আল-কোরআন : যথাযথ বিশ্লেষণ

(দ্বিতীয় খন্ড)

Al -Quran : A True Interpretation

এ জেড এম আলমগীর

আইডিয়াস এন ভিউস পাবলিকেশন

গ্রন্থস্বত্ব : এ জেড এম আলমগীর

প্রথম প্রকাশ : জুন ২০২৬

প্রকাশক : এ জেড এম আলমগীর
আইডিয়াস এন ভিউস পাবলিকেশন
রোড-৬, ব্লক-এ, মিরপুর-১০, ঢাকা, বাংলাদেশ।

প্রচ্ছদ পরিকল্পনা : এ জেড এম আলমগীর
প্রচ্ছদ ডিজাইন : নাহিয়ান নাজাহ্

মুদ্রণ : ইরানী প্রিন্টার্স
১৪৯-১৬১, গাউসুল আজম মার্কেট, ঢাকা।

মূল্য : ৭০০ টাকা।

Al-Quran : A True Interpretation
(Understanding Quran-IV)
by A Z M Alamgir
Published in Bangladesh
By A Z M Alamgir
Ideas n views publication.

Price: BDT 700.

ISBN : 978-984-35-9225-5

Facebook Page: https://www.facebook.com/ideasnviews

‘হে আল্লাহ! আমাদেরকে সরল পথ দেখাও’

সূচী

সূরা আল–বাকারা

(Sura Al-Bakara)

যথাযথ বিশ্লেষণ : সূরা আল-বাকারা

(আয়াত ১৪৩-২৮৬)

■ **২.১৪৩.৩** এবং আমি এজন্যই কেবলা পুনঃ নির্ধারণ করেছিলাম যা তোমরা পূর্বে অনুসরণ করতে, যেন আমি জানতে পারি কে বার্তাবাহককে অনুসরণ করছে এবং কে তার থেকে মুখ ফিরিয়ে নিচ্ছে। সত্যি বলতে এটি ছিল একটি কঠিন পরীক্ষা, তাদের ব্যাতিত যাদেরকে আল্লাহ পথ প্রদর্শন করেছেন : মোহাম্মদ (সাঃ)-কে কে বা কারা সত্যিকারভাবে অনুসরণ করছে তাদের চিহ্নিতকরণে কেবলা পুনঃ নির্ধারণের বিষয়টি ছিল একটি কঠিন পরীক্ষা। কারা তাদের অন্তরের পূর্বতন টান পরিত্যাগ করে আল্লাহ ও সত্যের পথ ধারণ করতে মানসিকভাবে প্রস্তুত ও শক্তিশালী হতে পেরেছে এটি ছিল তারও একটি পরীক্ষা।

মক্কা থেকে মদীনা হিজরত করার পরেও মহানবী (সাঃ) প্রায় ১৬-১৭ মাস উপাসনাকালীন সময়ে জেরুজালেমের দিকে মুখ করে সালাত আদায় করতেন।

বিশ্বাসী আরবের অধিবাসীরাও উপাসনাকালে মোহাম্মদ (সাঃ) কে অনুসরণ করে জেরুজালেমের দিকে এতকাল মুখ ফিরিয়েছে। মক্কার পরিবর্তে জেরুজালেমের দিকে মুখ ফেরানো ছিল তাদের জন্য কষ্টকর। অপরদিকে মদীনার ইহুদিরা এতে তুষ্ট ছিল। কিন্তু যখন কেবলা পরিবর্তন করা হল এবং কা'বার দিকে মুখ ফেরাতে বলা হল, তখন ইহুদি-খ্রীষ্টানদের মধ্যে যারা ইসলাম গ্রহণ করেছিল তাদের জন্য এটি এক কঠিন পরীক্ষা হয়ে দাড়ায়। কেননা জেরুজালেম ছিল তাদের কেবলা। তাদের অন্তরের টান সেদিকে।

কেবলা পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে যারা মোহাম্মদ (সাঃ) কে সত্যিকারভাবে অনুসরণ করেছে তাদের ও অবিশ্বাসীদের পৃথকভাবে চিহ্নিত করা সম্ভব হয়েছে। বস্তুত এ চিহ্নিতকরণ গুরুত্বপূর্ণ ছিল। কেননা ইসলামের ছাঁয়াতলে থেকে অনেকেই তখন হঠকারী আচরণ করত। হঠকাররা ইসলামের প্রচার-প্রসারের জন্য ক্ষতিকর ছিল। এটি ছিল একটি কঠিন পরীক্ষা।

দীর্ঘদিনের নিজ বিশ্বাস ও অভ্যস্ততা পরিত্যাগ করে মূহুর্তেই অন্য একটি বিশ্বাস ও অভ্যস্ততায় চলে যাওয়া যায় না। এটি সহজ বিষয় নয়। এর সাথে বিশ্বাস, স্মৃতি, অভ্যস্ততা অনেক আর্থ–সামাজিক ও পরিবেশের প্রভাব রয়েছে। কিন্তু যারা সত্যিকার বিশ্বাসী এবং যারা যথাযথই মোহাম্মদ (সাঃ)–কে অনুসরণ করছে তাদের জন্য এ পরিবর্তনকে তৎক্ষণাৎ মেনে নেয়া সহজ ছিল। এভাবে সত্যিকার বিশ্বাসী, অবিশ্বাসী ও হঠকারদের চিহ্নিত করা সহজ ছিল। কেবলা পরিবর্তনের এটিও একটি উদ্দেশ্য ছিল যা এ আয়াতে উদ্ধৃত হয়েছে।

▪ **২.১৪৩.৪** কিন্তু এটি আল্লাহর ইচ্ছে নয় যে তিনি তোমাদের বিশ্বাসকে নিরর্থক করে দেবেন : কেবলা পরিবর্তনের বিষয়টি কারও বিশ্বাসে আঘাত করার অভিপ্রায়ে করা হয়নি। আল্লাহ সেটি নিশ্চিত করে জানিয়ে দিয়েছেন। ফলে বিশ্বাসীদের অন্তর এতে প্রশান্ত হয়।

এটি করা হয়েছে সত্যিকার বিশ্বাসীদেরকে চিহ্নিত করার জন্য। হঠকারদেরকে বিশ্বাসীদের থেকে পৃথকভাবে চিহ্নিতকরণের জন্য এবং কারা তাদের পূর্বতন ভূল চিন্তাধারা দুরে সরিয়ে নতুন ও সত্য ধর্মকে গ্রহণ করতে পেরেছে তা যাচাই করার জন্য। বিষয়টি নিশ্চিত করার জন্য আল্লাহ বলেন, এটি আল্লাহর ইচ্ছে নয় যে তিনি তোমাদের কারও বিশ্বাসকে আঘাত করেন বা নিরর্থক করে দেবেন।

এ বাণী বিশ্বাসীদের মনে স্বস্তি বা প্রশান্তি এনে দেয়। বিশ্বাসীদের পূর্বেকার উপাসনাসমূহও নিরর্থক হয়ে যায়নি সে বিশ্বাসও তাদের মধ্যে ফিরে আসে। আল্লাহর একটি নিশ্চিতকরণ বার্তা বিশ্বাসীদের মনের ওপর ব্যাপক প্রভাব বিস্তার করতে সক্ষম। তৎকালীন সময়ে বিশ্বাসীদের ওপর এ বাণীর বড় রকমের ধনাত্মক প্রভাব ছিল।

তবে এ বাণীর শাশ্বততা ও সার্বজনীনতা হচ্ছে আল্লাহ কখনই মানুষের অন্তরকে আঘাত করার জন্য কোন পদক্ষেপ নেন না। মানুষের জন্যও সে পথই অনুসরণীয়।

▪ **২.১৪৩.৫** নিশ্চয়ই! আল্লাহ মানুষের প্রতি অত্যান্ত স্নেহশীল, করুণাময় (Allah is Full of Pity, Merciful towards mankind) : আয়াতের পূর্বের অংশে কেবলা পরিবর্তন বিষয়ে বলা হয়েছে যে, এটি আল্লাহর ইচ্ছে নয় যে

তিনি তোমাদের বিশ্বাসকে নিরর্থক করে দেবেন। আল্লাহ তেমনটি করবেন না। বলা হচ্ছে, আল্লাহ মানুষের প্রতি অত্যান্ত স্নেহশীল, করুণাময়।

বস্তুত সৃষ্টি যার সৃষ্টির প্রতি দয়া ও করুনা তাঁরই সবচাইতে বেশী থাকে। কেননা তিনি নিজ হাতে তা সৃষ্টি করেছেন। ফলে মানুষ নিজেদের মধ্যে যত প্রেম-প্রীতি-ভালবাসাই প্রদর্শন করুক না কেন তার সবই সম্ভব হয়েছে তাকে সৃষ্টি করার কারণে। কিন্তু যিনি সৃষ্টি করেছেন সৃষ্টির প্রতি তাঁর দয়া ও ভালবাসাই সবচাইতে বেশী। সে সূত্র উল্লেখ করে কেবলা পরিবর্তনের বিষয়ে বলা হয়েছে যে, তিনি কারও মনে আঘাত দেয়ার জন্য এ নির্দেশনা দেননি। পরীক্ষার প্রয়োজনীয়তা ছিল বলে সেটি করা হয়েছে।

তবে এতে পূর্বে যেদিকে মুখ করে সবাই উপাসনা করেছে তাদের সে উপাসনা ক্ষতিগ্রস্ত হবে না। আল্লাহ অত্যান্ত স্নেহশীল, করুণাময়। তিনি মানুষকে কোনভাবেই ক্ষতিগ্রস্ত করবেন না যাদি মানুষ সঠিক পথে চলে। এমনই তাঁর দয়া।

▪ **২.১৪৪.১** নিশ্চয়ই! আমি তোমাকে উর্ধ্বপানে তাকাতে দেখি। অতএব অবশ্যই এবার আমি তোমাকে সেই কেবলার দিকেই ঘুরিয়ে দেব যেটি তোমার কাছে অধিক প্রিয়। অতএব তুমি উপাসনার পবিত্রতম স্থানের দিকে মুখ ফেরাও : নিশ্চয়ই! আমি তোমাকে উর্ধ্বপানে তাকাতে দেখি। অর্থাৎ মোহাম্মদ (সাঃ) এর অন্তর কেবলা পরিবর্তনের জন্য প্রত্যাশী ছিল এবং তিনি এ বিষয়ে আল্লাহর সুস্পষ্ট দিক-নির্দেশনা কামনা করতেন। এ বাণী থেকে সে বিষয়টি স্পষ্ট। অতঃপর সে নির্দেশনা আসে।

এ বাণী অবতীর্ণ হওয়ার পর থেকে জেরুজালেমের পরিবর্তে মক্কায় অবস্থিত মসজিদুল হারাম যার প্রাণকেন্দ্রে কা'বা অবস্থিত সেটি কেবলা হিসেবে নির্ধারিত হয়। যেটি সকলের পূর্বপুরুষ ইব্রাহীম (আঃ) প্রতিষ্ঠা করেছেন। অতএব সেটিই সর্বপ্রথম ও পবিত্রতম।

মসজিদুল হারাম হচ্ছে, যে চৌহদ্দির মধ্যে যে কোন প্রকার খারাপ বা মন্দ কাজ করা হারাম বা নিষিদ্ধ সেটি। তাই এটি উপাসনার পবিত্রতম স্থান। যেখানে সকল প্রকার অন্যায় অপরাধ ও মন্দ কাজ করা নিষেধ। এ বাণী বা নির্দেশনার অব্যাবহিত পরেই মক্কা কেবলারূপে প্রতিষ্ঠা পায়।

▪ **২.১৪৪.২** এবং তোমরা যেখানেই থাক না কেন এদিকেই মুখ ফেরাও : এটি সকল বিশ্বাসী তথা মুসলমানদেরকে উদ্দেশ্য করে বলা হয়েছে। তোমরা যেখানেই থাক না কেন যখন তোমরা উপাসনায় রত হও তখন কা'বার দিকে মুখ ফেরাও। এখানেই কেবলা পরিবর্তনের নির্দেশনা বা ঘোষনা দেয়া হয়েছে সকল মুসলিম তথা বিশ্ববাসীদের জন্য।

বস্তুত আল্লাহ সর্বত্র বিরাজ করেন। এটি পূর্বেও উল্লেখ করা হয়েছে। কেবলা পরিবর্তনের কারণে আল্লাহ কিংবা বিশ্বাসীদেরও কোন প্রকার ক্ষতি হয়নি। কিন্তু এটি একই বিশ্বাসের মানুষের মধ্যে মনস্তাত্ত্বিক পরিবর্তনের শুভ সূচনা করে। ভ্রাতৃত্ববোধ, সম্পর্ক, শৃংখলা নানান বিষয় এর সাথে সম্পর্কিত। দীর্ঘ সময়ের বাস্তবতার নিরিখে এ বিষয়গুলিও প্রয়োজনীয়। এতে না ধর্মের না আল্লাহর সঙ্গে মানুষের সম্পর্কের কোন ক্ষতি হয়। বিষয়গুলি সকলকে যথাযথ জ্ঞানে বুঝতে উৎসাহিত করা হয়েছে। তাতে ধর্মের ভেতরের কুসংস্কারও দুরীভূত হবে। সারা বিশ্বের মুসলিম যে যেখানেই থাকুক না কেন উপাসনাকালে তাদেরকে নতুনভাবে প্রতিষ্ঠিত এ কেবলামুখী হতে বলা হয়েছে।

▪ **২.১৪৪.৩** যারা গ্রন্থপ্রাপ্ত হয়েছে তারা অবশ্যই জানে যে এটি পালনকর্তার পক্ষ থেকে (অবতীর্ণ) ও সত্য। তারা যা করে সে বিষয়ে আল্লাহ অনবহিত নন : মক্কায় অবস্থিত মসজিদুল হারাম বা বায়তুল্লাহ শরীফ যার কেন্দ্রে কা'বা অবস্থিত তা কেবলা হিসেবে নির্ধারিত হয়। এটি সর্বপ্রথম প্রতিষ্ঠিত আল্লাহর ঘর যেটি ইব্রাহীম (আঃ) প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। জেরুজালেমে আল্লাহর ঘর প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল ইব্রাহীম (আঃ) এর বহু পরে হযরত সোলায়মানের সময়ে।

জেরুজালেমে আল্লাহর ঘর নির্মাণের নির্দেশনা পেয়েছিলেন হযরত সোলায়মানের পিতা হযরত দাউদ (আঃ)। তিনি সে কাজ সম্পন্ন করে যেতে পারেননি। এটি ছিল আহলে-কিতাব বা গ্রন্থপ্রাপ্ত সম্প্রদায়ের কেবলা। আহলে-কিতাব হচ্ছে ইসরাইলের সন্তানগণ। কেননা তারাই সর্বপ্রথম আল্লাহর অবতীর্ণ গ্রন্থ প্রাপ্ত হন। পরবর্তীতে তাদের একাংশও সেদিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়। তাদের গ্রন্থে তথা বাইবেলে বিষয়গুলি বলা হয়েছে যা তারা পাঠ করে। ফলে বিষয়গুলি তারা জানে [লেখকের 'বাইবেল কোরআন ও ইসরাইল' বইতে বিষয়গুলি ধারাবাহিকভাবে তুলে ধরা হয়েছে]।

ইহুদি, খ্রীষ্টান ও মুসলিম জাতির পিতা ইব্রাহীম (আঃ) সর্বপ্রথম মক্কায় পবিত্র উপাসনালয় প্রতিষ্ঠা করেন। অতএব কেবলা হওয়ার ক্ষেত্রে জেরুজালেমের চাইতে মক্কা যে অগ্রগণ্য হিসেবে বিবেচিত গ্রন্থপ্রাপ্ত সম্প্রদায়ের লোকেরা সেটি জানে। আল্লাহ যে নির্দেশনা দিয়েছেন সেটি যে যুক্তিযুক্ত ও সত্য সেটিও তারা জানে। এতদ্বসত্বেও তারা কেবলা পরিবর্তনের বিষয় নিয়ে নানান বিরূপ আলোচনা-সমালোচনা করার প্রয়াস পায়।

বলা হচ্ছে যে, তারা যা করে সে বিষয়ে আল্লাহ অনবহিত নন। আল্লাহর পক্ষ থেকে যে সত্য নির্দেশনা আগমন করেছে সে বিষয়ে গ্রন্থপ্রাপ্ত সম্প্রদায়ের লোকেরা যদি বিরূপ আলোচনা-সমালোচনা বা মন্দ কাজ করতেই থাকে, তবে তাদেরকে আল্লাহ প্রদত্ত শাস্তির মুখোমুখী হতে হবে। কেননা সকলের সকল কার্যকলাপ আল্লাহ জানেন। প্রচ্ছন্নে এটি তাদের প্রতি একটি সতর্কবার্তা।

▪ **২.১৪৫.১** যদি তুমি গ্রন্থপ্রাপ্ত সম্প্রদায়ের কাছে সমুদয় নিদর্শন উপস্থাপন কর, তবুও তারা তোমার কেবলা অনুসরণ করবে না এবং তুমিও তাদের কেবলার অনুসারী নও। তারাও একে অন্যের কেবলার অনুসারী নয় : বিশ্বাস এমন একটি বিষয় যদি সেটি সত্যিকারভাবে একবার কারও মনে প্রবেশ করে, তবে সেখান থেকে সরে আসা সহজ নয় বা সম্ভব হয়ে ওঠে না। প্রত্যেকের একটি বিশ্বাস আছে। তার থেকে সংস্কৃতি, অভ্যস্ততা, স্মৃতি ইত্যাদি অনেক বিষয় জড়িত। এখানে কেবলা পরিবর্তনজনিত নির্দেশনার একটি ফলাফলও প্রকাশ পেয়েছে। অর্থাৎ কেবলা পরিবর্তন সহজ বিষয় না। যেটি এ বাণীতে ফুটে উঠেছে।

ইসরাইলের সন্তানদের কেবলা হচ্ছে জেরুজালেম। কিন্তু হযরত সোলায়মানের মৃত্যুর পরে রাজনৈতিক বিভাজনের কারণে তাদের মধ্যেও বিভক্তি দেখা দেয়। ফলে তাদেরই একদল বেথেলকে কেবলারূপে বেছে নেয়।

ইসরাইলের সন্তানদের মধ্যে যারা তাদের বিশ্বাসে অনড়, তারা মোহাম্মদ (সাঃ) এর নির্দেশনা অনুযায়ী নতুন কেবলাকে অনুসরণ করতে পারবে না। এমনকি বিভক্তির পরে তারা নিজেরাও একে অন্যের কেবলাকে অনুসরণ করে না বা করতে পারেনি। এর সাথে যেমন অন্তরের বা বিশ্বাসের সম্পর্ক আছে, সম্পর্ক আছে বহুদিনের অভ্যস্ততার, আবার রাজনীতিরও একটি সম্পর্ক আছে।

যারা মোহাম্মদ (সাঃ) এর প্রতি অনুগত কেবল তারাই আল্লাহ প্রদত্ত কেবলা পরিবর্তনজনিত এ নির্দেশনা সহজভাবে অনুসরণ করবে। এর মধ্য দিয়ে কারা সত্যিকারের বিশ্বাসী ও কারা হঠকারীর আশ্রয় নেয় তাদেরকেও চিহ্নিত করা সম্ভব হয়। কেউই একে অন্যের কেবলাকে অনুসরণ করবে না বা করতে পারবে না। এটিই সত্য। বস্তুত যার অন্তর যেদিকে ভালবাসায় সিক্ত তার পক্ষে অন্যটি গ্রহণ করা সম্ভব নয়। কেবলা পরিবর্তনের নির্দেশনা ছিল একটি পরীক্ষাস্বরূপ।

তাই বলা হয়েছে, যদি তুমি গ্রন্থপ্রাপ্ত সম্প্রদায় অর্থাৎ ইহুদি ও খ্রীষ্টানদের কাছে সমুদয় নিদর্শন উপস্থাপন কর, তবুও তারা তোমার কেবলা অনুসরণ করবে না এবং তুমিও তাদের কেবলার অনুসারী নও। তারাও একে অন্যের কেবলার অনুসারী নয়।

■ **২.১৪৫.২** তোমার নিকট জ্ঞান আসার পরেও যদি তুমি তাদের খেয়াল খুশির অনুসরণ কর, তবে নিশ্চয়ই! তুমি সীমালংঘনকারীদের অন্তর্ভুক্ত হবে : আল্লাহ যে নির্দেশনা প্রেরণ করেছেন তা নির্দ্বিধায় অনুসরণ করতে বলা হয়েছে। আল্লাহর নির্দেশনা অমান্য করা হলে সীমালংঘনকারীদের অন্তর্ভুক্ত হতে হবে। এখানে সে সতর্কবাণী উচ্চারণ করা হয়েছে। বিশেষভাবে লক্ষনীয় যে, এ সতর্ক বাণী উচ্চারণ করা হয়েছে মোহাম্মদ (সাঃ) এর প্রতি। অতএব আল্লাহ প্রদত্ত নির্দেশনা পালনের গুরুত্ব যে কত বড় সেটি এ বাণী থেকে সহজেই অনুমেয়। এমনকি হযরত আদম (আঃ) এর আল্লাহর নির্দেশ রক্ষা করতে না পারার ফলাফল থেকেও সেটি বোঝা যায়।

আল্লাহ কোন অনর্থক নির্দেশনা দেন না। আল্লাহর সকল নির্দেশনা সত্যের ওপর ভিত্তি করে চলে। কেবলা পরিবর্তনের এ নির্দেশনার পেছনেও তেমনি কারণ ছিল।

অপরদিকে মোহাম্মদ (সাঃ) এর ওপর আল্লাহ কোন নির্দেশনা দিলে সেটিই যথেষ্ট। সেটি পালন করতে হবে। সেটি বাস্তবায়ন হতেই হবে। বিশ্বাসীদের এর অন্যথা করার উপায় নেই। এর কোন ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণেরও প্রয়োজন নেই এবং তিনি সেটি দিতে বাধ্যও নন।

লক্ষ্যনীয় যে, আল্লাহ তেমনভাবে কাজটি করেননি। কি কারণে তিনি এমন সিদ্ধান্ত দিয়েছেন সে জ্ঞানও তিনি রাসূলকে দিয়েছেন। সেটি আয়াতসমূহ থেকে বোঝা যায় (২:১৪৩)। যা ছিল যৌক্তিক, সত্য বা যথাযথতার ওপর প্রতিষ্ঠিত এবং প্রয়োজনীয়।

গুরুত্বপূর্ণ ও প্রয়োজনীয় কাজ বাস্তবায়নের যথাযথতার জ্ঞান আসার পরেও যদি কেউ ভূল করে, তবে সে সেই পরিবেশ-পরিস্থিতি ও কৌশল অনুধাবনেই ব্যার্থ! তেমন মানুষের পক্ষে কিভাবে বড় দায়িত্ব পালন করা সম্ভব?

জ্ঞান আসার পরেও আল্লাহ প্রদত্ত সিদ্ধান্ত উপেক্ষা করা বা অপরাপর মানুষের খেয়াল-খুশির অনুসরণ করা বা তাদের মন জয় করার বাসনা গুরু দায়িত্ব পালনকালে ক্ষমার অযোগ্য অপরাধরূপে বিবেচিত হয়। কেননা তখন জ্ঞানই বলে দেয় যে, গৃহিত সিদ্ধান্ত বা পদক্ষেপ সামগ্রীক মঙ্গল ও কল্যাণের নিমিত্তে। কিন্তু কোন ভূলের কারণে সত্যের সে পথের প্রতিষ্ঠা বিঘ্নিত হলে সেটি মানব সমাজে দীর্ঘমেয়াদে অকল্যাণ বয়ে আনবে যা আল্লাহ জানেন। বোধসম্পন্ন মানুষও জানে বা বোঝে। অতঃপর জ্ঞান আসার পর সেটি পালিত না হলে হিতে বিপরীত কাজ করা হয়। আল্লাহর নির্দেশনার দিক বিবেচনায় যা গুরুতর সীমালংঘন।

মানবের বৃহত্তর কল্যাণের বিপরীত কাজই শাস্তিযোগ্য অপরাধ। সকল সিদ্ধান্ত কোরআনে এমনিভাবে যুক্তি ও সত্যের ওপর ভিত্তি করে প্রতিষ্ঠিত। তাই বলা হয়েছে, 'তোমার নিকট জ্ঞান আসার পরেও যদি তুমি তাদের খেয়াল খুশির অনুসরণ কর, তবে নিশ্চয়ই! তুমি সীমালংঘনকারীদের অন্তর্ভুক্ত হবে।'

■ **২.১৪৬-২.১৪৭** যাদেরকে আমি গ্রন্থ প্রদান করেছি, তারা তাকে (নতুন কেবলাকে) তেমনিভাবে চেনে-জানে, যেমনিভাবে চেনে-জানে তাদের সন্তানদেরকে। কিন্তু তাদের মধ্যে একদল জেনে-শুনে সত্যকে গোপন করে। সত্য তোমার পালনকর্তার নিকট থেকে প্রেরীত (হে মোহাম্মদ)। অতএব তুমি (এ বিষয়ে) সন্দিহান হয়ো না : গ্রন্থপ্রাপ্ত সম্প্রদায় জানে যে, যথাযথতার দিক থেকে কেবলা হওয়ার অধিকতর উপযুক্ত হচ্ছে কা'বা। কেননা এটি জেরুজালেমের বহু পূর্বে সম্প্রদায়ের সকলের পিতা ইব্রাহীম (আঃ) কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। অপরদিকে জেরুজালেমে আল্লাহর ঘর প্রতিষ্ঠিত হয়েছে

ইব্রাহীম (আঃ) এর প্রায় ১৩০০ বছর পর হযরত সোলায়মান (আঃ) এর সময়।

সে প্রেক্ষিতে বলা হয়েছে যে, গ্রন্থপ্রাপ্ত সম্প্রদায় অর্থাৎ ইহুদি-খ্রীষ্টানরা বিষয়টি জানে এবং জোর দিয়ে বলা হয়েছে যে, বিষয়টি তারা এতটাই ভালভাবে জানে যে যেমন তারা নিজেদের সন্তানদেরকে চেনে-জানে তেমনভাবেই জানে। তথাপি তারা সত্য গোপন করে। তাদেরকে সত্য গোপন করতে বারণ করা হয়েছে। সত্য গোপন করা অপরাধ।

একই সাথে বার্তা যেহেতু আল্লাহর দিক থেকে আগত, তাই মোহাম্মদ (সাঃ)-কে নানান প্রতিকূলতা ও ঝুঁকি থাকা সত্বেও কেবলা পরিবর্তনের সিদ্ধান্তের বিষয়ে দৃঢ় থাকতে বলা হয়েছে। কেননা প্রথমত: এ সিদ্ধান্ত আল্লাহর দিক থেকে আগত এবং দ্বিতীয়ত: এটি এতটাই যথাযথ যে এ বিষয়ে মনে কোন প্রকার সন্দেহ ও দোদুল্যমানতা রাখারও প্রয়োজন নেই। মক্কাকে কেবলা নির্ধারণের বিষয়টি যুক্তিসঙ্গত ও যথাযথ। এ বিষয়ে কোন প্রকারের সন্দেহ ও দোদূল্যমানতা থাকার কোন অবকাশ নেই।

▪ **২.১৪৮.১** প্রত্যেকেরই একটি দিক আছে যে দিকে সে মুখ করে (উপাসনার জন্য)। অতএব একে অপরের সঙ্গে প্রতিযোগিতা কর ভাল কাজে : বলা হচ্ছে যে, প্রত্যেক জাতিই উপাসনার জন্য একটি দিক নির্ধারণ করে নেয়। কিন্তু সত্য হচ্ছে আল্লাহ বিরাজ করেন সর্বত্র। ফলে দিকটি আল্লাহর কারণে গুরুত্বপূর্ণ নয়। তবে গুরুত্বপূর্ণ একটি জাতির বা বৃহৎ জনগোষ্ঠীর শৃংখলা ও ব্যাবস্থাপনার জন্য। ভ্রাতৃত্ববোধ ও একতা সৃষ্টির জন্য। এছাড়াও অভ্যস্ততার কারণে এর আত্মিক ও মানসিক বা মনস্তাত্বিক দিকও আছে।

এতদ্বসত্বেও দিক নির্ধারণের চেয়েও গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে দিক নির্ধারণের পরে যথাযথতার সাথে আল্লাহর উপাসনা করা। ভাল কাজ করা। ভাল গুণাবলী অর্জন করা। সেটি করা সম্ভব না হলে দিক বা কেবলা নির্ধারণের মূল উদ্দেশ্যই ব্যাহত হবে বা অর্জন করা সম্ভব হবে না।

অতএব দিক নিয়ে অধিক ভাবনা বা আলোচনা-সমালোচনার চেয়ে একে অপরের সঙ্গে ভাল কাজে প্রতিযোগিতা করাটি অধিক গুরুত্বপূর্ণ। এখানে সে কথাটিই ব্যাক্ত করা হয়েছে। কেননা পরিশেষে সকলকে আল্লাহর কাছে সমবেত

হতে হবে এবং তিনি ভাল-মন্দ কর্মের ভিত্তিতে সকলের বিচার করবেন। সেটিই অধিক গুরুত্বপূর্ণ। আয়াতে সকল প্রকারের উপাসনা ও রীতি-নীতি পালনের মূল লক্ষ্য যে ভাল কাজ করা সে বিষয়ের গুরুত্বকে তুলে ধরা হয়েছে।

■ **২.১৪৮.২** তোমরা যেখানেই থাক না কেন আল্লাহ অবশ্যই তোমাদেরকে সমবেত করবেন (Allah will bring you all together) : কেবলা পরিবর্তন প্রসঙ্গে বলতে গিয়েই এখানে এটি বলা হয়েছে। ওপরে বিষয়টি তুলে ধরা হয়েছে যে, দিক নিয়ে অধিক ভাবনার চেয়ে একে অপরের সঙ্গে ভাল কাজে প্রতিযোগিতা করাটি অধিক গুরুত্বপূর্ণ। এখানে সেটি স্মরণ করিয়ে দেয়া হয়েছে।

বিচার দিবসে আল্লাহ মানুষকে সমবেত করবেন। সেদিন মানুষকে তাদের ভাল-মন্দ কর্মের কারণে জবাবদিহি হতে হবে। অতএব ভাল কাজ করতে বলা হয়েছে। ভাল কাজে প্রতিযোগীতা করতে বলা হয়েছে। তবে হিংসাত্মক, ধ্বংসাত্মক বা ষড়যন্ত্রের পথ অবলম্বন করে নয়।

অপ্রয়োজনীয় বিষয় নিয়ে বিবাদে লিপ্ত হয়ে অযথা মূল্যবান সময় নষ্ট না করতে বলা হয়েছে। এ বার্তার মাধ্যমে প্রচ্ছন্নে সে বিষয়টিও স্মরণ করিয়ে দেয়া হয়েছে। প্রত্যেককেই তার নিজ নিজ বিশ্বাসে থেকে হলেও ভাল কাজ করতে বলা হয়েছে। যেমন বলা হয়েছে,

"... সেদিন (বিচার বা সমাবেশের দিন) তেমন কোন ব্যাক্তির বিশ্বাস স্থাপন তার জন্য ফলপ্রসূ হবে না, যে পূর্ব থেকে বিশ্বাস স্থাপন করেনি কিংবা 'স্বীয় বিশ্বাস' অনুযায়ী কোনরূপ ভাল কাজ করেনি। ..." (আল-কোরআন ৬:১৫৮)

অতএব যারা ভাল কাজে বাধা হয়ে দাড়ায় তাদেরকে সতর্ক করা হচ্ছে যে, যে যেখানেই থাকুক না কেন আল্লাহ অবশ্যই একদিন সকলকে সমবেত করবেন এবং মন্দ কাজের কারণে তাদেরকে পরিণতি ভোগ করতে হবে। অতএব মন্দ কাজ পরিত্যাগ করে সকলকে ভাল কাজ করতে ও ভাল কাজে সহায়তা করতে উৎসাহিত করা হয়েছে।

▪ **২.১৪৮.৩** নিশ্চয়ই! আল্লাহ সবকিছু করতে সক্ষম (Lo! Allah is Able to do all things) : বিষয়টি নিয়ে এখানে অধিক আলোচনা করতে চাই না। চৌদ্দ'শ বছর পূর্বে এসব কথার মর্ম অর্থ অনুধাবন করা কষ্টসাধ্য ছিল। বর্তমান প্রযুক্তির উন্নতি ও উৎকর্ষ সাধনের যুগে মানুষই যেসব কাজ করে চলেছে তাতে মানুষের স্রষ্টার ক্ষমতার বাইরে যে কিছুই নেই সেটি বোঝা সহজ হয়ে উঠছে [আল্লাহ দ্রষ্টব্য ২.২০.২]।

এ বিষয়ে তাই যুক্তিতে না গিয়ে বিশ্বাস রাখাটিই উত্তম। আল্লাহ নিজেই তার সক্ষমতার কিছু নিদর্শন মানব সামাজের সম্মুখে ধীরে ধীরে প্রকাশ করছেন যা পূর্বে মানুষ কল্পনাও করতে পারত না। কোরআনে এ বিষয়ে বহু পূর্বেই বলা হয়েছে যে,

"সৃষ্টিগতভাবে মানুষ ত্বরাপ্রবণ। আমি তোমাদেরকে আমার নিদর্শনাবলী প্রদর্শন করব, তবে আমাকে ত্বরা করতে বল না।" (আল-কোরআন ২১:৩৭)

আল্লাহ যা নির্দেশনা দিয়েছেন তা পরিপালন করতে বলা হয়েছে। এর অন্যথা করে ভূল করতে সতর্ক করা হয়েছে। আল্লাহ তাঁর ইচ্ছেকে পরিপুরণ বা প্রতিষ্ঠা করবেনই। তিনি সবকিছু করতে সক্ষম। এ বার্তার মাধ্যমে সে বিশ্বাস রেখে মানুষকে তাঁর নির্দেশনা মেনে চলতে বলা হয়েছে।

▪ **২.১৪৯** যে স্থান থেকেই তুমি উপাসনার জন্য আস না কেন, তোমার মুখ ফেরাও উপাসনার পবিত্রতম স্থানের (মসজিদুল হারামের) দিকে। এটি তোমার পালনকর্তার পক্ষ থেকে নির্ধারিত সত্য। তোমরা যা কর আল্লাহ সে বিষয়ে অনবহিত নন : যে কোন স্থান থেকেই কেউ মক্কা নগরীতে আসুক না কেন উপাসনাকালে কা'বার দিকে মুখ ফেরাতে নির্দেশনা দেয়া হয়েছে। যে যাই বলুক না কেন এটিই আল্লাহ প্রদত্ত সিদ্ধান্ত যা যথাযথ বা সত্যের ওপর প্রতির্ষ্ঠিত। বিষয়টিকে এভাবে শক্তভাবে নিশ্চিত করা হয়েছে যেন এ বিষয়ে বিশ্বাসীদের কারও মনে কোনরূপ দ্বিধা-দ্বন্দ্ব কাজ না করে। অতঃপর কেউ এর অন্যথা করলে সে যেন জানে যে আল্লাহ প্রত্যেকের কাজ সম্পর্কে অবগত। এটি নির্দেশ অমান্যকারীদের জন্য প্রচ্ছন্ন এক সতর্কবার্তা।

▪ **২.১৫০.১** তোমরা উপাসনার জন্য যেখান থেকেই আস না কেন মুখ ফেরাও মসজিদুল হারামের দিকে এবং তোমরা যেখানেই অবস্থান কর না কেন

এদিকেই মুখ ফেরাও, যেন এ বিষয়ে মানুষের মধ্যে বিতর্কের অবকাশ না থাকে তাদের ব্যাতিত যারা অন্যায় করে : পৃথিবীর যে কোন প্রান্তেই যে থাকুক না কেন মুসলমানদেরকে উপাসনাকালে মক্কা অভিমুখে বা নতুন কেবলার দিকে মুখ ফেরাতে নির্দেশনা দেয়া হয়েছে। হিজরত পরবর্তীকালের প্রথমদিকে যখন জেরুজালেম বা ইহুদিদের কেবলার দিকে মুখ করে উপাসনা করা হত তখন তারা বলার চেষ্টা করত যে, মুসলমানরা যখন আমাদের কেবলা গ্রহণ করেছে তখন আমাদের ধর্মও গ্রহণ করবে। কেবলা পরিবর্তনের মাধ্যমে তাদের তেমন আলোচনারও অবসান ঘটানো হয়েছে।

একটি বিষয় লক্ষ্যনীয় যে, মক্কা অভিমুখে নতুন কেবলার দিকে মুখ ফেরাবার কথা পাশাপাশি আয়াতসমুহে কয়েকবার উচ্চারণ করা হয়েছে (দ্রষ্টব্য আল-কোরআন ২:১৪৪, ২:১৪৯, ২:১৫০)। এর মাধ্যমে কেবলা পরিবর্তনের মতো স্পর্শকাতর বিষয়টির প্রতি বিশেষ গুরুত্ব দেয়া হয়েছে এবং এ বিষয়টির পরিপালন যেন কোন প্রকারেই অবহেলিত না হয় সেটি গুরুত্ব পেয়েছে। আবার কেউ যেন এ বিষয়ে ভুলভাবে কোনরূপ ব্যাখ্যা করার সুযোগ না পায় বা বিষয়টি নিয়ে কোনরূপ বিতর্কের সৃষ্টি না হয়, সেজন্য এটি বারবার উচ্চারণ করা হয়েছে এবং গুরুত্ব ও দৃঢ়তার সাথে নিশ্চিত করা হয়েছে।

যদিও তৎকালীন অবস্থার প্রেক্ষিতে এমন আশংকা ছিল যে কিছু মানুষ আলোচনা-সমালোচনা করার প্রয়াস চালিয়েই যাবে। তাদেরকেই এখানে অন্যায়কারী বলা হয়েছে। যারা সঠিক দিক-নির্দেশনা আসার পরেও এর অন্যথা করেই যাবে।

কেবলা পরিবর্তনের বিষয়টি স্পর্শকাতর এ জন্য যে এর সাথে কোন মানুষ, জাতি, সম্প্রদায় বা গোষ্ঠীর সারাজীবনের লালিত-পালিত বিশ্বাস, সংস্কৃতি, পৈত্রিক স্মৃতি, অভ্যস্ততা, মনস্তত্ব নানান বিষয় জড়িত। সহজেই এমন পরিবর্তন মেনে নেয়া যায় না বা কেউ মেনে নিতে পারে না। উপরন্তু এর সাথে নেতৃত্ব পরিবর্তনের একটি সম্পর্ক আছে বলেও বলা হয়।

আল্লাহ মানবজাতির জন্য ইহুদিদের ওপর গুরু দায়িত্ব অর্পন করেছিলেন। অর্থাৎ মানব সমাজে তারা আল্লাহর বাণী প্রচার করবে। যা মুসা (আঃ) ইসরাইলের সন্তানদের নির্দেশনা দিয়ে গিয়েছিলেন। বাইবেলে এ বিষয়ে উল্লেখ রয়েছে।

কিন্তু তাদের নানাবিধ ভূল কর্মকান্ড ও বিচ্যূত আচার-আচরণের কারণে সে দায়িত্ব আল্লাহ মুসলিম সম্প্রদায়ের ওপর ন্যাস্ত করেছেন। কেবলা পরিবর্তনের বিষয়টি তারই প্রতীকী একটি রূপ। অর্থাৎ নেতৃত্বের পরিবর্তনের সূচনা।

কোরআনে ইসরাইল জাতি সম্পর্কে ধারাবাহিক আলোচনার মাধ্যমে যৌক্তিকভাবে এ পরিবর্তনের আবশ্যকীয়তা তুলে ধরা হয়েছে। যেমন বলা হয়েছে,

“আমি ইসরাইলের সন্তানদের অবতীর্ণ গ্রন্থ (বিধি-বিধান), নির্দেশ প্রদানের ক্ষমতা (কর্তৃত্ব) ও নবুওয়ত (নেতৃত্ব) দান করেছিলাম এবং তাদেরকে পরিচ্ছন্ন জীবনোপকরণ দিয়েছিলাম এবং বিশ্ববাসীর ওপর শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছিলাম,

আরও দিয়েছিলাম তাদেরকে পথ চলার সুস্পষ্ট নির্দেশনা। কিন্তু জ্ঞান লাভের পর তারা পারস্পরিক বিদ্বেষের বশবর্তী হয়ে মতভেদ সৃষ্টি করে। নিশ্চয়ই! তারা যে বিষয়ে মতভেদ করেছে তোমার পালনকর্তা পুনরুত্থান দিবসে সে বিষয়ে তাদের মধ্যে মিমাংসা করবেন।

এখন আমি তোমাকে (হে মোহাম্মদ) আমার নির্দেশনার সুস্পষ্ট পথ প্রদর্শনের জন্য নিয়োজিত রেখেছি। অতএব এর অনুসরণ কর এবং যারা জানে না তাদের খেয়াল-খুশির অনুসরণ কর না। (আল-কোরআন ৪৫:১৬-১৮)

নেতৃত্বও একটি স্পর্শকাতর বিষয়। কেবলা পরিবর্তনের সাথে এর সম্পর্ক আছে। ফলে কেবলা পরিবর্তনের সম্পুর্ণ বিষয়টিই একটি ঝুঁকিপূর্ণ সিদ্ধান্ত বলা যেতে পারে। অনেকেই এ কারণে নতুন দর্শন ছেড়ে চলে যেতেও দ্বিধাবোধ করার কথা নয়। যদিও সে পরীক্ষা গ্রহণ করাই ছিল কেবলা পরিবর্তনের মূল উদ্দেশ্য, যা সততার সঙ্গেই কোরআনে প্রকাশ করা হয়েছে (দ্রষ্টব্য আল-কোরআন ২:১৪৩)।

▪ **২.১৫০.২** তাদের ভয় কর না, ভয় কর আমাকে! যেন আমি তোমাদের ওপর আমার অনুগ্রহ পূর্ণ করে দেই, ফলে তোমরা সঠিক পথে পরিচালিত হতে পার : তৎকালীন সময়ের সামাজিক অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে কেবলা পরিবর্তনের সিদ্ধান্ত এমন একটি স্পর্শকাতর বিষয় ছিল যা নিয়ে বিতর্ক সৃষ্টির অবকাশ ছিল। এমনকি সংঘর্ষ সৃষ্টিরও অবকাশ ছিল। কোরআনে আল্লাহ বারবার

বিষয়টির পুনরাবৃত্তি করেছেন যেন এ বিষয়ে মানুষের মধ্যে কোনরূপ বিতর্কের অবকাশ না থাকে এবং মোহাম্মদ (সাঃ) এর ওপর কোনরূপ বদনামও না আসে। এটি আল্লাহ প্রদত্ত সিদ্ধান্ত।

তবে কিছু লোক তারপরেও এমনটি করার প্রয়াস চালাবে। তেমন মানুষদের মন্দ আলোচনা-সমালোচনার ভয়ে ভীত না হওয়ার জন্য বলা হয়েছে। বরং আল্লাহকে ভয় করাই অধীক সমীচীন।

'আমাকেই ভয় কর' অর্থাৎ অন্যদের ভয়ে ভীত হয়ে যেন পথচ্যূত না হও। কেননা পরিশেষে আল্লাহর কাছেই সকলকে সমবেত হতে হবে। তিনি সকলের কর্মের হিসেব নেবেন এবং ফলাফল প্রদান করবেন।

আল্লাহকে ভয় করার অর্থ কি? আল্লাহকে ভয় করার অর্থ হচ্ছে, তাঁর নির্দেশের যথাযথ পরিপালন বা বাস্তবায়ন করা। আল্লাহর নির্দেশ বাস্তবায়নই তাঁর সন্তুষ্টির কারণ। আল্লাহর নির্দেশের অমান্যতার ফলাফল ইসরাইল জাতি দেখেছে। মরুর বুকে গোটা জাতিকে চল্লিশ বছর অবস্থান করতে হয়েছে। তিনি যদি শাস্তি দিতে চান তবে তাঁর মতো শাস্তি কেউ কাউকেই দিতে পারবে না। এ বাণীর মাধ্যমে সে কথা স্মরণ করিয়ে দেয়া হয়েছে।

আল্লাহর নির্দেশ জগতের সকল মানবের মঙ্গলের জন্য। যারা সেটি পালন করবে না তারা অমঙ্গলের জন্য দায়ী হবে। যারা অমঙ্গলের জন্য দায়ী তারাই শাস্তিযোগ্য বলে বিবেচিত হবে।

অপরদিকে আল্লাহর সন্তুষ্টি অধিকতর অনুগ্রহ প্রাপ্তির কারণ। সে কথা বলা হয়েছে। আল্লাহ তাঁর নির্দেশনা প্রদানের মাধ্যমে ধাপে ধাপে বিশ্বাসীদেরকে একটি লক্ষ্যের দিকে এগিয়ে নিয়ে চলেছেন। তৎকালীন সময় বিবেচনায় যা সমাপ্ত হয়নি বা একটা শক্তিশালী পর্যায় পর্যন্ত পৌঁছায়নি। আল্লাহর প্রতি ভয় রেখে তাঁর নির্দেশ পালন করলে তিনি তাঁর অনুগ্রহের পূর্ণতা দান করবেন। ফলে মানুষ সঠিক পথে পরিচালিত হতে পারবে। এখানে সে কথাও ব্যাক্ত করা হয়েছে।

▪ **২.১৫১** যেমন আমি তোমাদেরই মধ্য থেকে তোমাদের জন্য একজন বার্তাবাহক প্রেরণ করেছি, যে তোমাদের কাছে আমার বাণীসমূহ পাঠ করে এবং তোমাদের বিকাশ এবং শিক্ষা দান করে অবতীর্ণ গ্রন্থ ও জ্ঞান সম্পর্কে

এবং শিক্ষা দেয় এমন সব বিষয়ে যা তোমরা জানতে না : আল্লাহ মুসলিম জাতির ওপর তার অনুগ্রহ বর্ষন করেছেন। যেমন তিনি একসময় ইসরাইল জাতির ওপর করেছিলেন। ইসরাইল জাতির মধ্য থেকে নবী-রাসূলদের আগমন ঘটেছে। তাদেরকে নেতৃত্ব প্রদানের ক্ষমতা দিয়েছেন। গ্রন্থ প্রদান করে পথের দিশা দেখিয়েছেন। ফেরাউনের অত্যাচারের হাত থেকে উদ্ধার করেছেন। এত অনুগ্রহের পরেও তাদের পরবর্তী কার্যকলাপও ওপরে আলোচনা করা হয়েছে।

আল্লাহ জাতিসমুহের মধ্য থেকেই তাদেরকে সঠিক পথ প্রদর্শনের জন্য বার্তাবাহক প্রেরণ করেন। এটিও আল্লাহর এক অশেষ অনুগ্রহ। আল্লাহকে ভয় করে তাঁর নির্দেশ পালন ও বাস্তবায়ন করতে বলা হয়েছে। বলা হচ্ছে, তাহলে তিনি তাঁর অনুগ্রহের পূর্ণতা দান করবেন। তাঁর অনুগ্রহের একটি উদাহরণ তুলে ধরেছেন এ আয়াতে। যেমন তিনি বার্তাবাহক প্রেরণ করেছেন।

বার্তাবাহক আল্লাহর দিক থেকে আগত সত্যের জ্ঞানের ধারক ও বাহক। তাঁর মাধ্যমে মানুষ এমন সব বিষয় জানতে পেরেছে যা মানুষ আগে জানত না। মানুষ ছিল উদ্ভ্রান্তের মতো। জগতে মানুষের করণীয় কি, কাকে উপাসনা করবে, কিভাবে উপাসনা করবে, কে তার সৃষ্টিকর্তা, কতজন তার সৃষ্টিকর্তা, জাগতিক অনাচারের ফলাফল কি, পরকাল কি, বিচার দিবস কি, কৃতকর্মের জবাবদিহিতা ইত্যাদি নানান কিছু মানুষ অবগত হয়েছে যেসব বিষয়ে পূর্বে মানুষের যথাযথ জ্ঞান ছিল না। বার্তাবাহকের মাধ্যমে আল্লাহ মানবজাতিকে সঠিক পথের দিক-নির্দেশনা দিয়েছেন। মানুষকে অনুগ্রহ করেছেন।

আল্লাহ প্রদত্ত জ্ঞান মানব জীবন ও সমাজকে করেছে সুশৃংখল, শান্তিপূর্ণ। মানবের মাঝে দায়িত্ববোধ জাগ্রত করেছে। জীবনকে অর্থপূর্ণ করে গড়ে ওঠাতে এ জ্ঞান ভূমিকা রেখেছে। জ্ঞান মানুষকে বিকশিত করেছে। উচ্চ পর্যায়ে উন্নীত করেছে। অনুগ্রহের মধ্যে সর্বোত্তম অনুগ্রহ হচ্ছে 'জ্ঞান'।

কেবলা পরিবর্তন মুসলিম জাতির ওপর আল্লাহ প্রদত্ত আরও একটি অনুগ্রহ। এ পরিবর্তন মুসলিম জাতির ওপর অনেক বড় গুরু দায়িত্ব অর্পন করার প্রতীকস্বরুপ বলা যেতে পারে। এ দায়িত্ব প্রদানও একটি অশেষ অনুগ্রহ। কারও মতে এর দ্বারা মুসলিম (অর্থাৎ আল্লাহতে সমর্পিত) জাতির ওপর ইসরাইলিদের যে নেতৃত্ব ছিল সেটি মোহাম্মদ (সাঃ) এর অনুসারীদের ওপর অর্পন করা হয়েছে (দ্রষ্টব্য আল-কোরআন ৪৫:১৬-১৮)।

নেতৃত্ব বিষয়ে ইতিপূর্বেও আলোচনা করা হয়েছে। ইব্রাহীম (আঃ)-কে আল্লাহ যখন মানবজাতির নেতা সম্বোধন করেছিলেন, তখন তিনি জানতে চেয়েছিলেন যে তাঁর বংশধরদের মধ্য থেকেও নেতা হবে কিনা। আল্লাহ বলেছেন, আমার প্রতিশ্রুতি পথভ্রষ্টদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয় (দ্রষ্টব্য আল-কোরআন ২:১২৪)।

মুসা (আঃ) এর সময় মুসলিমদের নেতৃত্ব দিয়েছে ইসরাইল জাতি। পরবর্তীতে এ জাতির কার্যকলাপ কোরআনে তুলে ধরা হয়েছে যা ছিল মন্দ ও সরল পথ বিচ্যুত। তারা মুসা নবীর মাধ্যমে আল্লাহর সাথে যে অঙ্গীকারে আবদ্ধ হয়েছিল সেসব পালন করে নাই। উপরন্ত সময়ের সাথে সাথে বহুদুর বিচ্যুত হয়েছে। মন্দ কাজে লিপ্ত হয়েছে। ফলে নেতৃত্ব তাদের পরিবর্তে মোহাম্মদ (সাঃ) এর অনুসারীদের ওপর বর্তিয়েছে। প্রতিটি বিষয় কোরআন এভাবে যৌক্তিকতার সাথে তুলে ধরেছে।

ইব্রাহীম (আঃ) তাঁর প্রতি আল্লাহ নির্দেশিত কাজ সমাপ্ত করে আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করে বলেছিলেন, "হে আমাদের পালনকর্তা! তাদেরই মধ্য থেকে তাদের জন্য একজন বার্তাবাহককে জাগরিত কর, যে তাদের কাছে তোমার অবতীর্ণ বাণীসমূহ পাঠ করবে এবং তাদেরকে গ্রন্থ ও জ্ঞান সম্পর্কে দীক্ষা দেবে এবং তাদেরকে বিকশিত হতে সহায়তা করবে।" (আল-কোরআন ২:১২৯)

আল্লাহ ইব্রাহীম (আঃ) এর সে প্রার্থনা কবুল করেছেন (দ্রষ্টব্য ২:১২৯)। মোহাম্মদ (সাঃ) এর উত্থান বা আবির্ভাব বা তাঁর নবুয়ত লাভ সে প্রার্থনারই ফল। এ আয়াতে সেভাবে বিষয়টিকে তুলে ধরা হয়েছে। যেমন বলা হয়েছে, "আমি তোমাদেরই মধ্য থেকে তোমাদের জন্য একজন বার্তাবাহক প্রেরণ করেছি, যে তোমাদের কাছে আমার বাণীসমূহ পাঠ করে এবং তোমাদের বিকাশ এবং শিক্ষা দান করে অবতীর্ণ গ্রন্থ ও জ্ঞান সম্পর্কে এবং শিক্ষা দেয় এমন সব বিষয়ে যা তোমরা জানতে না।"

ইহুদি, খ্রীষ্টান, মুসলিম সকল সম্প্রদায়ের নিকট গ্রহণযোগ্য ইব্রাহীম (আঃ) এর প্রার্থনা উদ্ধৃত করে, মোহাম্মদ (সাঃ) এর আগমনের অবশ্যম্ভাব্যতা কোরআন যৌক্তিকভাবে তুলে ধরেছে। তাই পূর্বের আয়াতের শেষে এভাবে বলা

হয়েছে যে, “যেন আমি তোমাদের ওপর আমার অনুগ্রহ পূর্ণ করে দেই, ফলে তোমরা সঠিক পথে পরিচালিত হতে পার।”

এ সবই মানবজাতির জন্য আল্লাহর অশেষ অনুগ্রহ। অনুগ্রহের মধ্যে সর্বোত্তম অনুগ্রহ হচ্ছে জ্ঞান, যা বার্তাবাহক বা মোহাম্মদ (সাঃ) এর মাধ্যমে মানব সমাজে এসে পৌঁছেছে। যেসব বিষয়ে মানুষের পূর্বে কোন জ্ঞান ছিল না। সে কারণে মোহাম্মদ (সাঃ) এর আগমনও মানবজাতির প্রতি আল্লাহর একটি বড় অনুগ্রহ। বিষয়গুলিকে কোরআনে সেভাবে তুলে ধরা হয়েছে।

অপরাপরদের ভয়ে আল্লাহর নির্দেশ বিচ্যূত হতে বারণ করা হয়েছে। বরং আল্লাহকে ভয় করে তাঁর প্রদর্শিত পথে চলতে বলা হয়েছে। মানুষ যদি আল্লাহর আদেশ-নির্দেশ মেনে চলে তবে তিনি কৃতজ্ঞদের জন্য আরও অধিক অনুগ্রহ দান করবেন। আয়াতে আল্লাহর অনুগ্রহরূপে বার্তাবাহক প্রেরণের উদাহরণ তুলে ধরে সে কথা এখানে ব্যাক্ত করা হয়েছে। বোধসম্পন্ন মানুষদের জন্য যা সত্যিকার অর্থেই সুসংবাদ!

▪ **২.১৫২** অতএব আমাকে স্মরণ কর, আমিও তোমাদের স্মরণ রাখব। আমার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর এবং আমাকে পরিত্যাগ কর না : আল্লাহকে স্মরণ রাখতে বলা হয়েছে। এর গভীর তাৎপর্য রয়েছে। সমগ্র দর্শনে এ একটিমাত্র কেন্দ্রবিন্দু যা স্মরণ রাখলে দর্শনের আদেশ-নিষেধ থেকে শুরু করে সকল বিষয় স্মরণের মধ্যে থাকে। মানুষ পথ থেকে বিচ্যূত হয় না। যে পথ সত্য ও ন্যায়ের পথে চলতে নির্দেশ করে। অনুপ্রেরণা দেয়।

‘আমিও তোমাদের স্মরণ রাখব’ মানুষ বুঝবে কি করে যে আল্লাহ মানুষকে স্মরণ রাখছে? বস্তুত যে স্মরণকারী সে তাঁর স্মরণের মাধ্যমে সেটি অনুভব করতে পারে। সে তার প্রতিটি কাজে-কর্মে আল্লাহর অশেষ অনুগ্রহকে অনুধাবন করে এবং সৎ কাজে অনুপ্রাণীত হয়। ফলে আল্লাহ কাকে স্মরণ রাখছে সেটিও নির্ভর করে কে তাঁকে স্মরণ করছে তার ওপর। অতএব উভয় কারণেই আল্লাহকে মানুষের স্মরণ করতে হবে।

আল্লাহকে স্মরণ খুব গুরুত্বপূর্ণ। এ স্মরণই মানুষকে সঠিক পথে চালায় এবং ধরে রাখে। এটি অলৌকিকভাবে ঘটে না। আল্লাহর পথ এমন যে এ পথে চললে স্মরণকারী যে উপকার প্রাপ্ত হবে সেটিই হবে তার প্রতি আল্লাহর বর্ষিত

অনুগ্রহ। প্রকৃতির নিয়ম ও জগত পরিচালন পদ্ধতিতে এগুলি স্বয়ংক্রিয়ভাবে ঘটে। স্বয়ংক্রিয় কিছুই স্বয়ংক্রিয়ভাবে ঘটতে পারে না যদি না কেউ সেটিকে সেভাবে তৈরী করে দেয়। অতএব সমস্ত প্রাপ্ত আশীর্বাদ ও অনুগ্রহ বস্তুত আল্লাহর দিক থেকে হয়ে থাকে। তিনিই সবকিছু সেভাবে সৃষ্টি করে রেখেছেন। বিষয়গুলিকে সেভাবে বুঝতে হবে।

যিনি মানুষকে এত অনুগ্রহ করেছেন তাঁকে সর্বদা স্মরণ রাখতে বলা হয়েছে এবং তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে বলা হয়েছে। এতে আল্লাহ সন্তুষ্ট হন। তাঁর সন্তুষ্টি অধিক অনুগ্রহ প্রাপ্তির উপায়। গীতায়েও এমন দিক-নির্দেশনা আছে। এটি মানুষের জন্য এক শিক্ষনীয় বিষয়। বাস্তব জীবনে মানুষ নিজেও এমন আচরণ প্রত্যাশা করে। মানুষ নিজেকে বোঝার মধ্য দিয়েই আল্লাহকে বুঝতে সক্ষম হয়ে ওঠে।

আমাকে পরিত্যাগ কর না। আল্লাহর স্মরণ ভূলে যাওয়াই আল্লাহকে পরিত্যাগ করা। আল্লাহকে স্মরণের যে মহাত্ব আছে, তাঁকে পরিত্যাগ করার অর্থ হচ্ছে সেসব থেকে বঞ্চিত হওয়া এবং তার বিপরীত দিকে চালিত হওয়া। অতঃপর ফলাফল প্রাপ্তিও হবে কর্ম অনুযায়ী।

অনুগ্রহ বর্ষনকারীর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রদর্শন করতে হয়। কিন্তু আল্লাহকে মানুষ কিভাবে কৃতজ্ঞতা জানাবে? তাঁকে প্রতিনিয়ত স্মরণ করাই তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞতার প্রকাশ। আল্লাহকে মানুষ প্রতিনিয়ত স্মরণ করতে পারে। এর কোন বাধা-ধরা নিয়ম নেই। কিন্তু কেবলা সম্পর্কিত দিক-নির্দেশনা প্রদান শেষে অল্লাহকে স্মরণ করতে ও তাঁকে পরিত্যাগ না করতে বলার কিছু সুনির্দিষ্ট তাৎপর্য আছে। নিয়মমাফিক আল্লাহকে স্মরণ করার উত্তম উপায় হচ্ছে নিয়মিত তাঁর উপাসনা করা। উপাসনার মাধ্যমেও মানুষ আল্লাহকে স্মরণ করে, তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে। আল্লাহ প্রদর্শিত পথ অর্থাৎ কেবলা মুখী হয়ে নিয়মিত উপাসনার মাধ্যমে তাঁকে স্মরণ করতে বলা হয়েছে এবং উপাসনাকে পরিত্যাগ করতে বারণ করা হয়েছে। আল্লাহর নির্দেশিত পথে অর্থাৎ ভাল পথে চলাই হচ্ছে তাঁকে স্মরণ করার বাস্তব প্রতিফলন। বিষয়গুলিকে সেভাবে বুঝতে হবে।

➢ (আয়াত ১৫৩-১৫৭) এ পর্যায়ে জেহাদ, সংগ্রাম বা যুদ্ধ (Warfare) বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে। এখান থেকে শুরু করে শেষ অবধি বিশ্বাসীদেরকে আল্লাহ সঠিক পথে চলার নানাবিধ দিক-নির্দেশনা দিয়েছেন। এ অংশটুকু তারই অন্তর্ভূক্ত।

১৫৩	হে বিশ্বাসীগন! তোমরা সাহায্য কামনা কর ধৈর্য্য ও প্রার্থনার মাধ্যমে। নিশ্চয়ই! আল্লাহ ধৈর্য্যশীলদের সঙ্গে রয়েছেন। (O ye who believe! Seek help in steadfastness and prayer. Lo! Allah is with the steadfast.)
১৫৪	যারা আল্লাহর পথে (সত্য ও ন্যায়ের পথে) নিহত হয়, তাদেরকে 'মৃত' বল না। তারা জীবিত; তোমরা তা উপলব্ধি করতে পার না। (And call not those who are slain in the way of Allah "dead." Nay, they are living, only ye perceive not.)
১৫৫	অবশ্যই আমি তোমাদেরকে পরীক্ষা করব কিছু ভয়, কিছু ক্ষুধা, সম্পদ ও জীবন এবং ফল ও ফসলের ক্ষতি সাধনের মাধ্যমে; তবে সুসংবাদ দাও দৃঢ় প্রত্যয়ী/ধৈর্য্যশীলদের। (And surely We shall try you with something of fear and hunger, and loss of wealth and lives and crops; but give glad tidings to the steadfast,)
১৫৬	যারা বিপদ এলে বলে: আমরা আল্লাহর এবং তারই দিকে আমরা প্রত্যাবর্তিত হব (ইন্নালিল্লাহে ওয়া ইন্না ইলাইহে রাজেউন)। (Who say, when a misfortune striketh them: Lo! we are Allah's and lo! unto Him we are returning.)
১৫৭	তারাই সে সমস্ত লোক, যাদের প্রতি রয়েছে আল্লাহর অফুরন্ত অনুগ্রহ ও দয়া। তারাই সঠিক পথে পরিচালিত। (Such are they on whom are blessings from their Lord, and mercy. Such are the rightly guided.)

▪ **২.১৫৩** হে বিশ্বাসীগন! তোমরা সাহায্য কামনা কর ধৈর্য্য ও প্রার্থনার মাধ্যমে। নিশ্চয়ই! আল্লাহ ধৈর্য্যশীলদের সঙ্গে রয়েছেন : পৃথিবীর ইতিহাস ও

মানব অভিজ্ঞতা বলে যে, কোন অভিষ্ট লক্ষ্য অর্জনে নানামুখী বাঁধার মুখোমুখী হতে হয়। ধৈর্য্য ব্যাতিত এমতাবস্থায় টিকে থাকা কষ্টকর। সফল হতে হলে ধৈর্য্য ধরতেই হবে। অস্থিরতা নিজেকেই ধ্বংস করে।

জগতে কিছুই অলৌকিকভাবে ঘটে না। সফল হতে হলে উপযুক্ত সময়ে কাজ করতে হয়। যেমন লোহাকে উত্তপ্ত হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করতেই হয়। অতঃপর তাকে মনের মতো করে তৈরী করা সম্ভব হয়। 'উপযুক্ত বা যথার্থ সময়ের জন্য অপেক্ষা' করাই হচ্ছে ধৈর্য্য। যারা ধৈর্য্য ধারণ করে তারা সঠিক সময়ে সঠিক কাজটি করতে পারে। আল্লাহর সহযোগীতা এই 'যথার্থ সময়েই' পরিপূর্ণভাবে লাভ করা সম্ভব হয়। কেননা তিনিই সত্য। তিনিই সবকিছু তেমন শর্তে সৃষ্টি করেছেন। তিনি যথাযথ সময়টি জানেন। সে সময়ে কাজ করলে কাজে সফলতা আসে। তাই বলা হয় যে, আল্লাহ ধৈর্য্যশীলদের সঙ্গে রয়েছেন। কেননা এ গুণের বদৌলতে যথাসময়ে আল্লাহর সহযাগীতা প্রাপ্তি সম্ভব হয় এবং সফলতা আসে।

নেতৃত্বের গুরু দায়িত্ব আল্লাহ মুসলিম সমাজের ওপর অর্পন করেছেন। পূর্বের আয়াতসমুহের বিশ্লেষনে এ বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে। সত্য ও ন্যায়কে প্রতিষ্ঠা করা ও সমুন্নত রাখা, সমাজ থেকে মিথ্যে, ভূল বা কুসংস্কারকে দুরীভূত করা ইত্যাদি নানান ঝুঁকিপূর্ণ কাজে বিশ্বাসীদেরকে সক্রিয়ভাবে অংশ নিতে হবে। এসব কাজ করতে গিয়ে নানামুখী বাঁধাকে অতিক্রম করতে হতে পারে। অবর্ণনীয় কষ্টকে বরণ করতে হতে পারে এবং কখনও হয়তবা ক্ষতিরও মুখোমুখী হতে হবে। যারা আল্লাহর পথে থেকে ধৈর্য্যের সঙ্গে বিষয়গুলিকে মোকাবেলা করতে পারবে আল্লাহ তাদেরকে অগনিত অনুগ্রহ ও পুরস্কারে ভূষিত করবেন।

ধৈর্য্য বিপদে কঠিন অবস্থা মোকাবেলায় নিজেকে সক্ষম করে তোলে, স্থীরতা দান করে, যথাযথ সিদ্ধান্ত গ্রহণকে সম্ভব করে তোলে, সাহসের সঞ্চার করে। কন্টকাকীর্ণ আল্লাহর পথে অগ্রসর হতে হলে ধৈর্য্য ও নৈতিক শক্তি নেতৃত্বের জন্য অবশ্যই প্রয়োজন। এমন গুণাবলী অর্জনে আল্লাহর কাছে প্রার্থনা ভেতরের শক্তিকে জাগরিত হতে সহায়তা করে।

গুরু দায়িত্ব পালনে কিভাবে সফল হতে হবে বিশ্বাসীদেরকে আল্লাহ সে দিক-নির্দেশনা দিয়েছেন এবং অন্তরে আশার সঞ্চার করেছেন যে এমন যথাযথ

গুণসম্পন্ন মানুষদের সাথে তিনি আছেন। বিশ্বাসীদেরকে ধৈর্য্যশীল হতে বলা হয়েছে যা লক্ষ্য অর্জনে সফল হতে হলে সর্বক্ষেত্রেই একটি আবশ্যকীয় গুণ। পাশাপাশি প্রার্থনার মাধ্যমে এ গুণ অর্জনে উদ্বুদ্ধ করা হয়েছে।

উল্লেখ্য যে, ধৈর্য্যের বিপরীত হচ্ছে অধৈর্য্য। অধৈর্য্য মানুষকে অস্থির করে তোলে। অস্থিরতা চিত্তকে অশান্ত করে তোলে। ভেবেচিন্তে চলতে বা সিদ্ধান্ত নেয়ার পথে বাধাস্বরূপ হয়। সিদ্ধান্ত গ্রহণকালে মানুষ হিতাহিত জ্ঞানশূণ্য হয়ে পড়ে। চোখে অন্ধকার বা সরষে ফুল দেখে। বস্তুত এমন মানুষদের দেহ ও চিত্ত সঠিকভাবে কাজ করে না। তারা ভুল করে। ফলে কেবল লক্ষ্যে পৌঁছাতে ব্যার্থ হয় তাই না সবকিছু ওলট-পালট করে ফেলে।

ভীতি কিংবা অতি আকাংখা বা লালসা থেকেও অধৈর্য্য আচরণের সৃষ্টি হয়। ধৈর্য্য হচ্ছে বোধসম্পন্ন ও সাহসী মানুষের প্রতীক। তারা বিপদেও চিত্তকে স্থীর রাখতে জানে। স্থীরচিত্তে সমস্যার কারণ চিহ্নিত করে, সমাধানের পরিকল্পনা করে এবং পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করে।

মানব চরিত্রে ধৈর্য্য ও সাহস আল্লাহর অশেষ দান। সকল গুণ অর্জনে তাই আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করার দিক-নির্দেশনা দেয়া হয়েছে। প্রার্থনা ভেতরের শক্তিকে জাগ্রত করে। কেননা মানুষ যা হতে চায় তাই পায়। লক্ষ্য অর্জনের সফলতার পেছনে উদ্ধৃত এ দু'টি গুণ অতীব প্রয়োজনীয়।

অতএব গুরু দায়িত্ব পালনকালে কি কি গুণ অর্জন করতে হবে এবং কিভাবে তা অর্জন করতে হবে সত্যের এ জ্ঞান ও দিক-নির্দেশনা প্রাপ্তিও আল্লাহর এক অশেষ অনুগ্রহস্বরূপ।

▪ **২.১৫৪** যারা আল্লাহর পথে নিহত হয়, তাদের 'মৃত' বল না। তারা জীবিত; তোমরা তা উপলব্ধি করতে পার না : যারা আল্লাহর পথে অর্থাৎ সত্য ও ন্যায়ের পথে যুদ্ধ বা সংগ্রাম করতে গিয়ে নিহত হয় তাদেরকে 'মৃত' বলতে বারণ করা হয়েছে। মৃত শব্দটি উজ্জীবনের সহায়ক শব্দ নয়। সংগ্রামী ও জীবিতদের জন্য হতাশা সৃষ্টিকারী একটি শব্দ। বরং তাদেরকে জীবিত ভাবতে পারাটি উজ্জীবনের সহায়ক। চরম বিপদকালেও জীবিত ভাবতে পারা সকলকে উজ্জীবিত করে। সংগ্রামীদের অবিচল রাখতেও ভূমিকা রাখে।

এটা সত্যি যে, মৃত্যু পরবর্তী অবস্থা সম্পর্কে মানুষ নিশ্চিতভাবে কিছু জানে না। তবে আত্মাকে ধ্বংসশীল না ভাবাটিই অধিকতর যুক্তিসঙ্গত। মৃত্যুতে দেহের বিনাশ হলেও যে 'আমি' বর্তমান অনুভবে পূর্বে ছিলাম না অথচ ছিলাম এবং পূর্বে ছিলাম বলেই বর্তমানে বাস্তবে আছি। আবার পূর্বাবস্থায় কিংবা অন্য অবস্থায় চলে যাব। তখনও থাকব। অতএব সে 'আমি'র মৃত্যু নেই। অর্থাৎ আত্মার মৃত্যু নেই।

আজকের ভাল কাজ ভবিষ্যতে বা সুদুর ভবিষ্যতে অর্থাৎ মৃত্যু পরবর্তীতে মূল্য সংযোজন করবে; অধিকতর স্বাচ্ছন্দপূর্ণ ও সন্মানজনক জীবনদান করবে এমন ভাবনা ভেবে নেয়াটি স্বাভাবিক, উত্তম বা অধিকতর যৌক্তিক। সে জন্য অবশ্য পরকালে বিশ্বাস রাখতে হবে। এমন কি এ বাস্তব জীবন পরিচালনার ক্ষেত্রেও তেমন ভাবনাই মঙ্গলজনক। এমনই আল্লাহ প্রদত্ত দর্শন।

জগতে মানুষকে দিয়ে কেবল কাজ নয়, ঝুঁকিপূর্ণ কাজ তথা যুদ্ধের মতো কাজও তৃপ্তি ও প্রশান্তির মধ্য দিয়ে করিয়ে নেয়া সম্ভব কেবল একটি যথার্থ দর্শন উপস্থাপনের মাধ্যমে [জেহাদ-সংগ্রাম-যুদ্ধ দ্রষ্টব্য ২.১৯০, ২.২১৬-২১৮, ২.২৪৪.১]। যেমন বলা হয়েছে, "যারা আল্লাহর পথে তথা সত্য ও ন্যায়ের পথে নিহত হয়, তাদেরকে 'মৃত' বল না। তারা জীবিত; তোমরা তা উপলব্ধি করতে পার না।" সত্য ও ন্যায় প্রতিষ্ঠায় আল্লাহর বাণী এমনিভাবে বিশ্বাসীদেরকে উদ্দীপ্ত করে ও উজ্জীবিত করে রাখে। ঝুঁকিপূর্ণ কাজ করতেও ভেতরে আশা ও সাহসের সঞ্চার করে এবং প্রেরণা দান করে। এমন বাণী সফলতার জন্য সহায়ক হয়ে কাজ করে। তাই আল্লাহ বলেন,

"একটি ভাল বাণী হল একটি ভাল বৃক্ষের মতো। তার শিকড় মজবুত এবং শাখা-প্রশাখা অতি উচ্চে পৌঁছে যায়। আল্লাহ বিশ্বাসীদেরকে দৃঢ় বাণী দ্বারা সুনিশ্চিত/সুদৃঢ়/সুপ্রতিষ্ঠিত করেন পার্থিব জীবনে এবং পরকালে।" (আল-কোরআন ১৪:২৪,২৭)

যুদ্ধকালীন পরিস্থিতিতে একই বিষয়ে একই কথা গীতায় যেভাবে উপস্থাপন করা হয়েছে সেটি নিচে তুলে ধরা হল। গীতায় বলা হচ্ছে,

"কখনই এমন কোন সময় ছিল না, যখন আমি বিদ্যমান ছিলাম না, না তুমি, না এই সকল রাজাগণ; না ভবিষ্যতে আমরা কেউ থাকব না।

জীবদেহে আত্মা (Self) যেভাবে শৈশব, যৌবন ও বার্ধ্যক্যের মাধ্যমে দেহের রূপ পরিবর্তন করে, মৃত্যুর পরে ঠিক সেভাবেই আত্মা এক দেহ থেকে অন্য দেহে দেহান্তরীত হয়। একজন আত্ম-উপলব্ধিসম্পন্ন ব্যাক্তি এমন পরিবর্তনে কখনই মূহ্যমান বা বিভ্রান্ত হয় না।

যারা সত্যকে দেখে অর্থাৎ তত্বদ্রষ্টা তারা এ উপসংহারে পৌঁছেছে যে, ক্ষয়িষ্ণু কোন কিছুর কোন স্থায়ীত্ব নেই এবং অব্যায়-অক্ষয়-নিত্য বস্তু আত্মার কোন সমাপ্তি বা ধ্বংস নেই। অতএব সমস্ত দেহে যে অব্যায়-অক্ষয়-নিত্য আত্মা পরিব্যাপ্ত হয়ে আছে তাকে তুমি অবিধ্বংসী বলে জানবে।

অবিধ্বংসী আত্মাকে কেউই কখনও ধ্বংস করতে পারে না। অবিধ্বংসী, অপরিমাপযোগ্য ও শাশ্বত জীবসত্বার বা আত্মার এ জড় দেহই কেবল ধ্বংসশীল; অতএব .. তুমি যুদ্ধ কর (ধর্ম রক্ষার্থে অর্থাৎ সত্য ও ন্যায়কে প্রতিষ্ঠা করতে ও সমুন্নত রাখতে)।

যে জীবাত্মাকে হত্যাকারী বলে মনে করে কিংবা মনে করে যে সে নিহত হয়েছে, প্রকৃতপক্ষে সে বোঝে না বা আত্মার স্বরূপ জানে না।

জ্ঞানসম্পন্ন ব্যাক্তিমাত্রই জানে যে আত্মা কাউকে হত্যা করে না, না সে নিহত হয়। আত্মার কোন জন্ম ও মৃত্যু নেই, না কখনও এমন সময় আসবে যে সে থাকবে না। আত্মা জন্ম রহিত, শাশ্বত, সর্বদা বিদ্যমান অর্থাৎ নিত্য, মৃত্যুহীন এবং আদি। দেহ কর্তিত হলেও সে হয় না।

যে জানে যে আত্মা অবিনাশী, জন্মহীন, শাশ্বত ও অপরিবর্তনীয়; তবে সে কিরূপে কাউকে হত্যা করতে বা করাতে পারে?

মানুষ যেমন জীর্ণ বস্ত্র পরিত্যাগ করে নতুন বস্ত্র পরিধান করে, আত্মাও তেমনি ব্যাবহার অনুপোযোগী জীর্ণ দেহ ত্যাগ করে নতুন দেহ গ্রহণ করে।

আত্মাকে কোন অস্ত্র দ্বারা কর্তন করা যায় না, না এটিকে অগ্নি দ্বারা পুড়িয়ে ফেলা যায়, না পানিতে সিক্ত করা যায়, না বাতাসে শুকানো যায়। আত্মাকে ভাঙ্গা যায় না, দ্রবীভূত করা যায় না, না একে পোড়ানো যায়, না শুকানো যায়।

এটি চিরজীবি, সব কিছুকে বেষ্টন করে রাখে, অপরিবর্তনীয়, নিশ্চল এবং শাশ্বত। যে এই দেহে বসবাস করে অর্থাৎ আত্মা সে শাশ্বত এবং কখনই নিহত হয় না।" (গীতা ২:১২-৩০)

গীতার ওপরের উদ্ধৃতির একটি অংশে যেমন বলা হয়েছে যে, "যে জানে যে আত্মা অবিনাশী, জন্মহীন, শাশ্বত ও অপরিবর্তনীয়; তবে সে কিরূপে কাউকে হত্যা করতে বা করাতে পারে?"

একই কথা কোরআনে এভাবে বলা হয়েছে যে, "(জেনে রেখ) তোমরা (মুসলমানগণ) তাদেরকে (শত্রুদেরকে) হত্যা করনি, বরং আল্লাহই তাদেরকে হত্যা করেছেন।" (আল-কোরআন ৮:১৭)

মৃত্যুভয় সকলেরই আছে বা থাকে। কিন্তু মানুষ মৃত্যুবরণ করে না। দেহ কর্তিত হলেও আত্মা চিরজীবি। যারা সত্য ও ন্যায় অর্থাৎ আল্লাহর পথে জীবন উৎসর্গ করতে যায় এ দর্শন তাদের মনে সাহসের সঞ্চার করে। আশার সঞ্চার করে। যেমন বলা হয়েছে, "যারা আল্লাহর পথে (সত্য ও ন্যায়ের পথে) নিহত হয়, তাদের 'মৃত' বল না। তারা জীবিত; তোমরা তা উপলব্ধি করতে পার না।"

■ **২.১৫৫-২.১৫৭** অবশ্যই আমি তোমাদেরকে পরীক্ষা করব কিছু ভয়, কিছু ক্ষুধা, সম্পদ ও জীবন এবং ফল ও ফসলের ক্ষতি সাধনের মাধ্যমে; তবে সুসংবাদ দাও দৃঢ় প্রত্যয়ী/ধৈর্য্যশীলদের। যারা বিপদ এলে বলে, আমরা আল্লাহর এবং তারই দিকে আমরা প্রত্যাবর্তিত হব (ইন্নালিল্লাহে ওয়া ইন্না ইলাইহে রাজেউন)। তারাই সে সমস্ত লোক যাদের প্রতি রয়েছে আল্লাহর অফুরন্ত অনুগ্রহ ও দয়া। তারাই সঠিক পথে পরিচালিত : আল্লাহ মন্দ কাজের জন্য শাস্তি দেবেন এবং ভাল কাজের জন্য পুরস্কৃত করবেন। ভাল কর্মের ধরণ অনুযায়ী পুরস্কারেও আছে তারতম্য। স্বাভাবতই তিনি মানুষকে পরীক্ষা করবেন কে উত্তম পুরস্কার প্রাপ্তির যোগ্যতা রাখে। বিশ্বাসী পুরস্কার প্রাপ্তির প্রত্যাশায় ছুটে চলে। ফলে উত্তম কাজের প্রতিযোগীতার সৃষ্টি হয়।

পরীক্ষার চরম এক পর্যায়ে গিয়ে ভয়, ক্ষুধা, সম্পদ ও জীবন এবং ফল ও ফসলের ক্ষতির মুখোমুখী হয়েও আল্লাহর জন্য উৎসর্গীকরণের মানসিকতা কারা রাখে তাদের বাছাই করে নেয়া হয়। কেননা সকলে এ পর্যায়ে যেতে পারে না। কিংবা যারা এ পর্যায়ে যেতে চেষ্টা করে তাদের মধ্যেও কেউ কেউ এগিয়ে থাকে। তারাই নৈকট্যপ্রাপ্ত হয়। আল্লাহর নৈকট্যপ্রাপ্তি বিশ্বাসীর কাছে অনেক বড় বিষয়। ফলে বিপদের মুখোমুখী হয়েও যারা পিছু হটে না, আল্লাহর কারণে

তথা সত্য ও ন্যায় প্রতিষ্ঠায় যারা প্রচন্ড ধৈর্য্য নিয়ে লেগে থাকে বা সংগ্রাম করে তাদেরকে সুসংবাদ দেয়া হয়েছে।

একজন বিশ্বাসীর কাছে আল্লাহর নৈকট্যপ্রাপ্তি অত্যান্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। এটি বিশ্বাসীকে এগিয়ে নিয়ে যায়। এটি এক পর্যায়ে সত্যিকার অর্থে আর পুরস্কার প্রাপ্তির লোভের পর্যায়ে থাকে না। এটি আল্লাহর মহব্বতের সাথে একাকার হয়ে যায়। এমন তেজদীপ্ত ভাবের অভাবের কারণে আজকাল মানবতা ভূলুন্ঠিত হতে দেখেও মানুষ নির্বিকার থাকে। অন্যায়কে প্রতিরোধে সমাজে তাই ঈমানী জোরও অবশ্যই জাগিয়ে রাখা প্রয়োজন এবং সত্যের পথে একে অন্যকে সমর্থন ও সহায়তা দিয়ে এগিয়ে আসা প্রয়োজন। তাই একটি যথাযথ দর্শনের ছাঁয়াতলে সকলকে বিশ্বাস রাখতে আহবান করা হয়ে থাকে। বলা হচ্ছে,

"যদি আল্লাহ মানবজাতির একদলকে দিয়ে অপরদলকে প্রতিহত না করতেন, তবে এ পৃথিবী অন্যায়ে ছেঁয়ে যেত। কিন্তু আল্লাহ তাঁর সৃষ্টির প্রতি একান্তই দয়াশীল।" (আল-কোরআন ২:২৫১)

সত্য ও ন্যায় এবং মানবতা যখন ভূলুন্ঠিত হতে দেখা যায়, তখন যারা আল্লাহর পথের সৈনিক বলে নিজেদেরকে দাবী করে তাদের বসে থাকার সময় নয়। সত্য ও ন্যায়ের পথে যুদ্ধে যাওয়াও বলা হচ্ছে আল্লাহর একটি পরীক্ষা। এখানে মৃত্যুভয় আছে। কিন্তু যারা ধৈর্য্যের সাথে তা মোকাবেলা করতে এগিয়ে যায় তাদের জন্য আছে সুসংবাদ।

ধৈর্য্য তারাই রাখতে পারে যারা বিপদে বিশেষত যুদ্ধের ময়দানেও আল্লাহতে বিশ্বাস রাখে এবং বলে যে, "আমরা আল্লাহর এবং তারই দিকে আমরা প্রত্যাবর্তিত হব।" তারা নিশ্চিত বিশ্বাস রাখে এবং জানে যে একদিন তাদের মৃত্যু হবেই এবং মৃত্যু হলেও তারা আল্লাহর কারণে মৃত্যুবরণ করেছে এবং তারা তাঁরই দিকে প্রত্যাবর্তিত হচ্ছে। আল্লাহর এই নৈকট্যপ্রাপ্তির প্রত্যাশা সত্যিকার বিশ্বাসীদের কাছে জীবনের চেয়েও অনেক বেশী প্রাপ্তির। একটি দর্শন মানুষকে সাহসী করে তোলে। ঝুঁকি নিতে উদ্বুদ্ধ করে। আর এর প্রয়োজনীয়তাও আছে। নইলে জগতে ভাল কিছুকে প্রতিষ্ঠা করা ও টিকিয়ে রাখা সম্ভব হত না। বলা হচ্ছে,

"কিভাবে তোমরা আল্লাহর পথে (সত্য, ন্যায় ও কল্যাণের পথে) যুদ্ধ না করে থাকতে পারবে, যখন দুর্বল পুরুষ-নারী ও শিশুরা ক্রন্দন করছে এই বলে, হে আমাদের পালনকর্তা! আমাদেরকে এই জনপদ থেকে নিষ্কৃতি দান কর, যেখানের অধিবাসীরা অত্যাচারী। ওহ! তোমার পক্ষ থেকে আমাদের জন্য কোন সাহায্যকারী প্রেরণ কর। তোমার পক্ষ থেকে আমাদের জন্য কোন রক্ষাকারীকে প্রেরণ কর!" (আল-কোরআন ৪:৭৫)

এ দর্শন কেবল অন্ধ বিশ্বাসজনিত বিষয়ই নয়। এটি একটি প্রয়োজনীয়তাও। অত্যাচারিত আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করে। কোন রক্ষাকর্তাকে কামনা করে। যৌক্তিক সত্য হচ্ছে যে নিশ্চিতভাবেই আমরা মৃত্যুবরণ করব। হতে পারে রোড এ্যাক্সিডেন্টে কিংবা কোন ভাইরাসের আক্রমনে। অন্যায় প্রতিরোধ এবং সত্য ও ন্যায়কে প্রতিষ্ঠা ও সমুন্নত রাখতে গিয়ে মৃত্যুবরণ করা কি তার চেয়ে সঠিক এবং অধিকতর মর্যাদাপূর্ণ ও যুক্তিযুক্ত নয়? যারা এ জ্ঞানে জ্ঞানান্বিত বস্তুত তারাই সঠিক জ্ঞানে আছে। স্বাভাবতই তারা সঠিক পথে পরিচালিত। তারা জীবন ও জগতের কল্যাণার্থে তথা আল্লাহর পথে সংগ্রম করে।

এ জ্ঞানটিও আল্লাহর অফুরন্ত অনুগ্রহের অন্যতম একটি। এমন জ্ঞান প্রাপ্তরা আল্লাহর কারণে জাগতিক সকল কিছু প্রাপ্তির মায়াকে পরিত্যাগ করতে পারে। তারা জানে যে জগতে যা কিছু প্রাপ্তি সবই আল্লাহর কারণে; এমনকি জীবনটিও। অতএব তাঁর পথে থাকলে এবং তিনি চাইলে এর চেয়েও অধিক দিতে পারেন। তবে এ ধরণের মানুষেরা বস্তুত কেবল আল্লাহকেই পেতে চায়। তারা বস্তুগত কোন প্রাপ্তির প্রত্যাশাও করে না। গীতায় বলা হয়েছে,

"আর যদি তুমি ভাব যে, আত্মা সবসময় জন্ম নেয় এবং মৃত্যুবরণ করে, তথাপি তোমার দুঃখ করার কোন কারণ নেই, ..। যে জন্ম নিয়েছে মৃত্যু তার জন্য সুনিশ্চিত এবং যে মৃত জন্ম তার নিশ্চিত। অতএব কর্তব্য পালনকালে তোমার শোকাবহ হওয়া উচিত নয়।" (গীতা ২:২৬-২৭)

বলা হচ্ছে, এমন জ্ঞানসম্পন্ন মানুষেরাই সে সমস্ত লোক, যাদের প্রতি রয়েছে আল্লাহর অফুরন্ত অনুগ্রহ ও দয়া। তারাই সঠিক পথে পরিচালিত।

➢ (আয়াত ১৫৮) হজ্বের (Pilgrimage or Haj) পালনীয় একটি নিয়ম হচ্ছে সাফা ও মারওয়া প্রদক্ষিন করা। সে প্রসঙ্গে বলা হয়েছে।

১৫৮	নিঃসন্দেহে সাফা ও মারওয়া আল্লাহর নিদর্শনসমুহের অন্যতম। সুতরাং যারা কা'বা ঘরে হজ্ব বা ওমরাহ পালন করে তাদের জন্য এ দুটিতে প্রদক্ষিন (সা'ঈ) করায় কোন দোষ নেই। কেউ যদি স্বেচ্ছায় কিছু ভাল কাজ করে, তবে আল্লাহ অবশ্যই তা অবগত এবং তার কাজের প্রতিদানদাতা। (Lo! (the mountains) As-Safa and Al-Marwah are among the indications of Allah. It is therefore no sin for him who is on pilgrimage to the House (of Allah) or visiteth it, to go around them (as the pagan custom is). And he who doeth good of his own accord, (for him) lo! Allah is Responsive, Aware.)

▪ ২.১৫৮ নিঃসন্দেহে সাফা ও মারওয়া ... প্রদক্ষিন করায় কোন দোষ নেই। কেউ যদি স্বেচ্ছায় কিছু ভাল কাজ করে, তবে আল্লাহ .. তার কাজের প্রতিদানদাতা : হযরত ইব্রাহীম (আঃ) তাঁর শিশুপুত্র ইসমাঈল ও তার মাতাকে মরুর বুকে রেখে চলে যান। তাদের যৎসামান্য খাবার ও পানীয় শেষ হয়ে গেলে মাতা হাজেরা শিশুর জন্য পানির সন্ধানে সাফা ও মারওয়া দুই পর্বত অভিমুখে ছুটোছুটি করেন। কথিত আছে তিনি সাতবার এমনিভাবে গমনাগমন করেন। হজ্ব পালনকালে সাফা ও মারওয়া প্রদক্ষিনের মাধ্যমে সে ঘটনাটিকে স্মরণ করা হয়। এটিকে সা'ঈ বলা হয়।

পর্বত দু'টিতে একসময় মূর্তী প্রদক্ষিনের বা তাওয়াফ করার এক ধরণের রীতি চালু হয়েছিল। ইসলামের আবির্ভাবের পরে তাই সাফা-মারওয়া প্রদক্ষিণ হজ্বের অন্তর্ভূক্ত বিষয় থাকবে কিনা এ নিয়ে আলোচনা ও বিতর্কের শুরু হয়। এ আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার ফলে সে বিতর্কের অবসান ঘটে।

'হজ্ব' হচ্ছে জিলহজ্ব মাসের সুনির্দিষ্ট দিনগুলিতে কা'বায় তীর্থযাত্রীদের সমাবেশ। অপরদিকে হজ্বের সময় ব্যাতিত অন্য সময়ে স্বেচ্ছায় কা'বা পরিদর্শন হচ্ছে 'ওমরাহ'।

কা'বা মুসলিমদের কেবলারূপে তখন সদ্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। কেবলার সাথে সম্পর্কিত বিষয় বিধায় এ আলোচনা এখানে অন্তর্ভূক্ত হয়েছে। হজ্বের এ রীতি অর্থাৎ সাফা ও মারওয়া প্রদক্ষিন ইব্রাহীম (আঃ) এর সময় থেকে চলে আসছে। যারা ধারণা করেছিল যে এটি পৌত্তলিকদের কর্মকান্ডের একটি অংশ এ বাণী অবতীর্ণ হওয়ায় সে বিতর্কের অবসান হয়।

বলা হচ্ছে, কেউ যদি স্বেচ্ছায় কিছু ভাল কাজ করে তবে আল্লাহ অবশ্যই তা অবগত এবং তার উত্তম কাজের প্রতিদানদাতা। এর মাধ্যমে মানুষকে যে কোন প্রকার ভাল কাজ করার ক্ষেত্রে যেমন উৎসাহ দেয়া হয়েছে তেমনি অনুমোদনও দেয়া হয়েছে। এটি মানুষের জন্য একটি দিক নির্দেশনা যে, মানুষ ভাল অন্তর নিয়ে স্বেচ্ছায় কোন ভাল কাজ যা অন্যের ক্ষতি করে না এবং সমস্যারও কারণ হয় না তেমন কাজ করতেই পারে।

সাফা ও মারওয়া প্রদক্ষিনের মাধ্যমে সে ঘটনাটিকে স্মরণ করা উত্তম কাজের অন্তর্ভূক্ত। কেউ অন্তরের ভালবাসা থেকে কোন উত্তম কর্ম করতেই পারে। এ বাণী অবতীর্ণ হওয়ায় এ বিতর্কের অবসান হয়।

➢ (আয়াত ১৫৯-১৬০) আল্লাহর অবতীর্ণ বার্তা (Revelation, Scripture or Guidance) গোপন করার মাধ্যমে যারা নিজেদের স্বার্থ সিদ্ধি করার চেষ্টা করে তাদের প্রসঙ্গে বলা হয়েছে।

১৫৯	পথ-নির্দেশনা যা আমি অবতীর্ণ করেছি, গ্রন্থে তার বিস্তারীত বর্ণনা করার পরও যারা তথ্য প্রমাণ গোপন করে, তাদের প্রতি আল্লাহর অভিশাপ এবং অভিশাপ তাদের যারা অভিসম্পাত করার অধিকার/ক্ষমতা রাখে। (Lo! Those who hide the proofs and the guidance which We revealed, after We had made it clear in the Scripture: such are accursed of Allah and accursed of those who have the power to curse.)
১৬০	তবে তারা ব্যাতিত যারা ক্ষমা প্রার্থনা করে, নিজেদের সংশোধন করে অতঃপর সত্যকে প্রকাশ করে। এরাই তারা যাদের প্রতি আমি ক্ষমা প্রদর্শন করি। আমি ক্ষমাকারী, পরম দয়ালু। (Except such of

	them –as repent and amend and make manifest (the truth). These it is toward whom I relent. I am the Relenting, the Merciful.)

▪ **২.১৫৯** পথ-নির্দেশনা ... যারা তথ্য প্রমাণ গোপন করে ... অভিশাপ তাদের যারা অভিসম্পাত করার অধিকার/ক্ষমতা রাখে : প্রকৃতির সূত্রটি হচ্ছে যে, যে কোন মন্দ কাজই নিন্দনীয় এবং সেটি একটি খারাপ ফলাফল বহন করে। মন্দ কাজের খারাপ ফলাফলকেই শাস্তিরূপে গন্য করা হয়। শাস্তির মাত্রার কম-বেশী বা তারতম্য আছে।

আল্লাহ পথ-নির্দেশনা প্রেরণ করেছেন মানুষের কল্যাণের জন্য। গুণী সমাজ এগুলিকে ধারণ করে এবং প্রচার ও প্রসার ঘটায়। যা সত্য ও ন্যায়ের কথা বলে। সমাজে শান্তি প্রতিষ্ঠা করে।

আল্লাহ তাঁর পথ-নির্দেশনাকে সকলের জন্য উন্মুক্ত করে দিয়েছেন। যেন সকলেই সেটি জানতে পারে। কিন্তু সমাজের কিছু লোক যখন আল্লাহ প্রদত্ত পথ-নির্দেশনাকে গোপন করে, কিংবা নিজেদের স্বার্থ চরিতার্থে সুবিধা মতো বিচার-বিশ্লেষণ করে ও কাজে লাগায় তখন সেটি মন্দ কাজ। এর ফলাফলও মন্দ হতে বাধ্য।

ইসরাইলের সন্তানেরা আল্লাহর বাণী মানব সমাজে তুলে ধরার জন্য দায়িত্ব প্রাপ্ত ছিল। আর এ কাজের গুরু দায়িত্ব সব সমাজেই প্রথম বর্তায় শিক্ষিত ও জ্ঞানী-গুণী সমাজের ওপর। ইহুদি জ্ঞানী-গুণীজনদের অত্যন্ত মন্দ ও গর্হিত কাজ ছিল যে তারা আল্লাহ প্রদত্ত পথ-নির্দেশনা নিজেরা কুক্ষিগত করে রেখেছিল। তারা আল্লাহর বার্তা গোপন করত। অইহুদি কিংবা সাধারণ ইহুদিদের মধ্যে তা যথাযথভাবে প্রচার হতে দিত না।

তাদের এমন গর্হিত কাজের ফলে সাধারণ ইহুদিরা ধর্মের বিষয়ে সঠিক জ্ঞান লাভ করতে পারত না। অজ্ঞতার কারণে নানা প্রকার অধার্মিক কাজকেও তারা যথাযথ ধর্মের কাজ বলে বিবেচনা করত। শিক্ষিতজনেরা ধর্ম বিচ্যুত এমন মন্দ কাজের সংস্কারের চেষ্টা করত না। সঠিক শিক্ষাও দিত না। উপরন্তু প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে ধর্ম বিচ্যুত এসব কাজকে স্বীকৃতি দান করত।

এভাবে সমাজে নিজেদের জনপ্রিয়তা অর্জন ও ধরে রাখার চেষ্টা করত। মানুষের অজ্ঞতার সুযোগে কিছু সুবিধাও লুটে নেয়ার চেষ্টা করত।

আল্লাহর প্রতিষ্ঠিত নিয়মের ব্যাত্যয়ের ফলাফল যেমন শিক্ষিতজনদের ভোগ করতে হয়, তেমনি ভোগ করতে হয় সমাজের সাধারণ মানুষকেও অর্থাৎ বৃহত্তর জনগোষ্ঠীকেও। তবে মন্দ কাজের ফলাফল পেতে কখনও একটু সময় নেয় বিধায় মানুষ অনেক সময় বিষয়গুলি বুঝে উঠতে পারে না। এ ধরণের মন্দ কাজের ফলাফল এত খারাপ হয় যে, প্রতিষ্ঠিত নিয়মও কখনও ভেঙ্গে পড়ে চিরকালের জন্য। ফলশ্রুতিতে নতুন নিয়মের আবির্ভাব ঘটে। উল্লেখ্য যে, জেনে-বুঝে আল্লাহর বার্তার ভূল ব্যাখ্যা করাও যথাযথ বার্তা গোপন করার সামিল।

স্বার্থান্বেষীরা তাদের তাৎক্ষণিক লাভের বিষয়গুলিকিই বড় বলে গন্য করে। একটি নিয়মের বিনাশ এমনকি প্রজন্মের ক্ষতির বিষয়গুলিকেও ভাবনায় নেয় না। তারা এগুলি করে লোভ বা স্বার্থের কারণে করে। প্রকৃতপক্ষে তারা এগুলি করে 'প্রকৃত জ্ঞান' এর অভাবে। বলা হচ্ছে যে, এমন মানুষদের প্রতি রয়েছে আল্লাহর অভিশাপ।

অভিশাপের অর্থ হচ্ছে কর্মের একটি মন্দ ফলাফল প্রাপ্তি। আল্লাহর অভিশাপ সৃষ্টির সূত্রজনিত। মন্দ কাজ করলে তার ফলাফল মন্দভাবে ঘাড়ে এসে পড়বে। শুধু বুঝতে হবে যে, কৃতকর্মটি মন্দ কিনা। তাহলে ফলাফল নিশ্চিত। যদিও মাত্রায় তারতম্য আছে। আবার আছে ক্ষমার শর্ত সাপেক্ষে ক্ষমার সুযোগ!

'অভিশাপ তাদের যারা অভিসম্পাত করার অধিকার/ক্ষমতা রাখে'। শাস্তি প্রাপ্তির একটি দিক হচ্ছে প্রকৃতির নিয়মের বিচার। যে প্রকৃতিকে বিধাতা তেমন বিধান দ্বারা প্রতিষ্ঠা করেছেন। ফলে সেটি আল্লাহ প্রদত্ত শাস্তি। যেটিকে বলা যায় আল্লাহ প্রদত্ত অভিশাপের ফল। তিনি সেভাবে সূত্র প্রতিষ্ঠা করে রেখেছেন।

আরেকটি বিচার হবে পরকালে যা কিনা সরাসরি আল্লাহ প্রদত্ত। বিশ্বাসীরা তেমনটি বিশ্বাস করে। অবিশ্বাসীরা বিশ্বাস করে না।

অপর আরেকটি বিচার ব্যাবস্থা হচ্ছে ইহ-জাগতিক। যে ভাল কাজটি সকলের জানা প্রয়োজন যারা তেমন বিষয় গোপন করে এবং যার মন্দ

ফলাফল বৃহত্তর জনগোষ্ঠীকে ভোগ করতে হয় বা হবে– ইহজগতেও তাদের একটি বিচার হওয়া বাঞ্ছনীয়।

এখানে তেমন অনুমোদন দেয়া হয়েছে। তাই যারা সে বিচার করার জাগতিক অধিকার ও ক্ষমতা রাখে এখানে তেমন মানুষদের প্রতি তাদেরও অভিসম্পাতের কথা বলা হয়েছে। অর্থাৎ দোষী সাব্যস্ত হলে বিবেচনা সাপেক্ষে তেমন মানুষদের জাগতিক বিচারেও শাস্তি দেয়া যেতে পারে। তবে যারা বিচার করবে সততার পরীক্ষায় তাদেরকে উত্তীর্ণ হতে হবে। বিচারকে সৎ ও নিরপেক্ষ হতে হবে এবং বিষয়গুলিকে যথাযথ জ্ঞানে বিচার-বিশ্লেষণ করতে হবে।

ইহুদিদের কাজের সমালোচনা করার পাশাপাশি এ আয়াতে সকলকেই এ বিষয়ে সতর্ক করা হয়েছে যে, কেউই যেন ইহুদিদের মতো একই কাজ না করে। অর্থাৎ তথ্য-প্রমাণ ও সত্য গোপন না করে, আল্লাহ প্রদত্ত সঠিক বার্তা মানুষের মাঝে যথাযথভাবে পৌঁছে দেয়। অন্যথায় সকলেরই পরিণাম এক।

মন্দ কাজ যে করবে সে তার ফলাফল ভোগ করবে। ইহুদিরা কেবল একটি উদাহরণ। কিন্তু শিক্ষাটি সকল মানুষের জন্য। মুসলিমদেরকেও এমন ভূল কাজ করা থেকে বিরত থাকতে হবে। তাই তো কোরআনের বাণী শাশ্বত ও সার্বজনীন।

▪ **২.১৬০** তবে তারা ব্যাতিত যারা ক্ষমা প্রার্থনা করে, নিজেদের সংশোধন করে অতঃপর সত্যকে প্রকাশ করে। এরাই তারা যাদের প্রতি আমি ক্ষমা প্রদর্শন করি। আমি ক্ষমাকারী, পরম দয়ালু : ক্ষমার বিষয়টি খুবই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। এটি ভূল পথগামীদেরকে আশার আলো দেখায়। হতাশায় নিমজ্জিত হওয়ার হাত থেকে রক্ষা করে। তাদেরকে ভূলের আবর্তে আবর্তিত হওয়ার হাত থেকে উদ্ধার করে বা বের হওয়ার পথ করে দেয়।

তবে আল্লাহ কাদেরকে ক্ষমা করেন সে বিষয়টিও গুরুত্বপূর্ণ। যারা ক্ষমা প্রার্থনা করে, নিজেদের সংশোধন করে অতঃপর সঠিক কাজ করে এরাই তারা যাদের প্রতি আল্লাহ ক্ষমা প্রদর্শন করেন। অল্প কথায় ক্ষমার বিষয়ে এখানে একটি পূর্ণাঙ্গ ধারণা দেয়া হয়েছে।

বস্তুত আল্লাহ পরম দয়ালু এবং তিনিই ক্ষমা প্রদানকারী। তাই ভূল করার পরেও যারা ক্ষমা প্রার্থনা করে, নিজেদের সংশোধন করে অতঃপর সত্যকে প্রকাশ করে অর্থাৎ যে সত্য বার্তা গোপন করার মধ্য দিয়ে অন্যায় কাজটি করা হয়েছিল তা যথাযথভাবে প্রকাশ করে, তাদের প্রতি তিনি ক্ষমা প্রদর্শন করেন। সে আশার বাণীও এখানে সংযোজন করা হয়েছে যেন যারা ভূল করেছে তারা সঠিক পথে ফিরে আসতে পারে এবং নিরাশা বা কোন হতাশা তাদেরকে গ্রাস না করে।

কোরআন সর্বদা এবং সর্বত্রই মানুষকে ভূল করা সত্ত্বেও হতাশায় নিমজ্জিত হওয়ার হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার উপায় প্রদর্শন করেছে এবং আশার আলো দেখিয়েছে। মানুষের জন্য এগুলিও শিক্ষা ও আল্লাহ প্রদত্ত শাশ্বত ও সার্বজনীন দিক-নির্দেশনা। বস্তুত শাস্তি দেয়া আল্লাহর মূল উদ্দেশ্য নয়। মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে, বিপথগামী মানুষকে পথে ফিরিয়ে আনা। বলা হচ্ছে,

"তোমাদের শাস্তি প্রদান করে আল্লাহর কি আসে যায়, যদি তোমরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর এবং বিশ্বাস স্থাপন কর?" (আল-কোরআন ৪:১৪৭)

কৃতজ্ঞতা প্রকাশের শিক্ষা এবং একটি যথাযথ দর্শনে বিশ্বাস রাখাই হচ্ছে সঠিক পথে থাকা। কিন্তু দর্শনটি সঠিক কিনা সেটি বুঝতে হলেও যথাযথ জ্ঞানে দর্শনের বিষয়গুলিকে বিচার-বিশ্লেষন করতে জানতে হবে। অর্থাৎ কথাগুলি শুনতে যত সহজ ও ছোট মনে হয় কাজটি কিন্তু বড়!

➢ (আয়াত ১৬১-১৬২) এ পর্যায়ে অবিশ্বাসীদের (Disbeliever) সম্পর্কে বলা হয়েছে।

১৬১	যারা অবিশ্বাস করে এবং অবিশ্বাসীরূপে মৃত্যুবরণ করে, তাদের প্রতি আল্লাহ এবং ফেরেশতাগন ও মানব সম্প্রদায়ের সম্মিলিত অভিসম্পাত। (Lo! Those who disbelieve, and die while they are disbelievers; on them is the curse of Allah and of angels and of men combined.)
১৬২	তারা চিরকাল অভিসম্পাতের মাঝেই থাকবে। তাদের শাস্তি হ্রাস করা হবে না এবং তারা ক্ষমাও পাবে না। (They ever dwell therein.

	The doom will not be lightened for them, neither will they be reprieved.)

▪ **২.১৬১-২.১৬২** যারা অবিশ্বাস করে এবং অবিশ্বাসীরূপে মৃত্যুবরণ করে ... তাদের শাস্তি হ্রাস করা হবে না এবং তারা ক্ষমাও পাবে না : বলা হচ্ছে, যারা অবিশ্বাস করে ...। প্রশ্ন হচ্ছে, কারা অবিশ্বাস করে এবং কি অবিশ্বাস করে [বিশ্বাসী-অবিশ্বাসী দ্রষ্টব্য ২.৬]?

প্রথমত: যারা আল্লাহ ও পরকালকে বিশ্বাস করে না তারা অবিশ্বাসী। একজন মুসলিম আল্লাহকে বিশ্বাস করে। একজন ইহুদি বা খ্রীষ্টান কি আল্লাহকে বিশ্বাস করে না? একজন হিন্দু, শিখ বা জৈন কি আল্লাহকে বিশ্বাস করে না? আল্লাহকে সবাই বিশ্বাস করে।

বিভিন্নজন বিভিন্নভাবে বিশ্বাস করে এবং তাঁকে বিভিন্ন নামে ডাকে। জন তো সে একই জন! তাঁকে লক্ষ্য করেই বিভিন্ন রীতি-নীতি, বিধি-বিধান অনুসরণ করে। সকলেই বিশ্বাসী।

তবে সকলে কোরআন প্রদত্ত ছকে বিশ্বাসী নয়। একই ছকে সকলকে বিশ্বাসী হতে হবে বিষয়গুলি তেমন নয়। তাহলে এভাবে বলা হত না যে, "যেদিন তোমার পালনকর্তার পক্ষ থেকে কোন নিদর্শন আসবে, সেদিন তেমন কোন ব্যাক্তির বিশ্বাস স্থাপন তার জন্য ফলপ্রসূ হবে না, যে পূর্ব থেকে বিশ্বাস স্থাপন করেনি কিংবা 'স্বীয় বিশ্বাস' অনুযায়ী কোনরূপ ভাল কাজ করেনি।" (আল-কোরআন ৬:১৫৮)

যে যেভাবেই বিশ্বাস করুক না কেন, 'স্বীয় বিশ্বাস' অনুযায়ী হলেও সকলকেই 'ভাল কাজ' করতে হবে। অর্থাৎ ভাল কাজটিই গুরুত্বপূর্ণ। সে লক্ষ্যকে সামনে রেখেই বিশ্বাসী হতে হয়। অন্যথায় বিশ্বাসী হওয়া না-হওয়া কোন গুরুত্ব বহন করে না।

দ্বিতীয়ত: বলা যায় যে, যে বা যারা আল্লাহর নির্দেশনা মেনে চলে না তারা অবিশ্বাসী। যারা তাঁর নির্দেশনা মেনে চলে তারা বিশ্বাসী। তাহলে গুরুত্বের সাথে বুঝতে হবে যে 'আল্লাহর নির্দেশনা'টি কি?

এই একটি বিষয় যথাযথ অনুধাবনের মধ্যে আনতে পারলে মনোজগতে বিশ্বাস-অবিশ্বাস, বিশ্বাসী-অবিশ্বাসী এ জাতীয় বিষয়গুলি নিয়ে মানসিকতার

চিত্র পাল্টে যাবে। এটি অত্যান্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয়। এর বিস্তারীত আলোচনা হওয়া প্রয়োজন।

মানব সম্প্রদায়ের সার্বিক কল্যাণের বিষয়কে বিবেচনায় রেখে ও অন্তরে উদার মানসিকতার বিকাশ ঘটিয়ে 'সত্যিকারের অবিশ্বাসী' কে এ বিষয়ে দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন আনা অতীব জরুরী। কেবলমাত্র এই একটি শব্দ অর্থাৎ 'কাফের' বা 'অবিশ্বাসী'র যথাযথ সঙ্গা নির্ধারণ করতে পারা, কিংবা এর মর্ম অর্থ সঠিকভাবে অনুধাবন করতে পারার বিষয়টি সমগ্র বিশ্বের মানবিক সম্পর্কের চিত্র পাল্টে দিতে পারে।

এটি অত্যান্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয়। কিন্তু তার পূর্বে আল্লাহর কাছে সকল মানুষের মুক্তি কামনা করার মানসিকতা গড়ে ওঠাতে হবে সকলের মধ্যে। অর্থাৎ উদার মানসিকতা গড়ে তুলতে হবে। কেবলমাত্র নিজের, সাম্প্রদায়ের বা গোষ্ঠীর কিংবা দলের স্বর্গে গমন ও শান্তি লাভের ইচ্ছে পোষন করলে হবে না। কিংবা নিজেরা ক্ষমতা লাভের বাসনা অন্তরে পোষন করে রাখলেও চলবে না। নিচু মানসিকতা পরিহার করতে হবে। সকলের মঙ্গল প্রত্যাশা করার মনোবৃত্তি থাকতে হবে। সকলের যৌক্তিক স্বাধীনতায় বিশ্বাস করতে হবে।

আল্লাহর প্রতি দৃঢ় ঈমান থাকতে হবে। আল্লাহ অসীম ক্ষমতার অধিকারী। আল্লাহ সব করতে পারেন। মুখে বললে হবে না। সেটি অন্তরেও বিশ্বাস ও অনুভব করতে হবে। কথাটি কেন বলা হল?

কথাটি এ কারণে বলা হল যে, আল্লাহ চাইলে সকলকেই মুক্তি দিয়ে দিতে পারেন। তিনি চাইলে সকলকে স্বর্গবাসী করে দিতে পারেন। তিনি চাইলে প্রত্যেককে এক একটি স্বর্গ উপহার দিতে পারেন। তাঁর সক্ষমতা অফুরন্ত ও সীমাহীন। তিনি চাইলে কোন কিছুই কারও ভাগ থেকে ছুটে যাবে না। তাহলে অপরের মঙ্গল কামনায় নিজের হারাবার কি আছে? আবার তিনি না চাইলে কোন কিছুই কারও পক্ষে পাওয়াও সম্ভব না। কেবল উদার মানসিকতাই নয়, জ্ঞানও সত্যিকারের বিশ্বাসীকে এ সত্যটি বুঝতে সহায়তা করে।

যেখানে নিজের হারাবার কিছু নেই, সেখানেও অপরের জন্য সুখ কামনায় যার কার্পন্য আছে সে তো সঠিক মানুষ হয়ে গড়ে ওঠেনি। তার ভেতরে কার্পন্য আছে। স্বার্থপরতা আছে। নীচতা আছে। অন্যের প্রাপ্ত সুখ তাকে ঈর্ষান্বিত করে। সে কেমন ধরনের মানুষ যে নিজের জন্য স্বর্গ কামনা করে,

অথচ অন্যের জন্য নরক কামনা করতে পারে? সে কি জানে না যে, সকলেই কোন না কোনভাবে তার ভাই বা বোন? সকলেই এক আল্লাহর সৃষ্টি? মানুষকে আপন ভাবতে শিখতে হবে। অপর ভাই-বোনের জন্যও সমাজে মঙ্গল কামনা করার অভ্যাস গড়ে তুলতে হবে। সকল প্রাণ আল্লাহর সৃষ্টি। আল্লাহর সকল সৃষ্টিকে ভালবাসতে হবে।

কথাগুলি বলতে হল এ কারণে যে, প্রকৃতপক্ষে আমরা কাদেরকে অবিশ্বাসী বলে প্রমাণ করতে চাই এবং কেন? অবিশ্বাসী নরকে গেলে তাতে আমার কি লাভ। আমি তো আমার প্রাপ্যটুকুই পাব। অন্যকে অবিশ্বাসীর তকমা দিয়ে আমার কি অর্জন হবে? এ ধরণের প্রচারণা আমাদেরকে তথা সমাজকে কি উপহার দেবে?

পাঠক, ওপরের আলোচনার ধরণের মাধ্যমে কি কোরআন প্রদত্ত বার্তা বা উল্লেখিত আয়াতসমুহের মর্মার্থকে অস্বীকার করা হচ্ছে?

নিশ্চয়ই না। কোরআনের বার্তাকে অস্বীকার নয় বরং যথাযথ জ্ঞানে বিষয়গুলিকে উপস্থাপন করা হচ্ছে। যা বিশ্ব শান্তি, ভাতৃত্ববোধ ও মানবতাকে সমুন্নত করতে পারে এবং প্রচলিত ধর্ম নির্বিশেষে সকল মানুষকে এ আলোচনার অন্তর্ভূক্ত করতে পারে। যেন কোরআন কেবল তথাকথিত মুসলিমদের জন্যই নয়, জগতের সকল মানুষের জন্য সঠিক দিক-নির্দেশনা হিসেবে প্রযোজ্য হতে পারে।

অবিশ্বাসী দোজখের আগুনে পুড়বে। তাতে আমার কি লাভ? সকলকে মুক্তির পথ দেখাতে হবে। মানুষ হিসেবে আল্লাহ প্রদত্ত সঠিক বার্তা মানুষের কাছে তথা অপর ভাইয়ের কাছে পৌঁছে দিতে হবে। আল্লাহর বার্তা সকল মানুষের জন্য। পৌঁছে দিতে না পারলে বা বোঝাতে ব্যার্থ হওয়ার দায়ও নিতে হবে দায়িত্বশীলদের (দ্রষ্টব্য ২.১৪৩.২)।

এটাই নেতৃত্বের দায়। সে কারণেই নেতৃত্বকে এত গুরুভারপূর্ণ দায়িত্বরূপে দেখা হয়। নয়ত নেতৃত্বের এত অধিক গুরুত্ব ও মর্যাদা কিসে?

আল্লাহর হিসেব সূক্ষ্ম। তিনি কাউকেই ছাড় দেবেন না। আবার প্রাপ্য পুরস্কারও পুরোপুরি দেবেন। তবে তিনি মানুষকে পরীক্ষা করেন।

এতগুলি কথা কেন বলতে হল? কারণ আমরা নিজেদের সুবিধামতো বিশ্বাসীর সঙ্গা নির্ধারণ করি। তারপর প্রকাশ্যে সে সঙ্গার মধ্যে অবস্থান করে

অপ্রকাশ্যে অবিশ্বাসীর মতো কাজ করেও স্বর্গের অধিকারীরূপে নিজেদের প্রদর্শন করার চেষ্টা করি। সমাজে তেমন ঘটছে। দেখে-শুনেও মানুষ চুপ করে আছে। কখনও ভয়েও চুপ থাকতে হয়। অর্থাৎ ধর্মের ক্ষেত্রেও জবরদস্তী আছে। যেটি কোরআনে নিষেধ করা হয়েছে।

বিভিন্ন প্রকারের ছোট ছোট সঙ্গা দিয়ে বস্তুত আমরা নিজেরাই আল্লাহ প্রদত্ত মুক্ত মানবজীবনকে বন্দি করে ফেলছি। বিভিন্ন পদবী, মর্যাদা কিংবা ভাল-মন্দের শ্রেনী বিভাজন করছি। এভাবে মানুষকে আল্লাহ সৃষ্টি করেননি। নানা প্রকারের দখলদারিত্ব কায়েমের জন্য মানুষ নিজেরাই এসবের স্রষ্টা। সেটিও মেনে নেয়া যেত যদি এসবের মধ্যে সূক্ষ কারচুপি না থাকত। সত্যিকারের ভালই ভাল হিসেবে প্রতিয়মান হত। কিন্তু এখানে ভালকে মন্দ ও মন্দকে ভাল রূপেও প্রমান করা হয়। কোরআনের শিক্ষা কোন প্রকার মন্দ ছল-চাতুরীর আশ্রয়কে প্রশ্রয় দেয় না। সে কারণেই কোরআনের মর্যাদা এত এত উর্ধ্বে!!

মুক্ত মন নিয়ে কোরআনের অন্তর্নিহিত মর্মবাণী অনুধাবন করতে পারলে এত প্রকার বাধা-নিষেধের জালে মানুষকে বন্দি হতে হয় না। কিন্তু যারা ব্যাখ্যা-বিশ্লেষন করে তাদের নানান জনের নানান ব্যাখ্যা সহজ-সরল পথে জটিলতা প্রবেশ করায়। অতঃপর ব্যাখ্যা থেকে সৃষ্ট নানান জটিল নিয়ম-কানুন একসময় এমন কর্মযজ্ঞ হয়ে ওঠে যে, সতীদাহ প্রথার মতো সমাজ থেকে তা দুর করাও কঠিন হয়ে যায়। শত শত কিংবা হাজার বছরেও তা আর দুর করা সম্ভব হয়ে ওঠে না। বস্তুত মানুষ নিজেই নিজেকে নিয়মের বেড়াজালে বন্দি করে ফেলে। কেউ স্বেচ্ছায় বন্দি হতে চাইলে কে তাকে মুক্ত করতে পারবে? তাই বলা হয়েছে,

"আল্লাহ মানুষের প্রতি বিন্দু পরিমাণ ভূল করেন না, মানুষ নিজেই নিজের প্রতি ভূল করে।" (আল-কোরআন১০:৪৪)

মানুষ যখন জ্ঞান প্রয়োগ করে না তখন সে ভূল করে। কোন বিষয়ে মনযোগ সহকারে জ্ঞানের যথাযথ প্রয়োগ না করা উদাসীনতার দোষে দুষ্ট। উদাসীনদের আল্লাহ পছন্দ করেন না। উদাসীনদের সম্পর্কে বলা হচ্ছে,

"... যারা আমার নির্দশনসমূহ সম্পর্কে উদাসীন, তারা যা অর্জন করেছে তার ফলস্বরূপ তাদের আবাস হবে অগ্নি।" (আল-কোরআন ১০:৭-৮)

"অভিশপ্ত হোক মিথ্যে অনুমানকারীরা, অজ্ঞতার বশবর্তী হয়ে যারা একেবারেই উদাসীন!" (আল-কোরআন৫১:১০-১১)

গীতায় বলা হয়েছে, "বোকা ও বুদ্ধিহীনদের কাছে আমি নিজেকে কখনই প্রকাশ করি না। তাদের জন্য আমি আমার শাশ্বত সৃষ্টিশীল শক্তি মায়া যোগ দ্বারা আবৃত থাকি" (গীতা ৭:২৫)

মানুষ যখন জ্ঞান প্রয়োগ করে না তখন সে বিধাতার অনুগ্রহ বঞ্চিত হয় এবং ভূল করে। যখন সে ভূল করে তখন অন্তর্নিহিতের সত্যিকার অর্থ বের করে কোন বিষয় বুঝতে ব্যার্থ হয়। যখন সে বুঝতে ব্যার্থ হয় তখন তার বিচার-বিশ্লেষণ মানবজীবনে কোন উপকারে আসে না। তারা নিজেদের মতো করে 'বিশ্বাসী-অবিশ্বাসীর সঙ্গা' নির্ধারণ করে। এসব বিশ্লেষণ কিছু মানুষের স্বর্গে গমনের এক কল্পিত বাসনা পূরণ করে মাত্র। অপরদিকে তেমন বিশ্লেষণ কিছু মানুষকে নানান নিয়মের মধ্যে বন্দি করে রাখারও একটি অপকৌশল হয়ে কাজ করে। স্বার্থান্বেষী ও সুযোগসন্ধানীরা এসবের সুবিধা ভোগ করে।

স্বার্থান্বেষী ও সুযোগসন্ধানীরা মহান!! কেননা তাদের জ্ঞান ও বুদ্ধি আছে। তারা সুযোগের সদ্ব্যাবহার করতে জানে। তাদের কর্মকান্ডের দ্বারা কিছু মানুষের উপকারও হয়। তারা চিরকালই সুযোগ নেবে বা নেয়ার চেষ্টা করবে। এটিই তাদের নিয়ম বা রীতি। তারা তাদের চরিত্র অনুযায়ি কাজ করে। সেজন্যই তো তাদেরকে স্বার্থান্বেষী ও সুযোগসন্ধানী বলা হয়। অতএব তাদের কোন ত্রুটি নেই। তারা তাদের নিয়ম যথাযথভাবে মেনে চলে।

ত্রুটি হচ্ছে 'আম জনতা'র। অর্থাৎ যারা বিষয়গুলির প্রতি উদাসীন। যারা বোঝে না বা বোঝার চেষ্টা করে না বা না বুঝে অন্যায়কে সমাজে প্রশ্রয় দেয় কিংবা বুঝেও তা প্রতিহত করার চেষ্টা করে না বা প্রয়োজনীয় ব্যাবস্থা গ্রহণ করে না বা উদ্যোগী হয় না ত্রুটি মূলত তাদের। আর সে কারণেই যথাযথ জ্ঞান বঞ্চিত হয়ে পরে থাকাকেও অপরাধতূল্য গণ্য করা হয়। কেননা সমাজে এর সুদুর প্রসারী মন্দ ফলাফল আছে। সাধারণ জনতার নিরবতা সমাজে অন্যায় কর্মকান্ড প্রবেশের প্রধান সহায়ক।

অতীতেও নানান নিয়মের বেড়াজালে সমাজের সাধারণ মানুষ বন্দি হয়েছিল। নবী-রাসূলগনের আগমন ঘটেছে এসব কুসংস্কার ও জটিলতা থেকে

মানুষকে মুক্তি দেয়ার জন্য। তারা জীবনের ঝুঁকি নিয়ে সমাজের মানুষের মুক্তির জন্য কাজ করে গেছেন। যেমন বলা হয়েছে,

“.. বার্তাবাহক (মোহাম্মদ) ... সে তাদের নির্দেশ দেবে সঠিক কাজের এবং বারণ করবে যা কিছু মন্দ তা। সে তাদের জন্য যাবতীয় ভাল বস্তু বিধি-সম্মত ঘোষনা করবে এবং নিষিদ্ধ করবে শুধুমাত্র মন্দ বস্তুসমূহ এবং যে তাদের ওপর অর্পিত বোঝা থেকে তাদেরকে অব্যাহতি দেবে এবং শৃংখল অপসারণ করবে যা তাদের ওপর বিদ্যমান ছিল।” (আল-কোরআন ৭:১৫৭)

কিছু সুবিধাভোগী মানুষ নিয়মের নানান জটিলকরণের সুবিধা লুটে নেয়। আজও কিছু মানুষ ধর্মীয় রীতি-নীতি এমনকি প্রশাসনিক বিধি-বিধান বা বিধি-নিষেধের তথা আইনের বেড়াজালে মুক্ত মানুষকে আটকে ফেলছে। এভাবে তারা মর্যাদা অর্জনের পাশাপাশি অবৈধ উপায়ে অধিক উপার্জনেও সক্ষম হচ্ছে।

উল্লেখ্য যে, মানুষ মানুষ হয়ে জন্ম লাভ করে। বিশ্বাসী-অবিশ্বাসী হয়ে জন্ম লাভ করে না। বাস্তবে মানুষ বিশ্বাসী বা অবিশ্বাসী হয় নানারূপ ব্যাখ্যা-বিশ্লেষনের কারণে। অর্থাৎ এ বিষয়ে কিছু মানুষের নির্ধারণ করে দেয়া ‘সঙ্গা’র কারণে। সাধারণ মানুষও সেটিকেই অধিক গুরুত্ব দেয়। ফলে মানুষ বিশ্বাসী-অবিশ্বাসী হয় সমাজের সুবিধাভোগীদের দ্বারা সৃষ্ট ব্যাখ্যা বা বিশ্লেষনকে ‘আম জনতা’র নিজেদেরই গ্রহণ করে নেয়া বা না নেয়ার কারণে। এখানেই বিষয়ের প্রতি ‘আম জনতা’ বা সাধারণ মানুষের মনযোগের অভাব তথা উদাসীনতা কাজ করে বা প্রকাশ পায়।

এভাবে সঙ্গা নির্ধারণ ও নানান নিয়মের বেড়াজালে মানুষ আটকা পরে যায়। অথচ মূল যে বিষয় অর্থাৎ ‘ভাল কর্ম’ সেটিকে বিবেচনায় নেয় না বা কম গুরুত্ব দেয়। বস্তুত বিত্ত ও ক্ষমতাশালীরা সাধারণ মানুষকে এভাবে দৃষ্টিচ্যুত করে।

অথচ সাধারণ মানুষ নিজেদের অবস্থা ও অবস্থানগত দিক থেকে নিজেদের অন্তরের সত্য কথাগুলি তুলে ধরে না। যা এমনকি বিদ্যমান সঙ্গাকেও পরিবর্তন করে দিতে পারে। ফলে তারাই বস্তুত সত্যকে চাপা দেয়ার সুযোগ করে দেয়। একটি সঙ্গার কারণে নিজেরাই নিজেদেরকে সুবিধাভোগীদের কাছে সঁপে দেয়।

সত্যি বলতে এক অর্থে জগতের সকল মানুষই বিধাতা বা আল্লাহতে বিশ্বাসী। এটিও একটি বিশ্লেষনোত্তর সঙ্গা। বিষয়টিকে এভাবেও বিশ্বাস করা যেতে পারে। গ্রহণ করে নিলে কোন সমস্যা নেই।

সেক্ষেত্রে 'আল্লাহ' শব্দটিতে যদি কারও এলার্জি থাকে তবে আল্লাহর পরিবর্তে সৃষ্টিকর্তা, বিধাতা, ভগবান, ঈশ্বর, গড, প্রকৃতি নিজের পছন্দমতো যে কোন একটি শব্দ সহৃদয় পাঠক চয়ন করে নিতে পারেন। তাতেও কোন সমস্যা দেখি না। এগুলি তো কেবলি কিছু নাম বা সঙ্গা। মূল বক্তব্যটি বোঝা গেল কিনা সেটি গুরুত্বপূর্ণ। এমনকি একই বিশ্বাসে বিশ্বাসীর কাছেও বিশ্বাসের সকল বিষয়গুলি একই রকমভাবে ধরা দেয় না। পার্থক্যপূর্ণ হয়।

বিধাতা সকলকে বোধ-বিচারের সক্ষমতা দিয়েছেন। আবার তিনি গ্রন্থ প্রেরণ করে মানুষের জন্য ভাল-মন্দের দিক-নির্দেশনাও দিয়েছেন। মানুষকে এমনভাবে সৃষ্টি করা হয়েছে যে সে তার ভেতরে যে বোধটিকে জাগাতে সচেষ্ট হয় সেটিই তার ভেতরে জেগে ওঠে বা শাণিত হয়। সে সে বিষয়ে সচেতন ও উজ্জীবিত হয়ে ওঠে। যেমন একজন হিসেববিদ ডাক্তারী বোঝে না। কিন্তু নিজের বিষয়টা ভাল বোঝে। ডাক্তার হিসেববিদের মতো করে হিসেব বোঝে না। বিভিন্ন উপায়ে মানুষ নিজের ভেতরের বোধগুলিকে আলোড়িত, উজ্জীবিত ও শাণিত করে বা জাগিয়ে তোলে।

একই সূত্রে যে মানুষ তার নিজের ভেতরের মন্দ রিপুর তাড়নাগুলোকে অতিমাত্রায় জাগিয়ে তোলে তার সঠিক জ্ঞান ও বোধ কাজ করে না। সে ভূলের আবর্তে ঘুরপাক খায়। আল্লাহর নির্দেশ অনুযায়ী যেসব কাজ করা নিষিদ্ধ সেসব অন্যায় ও ভূল কাজও তেমন মানুষ অনায়াসে করতে পারে। প্রকাশ্যে জারী করা আল্লাহর নির্দেশনার বাইরে গিয়ে সীমা লঙ্ঘন করে। অথচ আল্লাহ কখনই অশ্লিল বা মন্দ কাজের আদেশ করেন না। আল্লাহর নির্দেশ অমান্যকারীদের বোধ সৃষ্টিতেই আল্লাহর বেধে দেয়া স্বয়ংক্রিয় নিয়ম, সত্য বা সূত্রের কারণে অকার্যকর হয়ে থাকে।

এরাই প্রকৃত 'অবিশ্বাসী'। এরা আল্লাহর নির্দেশ অমান্যকারী ও ভূল-পথগামী। এরা অন্যায়কারী। বলা হচ্ছে, 'অবিশ্বাসীরাই অন্যায়কারী' (২:২৫৪)।

'অবিশ্বাসীরাই অন্যায়কারী'। অর্থাৎ যারা আল্লাহর নির্দেশ অমান্যকারী, ভূল-পথগামী ও অন্যায়কারী তারাই 'অবিশ্বাসী'। এটিই 'অবিশ্বাসী'র সবচেয়ে বড় পরিচয় বা যথাযথ সঙ্গা। তা সে হিন্দু, মুসলিম, বৌদ্ধ, খ্রীষ্টান যাই হোক না কেন।

অবিশ্বাসীর সঙ্গা তাই পুনঃনির্ধারণ হওয়া জরুরী। অন্যথায় ভূল-পথগামী ও অন্যায়কারীরাও নানাবিধ নিয়ম-কানুন ও সঙ্গার ফাঁক-ফোঁকর দিয়ে বিশ্বাসীর তকমা লাগিয়ে সমাজে শ্রেষ্ঠ মানবরূপে ঘুরে বেরাবে এবং স্বর্গে যাবার অগ্রাধিকার দাবী করবে। সমাজে হচ্ছেও তাই। অথচ আল্লাহ কখনই অন্যায় কাজের আদেশ দেন না।

বোধসম্পন্ন কিছু মানুষ আবার প্রচলিত 'বিশ্বাসী' কথাটির সঙ্গার মধ্যে ত্রুটি দেখতে পায়। সে কারণে তারা চাইলেও নিজেদেরকে তথাকথিত 'বিশ্বাসী' বলতে নারাজ। সমাজে নিরবে তেমনটি ঘটে চলেছে। কেননা তারা দেখছে যে, সঙ্গা অনুযায়ী একজন মানুষের পরিচয় হচ্ছে 'বিশ্বাসী'। দাড়ি-টুপি, পাঞ্জাবী সবই আছে। বেহেস্তে যাবার সে পূর্ণ অধিকারের দাবীদার। অথচ অনেক অপকর্মে লিপ্ত।

আবার অনেকে 'বিশ্বাসী' হয়ে ধর্মের নামে কুসংস্কারাচ্ছন্ন এমনসব কাজ-কর্ম, রীতি-নীতি পালন করে চলেছে যা কিনা আদৌ ধর্মের মৌল কোন বিষয়ের অন্তর্ভূক্তও নয়।

কিছু মানুষের নিজেদেরকে 'বিশ্বাসী না' এমন দাবী করার পেছনে অনেকটা 'বিশ্বাসী' শব্দটির সংকীর্ণ সঙ্গা ও তথাকথিত কিছু 'বিশ্বাসী'দের কাজ-কর্ম ও আচরণের প্রতিবাদরূপেও দেখা যেতে পারে। সে অর্থে 'নাস্তিকতা'ও কোন 'বাদ' নয়, বস্তুত এটি একটি 'প্রতিবাদ'। এটির সৃষ্টি হয়েছে আস্তিক নামধারীদের অপকর্মের কারণে।

বস্তুত 'বিশ্বাস-অবিশ্বাস' কথাটির সাথে 'ভাল-মন্দ কর্মের' সম্পর্কটি অত্যান্ত নিবিড়। বাধা-ধরা কোন সঙ্গা নয়। কর্মের সাথে শাস্তি-পুরস্কার ও মুক্তির বিষয়টি সম্পর্কিত। ধর্মীয় রীতি-নীতি, নিয়ম-বিধি বা অপরাপর বিষয়গুলি আদৌ কোন মূখ্য বিষয় নয়। সেগুলি সহায়ক কার্যক্রম মাত্র। সহায়ক কার্যক্রমসমুহ একজনকে ন্যায় পথে চলতে ও থাকতে সহায়তা করে, নির্দেশনা

দেয়, অনুপ্রেরণা জোগায়, অভ্যস্ত করে গড়ে তোলে ও ভূল পথে যেতে বাধা হয়ে কাজ করে। তাই বলা হয়েছে,

"... সত্য ব্যাতিত কেবল ধর্মের প্রতিই তোমরা অধিক গুরুত্ব দিও না ...।" (আল-কোরআন ৫:৭৭)

এখানে ধর্ম বলতে ধর্মীয় রীতি-নীতি, বিধি-বিধান ইত্যাদিকেই বোঝান হয়েছে। কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে 'সত্য'। সত্যকে জানতে ও বুঝতে হবে। এটি অত্যান্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি বাণী এবং মানবজাতির জন্য আল্লাহ প্রদত্ত গুরুত্বপূর্ণ দিক-নির্দেশনা। মানুষকে বিষয়গুলির মর্মার্থ যথাযথতার সাথে অনুধাবন করতে হবে।

বিষয়টিকে যদি এভাবে ধরে নেই যে, প্রাথমকি অবস্থায় মানবসত্বা কেবলি একটি 'চার্জবিহীন উপাদান' মাত্র। তবে তার সৃষ্টিটিই এমন যে দেহ প্রাপ্তির পর পরিবেশের সান্নিধ্যে এসে সে কোন একটি বিষয়ের প্রতি 'ধনাত্মক' অথবা 'ঋনাত্মক' চার্জযুক্ত হয়ে যায়। কোন একটি বিষয়ে বিশ্বাসী অথবা অবিশ্বাসী হয়। পেছনে কাজ করে জ্ঞান ও বাস্তবতা দু'টোই। ওপরে যেমন বলা হয়েছে যে, 'নাস্তিকতা কোন বাদ নয় প্রতিবাদ'। আস্তিকদের ভূল কর্মের কারণে এর সৃষ্টি। এটি হচ্ছে বাস্তবতা। যা নিজ নিজ জ্ঞান থেকে সৃষ্ট বিভিন্ন দল সমুহের মুখোমুখী অবস্থানের কারণে সৃষ্টি হয়।

সত্য হচ্ছে, যে যে নামেই ডাকুক বা যে যেমন সঙ্গাই দিক না কেন- আল্লাহ, ভগবান, ঈশ্বর, গড, বিধাতা এক। বোধসম্পন্ন মানুষগণ বিষয়গুলি অন্তরে ঠিকই স্বীকার করে। সঙ্গা নিয়ে তর্ক-বিতর্ক প্রকৃতপক্ষে কু-তর্ক। গুরুত্বপূর্ণ কাজ না থাকার কারণে কেউ কেউ এগুলিতে নিজে ব্যাতিব্যাস্ত থাকে এবং অন্যদেরকেও ব্যাস্ত রাখে। অনেকে সাধারণের দৃষ্টিকে সত্য থেকে দুরে সরিয়ে রেখে উপার্জনও করে।

তবে এটিও সত্য যে কিছু মানুষ সমাজে জ্ঞানী-গুণী হিসেবে পরিচিতজনদের থেকে বিষয়গুলি সম্পর্কে শুনতে ও জানতে চায়। কিন্তু গুণীজনেরাও সমাজের প্রচলিত ধারণার বাইরে গিয়ে বলতে ভয় পায় নানা প্রকারের সুবিধা ও অবস্থান হারাবার ভয়ে। বস্তুত স্বার্থের কারণেই। কেউ আবার ব্যাতিক্রম কিছু করার চেষ্টা করলেও দেখা যায় অতিরঞ্জিত করছে,

নইলে আরেকটি নতুন ভূলের জন্ম দিচ্ছে। পূর্বেই বলে নিয়েছি যে এক অর্থে সকলেই বিশ্বাসী। যেমন বলা হয়েছে,

"নভোমণ্ডল ও ভূ-মণ্ডলে যা কিছু আছে প্রত্যেকেই আল্লাহর সেজদায় পতিত হয় ইচ্ছায় কিংবা অনিচ্ছায়, ঠিক যেমনিভাবে তাদের ছাঁয়া সকালে ও সন্ধ্যায় পতিত হয়।" (আল-কোরআন ১৩:১৫)

সৃষ্টির সূত্র বা নিয়মটিই এমন যে এটি হতে বাধ্য। ইচ্ছায় কিংবা অনিচ্ছায়, বুঝে কিংবা না বুঝে, চেতনে বা অবচেতনে সকলেই বিশ্বাসী। যদিও অনেকে সেটি উপলব্ধি করতে পারে না। সকলেই এক এবং একই আল্লাহর সেজদায় পতিত হয়। সৃষ্টির সূত্রের কারণেই হয়। যে সূত্র বিধাতা নিজেই তার সৃষ্টির ভেতরে স্থাপন করে দিয়েছেন সৃষ্টিকালে। ঠিক যেমন মানুষ বিপরীতে যত চেষ্টাই করুক না কেন তার ছাঁয়া মাটিতে পতিত হবেই। যদি না আল্লাহ অন্য কোন সূত্র স্থাপন করেন। সৃষ্টি ও তার নিয়মটিই এমন। অর্থাৎ বস্তুগত দেহ ভিন্নও মানুষের যে সত্বার বিদ্যমানতা সে সত্বা বিশ্বাসের শর্তে গড়া। 'ধনাত্মক চার্জযুক্ত'।

আপাত দৃষ্টে যাদেরকে সঙ্গার কারণে অবিশ্বাসী বলা হয় সেখানে পার্থক্য হচ্ছে জ্ঞানের। আর জ্ঞান নিজ থেকে প্রবেশ না করলে করণীয় নেই। নিউটনের দ্বিতীয় সূত্র যে বোঝে না তাকে মেরে ফেললেও সে বুঝবে না। তাকে মেরে ফেলেই বা লাভ কি? কি অর্জন হবে? নিজেকে অপরাধী হতে হবে। তাকে তার মতো থাকতে দেয়াই উত্তম।

তবে দায়িত্বশীল মানুষ, হিতাকাঙ্খী বা বন্ধু হিসেবে আপ্রাণ চেষ্টা করে যেতে হবে তেমন একজনকে সঠিক বিষয়টি বোঝাতে এবং একসাথে এগিয়ে নিয়ে যেতে। তার বিষয় তার নিজের ও আল্লাহর ওপরই ছেড়ে দিতে হবে। তবে বোঝাতে সক্ষম হলে মানুষ বুঝবেই। কিন্তু মানুষ তখন বুঝবে না যখন সে বুঝবে যে, যে বোঝাচ্ছে সে বোঝাচ্ছে না; সে অহম প্রদর্শন করছে। এমনিভাবে জ্ঞান একটি কারণ বিষয়ের প্রতি মানুষের 'ঋণাত্মক' ভাব প্রদর্শনের। অতএব দাওয়াতি কার্যক্রমও হতে হবে যেভাবে আল্লাহ নির্দেশ করেছেন সেভাবে। যেমন বলা হয়েছে,

"তোমার পালনকর্তার পথে মানুষকে আহবান কর জ্ঞানের আলোকে, যুক্তিসম্মত উপায়ে ও উত্তম পন্থায়।" (আল-কোরআন ১৬:১২৫)

চিৎকার-চেচামেচি ও ঔদ্ধত্যপূর্ণ আচরণ প্রদর্শন নয়। মন্দ কথা উচ্চারণ করে কিংবা গালাগাল দিয়ে নয়।

ওপরে গুরুত্বের সাথে এটিই বলার চেষ্টা করা হয়েছে যে, বিশ্বাসীর গুরুত্বপূর্ণ দিকটি হল আল্লাহর নির্দেশ মেনে চলা। প্রশ্ন হচ্ছে, আল্লাহর নির্দেশ কি? আল্লাহর নির্দেশ হচ্ছে সত্য ও ন্যায়ের পথে চলা। অন্যায়-অনৈতিক কার্যকলাপ থেকে দুরে থাকা ও নিরুৎসাহিত করা। আল্লাহর নির্দেশনার এ মর্মার্থ অনুধাবনই হচ্ছে মানব জীবনের জন্য সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়।

বুকের ওপর কাপড় টেনে দেয়া, পর পুরুষের সামনে কথা না বলা এগুলি গুরুত্বপূর্ণ নয়। কারও কাছে যদি এগুলিকেই গুরুত্বপূর্ণ মনে হয় তবে বুঝতে হবে যে তেমন নির্দেশনার প্রতিটির পেছনে কিছু কারণ নিহিত আছে। সে কারণটি গুরুত্বপূর্ণ। সে কারণটির উপস্থিতি-আনুপস্থিতির সাথে আল্লাহর নির্দেশনার বিষয়টি সম্পর্কিত। অতএব সমাজ থেকে সে কারণ দুরীভূত হতে হবে বা দুর করার চেষ্টায় রত থাকতে হবে। তবেই তার নির্দেশ পালিত হবে এবং সেটিই সমস্যার মূলে আঘাত করবে। অন্য ব্যাবস্থাগুলি মলমের মতো সাময়িক যন্ত্রনার লাঘব করতে পারে মাত্র।

আল্লাহর নির্দেশ পালন করার জন্য সুনির্দিষ্টভাবে কোন একটি রূপ ধারণ করার প্রয়োজন নেই। একজন মানুষ স্বাভাবিক মানুষ থেকেই ভাল-মন্দ, ন্যায়-অন্যায় বিবেচনা করে আল্লাহর নির্দেশ পালন করতে পারে। এর জন্য ইহুদি-খ্রীষ্টান বা অন্য কিছুই হতে হবে না। আল্লাহতে সমর্পন করলেই হবে। আল্লাহতে সমর্পন হচ্ছে আল্লাহর ইচ্ছে ও নির্দেশনায় সমর্পন। সমর্পনই সত্য ধর্ম। চিরন্তন বা সনাতন ধর্ম।

সৃষ্টির আদি থেকে এ একটি ধর্মই সমগ্র জগতজুড়ে বিদ্যমান ও মানুষের জন্য আল্লাহ কর্তৃক নির্ধারিত। এটিই ইসলাম। ইসলাম হচ্ছে সমর্পন। আল্লাহতে সমর্পন করলে অপরের পদানত হতে হয় না। নিজেকে সমুন্নত রেখে বিদ্যমান থাকা যায়। সমর্পনেই শান্তি। ইসলামকে তাই শান্তির ধর্ম বলা হয়।

জ্ঞান ও বোধসম্পন্ন প্রতিটি মানুষ নিজের মতো করেই আল্লাহতে বা সৃষ্টিকর্তায় সমর্পন করতে পারে। এর জন্য কোন সুনির্দিষ্ট রং বা রূপ ধারণ করার প্রয়োজন নেই। তবে বৃহৎ জনগোষ্ঠীর ব্যাবস্থাপনা ও শৃংখলার প্রয়োজনে সুনির্দিষ্ট নিয়ম ও বিধি-বিধানের আওতার মধ্যে থাকাটি বাস্তবতার কারণে একেবারে অগুরুত্বপূর্ণ নয়। তাই হিন্দু, মুসলিম, বৌদ্ধ, খ্রীষ্টান, ইহুদি বিবিধ নামের ধর্মসমুহের বিদ্যমানতা। স্থান-কাল-পাত্র ও প্রয়োজনের ভিত্তিতে এগুলি এভাবে গড়ে উঠেছে [ধর্ম দ্রষ্টব্য ২.৩.৩]। আবার প্রয়োজনেই পরিবর্তন আসবে। তবে গুরুত্বপূর্ণ বক্তব্য বা বাণী হচ্ছে,

'সত্য ব্যাতিত তোমরা কেবল ধর্মের প্রতিই অধিক গুরুত্ব দিও না।' (৫:৭৭)

এখানে ধর্ম বলতে ধর্মীয় রীতি-নীতি, বিধি-বিধানকে বোঝান হয়েছে। সত্যকে পেছনে ফেলে এসবকে প্রাধান্য দিতে বারণ করা হয়েছে।

ওপরে বলা হয়েছে যে, পথ-নির্দেশনা যা আমি অবতীর্ণ করেছি গ্রন্থে তার বিস্তারীত বর্ণনা করার পরও যারা তথ্য-প্রমাণ গোপন করে তাদের প্রতি আল্লাহর অভিসম্পাত। অর্থাৎ এ কাজটি একটি অত্যান্ত মন্দ ও অন্যায় কাজ। যারা তেমনটি করবে তারা আল্লাহর নির্দেশনা অমান্য করেছে বুঝতে হবে।

এ কাজটি আজ ইহুদি করেছে, কাল খ্রীষ্টান বা কোনদিন মুসলিমও করতে পারে। ফলে মানুষ হিসেবে আল্লাহর নির্দেশ ইহুদি, খ্রীষ্টান বা মুসলিম যে কেউ যেমন পালন করতে পারে, তেমনি আবার যে কেউ সে নির্দেশনা যে কোন সময় অমান্যও করে ফেলতে পারে।

অতএব কেবল নামে বা লেবাসে নয়, বরং সততা বা ভাল-মন্দ কর্মের ভিত্তিতেই একজন মানুষ 'বিশ্বাসী' অথবা 'অবিশ্বাসী' বলে বিবেচিত হতে পারে। সুনির্দিষ্ট সঙ্গার মধ্যে কোন প্রকারে একবার প্রবেশ করতে পারলেই বিশ্বাসী হয়ে যাওয়া যায় না। কর্ম ও আচরণ যথাযথ হতে হবে এবং তার ধারাবাহিকতাও থাকতে হবে। তবে বাস্তবতার প্রেক্ষিতে সঙ্গাগত বিষয়লিরও প্রয়োজন আছে। এতদ্বসত্বেও কিছু মানুষের সত্যকে জানা ও বোঝার প্রয়োজন আছে।

উল্লেখ্য যে, আল্লাহ কখনই মন্দ কাজের আদেশ দেন না। সে কথা গ্রন্থে যেমন ঘোষনা দিয়ে বলা হয়েছে, তেমনি গ্রন্থে কোন মন্দ আদেশও নেই। তবে বোধসম্পন্ন ও সমর্পিত আত্মা গ্রন্থের দিক-নির্দেশনা ছাড়াও ভাল-মন্দ বুঝতে পারে। আল্লাহ সেভাবেই মানুষ সৃষ্টি করেছেন। তাই মন্ত্রী থেকে মুচি, বৃদ্ধ থেকে শিশু পর্যন্ত সকলেই সাধারণভাবে কিছু ভাল-মন্দ একইভাবে বোঝে। যেমন মিথ্যে বলা পাপ, চুরি করা অন্যায় ইত্যাদি। অবতীর্ণ গ্রন্থে যদি বিষয়গুলির নিষিদ্ধতা বিষয়ে কিছুই বলা না হত, তবুও বোধসম্পন্ন মানুষের সাধারণ জ্ঞানই মানুষকে সে দিক-নির্দেশনা দিয়ে দিত। তাই বলা হয়েছে,

“যাদেরকে জ্ঞান ও প্রজ্ঞা দান করা হয়েছে তাদের অন্তরে এটি (কোরঅনের বাণী/দিক-নির্দেশনা) সুস্পষ্ট নিদর্শন। ভূল পথগামীরা ছাড়া কেউই আমার অবতীর্ণ বাণীসমুহ অস্বীকার করে না।” (আল-কোরআন ২৯:৪৯)

অর্থাৎ সৃষ্টিতেই কিছু নিয়ম বা নির্দেশনা প্রতিষ্ঠা করে দেয়া আছে। যেমন কম্পিউটারে লিখিত কিছু ইন্সট্রাকশন বা কমান্ড দেয়া থাকে যা ব্যাবহারকারী দেখতে পায় না বিষয়টি তেমন। উদাহরণ ‘ওরাকল’ এ লিখিত প্রোগ্রাম। নির্দেশনা দেয়া আছে অথচ দৃষ্টির অন্তরালে বা অন্তর্গ্রথিত (On a guarded tablet)। তাই ন্যায় বা ন্যায্যতা, ভারসাম্য এবং সত্য বা যথাযথতার প্রতি সকল মানুষের একটি সুপ্ত সহজাত টান আছে। সেভাবেই আল্লাহর নির্দেশনা কাজ করে।

কোন ধর্মের বা লেবাসের বা নামের পরিচয়ের সাথে বিশ্বাস-অবিশ্বাস কথাটি যায় না। মানুষ হিসেবে যে কেউ বা সকলেই বিশ্বাসী হতে পারে। আবার যে কেউ মন্দ কাজ করলে অবিশ্বাসী হয়ে যেতে পারে। কেননা অবিশ্বাসী আল্লাহ নির্ধারিত সীমা বা নির্দেশনার বাইরে চলে যায়। অথচ আল্লাহ কখনই মন্দ কাজের আদেশ দেন না। বলা হচ্ছে,

“আল্লাহ অবশ্যই মন্দ কাজের আদেশ দেন না।” (আল-কোরআন ৭:২৮)

“নিশ্চয়ই! আল্লাহ ন্যায়পরায়ণতা, সদয়তা এবং আত্নীয়-স্বজনকে দান করার নির্দেশ দেন এবং তিনি অশ্লীলতা, ঘৃণিতকাজ এবং দুষ্ট প্রকৃতির কাজ নিষিদ্ধ করেন।” (আল-কোরআন ১৬:৯০)

কোরআনের বা আল্লাহর বাণীর ওপরোক্ত দাবীর বিষয়ে কারও মনে কোন প্রকার বিন্দু পরিমাণ সন্দেহের উদ্রেক হলে সমগ্র কোরআন ঘেঁটে সে এ দাবীর অযথার্থতা খুঁজে বের করার চেষ্টা করে দেখতে পারে।

কাউকেই কোন ধর্ম বা কোন লেবাস বা কোন সুনির্দিষ্ট আচার-অনুষ্ঠান পালনের কারণে অবিশ্বাসী বলা সমীচীন নয়, আবার বিশ্বাসী ভাবাও ঠিক হবে না। 'আল্লাহর নির্দেশ' পালন করা বা পালন না করার মধ্য দিয়ে বিশ্বাসী-অবিশ্বাসী চিহ্নিত হতে হবে। কেননা আল্লাহ কোন মন্দ, অন্যায় বা অশ্লিল কাজের নির্দেশনা দেন না। অতএব যারা তেমন কর্মে লিপ্ত হবে তারাই 'অবিশ্বাসী'। তা সে যে ধর্মের পরিচয়েই পরিচিত হোক না কেন।

মানুষ হিসেবে যারা সত্য, ন্যায় ও ভাল কাজ করে বা সে পথে থাকে চেতনে-অবচেতনে তারাই 'বিশ্বাসী'। যারা অন্যায় করে তা সে যে লেবাসই ধারণ করুক না কেন তারা 'অবিশ্বাসী'। তারা মুখে আল্লাহ, পরকাল এসব বিশ্বাস করি বললেও কাজ করে আল্লাহ যা নিষেধ করেছেন তা। এরা মূল কাজ তথা কর্মেই অবিশ্বাসীর আচরণ করে। মুখে বলে বিশ্বাস করি। বস্তুত এদের অন্তর জানে যে এদের কাছে মৌখিক স্বীকৃতি কোন মূল্যই বহন করে না। বলা হচ্ছে,

"যারা অবিশ্বাস করে তারা বস্তুত মিথ্যের অনুসরণ করে এবং যারা বিশ্বাসী তারা তাদের পালনকর্তার নিকট থেকে আগত সত্যের অনুসরণ করে।" (আল-কোরআন ৪৭:৩)

'মিথ্যের অনুসরণকারীরাই অবিশ্বাসী' এবং 'সত্য পথের অনুসারীরা বিশ্বাসী'। এটিই বিশ্বাসী-অবিশ্বাসীর সবচাইতে যথাযথ সঙ্গা।

ইসলামের দৃষ্টিতে বিশ্বাস-অবিশ্বাস বা বিশ্বাসী-অবিশ্বাসীর ক্ষেত্রে এভাবেই ধরে নেয়া হয় যে, যারা কোরআনে উল্লেখিত বিশ্বাসের শর্তসমুহ বিশ্বাস করে অর্থাৎ না দেখা বিষয়সমুহ (দ্রষ্টব্য আল-কোরআন ২:২-৫) যেমন আল্লাহ, পরকাল, ফেরেশতা ইত্যাদি বিষয়সমুহ বিশ্বাস করে তারা মন্দ কাজ করবে না বা তা থেকে বিরত থাকবে। অতএব মন্দ কাজ থেকে বিরত থাকা ও ভাল কাজ করার সাথে বিশ্বাসী-অবিশ্বাসীর সম্পর্কটি বিদ্যমান।

কেবল উল্লেখিত শর্তগুলি বিশ্বাস করি বললেই বিশ্বাসী হওয়া যাবে না। ওপরের শর্তগুলি বিশ্বাস করতে বলাই হয়েছে মন্দ কাজ পরিহার করে চলার জন্য। যদি বিশ্বাস স্থাপনের মাধ্যমে মূল উদ্দেশ্যই অর্জন করা সম্ভব না হয়, তবে সে বিশ্বাসের কোন মূল্য কিংবা প্রয়োজনীয়তাও নেই। অতএব মুখে বিশ্বাস করি বলে কর্ম খারাপ করলে সে বিশ্বাসী হবে না। সে সুযোগ সন্ধানী।

যারা অবিশ্বাসী অর্থাৎ যারা মন্দ কাজ করে, যেমন উদ্ধৃত বাণীতে উল্লেখ করা হয়েছে যে যারা আল্লাহ প্রদত্ত সত্য বার্তাও গোপন করে তাদের প্রতি অভিসম্পাত। এটি একটি উদাহরণ। তারা মিথ্যের আশ্রয় নেয়। কিন্তু এ মিথ্যের সুদুরপ্রসারী ফল হচ্ছে জগতে ভাল কিছু প্রতিষ্ঠাকে প্রতিহত করা বা রুদ্ধ করে দেয়া। এর অপর অর্থই হচ্ছে অনাচার সৃষ্টির সুযোগ করে দেয়া।

এতবড় খারাপ ও অন্যায় কাজ যে বা যারা করে বা করতে পারে সেটি ক্ষমার অযোগ্য অপরাধ। শাস্তিই তাদের প্রাপ্য। তাই এভাবে ব্যাক্ত করা হয়েছে যে তারা চিরকাল অভিসম্পাতের মাঝেই থাকবে। তাদের শাস্তি হ্রাস করা হবে না এবং তারা ক্ষমাও পাবে না। কেননা তাদের দুষ্ট কাজ মানুষ ও সমাজকে দীর্ঘমেয়াদী বিপদে ফেলে দেয়। যা অনেক বড় অপরাধ ও অন্যায় কাজ হিসেবে বিবেচিত।

অতএব প্রাপ্তব্য শাস্তি হচ্ছে প্রধানত অন্যায় কাজের জন্য; অবিশ্বাসের জন্য নয়। তবে অবিশ্বাসের জন্য কথাটি বলা হয় এজন্য যে, সত্যিকারভাবে দর্শন উপস্থাপিত শর্তসমুহের ওপর আস্থা ও বিশ্বাস রাখা সম্ভব হলে অন্যায় ও মন্দ কাজ করা সম্ভব না। তাই ধরে নেয়া হয় যে অবিশ্বাসী হলে সে অন্যায় কাজ করবে। দর্শনের রুপরেখায় বিশ্বাসের গুরুত্বটা এখানেই। যদি লক্ষ্যই অর্জিত না হয় তবে বিশ্বাস স্থাপন অর্থহীন।

সত্যকে যারা অস্বীকার বা অবিশ্বাস করে এবং সত্যের বিপক্ষে কাজ করে এবং মিথ্যে ও অন্যায় আচরণ করে আয়াতে মূলত তাদের সম্পর্কে বলা হয়েছে এবং তাদের প্রতি রয়েছে সকলের অভিসম্পাত এটিই বোঝানো হয়েছে। তারা অভিসম্পাতের মাঝেই থাকবে। তাদের শাস্তি হ্রাস পাবে না এবং তারা ক্ষমাও পাবে না।

শাস্তির ভীতি বহু মানুষকে সুপথে চালনা করে যদি সে বিশ্বাসী ও নম্র হয়। অন্যথায় তারাও ঔদ্ধত্য প্রদর্শন করত এবং জগতকে অধিকতর

অশান্তিময় করে তুলত। কিছু মানুষের জন্য হয়তবা সত্যি সাত্যি শাস্তি প্রয়োজন আছে। কেননা তারা প্রকৃতই অবাধ্য, অবুঝ ও অশান্তি সৃষ্টিকারী। তবে আল্লাহর ব্যাবস্থাপনায় সেখানেও আশার আলো আছে শর্ত সাপেক্ষে। সব কিছুই আল্লাহর বিবেচনার ওপর নির্ভরশীল। শাস্তি হচ্ছে সুপথে ফিরিয়ে আনার অন্যতম একটি উপায়।

➢ (আয়াত ১৬৩-১৬৭) প্রকৃতির মাঝেই রয়েছে আল্লাহর মহাত্ব ও তাঁর একত্বের নিদর্শন (Allah's Signs or Portent)। প্রকৃতির সুশৃংখল চলমানতা পর্যবেক্ষন করেও সে সম্পর্কে জানা ও বোঝা যায়। এতদ্বসত্বেও যারা আল্লাহর সমকক্ষ বা অংশীদার (Partner of Allah) সৃষ্টি করে সেসব অবিশ্বাসীদের (Disbeliever) অবিশ্বাস ও তার পরিণতি সম্পর্কে বলা হয়েছে।

১৬৩	তোমাদের উপাস্য এক; তিনি ব্যাতিত আর কোন উপাস্য নেই। পরম দয়ালু, ক্ষমাশীল। (Your God is One God; there is no God save Him, the Beneficent, the Merciful.)
১৬৪	নভোমন্ডল ও ভূমন্ডলের সৃষ্টিতে এবং রাত ও দিনের পরিবর্তনে এবং মানুষের কল্যাণে নদীতে জলযান সমূহের চলাচলে, আকাশ থেকে বর্ষনকৃত পানি যা দ্বারা মৃত যমীনকে সজীব করে তুলেন তাতে এবং তার মাঝে ছড়িয়ে দেয়া সকল প্রকার জীবে, বাতাস প্রবাহের গতি প্রকৃতিতে এবং আসমান ও যমীনের মাঝে বিচরনকৃত মেঘমালা- এ সবই বোধসম্পন্ন মানুষের জন্য আল্লাহর ইংগিতপূর্ণ নিদর্শন। (Lo! In the creation of the heavens and the earth, and the difference of night and day, and the ships which run upon the sea with that which is of use to men, and the water which Allah sendeth down from the sky, thereby reviving the earth after its death, and dispersing all kinds of beasts therein, and (in) the ordinance of the winds, and the clouds obedient between heaven and earth: are signs (of Allah's Sovereignty) for people who have sense.)

১৬৫	তথাপি মানব সম্প্রদায়ে রয়েছে এমন কিছু লোক, যারা তাদের উপাসনার জন্য আল্লাহর সমকক্ষ কোন কিছুকে সাব্যস্ত করে এবং তাদের প্রতি তেমনি ভালবাসা পোষন করে, যেমন ভালবাসা কেবলমাত্র আল্লাহর প্রতি হয়ে থাকে– যারা বিশ্বাসী আল্লাহর প্রতি তাদের ভালবাসা ওদের তুলনায় বহুগুন বেশী। কতই না উত্তম হত যদি তারা পার্থিব কোন কোন দুর্যোগ প্রত্যক্ষ করেই উপলব্ধি করে নিত যে যাবতীয় ক্ষমতা শুধুমাত্র আল্লাহর এবং শাস্তি প্রদানে আল্লাহ অত্যান্ত কঠিন। (Yet of mankind are some who take unto themselves (objects of worship which they set as) rivals to Allah, loving them with a love like (that which is the due) of Allah (only) – Those who believe are stauncher in their love for Allah – Oh, that those who do evil had but known, (on the day) when they behold the doom, that power belongeth wholly to Allah, and that Allah is severe in punishment!)
১৬৬	আল্লাহর পরিবর্তে তারা যাদের অনুসরণ করে, শেষ দিবসে তারা যখন তাদের প্রতি অস্বীকৃতি প্রদর্শন করবে এবং শাস্তি প্রত্যক্ষ করবে, তাদের সকল লক্ষ্য (সম্পর্ক) ব্যার্থতায় পর্যবেশিত হয়ে যাবে। ((On the day) when those who were followed disown those who followed (them), and they behold the doom, and all their aims collapse with them.)
১৬৭	এবং যারা অনুসারী ছিল তারা বলবে: যদি একবার পৃথিবীতে আমাদের ফিরে যাবার সুযোগ হত, তবে আমরাও তাদের প্রতি তেমনি অস্বীকৃতি প্রদর্শন করতাম, যেমন তারা আমাদের প্রতি অস্বীকৃতি প্রদর্শন করছে। এভাবেই আল্লাহ তাদেরকে তাদের কৃতকর্ম প্রদর্শন করে অনুতপ্ত করে তুলবেন এবং তারা আগুন থেকে কখনই বের হবে না। (And those who were but followers will say: If a return were possible for us, we would disown them even as they

	have disowned us. Thus will Allah show them their own deeds as anguish for them, and they will not emerge from the Fire.)

■ **২.১৬৩.১** তোমাদের উপাস্য এক; তিনি ব্যাতিত আর কোন উপাস্য নেই : মানবজাতির একমাত্র উপাস্য আল্লাহ। আল্লাহ ব্যাতিত আর কোন উপাস্য নেই। আল্লাহ এক [আল্লাহ দ্রষ্টব্য ২.২০.২]।

সত্যি বলতে আল্লাহকে কেউ চেনে না, জানে না। আল্লাহ সম্পর্কে মানুষের যথাযথ কোন জ্ঞানও নেই। এটি একটি দর্শন, একটি দৃষ্টিভঙ্গী। 'এক' ব্যাতিত সুশৃংখল সমন্বয় ও পরিচালনা সম্ভব নয়। কোরআনেও যুক্তি হিসেবে সে উদ্ধৃতি দেয়া হয়েছে। বলা হচ্ছে,

"যদি আল্লাহ ভিন্ন আর কোন উপাস্য থাকত, তবে অবশ্যই নভোমণ্ডল ও ভূ-মণ্ডল বিশৃংখল হয়ে যেত।" (আল-কোরআন ২১:২২)

"যদি তাঁর (আল্লাহর) সঙ্গে অন্যান্য উপাস্য থাকত যেমনটি তারা (অবিশ্বাসীরা) বলে, তবে তারা (অন্যান্য উপাস্যরা) আরশের অধিপতির (অর্থাৎ আল্লাহর) বিপক্ষে উপায় (ভিন্ন পথ) অন্বেষন করত।" (আল-কোরআন ১৭:৪২)

আল্লাহ সম্পর্কে নিশ্চিতভাবে সবকিছু জানা থাকলে এসব যুক্তি উপস্থাপনের প্রয়োজন হত না। আল্লাহর একত্বের বিষয়টি জ্ঞান ও যুক্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত। কেউ তা বিশ্বাস নাও করতে পারে। কারও কাছে অন্য যুক্তি ভাল মনে হতে পারে। কিন্তু কোরআনের দর্শন থেকে সামগ্রীকভাবে উপকৃত হতে হলে এ ধারণার ওপর অর্থাৎ আল্লাহর একত্বের ধারণার ওপর অকাট্য বিশ্বাস রাখতে হবে। গীতায় বলা হয়েছে,

"জ্ঞানের পার্থক্যের কারণে বিভিন্নজন বিভিন্নভাবে ভগবানের যজ্ঞ করে। কেউ ভগবানকে এক ও অভেদ জেনে তাঁর উপাসনা করে। কেউ তাঁর বহুরূপের উপাসনা করে। আবার কেউ বিশ্বরূপের উপাসনা করে।" (গীতা ৯:১৫)

বিষয়গুলি জ্ঞানের সাথে সম্পর্কিত। কোরআনের দর্শনে 'এক আল্লাহ' হচ্ছেন কেন্দ্রবিন্দু। এখান থেকে বিচ্যুত হলে দর্শনের কোন কিছুই মানুষের ওপর আর কার্যকর হবে না। তাই এ ধারণায় অবিশ্বাসীদের ওপর এ দর্শন কার্যকর নয়। সে কারণেই সকলকে বিশ্বাসী হতে আহবান করা হয়। যেন সকলেই বিশ্বাসের ছাঁয়াতলে অবস্থান করে সত্য ও ন্যায় পথে চলতে ও মন্দ পথ পরিহার করতে সক্ষম হয়ে ওঠে। জগতে শান্তি প্রতিষ্ঠা পায়।

জোর করে বিশ্বাস আনা সম্ভব না। যুক্তি দ্বারা বিচার-বিশ্লেষণ করে সেটি করতে হবে। তবে শিশুদেরকে কোন ধারণায় বিশ্বাসী করে গড়ে তোলা সম্ভব। সেখানেও অবশ্য যুক্তি বা বাস্তবতা কাজ করে। সেটি হল শিশুরা মা-বাবা, মুরুব্বি, শিক্ষক, অতি কাছের আপনজনদের কথা বিশ্বাস করে। জীবনের সব ক্ষেত্রেই কোথাও না কোথাও একটি বিশ্বাস রাখা গুরুত্বপূর্ণ।

কোরআন জীবনের জন্য একটি পরিপূর্ণ দর্শন। অতএব এ দর্শনের ছাঁয়াতলে জীবনের সকল দিককে সুশৃংখল পেতে হলে এর সকল বিষয়ে বিশ্বাস রাখতে হবে। অতএব আল্লাহর একত্বে বিশ্বাস রাখতে হবে।

■ **২.১৬৩.২** পরম দয়ালু, ক্ষমাশীল (Allah) : (দ্রষ্টব্য আল-কোরআন ১:২)।

■ **২.১৬৪** নভোমন্ডল ও ভূমন্ডলের সৃষ্টিতে এবং রাত ও দিনের পরিবর্তনে এবং মানুষের কল্যাণে নদীতে জলযান সমূহের চলাচলে, আকাশ থেকে বর্ষনকৃত পানি যা দ্বারা মৃত যমীনকে সজীব করে তুলেন তাতে এবং তার মাঝে ছড়িয়ে দেয়া সকল প্রকার জীবে, বাতাস প্রবাহের গতি প্রকৃতিতে এবং আসমান ও যমীনের মাঝে বিচরনকৃত মেঘমালা- এ সবই বোধসম্পন্ন মানুষের জন্য আল্লাহর ইংগিতপূর্ণ নিদর্শন : নভোমন্ডল ও ভূমন্ডলের সৃষ্টিতে, রাত ও দিনের পরিবর্তনে, সকল প্রকার জীবে, বাতাস প্রবাহের গতি প্রকৃতিতে অর্থাৎ বলা হচ্ছে যে, সৃষ্টির প্রতিটি পরতে পরতে আল্লাহর একত্বের বিষয়ে ইংগিতপূর্ণ নিদর্শন রয়েছে। আল্লাহর একত্বের বিষয়ে জানতে ও বুঝতে হলে তাই আল্লাহর সৃষ্টিকে গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ তথা সত্যকে জানা ও বোঝার চেষ্টা করতে হবে [সত্য কি এ বিষয়ে লেখকের 'সত্য' বই দ্রষ্টব্য]।

এ জগত সত্যের ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত (দ্রষ্টব্য আল-কোরআন ৬:৭৩, ১৬:৩, ২৯:৪৪, ৬৪:৩)। সত্যের সন্ধান বা সত্যকে জানার চেষ্টার মধ্য দিয়ে অনুধাবন করা সম্ভব যে, এত বিশাল ব্রহ্মান্ড এক সমন্বয়কের উপস্থিতি ভিন্ন লক্ষ্য কোটি বছর নিরবিচ্ছিন্নভাবে সুশৃংখল নিয়মে চলতে পারত না। সব বিশৃংখল হয়ে যেত।

এ আয়াত মানুষকে সত্যের সন্ধান, আল্লাহকে জানা ও বোঝার ক্ষেত্রে জ্ঞান, গবেষনা ও অব্যাহত চর্চ্চার কথা বলে। আল্লাহ সম্পর্কে মানুষ নিশ্চিতভাবে সবকিছু জানলে ইংগিতপূর্ণ নিদর্শন পর্যবেক্ষন করতে বলা হত না। জ্ঞান, গবেষনা ও অব্যাহত চর্চ্চার মাধ্যমে সত্যকে জানা ও বোঝা বোধসম্পন্ন মানুষদের অন্যতম দায়িত্ব ও কর্তব্যের মধ্যে পরে। বস্তুত তথা আল্লাহই সত্য ও শ্রেষ্ঠ। বলা হচ্ছে,

"... আল্লাহ! তিনিই সত্য ..." (আল-কোরআন ২২:৬)

"... আমার চেয়ে উচ্চতর কোন সত্য নেই ..." (গীতা ৭:৭)

যারা জ্ঞান-গবেষনা করে তারা বস্তুত আল্লাহর সন্ধানেই রত। তারাই আল্লাহর মহাত্বকে তাদের গবেষনালব্ধ প্রাপ্তির মধ্য দিয়ে সবচাইতে ভালভাবে মানবজাতির সামনে তুলে ধরে। সৃষ্টির উৎসকে জানা ও বোঝার চেষ্টায় তারা সর্বদা রত। নিজেদেরকে নিজেদের কর্মে নিয়োজিত রেখেই তারা এবাদতে মশগুল। বিষয়গুলিকে সেভাবে বুঝতে হবে। যেমন বলা হয়েছে,

"নিজ নিজ স্বভাবজাত কর্ম বা স্বকর্ম অনুসরণ করে সকল মানুষ উৎকর্ষ সাধন করতে পারে। ... মানুষ তার নিজ দায়িত্ব পালন করার মধ্য দিয়ে ভগবানের অর্চনা করে সিদ্ধি, উৎকর্ষতা বা পরিপূর্ণতা লাভ করতে পারে।" (গীতা ১৮:৪৫-৪৬)

▪ **২.১৬৫.১** তথাপি মানব সম্প্রদায়ে রয়েছে এমন কিছু লোক, যারা তাদের উপাসনার জন্য আল্লাহর সমকক্ষ কোন কিছুকে সাব্যস্ত করে : ইতিপূর্বে বলা হয়েছে যে, নভোমন্ডল ও ভূমন্ডলের সৃষ্টিতে ... অর্থাৎ সৃষ্টির প্রতিটি পরতে পরতে আল্লাহর একত্বের ইংগিতপূর্ণ নিদর্শন রয়েছে। বলা হচ্ছে এতসব নিদর্শন মানুষের সম্মুখে উপস্থাপন করা সত্বেও মানব সমাজে 'এমন কিছু মানুষ' আছে

যারা সর্বোচ্চ মহান এক আল্লাহর সঙ্গে সমকক্ষ কোন কিছু স্থির করে এবং তাদের উপাসনা করে।

কোরআনের দর্শন এক আল্লাহর ধারণায় বিশ্বাসের কথা বলে। আল্লাহ ব্যাতিত আর কোন উপাস্য নেই। উপাস্য তো তিনিই হবেন যিনি সৃষ্টি করেছেন, লালন-পালন করেন। যিনি যেমনি একইসাথে মানুষ তথা সৃষ্টি জগতের উপকার করতে পারেন, আবার ক্ষতিসাধন করারও ক্ষমতা রাখেন (দ্রষ্টব্য ১.৪.১)। তিনিই তো উপাস্য!

মানুষের মধ্যেও তেমন মানুষ আছে যে কারও উপকার বা ক্ষতি করতে পারে। তবে কি সে উপাস্য হবে?

বিষয়গুলিকে এমন ক্ষুদ্র আঙ্গিকে ভাবলে হবে না। ভাবতে হবে সর্বশেষ পর্যায়কে বিবেচনা করে। যেখানে আল্লাহ ছাড়া আর কাউকে খুঁজে পাওয়া যাবে না। যেমন ওপরের উদাহরণে কোন মানুষের কাউকে উপকার করার ক্ষমতা থাকলেও সে তো তার সৃষ্টিকর্তা না। সে তো তাকে সৃষ্টি করেনি। এটি মানুষ জানে বা বোঝে।

নমরুদ, ফেরাউন তারাও তাদের ক্ষমতার দাপটে এমন কথা বলেছিল যা আমরা কোরআন থেকে জানতে পারি। কিন্তু তারা তো এ জীবন ও জগতের স্রষ্টা নয়। তারা তো চন্দ্র বা সূর্য্যকে উদিত করার ক্ষমতা রাখে না। অর্থাৎ কেবল একটি বিষয় দ্বারাই সব নির্ধারণ হয় না। আরও অনেক বিষয় আছে।

ওপরে উদ্ধৃত এই 'এমন কিছু মানুষ' তারা আল্লাহরই আজ্ঞাবহ বিভিন্ন কর্মের দায়িত্বপ্রাপ্ত ফেরেশতা বা দেবতাদের উপাসনা করে এবং সেটিও করে কল্পনার ভিত্তিতে। কেননা কে কিসের দায়িত্বে আছে কেউ জানে না। জানলেও তার স্বরুপ জানে না। অথচ কাল্পনিক রুপ তৈরী করে নিয়ে তারা তাদের উপাসনা করে। বলা যায়, তারা নিজেদের সৃষ্টি করা কল্পনাপ্রসূত কিছু ছবি, মূর্তী বা প্রতীকের উপাসনা করে। তারা নিজেরাই তাদেরকে বিভিন্ন নাম দিয়ে থাকে। তাই বলা হয়েছে,

"এগুলি তো তোমাদের দেয়া ফেরেশতা বা দেবতাদের কতগুলি নাম বৈ আর কিছু নয়, যা তোমরা এবং তোমাদের পূর্ব-পুরুষেরা দিয়েছ; ... বস্তুতঃ

তারা অনুমান ও নিজেদের প্রবৃত্তি দ্বারা পরিচালিত।” (আল-কোরআন ৫৩:২৩)

এসব কাজ অনুমান নির্ভর। সত্যের ওপর প্রতিষ্ঠিত নয়। তাই জ্ঞানের পরিপন্থী। তাই বলা হয়েছে,

“এ সম্পর্কে তাদের কোন জ্ঞান নেই। তারা অনুসরণ করে অনুমানের এবং অনুমান কখনই সত্যের স্থান নিতে পারে না।” (আল-কোরআন ৫৩:২৮)

এই ‘এমন কিছু মানুষ’ তারা দেবতাদের কাছে লভ্য কোন বিষয় বা বস্তু যাঞ্চা করে। তারা লোভ থেকে তাড়িত হয়ে তাদের আরাধনা করে। কিছু পাওয়ার আশায়। যদিও দেবতাদের তা বরাদ্দ দেয়ার সক্ষমতা ও অধিকার কোনটিই নেই। বস্তুত এক আল্লাহই সব বরাদ্দ দিয়ে থাকেন। তাই এভাবে বলা হয়েছে যে,

“যাদের মন বস্তুগত কোন প্রাপ্তির প্রত্যাশায় বিচ্যুত, তারা অপরাপর বিবিধ দেব-দেবতায় নিজেদেরকে সমর্পন করে এবং প্রাপ্তির প্রত্যাশা থেকে তারা তাদের নিজস্ব প্রকৃতি অনুসারে নির্দিষ্ট বিধি-বিধান অনুসরণ করে সেইসব দেবতাদের ভজনা-উপাসনা করে।

যখনই কেউ কোন দেব-দেবীর ভজনা করতে ইচ্ছে করে, আমি সেখানেই তার বিশ্বাসকে সুদৃঢ় করে দেই, যেন সে কোন নির্দিষ্ট উপাস্যতে একান্তভাবে নিজেকে নিয়োজিত রাখে।

তেমন বিশ্বাসে নিজেকে নিয়োজিত করে ভক্ত কোন নির্দিষ্ট দেব-দেবীর আনুকূল্য কামনা করে এবং তার প্রত্যাশিত বিষয় বা বস্তু লাভ করে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এই সকল সুবিধা, অনুগ্রহ বা কাম্য বস্তু আমি একাই প্রদান করি।” (গীতা ৭:২০-২২)

এই ‘এমন কিছু মানুষ’ তারা এমনটি করে প্রথমত: তাদের অজ্ঞতার কারণে এবং দ্বিতীয়ত: দ্রুত কোন কিছু প্রাপ্তির আকাঙ্খা থেকে। অর্থাৎ ভেতরের অস্থিরতার কারণে। তারা সাব্যস্তকৃত আল্লাহর অংশীদারদের প্রতি তাই তেমনি ভালবাসা প্রদর্শন করে যেমন ভালবাসা কেবলমাত্র আল্লাহর জন্যই প্রযোজ্য হতে পারে। বস্তুত অনুমান নির্ভর হয়ে তারা ভূল বা মিথ্যে কিছু

একটার আরাধনা করে। তারা মহামানব তূল্য গণ্য করে রাজনৈতিক নেতাদেরও আরাধনা করে ও কাম্য বস্তু লাভ করে।

বেশীরভাগ ধর্মীয় দর্শনই এক আল্লাহর কথা বলে। কিন্তু কিছু মানুষ অজ্ঞতা, লোভ ও উদ্দেশ্য প্রণোদিত ধূর্ততার কারণে আল্লাহর সঙ্গে অংশীদারী আরোপ করে। এর মাধ্যমে তারা আল্লাহ প্রদত্ত দিক-নির্দেশনাকে পাশ কাটিয়ে নানাবিধ দেবতাদের নাম করে নিজেদের রীতি বা বিধান চালু করার চেষ্টা করে। ন্যায়-বিচ্যুত রীতি প্রতিষ্ঠা করে অপরকে ঠকিয়ে জাগতিক সুযোগ-সুবিধা লুন্ঠন করে। ইসলামের দর্শনে তাই এ কাজটি নিষিদ্ধ।

সকলেই অবশ্য এ দোষে দুষ্ট হয় না। তারাই এ দোষে দুষ্ট যারা এসব রীতি-নীতির আদি স্রষ্টা। কিছু অনুসারী আবার এসব থেকে সুবিধা পায় বিধায় তারাও তেমন ধারণাকে ধরে রাখতে সচেষ্ট থাকে। কিছু আছে উদাসীনতা ও অজ্ঞতার দোষে দুষ্ট। তারা না জেনে না বুঝে পূর্ববর্তীদের অনুসরণ করে। শত শত বছরের ব্যাবধানে এগুলি সমাজে সাধারণের মাঝে এমন নিয়মে পরিণত হয় যে এসবের বেড়াজাল থেকে মানুষ মুক্ত হতে পারে না। তাদেরকে মুক্তি দিতেই মহামানবদের আগমন ঘটে।

▪ **২.১৬৫.২** এবং তাদের প্রতি তেমনি ভালবাসা পোষন করে, যেমন ভালবাসা কেবলমাত্র আল্লাহর প্রতি হয়ে থাকে- যারা বিশ্বাসী আল্লাহর প্রতি তাদের ভালবাসা ওদের তুলনায় বহুগুন বেশী : জ্ঞান বিবর্জিত, দুর্বল চিত্ত কিংবা অতি ধূর্ত কিছু মানুষ জাগতিক সুবিধা লুটে নেয়ার জন্য আল্লাহর সমকক্ষ (দ্রষ্টব্য ১.৪.১) কোন কিছুকে উপাস্য সাব্যস্ত করে। সৃষ্টিকর্তা আল্লাহর প্রতি যেমন ভালবাসা একজন মানুষের অন্তরে থাকার কথা, তারা নিজেদের তৈরী করা সেসব উপাস্যের প্রতি তেমনি ভক্তি-শ্রদ্ধা-ভালবাসা প্রদর্শন করে এবং অন্যদেরকেও এর অধীন করে ফেলার চেষ্টা করে। এগুলি করে তারা তাদের নিজেদের কাম্য বস্তু লাভ করার চেষ্টা করে।

কিছু আছে আরাধ্য দেবতাদের নামে নিজেদের সুবিধামতো নির্দেশনা জারী করে। যা আল্লাহর নির্দেশকেও পাশ কাটিয়ে যায় এবং অন্যায় কাজ করার সুযোগ করে দেয় [শিরক বা অংশীদারী দ্রষ্টব্য ২.২২]।

বলা হচ্ছে, যারা এগুলি করে বস্তুত আল্লাহর প্রতি সত্যিকার ও জ্ঞানসম্পন্ন বিশ্বাসীদের বিশ্বাস ও ভালবাসা তাদের উপাস্যদের প্রতি তাদের প্রদর্শিত বিশ্বাস ও ভালবাসার চেয়েও অনেক অনেক বেশী। কেননা তারা নিজেরাও জানে যে, পার্থিব সুযোগ-সুবিধা প্রাপ্তির প্রত্যাশায় তারা নিজেরা নিজ জ্ঞানে ও নিজেদের হাতে দেবতাতুল্য এসব সৃষ্টি করে। অর্থাৎ তারা মিথ্যে কোন কিছুর উপাসনা করে। ফলে মিথ্যের প্রতি তাদের বিশ্বাস-ভালবাসা কখনই আল্লাহর প্রতি বিশ্বাসীদের বিশ্বাস-ভালবাসার সমতুল্য নয়। তাই বলা হয়েছে যে, আল্লাহর প্রতি বিশ্বাসীদের ভালবাসা মিথ্যে উপাস্যের উপাসনাকারীদের তুলনায় বহুগুণ বেশী। কেননা জ্ঞান সব সময়ই সত্যের পথে চলে।

যেহেতু তাদের অন্তর এসব কর্মকান্ডের পেছনে তাদের নিজেদের লোভ-আকাংখা ও অজ্ঞতা সম্পর্কে অবগত, ফলে এসবের প্রতি তাদের সত্যিকারের ভালবাসা থাকে না। কিন্তু বিশ্বাসীরা জ্ঞানত ও হৃদয় দিয়ে তাদের আল্লাহকে ভালবাসে। তারা আল্লাহর সঠিক রূপ জানে না সত্য, তবে তারা কোন মিথ্যে রূপেরও উপাসনা করে না। অনুমানের ওপর নির্ভর করে কারও উপাসনা করে না। নিরাকারের উপাসনা করে। অর্থাৎ আকার বিষয়ে অবহিত নয়। যা সত্য প্রকাশ করে। অর্থাৎ বিশ্বাসীদের উপাসনা সত্যের ওপর প্রতিষ্ঠিত। ফলে এ দু'টির মধ্যে কোন তুলনাই হতে পারে না।

মানুষ যদি কেবল নিজেকে দিয়েও চিন্তা করে তবে বুঝতে পারবে যে, নিজে যার জন্য অন্তর দিয়ে করে সে যদি তাকে বাদ নিয়ে অন্যকে স্বীকার করে নেয়, তবে যত ভাল মানুষই হোক না কেন সে সেটি সহ্য করতে পারে না বা তেমন কর্মকে কখনই গ্রহণ করে নিতে পারে না। যদিও প্রতিক্রিয়ার প্রকাশ এক এক জনের এক এক রকম হতে পারে কিন্তু ফলাফল একই। অগ্রহণযোগ্যতা।

অকৃতজ্ঞ তেমন মানুষকে ও তার কাজকে অতি আপনজনও গ্রহণ করে নিতে পারে না। তাই আল্লাহ সব পাপ ক্ষমা করলেও তার সঙ্গে অংশীদারি আরোপ করার পাপ ক্ষমা করেন না। আল্লাহকে বুঝতে হলে তাই নিজেকে বুঝতে হবে সর্বপ্রথম।

তিনি মানুষের মাঝে সংযোগ স্থাপনের মাধ্যমে তার উপস্থিতি দিয়ে মানুষকে হৃদয় দিয়ে অনেক কিছুই উপলব্ধি করতে দেন। কিন্তু সবাই উপলব্ধি করতে

পারে না। কিছু আছে উদাসীন। কিছু আছে জাগতিক ও বস্তুগত কোনকিছু প্রাপ্তির প্রত্যাশায় এতই বিভোর যে সৃষ্টি ও গভীরের ভাবনা বিষয়ে ভাববারও সময় পায় না।

বিশ্বাসীগণ আল্লাহকে অন্তর দিয়ে ভালবাসে। তাদের আচরণই তাদেরকে বিষয়গুলি বুঝতে সহায়তা করে। অবাধ্য, ঔদ্ধত্যপূর্ণ আচরণকারী এবং অজ্ঞ ও উদাসীনরা বিষয়গুলি বুঝতে পারে না। তেমন আচরণকারী মানুষই বস্তুত অবিশ্বাসী যারা কিছুই বুঝতে চায় না। কেবল জাগতিক লোভ ও লাভটাই তাদের কাছে বড় হয়ে দেখা দেয়।

▪ **২.১৬৫.৩** কতই না উত্তম হত যদি তারা পার্থিব কোন কোন দুর্যোগ প্রত্যক্ষ করেই উপলব্ধি করে নিত যে যাবতীয় ক্ষমতা শুধুমাত্র আল্লাহর : আল্লাহর ক্ষমতার বিশালত্ব উপলব্ধি করার জন্য পার্থিব দুর্যোগ মানুষের জন্য এক নির্দশন। প্রচন্ড ও অপ্রতিরোধ্য। মানুষের ক্ষমতার নিয়ন্ত্রনের বাইরে। এটি কোন বৃহৎ শক্তির নিয়ন্ত্রনাধীন ব্যাতিত তো নয়!

মানুষের নিয়ন্ত্রনের বাইরে কোন বৃহতের নিয়ন্ত্রনাধীন বিষয়কেই তো আমরা আল্লাহর নিয়ন্ত্রনরূপে গন্য করি। জগত চলে সত্যের ওপর ভিত্তি করে। অর্থাৎ নিয়ম মেনে। আর আল্লাহই হচ্ছেন সত্য। সকল নিয়ম বা সূত্রের স্রষ্টা ও নিয়ন্ত্রক।

যা কিছু আল্লাহ সৃষ্ট নিয়ম, সূত্র বা নির্দেশ অমান্য করে সেটিকে পাপ, অন্যায় বা ভূল কাজ বলা হয়। তেমন মানুষকেই পথভ্রষ্ট বা ভূল পথগামী বলা হয়। যে নিয়মে জগত সুষ্ঠুভাবে চলে সে সে নিয়ম বা সূত্রের ব্যাত্যয় ঘটায়। ফলে জগত নিয়মে চলে না। সেটিকেই দূর্যোগ বলা হয়।

নিয়মের ব্যাত্যয় তথা ভূল বা অন্যায় কর্মই হচ্ছে পাপ। তাই বলা হয় মানুষের পাপের ফলেই দুর্যোগের আবির্ভাব ঘটে। যেমন– সবুজ পৃথিবীকে বৃক্ষহীন করা উচিত নয়। কিন্তু যারা নির্বিচারে বৃক্ষ নিধন করছে অথচ তার প্রতিস্থাপন করছে না তারা আল্লাহর নিয়ম ভঙ্গ করছে। যার ফলাফল দুর্যোগ। সেটি তার প্রতিষ্ঠিত নিয়মানুযায়ীই ঘটে। প্রতিষ্ঠিত সূত্রের ফলাফল অবধারিত।

যখন এবং যেখানে নিয়মের ব্যাত্যয় ঘটে তখন নিয়ম প্রতিষ্ঠায় বাইরের চাপ কার্যকর হয়। তখন দুর্যোগ প্রতিভাত হয়। এগুলি কাল্পনিক কথা নয়, সত্য। জগত সত্য, সূত্র বা নিয়মের ওপর প্রতিষ্ঠিত।

বস্তুত এটি হয় ভারসাম্য প্রতিষ্ঠার জন্য। অর্থাৎ নিয়মের পুনঃপ্রতিষ্ঠা বা নতুন শর্তে নতুন নিয়মের প্রবর্তন কিংবা একই নিয়মের পুনঃপ্রবর্তনস্বরূপ। স্বয়ংক্রিয়ভাবে এগুলি ঘটে। কেননা সৃষ্টিতেই সে সূত্র বিধাতা প্রতিষ্ঠা করে রেখেছেন।

আজকাল মানুষের হাতে তৈরী বস্তু বা বিষয়গুলিতেও যেমন অটোমেশনের ব্যাবস্থা আছে বিষয়গুলি ঠিক তেমনই। প্রকৃতিতে সে স্বয়ংক্রিয়তা যিনি সৃষ্টি করে রেখেছেন তিনিই বিধাতা। বিভিন্নজন তাঁকে বিভিন্ন নামে ডাকে। কোরআনের দর্শন সে শক্তিকেই আল্লাহ নামে অভিহিত করেছে।

যারা মূর্তী, জ্বিন, ফেরেশতা, মহামানব কিংবা যাদেরকে তারা আল্লাহর সমকক্ষ অংশীদার বলে মনে করে এমন দূর্যোগকালীন সময়ে তারা তাদেরকে রক্ষা করতে পারে না। তারাও তাদেরকে ভূলে যায়। তেমন সময় সকলেই আল্লাহর মুখাপেক্ষী হয়। কেউ তাঁকে ঈশ্বর, ভগবান বা গড বলে অভিহিত করে। তিনি একই জন।

সব দুর্যোগকে শাস্তি ভাবাও ঠিক নয়। অথবা ঠিক হতেও পারে কিন্তু আমরা হয়ত তার সূক্ষ্ণ কারণগুলি জানি না। যেমন কিছু ঘটে ঋতু পরিবর্তনের কারণে। একটা নিয়ম। মানুষের ভেতরে যেমন বয়োঃসন্ধিকালে পরিবর্তন ঘটে তেমন।

প্রাকৃতিক দুর্যোগসমূহ আমাদেরকে বুঝতে সহায়তা করে যে, মানুষ নিজেকে যত বড় ও ক্ষমতাবানই ভাবুক না কেন আসলে সে কত অসহায় এবং সে আল্লাহর আয়ত্বের মধ্যে বন্দি। তার পালাবার স্থান নেই।

মানুষ উন্নতির চরম শিখরে উঠেছে বলে দাবী করে। অথচ তার নিয়ন্ত্রনের বাইরে অন্যের নিয়ন্ত্রনেও অনেক কিছু আছে। প্রাকৃতিক দুর্যোগ তার একটি উদাহরণ। তাই বলা হয়েছে যে, কতই না উত্তম হত যদি তারা অর্থাৎ অবিশ্বাসীরা পার্থিব কোন কোন দুর্যোগ প্রত্যক্ষ করেই উপলব্ধি করে নিত যে, যাবতীয় ক্ষমতা শুধুমাত্র আল্লাহর এবং এ উপলব্ধিবোধ থেকে তারা আল্লাহতে বিশ্বাসী হত তবে কতই না উত্তম হত!

▪ **২.১৬৫.৪** এবং শাস্তি প্রদানে আল্লাহ অত্যান্ত কঠিন (And that Allah is severe in punishment) : আমরা জানি আল্লাহ অত্যান্ত দয়ালু ও করুণাময়। তবে একই সাথে তিনি শাস্তি প্রদানেও অত্যান্ত কঠিন [আল্লাহ দ্রষ্টব্য ২.২০.২]। বলা হচ্ছে,

"জেনে রেখ, শাস্তি প্রদানে আল্লাহ অত্যান্ত কঠোর, তবে একই সঙ্গে আল্লাহ ক্ষমাশীল, দয়ালু।" (আল-কোরআন ৫:৯৮)

"নিশ্চয়ই! তোমার প্রতিপালক ক্ষমা প্রদর্শনের অধিকারী এবং অধিকারী যন্ত্রনাদায়ক শাস্তি প্রদানের।" (আল-কোরআন ৪১:৪৩)

"(আল্লাহ বলেন) আমি আমার শাস্তি দ্বারা যাকে ইচ্ছে তাকে আঘাত করি এবং আমার দয়া সবকিছুকেই পরিব্যাপ্ত করে রাখে। আমি তা নির্ধারণ করব তাদের জন্য- যারা মন্দ কর্ম/পথ থেকে নিজেদের রক্ষা করে চলে ...।" (আল-কোরআন ৭:১৫৬)

আল্লাহ দয়ালু তাদের প্রতি যারা সীমালংঘন করে না। যারা তাঁর নির্দেশ মেনে চলে। কিন্তু যারা আল্লাহ নির্ধারিত সীমা লংঘন করে তাদেরকে তিনি শাস্তি দিতে কুন্ঠাবোধ করেন না। এটি এজন্য যে, তাঁর নির্দেশের অমান্যতা হচ্ছে জাগতিক বিশৃংখলা সৃষ্টির কারণ। কেননা আল্লাহ কখনই মন্দ কাজের নির্দেশনা দেন না। ফলে তাঁর নির্দেশের অমান্যতা হচ্ছে মন্দ কাজ করা।

আল্লাহর শাস্তি অত্যান্ত ভয়ানক, কঠিন ও বেদনাদায়ক। এটি কোরআনেই জানিয়ে দেয়া হয়েছে। তবে যারা ভূল বুঝতে পেরে ক্ষমা প্রার্থনা করে ও নিজেকে সংশোধন করে নেয় তাদের প্রতি তিনি ক্ষমাপ্রবণ হন।

আল্লাহর শাস্তি প্রদানের এ ক্ষমতার রয়েছে বিশাল গুরুত্ব। আল্লাহ যদি কেবল দয়াই প্রদর্শন করতেন এবং শাস্তি প্রদানের কঠোরতা প্রদর্শন না করতেন তবে দুষ্ট প্রকৃতির মানুষ এর সুযোগ নিত। দুষ্টের দমনে এর রয়েছে অত্যাধিক গুরুত্ব। পৃথিবীতে অনেক মানুষ আপনা থেকে ভাল হয়ে চলে আল্লাহর এ গুণে বিশ্বাসের কারণে।

আমরা নরকের যে বর্ণনা শুনি সেটি তার শাস্তি বাস্তবায়ন প্রক্রিয়ার একটি অংশ মাত্র। এর দ্বারা তিনি খারাপদেরকে যতটা শাস্তি দেন তার চেয়ে অধিক

ভালদেরকে স্বস্তি ও নিরাপত্তা দান করেন। তাই আল্লাহর এ শাস্তির বাণী তাঁর দয়ারই অন্তর্ভূক্ত একটি বিষয়। ভালদের জন্য আশীর্বাদস্বরূপ।

এখানে শাস্তি প্রদানে যেমন নরকের আগুনের কথা বলা হয়েছে, আবার অন্তরের জ্বালা বা অগ্নুত্তাপের কথাও বলা যেতে পারে। তিনি এমন ব্যাবস্থা গ্রহণ করবেন যে মানবের অন্তরজ্বালাও বৃদ্ধি পাবে। এটিও মারাত্মক শাস্তি। এটি ইহজগতেও মানুষ ভোগ করে এবং দোজখের স্বাদ আস্বাদন করে। যেমন বলা হয়েছে,

"আহ্! কে তোমাকে জানাবে যে 'হুতামা' (নরক) কি! এটি আল্লাহর প্রজ্বলিত সেই অগ্নি যা মানুষের হৃদয় পর্যন্ত পৌঁছুবে।" (আল-কোরআন ১০৪:৫-৭)

আল্লাহ বলেন, "বল: তিনি তোমাদেরকে উর্ধ্বালোক কিংবা পাদদেশ থেকে কিংবা তোমাদেরকে দলে-উপদলে বিভক্ত করে একের দ্বারা অন্যকেও শাস্তির স্বাদ আস্বাদন করাতে সক্ষম। দেখ, কিরূপে আমি নিদর্শনাবলী বর্ণনা করি যেন তোমরা বুঝতে সক্ষম হও।" (আল-কোরআন ৬:৬৫)

অর্থাৎ আল্লাহর ব্যাবস্থাপনায় আছে কত রকমের উপায়। আমরা সামান্য কিছু জানি মাত্র। যতটুকু তিনি প্রকাশ করেছেন। কিন্তু আল্লাহর সবকিছুই সীমাহীন! মানুষ সবকিছু জানেও না। যেমন গীতায় বলা হয়েছে,

"আমার দিব্য ঐশ্বর্য্যের কোন অন্ত নেই।" (গীতা ১০:৪০)

▪ **২.১৬৬-২.১৬৭** আল্লাহর পরিবর্তে তারা যাদের অনুসরণ করে, শেষ দিবসে তারা যখন তাদের প্রতি অস্বীকৃতি প্রদর্শন করবে এবং শাস্তি প্রত্যক্ষ করবে, তাদের সকল লক্ষ্য (সম্পর্ক) ব্যার্থতায় পর্যবেশিত হয়ে যাবে এবং যারা অনুসারী ছিল তারা বলবে, যদি একবার পৃথিবীতে আমাদের ফিরে যাবার সুযোগ হত, তবে আমরাও তাদের প্রতি তেমনি অস্বীকৃতি প্রদর্শন করতাম, যেমন তারা আমাদের প্রতি অস্বীকৃতি প্রদর্শন করছে। এভাবেই আল্লাহ তাদেরকে তাদের কৃতকর্ম প্রদর্শন করে অনুতপ্ত করে তুলবেন এবং তারা আগুন থেকে কখনই বের হবে না : এ দু'টি আয়াতের মর্মকথা অত্যান্ত গুরুত্বপূর্ণ। এখানেও মূলত শিরক বা আল্লাহর সঙ্গে কোনরূপ অংশীদারীত্ব আরোপ করা বা সাব্যস্ত

করা বা তাঁর সমকক্ষ কাউকে বা কোন কিছুকে গণ্য করার পরিণাম সম্পর্কে বলা হয়েছে।

এ পরিণাম সত্যের বা সূত্রের কারণে ঘটে থাকে। যেসব সূত্র সৃষ্টিকালেই বিধাতা প্রতিষ্ঠা করে রেখেছেন। তাই বলা হয় সত্যের ওপর ভিত্তি করে এ জগত সৃষ্টি। যার অন্যথা হওয়া সম্ভব নয় কেবলমাত্র আল্লাহর ইচ্ছে ব্যাতিত।

কোরআনের মাধ্যমে দয়াময় আল্লাহ মানুষকে সূত্রটি জানিয়ে দিয়েছেন। যেন মানুষ বিষয়গুলি বোঝে, সতর্ক হয় এবং নিজেকে রক্ষা করে চলতে পারে। দয়াময় মানুষের হিতার্থেই বিষয়গুলি তুলে ধরেছেন। কেউ উপদেশ গ্রহণ করতে পারে। কেউ গ্রহণ নাও করতে পারে। প্রত্যেকেরই নিজের বিচার-বিবেচনার বিষয় এটি। কেউ সূত্রের সত্যতা বা পরিণাম দেখার জন্য অপেক্ষাও করতে পারে।

এখানে বাস্তব জীবনের উদাহরণ তুলে ধরে তেমন ভূল কাজ করার পরবর্তী পরিণাম সম্পর্কে বলা হয়েছে। বোধসম্পন্ন যে কোন মানুষ বাস্তবতার নিরিখে তুলে ধরা এ উদাহরণকে যথাযথ বিবেচনা না করে পারবে না। এমনকি ইহজগতেও মন্দ কর্মকান্ডের দুঃখজনক পরিণাম মানুষ পেয়ে থাকে, আবার দেখেও থাকে। বিষয়গুলিকে অনুধাবন করতে হবে।

সাধারণভাবে মানুষ জানে বা বোঝে যে, যারা আল্লাহর সঙ্গে কোনরূপ অংশীদার সাব্যস্ত করে তারা জ্বিন, ফেরেশতা বা কোন মূর্তী অর্থাৎ প্রতীকী কোন দেবতার উপাসনা বা আরাধনা করে। অর্থাৎ তারা মূলত আল্লাহরই রাজত্বে বিশেষ কোন দায়িত্বে নিয়োজিত কারও উপাসনা করে। দেবতাদের উপাসনাকারীরা তাদের উপাসনার মাধ্যমে বস্তুত দেবতাদের আনুকূল্য কামনা করে। তারা উপাসনার মাধ্যমে দেবতাদের নিয়ন্ত্রনে থাকা বিশেষ কোন বিষয় বা বস্তু যাচ্ঞা করে। গীতায় বিষয়টিকে সুন্দরভাবে তুলে ধরা হয়েছে। বলা হচ্ছে,

“যাদের মন বস্তুগত কোন প্রাপ্তির প্রত্যাশায় বিচ্যুত, তারা অপরাপর বিবিধ দেব-দেবতায় নিজেদেরকে সমর্পন করে এবং প্রাপ্তির প্রত্যাশা থেকে তারা তাদের নিজস্ব প্রকৃতি অনুসারে নির্দিষ্ট বিধি-বিধান অনুসরণ করে সেইসব দেবতাদের ভজনা-উপাসনা করে। ... ‘স্বল্প জ্ঞানের’ মানুষ দেব-

দেবীদের উপাসনা করে, অথচ তাদের প্রদত্ত ফল অত্যান্ত সীমিত ও ক্ষণস্থায়ী।" (গীতা ৭:২০-২৩)

সত্য হচ্ছে যে, এ তালিকায় কেবল জ্বিন, ফেরেশতা বা দেবতাই নয়, এমনকি মানুষও পরতে পারে। অর্থাৎ নেতা-নেত্রী থেকে শুরু করে এমনকি ধর্মগুরু বা ভালবাসার কোন মানুষ বা শ্রদ্ধাভাজন কোন ব্যাক্তিবিশেষও তেমন দেবতাতূল্য হয়ে যেতে পারে।

এটা হবে তখন যখন তাদের প্রভাব কারও ওপরে পড়বে এবং সে প্রভাবের কারণে অনুসারীরা নিজ জ্ঞানে ভাল-মন্দ বিচার না করে মন্দ কাজ করবে। এমনকি আল্লাহর সুস্পষ্ট নির্দেশনা থাকা সত্বেও সে নির্দেশনাকে উপেক্ষা করে দেবতাতূল্যদের নির্দেশনা পালন করবে।

বস্তুত পার্থিব সুযোগ-সুবিধা ও তাৎক্ষণিক কোন কিছু পাওয়ার জন্যই অনুসারীরা তেমনটি করে। তারা এটি করে লোভের কারণে সত্য বিবর্জিত হয়ে। এভাবেই আল্লাহ মানুষকে চিনে নেন। তাই এ জীবন হচ্ছে এক পরীক্ষাক্ষেত্র।

'যা কিছু' মানুষকে আল্লাহর নির্দেশনা উপেক্ষা করতে উদ্বুদ্ধ বা অনুপ্রাণীত করে তাই হচ্ছে 'তাগুদ' [তাগুদ দ্রষ্টব্য ২.২২১, ২.২৫৬.৩, ২.২৫৭.১]। তাগুদ মানুষকে 'শিরক' এর পাপ করতে উদ্বুদ্ধ করে। 'শিরক' এর পাপ হচ্ছে কাউকে আল্লাহর সমপর্যায়ে গণ্য করা বা আল্লাহর সমকক্ষ কোন কিছুকে প্রতিষ্ঠা করা।

মানুষ যখন 'শিরক' করে তখন সত্য বিচ্যূত অন্তর তাগুদকে আল্লাহর নির্দেশনা জারীর সমপর্যায়ে নিয়ে যায় বা আল্লাহর সমকক্ষ বা তারও উর্ধ্বে স্থান দেয়। ফলে তাগুদের নামে জারী করা নির্দেশনা বা তার প্রেরণা অনুসারীরা অনুসরণ ও পালন করে।

সমস্যার সৃষ্টি হয় তখন যখন আল্লাহ যা নিষেধ করেছেন তাগুদের নামে তেমন নির্দেশনাও জারী করা হয়, কিংবা অনুসারীদেরকে এমনভাবে প্রলুব্ধ করা হয় যে কৌশলে তাদেরকে দিয়ে কোন মন্দ বা অন্যায় কাজ করিয়ে নিজেদের স্বার্থ হাসিল করা হয়। [শিরক বা অংশীদারী দ্রষ্টব্য ২.২২]।

নেতা-নেত্রীদের মান্য করায় কোন সমস্যা নেই। জাগতিক শৃংখলার স্বার্থে সেটি প্রয়োজন আছে বা করতেও হবে। কিন্তু যখন তা আল্লাহর সুস্পষ্ট নির্দেশনাকেও ভঙ্গ করে তখন সে মান্যতা শিরক এর পর্যায়ে পড়ে যায়। অর্থাৎ নির্দেশদাতাকে অনুসারীরা তখন আল্লাহর সমকক্ষ বা তারও উর্ধ্বে স্থান দেয়। যার কারণে আল্লাহর নির্দেশনাও সে ভঙ্গ করে। শিরক এর সমস্যাটি এখানেই।

'তাগুদ' মানুষকে দিয়ে এমন কাজ করায় যা আল্লাহর নির্দেশনাকেও উপেক্ষা করিয়ে মানুষকে দিয়ে মন্দ কাজ করায়। তাই যেখানেই এমন সমস্যা সৃষ্টি হওয়ার বিন্দু পরিমাণ সম্ভাবনা থাকে- এ দর্শনে তেমন কাজ করাকে নিরুৎসাহিত বা কঠোরভাবে নিষেধ করা হয়।

উদাহরণস্বরূপ বলা যেতে পারে যে, আল্লাহর সুস্পষ্ট নির্দেশনা হচ্ছে বিচারের ক্ষেত্র ব্যাতিত কোন মানুষকে হত্যা না করা। কেননা সেটি অন্যায় বা পাপ। কিন্তু কোন অনুসারী অতি উৎসাহী হয়ে তার নেতা বা গুরুর নির্দেশে তেমন অন্যায় কাজ করতে পারে। এখানে নেতা বা গুরু হচ্ছে সেই 'তাগুদ' যে কিনা অনুসারীকে দিয়ে নিজ স্বার্থে এমন কাজ করিয়ে নিল যা আল্লাহও নিষেধ করেছেন। এভাবে তারা উভয়েই আল্লাহর সুস্পষ্ট নির্দেশনাকে লংঘন করে। আবার একইভাবে আল্লাহ যেটি করতে বলেছেন সেটিকেও বারণ করে।

পূর্বেও উল্লেখ করেছি যে, পার্থিব সুযোগ-সুবিধা প্রাপ্তির আশায় অনুসারীরা তাগুদের কারণে এমন কাজ করে। তারা এটি করে অতি লোভ ও সত্যের জ্ঞান বিবর্জিত হয়ে।

কেউ স্ত্রীকে অত্যাধিক ভালবেসে তার কথায় এমন অন্যায় কাজ করতে পারে যা আল্লাহও নিষেধ করেছেন। সেক্ষেত্রে স্ত্রীও তেমন মানুষের জন্য তাগুদস্বরূপ হয়ে যায়। যা কিছু অন্তরে বা ধারণায় আল্লাহর সমকক্ষ বা তারও উর্ধ্বে স্থান পায় তাই 'তাগুদ'। তাগুদকে এমন পর্যায়ে গণ্য করা হয় যার উছিলায় বিবেক-বিবেচনা বিচ্যুত হয়ে আল্লাহর সুস্পষ্ট নির্দেশনাকেও উপেক্ষা করা সম্ভব হয়।

তাগুদকে মাধ্যম ধরে সমাজে ও মানব মস্তিষ্কে 'শিরক' এর পাপ প্রবেশ করান হয়। অতঃপর তাকে কাজে লাগিয়ে আল্লাহ প্রদত্ত ন্যায়সম্মত

নির্দেশনাকেও পাশ কাটিয়ে স্বার্থ হাসিল করা হয়। আল্লাহর ন্যায়সঙ্গত নির্দেশনা ভঙ্গ করাই সমাজে অন্যায় প্রবেশের পথকে সুগম করে দেয়।

'তাগুদ' 'শিরক'কে উৎসাহিত করে এবং এর মাধ্যমে সমাজে মারাত্মক রকমের মন্দ, অন্যায় বা পাপ কাজের অনুপ্রবেশ ঘটে। যাকে বাধা দেয়ার আর কেউ থাকে না। কেননা সে সর্বোচ্চ পর্যায়কে অতিক্রম করে যায়। আল্লাহ সৃষ্ট জাগতিক নিয়ম, সূত্র বা সত্যের শৃংখলাকে ভঙ্গ করে দেয় 'শিরক' এর দোষে দুষ্ট সমাজ। যার মন্দ প্রভাব সমগ্র মহাবিশ্বেও ছড়িয়ে পড়ে। বিশৃংখলার সৃষ্টি হয়। সৃষ্টি ধ্বংসের কারণে পরিণত হয় 'শিরক'। তাই এটি মহা অন্যায়। অন্যায়-অন্যায্য কাজই পাপে পরিণত হয়। যে পাপের ফল মানুষকে ভোগ করতে হয়। অথচ আল্লাহ কখনই অন্যায়-অন্যায্য কিংবা কোন মন্দ কাজের নির্দেশনা দেন না।

'শিরক' এমন এক পাপ যা আল্লাহ সৃষ্ট সত্য বা সূত্রকে নাজুক অবস্থায় ফেলে দেয়। এর সাথে অকৃতজ্ঞতার একটি সম্পর্ক আছে যা সৃষ্টির সূত্রের সম্পর্কগুলিকে বিচলিত করে। ফলে সব কর্ম স্থবির হয়ে যায়। সামনে অগ্রসর হতে চায় না; কিংবা সহজ-সরল পথের সূত্রের বাইরে কাজ করে। মাত্রা ছাড়িয়ে গেলে আল্লাহ নিয়মের পুনঃ প্রবর্তন করেন। সে প্রক্রিয়ার শুরুই সৃষ্টি ধ্বংসের কারণরূপে প্রতিভাত হয়।

'শিরক' এমনকি আল্লাহর দৃষ্টিতেও এত বড় মাত্রার পাপ যে আল্লাহ সব পাপ মাফ করলেও এটি করেন না। তেমন সূত্রেই সব সৃষ্ট। মানুষ নিজেকে দিয়েও অকৃতজ্ঞ আচরণের ভয়াবহতা উপলব্ধি করতে পারে। তবে যারা তেমন অভিজ্ঞতার মুখোমুখী হননি তাদের উচিৎ উপদেশ মেনে চলা কিংবা তারা অভিজ্ঞতা অর্জনের জন্য অপেক্ষাও করতে পারেন।

ক্ষুদ্র আঙ্গীকে সাধারণভাবে মানুষ সমাজে 'শিরক' এর প্রভাব বা এর ভয়াবহতা বুঝতে পারে না। যেমন প্রচন্ড ক্ষমতা থাকা সত্বেও সাধারণ মানুষ পরমানুর শক্তিমত্তা সম্পর্কে জানে না বা ধারণা করতে পারে না। খালি চোখে দেখা যায় না বা বোঝা যায় না বিধায় মানুষ এর সক্ষমতা বুঝতে পারে না। যেমন একটি অতি ক্ষুদ্র ভাইরাসও মৃত্যু বা জীবন ধ্বংসের কারণ হতে পারে।

নেতা-নেত্রী থেকে শুরু করে এমনকি কাছের মানুষও যদি আল্লাহ নির্দেশিত কোন নিষিদ্ধ কাজ করতে বলে তবুও সেটি করা যাবে না। সবচেয়ে কাছের তো 'সৃষ্টিকর্তা নিজে' এটিও বুঝতে হবে। 'শিরক' অন্যদের তথা 'তাগুদ'কে মান্যতা দানের মাধ্যমে আল্লাহর নির্দেশনাকেও উপেক্ষা করে চলার সক্ষমতা দেয় এবং নিজেদের মতো করে যে কোন মন্দ কাজ করাকে সম্ভব করে তোলে। অথচ আল্লাহ কখনই অন্যায়-অন্যায্য কিংবা কোন মন্দ কাজের নির্দেশনা দেন না।

'তাগুদ' এর জ্বলন্ত উদাহরণ হচ্ছে নবী ইয়াহহিয়ার মৃত্যু। এক নর্তকীর অনুরোধে নবী ইয়াহহিয়া বা 'জন দ্যা ব্যাপ্টিষ্ট'কে হত্যা করা হয়েছিল। অথচ মানুষ হত্যা করা আল্লাহর সুস্পষ্ট নির্দেশনার বাইরে। তাই 'শিরক' এর পাপের বিষয়টিকে ভালভাবে বুঝতে বা অনুধাবন করতে হবে। অন্ধ অনুসারীরা তাগুদের দ্বারা এতটাই প্রভাবিত হয় যে তারা আল্লাহর সুস্পষ্ট নির্দেশনাও লংঘন করে কাজ করে। তাই বলা হয়েছে,

"আল্লাহর পরিবর্তে তারা (অর্থাৎ অনুসারীরা) যাদের (অর্থাৎ যে সব তাগুদের) অনুসরণ করে, শেষ দিবসে তারা (তাগুদসমুহ) যখন তাদের (অনুসারীদের) প্রতি অস্বীকৃতি প্রদর্শন করবে এবং শাস্তি প্রত্যক্ষ করবে, তাদের (অনুসারীদের) সকল লক্ষ্য (সম্পর্ক ও প্রাপ্তির প্রত্যাশা) ব্যার্থতায় পর্যবেশিত হয়ে যাবে।"

বলা হচ্ছে যে, শেষ বিচার দিবসে আল্লাহ যেদিন মানুষের কর্মের হিসেব নেবেন, সেদিন তাগুদের অনুসারী অন্যায়কারীরা নেতা-নেত্রী বা কোন তাগুদের ওপর অন্যায় কাজের হুকুমদাতারূপে দোষ চাপাবার চেষ্টা করবে। কিন্তু আল্লাহর সম্মুখে নেতা-নেত্রী থেকে শুরু করে ধর্মগুরু বা যে কোন তাগুদ তাদের সে অভিযোগ অস্বীকার করবে।

অনুসারীদের নিজেদের করা মন্দ কাজের দায় তখন নিজেদেরকে বহন করতে হবে। তারা শাস্তির মুখে পতিত হবে। তাগুদের অনুগত অনুসারীরা মন্দ কাজ করে দেয়ার বিনিময়ে যা কিছু প্রাপ্তির প্রত্যাশা করেছিল, শাস্তি প্রত্যক্ষকালে তাদের সকল লক্ষ্য ব্যার্থতায় পর্যবেশিত হয়ে যাবে। এখানে সে কথা বলা হয়েছে। অতঃপর বলা হচ্ছে,

"এবং যারা অনুসারী ছিল তারা বলবে: যদি একবার পৃথিবীতে আমাদের ফিরে যাবার সুযোগ হত, তবে আমরাও তাদের প্রতি তেমনি অস্বীকৃতি প্রদর্শন করতাম, যেমন তারা আমাদের প্রতি অস্বীকৃতি প্রদর্শন করছে। এভাবেই আল্লাহ তাদেরকে তাদের কৃতকর্ম প্রদর্শন করে অনুতপ্ত করে তুলবেন এবং তারা আগুন থেকে কখনই বের হবে না।"

তাগুদের অনুসারীরা যখন শাস্তি প্রত্যক্ষ করবে তখন তারা বুঝতে পারবে এবং অনুতপ্ত হবে এবং বলবে যে, যদি আর একবার পৃথিবীতে আমাদের ফিরে যাবার সুযোগ হত, তবে আমরাও তাদের অর্থাৎ নেতৃত্ব বা হুকুমদাতাদের প্রতি তেমনিভাবে অস্বীকৃতি প্রদর্শন করতাম, যেমন অস্বীকৃতি তারা আমাদের প্রতি এখন (শেষ বিচার দিবসে) প্রদর্শন করছে। অর্থাৎ শিরক এর পাপ করতাম না। আল্লাহর নির্দেশনা মতো চলতাম এবং মন্দ কাজ করতাম না।

তখন তারা অনুতপ্ত হবে। কিন্তু ততদিনে পার্থিবজীবন নামক পরীক্ষা শেষ হয়ে গেছে। এবার ফল ভোগের পালা। তারা আগুন তথা নরক বা এ অন্তর্জ্বালা থেকে কখনই বের হতে পারবে না। এভাবেই আল্লাহ তাদেরকে তাদের কৃতকর্ম প্রদর্শন করে অনুতপ্ত করে তুলবেন। এখানে সে কথা বলা হয়েছে।

পূর্বে উল্লেখ করেছি যে, আল্লাহর সীমাহীন ব্যাবস্থাপনা বিষয়ে মানুষ সব জানে না। এ আগুন অন্তরের আগুন বা জ্বালাও হতে পারে। যে যন্ত্রনা চির জীবন তাদেরকে কুড়ে কুড়ে খাবে। সে যন্ত্রনা থেকে তারা কখনই বের হতে পারবে না। অর্থাৎ চিরকাল এ শাস্তি ভোগ করবে। নরক যন্ত্রনা বাইরের পরিবেশ দ্বারা হতে পারে আবার ভেতরেও হতে পারে। আল্লাহ জানেন।

ইহজগতে যারা কোন না কোন লোভের বশবর্তী হয়ে মন্দ কাজ করেছে, বিচার দিবসে তাদের পরিণাম বিষয়ে কথোপকথনের মাধ্যমে তার একটি চিত্র তুলে ধরা হয়েছে এখানে, যেন সাধারণ মানুষ বিষয়গুলি সহজভাবে জানতে ও বুঝতে পারে এবং সতর্ক হয় এবং যেন মন্দ কাজ পরিত্যাগ করে ও সহজ-সরল পথে চলে।

বিষয়গুলি জেনে-বুঝে নিজেদেরকেই সচেতন হয়ে পথ চলতে হবে। অন্যথায় মন্দ কাজের ফলাফল নিজেদেরকেই ভোগ করতে হবে। প্রত্যেকের কর্মের পরিণাম তার নিজ কাঁধে (দ্রষ্টব্য আল-কোরআন ১৭:১৩)।

আল্লাহর যথাযথ নির্দেশনা বিষয়ে জানা থাকতে হবে। আল্লাহ কোন মন্দ বা অন্যায্য কাজের আদেশ দেন না। তাই নিজেকে রক্ষার জন্য হলেও নিজ দায়িত্বেই সঠিক জ্ঞান অর্জন করতে হবে; কিংবা নিজ জ্ঞান ও প্রজ্ঞাকে কাজে লাগিয়ে কৌশলে ও দৃঢ়তার সাথে সহজ-সরল ও ভাল পথে চলতে হবে। মন্দ পথ ত্যাগ করতে হবে। উল্লেখ্য যে, জেনে-বুঝে মন্দ কাজ করা এবং না জেনে-বুঝে মন্দ কাজ করা এক অর্থে দুটোই পাপ। তাই জানাটাও কর্তব্যের মধ্যে পড়ে। যদিও পরিপূর্ণ বিবেচনা আল্লাহর হাতে।

আল্লাহর নির্দেশনা বিষয়ে জানা প্রত্যেকের কর্তব্যের মধ্যে পড়ে। নিজেকে রক্ষার জন্য বা নিজ স্বার্থেও সেটি প্রয়োজন। আবার একটি দল আল্লাহর যথাযথ বিধানের প্রচার-প্রচারণার কাজেও নিয়েজিত থাকতে হবে যেটি মানবসমাজের সামষ্ঠিক দায়িত্ব ও কর্তব্যের মধ্যে পড়ে।

সবকিছুই বস্তুত সমাজ ও জগতের শান্তি ও শৃংখলা রক্ষার স্বার্থে প্রয়োজন। যেন অতি লোভীরা মানুষকে বঞ্চিত করে নিজেরা একাই এমন কিছু ভোগ না করতে পারে যা আর্থ-সামাজিক বিশৃংখলা সৃষ্টি করে, জীবন ও জগতকে অশান্ত করে তোলে এবং মাত্রা ছিাড়িয়ে গেলে ধ্বংসের কারণ হয়ে দেখা দিতে পারে।

উল্লেখ্য যে, যে কাজ করা অন্যায়, যে কাজ সমাজ, সংসার ও জগতকে অস্থীর, বিশৃংখল ও অস্থীতিশীল করে এখানে তেমন মন্দ কাজ করার পরিণামস্বরুপ শাস্তির কথা বলা হয়েছে। শাস্তি প্রদানের এছাড়া অন্য কোন কারণ নেই।

অবিশ্বাসীরা প্রধানত পরকাল ও পরকালের বিচার ব্যাবস্থাকে মানে না বা এক অর্থে আল্লাহর বিদ্যমানতাকেই স্বীকার করে না, তাই তাদের ভেতরে অন্যায় বা পাপের প্রায়শ্চিত্তকরণের কোন ভয় থাকে না। তাদের দ্বারা জগতে যে কোন অনাসৃষ্টি করা সে কারণে সম্ভব হয়ে ওঠে। তাই অবিশ্বাসী কথাটির সাথে শাস্তি কথাটির একটি সহ-সম্পর্ক সৃষ্টি হয়। এছাড়া অন্য বড় কোন কারণ নেই। অবিশ্বাসী কথাটির সাথে বিষয়গুলিকে এভাবে ধরে নেয়া হয়।

দর্শনে বিষয়গুলিকে এভাবেই ধরে নেয়া হয়েছে যে, অবিশ্বাসীদের দ্বারা আল্লাহ প্রতিষ্ঠিত যথাযথ ও সত্য ধর্ম তথা চলার সহজ-সরল পথ ভঙ্গ করা সম্ভব এবং এই ভঙ্গ করার কারণ হেতু তাদের দ্বারা যে কোন মন্দ কাজ বা জাগতিক অনাসৃষ্টি সৃষ্টি করা সম্ভব; তাই যৌক্তিকভাবেই তাদের ওপর শাস্তির বার্তা বর্তায় [অবিশ্বাসী দ্রষ্টব্য ২.৩.১]। কিন্তু অবিশ্বাসী যদি মন্দ কাজ না করে তবে তো সে আল্লাহর নির্দেশনার মধ্যেই আছে! সেটিও বুঝতে হবে। তাই বলা হয়েছে,

"সত্য প্রত্যাখ্যানে সব মানুষের এক মতাবলম্বী হয়ে যাওয়ার আশংকা না থাকলে, যারা দয়াময়কে অস্বীকার করে আমি তাদেরকেও দিতাম তাদের গৃহের জন্য রৌপ্য নির্মিত ছাদ ও সিড়ি, যেখানে তারা আরোহন করত এবং তাদের গৃহের জন্য দরজা ও পালংক যেখানে তারা বিশ্রাম নিত এবং স্বর্ণ নির্মিত অলংকার।" (দ্রষ্টব্য আল-কোরআন ৪৩:৩৩)

অর্থাৎ সর্বোচ্চ গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে সত্যের পথে থাকা। সত্যকে প্রত্যাখ্যান করে মন্দ ও মিথ্যে কাজ না করা। মন্দ কাজ না করলে যারা দয়াময়কে অস্বীকার করে তিনি তাদেরকেও পুরস্কৃত করতেন। এ জগত দাড়িয়েই আছে সত্য বা আল্লাহর প্রতিষ্ঠিত যথাযথ নিয়ম বা সূত্রের ওপর ভিত্তি করে। বলা হচ্ছে,

"আল্লাহ নভোমণ্ডল ও ভূ-মণ্ডল সত্য দ্বারা সৃষ্টি করেছেন যেন প্রত্যেককে তার কৃতকর্মের ফল প্রদান করা যায়। তাদের প্রতি কোনরূপ অন্যায় করা হবে না।" (আল-কোরআন ৪৫:২২)

উল্লেখ্য যে, সত্য কি সেটিও বুঝতে হবে [এ বিষয়ে লেখকের 'সত্য' বই দ্রষ্টব্য]। অবিশ্বাসীরা যেহেতু বিচার দিবসে বিশ্বাসী না, তাই তাদের ভেতরে অন্যায় কাজের জবাবদিহিতা ও প্রায়শ্চিত্তকরণের ভয় নেই। তাদের দ্বারা যে কোন প্রকার মন্দ কাজ করা সম্ভব। দর্শনে বিষয়গুলিকে এভাবে ধরে নেয়া হয়। তাই অবিশ্বাসী কথাটির সাথে শাস্তি কথাটির একটি সহ-সম্পর্ক সৃষ্টি হয়।

সে কারণে যখনই অবিশ্বাসী কথাটি বলা হয় তখনই শাস্তির কথাটি চলে আসে। তবে সব অবিশ্বাসীও এক নয়। অনেক অবিশ্বাসী আছে যারা বিশ্বাসীর চাইতেও দৃঢ়ভাবে সত্যের ওপর প্রতিষ্ঠিত। গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে সত্যে অধিষ্ঠিত

থাকা। বস্তুত সত্যে অধিষ্ঠিত থাকার প্রয়োজনেই বিশ্বাস-অবিশ্বাসের দর্শনের প্রয়োজনীয়তা ও তার সৃষ্টি। যদি উদ্দেশ্যই অর্জন না হয় তবে বিশ্বাস কিংবা দর্শন প্রসূত বিবিধ নিয়ম-বিধি পরিপালন অর্থহীন।

মানুষের মধ্যে যারা জ্ঞান ও বোধসম্পন্ন; যাদের ভেতরে ভাল বোধগুলি সদা জাগরুক। তারা জ্ঞানের কারণেই মন্দ কাজ করে না। মন্দ কাজ না করলে মন্দ ফলাফল প্রাপ্তির কোন কারণ নেই। সত্যি বলতে জ্ঞানপ্রাপ্ত মানুষ প্রভূত কল্যাণপ্রাপ্ত। এটি বিধাতার শ্রেষ্ঠ উপহার বা দানগুলির অন্যতম। বলা হচ্ছে,

"তিনি যাকে ইচ্ছে তাকে বিশেষ জ্ঞান/প্রজ্ঞা (হিকমত) দান করেন এবং যাকে বিশেষ জ্ঞান/প্রজ্ঞা দান করা হয়, সে প্রকৃত অর্থেই প্রভুত কল্যাণপ্রাপ্ত। তবে উপলব্ধি বোধসম্পন্ন মানুষ ব্যতিত কেউই তা স্মরণ বা শিক্ষা গ্রহণ করে না।" (আল-কোরআন ২:২৬৯)

জ্ঞানই একমাত্র মাধ্যম যে মানব অন্তরকে যৌক্তিকভাবে ভাল পথ অবলম্বনের প্রয়োজনীয়তাকে উপলব্ধি করিয়ে দিতে পারে। তা সে বিশ্বাসী হোক কিংবা না হোক। জ্ঞান আত্মাকে এমন পর্যায়ে উন্নীত করে দিতে পারে যখন মানুষ নিজ থেকে ভাল হয়ে চলার প্রয়োজনীয়তাটুকু অন্তর দিয়ে অনুধাবন করে। এমনকি ভাল পথ অবলম্বনের জন্য তখন কোন বিশ্বাসেরও আর প্রয়োজন হয় না।

বিশ্বাস ও জ্ঞান মানুষকে কোন ধর্ম বা দর্শনের ওপর সুপ্রতিষ্ঠিত রাখতে সহায়তা করে। অথচ কেবল জ্ঞান একাই একটি দর্শন সৃষ্টিতেও সক্ষম।

বিশ্বাসীর চেয়েও তাই জ্ঞানীর মর্যাদা উচ্চ স্তরে। আর জ্ঞানী যদি হয় বিশ্বাসী তবে সে সর্বশ্রেষ্ঠ। জ্ঞানহীন বিশ্বাসী কচুপাতার পানির মতো টলটলায়মান। অপরদিকে বিশ্বাসহীন জ্ঞানী জ্ঞানের কারণেই সত্যে বিশ্বাসী। তাই বলা হয়েছে,

"তোমাদের মধ্যে যারা বিশ্বাসী এবং যারা জ্ঞানসম্পন্ন আল্লাহ তাদেরকে উচ্চ মর্যাদা দান করবেন।" (আল-কোরআন ৫৮:১১)

জ্ঞান মানুষকে তার অনুধাবিত সত্যের সঙ্গে কঠিন বন্ধনে আবদ্ধ করে ফেলে। ফলে বিশ্বাস যেমন মানুষকে কোন ধারণায় বেধে ফেলে, জ্ঞানও তাই

করে এবং সেটি করে বিশ্বাসকে মাধ্যম ধরে। কেননা সত্যের জ্ঞানটিই বিশ্বাসে পরিণত হয়। জ্ঞান দ্বারা সৃষ্ট বিশ্বাস বিশ্বাসীকে নিজ জ্ঞানে অনুধাবিত সত্যের ওপর দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত রাখতে সক্ষম।

তবে বহুসংখ্যক মানুষের ব্যাবস্থাপনার সুবিধার জন্য দর্শনকে আদর্শিকভাবে বিশ্বাসী-অবিশ্বাসী এভাবে ভাল-মন্দ দুটি ধরণে বিভাজন করে উপস্থাপন করতে হয়। সেক্ষেত্রে কোনরূপ ছাড় দেয়ার অবকাশ থাকে না বা সেটি করা সমীচীনও নয়। তাই 'বিশ্বাসী' বললেই 'ভাল' এবং 'অবিশ্বাসী' বললেই 'মন্দ' বুঝে নিতে হয়। যদিও বাস্তবে বিশ্বাসী হলেই সকলে ভাল হয় না। আবার অবিশ্বাসী হলেও সকলে মন্দ হয় না।

আদর্শগত বা সংঙ্গাগতভাবে বিশ্বাসী-অবিশ্বাসীকে এভাবে ধরে নেয়ার কারণে বিশ্বাসী কথাটির সাথে বরাবরই পুরস্কার এবং অবিশ্বাসী কথাটির সাথে শাস্তি শব্দগুলি চলে আসে। এতদ্বসত্বেও সর্বময় ক্ষমতা আল্লাহর হাতে। তিনি যাকে ইচ্ছে ক্ষমা করতে পারেন (আল-কোরআন ২:২৮৪)। কেবল এ একটি বাক্যে অবিশ্বাসী হলেই সকল বিশ্বাস পন্ড হয়ে যাবে। যথাযথ সত্যে অধিষ্ঠিত মানুষের জন্য তাই হতাশার কোন কারণ নেই।

কিছু মানুষ বিশ্বাসী-অবিশ্বাসী সম্পর্কিত দর্শনের প্রচলিত অর্থের আদর্শিক উপস্থাপনার কারণেও দর্শনকে ভূল বোঝে তাই ওপরের কথাগুলি এভাবে তুলে ধরতে হল। তারা নিজ জ্ঞান-বুদ্ধি, বিচার-বিবেচনা ও বিশ্বাসে দৃঢ়চিত্ত নয়। তারা এসবের যথাযথ সঙ্গা অনুসন্ধানে অন্যের দ্বারস্ত হয়।

মন্দ কাজ না করা সত্বেও একদল মানুষ সুনির্দিষ্ট একটি দর্শনের রূপরেখায় বিশ্বাস না করার কারণে অপর সকল মানুষকে অবিশ্বাসী-পাপি বলে গণ্য করার চেষ্টা করে। সমাজে তারা তেমন প্রচার-প্রচারণা চালায়। অপরদল দৃঢ়চিত্তে সেটিকে প্রত্যাখ্যান করতে না পেরে সত্যের পথে থেকেও এমন ধারণার কারণে একটি সঠিক দর্শনকেই ভূল বোঝে।

সত্য হচ্ছে, কঠিন সত্য প্রকাশ করলে সাধারণ মানুষের দ্বারা দর্শনের যথাযথ পরিপালন ক্ষুন্ন হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। তাই কথাগুলি এভাবে বলা যায় না। কখনও কখনও বলা সমীচীনও নয়। কিন্তু কিছু মানুষের ভূল বোঝার অবসানের জন্য বর্তমানে কথাগুলি বলাও প্রয়োজনীয় হয়ে উঠেছে।

➢ (আয়াত ১৬৮-১৭৬) খাদ্য (Food) প্রসঙ্গে বলা হয়েছে। খাদ্যের ভাল-মন্দ বিষয়ে বলা হয়েছে।

১৬৮	হে মানবজাতি! খাদ্য হিসেবে পৃথিবীতে সেটি গ্রহণ কর যেটি বিধি ও স্বাস্থ্যসম্মত এবং শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ কর না। নিঃসন্দেহে সে তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু। (O mankind! Eat of that which is lawful and wholesome in the earth, and follow not the footsteps of the devil. Lo! he is an open enemy for you.)
১৬৯	সে তোমাদের ওপর কেবল মন্দ ও অশ্লীল কাজের নির্দেশনা দেয় এবং আল্লাহর প্রতি এমন সব বিষয়ে বলতে বলে যা তোমরা জান না। (He enjoineth upon you only the evil and the foul, and that ye should tell concerning Allah that which ye know not.)
১৭০	যখন তাদেরকে (অবিশ্বাসীদেরকে) বলা হয় যে আল্লাহ তোমাদের ওপর যা অবতীর্ণ করেছেন তা অনুসরণ কর, তখন তারা বলে: আমরা তা-ই অনুসরণ করি যেভাবে আমাদের পিতা-পিতামহদের পেয়েছি। কি! যদিও তাদের পিতা-পিতামহরা এ বিষয়ে তেমন কিছুই জানত না এবং তাদের কোন পথ-নির্দেশনাও ছিল না (তবুও)! (And when it is said unto them: Follow that which Allah hath revealed, they say: We follow that wherein we found our fathers. What! Even though their fathers were wholly unintelligent and had no guidance?)
১৭১	এরূপ অবিশ্বাসীদের উপমা এমন যেন কেউ এমন কিছুকে আহবান করছে যা কোন কিছুই শোনে না হাঁক-ডাক আর চিৎকার ছাড়া। বধির, মুক এবং অন্ধ ফলে তারা কিছুই বোঝে না। (The likeness of those who disbelieve (in relation to the messenger) is as the likeness of one who calleth unto that which heareth naught except a shout and cry. Deaf, dumb, blind, therefore they have no sense.)

১৭২	হে বিশ্বাসীগন! তোমরা সে সকল উত্তম খাদ্য গ্রহণ কর যেগুলি আমি তোমাদেরকে প্রদান করেছি এবং কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর আল্লাহর প্রতি যদি তোমরা তাঁরই উপাসনা কর। (O ye who believe! Eat of the good things wherewith We have provided you, and render thanks to Allah if it is (indeed) He Whom ye worship.)
১৭৩	তিনি তোমাদের জন্য নিষিদ্ধ করেছেন শুধুমাত্র মৃত জীব এবং রক্ত ও শুকরের মাংস এবং সে সব জীব-জন্তু যা আল্লাহ ব্যাতিত অপর কারও নামে উৎসর্গ করা হয়। কিন্তু যে অনন্যোপায় হয়ে তা করে, ইচ্ছেকৃত বা সীমালঙ্ঘনকারী হিসেবে নয় তার জন্য সেটি পাপ নয়। নিঃসন্দেহে আল্লাহ ক্ষমাশীল, দয়ালু। (He hath forbidden you only carrion (the rotting flesh of a dead animal), and blood, and swineflesh, and that which hath been immolated to (the name of) any other than Allah. But he who is driven by necessity, neither craving nor transgressing, it is no sin for him. Lo! Allah is Forgiving, Merciful.)
১৭৪	নিশ্চয়ই! যারা প্রেরীত গ্রন্থের সেসব বিষয় গোপন করে যা আল্লাহ অবতীর্ণ করেছেন এবং তার বিনিময়ে ক্ষুদ্র কোন সুবিধা অর্জন করে, তারা তাদের পেটে আগুন ছাড়া কিছুই ভক্ষণ করে না। পুনরুত্থান দিবসে আল্লাহ তাদের সঙ্গে কথা বলবেন না এবং তাদের বিকশিতও করা হবে না। তাদের জন্য রয়েছে বেদনাদায়ক শাস্তি। (Lo! those who hide aught of the Scripture which Allah hath revealed and purchase a small gain therewith, they eat into their bellies nothing else than fire. Allah will not speak to them on the Day of Resurrection, nor will He make them grow. Theirs will be a painful doom.)
১৭৫	এরাই হল তারা যারা সঠিক দিক-নির্দেশনার পরিবর্তে ভূল পথ ক্রয় করে এবং ক্ষমার পরিবর্তে ক্রয় করে শাস্তি। আগুনের পানে ছুটে

	যাবার জন্য তারা কেমন অনড়! (Those are they who purchase error at the price of guidance, and torment at the price of pardon. How constant are they in their strife to reach the Fire!)
১৭৬	এটি এজন্য যে, আল্লাহ এ গ্রন্থ (কোরআন) অবতীর্ণ করেছেন সত্যসহ (যথাযথরূপে)। যারা গ্রন্থের মধ্যে মতবিরোধ সৃষ্টির কারণ খুঁজে পায় তারা বিভক্তি সৃষ্টি করে। (That is because Allah hath revealed the Scripture with the truth. Lo! those who find (a cause of) disagreement in the Scripture are in open schism.)

▪ **২.১৬৮.১** হে মানবজাতি! খাদ্য হিসেবে পৃথিবীতে সেটি গ্রহণ কর যেটি বিধি ও স্বাস্থ্যসম্মত : এটি একটি শাশ্বত ও সার্বজনীন বাণী। খাদ্য গ্রহণের ক্ষেত্রে এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ বিবেচ্য বিষয়। যে খাবার খাদ্য হিসেবে গ্রহণ করা হচ্ছে বিবেচনা করতে হবে যে, প্রথমত: সেটি ক্ষতিকর কিনা এবং দ্বিতীয়ত: সেটি উপকারী কিনা। উপকারী খাদ্য গ্রহণ করা যেতে পারে, তবে বিষাক্ত বা ক্ষতিকর হলে তা বর্জনীয়।

যে সময়ে এ বাণী অবতীর্ণ হয়েছে সে সময়ে মানুষের খাদ্য তালিকায় যে সকল খাদ্য অন্তর্ভূক্ত ছিল বর্তমানে বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধান ও গবেষনার ফলে সে তালিকা বড় হয়েছে। বিশেষভাবে সামুদ্রিক প্রাণীর উল্লেখ করা যেতে পারে। ভবিষ্যতে হয়তবা আরও নতুন খাদ্য তালিকায় অন্তর্ভূক্ত হবে। সবক্ষেত্রে ওপরের নির্দেশনার অনুসরণ বাঞ্ছনীয়। গবেষনা বা মানুষের অভিজ্ঞতা বা যে কোন প্রকারেই হোক না কেন মানুষকে বিবেচনা করে দেখতে হবে যে, খাদ্য হিসেবে যা গ্রহণ করা হচ্ছে সেটি ক্ষতিকর নাকি উপকারী। এটিই আল্লাহর নির্দেশনা। এর ভিত্তিতেই খাদ্যের হারাম-হালাল নির্ধারিত হয়ে থাকে।

শৈশবে মা-বাবা সন্তানকে যে খাদ্য-খাবার দেয় সে তাতেই অভ্যস্ত হয়। সেটি তাদের দ্বারা সন্তানের জন্য অনুমোদিত হয়ে যায়। যা খাওয়ায় না তাতে সে অভ্যস্ত হয় না। অনভ্যস্ততার কারণে পরবর্তীতে সহজে সেটি গ্রহণ করতে পারে না। মন বাধা দেয়। অথচ অভ্যাস করালে হয়তবা সেটিও সাদরেই গ্রহণ

করে নিত। খাবারটি নিষিদ্ধও নয়। কেবলমাত্র অনভ্যস্ততার জন্য খাওয়া যাচ্ছে না। অর্থাৎ খাবারের ওপর অনুমোদনের একটি প্রভাব থাকে।

গোটা মানবজাতির খাবারের ওপরও অনুমোদনের একটি প্রভাব আছে। কোন একটি খাবারের ওপর বিধাতার অনুমোদন আছে কি নেই সেটিও মানুষের মনস্তত্ত্বের ওপর প্রভাব ফেলে। বিধাতা যেটি অনুমোদন করেছেন বলে মানুষ জানে বা মানে সেটি সে অনায়াসে গ্রহণ করতে পারে। কিন্তু বিধাতার অনুমোদন নেই তেমন খাবারে সর্বপ্রথমেই মানুষের মন বাধা হয়ে দাড়ায়। অতঃপর সে খাবারটি না খেতে খেতে অনভ্যস্ততায় পরিণত হয়। ঐ খাবারের প্রতি অরুচি আসে। মন গ্রহণ না করলে তেমন গ্রহণ করা খাবার মানুষ ভেতর থেকে বমি করেও বের করে দেয়। এমনটি ঘটে। বিষয়গুলি মনস্তাত্বিক। মনস্তত্বও এক অনেক বড় বিজ্ঞান যা অনস্বীকার্য!

কিছু মানুষ নিজ প্রচেষ্টায় মনকে বসে এনে এসব মানসিক বাধা থেকে বহু কষ্টে নিজেদের উত্তরণ ঘটাতে পারে। কিন্তু তারপরেও কিছু সমস্যা থেকেই যায়। আবার শতকরা হিসেবে সেটিও ধর্তব্যের মধ্যে পরে না। বেশীরভাগ মানুষের ক্ষেত্রে প্রথমোক্ত বিষয়টি সত্য হয়ে দেখা দেয়। তাই বিধাতার অনুমোদনের বিষয়টিকে গুরুত্বের সাথে বিবেচনায় নিতে হয়। আল্লাহ সে কারণে বিশাল তালিকা তৈরী করে মানুষের জন্য খাদ্য-খাবার নিষিদ্ধ করেন নাই।

এ বাণীতে আল্লাহ খাদ্য গ্রহণের মূল সূত্রটি মানবজাতিকে জানিয়ে দিয়েছেন। বলা হচ্ছে, 'হে মানবজাতি! খাদ্য হিসেবে পৃথিবীতে সেটি গ্রহণ কর যেটি বিধি ও স্বাস্থ্যসম্মত' যেন মানুষ ভবিষ্যতেও এ সূত্র ধরে সঠিক পথে নিজেদের বিচার-বিবেচনায় চলতে পারে।

■ **২.১৬৮.২** এবং শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ কর না। নিঃসন্দেহে সে তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু : আল্লাহ সরাসরি যা নিষিদ্ধ করেছেন তা ব্যাতিত আর কোন খাবারই নিষিদ্ধ নয়। আল্লাহ ব্যাতিত অপর কারও তেমন নিষিদ্ধতা আরোপ করার অনুমতিও নেই। আল্লাহ যা নিষেধ করেননি কেউ যেন তা নিষেধ না করে এখানে প্রচ্ছন্নে সে কথাটিও জানিয়ে দেয়া হয়েছে। যারা তা করে তাদের সে কাজকে শয়তানের কাজের সাথে তুলনা করা

হয়েছে। কেননা এসব করার পেছনে তাদের কিছু খারাপ উদ্দেশ্য থাকে। আল্লাহ তাই এমন কাজ করাকে নিষিদ্ধ করে দিয়েছেন। বলা হচ্ছে,

"এমন কথা বল না যা বলার তুমি যোগ্যতা রাখ না এবং যা দ্বারা ভূলভাবে বলা হয়: 'এটি হালাল এবং ওটা হারাম।' ফলস্বরূপ আল্লাহ সম্পর্কে মিথ্যে আরোপ করা হয়। নিশ্চয়ই! যারা আল্লাহ সম্পর্কে মিথ্যে আরোপ করে তারা সফল হবে না।" (আল-কোরআন ১৬:১১৬)

"হে বিশ্বাসীগণ! তোমরা উত্তম কোন কিছুকে নিষিদ্ধ কর না, যা আল্লাহ তোমাদের জন্য বিধিসম্মত করেছেন এবং সীমা অতিক্রম কর না। নিশ্চয়ই! আল্লাহ সীমা অতিক্রমকারীদেরকে পছন্দ করেন না।" (আল-কোরআন ৫:৮৭)

উল্লেখ্য যে, এক সময় উপাসনার প্রাতিষ্ঠানিক কোন রূপ বা নিয়ম ছিল না। আল্লাহ মানুষকে তা প্রতিষ্ঠা করতে বলেছেন। অর্থাৎ তিনি এটিকে প্রতিষ্ঠা করতে বলে সর্বক্ষেত্রের জন্যই একটি সুন্দর দিক-নির্দেশনা দিয়েছেন। বুঝতে হবে যে সকল ভাল কর্মই এবাদত বা উপাসনার পর্যায়ভূক্ত। সবক্ষেত্রেই প্রাতিষ্ঠানিক ভিত্তি দাড় করাবার নির্দেশনা রয়েছে এখানে।

খাদ্যের ভাল-মন্দ মান যাচাই-বাছাইয়ের জন্যও এককালে কোন গবেষনা কর্ম ছিল না। কোন প্রতিষ্ঠান এসব ক্ষেত্রে তখনও দৃঢ়ভিত্তি লাভ করেনি। আল্লাহর নির্দেশনায় সকল কর্মে প্রাতিষ্ঠানিক ভিত্তি দাড় করাবার দিক-নির্দেশনা আছে। সেভাবে মানুষকে উদ্বুদ্ধ করা হয়েছে। বলা হয়েছে, 'খাদ্য হিসেবে সেটি গ্রহণ কর যেটি বিধি ও স্বাস্থ্যসম্মত'। মানুষ জানবে কি করে যে কোন খাদ্যটি স্বাস্থ্য ও বিধিসম্মত? সেটি জানতে হলেও গবেষনার প্রয়োজন আছে।

খাদ্যের ভাল-মন্দ মান যাচাইয়ে বর্তমানে গবেষনাও প্রাতিষ্ঠানিক রূপ লাভ করেছে। বর্তমান সময়ে স্ব স্ব ক্ষেত্রে কাজ করার ও মান নির্ধারণের জন্য প্রতিষ্ঠানসমুহ রয়েছে। খাদ্যের বিধি-সম্মততা কিংবা ভাল-মন্দ নির্ধারণ এখন এসব প্রতিষ্ঠানগুলি গবেষনার মাধ্যমে করে থাকে। বর্তমান সময়ে সেটিই অনুসরণীয়।

আল্লাহ যা নিষেধ করেননি কেউ তা নিষেধ করতে পারে না। যারা তা করে তাদের সে কাজকে শয়তানের কাজের সাথে তুলনা করা হয়েছে। শয়তানের কাজ হচ্ছে নেতিবাচক কাজ বা আল্লাহর নির্দেশনার বিপরীত কাজ

করা। শয়তান হচ্ছে একটি নেগেটিভ ফোর্স। মানুষকে যা আল্লাহর নির্দেশনার বিপরীতে চলতে উদ্বুদ্ধ করে। আল্লাহর নির্দেশনা অনুযায়ী শয়তানের কাজ মানুষের জন্য অনুসরণীয় নয়। বিশ্বাসী হলে সেটি মানতে হবে এবং তা বর্জন করতে হবে।

জ্ঞানসম্পন্ন মানুষ বিচার-বিশ্লেষন থেকেই আল্লাহর নির্দেশনার যথার্থতা অনুধাবন করতে পারে। তাই তারা শয়তানের প্ররোচনাকে নিজ বিবেচনায় বর্জন করে।

মানব সৃষ্টির শুরু বা আদম-হাওয়ার কাল থেকেই শয়তান মানুষকে ভূল পরামর্শ দিয়ে এসেছে। যা খাওয়া নিষেধ তা খেতে উদ্বুদ্ধ করেছে এবং মানুষকে বিপদগ্রস্ত করেছে। বিষয়গুলি গোপন কিছু নয়। বিষয়গুলি মানুষ জানে বা এভাবে প্রতিষ্ঠিত। তাই সে মানুষের প্রকাশ্য শত্রু [শয়তান দ্রষ্টব্য ২.১৬৯, ২.২০৭, ২.২৬৮.১]।

আল্লাহ যা নিষেধ করেছেন যারা তা করতে উদ্বুদ্ধ করে এবং আল্লাহ যা নিষেধ করেননি যারা তা নিষেধ করে তাদের এসব করার পেছনে কিছু মন্দ উদ্দেশ্য থাকে। আল্লাহ তাই এমন কাজ করাকে নিষিদ্ধ করে দিয়েছেন। তাদের সে কাজকে শয়তানের কাজ বলে আখ্যায়িত করেছেন। শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ করতে বারণ করে দিয়েছেন। উল্লেখ্য যে, বর্তমান সময়ে এসব বিষয়ে প্রাতিষ্ঠানিক দিক-নির্দেশনা অনুসরণ করা বাঞ্চনীয়।

▪ **২.১৬৯** সে তোমাদের ওপর কেবল মন্দ ও অশ্লীল কাজের নির্দেশনা দেয় এবং আল্লাহর প্রতি এমন সব বিষয়ে বলতে বলে যা তোমরা জান না : আল্লাহ যা নিষেধ করেননি কেউ যেন সেসবকে নিষেধ না করে। যারা তা করে তাদের সে কাজকে শয়তানের কাজের সাথে তুলনা করা হয়েছে। কেননা এসব করার পেছনে তাদের কিছু খারাপ উদ্দেশ্য থাকে।

শয়তান সম্পর্কে বলা হচ্ছে যে, সে সব সময়ই মন্দ ও অশ্লীল কাজের নির্দেশনা দেয় [শয়তান দ্রষ্টব্য ২.১৬৮.২]। তার প্রতিটি কাজ একটি অসৎ উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে প্রণীত হয়। এর মাধ্যমে সে ধীরে ধীরে সমাজে শিরক বা আল্লাহর সাথে অংশীদারী আরোপ করার পাপকে প্রবেশ করায় [শিরক বা অংশীদারী দ্রষ্টব্য ২.২২]। একবার সমাজে তা প্রতিষ্ঠা পেয়ে গেলে মানুষকে সে

তার নিজের মতো করে পরিচালনা করতে পারে। আল্লাহর নির্দিষ্ট করে দেয়া সীমার বাইরে নিয়ে যেতে পারে। মানুষ ভূল পথগামী হয়, পথচ্যুত হয়। অর্থাৎ অন্যায্য কাজের মাধ্যমে সে নিজে লাভবান হয় এবং মানুষকে নিঃস্ব করে দেয়। অথচ আল্লাহর বেধে দেয়া সীমা মানুষকে সঠিক পথে পরিচালনা করে। অন্যায় কাজ করতে নিরুৎসাহিত বা বারণ করে। প্রকৃতি ও সমাজে ভারসাম্য বজায় রাখে।

শয়তান তার নিজ স্বার্থে আল্লাহ প্রতির্ষ্ঠিত সত্য, সঠিক ও ন্যায়ের নিয়মকে ভেঙ্গে ফেলে নিজের নিয়ম চালু করে। সমাজ থেকে আল্লাহ প্রতির্ষ্ঠিত ন্যায়ের বিধানকে দুরীভূত করে দেয়। একটি ছোট্ট গোষ্ঠিকে সে নিজের করে নেয়। লাভ ও লোভের কারণে সে গোষ্ঠীটি তার প্রতি সর্বদা কৃতজ্ঞ থাকে। কেবল ঐ গোষ্ঠীটিই তার সাহচর্যে থেকে লাভবান হয়। কিন্তু সমাজের বৃহৎ অংশ তার প্রতিষ্ঠা করা অন্যায় বিধানের কারণে যুগের পর যুগ, শতাব্দীর পর শতাব্দী ধুকে ধুকে মরতে থাকে।

কোন মন্দ নিয়মও সমাজে একবার প্রতিষ্ঠা পেয়ে গেলে সহজেই সেটি ভেঙ্গে ফেলা যায় না। এসব থেকে বের হওয়া সহজ কাজ নয়। যুগে যুগে আল্লাহ যখন মানুষের প্রতি অনুগ্রহ বর্ষন করেন তখন তিনি মহাপুরুষ প্রেরণ করেন। তারা দুষ্ট-রীতি, কুসংস্কার ইত্যাকার বিষয়গুলিকে সমাজ থেকে দূরীভূত করতে কাজ করে।

বস্তুত ভাবনাশীল কিছু মানুষ সমাজে প্রতির্ষ্ঠিত অনাচার নিয়ে ভাবেন। তারা সংগ্রাম করেন। অন্যায়-অনাচারের বিপক্ষে তারা রুখে দাড়ান। পরিবেশ-সমাজ সব কিছুর প্রতিক্রিয়ায় মানুষের মধ্যে এমন পরিবর্তন আসে বা ঘটে। কিন্তু এর গোড়া অনুসন্ধান করতে গেলে বিধাতা চলে আসে। তাই বলা হয় বিধাতাই তাদের প্রেরণ করে। যেমন বলা হচ্ছে,

"(জেসাস বলে- আমি এসেছি) ... যেন আমি তোমাদের জন্য আইনসিদ্ধ করে দেই সে সব বস্তু যা তোমাদের জন্য নিষিদ্ধ ছিল।" (আল-কোরআন ৩:৫০)

“.. বার্তাবাহক (মোহাম্মদ) ... যে তাদের ওপর অর্পিত বোঝা থেকে তাদেরকে অব্যাহতি দেবে এবং শৃংখল অপসারণ করবে যা তাদের ওপর বিদ্যমান ছিল।” (আল-কোরআন ৭:১৫৭)

স্বার্থান্বেষী ও ভূল-পথগামী মানুষ নানান উছিলায় অনেক ভাল কিছুকে অবৈধ এবং অনেক মন্দ বিষয়কে বৈধ করে নেয়। যখন এসব বাণী অবতীর্ণ হয় তৎকালীন সময়েও সমাজে এমন অবস্থা বিরাজমান ছিল। ধর্মীয় নেতা থেকে শুরু করে শিক্ষিতজন, এমনকি প্রশাসনিক কর্মচারী থেকে শুরু করে বিচারকগনও সমসায়িককালে স্বার্থান্বেষীদের এমনিতর মন্দ কর্মকান্ডের সমর্থন দিয়েছে। তারাও এর মাধ্যমে লাভবান হয়। মূলত এসবের পেছনে একটি দুষ্ট চক্র কাজ করে। নানান কুসংস্কার ও অন্যায় বিধি-বিধান দ্বারা সাধারণ মানুষ যখন বন্দি হয়ে যায়, তখন মহাপুরুষদের আগমন ঘটে অনিয়মের এসব বোঝা থেকে মানুষকে মুক্তি দিতে।

আল্লাহ কখনই মন্দ কাজের আদেশ দেন না। আল্লাহ ন্যায়পরায়ণতার নির্দেশ দেন এবং অশ্লীলতা, ঘৃণিত ও দুষ্ট প্রকৃতির কাজ নিষিদ্ধ করেন। অপরদিকে শয়তান মন্দ ও অশ্লীল কাজের নির্দেশনা দেয় এবং আল্লাহ সম্পর্কে এমনসব বিষয় বলতে বলে যা মানুষ জানে না। বলা হচ্ছে,

“... আল্লাহ অবশ্যই মন্দ কাজের আদেশ দেন না। ...। বল: আমার প্রতিপালক ন্যায়/সুবিচারের নির্দেশ দিয়েছেন ...।” (আল-কোরআন ৭:২৮-২৯)

“নিশ্চয়ই! আল্লাহ ন্যায়পরায়ণতা, সদয়তা এবং আত্নীয়-স্বজনকে দান করার নির্দেশ দেন এবং তিনি অশ্লীলতা, ঘৃণিতকাজ এবং দুষ্ট প্রকৃতির কাজ নিষিদ্ধ করেন। ...।” (আল-কোরআন ১৬:৯০)

পূর্বেও উল্লেখ করেছি যে, শয়তানের কাজ হচ্ছে নেতিবাচক কাজ বা আল্লাহর নির্দেশনার বিপরীত কাজ করতে উদ্বুদ্ধ করা। শয়তান হচ্ছে একটি নেগেটিভ ফোর্স। মানুষকে যা আল্লাহর নির্দেশনার বিপরীতে চলতে প্ররোচিত করে [শয়তান দ্রষ্টব্য ২.১৬৮.২]।

আল্লাহ সম্পর্কে ওপরে উদ্ধৃত বাণীসমুহের অন্তর্নিহিত সূত্রটি যে বুঝবে এবং দৃঢ়চিত্ত হয়ে তাতে প্রতিষ্ঠিত থাকতে পারবে সে শয়তানের প্ররোচনায় প্ররোচিত

নাও হতে পারে। কিন্তু অধিকাংশ সাধারণ মানুষ গ্রন্থ বা আল্লাহর নির্দেশনা বিষয়ে যথাযথভাবে জানে না। আবার কিছু জেনে থাকলেও তার সঠিক ব্যাখ্যা জানে না। নিজেও বিচার-বিবেচনা করে না। ফলে ভূল করে।

শয়তান মানুষের কাছে আসে মিষ্টভাবে। তাতেই মানুষ ভূল করে। তাকে চেনার একটি সহজ ও উত্তম উপায় হচ্ছে সে যা নির্দেশ করে সেটি হচ্ছে মন্দকর্ম। ফলে কাজ করার পূর্বে মানুষের নিজেকেই বিচার-বিবেচনা করে দেখতে হবে। মন্দ কাজ হলে সেটি পরিত্যাগ করতে হবে। বুঝতে হবে যে সেটি শয়তানের কাজ। কেননা আল্লাহ কখনই মন্দ কাজের নির্দেশনা দেন না। এটিও একটি সূত্র।

▪ **২.১৭০-২.১৭১** যখন তাদেরকে (অবিশ্বাসীদেরকে) বলা হয় যে আল্লাহ তোমাদের ওপর যা অবতীর্ণ করেছেন তা অনুসরণ কর, তখন তারা বলে, আমরা তা-ই অনুসরণ করি যেভাবে আমাদের পিতা-পিতামহদের পেয়েছি। কি! যদিও তাদের পিতা-পিতামহরা এ বিষয়ে তেমন কিছুই জানত না এবং তাদের কোন পথ-নির্দেশনাও ছিল না (তবুও)! এরূপ অবিশ্বাসীদের উপমা এমন যেন কেউ এমন কিছুকে আহবান করছে যা কোন কিছুই শোনে না হাঁক-ডাক আর চিৎকার ছাড়া। বধির, মুক এবং অন্ধ ফলে তারা কিছুই বোঝে না : যারা ভূল কাজ করে তারা নিজেরা ভাল-মন্দ বিচার করে না। আবার ভাল পথের নির্দেশনা এলে সেটিকেও নিজেদের বিচার-বিবেচনা দিয়ে যাচাই-বাছাই করতে চায় না। বলে, আমরা পূর্ব-পুরুষের নিয়ম-রীতি অনুসরণ করে চলেছি। অর্থাৎ তারা গড্ডালিকায় গা ভাসিয়ে দিয়েছে।

পূর্ব-পুরুষদের কাজ সঠিক ছিল কিনা সেটিও বিচার-বিবেচনা করার প্রয়োজন আছে। কিন্তু এ ধরণের মানুষেরা তাও করে না। তাদেরকে সঠিক পথে আহবান করলে তারা এমন আচরণ করে যেন সে আহবান তারা শুনতেই পায়নি। এরা ভাল কথা শুনতে চায় না, বিষয়ের ভাল-মন্দ নিয়ে কথাও বলতে চায় না, সমাজে প্রচলিত রীতি-বিধির ভাল-মন্দ প্রভাব দেখতে পায় না। তাই তাদেরকে বধির, মুক ও অন্ধ বলা হয়েছে।

সমাজের এমন মানুষদের মধ্যে যারা গুণীজনরূপে পরিচিত তাদের ভেতরে থাকে হীন উদ্দেশ্য চরিতার্থ করার বাসনা ও আত্মম্ভরীতা। অপরদিকে সাধারণদের মাঝে থাকে অজ্ঞতা ও মূর্খতা।

ওপরোক্ত আয়াতের বাণীগুলি যেহেতু খাদ্য প্রসঙ্গে আলোচনা করতে গিয়ে উদ্ধৃত হয়েছে তাই এ বিষয়ে আরও একটু বিস্তারীত আলোচনা করা প্রয়োজন বলে মনে করি। বলা হচ্ছে,

"তাওরাত অবতীর্ণ হওয়ার পূর্বে ইয়াকুব (ইসরাইল) যেসব খাদ্য নিজের জন্য নিষিদ্ধ (হারাম) করে নিয়েছিল, সেগুলি ব্যতীত সব আহার্য্যই বনী-ইসরাইলের জন্য হালাল ছিল। বল: তোমরা যদি সত্যবাদী হও তবে তাওরাত নিয়ে এসো এবং তা পাঠ কর।" (আল-কোরআন ৩:৯৩)

ওপরের আয়াত থেকে বোঝা যাচ্ছে যে, অনেক খাবার আল্লাহ নিষিদ্ধ করেননি। ব্যাক্তিগত অভিরুচি থেকে ইসরাইল নিজের জন্য কিছু খাবার নিষিদ্ধ, অর্থাৎ যাকে হারাম বলা হয় তাই করে নিয়েছিল। এটি তার নিজের জন্য করেছিল। সকলের জন্য নিষিদ্ধ ছিল না। কিন্তু পরবর্তী প্রজন্ম সেটির অন্ধ অনুসরণ করেছে। তারা নিজেরা না গ্রন্থ পাঠ করে সত্যটি জেনেছে, না খাদ্যের ভাল-মন্দ গুণাগুণ কোন কিছু বিবেচনা করে কাজগুলি করেছে। তারা শুধুই পূর্ব-পুরুষদের অন্ধের মতো অনুসরণ করেছে। অথচ আল্লাহ তাদের জন্য সেসব খাবার নিষিদ্ধ করেননি। অতএব গড্ডালিকায় গা ভাসিয়ে দিয়ে কেবল পুর্ব-পুরুষের অনুসরণই যথাযথ আচরণ নয়। নিজেদেরকেও ভাল-মন্দ বিচার-বিবেচনা করতে হবে। এমনই কোরআনের দিক-নির্দেশনা। আরও বলা হচ্ছে,

"ভূল কার্যকলাপ এবং আল্লাহর পথে অধিক পরিমাণে বাধা দানের কারণে, ইহুদিদের জন্য আমি বহু ভাল বস্তু নিষিদ্ধ করে দিয়েছি যা তাদের জন্য (পূর্বে) আইনসিদ্ধ ছিল" (আল-কোরআন ৪:১৬০)

"ইহুদিদের জন্য আমি প্রত্যেক নখবিশিষ্ট পশু নিষিদ্ধ করেছিলাম এবং ষাঁড় ও মেষ এতদুভয়ের চর্বি তাদের জন্য নিষিদ্ধ করেছিলাম সেগুলি ব্যাতিত যা পৃষ্টে কিংবা অন্ত্রে সংযুক্ত থাকে অথবা অস্থির সাথে মিলিত থাকে। তাদের অবাধ্যতার কারণে আমি তাদেরকে এ শাস্তি দিয়েছিলাম। অবশ্যই আমি সত্য বলছি।" (আল-কোরআন ৬:১৪৬)

ওপরের আয়াত দু'টিতে বিশেষভাবে লক্ষনীয় যে, খাবারের গুণাগুণ বিচারে বা ভাল-মন্দ বা উপকারী-অপকারী বিবেচনায় আল্লাহ তাদের জন্য কিছু খাবার নিষিদ্ধ করেননি। তিনি নিষদ্ধি করেছেন তাদের কিছু আচরণগত কারণে অসন্তুষ্ট হয়ে শাস্তি প্রদানস্বরূপ। অর্থাৎ 'ফুড ভ্যালু'র বিবেচনায় নিষদ্ধ খাবারগুলি নিষদ্ধ ছিল না। যেমনটি ১৬৮ নং আয়তে বলা হয়েছে যে, হে মানবজাতি! খাদ্য হিসেবে পৃথিবীতে সেটি গ্রহণ কর যেটি বিধি ও স্বাস্থ্যসম্মত।

সত্য হচ্ছে, যে কোন কিছু বিধি-নিষেধের বিষয়গুলি যথাযথ বিচার-বিবেচনা এবং জ্ঞান ও নির্জ্ঞানতার সাথে সম্পর্কিত। তাদের পূর্ব-পুরুষদেরও এসব বিষয়ে কোন দিক-নির্দেশনা ছিল না। যারা জ্ঞানকে কাজে লাগায় না, কিংবা বোঝাবার পরেও বোঝে না তারা এভাবে ভূল পথে চলে।

আরেকটি বিষয় উল্লেখ করা প্রয়োজন। কোরআন এসেছে সব মানুষের জন্য দিক-নির্দেশনাস্বরূপ। মানুষের জন্য খাদ্যের উপকারীতা বা অপকারীতার বিষয়টি হিন্দু-মুসলিম-বৌদ্ধ-খ্রীষ্টান-ইহুদি এ জাতীয় বিষয়ের ওপর নির্ভর করে না। ঠিক যেমন ধর্মের পার্থক্যের কারণে কোন মানুষের ওপর 'বিষের কার্যকারিতা'য় কোন হেরফের হয় না তেমন। অর্থাৎ ভাল সবার জন্য ভাল। মন্দ সবার জন্য মন্দ। তবে ব্যাক্তিগত পর্যায়ে ব্যাক্তি বিশেষের ক্ষেত্রে কিছু খাদ্যের কার্যকারীতায় তারতম্য হতে পারে। সেসবকে চিকিৎসকের পরামর্শ সাপেক্ষ বিষয়, কিংবা নিজেদের ব্যাক্তিগত অভিরুচি বা বিবেচনা সাপেক্ষ্য বিষয় বলে গণ্য করা যেতে পারে।

কোরআনে তাই এমন দিক-নির্দেশনা দিয়ে বলা হয়েছে যে, 'হে মানবজাতি! খাদ্য হিসেবে পৃথিবীতে সেটি গ্রহণ কর যেটি বিধি ও স্বাস্থ্যসম্মত।' ধর্ম বা আল্লাহর নির্দেশনাকে মানুষ ও জীবন থেকে অযৌক্তিকভাবে পৃথক করে ফেলার কোন কারণ নেই। ধর্ম এসেছেই জীবন ও জগতের কল্যাণ সাধনের জন্য।

আল্লাহর নির্দেশনাকে যথাযথভাবে বিচার-বিশ্লেষণ ও ব্যাখ্যা করে বুঝতে না পারার কারণে কিছু মানুষ জীবন থেকে ধর্মকে পৃথকীকরণের কথা উচ্চারণ করে। আবার কিছু মানুষ একই দোষে অনেক সুন্দর ও প্রাণবন্ত বিষয়সমূহকে

জীবন থেকে বাদ দিতে বল প্রয়োগের চেষ্টা করে। দু'টির কোনটিতেই 'চরম' পর্যায়ে যাওয়া সঠিক বিচার নয়।

▪ **২.১৭২.১** হে বিশ্বাসীগন! তোমরা সে সকল উত্তম খাদ্য গ্রহণ কর যেগুলি আমি তোমাদেরকে প্রদান করেছি : পূর্বেও খাবারের বিষয়ে অনুমোদনের প্রসঙ্গ তুলে ধরেছি। এখানেও প্রচ্ছন্নে খাদ্যের অনুমোদনের প্রসঙ্গই তুলে ধরা হয়েছে। খাদ্য হিসেবে সেসবকে গ্রহণ করতে বলা হয়েছে যা ভাল। আল্লাহ যা নিষেধ করেননি তাই ভালর মধ্যে পরে। ফলে সেগুলি তাঁর অনুমোদনের আওতায়ভূক্ত। অনুমোদন খুব গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয়। এর গুরুত্বপূর্ণ মনস্তাত্বিক দিকও আছে। কেবল একটি উদাহরণেই মনস্তাত্বিক বিষয়টি পরিস্কার হয়ে যাবে।

মুসলিমদের ধর্মগ্রন্থ তাদেরকে শুকরের মাংশ খাবার হিসেবে অনুমোদন দেয়নি। ফলে তারা সে খাবার খেতে পারে না। কেবল নিষেধের কারণে তারা সেটি খেতে পারে না বিষয়টি তেমন নয়। নিষেধের কারণে তারা শৈশব থেকে এ খাবারে অভ্যস্ত হয়ে ওঠেনি। অনভ্যস্ততার কারণে তারা সেটি মুখে নিতে পারে না। রুচিতেও বাঁধে। এমনই মানুষের শিক্ষা ও তার প্রভাব। অথচ যাদের সে খাবারের অনুমোদন আছে তারা সেটি তৃপ্তির সাথে গোগ্রাসে গিলছে।

কেউ পেয়াজ, মরিচ, ধনে পাতা মিশিয়ে মজাদার করে গরুর মগজ ভূনা করে খাচ্ছে। কারও মনে হতে পারে আমি আমারই মতো একটি প্রাণীর মগজ খেয়ে ফেলছি। দেখতে তো মানুষের মগজের মতোই। এসব ভাবনা থেকে ঘৃণাবোধ আসতে পারে। তেমন ভাবনা থেকেও নিরামিষভোজীদের উৎপত্তি হতে পারে। নিজের ব্যাক্তিগত অভিরুচি থেকে অনেকে মাছ খায় না।

খাদ্যের ওপর বিধাতার অনুমোদনের বিষয়টি তাই খুবই গুরুত্বপূর্ণ। যিনি সৃষ্টি করেছেন, যাকে বিশ্বাস করি, যাকে ভক্তি করি, যাকে ভালবাসি সে যখন কোন বিষয়ে অুনমতি দেয় শরীর-মন তখন সেটি গ্রহণ করতে পারে। এ যুগের মানুষের ওপর এর প্রভাব কম হলে হতেও পারে। একটা সময় মানুষের জীবন গিয়েছে যখন এগুলি ভীষন প্রভাব রেখেছে। তখন কোন কিছুর কোন প্রাতিষ্ঠানিক ভিত্তি গড়ে উঠেনি। গড়ে উঠেনি কোন গবেষণা প্রতিষ্ঠান। ধর্মীয় নির্দেশনাই মানুষের ওপর প্রভাব রেখেছে। যাদের ওপর প্রচন্ড প্রভাব রেখেছে আমরা তাদেরই উত্তরসূরী।

পৃথিবীতে সকল প্রাণীর জন্য হরেক রকমের খাবার সরবরাহ করে আল্লাহ অশেষ অনুগ্রহ বর্ষন করেছেন। মানুষকে আল্লাহর সরবরাহকৃত খাদ্য থেকেই উপযোগী, পুষ্টিকর ও ভাল খাবারসমুহ খেতে বলা হয়েছে। এ ছাড়াও মানুষকে খাবারের ভাল-মন্দ গুণাগুণ যাচাই-বাছাই করতেও এ আয়াত দিক-নির্দেশনা দেয়। বর্তমান সময়ে যা বিশেষায়িত প্রাতিষ্ঠানিক কার্যক্রমের আওতার মধ্যে পড়ে। অর্থাৎ যারা খাবারের গুণাগুণ যাচাইয়ে বিজ্ঞানভিত্তিক কার্যক্রম পরিচালনা করে এ বিষয়ে তারাই সঠিক দিক-নির্দেশনা দিতে পারে।

▪ **২.১৭২.২** এবং কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর আল্লাহর প্রতি যদি তোমরা তাঁরই উপাসনা কর : মানুষ তো পৃথিবী চিনত না, এমনকি এ সম্পর্কে জানত না। সে নিজ ইচ্ছেতে এখানে আসেনি। কেউ না কেউ তাকে কোন না কোন প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে সৃষ্টি করে এ পর্যন্ত নিয়ে এসেছে। তিনিই আল্লাহ বা তাঁকেই আল্লাহ নামে অভিহিত করা হয়। কেউ তাকে অন্য নামে ডাকে। কিন্তু সত্য হচ্ছে যে কেউই তাঁকে চেনে না, জানে না।

যিনি মানুষকে সৃষ্টি করেছেন, পৃথিবীতে তাকে বসবাস করার সুযোগ করে দিয়েছেন, যিনি তাকে বেঁচে থাকার জন্য প্রয়োজনীয় সকল উপকরণ সরবরাহ করে চলেছেন বা ব্যাবস্থা করে দিয়েছেন তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা কি সমীচীন নয়? এটিই পরীক্ষা। মানুষের নিজের বোধ কেমনভাবে কাজ করে তিনি সেটি দেখেন। অথচ এই মানুষই যখন অপর কারও জন্য ছোট্ট কোন একটি উপকারী কাজ করে তখন সে কৃতজ্ঞতা প্রত্যাশা করে [কৃতজ্ঞতা দ্রষ্টব্য ১.১.১, ১.৪.১, ২.১৮৫.৩]।

যিনি মানুষকে সৃষ্টি থেকে শুরু করে তার জন্য এত কিছু আয়োজন করে দিয়েছেন সেই মানুষকে আল্লাহর প্রতি কৃতজ্ঞ হওয়ার জন্য বলা হয়েছে। যারা সেটি হবে না তাদের বিচার-বিশ্লেষণ ও বোধশক্তি নিম্ন পর্যায়ের বিধায় বিধাতা তাদের ক্ষমাও করতে পারেন। কেননা যার জ্ঞান যতটুকু পর্যন্ত যেতে পারে না তাকে দিয়ে তো বল প্রয়োগ করে সেটি করান সম্ভব না।

যে নিজে থেকে বিষয়ের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা বুঝবে না তাকে দিয়ে বল প্রয়োগেও সেটি বোঝানো যাবে না। বল প্রয়োগে ভালবাসা আদায় করেও তৃপ্তি নেই। প্রথমদিকে বল প্রয়োগে বশে আনতে পারলে এক সময় অভ্যস্ত হয়ে যাবে

এবং একটা সময় পর বুঝতেও পারবে, কারও বুঝ-জ্ঞান এ বিষয়ে সে যুক্তিও উত্থাপন করতে পারে। সব বিবেচনাই সঠিক। তবে এমন মানুষদের বিষয় আল্লাহর ওপরই নির্ভরশীল। আয়াতে আল্লাহর দিক-নির্দেশনা হচ্ছে তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা।

বিশ্বাসী এবং বোধসম্পন্ন মানুষ অবশ্যই আল্লাহর অফুরন্ত অনুগ্রহ প্রাপ্তির কারণে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করবে যে আল্লাহকে কেউ চেনে না, জানে না এমনকি যথাযথভাবে বোঝেও না। বিধাতার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশের বিষয়টিকে গীতায় এভাবে তুলে ধরা হয়েছে,

"জীবন ধারণের নিত্য প্রয়োজনীয় বিষয়াদির দায়িত্বপ্রাপ্ত দেবতাগণ, যজ্ঞ অনুষ্ঠান বা উৎসর্গীকরণের ফলে তুষ্ট হয়ে প্রয়োজনীয় সকল কিছু মানুষের জন্য সরবরাহ করে। প্রতিদানে যে এই উপহার দেবতাগণের প্রতি নিবেদন না করে নিজে ভোগ করে নিশ্চিতভাবেই সে চোর।

পালনকর্তা ভগবানের ভক্তগণ সকল পাপ থেকে মুক্ত হন, কেননা তারা খাদ্য গ্রহণ করে যা সর্বপ্রথম তাঁর নামে নিবেদন বা উৎসর্গ করা হয়, অর্থাৎ কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা হয়। কিন্তু যারা কেবল নিজ ইন্দ্রিয় তৃপ্তির জন্য খাদ্য প্রস্তুত করে নিশ্চিতভাবেই তারা পাপ ভক্ষণ করে।" (গীতা ৩:১২-১৩)

■ **২.১৭৩.১** তিনি তোমাদের জন্য নিষিদ্ধ করেছেন শুধুমাত্র মৃত জীব এবং রক্ত ও শুকরের মাংস এবং সেসব জীব-জন্তু যা আল্লাহ ব্যাতিত অপর কারও নামে উৎসর্গ করা হয় : খাদ্য হিসেবে আল্লাহ যা নিষিদ্ধ করেছেন এখানে তা সুস্পষ্টভাবে তুলে ধরা হয়েছে। যেমন মৃত জীব, রক্ত ও শুকরের মাংস। এছাড়াও সেগুলি নিষিদ্ধ যা আল্লাহ ব্যাতিত অপর কারও নামে উৎসর্গ করা হয়। যেমন বলা হয়েছে,

"বল: যা কিছু বিধান অবতীর্ণ বাণীর মাধ্যমে আমার কাছে পৌঁছেছে, তন্মধ্যে আমি কোন নিষিদ্ধ খাদ্য পাইনি কোন আহারকারীর জন্য যা সে আহার করে, কেবল মৃত অথবা প্রবাহিত রক্ত অথবা শুকরের মাংস ব্যাতিত এবং যা আল্লাহ ছাড়া অন্যের নামে উৎসর্গ করা হয়েছে।" (আল-কোরআন ৬:১৪৫)

মৃত অথবা প্রবাহিত রক্ত বা শুকরের মাংস নিষিদ্ধ। এগুলি খাদ্য; তাই এগুলিকে খাদ্য হিসেবে নিষেধ করতে হয়েছে। কিন্তু আল্লাহ ছাড়া অন্যের নামে উৎসর্গ করা খাদ্য নিষিদ্ধ কেন? এরও যুক্তি আছে যা গীতায় এভাবে বলা হয়েছে,

"জীবন ধারণের নিত্য প্রয়োজনীয় বিষয়াদির দায়িত্বপ্রাপ্ত দেবতাগণ, যজ্ঞ অনুষ্ঠানের ফলে বা উৎসর্গীকরণের ফলে তুষ্ট হয়ে প্রয়োজনীয় সকল কিছু মানুষের জন্য সরবরাহ করবে। প্রতিদানে যে এই উপহার দেবতাগণের প্রতি নিবেদন না করে নিজে ভোগ করবে নিশ্চিতভাবেই সে চোর।

ভগবানের ভক্তগণ সকল পাপ থেকে মুক্ত থাকেন কেননা তারা খাদ্য গ্রহণ করে যা সর্বপ্রথম তাঁর নামে নিবেদন বা উৎসর্গ করা হয়। কিন্তু যারা কেবল নিজ ইন্দ্রিয় তৃপ্তির জন্য খাদ্য প্রস্তুত করে নিশ্চিতভাবেই তারা পাপ ভক্ষণ করে।" (গীতা ৩:১২-১৩)

দেবতাদের উৎসর্গ করলে তারাও তুষ্ট হয়ে অধিক পরিমাণে সরবরাহ করে। সেটি না করা অন্যায় বা পাপ। তাহলে তো দেখা যাচ্ছে যে, জীবন ধারণের জন্য নিত্য প্রয়োজনীয় বিষয়াদির দায়িত্বপ্রাপ্ত দেবতা বা ফেরেশতাগণকে উৎসর্গ করলেই হল। তবে কেন আবার এক আল্লাহর নামে উৎসর্গ করতে হবে? বলা হচ্ছে,

"যাদের মন বস্তুগত কোন প্রাপ্তির প্রত্যাশায় বিচ্যুত, তারা অপরাপর বিবিধ দেব-দেবতায় নিজেদেরকে সমর্পন করে এবং প্রাপ্তির প্রত্যাশা থেকে তারা তাদের নিজস্ব প্রকৃতি অনুসারে নির্দিষ্ট বিধি-বিধান অনুসরণ করে সেইসব দেবতাদের ভজনা-উপাসনা করে। ... তেমন বিশ্বাসে নিজেকে নিয়োজিত করে ভক্ত কোন নির্দিষ্ট দেব-দেবীর আনুকূল্য কামনা করে এবং তার প্রত্যাশিত বিষয় বা বস্তু লাভ করে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এই সকল সুবিধা, অনুগ্রহ বা কাম্য বস্তু আমি একাই প্রদান করি।" (গীতা ৭:২০-২২)

বস্তুত আল্লাহ একাই সব প্রদান করেন। অপরাপর দেবতাগণ নিজ নিজ ক্ষেত্রে তাঁরই প্রতিনিধি মাত্র। প্রতিনিধির নিজস্ব কোন ক্ষমতা থাকে না। তাকে যা করতে বলা হয় সে তাই পালন করে মাত্র। কিন্তু অতি সাধারণ মানুষ

প্রতিনিধিদেরকেই সুনির্দিষ্ট ক্ষেত্রে প্রকৃত ক্ষমতাধর ভেবে বসে থাকে এবং তাদের কাছে যাচ্ঞা করে। তাদেরকে বিধাতার সমকক্ষ মনে করে।

বস্তুত সকল কিছু আল্লাহকেই উৎসর্গ করা যথাযথ ও শ্রেয়। আল্লাহ ভিন্ন অন্য কারও নামে খাদ্য কিংবা অন্য কোন কিছুর উৎসর্গীকরণ যেমন অকৃতজ্ঞতা, সাথে সাথে এটি সমাজে স্থায়ীভাবে একটি শিরক এর আচরণ প্রতিষ্ঠাকে সম্ভব করে তোলে। শিরক এর সকল মন্দ বিষয়গুলিকে সমাজে প্রতিষ্ঠা পেতে সহায়ক হয়ে কাজ করে। সমাজে যেটি অন্যায় প্রবেশের পথকে সুগম করে দেয় [শিরক বা অংশীদারী দ্রষ্টব্য ২.২২]।

আল্লাহই আমাদের খাদ্য থেকে শুরু করে প্রয়োজনীয় সকলকিছু সরবরাহ করেন। তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞ হওয়া অবশ্যই কর্তব্যের মধ্যে পরে। এটি একটি স্বাভাবিক নিয়মের মধ্যেও পরে। এমনকি মানুষ মানুষকে কিছু দান করলেও আমরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করি কিংবা কৃতজ্ঞতা প্রত্যাশা করি। আল্লাহর ক্ষেত্রে তো সেটি হতেই হবে! তিনি তো এমনকি এ জীবনটাও দিয়েছেন! তাঁর প্রতি তেমনটি না করা হলে সেটি হবে অকৃতজ্ঞ আচরণ। অকৃতজ্ঞতা হচ্ছে এক প্রকার বিদ্রোহী বা বাটপারী আচরণ। শুধু তাই নয় এ আচরণের পরিণাম ভয়ঙ্কর! মানুষ এ কথার মর্মার্থ বুঝতে চাইলে নিজেদেরকে দিয়েও বুঝতে পারবে।

▪ **২.১৭৩.২** কিন্তু যে অনন্যোপায় হয়ে তা করে, ইচ্ছেকৃত বা সীমালঙ্ঘনকারী হিসেবে নয় তার জন্য সেটি পাপ নয়। নিঃসন্দেহে আল্লাহ ক্ষমাশীল, দয়ালু : নিয়ত খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয়। কোন কাজের বিষয়ে আল্লাহ বিচার-বিবেচনা করবেন মানুষের নিয়তের ওপর ভিত্তি করে। গ্রন্থে আল্লাহ খাদ্যের হারাম-হালাল উল্লেখ করেছেন। কিন্তু লক্ষ্যনীয় বিষয় এই যে, কোরআন কখনই অযৌক্তিক ও অনমনীয় হয়ে কোথাও কোন বাণী নিয়ে আসেনি। নিয়মের কঠোরতা দ্বারা মানুষের চলার পথ কখনই রুদ্ধ করে দেয়নি। কাঠিন্যের মধ্যেও বেঁচে আসার পথ বা উপায় করে দিয়েছে। কোরআন প্রদর্শিত পথ তাই মানুষের জন্য যথার্থই অনুসরণীয়। আল্লাহ প্রদত্ত দিক-নির্দেশনা মানুষের নিজেদের ব্যাবস্থাপনার ক্ষেত্রেও সে পথ অনুসরণ করে চলতে শিক্ষা দেয়।

বিপদাপন্ন বা জীবন রক্ষার তাগিদে প্রয়োজনে নিষিদ্ধ বা হারাম কাজটিও করার অনুমতি আছে। তবে অবশ্যই যতটুকু না হলে নয় ততটুক এবং অবশ্যই বিপদমুক্ত হলে সেটি বর্জন করার মানসিকতা থাকতে হবে। অর্থাৎ আল্লাহর নির্দেশের প্রতি অনুগত থাকতে হবে। যে ইচ্ছেকৃতভাবে আল্লাহর নির্দেশ ভঙ্গ করে সেটি তার জন্য পাপ। কিন্তু পরিস্থিতি বিবেচনায় অনোন্যপায় হয়ে যদি মানুষ কোন একটি নিষিদ্ধ কাজ করতে বাধ্যও হয় তবে সেটি তার জন্য পাপ নয়।

অল্লাহ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। এখানে এ বক্তব্যের অর্থ হচ্ছে মানুষ যে এ সুবিধাটুকু পাচ্ছে সেটি আল্লাহর দয়া ও ক্ষমার গুণের কারণে। যদিও বিষয়টি এখানে খাদ্য সংক্রান্ত বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে, কিন্ত এটি সকল ক্ষেত্রের জন্যই একটি অত্যান্ত গুরুত্ববহ দিক-নির্দেশনা। আল্লাহর এ গুণের কারণে মানুষকে প্রদত্ত এ সুবিধা তাকে বিপদ থেকে উদ্ধার করার একটি উপায় বা পথ হয়ে কাজ করে এবং সমস্যার সুন্দর সমাধান প্রদান করে। বলা হচ্ছে,

“... যে পালনকর্তা আল্লাহর প্রতি কর্তব্য পালন করে আল্লাহ তার জন্য নিস্কৃতির পথ করে দেবেন।” (আল-কোরআন ৬৫:২)

আল্লাহর প্রতি কর্তব্য পালন করা হচ্ছে সঠিক পথ বা যথাযথ পথে চলা। মন্দ পথ পরিহার করে চলা। যারা সুপথে চলে তাদের প্রতি আল্লাহ অনুগ্রহশীল, ক্ষমাশীল। তাদেরকে তিনি বিপদের মধ্যেও এমনিভাবে সকল উপায় দিয়ে নিষ্কৃতির পথ করে দেন এবং ক্ষমা প্রদর্শন করেন।

▪ **২.১৭৪** নিশ্চয়ই! যারা প্রেরীত গ্রন্থের সেসব বিষয় গোপন করে যা আল্লাহ অবতীর্ণ করেছেন এবং তার বিনিময়ে ক্ষুদ্র কোন সুবিধা অর্জন করে, তারা তাদের পেটে আগুন ছাড়া কিছুই ভক্ষণ করে না। পুনরুত্থান দিবসে আল্লাহ তাদের সঙ্গে কথা বলবেন না এবং তাদের বিকশিতও করা হবে না। তাদের জন্য রয়েছে বেদনাদায়ক শাস্তি : কি নিষিদ্ধ (হারাম), কি নিষিদ্ধ নয় (হালাল) মহান আল্লাহ পূর্বের প্রেরীত গ্রন্থসমুহেও সেসবের উল্লেখ করেছেন। এমনকি একজন নবীর আগমন হবে, তাঁর গুণাগুণ, চরিত্র, কর্ম ইত্যাদি বিষয়েও বলা হয় যে পূর্ববর্তী গ্রন্থে ইংগিত রয়েছে। কিন্তু পন্ডিতগণ গ্রন্থের বিশেষ বিশেষ কিছু অংশ সাধারণ মানুষকে জানতে দেয় না। উপরন্তু তারা

তাদের গ্রন্থে নিজেদের মনের মতো করে অনেক কিছুর প্রবেশ ঘটিয়েছে এবং ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ দাড় করিয়েছে। এভাবে সমাজে কুসংস্কার, ভূল প্রথা ও অপ্রয়োজনীয় বিধি-নিষেধ আরোপিত হয়েছে। ফলে মানুষ ভূল পথে চালিত হয়েছে। ইসরাইলের সন্তানদেরকে উদ্দেশ্য করে কথাগুলি বলা হয়েছে। তারা বাইবেলকে দূষিত করেছে। তাই এভাবে বলা হয়েছে যে,

“যারা কোরআনকে বিভিন্নভাবে বিভক্ত করেছে। তোমার পালনকর্তার শপথ তাদের প্রত্যেককে আমি প্রশ্ন করব তারা যা করেছে সে বিষয়ে।” (আল-কোরআন ১৫:৯১-৯৩)

নিজেদের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করতে গিয়ে ক্ষমতাশালীরা কখনও এ ধরণের কাজের আশ্রয় নিয়েছে। ধর্মযাজকেরা সেসব কাজে সমর্থন জানিয়েছে ও সহায়তা করেছে। কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করতে গিয়ে আল্লাহকে ব্যাবহার করা হয়েছে। যথাযথ গ্রন্থকে ব্যাবহার ও বিকৃত করা হয়েছে। কেউই এসব কাজের বিরোধীতা করেনি বা করতে পারেনি। বস্তুত যারা এমন কাজ করেছে তারা অন্যায় করেছে। তারা আল্লাহর বাণী গোপন করে পার্থিব সুবিধা লুটে নিতে চেয়েছে। আবার আল্লাহর বাণীর অনুসারীও সেজেছে। এটি অপরাপর অপরাধের চেয়েও বড় অন্যায়।

ক্ষণস্থায়ী পৃথিবীতে ক্ষুদ্র কিছু গোষ্ঠী বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর অকল্যাণের বিপরীতে অল্প কিছুদিনের জন্য এমন সব অন্যায় কাজ করে জাগতিক কিছু সুবিধা পেতে চায়। মানবসমাজের সার্বিক মঙ্গলের জন্য আল্লাহ যে পথ-নির্দেশনা প্রেরণ করেছেন তাদের এহেন কার্যকলাপ গোটা সমাজকে কলুষিত করার পথ সৃষ্টি করে দেয়। বিনিময়ে তারা যে সুবিধা পায় তা বৃহত্তর মানবসমাজের কল্যাণ বিবেচনায় অতি অতি ক্ষুদ্র। আল্লাহ তাদের বিষয়ে কি করবেন এখানে সেটি তুলে ধরা হয়েছে। যার অতিরিক্ত ব্যাখ্যা নিষ্প্রয়োজন।

▪ **২.১৭৫** এরাই হল তারা যারা সঠিক দিক-নির্দেশনার পরিবর্তে ভূল পথ ক্রয় করে এবং ক্ষমার পরিবর্তে ক্রয় করে শাস্তি। আগুনের পানে ছুটে যাবার জন্য তারা কেমন অনড় : পথ-নির্দেশনা আসার পরেও কিছু মানুষ তার প্রতি উদাসীন। এরাই হচ্ছে তারা যাদের বিষয়ে পূর্বের আয়াতে বলা হয়েছে। বস্তুত এরা ভূল কাজ করে ও ভূল পথ বেছে নেয়।

মহান অল্লাহ ক্ষমাশীল। পরম দয়ালু। এরা মন্দ কাজ পরিত্যাগ ও সঠিক পথ গ্রহণ করে আল্লাহর ক্ষমার গুণের সুযোগ গ্রহণ করা থেকেও নিজেদেরকে বঞ্চিত করে। ফলে তারা নিজেরাই যেন নিজেদেরকে শাস্তি তথা নরকের আগুনের দিকে নিয়ে যেতে ইচ্ছুক মনে হয়। তাই বলা হয়েছে, 'আগুনের পানে ছুটে যাবার জন্য তারা কেমন অনড়!'

■ **২.১৭৬** এটি এজন্য যে, আল্লাহ এ গ্রন্থ অবতীর্ণ করেছেন সত্যসহ। যারা গ্রন্থের মধ্যে মতবিরোধ সৃষ্টির কারণ খুঁজে পায় তারা বিভক্তি সৃষ্টি করে : আল্লাহ সত্যের আলোকে যথাযথরূপে মানবসমাজের দিক-নির্দেশনাস্বরূপ গ্রন্থ তথা কোরআন অবতীর্ণ করেছেন। যারা প্রেরীত গ্রন্থের সত্য বিষয়গুলিকে গোপন করে বা বিকৃত করার চেষ্টা করে, যা পূর্বের আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছে তারা মূলত দর্শনের মধ্যে বিভক্তি ও বিতর্ক সৃষ্টি করার চেষ্টা করে। যা মানবসমাজকে বিভক্ত করে ও বিভ্রান্তিতে ফেলে দেয়।

গ্রন্থে সুস্পষ্ট নির্দেশনা তুলে ধরার পরও এমনিভাবে যারা বিতর্কের সৃষ্টি করে এবং মতবিরোধ সৃষ্টি করার কারণ অনুসন্ধান করে, মূলত তারা শৃংখলা ভঙ্গের পাঁয়তারা করে। তারা সত্য গোপন করে। নিজেদের স্বার্থে মিথ্যেকে প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা করে। এ ধরণের কর্মকান্ড হয়ত কিছু মানুষকে স্বল্প সময়ের জন্য সুবিধা এনে দিতে পারে, কিন্তু বৃহত্তর জনগোষ্ঠীকে দীর্ঘমেয়াদে ভূল ও বিভ্রান্তির মধ্যে ফেলে দেয়। কোন সমস্যার যথাযথ সমাধান ও সঠিক পথে চলার পথ রুদ্ধ করে দেয়। নিজেদের প্রজন্মকেও ঝুঁকির মধ্যে ফেলে দেয়।

কিছু মানুষ ব্যাক্তিক বা নির্দিষ্ট একটি গোষ্ঠী বা দলের সুবিধা প্রাপ্তির জন্য এ ধরণের কাজ করে। তারা বৃহত্তর কল্যাণ ও মানবতা নিয়ে ভাবে না। এসবের মাধ্যমে ক্ষমতার ব্যাবহার বা নেতৃত্বের খায়েস পূর্ণ করতে চায়। কিন্তু এভাবে এটি করা যে বর্জনীয় এখানে সে বিষয়টি উঠে এসেছে।

সমর্পনের বিরুদ্ধ আচরণ এগুলি। এ ধরণের কাজ কৃত্রিমভাবে এক ধরণের পরিস্থিতি সৃষ্টি করে। যার শেষ পরিণতি সকলের জন্য খারাপ। পৃথিবীর ইতিহাসের দিকে ফিরে তাকালেও এসবের বাস্তব উদাহরণ পাওয়া যাবে। বস্তুত সকল ক্ষমতা অজানা-অচেনা আল্লাহর হাতে। ভূল ও অন্যায় কাজ বা ষড়যন্ত্র

বা নানাবিধ মন্দ কৌশল অবলম্বন করেও পৃথিবীতে কেউই কখনও নিজেদেরকে টিকিয়ে রাখতে পারেনি। বরং ধ্বংস হয়েছে। ইতিহাসের দিকে তাকালে সেটি সহজেই জানা যায়। মানুষ আরও কতকাল নিজেদেরকে বোকা বানিয়ে রাখবে?

আল্লাহর কাছে সমর্পন ভিন্ন এসবের সঠিক উত্তর বা সমাধান নেই। এটিই কোরআনের দর্শন। কোরআন সে বাণীই মানুষের কাছে তুলে ধরেছে। প্রকৃতি ও পরিবেশের স্বাভাবিক গতি ও প্রবণতার সাথে তাল রেখে চলতে জানা ও পারাই আল্লাহর প্রতি সমর্পনের একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক [সমর্পন দ্রষ্টব্য ১.৫]। যারা সমাজে তথা একটি ভাল দর্শনের মাঝে বিভক্তি সৃষ্টি করার চেষ্টা করবে, বস্তুত তারা সমাজে বিশৃংখলা সৃষ্টি করার মাধ্যমে একটি বড় রকমের অন্যায় কাজ করবে। অন্যায় কাজের অবধারিত ফল মন্দ পরিণতি। যা সমাজের সকলকেও একসময় ভোগ করতে হতে পারে। তাই অন্যায় কাজকে প্রতিরোধ করা নিজেদের প্রয়োজনেই সকলের কর্তব্য।

১৬৮ থেকে ১৭৬ নং আয়াতে কুসংস্কার ও অজ্ঞতাজনিত কারণে খাবারের বিষয়ে নিজেদেরই আরোপ করা নানাবিধ বিধি-নিষেধ থেকে মানুষকে মুক্ত হতে আহবান করা হয়েছে। এ বিষয়ে কোরআনে আল্লাহ যেমন নির্দেশনা দিয়েছেন তা অনুসরণ করতে বলা হয়েছে। গ্রন্থের মধ্যে মতবিরোধ সৃষ্টির কারণ খুঁজতে নিরুৎসাহিত করা হয়েছে। কোরআন সত্যের ভিত্তিতেই সকল নির্দেশনা জারি করেছে। যেমন খাদ্য হিসেবে সেটি গ্রহণ করতে বলা হয়েছে, যেটি উপকারী এবং ক্ষতিকর নয়। এ বিষয়ে এর চেয়ে সত্য দিক-নির্দেশনা আর কি হতে পারে?

সমাজে সৃষ্ট ও বিদ্যমান কুসংস্কারাচ্ছন্ন নানাবিধ বিধি-বিধানকে শয়তান মানুষের সামনে এমনভাবে তুলে ধরে যেন সেসবও ধর্মীয় বিধি-নিষেধের অংশবিশেষ ও আল্লাহর নির্দেশনা। যদিও আল্লাহর তেমন নির্দেশনা নেই। ওপরের আলোচনা থেকে জানা যায় যে, অনেক নিয়ম-কানুন মানুষ ধারাবাহিকভাবে পূর্ব-পুরুষদের অনুসরণ করার মাধ্যমে পেয়েছে। অথচ পূর্ব-পুরুষদেরও এসব বিষয়ে যথাযথ কোন জ্ঞান ছিল না।

নিজের পছন্দের ওপর ভিত্তি করে কেউ কোন খাবার পরিত্যাগ করেছে, কিংবা আরও কারণ থাকতে পারে; কিন্তু পরবর্তীতে উত্তরসূরীরা তা অনুসরণ

করেছে। কালক্রমে সেটিই বিধি-নিষেধ বা নিয়মে পরিণত হয়েছে। এভাবে সমাজে কুসংস্কার প্রবেশ করেছে বা প্রতিষ্ঠা পেয়েছে।

পন্ডিত বা ধর্মযাজকগণও নানাবিধ বিধি-নিষেধ আরোপ করে সমাজে নিজেদের গুরুত্ব ও মর্যাদাকে বৃদ্ধি করার প্রয়াস পেয়েছে। সাধারণ মানুষ তাদের কাছে বিষয়গুলির যথাযথতা বিষয়ে জানতে চেয়েছে, কিন্তু সত্যের জ্ঞান থাকা সত্বেও তাদের অনেকেই যথাযথ পথ প্রদর্শন করেনি।

বিশ্বাসীদেরকে তাই যেই হোক না কেন এমনকি পন্ডিত, ধর্মযাজক, রাব্বিস বা পুর্ব-পুরুষ কর্তৃক আরোপিত বিধি-বিহিঃর্ভূত অপ্রয়োজনীয়, অতিরঞ্জিত, অযথা, মিথ্যে বা ভূল এসব নিয়ম-বিধিকে ভেঙ্গে ফেলার নির্দেশনা দেয়া হয়েছে। আল্লাহ যেমন নির্দেশনা দিয়েছেন সেটি অনুসরণ করতে বলা হয়েছে। এ বিষয়ে মতভেদ সৃষ্টি করতে বারণ করা হয়েছে।

➢ (আয়াত ১৭৭) সঠিক বা যথাযথ কাজ কি (Right Deed) সে বিষয়ে এখানে একটি স্বচ্ছ ধারণা তুলে ধরা হয়েছে। যেন এ বিষয়ে মানুষের মাঝে বিতর্ক ও ভূল বুঝাবুঝির অবকাশ না থাকে। কেবল ধর্মীয় বিষয়গুলির ওপর গুরুত্ব দিলেই হবে না, বাস্তব জীবনের প্রয়োজনীয় কাজগুলিও যথাযথভাবে পরিপালন করতে হবে।

১৭৭	সঠিক কাজ শুধু এই নয় যে পূর্ব কিংবা পশ্চিম দিকে মুখ করা, বরং সে-ই সঠিক পথ অবলম্বনকারী যে বিশ্বাস করে আল্লাহতে, শেষ দিবসে, ফেরেশতাদের ওপর, অবতীর্ণ গ্রন্থে এবং বার্তাবাহকগনের ওপর এবং যে তাঁকে ভালবেসে সম্পদ ব্যায় করে আত্নীয়-স্বজন, ইয়াতীম, অভাবী, ভবঘুরে, ভিক্ষুক ও ক্রীতদাসদের মুক্ত করার জন্য এবং যারা যথাযথভাবে উপাসনা পালন করে এবং গরীবের প্রাপ্য অংশ (যাকাত) প্রদান করে এবং যারা কৃত প্রতিজ্ঞা বা প্রতিশ্রুতি পালন করে এবং অভাবে, বিপদ-আপদে ও চাপের মুখে ধৈর্য্যধারণ করে। তারাই হল সত্যনিষ্ঠ। তারাই খোদাভীরু। (It is not righteousness that ye turn your faces to the East and the West; but righteous is he who believeth in Allah and the Last Day

	and the angels and the Scripture and the prophets; and giveth wealth, for love of Him, to kinsfolk and to orphans and the needy and the wayfarer and to those who ask, and to set slaves free; and observeth proper worship and payeth the poor-due. And those who keep their treaty when they make one, and the patient in tribulation and adversity and time of stress. Such are they who are sincere. Such are the God-fearing.)

▪ **২.১৭৭** সঠিক কাজ শুধু এই নয় যে পূর্ব কিংবা পশ্চিম দিকে মুখ করা, বরং সে-ই সঠিক পথ অবলম্বনকারী যে বিশ্বাস করে আল্লাহতে, শেষ দিবসে, ... সম্পদ ব্যায় করে আত্নীয়-স্বজন, ইয়াতীম, অভাবী, ভবঘুরে, ভিক্ষুক ও ক্রীতদাসদের মুক্ত করার জন্য ... প্রতিশ্রুতি পালন করে এবং অভাবে, বিপদ-আপদে ও চাপের মুখে ধৈর্য্যধারণ করে। তারাই হল সত্যনিষ্ঠ। তারাই খোদাভীরু : এটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি আয়াত। এ আয়াতের মধ্যে কোরআনের মর্মবাণীও নিহিত রয়েছে। সঠিক কাজ কি সে বিষয়টি এখানে স্পষ্টভাবে ব্যাক্ত করা হয়েছে। যেন এ বিষয়ে মানুষের মাঝে বিতর্ক ও ভূল বুঝাবুঝির কোন অবকাশ না থাকে।

সঠিক কাজের সাথে সত্যের একটি সম্পর্ক আছে। মানুষকে সত্য পথে ধরে রাখার প্রয়োজনেই ধর্মীয় আচার-রীতি, বিধি-বিধানসমূহ অন্তর্ভূক্ত হয়েছে। বিশাল মানবগোষ্ঠীর সুষ্ঠু ব্যাবস্থাপনা ও শৃংখলার জন্য এসব বিধি-বিধান প্রয়োজনীয়। কিন্তু সত্য ও সঠিক পথটি কি সে বিষয়টিও কিছু মানুষকে জানতে, বুঝতে ও উপলব্ধি করতে হবে। বিশেষত যারা মানবসমাজ পরিচালনার সাথে যুক্ত থাকতে চান তাদের।

ইতিপূর্বে কেবলা পরিবর্তন বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে (দ্রষ্টব্য আল-কোরআন ২:১৪২-১৫২)। দেখা গেছে যে, কেবলা পরিবর্তনের সিদ্ধান্তের কারণে কিছু মানুষ হতবাক হয়েছে। কেউ কেউ এর বিরূপ সমালোচনা করারও প্রয়াস পেয়েছে। মনে হচ্ছে যেন এর সাথে ধর্ম বিচ্যুতি ঘটে গেছে।

কিন্তু সত্য হচ্ছে যে, এগুলি ধর্মীয় রীতি-বিধি, আচার-অনুষ্ঠানের সাথে সম্পর্কিত বিষয়।

একবার কোন একটি দিক বা কেবলা নির্ধারণ করা হয়ে গেলে কালক্রমে সেটি ধর্মীয় নিয়ম-বিধিরূপে প্রতিষ্ঠা পেয়ে যায়। দিকটি তখন গুরুত্বপূর্ণ হয়ে যায়। কিন্তু সত্য হচ্ছে আল্লাহ সর্বত্র বিরাজমান। তাকে সেজদা করার জন্য নির্দিষ্ট কোন দিকের প্রয়োজন হয় না। কিন্তু শৃংখলার প্রয়োজনে দিক বা একটি কেবলা নির্ধারণ করা প্রয়োজন। তাই বলা হয়েছে,

"প্রত্যেকেরই একটি দিক আছে যে দিকে সে মুখ করে (উপাসনার জন্য)। অতএব একে অপরের সঙ্গে প্রতিযোগিতা কর ভাল কাজে। তোমরা যেখানেই থাক না কেন আল্লাহ অবশ্যই তোমাদেরকে সমবেত করবেন।"

শৃংখলার প্রয়োজনে দিক বা একটি কেবলা নির্ধারণ করা প্রয়োজন হলেও আল্লাহ যেদিন সকলকে বিচারের জন্য সমবেত করবেন সেদিন ভাল-মন্দ কাজের ভিত্তিতেই বিচার করবেন। কোনদিকে মুখ করেছে সেটি মূখ্য বিবেচ্য নয়।

সঠিক কাজের সাথে সত্যের সম্পর্ক আছে। সত্যকে বোঝা তাই খুবই গুরুত্বপূর্ণ। সত্য হচ্ছে আল্লাহ সর্বত্র বিরাজ করেন। তাকে সেজদা করার জন্য নির্দিষ্ট কোন দিকের প্রয়োজন নেই। তাঁকে যে কোনভাবেই স্মরণ করা যায়। অপরদিকে ধর্মীয় রীতি-বিধি পরিপালন করা ভিন্ন বিষয়। বিধি-বিধান সকলকে একটি নিয়মের মধ্যে সুশৃংখল রাখে। এখানেই সত্য ও বিধি-বিধানের সূক্ষ্ম পার্থক্য। তাই বলা হয়েছে,

"কেবলমাত্র সর্ব-সাধারনকে শিক্ষাদানের জন্য হলেও তুমি তোমার জন্য নির্দেশিত দায়িত্ব পালন করা উচিত।

কোন মহান ব্যাক্তির দ্বারা যে কোন কাজই সম্পন্ন হোক না কেন, সাধারণ মানুষ তার পদাঙ্ক অনুসরণ করে এবং উদাহরণমূলক কাজের মাধ্যমে সে যে মান নির্ধারণ করে সারা পৃথিবী তা অনুসরণ করে।

এই ত্রিভূবনে আমার জন্য নির্ধারিত কোন কাজ নেই। না আমার কোন কিছুর চাহিদা আছে, না আমার কোন কিছু অর্জনের প্রয়োজন আছে, তথাপি আমি কর্মে ব্যাপৃত আছি।

যদি আমি কাজে সম্পৃক্ত না থাকি, নিশ্চিতভাবেই সকল মানুষ আমার পথ অনুসরণ করবে। যদি আমি কর্ম থেকে নিজেকে সরিয়ে নেই, তাহলে বিশ্বসমুহ ধ্বংসে পতিত হবে, সকলের সর্বনাশ হবে। (গীতা ৩:২০-২৪)

কোরআনে বলা হয়েছে, "প্রত্যহ তিনি তাঁর কর্মে রত।" (আল-কোরআন ৫৫:২৯)

কিছু কাজ করতে হয় সর্ব সাধারণের জন্য। তাদেরকে সঠিক পথে চালনা করার জন্য বা নিয়মের মধ্যে ধরে রাখার জন্য। জাগতিক শৃংখলার জন্য।

আয়াতে উদ্ধৃত 'সঠিক কাজ শুধু এই নয় যে পূর্ব কিংবা পশ্চিম দিকে মুখ করা' বলতে এখানে ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান পালনের আতিশয্যকে বোঝান হয়েছে। অর্থাৎ কেবলমাত্র 'পূর্ব-পশ্চিম দিকে মুখ করা' কিংবা অভ্যাসের বশবর্তী হয়ে ব্যাহ্যিক উপাসনা করা বা অত্যাধিক ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান পালন করাই সঠিক কাজ নয়।

বস্তুত সকল বিধি-বিধান মেনে চলার কিছু লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য আছে। সে লক্ষ্যটিই আসল। লক্ষ্য অর্জিত না হলে অতিরঞ্জিত ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান পালন করা অর্থহীন।

ধর্মীয় অনুষ্ঠান পালন করা ছাড়াও জাগতিক প্রয়োজনে প্রয়োজনীয় কাজসমুহ গুরুত্বের সাথে করতে বলা হয়েছে। যা নিয়ম-বিধি পালনের পেছনের মূল কারণ। যা মহাবিশ্বকে সৃশৃংখলভাবে পরিচালিত হতে সহায়তা করে। আয়াতে সে বিষয়টিই গুরুত্বের সাথে তুলে ধরা হয়েছে।

সঠিক কাজের সাথে বস্তুত বাস্তবে মানুষের কল্যাণ সাধনের সম্পর্ক আছে। সম্পর্ক আছে পৃথিবীর উন্নয়ন ও অগ্রগতির। তাই আল্লাহতে বিশ্বাস, শেষ দিবসে বিশ্বাস ইত্যাদি ধর্মীয় বিষয়গুলির পাশাপাশি বাস্তব জীবনের প্রয়োজনীয় ও গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলিকে আয়াতের শেষাংশে তুলে ধরা হয়েছে। শান্তিপূর্ণ মানব জীবন গড়ে তোলার জন্য এ বিষয়গুলি অবধারিতরূপে সত্য। সেগুলিকে ফলদায়ক করার জন্যই ধর্মীয় বিধানাবলী প্রতিষ্ঠা পেয়েছে। যদি মূল লক্ষ্যই অর্জন করা সম্ভব না হয়, তবে ধর্মীয় বিষয়গুলির পরিপালন নিরর্থক হয়ে যাবে। সেক্ষেত্রে মানব মস্তিষ্ক প্রয়োজনহীন কল্পিত বিষয়ে হাবুডুবু খাবে। মানব জীবনটাই আর অর্থপূর্ণ হবে না।

অতএব 'চরম সত্য' হচ্ছে 'বাস্তব জীবন'কে সুশৃংখলভাবে গড়ে তোলা। যথাযথভাবে পরিচালনা করা। জীবন ও জগতে শান্তি প্রতিষ্ঠা করা। সৃষ্টি সুরক্ষার জন্য যা অতি প্রয়োজনীয়। এটি মূল লক্ষ্য। এ লক্ষ্যকেই অর্জন করতে হবে। এটিই বাস্তব সত্য। কিন্তু সত্যকে নিশ্চিতভাবে অর্জন করার জন্য সুশৃংখল পরিচালনার সুবিধার্থে ধর্মীয় বিষয়গুলি আরেক সত্য। তাই সেগুলিও প্রয়োজনীয় হয়ে ওঠে।

উল্লেখ্য যে, জাগতিক কল্যাণে গৃহিত প্রতিটি কাজ নিষ্ঠার সঙ্গে যথাযথভাবে পালন করা উপাসনারই অন্তর্ভূক্ত বিষয় [উপাসনা দ্রষ্টব্য ২.৩.২]। যদি উপাসনার মূল উদ্দেশ্য অর্জন না হয় তাহলে উপাসনা পালন করা ব্যার্থতায় পর্যবেশিত হবে।

আল্লাহতে বিশ্বাস করা, শেষ দিবসে বিশ্বাস করা, ফেরেশতাদের বিদ্যমানতায় বিশ্বাস করা, অবতীর্ণ গ্রন্থ ও বার্তাবাহকগনের ওপর বিশ্বাস রাখা এ সবকিছুর পেছনে কিছু লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য আছে। মানুষকে ভাল কাজে উদ্বুদ্ধ করতে এ বিশ্বাসগুলি সহায়ক হয়ে কাজ করে। ভাল কাজই মানুষকে উচ্চমানে উন্নীত করে।

কার্যকারণ সম্পর্কে সম্পর্কিত আল্লাহর নিয়ম বা সূত্র সেভাবে সাজানো। সূত্র মেনে চললে মানুষ পৃথিবীতেই স্বর্গীয় সুখ লাভ করতে পারবে। মানুষকে সে সুখ নিজে অর্জন করে নিতে হবে নিজেদের কর্ম ও আচরণ দিয়ে। পথ-নির্দেশনার অনুসরণ আপনাতেই সে অর্জনকে সম্ভব করে তুলবে। তেমনই এ ধর্মের দর্শন।

বলেছি মানুষকে সুখ অর্জন করে নিতে হবে। মানুষ পৃথিবীতেও স্বর্গীয় সুখ লাভ করতে পারে। আবার বিধাতা চাইলে তৈরীকৃত কোন স্বর্গে মানুষকে সরাসরি প্রেরণ করতে পারেন। যেমন তিনি মানুষকে পৃথিবীতে পাঠিয়েছেন। নিজেদের কার্যকলাপ দিয়ে মানুষ যেন আমরা এ জগতকে নরকে পরিণত করে না ফেলি সেটিই বোধসম্পন্ন মানুষদের গুরুত্বপূর্ণ কাজ।

মানব সৃষ্টির প্রাক্কালে মানুষকে নিয়ে ফেরেশতারা আশংকা প্রকাশ করে বলেছিল যে, 'আপনি কি পৃথিবীতে এমন কাউকে প্রেরণ করবেন যারা দাঙ্গা-হাঙ্গামার সৃষ্টি করবে এবং রক্তপাত ঘটাবে (দ্রষ্টব্য ২:৩০)?' সে আশংকাকে আমরা যেন নিজেদের কর্ম ও আচরণ দিয়ে সত্যে পরিণত না করি। বরং

আল্লাহ যেমনটি বলেছেন যে, 'আমি যা জানি তোমরা তা জান না' সেটিকে সত্যরূপে প্রতিষ্ঠা করাই মানুষের যথাযথ কাজ।

লক্ষ্য করলে দেখা যাবে যে, আয়াতে প্রথমে ধর্মীয় বিষয়ে কিছু শর্তে বিশ্বাস করতে বলা হয়েছে। পরবর্তীতে বাস্তব জীবনের প্রয়োজনে গুরুত্বপূর্ণ কাজসমুহের উদাহরণ তুলে ধরা হয়েছে। বস্তুত মানুষ যেন বাস্তব জীবনের কাজগুলি যথাযথভাবে পালন করে সেজন্যই অপরাপর শর্তগুলি মেনে চলাও সঠিক কাজরূপে বিবেচিত। বাস্তবের কাজগুলি যদি পরিপালিত না হয়, তবে ধর্মীয় কাজগুলি সত্যিকার অর্থে ফলদায়ক হবে না। লক্ষ্যবিহীন কর্মে পরিণত হবে।

পরের নির্দেশনাগুলি যদি আমরা ভালভাবে লক্ষ্য করি তবে দেখা যাবে যে, উপাসনা যথাযথভাবে পালন করতে বলা হয়েছে। উল্লেখ্য যে, আল্লাহকে স্মরণ করার জন্য উপাসনার একটি প্রাতিষ্ঠানিক দিক আছে অর্থাৎ নির্দিষ্ট সময়ে, নির্দিষ্ট স্থানে সকলে মিলে সালাত আদায় করা। আবার যেখান থেকে মানুষের আহারের সংস্থান হয়, কিংবা আত্মা তৃপ্ত হয় অর্থাৎ নিজ নিজ দায়িত্ব-কর্তব্য যথাযথভাবে পালন করাও উপাসনারই অন্তর্ভূক্ত বিষয়। এগুলি বাস্তব জীবনের সাথে সম্পৃক্ত বিষয়। আয়াতে বাস্তব জীবনকে গুরুত্ব দেয়ার প্রতি জোর দেয়া হয়েছে।

বলা হচ্ছে, আল্লাহকে ভালবেসে যে সম্পদ ব্যায় করে অর্থাৎ আত্নীয়-স্বজন, ইয়াতীম, অভাবী, ভবঘুরে, ভিক্ষুক এমনকি ক্রীতদাসদের মুক্ত করার জন্য ব্যায় করে তারা সঠিক কাজ করে। এখানে বাস্তব জীবনের সমস্যাগুলির সমাধানের প্রতি জোর দেয়া হয়েছে। আল্লাহতে বিশ্বাস, পরকালে বিশ্বাস উপাসনা পালন ইত্যাদি বিষয়সমুহ আল্লাহর এ নির্দেশনার বাস্তবায়নকে মূলত বেগবান করে। তাই সেগুলি গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু মূল কাজ হচ্ছে জাগতিক সমস্যার সমাধানে কাজ করা। এটিই সত্য। যেন এ জগতই এক স্বর্গে রূপান্তরীত হয়।

'সম্পদ' যা অর্থনীতির সাথে সম্পর্কিত বিষয় তার যথাযথ ব্যাবহার গুরুত্বপূর্ণ। যতদিন মানুষ স্বর্গীয় নিয়ম-রীতি পৃথিবীতে গড়ে তুলতে না পারছে ততদিন এভাবে অসহায়-দুঃখী মানুষদের সহায়তা করে যেতে হবে। তার মানে এই নয় যে, দান ও যাকাতের সওয়াব অর্জনের জন্য কিছু মানুষকে চিরকাল

দরীদ্র বানিয়ে রাখতে হবে। দারীদ্রতা দুর করাই লক্ষ্য। দারীদ্রতা দুর করতে হবে।

চৌদ্দ'শ বছর আগে বর্তমান সময়ের উপযোগী কোন নিয়ম প্রবর্তন করা হলে সেটি যথাযথ হত না। যে সময়ে দারীদ্রতা দুর হয়ে যাবে সে সময়ে যাকাতের নিয়মের কি হবে? তাই আল্লাহ যখন যে নিয়ম প্রবর্তন করেন তা যুগপোযুগী করেই করেন। যাকাতের বিষয়ে পূর্বেও আলোচনা করা হয়েছে (দ্রষ্টব্য ২.৩.৩)।

কারও মনে প্রশ্ন জাগতে পারে যে আল্লাহ তো সব পারেন তবে তিনি প্রথম থেকেই কেন মানুষকে দারীদ্র মুক্ত করে দিলেন না? আল্লাহ তো এমনও পারেন যে, মানুষকে নড়াচড়াই করতে হবে না। রুগীর মতো শয্যায় রেখে পেট ভর্তী করে খাবার ঢুকিয়ে দিতে পারেন। গাড়ি-বাড়ী কিছু না দিয়েও তা অর্জনের সুখানুভূতিটুকুও দিয়ে দিতে পারেন। তাহলে এত আয়োজন কেন? আদম-হাওয়াকে কি তেমন স্বর্গীয় সুখের জীবন দেয়া হয়নি?

আল্লাহ মানুষকে পরীক্ষা করেন। অতএব আল্লাহ কি করেননি সেটি না ভেবে বরং তিনি কি করতে বলেছেন সেটি নিয়ে ভাবতে হবে। অতিরঞ্জিত ও অপ্রয়োজনীয় ভাবনার দরকার নেই।

গরীবের প্রাপ্য অংশ অর্থাৎ যাকাত প্রদান করার কথা বলা হয়েছে। যা বাস্তব জীবনে মানুষের কল্যাণের সাথে সরাসরি সম্পর্কিত একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। অর্থনীতির সাথে সম্পর্কিত বিষয়। এসব কাজ পরিপালনের সাথে আল্লাহ প্রদত্ত সওয়াব বা পুরস্কারকে সংযুক্ত করে দেয়া হয়েছে। যেন মানুষ নির্দেশনা পরিপালনে উৎসাহী ও যত্নবান হয়। আল্লাহতে বিশ্বাস ভিন্ন এসব কাজ কার্যকরি হবে না। তাই আল্লাহতে বিশ্বাস গুরুত্বপূর্ণ। তাই সেটিও সঠিক কাজের অন্তর্ভূক্ত।

সব মানুষ একই রকম জ্ঞানে জ্ঞানান্বিত নয়। কিছু মানুষ বিনিময় প্রাপ্তি বা প্রাপ্তির আশ্বাস ছাড়া কাজ করে না। তাই ভাল কাজের জন্য সর্বত্র পুরস্কার প্রাপ্তির ঘোষনা রয়েছে। আবার ভাল কাজ বাস্তবেও সরাসরি যে ফল দেয় সেটিকেও পুরস্কাররূপে বিবেচনা করতে হবে।

কৃত প্রতিজ্ঞা বা প্রতিশ্রুতি পালনের কথা বলা হয়েছে। বিষয়টিকে দু'ভাবে দেখা যেতে পারে। একটি হচ্ছে মানুষের সাথে মানুষের করা প্রতিশ্রুতি পালন

করা। যা পরিপালিত না হলে মিথ্যের অপরাধ হবে। যা থেকে বাস্তব জীবনে সকল অন্যায়-অপরাধ ও বিশৃংখলার সৃষ্টি হয়ে থাকে। যার ফলাফল মন্দ।

অপরটি হচ্ছে আল্লাহর সাথে মানুষের কৃত অঙ্গীকার পালন করা যা ছিন্ন হলে সেই একই বিশৃংখলার সৃষ্টি হবে [অঙ্গীকার দ্রষ্টব্য ২.২৭]। বিষয়টি সরাসরি অবিশ্বাসের সাথেও সম্পর্কিত। তাই বলা হচ্ছে যে, কেবল পূর্ব-পশ্চিমে মুখ করাই নয় অর্থাৎ অতিরিক্ত ধর্মীয় বিষয় তথা আচার-অনুষ্ঠান, নিয়ম রক্ষা এসব পরিপালনই নয়, বরং জীবনকে সুপথে পরিচালনা করা বা মন্দ কাজের ছোবল থেকে রক্ষা করাই সঠিক কাজ। অত্যান্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি আয়াত এটি। যার মর্মার্থ সঠিকভাবে অনুধাবন করতে পারলে একজন মানুষ ভ্রান্ত ধারণার উর্ধ্বে উঠে যথাযথ মানুষ হয়ে গড়ে উঠতে পারবে।

মানুষ নষ্ট হয় অভাবের কারণে। নষ্ট হওয়ার এটি অন্যতম একটি কারণ। কিছু মানুষ লোভে পরে নষ্ট হয়। তাদের কথা বলা হচ্ছে না। তারা তাদের প্রাপ্য পাবে। কিন্তু কিছু মানুষ কোনভাবেই নিজেদেরকে অন্যায় কাজে জড়াতে চায় না। তারা শেষ অবধি চেষ্টা করে যায় নিজেদেরকে সত্যের পথে ধরে রাখতে। কিন্তু শয়তান বা শয়তানরুপী মানুষ তাদের অভাবের সুযোগ নিয়ে নষ্ট পথে যেতে উদ্বুদ্ধ বা এক প্রকার বাধ্য করে। আবার অনেক সময় আল্লাহ নিজেই চিত্তের দৃঢ়তা পরীক্ষা করার জন্য ভালদেরকে তেমন বিপদের মুখোমুখী করে দেন। যারা তেমন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে অভাবে, বিপদ-আপদে ও চাপের মুখে ধৈর্য্যধারণ করে, বলা হচ্ছে তারাই সত্যনিষ্ঠ। তারাই সাচ্চা মানুষ। তারাই খোদাভীরু। পরীক্ষায় উত্তীর্ণ। এখানে সত্যকে বোঝাবার জন্য বাস্তব জীবনের গুরুত্বপূর্ণ কিছু উদাহরণ তুলে ধরা হয়েছে। তবে এটিও বুঝতে হবে যে এগুলিই শেষ কথা নয়।

অতএব স্বর্গে গমনের তীব্র বাসনাতে কেবল ধর্মীয় বিধি-বিধানের আতিশয্যই নয়, বরং বাস্তব জীবনের প্রয়োজনেই ভাল কাজ করতে হবে।

আয়াতে উদ্ধৃত কয়েকটি প্রয়োজনীয় বিষয়ের সঙ্গা নিচে তুলে ধরা হল।

- মিসকিন: যার নিকট এই পরিমান জিনিষ নেই যা তার খাওয়া-পরা ও বসবাসের জন্য যথেষ্ট হতে পারে। অর্থাৎ যা দ্বারা তার সমস্ত কাজ চলতে পারে।

- ইয়াতীম: এমন ছোট ছেলে যার পিতা (উপার্জনক্ষম অভিভাবক) মারা গেছে। তার অন্য কোন উপার্জনকারী নেই। তার নিজেরও উপার্জন করার ক্ষমতা নেই। তবে পূর্ণ বয়স্ক হওয়ার পর সে আর ইয়াতীম থাকে না।
- মুসাফির: যার কাছে সফরের খরচ নেই।
- ভিক্ষুক: যারা নিজেদের প্রয়োজন প্রকাশ করতঃ মানুষের নিকট ভিক্ষা যাঞ্চা করে।

➢ (আয়াত ১৭৮-১৭৯) হত্যা ও তার প্রতিশোধ বা প্রতিকার (Murder and Retaliation) প্রসঙ্গে বলা হয়েছে।

১৭৮	হে বিশ্বাসীগন! তোমাদের প্রতি হত্যার ক্ষেত্রে কেসাস গ্রহণ করা (শাস্তি প্রদানের ক্ষেত্রে সমতার নীতি) বিধিবদ্ধ করা হয়েছে। মুক্ত ব্যাক্তির বদলায় মুক্ত ব্যাক্তি, দাসের বদলায় দাস এবং নারীর বদলায় নারী। অতঃপর তার (আঘাতপ্রাপ্ত ব্যাক্তির) ভাইয়ের তরফ থেকে যদি কাউকে কিছুটা মাফ করে দেয়া হয়, তবে প্রচলিত নিয়মের অনুসরণ করবে এবং সদয়তার সঙ্গে তাকে তার প্রদেয় প্রদান করবে। এটি তোমাদের পালনকর্তার পক্ষ থেকে ভার লাঘবকরণ এবং একটি বিশেষ অনুগ্রহ। এরপরও যে ব্যাক্তি সীমালংঘন করবে তার জন্য রয়েছে বেদনাদায়ক শাস্তি। (O ye who believe! Retaliation is prescribed for you in the matter of the murdered; the freeman for the freeman, and the slave for the slave, and the female for the female. And for him who is forgiven somewhat by his (injured) brother, prosecution according to usage and payment unto him in kindness. This is an alleviation and a mercy from your Lord. He who transgresseth after this will have a painful doom.)
১৭৯	হে বোধসম্পন্ন মানুষ! কেসাসের মধ্যে তোমাদের জন্য রয়েছে জীবন, যেন তোমরা (মন্দ কর্ম/পথ থেকে) নিজেদেরকে রক্ষা করতে পার। (And there is life for you in retaliation, O men of

	understanding, that ye may ward off (evil).)

■ **২.১৭৮.১** হে বিশ্বাসীগন! তোমাদের প্রতি হত্যার ক্ষেত্রে কেসাস গ্রহণ করা বিধিবদ্ধ করা হয়েছে। মুক্ত ব্যাক্তির বদলায় মুক্ত ব্যাক্তি, দাসের বদলায় দাস এবং নারীর বদলায় নারী : হত্যার ক্ষেত্রে তার প্রতিকার গ্রহণ করাকে নিয়মসিদ্ধ বা স্বীকৃতি দেয়া হয়েছে এবং শাস্তি প্রদানের ক্ষেত্রে 'কেসাস' বা 'সমতার নীতি' গ্রহণ করাকে বিধিবদ্ধ করা হয়েছে। উল্লেখ্য যে, 'সমতার নীতি'-রও আবার যথাযথ ব্যাখ্যার প্রয়োজন আছে।

উল্লেখ্য যে, ইসলামের আবির্ভাবের পূর্বে আরবের তৎকালীন সমাজে হত্যাকারীর সম্প্রদায় থেকে নিহতের সম-মর্যাদার একজনকে হত্যা করার প্রচলন ছিল। সম-মর্যাদার না হলে প্রয়োজনে শতজনকে হত্যা করারও রীতির প্রচলন ছিল। অর্থাৎ রক্তের বদলা রক্ত। কিন্তু যদি হত্যাকারীর মর্যাদা উচ্চ পর্যায়ের হত তবে তারা তার বদলা নিত না। এমন ছিল বর্বর যুগের বিচার ব্যাবস্থা। বর্তমানেও কোন কোন ক্ষেত্রে তেমনটি হতে দেখা যায়।

এমন অন্যায় বিচার ব্যাবস্থাকে রোধ করার জন্য ইসলাম কেবলমাত্র হত্যাকারীর ওপর বদলা নেয়ার নির্দেশনা দিয়েছে। অপরাপরদের প্রতি নয়। এক্ষেত্রে মর্যাদা, জাতি, ধর্ম, বর্ণ এসব বিষয় ধর্তব্যের নয়। তাই বলা হয়েছে, মুক্ত ব্যাক্তির বদলায় মুক্ত ব্যাক্তি, দাসের বদলায় দাস এবং নারীর বদলায় নারী। উল্লেখ্য যে, একই প্রকারের নিষ্ঠুর উপায়ে হত্যাকারীকে হত্যা করতে বলা হয়নি। বরং প্রতিকার বা ব্যাবস্থা নেয়ার ক্ষেত্রে প্রচলিত স্বাভাবিক প্রক্রিয়া বা কোন যথাযথ উপায় অবলম্বন করাকে বুঝিয়েছে।

■ **২.১৭৮.২** অতঃপর তার ভাইয়ের তরফ থেকে যদি কাউকে কিছুটা মাফ করে দেয়া হয়, তবে প্রচলিত নিয়মের অনুসরণ করবে এবং সদয়তার সঙ্গে তাকে তার প্রদেয় প্রদান করবে : হত্যাকারী মানুষ হিসেবে নিহতের ভাই। সে ভূল করেছে। যদি তেমন বিবেচনায় মানবিকতা প্রদর্শন করে ভূক্তভোগীর পক্ষ থেকে কেউ হত্যাকারীর জীবন রক্ষা করতে চায় তবে সেটি করা যেতে পারে।

বলা হচ্ছে যে, তেমন ক্ষেত্রে প্রচলিত বিচার ব্যাবস্থায় বিচার সম্পন্ন হবে। যদি সঙ্গত মনে করে তবে নিহতের উত্তরাধিকারদের হত্যাকারীকে ক্ষমা করার অনুমোদন রয়েছে। সেক্ষেত্রে প্রচলিত বিচার ব্যাবস্থা মৃত্যুদন্ডের জন্য উৎসাহিত

করতে পারে না। তবে যথাযথ দাবীদার দাবী করলে রক্তের ঋণ অর্থমূল্য দ্বারা পরিশোধ করতে হবে। তাই বলা হয়েছে, ‘এবং সদয়তার সঙ্গে তাকে তার প্রদেয় প্রদান করবে।’

এখানে যেমন প্রতিকারের কথা বলা হয়েছে, তেমনি আবার মাফ করে দেয়ার অধিকারও দেয়া হয়েছে। এটিও প্রতিকারের একটি উপায়ের মধ্যে পরে। পরিস্থিতি বিবেচনা সাপেক্ষে প্রতিকারের উভয় বিধানই রাখা হয়েছে। সবকিছুই করতে হবে সদয়তার সঙ্গে। অন্তরের ক্ষোভ দুর করে। ক্ষোভ পোষন করে নয়। তাহলে উদ্দেশ্য অর্জন হবে না।

▪ **২.১৭৮.৩** এটি তোমাদের পালনকর্তার পক্ষ থেকে ভার লাঘবকরণ এবং একটি বিশেষ অনুগ্রহ : নিজের কোন লোক কারও দ্বারা নিহত হলে ভেতরে কেমন আগুন জ্বলে ওঠে সেটি ভূক্তভোগী মাত্রই জানে। প্রতিশোধের আগুন জ্বলে ওঠে। প্রতিশোধ না নেয়া পর্যন্ত সে আগুন কমে না। এখানে কমে না বলা হয়েছে। কেননা সে আগুন নেভে না। আপনজনকে আর কোনদিনই ফিরে পাওয়া সম্ভব না। অতঃপর এ প্রতিশোধ স্পৃহা বংশের পর বংশও চলতে পারে। আপাত কখনও শান্ত হলেও যে কোন কারণে সেটি আবার জ্বলে উঠতে পারে। ভয়ংকর হতে পারে।

কোন কারণে বা ভূল করেও যদি কেউ তেমন কোন অপরাধ সংঘটন করে ফেলে, তবে আল্লাহ তার প্রতিকারের জন্য কিছু গ্রহণযোগ্য নিয়ম সকলের জন্য করে দিয়েছেন। তেমন প্রতিকার বা বিচার বস্তুত ভূক্তভোগীর ভেতরের যে ভার বা কষ্ট তা লাঘবে সহায়ক।

আবার এ ভার লাঘবকরণের আরও একটি দিক আছে। এটি কেবল ভূক্তভোগীর কষ্টই লাঘব করে না। সমাজের অগ্রসরমান অস্থিরতা বা খুন-খারাবি, তথা রক্তের বদলা রক্ত নীতির বাস্তবায়ন যা অপরাপরদেরও ভবিষ্যৎ কষ্টের কারণ হয়ে উঠতে পারে তার সম্ভাবনাকেও হ্রাস করে। ফলে এটি ব্যাক্তি থেকে সামাজিক বা সামষ্ঠিক ভার বা কষ্ট লাঘবেরও একটি উত্তম দিক-নির্দেশনা বা সমাধানের যথাযথ পথ।

তাই বলা হয়েছে, সমতার ভিত্তিতে বিচার কিংবা ক্ষমার ব্যাবস্থা তোমাদের পালনকর্তার পক্ষ থেকে তোমাদের জন্য তোমাদের অন্তরের কষ্ট বা ভার

লাঘবকরণের একটি উপায়। এটিও আল্লাহর এক অশেষ অনুগ্রহ। বিবেচনাটি স্বয়ং আল্লাহর দিক থেকে হওয়ায় তৎকালীন পরিস্থিতি বিবেচনায় বিশ্বাসীদের জন্য বিষয়টি যেমন গ্রহণযোগ্য ছিল তেমনই স্বস্তিরও কারণ ছিল বলা যেতে পারে। যারা আল্লাহকে বিশ্বাস করে তারা যেমন তাঁর নির্দেশনা মেনে চলে, তেমনি সেটি তাদের অন্তরকেও প্রকৃতই শান্তি দান করে।

▪ **২.১৭৮.৪** এরপরও যে ব্যাক্তি সীমালংঘন করবে তার জন্য রয়েছে বেদনাদায়ক শাস্তি : প্রতিকার গ্রহণের পরেও যদি কেউ প্রতিশোধ নিতে চায় তবে তা হবে সীমালংঘন। অর্থাৎ আল্লাহর বেধে দেয়া নিয়মের লংঘন। আল্লাহর নির্দেশনার লংঘনই হচ্ছে সীমালংঘন। এখানে যে নির্দেশনা দেয়া হয়েছে সেটি সমস্যার জাগতিক সমাধানের একটি উপায়। এ সমাধান ব্যাতিত রক্তের বদলা রক্ত চিরকাল চলতে থাকবে। এটি থামবে না। আরও ভয়াবহ রূপ ধারণ করতে পারে। সীমালংঘনের পরিণতি দীর্ঘমেয়াদী রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষের কারণ হতে পারে।

অপরদিকে হত্যা করার কারণে যাদেরকে রক্তের বিনিময় মূল্য দিতে হচ্ছে, অন্যায় করা সত্বেও তাদের আচরণে যদি কোনরূপ পরিবর্তন না আসে, উপরন্তু যদি তারা অকৃতজ্ঞের মতো বা ঔদ্ধত্বপূর্ণ আচরণ করে যেতে থাকে তবে সেটিও সীমালংঘন বলে বিবেচিত হতে পারে। তাই অবশ্যই তাদের আচরণ হতে হবে সদয়তাপূর্ণ। এমনই আল্লাহর দিক-নির্দেশনা যেন বিচার পরবর্তীতে সকলের অন্তর প্রশান্তি লাভ করে।

এ বিষয়ে যারা সীমালংঘন করবে তাদেরকে শেষ বিচারের দিনে হলেও শাস্তি পেতে হবে। এমনই আল্লাহর দিক-নির্দেশনা। দিক-নির্দেশনা অনুযায়ী পার্থিব জীবন ও জগতকে শান্তিময় পেতে হলে দর্শনের মৌল ভিত্তিসমুহে তাই সত্যিকারভাবে বিশ্বাস রাখতে হবে এবং মানবসমাজে বিষয়গুলিকে সেভাবে প্রতিষ্ঠাও করতে হবে। কেননা সত্যিকারের বিশ্বাস ভিন্ন নির্দেশনা কার্যকর করা যাবে না।

▪ **২.১৭৯** হে বোধসম্পন্ন মানুষ! কেসাসের মধ্যে তোমাদের জন্য রয়েছে জীবন, যেন তোমরা নিজেদেরকে রক্ষা করতে পার : হত্যার ক্ষেত্রে প্রতিশোধের আগুন মারাত্মকরূপ ধারণ করতে পারে। কোন কারণে সাময়িক চাপা পড়ে

থাকলেও সময় ও সুযোগে এটি নৃশংশভাবে জেগে ওঠার সম্ভাবনা থাকে। তেমন ক্ষেত্রে সেটি বিচার বিবেচনাহীনভাবে অতিরঞ্জিতও হয়ে যেতে পারে। যা ন্যায়ানুগ বিচারের মাধ্যমে হওয়া ক্ষতির আশংকার চেয়ে অধিক ক্ষতিকর হতে পারে।

যুগের পর যুগ বংশানুক্রমে এ প্রতিশোধ স্পৃহা বজায় থাকতে পারে। যা মানুষের জীবনকে অতিষ্ট করে ফেলে। জীবনের স্বাদ তারা আর নিতে পারে না। কিন্তু যদি অন্যায়ের বিচার সঠিকভাবে সম্পন্ন হয় তবে তা দীর্ঘমেয়াদী এ প্রতিশোধ স্পৃহাকে রহিত করতে পারে। মানুষকে স্বস্তি দিতে পারে। মানুষ আবার নতুন জীবন ফিরে পেতে পারে।

তাই বলা হয়েছে, কেসাসের মধ্যে তোমাদের জন্য রয়েছে জীবন। এভাবে এ প্রতিকারের উপায় অবলম্বন করেই মানুষ নিজেদেরকে সমুহ বিপদ থেকে রক্ষা করতে পার। বোধসম্পন্ন মানুষ নিশ্চয়ই এ নির্দেশনার গুরুত্ব উপলব্ধি করতে পারবে। সকল নির্দেশনাই বস্তুত মানুষকে মন্দ ও ভূল কাজ করা থেকে রক্ষা করার জন্য।

➢ (আয়াত ১৮০-১৮২) ধন-সম্পদ ওসিয়ত (Bequeath) করা বা উত্তরাধিকার নির্ণয় করা প্রসঙ্গে বলা হয়েছে।

১৮০	এটি তোমাদের জন্য বিধিবদ্ধ করা হল যে, যখন তোমাদের মধ্যে কারও মৃত্যু নিকটবর্তী হয় এবং সে যদি ধন-সম্পদ রেখে যায়, তবে সে তা ওসীয়ত করে যাবে পিতামাতা ও নিকটাত্নীয়দের জন্য (সমতা/ন্যায্যতার ভিত্তিতে) সদয়তার সঙ্গে। এটি একটি কর্তব্য তাদের সকলের জন্য যারা মন্দ কর্ম/পথ থেকে নিজেদের রক্ষা করতে চায়। (It is prescribed for you, when death approacheth one of you, if he leave wealth, that he bequeath (will) unto parents and near relatives in kindness. (This is) a duty for all those who ward off (evil).)
১৮১	ওসীয়ত শোনার পর যদি কেউ তাতে কোন প্রকার পরিবর্তন সাধন করে, তবে সে অপরাধ পতিত হবে তাদের ওপর যারা তা পরিবর্তন

	করে। নিশ্চয়ই! আল্লাহ সর্বশ্রোতা, সবজান্তা। (And whoso changeth (the will) after he hath heard it - the sin thereof is only upon those who change it. Lo! Allah is Hearer, Knower.)
১৮২	যদি কেউ ওসীয়তকারীর পক্ষ থেকে অন্যায় কিংবা কোন অপরাধমূলক সিদ্ধান্তের আশংকা করে এবং তা পক্ষসমুহের মধ্যে মীমাংসা করে দেয় তবে সেটি তার জন্য কোন অপরাধ হবে না। নিশ্চয়ই! আল্লাহ ক্ষমাশীল, অতি দয়ালু। (But he who feareth from a testator some unjust or sinful clause, and maketh peace between the parties, (it shall be) no sin for him. Lo! Allah is Forgiving, Merciful.)

▪ **২.১৮০** এটি তোমাদের জন্য বিধিবদ্ধ করা হল যে, যখন তোমাদের মধ্যে কারও মৃত্যু নিকটবর্তী হয় এবং সে যদি ধন-সম্পদ রেখে যায়, তবে সে তা ওসীয়ত করে যাবে পিতামাতা ও নিকটাত্মীয়দের জন্য সদয়তার সঙ্গে। এটি একটি কর্তব্য তাদের সকলের জন্য যারা মন্দ কর্ম/পথ থেকে নিজেদের রক্ষা করতে চায় : ধন-সম্পদ থাকলে মৃত্যুর পূর্বে ওসীয়ত করে যাবার কথা বলা হয়েছে। এটিকে একটি কর্তব্য হিসেবে বিবেচনা করা হয়েছে। যেন যথাযথ উত্তরাধিকার সম্পদের ন্যায়সম্মত প্রাপ্তি থেকে বঞ্চিত না হয়, কিংবা কোন অন্যায়ের স্বীকার না হয়; কিংবা এ বিষয়ে কোন বিবাদের সৃষ্টি না হয়।

সাধারণত দেখা যায় যে, সম্পদশালীর মৃত্যু পরবর্তীতে সম্পদের উত্তরাধিকারের বিষয়টি অনেক ক্ষেত্রে একটি সমস্যারূপে দেখা দেয়। এ সমস্যার কোন সমাধান না করে কেউ মৃত্যুবরণ করলে সেটি পারিবারিক, আত্মীয়তার বন্ধন ও এমনকি সামাজিক সমস্যারও সৃষ্টি করে। তাই যারা মন্দ পথ পরিহার করে চলতে চায় বা ভবিষ্যতে তথা মৃত্যু পরবর্তীতে কোন বিবাদ বা বিশৃংখলার সৃষ্টি করতে দিতে না চায় তাদের জন্য সুবিবেচনাপ্রসূত এ বিধান পালনকে একটি কর্তব্য পালনরূপে দেখা হয়েছে।

যে সময়ে এ বাণী অবতীর্ণ হয়েছে সে সময়ে কোরআনের উত্তরাধিকারের বিধান সম্বলিত আয়াতসমুহ অবতীর্ণ হয় নাই (দ্রষ্টব্য আল-কোরআন ৪:৭-

১২)। উল্লেখ্য যে, উত্তরাধিকারের বিধি-বিধান সম্বলিত আয়াতসমুহ অবতীর্ণ হওয়ার ফলে মুসলিম আইন অনুযায়ী সেভাবেই সম্পদের বন্টন হবে।

কোরআনে বর্ণিত বিধান একটি দিক-নির্দেশনা মাত্র। সে অনুযায়ী সম্পত্তির বন্টন হওয়া বাঞ্ছনীয়। এতদ্বসত্বেও পরিস্থিতি বিবেচনা করে বিচারকের সিদ্ধান্ত নেয়ার ক্ষমতা বা স্বাধীনতা থাকার বিষয়টিও গুরুত্বপূর্ণ। কেননা সব পরিস্থিতি একরকম নয়। পারিবারিক গঠন কাঠামোও সর্বত্র একরকম নয় বা সম্পর্কসমুহও সর্বত্র একরকম নয়। বাস্তবে আরও নানান কারণ ও জটিলতা থাকতে পারে বা আসতে পারে। তাই পরিস্থিতি বিবেচনা করে বিচারকের সিদ্ধান্ত নেয়ার ক্ষমতা বা স্বাধীনতা থাকা বাঞ্ছনীয়। বিচারক যদি উদ্দেশ্য প্রণোদিতভাবে কোন ভূল সিদ্ধান্ত নেন এবং সেটি প্রমাণীত হয় তবে সেক্ষেত্রে বিচারকেরও জবাবদিহিতা বা উপযুক্ত শাস্তির বিধান থাকতে পারে।

মুসলিম উত্তরাধিকার আইন বলবৎ হওয়ার ফলে আইন অনুযায়ী সকলেই নিজ নিজ অংশ পেয়ে যাবে। ফলে বর্তমানে ওসীয়ত করার খুব একটা প্রয়োজনীয়তা নেই। তবে কারও মতে সম্পত্তির এক-তৃতীয়াংশ ওসীয়ত করা যেতে পারে। আবার এমন একটা মতও আছে যে, ওসীয়তের বিষয়টি শুধুমাত্র তাদের জন্য যারা উত্তরাধিকার না। উত্তরাধিকারদের ওসীয়ত নির্ধারিত।

ওসীয়ত করার ক্ষেত্রে পিতামাতা, নিকটাত্নীয় বা যাদের ওপর আস্থা ও বিশ্বাস রাখা যায় তেমন মানুষগণই অগ্রগণ্য হিসেবে বিবেচিত হবে। ওসীয়ত সমতা ও ন্যায্যতার ভিত্তিতে হওয়া বাঞ্ছনীয়।

ওসীয়ত ও উত্তরাধিকার দু'টো বিধান সমান্তরালে থাকা ভাল বলে মনে করি। সার্বিক পরিস্থিতি বিবেচনা করে সিদ্ধান্ত নেয়া উত্তম। বিচারকের প্রজ্ঞা এক্ষেত্রে খুবই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়।

▪ **২.১৮১.১** ওসীয়ত শোনার পর যদি কেউ তাতে কোন প্রকার পরিবর্তন সাধন করে, তবে সে অপরাধ পতিত হবে তাদের ওপর যারা তা পরিবর্তন করে : বিষয়টি স্বচ্ছভাবে বর্ণিত হয়েছে। অপরাধের দায় অপরাধীর ওপর বর্তাবে। এটি যেমন ইহকালীন বিচার ব্যাবস্থার জন্য প্রযোজ্য দিক-নির্দেশনা, তেমনি পরকালে বিশ্বাসীদের জন্যও এক সতর্কবার্তা।

▪ **২.১৮১.২** নিশ্চয়ই! আল্লাহ সর্বশ্রোতা, সবজান্তা : এখানে বিশেষভাবে বিষয়টি স্মরণ করিয়ে দিয়ে সকলকে সতর্ক করা হয়েছে যেন কেউ এ বিষয়ে ভূল না করে। মানুষের চোখকে ফাঁকি দিয়ে অনেক কিছু করা সম্ভব। কিন্তু আল্লাহ সব দেখেন, শুনেন ও জানেন। শেষ বিচারেরও একটি দিন আছে [দ্রষ্টব্য ২.২৯.৪]।

▪ **২.১৮২.১** যদি কেউ ওসীয়তকারীর পক্ষ থেকে অন্যায় কিংবা কোন অপরাধমূলক সিদ্ধান্তের আশংকা করে এবং তা পক্ষসমুহের মধ্যে মীমাংসা করে দেয় তবে সেটি তার জন্য কোন অপরাধ হবে না : যদি কেউ ওসীয়তকারীর পক্ষ থেকে অন্যায় কিংবা কোন অপরাধমূলক সিদ্ধান্তের আশংকা করে এবং তা পক্ষসমুহের মধ্যে মীমাংসা করে দেয় তবে সেটি তার জন্য কোন অপরাধ হবে না। এটিও একটি সার্বজনীন ও শাশ্বত দিক-নির্দেশনা যে ভাল বা কল্যাণকর কোন পদক্ষেপ নিলে সেটি অন্যায় বিবেচিত হয় না। তাতে পাপ হয় না।

▪ **২.১৮২.২** নিশ্চয়ই! আল্লাহ ক্ষমাশীল, অতি দয়ালু : এখানে বিশেষভাবে বিষয়টি স্মরণ করিয়ে দেয়া হয়েছে যেন এ বিষয়ে মানুষের মধ্যে কোন শঙ্কা কাজ না করে বা ভূল বোঝার অবকাশ না থাকে।

মানুষ যেন কল্যাণকর কাজে সাহসী পদক্ষেপ নিতে উদ্যোগী হয়। ‘ভূল বোঝার অবকাশ না থাকে’ কথাটি এজন্য বলা হয়েছে যে, আল্লাহই ওসীয়তের বিধানদাতা। সম্পদের অধিকারীর ওসীয়ত করার ক্ষমতা আছে। এটি আল্লাহর বিধান। অথচ সেক্ষেত্রে ওসিয়তকারীও যদি কোন অন্যায় কাজ করে এবং সেটি সকলের দৃষ্টিতেই অন্যায় বলে বিবেচিত হয়, তবে কল্যাণকর পদক্ষেপ হিসেবে বিষয়টি যদি মিমাংসা করে দেয়া হয় সেটি অন্যায় বা অপরাধ হিসেবে গণ্য হবে না। এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক-নির্দেশনা; যা সকল কল্যাণকর পদক্ষেপের ক্ষেত্রেই বিবেচ্য।

একটি বিষয় অবশ্যই উপলব্ধির মধ্যে আনতে হবে যে, কোন সমস্যা সমাধানের ক্ষেত্রে সুনির্দিষ্টভাবে উল্লেখিত বিধান পালনকেই আল্লাহ একমাত্র উপায় হিসেবে গুরুত্ব দেননি। তিনি সমস্যার যথাযথ ও ন্যায়সম্মত সমাধানকেই প্রাধান্য দিয়েছেন এবং সর্বক্ষেত্রেই দিক-নির্দেশনারূপে সে

বিষয়টিকেই প্রাধান্য দিতে হবে। এটিই আল্লাহর প্রকৃত দিক-নির্দেশনা যা শাশ্বত ও সার্বজনীন।

বলা হচ্ছে, আল্লাহ সব দেখেন। যদি তিনি দেখেন যে কোথাও কোন কল্যাণকর পদক্ষেপ নেয়া হয়েছে তবে অবশ্যই মানুষ যেন স্মরণ রাখে যে সেক্ষেত্রে আল্লাহ ক্ষমাশীল। তেমন ক্ষেত্রে মানুষের কোন ভয় বা আশংকা নেই। বিষয়টি মানুষকে স্মরণ করিয়ে দেয়া হয়েছে, যেন মানুষ সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে সাহসী পদক্ষেপ গ্রহণে দ্বিধান্বিত না হয়।

➤ (আয়াত ১৮৩-১৮৭) রোযা (Fasting) প্রসঙ্গে বলা হয়েছে।

১৮৩	হে বিশ্বাসীগন! রোযা তোমাদের জন্য বিধিবদ্ধ করা হয়েছে যেমন বিধিবদ্ধ করা হয়েছিল তোমাদের পূর্ববর্তীগণের ওপর, যেন তোমরা মন্দ (কর্ম/পথ) থেকে নিজেদের রক্ষা করতে পার। (O ye who believe! Fasting is prescribed for you, even as it was prescribed for those before you, that ye may ward off (evil);)
১৮৪	রোযা নির্দিষ্ট কতগুলি দিনের জন্য; তোমাদের মধ্যে কেউ অসুস্থ কিংবা সফরে থাকলে, সে অন্য সময়ে সমান সংখ্যক রোযা রেখে তা পূরণ করে নেবে। আর যাদের জন্য এটি অত্যান্ত কষ্টদায়ক হয় অর্থাৎ যারা রোযা রাখতে সক্ষম কিন্তু রাখে নাই, তাদের জন্য রয়েছে কাফফারার সুযোগ। তারা এর পরিবর্তে একজন দরীদ্রকে খাদ্য দান করবে। যে স্বতঃস্ফুর্ততার সঙ্গে ভাল কাজ করে অর্থাৎ অধিক সংখ্যককে আহার্য্য দান করে, সেটি তার জন্য কল্যাণকর। তবে যদি রোযা রাখ তোমাদের জন্য সেটিই উত্তম যদি তোমরা জানতে। ((Fast) a certain number of days; and (for) him who is sick among you, or on a journey, (the same) number of other days; and for those who can afford it there is a ransom: the feeding of a man in need - but whoso doeth good of his own accord, it is better for him: and that ye

	fast is better for you if ye did but know -)
১৮৫	রমযান মাস; যে মাসে কোরআন অবতীর্ণ হয়েছে মানবজাতীর দিক-নির্দেশনারূপে। যা শিক্ষা দেয় সঠিক পথে চলার এবং যা সত্য ও মিথ্যের পার্থক্য নিরুপন করে দেয়। তোমাদের মধ্যে যে এ মাসটি পাবে সে যেন অবশ্য পালনীয় রোযা রাখে। তবে যদি কেউ অসুস্থ কিংবা মুসাফির অবস্থায় থাকে সে অন্য সময়ে (সমসংখ্যক) রোযা রাখবে। আল্লাহ তোমাদের জন্য সহজ পথটিকেই নির্দেশ করেন; তিনি তোমাদের জন্য কঠিন নিয়ম প্রবর্তনের ইচ্ছে করেন না এবং প্রত্যাশা করেন যেন তোমরা রোযা পূর্ণ কর এবং তোমাদেরকে দিক-নির্দেশনা প্রদানের কারণে তোমরা আল্লাহর মহিমা বর্ণনা কর এবং কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর। (The month of Ramadan in which was revealed the Qur'an, a guidance for mankind, and clear proofs of the guidance, and the Criterion (of right and wrong). And whosoever of you is present, let him fast the month, and whosoever of you is sick or on a journey, (let him fast the same) number of other days. Allah desireth for you ease; He desireth not hardship for you; and (He desireth) that ye should complete the period, and that ye should magnify Allah for having guided you, and that peradventure ye may be thankful.)
১৮৬	(হে মোহাম্মদ) যখন আমার বান্দারা তোমার কাছে আমার সম্পর্কে জানতে চায় বস্তুত আমি তো অতি সন্নিকটে। যখন তারা আমার কাছে প্রার্থনা করে আমি শুনি এবং তাদের প্রার্থনায় সাড়া দেই। অতএব তারাও আমার ডাকে সাড়া দিক এবং আমার প্রতি আস্থা ও বিশ্বাস রাখুক। (অতএব তাদের কাছে এ বার্তা পৌঁছে দাও, হে মোহাম্মদ) যেন তারা সঠিক পথে পরিচালিত হতে পারে। (And when My servants question thee concerning Me, then surely I am nigh. I answer the prayer of the suppliant when he

	crieth unto Me. So let them hear My call and let them trust in Me, in order that they may be led aright.)
১৮৭	রোযার রাতে তোমাদের স্ত্রীদের সঙ্গে সহবাস তোমাদের জন্য নিয়মসিদ্ধ করা হয়েছে। তারা তোমাদের পরিচ্ছদ এবং তোমরা তাদের পরিচ্ছদ। আল্লাহ অবগত যে তোমরা আত্মপ্রতারণা করছিলে। অতএব তিনি তোমাদের প্রতি সদয় হয়েছেন এবং এ বিষয়ে তোমাদের অব্যাহতি দিয়েছেন। অতএব তোমরা স্ত্রীদের সঙ্গে সহবাস কর এবং আল্লাহ তোমাদের জন্য যা আইনসিদ্ধ করেছেন তা উপভোগ/কামনা কর। পানাহার কর যতক্ষণ না রাত্রির কালো রেখা থেকে ভোরের শুভ্র রেখা পরিষ্কার দেখা যায়। অতঃপর রোযা পূর্ণ কর রাত আসা পর্যন্ত এবং তাদের (স্ত্রীদের) স্পর্শ কর না (ই'তিকাফরত অবস্থায়), বরং গভীর ভালবাসায় সিক্ত হয়ে মসজিদে তাঁর (আল্লাহর) উপাসনা কর। এগুলি আল্লাহ কর্তৃক নির্ধারিত সীমা। অতএব তাদের কাছেও যেও না। এমনিভাবে আল্লাহ তাঁর অবতীর্ণ বাণীসমুহ মানবজাতির সামনে বিস্তারীতভাবে তুলে ধরেন যেন মানুষ (মন্দ কর্ম/পথ থেকে) নিজেদের রক্ষা করতে পারে। (It is made lawful for you to go unto your wives on the night of the fast. They are raiment for you and ye are raiment for them. Allah is Aware that ye were deceiving yourselves in this respect and He hath turned in mercy toward you and relieved you. So hold intercourse with them and seek that which Allah hath ordained for you, and eat and drink until the white thread becometh distinct to you from the black thread of the dawn. Then strictly observe the fast till nightfall and touch them not, but be at your devotions in the mosques. These are the limits imposed by Allah, so approach them not. Thus Allah expoundeth His revelation to mankind that they may ward off (evil).)

▪ **২.১৮৩.১** হে বিশ্বাসীগন! রোযা তোমাদের জন্য বিধিবদ্ধ করা হয়েছে যেমন বিধিবদ্ধ করা হয়েছিল তোমাদের পূর্ববর্তীগণের ওপর : পূর্ববর্তীগনের ওপরেও রোযা অবশ্য পালনীয় বিধানরূপে ছিল। বর্তমানেও রোযাকে অবশ্য পালনীয় করা হয়েছে। ব্যাক্তি জীবনে এর যেমন শারীরিক ও মানসিক এবং আত্মিক উপকারীতা আছে, তেমনি সামষ্ঠিক জীবনেও এর উপকারীতা আছে। বিশ্বের সকল মুসলিমদের মাঝে ভ্রাতৃত্বের বন্ধনকে দৃঢ় করে। রোযা দরীদ্রের কষ্ট বুঝতে সহায়তা করে। রোযা আল্লাহর সাথে সম্পর্ক সৃষ্টিতে অনবদ্য ভূমিকা রাখে।

মুসলমানদের জন্য বাধ্যতামূলক রোযার বিধান অবস্থার প্রেক্ষিতে সময়ে সময়ে পরিবর্তীত হয়ে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এমনকি সালাতের ক্ষেত্রে এবং সূদ নিষিদ্ধ হওয়ার ক্ষেত্রেও সময়ে সময়ে পরিবর্তীত হয়ে বিধানসমুহ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। ফলে এটিও একটি দিক-নির্দেশনা যে পরিবেশ-পরিস্থিতি, প্রয়োজনীয়তা ও মানুষের সুবিধা-অসুবিধাকে বিবেচনায় নিয়ে কোন কিছুর পরিবর্তন-পরিমার্জন একটি করণীয় কাজ।

▪ **২.১৮৩.২** যেন তোমরা মন্দ (কর্ম/পথ) থেকে নিজেদের রক্ষা করতে পার : রোযাকে মানুষের জন্য বিধিবদ্ধ করা হয়েছে যেন মানুষ মন্দ কর্ম ও পথ থেকে নিজেদেরকে রক্ষা করে চলতে পারে। মন্দ কর্ম ও পথ থেকে নিজেদেরকে রক্ষা করে চলতে রোযা একটি উপায়, শক্তি ও প্রেরণা হয়ে কাজ করে। বিশ্বাসীর ওপর এর মনস্তাত্ত্বিক গুরুত্ব ও প্রভাব অপরিসীম।

রোযা পালনের উদ্দেশ্য হচ্ছে মন্দ কাজ থেকে নিজেদেরকে রক্ষা করা। রোযা পালনের মাধ্যমে যদি উদ্দেশ্যই অর্জিত না হয় তবে এর পালন অর্থপূর্ণ হবে না। রোযারত অবস্থায় মানুষ মন্দ কাজ করা থেকে বিরত থাকে। কিন্তু এটিই গুরুত্বপূর্ণ নয়। এটি মানুষকে সব সময়ের জন্য স্মরণ করিয়ে দেয় যে মন্দ কাজ পরিহার করে চলতে হবে। এ মনে রাখাটি এবং তার পরিপালন গুরুত্বপূর্ণ।

মানুষ কিছু লক্ষ্যকে সামনে রেখে কাজ করে। যার লক্ষ্য নেই সে উদ্ভ্রান্তের মতো ঘুরে বেড়ায়। রোয়া মানুষকে নিয়মাবদ্ধ ও শৃংখলাবদ্ধ হতে শিক্ষা দেয়।

রোযা মানুষকে মানসিক তৃপ্তি দেয়। অন্তরকে পবিত্র করে। কিন্তু এগুলির কোনটিই অর্জিত হবে না, যদি না মানুষ নিজে থেকে সেগুলি বিশ্বাস ও যথাযথভাবে পালন করে। বিশ্বাসের শর্তগুলি তাই গুরুত্বপূর্ণ।

মানুষ বিচ্ছিন্নভাবে এসব কাজ করে না। সে একটি লক্ষ্যকে সামনে রেখে কাজ করে। আর সব কিছুর লক্ষ্য হচ্ছে তার বিধাতা। অতএব বিধাতার আরও যেসব নির্দেশনা আছে সেগুলিও পালন করতে হবে। রোযা সে শিক্ষাও দেয়। রোযা সেসব পালনে অনুপ্রেরণা হয়েও কাজ করে। আর এ সবই করে ভাল হয়ে চলার জন্য। মন্দ কাজ থেকে বিরত থাকার জন্য। জগতকে এক শান্তির আলয়রূপে গড়ে তোলার জন্য। এসব অর্জিত না হলে রোযার কার্যকারিতা বিফল হয়ে যাবে। তাই রোযা থেকে শুরু করে আল্লাহর সকল নির্দেশনা যথাযথ জ্ঞানে পালন করতে হবে।

আজকাল মানুষ রোযাও রাখে আবার ঘুষ-দুর্নীতি সবই করে। রোযা রেখে শরীরের যতটা উপকার করে, ভূড়ি-ভোজ করে তার চেয়ে অধিক ক্ষতি করে। যতটুকু আত্মার উত্তরণ ঘটায়, প্রদর্শন করে তার চেয়ে অধিক নিচে নামিয়ে আনে। অনেক ক্ষেত্রে দুঃখী মানুষের ভাবনা এমন রোযা পালনের মধ্যে থাকে না। থাকে ব্যবসায়িক হিসেব-নিকেশ। অতএব রোযা যথাযথ জ্ঞানে ও নিয়তে পালন করতে হবে। যেন সেটি মন্দ কর্ম/পথ থেকে নিজেদেরকে রক্ষা করতে সক্ষম করে তোলে।

▪ **২.১৮৪** রোযা নির্দিষ্ট কতগুলি দিনের জন্য; তোমাদের মধ্যে কেউ অসুস্থ কিংবা সফরে থাকলে, সে অন্য সময়ে সমান সংখ্যক রোযা রেখে তা পূরণ করে নেবে। আর যাদের জন্য এটি অত্যান্ত কষ্টদায়ক হয় অর্থাৎ যারা রোযা রাখতে সক্ষম কিন্তু রাখে নাই, তাদের জন্য রয়েছে কাফফারার সুযোগ। তারা এর পরিবর্তে একজন দরীদ্রকে খাদ্য দান করবে। যে স্বতঃস্ফুর্ততার সঙ্গে ভাল কাজ করে অর্থাৎ অধিক সংখ্যককে আহার্য্য দান করে, সেটি তার জন্য কল্যাণকর। তবে যদি রোযা রাখ তোমাদের জন্য সেটিই উত্তম যদি তোমরা জানতে : বাধ্যতামূলক রোযা সুনির্দিষ্ট কতগুলি দিনের জন্য এবং সেটি রমযান মাসে।

অসুস্থ ও সফররত ব্যাক্তি অসুস্থ থাকাকালীন সময়ে ও সফররত অবস্থায় রোযা পালন বাধ্যতামূলক নয়। সে সময়ে তারা রোযা পালন নাও করতে পারে। তবে সুস্থ্য হওয়ার পর বা সফর সমাপ্তির পর সমান সংখ্যক রোযা রেখে তা পূর্ণ করতে হবে। উল্লেখ্য যে, কাফফারার রোযা একসাথে অর্থাৎ পর পর দিনগুলিতে রাখতে হবে, নাকি পর পর দিনগুলিতে না রেখে পৃথকভাবেও রাখা যাবে এ বিষয়ে ভিন্ন ভিন্ন মত আছে।

রোযা রাখতে শারীরিকভাবে সক্ষম ব্যাক্তি যদি অতিরিক্ত কষ্ট অনুভব করে এবং রোযা না রাখে তবে তার জন্যও কাফফারার বিধান রয়েছে। অর্থাৎ রোযার পরিবর্তে একজন মিসকিনকে খাদ্য প্রদান করতে হবে। তবে কেউ যদি স্বতঃস্ফুর্ততার সাথে অধিক সংখ্যককে আহার্য্য প্রদান করে সেটি হবে উত্তম। স্বতঃস্ফুর্ত কোন ভাল কাজ করায় কোরআনে কোন নিষেধ নেই। বরং তেমন কাজকে উৎসাহ দেয়া হয়েছে, যা কোরআন প্রদত্ত বিভিন্ন নির্দেশনা থেকে স্পষ্ট হয় (দ্রষ্টব্য আল-কোরআন ২:১৮২, ২:১৫৮)। তবে উত্তম হচ্ছে নিজে রোযা রাখা এবং পরিশেষে নিজেকেই রোযা রাখতে উদ্বুদ্ধ করা হয়েছে। সেটিকেই যথাযথ ও সর্বোত্তম বলা হয়েছে।

আল্লাহ মানুষের জন্য পথ সহজ করে দিয়েছেন। সর্বক্ষেত্রে বিকল্প পথের উপায় রেখেছেন। নিয়মের কাঠিন্যের কারণে কোন নিয়ম পালন করতে না পারার চেয়ে সহজ উপায়ে সেটি পালন করা উত্তম। এগুলিও আল্লাহর গুরুত্বপূর্ণ দিক-নির্দেশনা। মানুষকে তাদের নিজেদের কর্মের ক্ষেত্রগুলিতেও এসব দিক-নির্দেশনা অনুসরণ করে চলতে উৎসাহিত করে।

- **২.১৮৫.১** রমযান মাস; যে মাসে কোরআন অবতীর্ণ হয়েছে মানবজাতীর দিক-নির্দেশনারূপে। যা শিক্ষা দেয় সঠিক পথে চলার এবং যা সত্য ও মিথ্যের পার্থক্য নিরুপন করে দেয় : আল-কোরআন হচ্ছে মানবজাতির জন্য দিক-নির্দেশনামূলক গ্রন্থ বা Guidance। পবিত্র রমযান মাসে মহান আল্লাহ এ গ্রন্থ মোহাম্মদ (সাঃ) এর ওপর অবতীর্ণ করেন। কোরআন অবতীর্ণ হওয়ার পূর্বে মানবজীবন ছিল উদভ্রান্তের মতো। জীবনের কোন লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য মানুষের জানা ছিল না। মানবজীবন ছিল দিক-নির্দেশনাবিহীন।

কোরআন মানবজীবনকে অর্থবহ হতে সহায়তা করেছে। পার্থিব জীবনে মানুষের সকল কর্মকান্ডের জন্য জবাবদিহিতার ধারণাকে সমুন্নত করেছে। পরকালীন জীবনের বার্তা তুলে ধরেছে। একটি বিচার দিবসের ধারণা দিয়েছে। বিচার দিবসে বিচারক থাকবেন স্বয়ং আল্লাহ! মানুষকে তার সকল কর্মকান্ডের জন্য আল্লাহর সম্মুখে জবাবদিহি করতে হবে। এ সবই বস্তুত মানুষকে সঠিক পথে চলতে উৎসাহিত করে। এর মাধ্যমেই মানবজীবন হয়েছে অর্থবহ। মানুষ জীবনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যকে বুঝতে শিখেছে।

পবিত্র কোরআন ভাল-মন্দ, সত্য-মিথ্যের পার্থক্য নিরুপন করে দিয়ে মানুষকে সঠিক পথ-প্রদর্শন করেছে। ভূল-শুদ্ধ নিরুপনের ক্ষেত্রে মানুষকে আত্মবিশ্বাসী হতেও কোরআন সহায়ক হয়ে কাজ করে।

▪ **২.১৮৫.২** তোমাদের মধ্যে যে এ মাসটি পাবে সে যেন অবশ্য পালনীয় রোযা রাখে। তবে যদি কেউ অসুস্থ কিংবা মুসাফির অবস্থায় থাকে সে অন্য সময়ে রোযা রাখবে। আল্লাহ তোমাদের জন্য সহজ পথটিকেই নির্দেশ করেন; তিনি তোমাদের জন্য কঠিন নিয়ম প্রবর্তনের ইচ্ছে করেন না : শারীরিক ও মানসিকভাবে সুস্থ্য ও সক্ষম বিশ্বাসীদের জন্য রোযা রাখাকে এ আয়াতে 'অবশ্য পালনীয়' বা বাদ্ধতামূলক বলা হয়েছে।

আল্লাহ কাউকেই তাঁর আশীর্বাদ থেকে বঞ্চিত হতে দিতে চান না। ফলে কেউ যদি যথাযথ কারণে নির্দিষ্ট সময়ে অবশ্য পালনীয় রোযা পালন করতে না পারে তবে তার জন্য বিকল্প উপায় আছে। রমযান মাসে কোরআন অবতীর্ণ করে মহান আল্লাহ মানবজাতিকে যে পথ প্রদর্শন করেছেন সেজন্য কৃতজ্ঞতাও প্রকাশ করতে বলা হয়েছে।

আয়াত নং ১৮৪ তে রোযা রাখতে শারীরিকভাবে সক্ষম ব্যাক্তি যদি রোযা না রাখে তবে তার জন্য কাফফারার বিধান দেয়া হয়েছিল। সেক্ষেত্রে রোযা রাখার পরিবর্তে একজন মিসকিনকে খাদ্য প্রদানের দিক-নির্দেশনা দেয়া হয়েছিল। এখানে সেটি রহিত করা হয়েছে। যদিও ওপরোক্ত আয়াতেও রোযা রাখাকেই সর্বোত্তম বলা হয়েছিল।

অসুস্থ ও সফররত ব্যাক্তি অসুস্থ থাকাকালীন সময়ে ও সফররত অবস্থায় রোযা পালন বাধ্যতামূলক নয়। সে সময়ে তারা রোযা পালন নাও করতে

পারে। তবে সুস্থ্য হওয়ার পর বা সফর সমাপ্তির পর সমান সংখ্যক রোযা রেখে তা পূর্ণ করতে হবে। বিধানটি এখানেও বলবৎ রাখা হয়েছে।

আল্লাহ মানুষের জন্য পথ সহজ করে দিয়েছেন। সর্বক্ষেত্রে বিকল্প পথের উপায় রেখেছেন। নিয়মের কাঠিন্যের কারণে কোন নিয়ম পালন করতে না পারার চেয়ে সহজ উপায়ে সেটি পালন করা উত্তম। ব্যাতিক্রমের ক্ষেত্রে পরিস্থিতি বিবেচনায় মানুষ সিদ্ধান্ত নেবে। এর মাধ্যমে মানুষকে তাদের নিজেদের কর্মের ক্ষেত্রগুলিতেও এভাবে দিক-নির্দেশনা অনুসরণ করাকে উৎসাহিত করা হয়েছে। করণীয় বিষয়ে নিয়মের অযাচিত কাঠিন্য দ্বারা কখনই কোন কাজকে দুরুহ করতে নেই। করণীয় বিষয়ে নিয়মকে মানুষের পালনের উপযোগী করে সহজ করে দিতে হয়। এগুলিও আল্লাহর গুরুত্বপূর্ণ ও ইংগিতপূর্ণ দিক-নির্দেশনা।

▪ **২.১৮৫.৩** এবং প্রত্যাশা করেন যেন তোমরা রোযা পূর্ণ কর এবং তোমাদেরকে দিক-নির্দেশনা প্রদানের কারণে তোমরা আল্লাহর মহিমা বর্ণনা কর এবং কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর : মানুষকে দিক-নির্দেশনা প্রদানের কারণে আল্লাহর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে বলা হয়েছে। এটি অত্যান্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয়। অন্যথায় দিক-নির্দেশনাবিহীন মানবজাতি উদ্ভ্রন্ত হয়ে পৃথিবীর পথে ঘুরে বেরাত। দিক-নির্দেশনা আছে বিধায় মানুষ সে পরিস্থিতি বর্তমানে কল্পনায়েও আনতে পারছে না।

কারও মহাত্ব বর্ণনা করা বা তার গুণগান করা বা তার সম্পর্কে প্রচার করার মধ্য দিয়ে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা সম্ভব। তেমনি আল্লাহর মহাত্ব বর্ণনা করা বা তাঁর গুণগান করা বা তাঁর সম্পর্কে প্রচার-প্রচারণা করার মধ্য দিয়েই তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা সম্ভব। অন্যথায় মানবের এমন কি আছে যা দিয়ে সে আল্লাহর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে পারে? এটিই উত্তম উপায়! উপাসনার পরিপালনও বস্তুত তাঁর মহাত্বেরই বর্ণনা ও তাঁর গুণগান করার অন্তর্ভূক্ত বিষয়।

আল্লাহর নির্দেশ পালন করার মধ্য দিয়েও তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞতাবোধের প্রকাশ করা সম্ভব। তাই বলা হয়েছে যে, ‘এবং (তিনি) প্রত্যাশা করেন যেন

তোমরা রোযা পূর্ণ কর।' অর্থাৎ তাঁর নির্দেশ পালন কর এবং নির্দেশ পালনের মধ্য দিয়ে রোযার উপকারীতাসমূহ লাভ কর।

এ ছাড়াও নিষিদ্ধ কাজ না করা, ভাল কাজ করা, খারাপ কাজ পরিত্যাগ করা, ন্যায়ের পথে থাকা, অন্যায়-অপরাধ না করা এমনই আল্লাহর নির্দেশনা। বাস্তবে এসব নির্দেশনা পালন করার মধ্য দিয়ে সত্যিকার অর্থে আল্লাহর প্রতি কৃতজ্ঞ হওয়া সম্ভব। এগুলি থেকে বিচ্যুত হলে ধর্মীয় বিধি-বিধান পালন করা অর্থপূর্ণ হয় না [কৃতজ্ঞতা দ্রষ্টব্য ২.১৭২.২]।

▪ **২.১৮৬.১** যখন আমার বান্দারা তোমার কাছে আমার সম্পর্কে জানতে চায় বস্তুত আমি তো অতি সন্নিকটে : আল্লাহ মানুষের থেকে দুরে নন [আল্লাহ দ্রষ্টব্য ২.২০.২]। অতি সন্নিকটে। কিন্তু মানুষ সেটি বুঝতে পারে না। বলা হচ্ছে,

"পরম সত্য সচল-অচল সকলের ভেতর ও বাহিরে বর্তমান। জড় ইন্দ্রিয়ের অগোচর বা অনুভূতির উর্ধ্বে। যদিও বহু বহু দুরে, তথাপি সকলের অত্যান্ত নিকটবর্তী।" (গীতা ১৩:১৬)

অন্যদিকে কোরআনে বলা হয়েছে, "আমি তার (মানুষের) গ্রীবাস্থিত ধমনী থেকেও অধিক নিকটবর্তী।" (আল-কোরআন ৫০:১৬)

মানুষ আল্লাহকে দেখতে পায় না বা বুঝতে পারে না বলে কখনও অস্থির ও কখনও হতাশ হয়ে যায়। বলা হচ্ছে,

"নিশ্চয়ই! আমি মানুষ সৃষ্টি করেছি এবং আমি জানি তার মন নিভৃতে তাকে কি পরামর্শ দেয়।" (আল-কোরআন ৫০:১৬)

আল্লাহ নিজেই মানুষের কাছে প্রশ্ন রেখে জানতে চেয়েছেন, "তোমরা যা শোন ও দেখ প্রকৃতপক্ষে কে তা শোনে ও দেখে?" (আল-কোরআন ১০:৩১)

নিজের মধ্যেই তাঁর উপস্থিতি বা অবস্থান। প্রশ্ন হচ্ছে কে এই 'নিজ' (Self)? মানুষের অস্তিত্ব কি? মানুষ যখন নিজের সাথে নিজে কথা বলে সে কার সাথে কথা বলে? তার ভেতরে কার বসবাস? এতটাই কাছে যে সে যাকে 'নিজ' ভাবে সেখানেই তাঁর অবস্থান। তার চেতনার সাথেই তাঁর

অবস্থান। তাঁর সাথে বিচ্ছিন্নতাই চেতনার অনুপস্থিতি বা মৃত্যু। অতএব কোথায় আল্লাহ? মানুষকেই ভাবতে হবে।

আল্লাহকে পেতে কোথাও যেতে হয় না। আল্লাহর কাছে যাবার জন্যও কোথাও যেতে হয় না। সর্বত্র তার উপস্থিতি। মানুষ নিজে যখন যেখানে বর্তমান সেখানেই তিনি। গভীর ভাবনা ও উপলব্ধিবোধ ছাড়া এ বিষয়ের জ্ঞান ও অনুভব আদৌ সম্ভব নয়।

তাঁকে পাবার জন্য কোন কৃত্রিম উপাস্যের কাছে যাবার প্রয়োজন নেই। নিজের ভেতরে সবচেয়ে কাছে যাকে অনুভূত হয় সেখানেই তিনি। আপনাতে আপনি! তাঁকে জাগিয়ে তুলতে পারলেই নিজের ওপর নিজের বিশ্বাস, বল, শক্তি খুঁজে পাওয়া যায়!

কখনই আল্লাহকে দুরে কল্পনা করতে বারণ করা হয়েছে। তিনি অতি সন্নিকটে। অথচ মানুষ নিজ হাতে মূর্তী বানিয়ে তাদেরই কাছে প্রার্থনা ও যাচ্ঞা করে। মূর্তী না প্রার্থনাকারীদের দেখতে পায়, না তাদের প্রার্থনা শুনতে পায়; না কোন কিছু বরাদ্দ দিতে পারে? তবুও মানুষ তেমনটি করে অজ্ঞতার কারণে। অথচ আল্লাহকে মানুষ সর্বত্র ডাকতে পারে। তিনি শোনেন। এমনকি তাকে না ডাকলেও তিনি সব জানেন। মানুষ নিজে যা জানে তার সবই তিনিই জানেন। তিনি সাথেই রয়েছেন।

মানুষকে কারও দ্বারে দ্বারে যেতে হবে না। ভ্রান্ত পথ ছেড়ে আল্লাহর কাছে আসতে আহবান করা হয়েছে; যিনি সার্বভৌম, সর্বশক্তিমান, সকল কিছুর সরবরাহকারী এবং এমনকি স্রষ্টা! যার কাছে সর্বদা-সর্বাবস্থায় প্রতিমূহুর্তে প্রার্থনা করা বা কিছু চাওয়া সম্ভব। অন্য কোথাও নয় তাঁর কাছেই চাইতে বলা হয়েছে। আল্লাহর আহবানে সাড়া দিয়ে তাঁর দিকে ফিরে আসতে বলা হয়েছে। তাঁকে বিশ্বাস করতে আহবান করা হয়েছে এবং তাঁর কাছেই সমর্পন করতে বলা হয়েছে।

তাঁর কাছে সমর্পন করতে হলে অন্তর যে ভাল নির্দেশনাটি দেয় সেটিকে অনুসরণ করতে হবে। অন্তরের অন্তস্থল যেটিকে মন্দ বলে জানান দেয় সেটি এড়িয়ে যেতে হবে। এটিই উত্তম ও যথাযথ পথ। সে কারণেই ভাল-মন্দ বোঝার দিক-নির্দেশনা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। ভাল-মন্দ বোঝার বিষয়টিকে যত সহজ মনে হয় ক্ষেত্রবিশেষে সেটি আদৌ সহজ নয়।

যারা আল্লাহকে জানতে ও বুঝতে চায় তাদের উদ্দেশ্যে বলা হচ্ছে যে, আল্লাহ অতি সন্নিকটেই। এটিও একটি দিক-নির্দেশনা। হতাশ না হয়ে তাঁকে উপলব্ধি ও অনুভব করার নিরন্তর চেষ্টা করে যেতে হবে। সফলতা আসবেই। তবে ক'জনাই বা আল্লাহকে সেভাবে সন্ধান করে? বলা হচ্ছে,

"হাজার হাজার মানুষের মধ্যে কদাচিৎ একজন সিদ্ধি লাভের জন্য সচেষ্ট হয়। সচেষ্ট সেই সিদ্ধি প্রাপ্তদের মধ্যে বস্তুত কেউ একজন আমাকে তত্বত জানতে পারে।" (গীতা ৭:৩)

তাই নিরন্তর সাধনা করে যেতে হবে তাঁকে পাবার জন্য। রোযার মাসে প্রার্থনায় অধিক মনোযোগী হয়ে তাঁকে অনুভব ও তাঁর নৈকট্য অর্জনের চেষ্টা করার জন্য এ বাণী এখানে উদ্ধৃত হয়েছে।

▪ **২.১৮৬.২** যখন তারা আমার কাছে প্রার্থনা করে আমি শুনি এবং তাদের প্রার্থনায় সাড়া দেই : মানুষ যখন গভীর আন্তরীকতা নিয়ে আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করে বা কোন কিছু চায় বা প্রত্যাশা করে- বলা হচ্ছে, আল্লাহ তাতে সাড়া দেন। বস্তুত মানুষ যখন আল্লাহর কাছে তার কাম্য কোন কিছু চায় বা প্রত্যাশা করে সেটি তার নিজেকেই জাগিয়ে তোলে। নিজের ভেতরেই প্রতিজ্ঞা সৃষ্টি হয় এবং মানুষ তা অর্জনে প্রচেষ্টায় লিপ্ত হয়। মানুষ সেটি অর্জনে সক্ষম হয়ে ওঠে এবং সফলও হয়। ভেতর থেকে সে মানসিক ও শারীরিক শক্তি জেগে ওঠে। এভাবেই আল্লাহ মানুষকে সহায়তা করেন। এটিই আল্লাহর সাড়া দেয়া।

আল্লাহকে যে তার নিজের ভেতরে জাগিয়ে তুলতে পারে তিনি নিজেই তার পথ-প্রদর্শক হয়ে যান। অতএব আল্লাহকে স্মরণ বা তাঁর কাছে প্রার্থনা করা সফল হওয়ার পথে মানুষের জন্য সহায়কের ভূমিকা পালন করে। তাঁর স্মরণই মানুষের ভেতরে তাঁর উপস্থিতিকে সার্বক্ষণিক উপলব্ধ করিয়ে রাখে। কিন্তু সে পর্যায়ে সবাই সব সময় যেতে পারে না। কিছু মানুষ যদি তেমন অভিজ্ঞতা লাভ করে থকে তবে তেমন মানুষ ছাড়া এ অনুভূতি সকলের পক্ষে বোঝা সম্ভব নয়। ডাকার মতো ডাকতে হবে। উপরন্তু আল্লাহ নিজেই যখন কোরআনে এমনটি ঘোষনা দিচ্ছেন যে, 'আমি শুনি এবং তাদের প্রার্থনায় সাড়া দেই' তখন বিশ্বাসীর কাছে এর মূল্য অনেক বেশী। এ বিশ্বাসই তাকে

সকল প্রচেষ্টার মধ্য দিয়ে সফল করে তোলে। আল্লাহর সাড়া প্রমাণিত হয়। বিশ্বাসের কারণেই মানুষ এমন বাণী থেকে উপকৃত হয়। আল্লাহ বলেন,

"বিশ্বাসীদেরকে আল্লাহ দৃঢ় বাণী দ্বারা সুনিশ্চিত/সুদৃঢ়/সুপ্রতিষ্ঠিত করেন পার্থিব জীবনে এবং পরকালে।" (আল-কোরআন ১৪:২৭)

তবে এটিও সত্যি যে, কিছু বিষয় অলৌকিকভাবেও আল্লাহর কাছে চাওয়া বা প্রার্থনার প্রেক্ষিতে পাওয়া সম্ভব হয়। অনেকের জীবনেই তেমনটি ঘটে। এটিকে ব্যাখ্যা করা সম্ভব নয়। বিশ্বাস রাখাই উত্তম।

▪ **২.১৮৬.৩** অতএব তারাও আমার ডাকে সাড়া দিক এবং আমার প্রতি আস্থা ও বিশ্বাস রাখুক : 'আমি তাদের প্রার্থনায় সাড়া দেই যখন তারা আমার কাছে প্রার্থনা করে'। বিশ্বাসীকে আশার বাণী শোনান হয়েছে এখানে! বিশ্বাসীর কাছে কোরআনের এ বাণীর মূল্য অনেক! এটি তাকে প্রাণবন্ত ও উজ্জীবিত করে তোলে। বলা হচ্ছে, মানুষ যখন সর্বান্তকরণে আল্লাহকে ডাকে আল্লাহ তাতে সাড়া দেন। এই নিশ্চিতিকরণ বিশ্বাসীর বিশ্বাসকে বৃদ্ধি করে দেয়। বলা হচ্ছে যে, 'তারাও আমার ডাকে সাড়া দিক'; প্রশ্ন হচ্ছে, আল্লাহর ডাকে মানুষ কিভাবে সাড়া দেবে?

আল্লাহ মানুষকে চলার পথের দিক-নির্দেশনা দিয়েছেন। মানুষ সে দিক-নির্দেশনা মেনে চলাই তাঁর ডাকে সাড়া দেয়া। সালাত কায়েম করা, সিয়াম সাধনা করা, তাঁর নির্দেশনা পালন করা ইত্যাদি। তাঁর দিক-নির্দেশনা মানুষকে সরল পথে চলার নির্দেশনা দেয়। অন্যায় ও অশ্লীলতা বর্জন করে চলতে বলে। অতএব তাঁর ডাকে সাড়া দেয়া মানে সুপথে চলা। মন্দ পথ পরিত্যাগ করে চলা।

যারা আল্লাহর ওপর আস্থা রাখে তারাই তাঁর নির্দেশনা মেনে চলে। যারা আল্লাহর নির্দেশনা মেনে চলে তারা নিঃসন্দেহে সঠিক পথে পরিচালিত হবে। কেননা আল্লাহ প্রদত্ত সকল নির্দেশনাই সুপথে চলার নির্দেশনা। মন্দ ও অশ্লীল পথ বর্জন করে চলার নির্দেশনা। তাই বলা হয়েছে, 'তারা আমার প্রতি আস্থা ও বিশ্বাস রাখুক'। এ বিশ্বাসই মানুষকে সঠিক পথে পরিচালিত করবে।

যতক্ষণ আল্লাহ মানুষের স্মরণের মধ্যে থাকেন ততক্ষণ তার নির্দেশনাও স্মরণের মধ্যে থাকে। সর্বদা তাঁর স্মরণ সৎ পথে চলার ক্ষেত্রে তাই গুরুত্বপূর্ণ

ভূমিকা পালন করে। তাঁর ডাকে সাড়া দেয়ার অন্যতম উপায় তাই তাঁকে স্মরণ করা, তাঁর নির্দেশনা মেনে চলা, তাঁর কাছে প্রার্থনা করা। প্রর্থনা তাঁকে জাগিয়ে তোলার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। আল্লাহকে স্মরণের অন্যতম একটি উপায় হচ্ছে তাঁর উপাসনা করা। বলা হচ্ছে,

"আমার উপাসনা কর এবং আমার স্মরনার্থে উপাসনাকে প্রতিষ্ঠা কর।" (আল-কোরআন ২০:১৪)

■ **২.১৮৬.৪** যেন তারা সঠিক পথে পরিচালিত হতে পারে : ওপরে যা কিছু বলা হয়েছে তাতে আস্থা ও বিশ্বাস রাখতে বলা হয়েছে। কেননা এটি একটি প্রক্রিয়া, যে প্রক্রিয়া মানুষকে সঠিক পথে চালনা করে নিয়ে যাবে। তাই পথটিকে অনুসরণ করতে বলা হয়েছে। পথের অনুসরণই মানুষকে সঠিক পথে পরিচালনা করবে। অন্তরের সকল সন্দেহ দুর করে বিশ্বাসের সাথে এগিয়ে যেতে হবে।

কোরআনের সকল দিক-নির্দেশনার মূল লক্ষ্য হচ্ছে এটি, অর্থাৎ 'যেন মানুষ সঠিক পথে পরিচালিত হতে পারে'। অতএব স্মরণ রাখতে হবে যে, লক্ষ্যই যদি অর্জন না হয় তবে সকল এবাদত ব্যার্থ। লক্ষ্যকে সামনে রেখে সকল কাজ করতে হবে। সঠিক পথে চলতে হবে। মন্দ পথ পরিহার করতে হবে।

■ **২.১৮৭.১** রোযার রাতে তোমাদের স্ত্রীদের সঙ্গে সহবাস তোমাদের জন্য নিয়মসিদ্ধ করা হয়েছে। তারা তোমাদের পরিচ্ছদ এবং তোমরা তাদের পরিচ্ছদ। আল্লাহ অবগত যে তোমরা আত্মপ্রতারণা করছিলে। অতএব তিনি তোমাদের প্রতি সদয় হয়েছেন এবং এ বিষয়ে তোমাদের অব্যাহতি দিয়েছেন। অতএব তোমরা স্ত্রীদের সঙ্গে সহবাস কর এবং আল্লাহ তোমাদের জন্য যা আইনসিদ্ধ করেছেন তা উপভোগ/কামনা কর : রোযার রাতে স্বামী-স্ত্রীর সহবাস বা মিলনের বিষয়ে প্রথম দিকে সুস্পষ্ট কোন দিক-নির্দেশনা ছিল না। এ বিষয়ে সুস্পষ্ট নিষিদ্ধতাও ছিল না। এতদ্বসত্ত্বেও বিশ্বাসীদের মধ্যে একটি ভ্রান্ত ধারণার জন্ম নেয় যে বিষয়টি হয়তবা নিয়মসিদ্ধ নয়। সুস্পষ্ট দিক-নির্দেশনা না থাকায় এ বিষয়ে দ্বিধাদ্বন্দের সৃষ্টি হয়। অনেকে তাদের নিজেদের ধারণার যথার্থতাও রক্ষা করতে পারেনি। ফলে গোপনে হলেও তাদের মনে পাপবোধের জন্ম নেয়।

বিষয়টি জানাজানি হলে এ বাণী অবতীর্ণ হয়। বলা হচ্ছে, ‘আল্লাহ অবগত যে তোমরা আত্মপ্রতারণা করছিলে।’ অর্থাৎ এ বিষয়ে দোদুল্যমানতা থাকা সত্বেও নিশ্চিত না হয়েই অনেকে এমনকি নিজেদের ধারণার যথার্থতাও রক্ষা করেনি। মানুষের ক্ষেত্রে এ নিয়ম পালন করা বা সহ্য করা কষ্টসাধ্য প্রতীয়মান হয়। তাই বলা হয়েছে যে, মহান আল্লাহ মানুষের প্রতি সদয় হয়ে এ কঠোর নিয়ম রহিত করেছেন। রোযার রাতে স্ত্রীদের সঙ্গে সহবাস নিয়মসিদ্ধ করা হয়।

নারীরা তোমাদের পরিচ্ছদ এবং তোমরা তাদের পরিচ্ছদ। দেহ ও পরিধেয় কাপড়ের মাঝে যেমন কোন প্রতিবন্ধকতা থাকে না; একটি অপরটির পরিপূরক হয়ে কাজ করে; বলা হচ্ছে স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক হচ্ছে তেমনই। একে অপরের জন্য প্রশান্তির, নিরাপত্তা ও সুখানুভূতির স্থান। এটি একটি উপমা।

তিনি তোমাদের প্রতি সদয় হয়েছেন এবং এ বিষয়ে তোমাদের অব্যাহতি দিয়েছেন। অতএব তোমরা নিজেদের স্ত্রীদের সঙ্গে সহবাস কর এবং যা কিছু আল্লাহ তোমাদের জন্য নির্ধারণ করেছেন তা উপভোগ কর। অর্থাৎ সৎকর্মপরায়ন সন্তানাদি কামনা কর।

▪ **২.১৮৭.২** পানাহার কর যতক্ষণ না রাত্রির কালো রেখা থেকে ভোরের শুভ্র রেখা পরিষ্কার দেখা যায়। অতঃপর রোযা পূর্ণ কর রাত আসা পর্যন্ত : রোযা বিধিবদ্ধ হওয়ার প্রাথমিক পর্যায়ে রোযা পালনের সময় সম্পর্কে কোন সুস্পষ্ট দিক-নির্দেশনা ছিল না। ফলে এ বিষয়ে বিভিন্নজন বিভিন্নরকম ধারণা পোষন করত। এসব ধারণার সবই ছিল নিজেদের চিন্তাধারা থেকে উদ্ভূত। যেমন কেউ মনে করেছে এশা নামাযের পর থেকেই রোযা শুরু হয়ে যায়। কেউ ভেবেছে এশার পরে একজন ব্যাক্তি যতক্ষণ সজাগ থাকে ততক্ষণ পানাহার করা যাবে ইত্যাদি। এখানে সকল সংশয় দুর করে সুস্পষ্ট দিক-নির্দেশনা দেয়া হয়েছে।

আকাশে ভোরের শুভ্র রেখা দেখা গেলে রোযা পালনের সময় শুরু। অর্থাৎ সূর্য্যদয়ের ঠিক অব্যবহিত পূর্ব থেকে। পূর্বাকাশে এর চিহ্ন দেখা যাবে। রোযার শুরু অর্থাৎ পানাহার থেকে বিরত থাকতে হবে। তার পূর্ব পর্যন্ত পানাহার করা যাবে। অতঃপর রাত আসা পর্যন্ত রোযা পালন করতে হবে। অর্থাৎ

সূর্য্যাস্তের অব্যবহিত পরেই রোযা সমাপ্ত করতে হবে। এখানে ভোরের শুভ্র রেখা দেখা যাওয়া পর্যন্ত পানাহার করা দ্বারা সেহরীর বিষয়ে ইংগিত করা হয়েছে।

ঘড়ির সময় অনুসারে কোন সময় নির্ধারণ করে দেয়া হয়নি। সকল অবস্থান বিবেচনায় গ্রহণযোগ্য ধারণা দেয়া হয়েছে। যেন এ বিষয়ে বিতর্কের অবকাশ না থাকে। কেননা ভোরের শুভ্র রেখা সর্বত্রই দেখা যাবে। রাত আগমনের চিহ্নও দেখা যাবে। সেভাবে অঞ্চলভিত্তিক মানুষ তাদের সময় নির্ধারণ করে নেবে।

যে সব অঞ্চলে রাত-দিন অনেক বড় সেখানে দৈনন্দিন জীবনের অপরাপর কাজগুলি যে নিয়মে সাধিত হয় রোযাও সেভাবে পালিত হবে। কেননা সেখানেও মানুষ রাতে ঘুমায়, সকালে ওঠে, অফিসে যায় ইত্যাদি। অথচ মাসের পর মাস সেসব অঞ্চলে না সূর্য্য ওঠে না ডোবে!

সকল ব্যতিক্রমের ক্ষেত্রেই নিয়মের ব্যতিক্রম প্রযোজ্য ও গ্রহণযোগ্য। তবে আদর্শ ও সাধারণ একটি নিয়ম সকল ক্ষেত্রেই থাকতে হয় বিধায় এমন নিয়মের আরোপকরণ। বস্তুত আলো দেখা না দেখার বিষয়টিও গুরুত্বপূর্ণ নয়। গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে আল্লাহর নির্দেশনা বা রোযা পালন করা ও এর যেসব শারীরিক, মানসিক, আত্মিক, সামাজিক, বৈশ্বিক ও বাস্তব সুবিধাসমুহ আছে সে লক্ষ্য অর্জন করা।

উল্লেখ্য যে, রোযা শুরু ও খোলার যথাযথ সময় পরিপালিত হওয়া বা না-হওয়ার বিষয়টি সময়ের সূক্ষ্ম হেরফেরের ওপর নির্ভর করে না। যথাসম্ভব একটি আদর্শ সময় বজায় রেখে সুন্দরভাবে সম্পন্ন করার ওপর নির্ভর করে। নিয়তে ত্রুটি না থাকলে এক্ষেত্রে তেমন আর কোন ত্রুটি নেই। তবে ইচ্ছেকৃত বা অবহেলাজনিত ত্রুটি গ্রহণযোগ্য নয়। এ বিষয়ে অনেকের মনে সংশয় দেখা দিতে পারে তাই প্রসঙ্গটি তুলে ধরা হল।

বস্তুত শৃংখলার প্রয়োজনে সবক্ষেত্রেই একটি আদর্শ নিয়ম থাকতে হয়। আদর্শ প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে ত্রুটি-বিচ্যুতি গ্রহণযোগ্য নয়। শৃংখলা ধরে রাখতে আদর্শ পরিপালনে জোর দিতে হয়। সেক্ষেত্রে নিয়মের বাধ্য-বাধকতায় কঠোরতাও প্রদর্শন করতে হয়। অন্যথায় শৃংখলা ধরে রাখা সম্ভব নয়।

সকলকে তাই যথাসাধ্য নিয়মের কাছাকাছি থাকার চেষ্টা করে যেতে হবে। ইচ্ছেকৃত ত্রুটি বা অবহেলা অমার্জনীয় অপরাধ।

এতদ্বসত্ত্বেও নিয়মের চেয়েও কর্মটি বা বিষয়ের পরিপালন, সাধনার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য অর্জন এবং নিয়ত বা আন্তরীকতার বিষয়গুলি হচ্ছে অধিক গুরুত্বপূর্ণ। ধর্মের পরিপালনের মধ্য দিয়ে বাস্তব জীবনের প্রয়োজনে সদগুণাবলী অর্জন করাটি গুরুত্বপূর্ণ। যার ইহকালীন ও পরকালীন উভয় ফলাফলই মধুর। তাই নিয়মের কঠোরতা রক্ষার চেয়েও সর্বক্ষেত্রেই মূল লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য অর্জনকে অধিক গুরুত্ব দিয়ে বিবেচনা করতে হবে।

▪ **২.১৮৭.৩** এবং তাদের স্পর্শ কর না, বরং গভীর ভালবাসায় সিক্ত হয়ে মসজিদে তাঁর উপাসনা কর। এগুলি আল্লাহ কর্তৃক নির্ধারিত সীমা। অতএব তাদের কাছেও যেও না : ই'তিকাফ হচ্ছে রমযান মাসের শেষ দশ দিন স্বেচ্ছায় আল্লাহর প্রেমে মগ্ন হয়ে এবাদতে মশগুল থাকা। এ সময়ে মসজিদে অবস্থান করে সম্পূর্ণ সময় নিজেকে আল্লাহর ধ্যানে ও প্রার্থনায় মগ্ন রাখতে হয়। আল্লাহর নৈকট্য লাভের চেষ্টায় রত থাকতে হয়। পার্থিব সকল কর্মকান্ড থেকে নিজেকে বিরত রাখতে হয়। এমনকি আল্লাহ ভিন্ন অপর কোন চিন্তাও মস্তিষ্কে প্রবেশ করার সুযোগ দিতে হয় না। প্রাকৃতিক কাজ সম্পন্ন করার সময়টুকু কেবল মসজিদ ত্যাগ করা যেতে পারে। ই'তিকাফ হচ্ছে অবশ্য পালনীয় ধর্মীয় নিয়মাবলীর অতিরিক্ত।

'এবং তাদের স্পর্শ কর না'- ই'তিকাফ করাকালীন সময়ের জন্য এটি একটি বিশেষ নির্দেশনা। এ সময়ে স্ত্রীদের সন্নিকটবর্তী হতে বারণ করা হয়েছে, অর্থাৎ সহবাস নিষিদ্ধ। বলা হচ্ছে, 'এগুলি আল্লাহ কর্তৃক নির্ধারিত সীমা'। ই'তিকাফ করাকালীন সময়ে কোন প্রকারেই এ সীমা লংঘন করা যাবে না। এতে ই'তিকাফের মূল উদ্দেশ্য অর্জন ব্যাহত হবে। পরিশ্রমসাধ্য এ এবাদত সেক্ষেত্রে কোন মূল্য বহন করবে না। কেননা এ সময়ে আল্লাহর সাথে নিজেকে একাত্ব অনুভব করে তাতেই বিলীন হয়ে যেতে হয়।

এ সময়ে এমনভাবে আল্লাহর ধ্যানে মগ্ন হতে হয় যেন ইহজাগতিক কোন চিন্তা বিঘ্ন ঘটাতে না পারে। সীমা নির্ধারণজনিত এ সতর্কবার্তা ই'তিকাফের নিখুঁত পরিপালনের গুরুত্বকে বুঝতে সহায়তা করে। এটি একটি কঠিন সাধনা।

খুব সহজেই জাগতিক সকল কর্মকান্ড ভূলে একাগ্রচিত্তে আল্লাহর চিন্তায় মগ্ন হয়ে যাওয়া যায় না বা এটি সহজ কাজ নয়। মুখে বললে বা কাগজে লিখলেই বিষয়টি তেমনি সহজভাবে হয়ে যায় না। সব মানুষের পক্ষে সূত্র অনুসরণ করে ই'তিকাফ পালন করা সত্বেও মূল লক্ষ্যে পৌঁছান হয়তবা সম্ভব হয় না। এর জন্য পূর্ব প্রস্তুতি লাগে। এছাড়াও মানসিক অবস্থার একটি পরিবর্তনও প্রয়োজন হয় যা ব্যাক্তিকে স্বতঃস্ফুর্ততার সাথে আল্লামুখী হতে সহায়তা করে। তবে এটি সহজ হয় তখন যখন যে কোন প্রকারেই হোক না কেন বিধাতা নিজেই কারও মধ্যে সে পরিবর্তনের সূচনা করে দেন। সে আশীর্বাদপুষ্ট!!

▪ **২.১৮৭.৪** এমনিভাবে আল্লাহ তাঁর অবতীর্ণ বাণীসমূহ মানবজাতির সামনে বিস্তারীতভাবে তুলে ধরেন যেন মানুষ (মন্দ কর্ম/পথ থেকে) নিজেদের রক্ষা করতে পারে : এটি বুঝতে হবে যে, মহান আল্লাহর সকল নির্দেশনাই হচ্ছে মানুষকে মন্দ কর্ম ও পথ থেকে রক্ষা করতে সহায়তা করা। সৃষ্টির প্রতি মহান আল্লাহর দয়া অসীম। আল্লাহ মানবজাতির সামনে তাই বিস্তারিতভাবে তাঁর দিক-নির্দেশনা তুলে ধরেছেন যেন মানুষ সমুহ বিপদ থেকে নিজেদেরকে রক্ষা করতে পারে।

এ বাণী ইহকাল ও পরকাল উভয় কালের জন্যই প্রযোজ্য। কেননা ভূল পথে চলার কারণে সমুহ বিপদ রয়েছে ইহকালে। আবার বিপদ রয়েছে পরকালেও। সৃষ্টির প্রতি মহান আল্লাহর দয়া অসীম। মানুষ যেন উভয় কালেই বিপদ থেকে নিজেদেরকে রক্ষা করে চলতে পারে তাই আল্লাহ মানবজাতির জন্য সঠিক পথের দিক-নির্দেশনা প্রেরণ করেছেন।

আল্লাহর সকল নির্দেশনাই মানুষকে সৎ পথে চলতে বলে এবং ভূল ও অশ্লীল পথ বর্জন করতে বলে। বিশ্বাসী হয়ে দিক-নির্দেশনার অনুসরণ মানুষকে বিপদ থেকে মুক্তি দিতে পারে। তাই মানুষকে বিশ্বাসের পথে আহবান করা হয়। পথের অনুসরণই মানুষকে সঠিক পথে পরিচালনা করবে। এ আহবান মানুষের নিজেদেরই মঙ্গলের জন্য।

➢ (আয়াত ১৮৮) অন্যায়ভাবে অপরের সম্পদ আত্মসাৎ ও দুর্নীতি না করা (Do-Don't) প্রসঙ্গে বলা হয়েছে।

১৮৮	তোমরা অন্যায়ভাবে একে অপরের সম্পদ গ্রাস কর না এবং জেনে-শুনে অন্যায়ভাবে অপরের সম্পদ আত্নসাৎ করার উদ্দেশ্যে সম্পদের কিয়দংশ অসৎ পন্থায় বিচার/শাসন কর্তৃপক্ষের হাতেও তুলে দিও না। (And eat not up your property among yourselves in vanity, nor seek by it to gain the hearing of the judges that ye may knowingly devour a portion of the property of others wrongfully.)

- **২.১৮৮** তোমরা অন্যায়ভাবে একে অপরের সম্পদ গ্রাস কর না এবং ... অসৎ পন্থায় শাসন কর্তৃপক্ষের হাতেও তুলে দিও না : অত্যান্ত গুরুত্বপূর্ণ দিক-নির্দেশনামূলক বাণী এটি। যা বাস্তব জীবনের সর্বাধিক সমস্যাসংকুল বিষয়ে দিক-নির্দেশনা দিয়েছে। কেবল এ একটি বাণী মানুষ অনুসরণ করে চলতে পারলে অনেক অপ্রয়োজনীয় সমস্যা জগতে থাকত না। তাই মানব মনে লুক্কায়িত অন্যায় লোভের প্রবৃত্তিকে অবদমন করতে হবে।

ভাগ ভাগ করে আয়াতটি কতটি বা কতভাবে অর্থ প্রকাশ করে সেভাবে উপস্থাপন করা সম্ভব। কিন্তু তার প্রয়োজনীয়তা কি? মূল বিষয়টি হচ্ছে এই যে, মানুষ যে প্রকারেই হোক না কেন অন্যায়ভাবে একে অন্যের সম্পদ গ্রাস করবে না। এটিই একজন সঠিক মানুষের চরিত্র হতে হবে যা মহান আল্লাহ নির্দেশ করে দিয়েছেন। এগুলিই সরল পথে চলার নির্দেশনা। এখানে কোন ফাঁক-ফোঁকর খোঁজার অবকাশ নেই।

এ নির্দেশনা কেবল মুসলমানের জন্য নয়। এটি সব মানুষের জন্য প্রযোজ্য। এটি একটি শাশ্বত ও সার্বজনীন বাণী। কিন্তু কোন মুসলমান যদি সকল ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠান পালন করা সত্ত্বেও সূক্ষ্ম জ্ঞানে এমন কাজ করে, তবে সে কিভাবে একজন ভাল মুসলিম হতে পারে? তার ধর্ম পালন অর্থহীন। অথচ সমাজে আজকাল মানুষ এমনকি মুসলিম নামধারীও অহরহ এমন কাজ করছে। যথাযথ জ্ঞানে বিষয়গুলি মানুষকে বুঝতে হবে এবং মেনেও চলতে হবে।

মিথ্যের আশ্রয় নিয়ে কেউ যদি অপরের সম্পদ গ্রাস করে থাকে এবং সেটি যদি প্রমাণিত হয়, তবে গ্রাসকৃত সে সম্পদের ওপর গ্রাসকারীর অধিকার

প্রতিষ্ঠিত হবে না। এটিই নিয়ম। যারা এমন করবে তাদেরকে আল্লাহর বিচারেও শাস্তি পেতে হবে। ইহজগতেও তেমন বিচার ব্যাবস্থা থাকতে হবে।

কোন বিচারিক রায়ের কারণে সত্য কখনই মিথ্যে হয়ে যায় না, আবার মিথ্যেও কখনও সত্য হয় না। সত্য সত্যই, মিথ্যে মিথ্যেই। বিচারক যদি অন্যায় কাজের সাথে নিজে সম্পৃক্ত থাকে তবে সেও দোষী। আদালত অবমাননার সুযোগ নেয়া যাবে না।

একজন বিচারকও মানুষ। তার দ্বারাও ভূল হতে পারে। কেননা সে ব্যাহ্যিক প্রমাণাদি বা কাগজ-পত্র দেখে বিষয়ের ওপর সিদ্ধান্ত নেয়। কিন্তু ভেতরের অনেক কারসাজি বা ফাঁক-ফোঁকর যা প্রমাণ করা যায়নি তা জানে না। কাগজ কথা বলে। কিন্তু এটিও সত্য যে, মিথ্যে কাগজও তৈরী হয়।

অন্যায়ভাবে বা মিথ্যের আশ্রয় নিয়ে কারও সম্পদ আত্মসাৎ করতে বারণ করা হয়েছে এবং অন্যায় কাজ করার জন্য শাসন কৃর্তপক্ষের সঙ্গে যোগসাজশ করতেও বারণ করা হয়েছে। সেক্ষেত্রে উভয়েই দোষী সাব্যস্ত হবে। ইহজগতেও তেমন ব্যাক্তিদের দোষী সাব্যস্ত হওয়ার বিধান থাকতে হবে। পরকালে তো হবেই।

মানুষকে এ সকল কারণ বিবেচনা করেই বিশ্বাসী হতে আহবান করা হয়। যেন বিশ্বাসের কারণে মানুষ নিজ থেকে মন্দ কাজ পরিহার করে চলে। যেন জানে যে আল্লাহ সব দেখছেন। অতএব লোভ সম্বরণ করতে শেখে। ভূল কর্ম করা থেকে বিরত থাকতে হবে। যেন নিজেকে ইহকালে ও পরকালে রক্ষা করতে পারে। দয়াময় আল্লাহ মানুষের বিপদমুক্ত হয়ে চলার সুবিধার্থে যথাযথ দিক-নির্দেশনা দিয়েছেন। বিশ্বাস নিয়ে সে পথ অনুসরণ মানুষের কাজ।

➢ (আয়াত ১৮৯) নতুন চাঁদ (New Moon) ও হজ্বের সময়ে পালিত একটি কুসংস্কার (Pilgrimage and Superstition) প্রসঙ্গে বলা হয়েছে।

১৮৯	তোমার নিকট তারা জিজ্ঞেস করে নতুন চাঁদের বিষয়ে। বল: এটি মানুষের জন্য সময় নির্ধারণ এবং হজ্বের সময় ঠিক করার মাধ্যম। আর পেছনের দিক দিয়ে ঘরে প্রবেশ করা সঠিক কাজ নয় বরং সঠিক কাজ হচ্ছে মন্দ কর্ম ও পথ থেকে নিজেকে রক্ষা করা। অতএব

	তোমরা ঘরে প্রবেশ কর দরজা দিয়ে এবং আল্লাহর প্রতি তোমাদের কর্তব্য পালন কর যেন তোমরা সফল হতে পার। (They ask thee, (O Muhammad), of new moons, say: They are fixed seasons for mankind and for the pilgrimage. It is not righteousness that ye go to houses by the backs thereof (as do the idolaters at certain seasons), but the righteous man is he who wardeth off (evil). So go to houses by the gates thereof, and observe your duty to Allah, that ye may be successful.)

▪ **২.১৮৯.১** তোমার নিকট তারা জিজ্ঞেস করে নতুন চাঁদের বিষয়ে। বল: এটি মানুষের জন্য সময় নির্ধারণ এবং হজ্বের সময় ঠিক করার মাধ্যম : চাঁদের গমনাগমন বিষয়ে যুগে যুগে মানুষের মনে নানান প্রশ্ন জেগেছে। এর সঙ্গে মানুষ কখনও নিজেদের ভাগ্যকেও মেলাবার চেষ্টা করেছে। দেশে দেশে অনেক কুসংস্কারও গড়ে উঠেছে। লোকেরা এসব বিষয় নিয়েও মহানবীর কাছে জানাতে চাইত।

বলা হচ্ছে, চাঁদের গমনাগমন হচ্ছে হজ্ব তথা মানুষের আরও অন্যান্য কাজের সময় গণনা ও নির্ধারণের একটি মাধ্যম। এর সাথে কুসংস্কারমূলক কোন ধারণার কোন সম্পর্ক নেই এর মাধ্যমে সে বিষয়টিও এখানে গুরুত্ব পেয়েছে।

এখানে হজ্বের বিষয়টি সুনির্দিষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছে এ কারণে যে, আরবদের কাছে ধর্মীয় থেকে শুরু করে সামাজিক, সাংস্কৃতিক, অর্থনৈতিক নানাবিধ কর্মের সাথে হজ্ব ওতোপ্রতোভাবে জড়িত তাই।

▪ **২.১৮৯.২** আর পেছনের দিক দিয়ে ঘরে প্রবেশ করা সঠিক কাজ নয় বরং সঠিক কাজ হচ্ছে মন্দ কর্ম ও পথ থেকে নিজেকে রক্ষা করা। অতএব তোমরা ঘরে প্রবেশ কর দরজা দিয়ে এবং আল্লাহর প্রতি তোমাদের কর্তব্য পালন কর যেন তোমরা সফল হতে পার : আরবরা হজ্বের সময় ‘এহরাম’ অর্থাৎ হজ্বের আনুষ্ঠানিক পোষাক বাধা অবস্থায় সম্মুখ দরজা দিয়ে ঘরে প্রবেশ করত না। এমনকি অজ্ঞতার যুগে বহু সম্প্রদায়ের মাঝে এমন প্রথাও চালু ছিল যে, যদি

তারা সফরের উদ্দেশ্যে ঘর থেকে বের হয়ে কোন কারণবশতঃ অর্ধ সমাপ্ত অবস্থায় সফর থেকে ফিরে আসত, তবে প্রধান ফটক দিয়ে গৃহে প্রবেশ করত না। দেয়াল টপকিয়ে কিংবা জানালা দিয়ে বা পেছনের দরজা দিয়ে ঘরে প্রবেশ করত। এমন বেশ কিছু কু-সংস্কার তাদের মধ্যে প্রচলিত ছিল। এ আয়াত এসব কু-প্রথাকে প্রকারান্তরে বাতিল ঘোষণা করেছে।

ইসলাম সত্যের ওপর প্রতিষ্ঠিত একটি ধর্ম। এমনকি কোরআনেও বারবার উচ্চারিত হয়েছে যে, এ বিশ্বজগত সত্যের ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত। ইসলামের শিক্ষা তাই। এখানে আজগুবি, অলৌকিকতা এবং কু-সংস্কারের কোন স্থান নেই। আলোচ্য আয়াতে সে বিষয়টি ফুটে উঠেছে এবং কুসংস্কারাচ্ছন্ন যে কোন প্রথাকে পরিত্যাগ করে মানুষকে সত্যের পথে চলতে উদ্বুদ্ধ করা হয়েছে। এ নির্দেশনার মাধ্যমে প্রকারান্তরে যা সত্য ও সঠিক নয় তেমন কাজে মনোনিবেশ করে মূল্যবান সময় নষ্ট না করতেও মানুষকে উদ্বুদ্ধ করা হয়েছে।

সত্যের পথে চলা ও অসত্যকে পরিত্যাগ করাই হচ্ছে আল্লাহর প্রতি যথাযথ কর্তব্য পালন করা। এছাড়াও আল্লাহর সুস্পষ্ট নির্দেশনা পালন করাও তাঁর প্রতি কর্তব্য পালন করার অন্তর্ভূক্ত বিষয়। যেমন তিনি মানুষকে রমযান মাসে সিয়াম সাধনা করতে নির্দেশনা দিয়েছেন। আল্লাহর কারণে পালন করা সকল কাজই মানবজীবনকে ইহকালীন ও পরকালীন সফলতার দিকে নিয়ে যায়। কোরআনের এ বিশ্লেষণাত্মক আলোচনায় বিষয়গুলি সকলের কাছে বোধগম্য হয়ে উঠবে।

➢ (আয়াত ১৯০-১৯৪) জেহাদ, সংগ্রাম বা যুদ্ধ (Warfare) প্রসঙ্গে বলা হয়েছে [জেহাদ-সংগ্রাম-যুদ্ধ দ্রষ্টব্য ২:১৫৪]।

১৯০	লড়াই কর আল্লাহর পথে (সত্য ও ন্যায়ের পথে), তাদের বিরুদ্ধে যারা লড়াই করে তোমাদের বিরুদ্ধে (সত্য ও ন্যায়ের বিপক্ষে), কিন্তু বিরোধীতার সূত্রপাত কর না। নিশ্চয়ই! আল্লাহ সীমালঙ্ঘনকারীদের পছন্দ করেন না। (Fight in the way of Allah against those who fight against you, but begin not hostilities. Lo! Allah loveth not aggressors.)

১৯১	তাদেরকে (অবিশ্বাসী/শত্রু পক্ষকে) যেখানে পাও বধ কর এবং বের করে দাও সেখান থেকে যেখান থেকে তারা তোমাদেরকে বের করে দিয়েছে। বস্তুত বিশৃংখলা বা দাঙ্গা-হাঙ্গামা (ফিতনা) সৃষ্টি করা হত্যার চেয়েও কঠিন অপরাধ। তাদের সঙ্গে লড়াই কর না উপাসনার পবিত্রতম স্থানে (মসজিদুল হারামের সন্নিকটে) যতক্ষণ না তারা তোমাদের সঙ্গে সেখানে লড়াই করে। যদি তারা তোমাদেরকে আক্রমন করে তবেই তাদেরকে বধ কর। এটিই অবিশ্বাসীদের পুরস্কার। (And slay them wherever ye find them, and drive them out of the places whence they drove you out, for persecution is worse than slaughter. And fight not with them at the Inviolable Place of Worship until they first attack you there, but if they attack you (there) then slay them. Such is the reward of disbelievers.)
১৯২	যদি তারা বিরত থাকে তবে আল্লাহ ক্ষমাশীল, দয়ালু। (But if they desist, then lo! Allah is Forgiving, Merciful.)
১৯৩	এবং লড়াই কর যে পর্যন্ত না 'ফিতনা'র (বিশৃংখলার) অবসান হয় এবং আল্লাহর 'দ্বীন' তথা ধর্ম বা চলার যথাযথ/সঠিক পথ প্রতিষ্ঠা পায়। যদি তারা (শত্রুপক্ষ) নিবৃত হয়, তবে (জেনে রেখ) পথভ্রষ্টদের ব্যাতিত আর কারও প্রতি কোন শত্রুতা নেই। (And fight them until persecution is no more, and religion is for Allah. But if they desist, then let there be no hostility except against wrong-doers.)
১৯৪	নিষিদ্ধ মাসকে অবশ্যই সন্মানের চোখে দেখতে হবে যদি শত্রুপক্ষও সেটিকে সন্মানের চোখে দেখে। সকল নিষিদ্ধ কাজের ক্ষেত্রেই বদলাজনিত প্রতিকার বিধিসম্মত। অতএব কেউ যদি নিষিদ্ধ কাজ করার মাধ্যমে সীমালংঘন করে এবং তোমাকে আক্রমন করে, তবে তুমিও তাকে একইরূপে আক্রমন কর (কেননা সে তোমাকে আক্রমন করেছে)। তথাপি আল্লাহকে ভয় কর এবং জেনে রেখ, যারা মন্দ

	কর্ম/পথ থেকে নিজেদের রক্ষা করে চলে আল্লাহ তাদের সঙ্গে আছেন। (The forbidden month for the forbidden month, and forbidden things in retaliation. And one who attacketh you, attack him in like manner as he attacked you. Observe your duty to Allah, and know that Allah is with those who ward off (evil).)

▪ **২.১৯০.১** লড়াই কর আল্লাহর পথে : যুদ্ধ বিষয়ক আয়াতসমুহের প্রায় প্রতিটি বক্তব্যকে নিয়েই এখানে পৃথকভাবে আলোচনা করার আগ্রহ দেখান হয়েছে। এর বিশেষ কারণ আছে। যুদ্ধ বিষয়ক আয়াতগুলিকে নিয়ে অনেক সময় উদ্দেশ্য প্রণোদিতভাবে ভূল ব্যাখ্যা দাঁড় করাবার চেষ্টা করা হয়। যদি এমন হত যে, যারা ইসলাম ধর্মকে গ্রহণ করেনি অর্থাৎ অবিশ্বাসী কেবল তারা এর বিরূপ সমালোচনা করছে তবে বিষয়টিকে একভাবে দেখা যেত। কিন্তু বর্তমানে দেখা যাচ্ছে যে ইসলাম ধর্মাবলম্বীদের মধ্যেও কিছু সংখ্যক রয়েছে যারা এসব আয়াত নিয়ে বিরূপ আলোচনা করার প্রয়াস পায়। অবশ্য এর কিছু কারণও আছে। তবে অন্যতম কারণ হচ্ছে বিষয়ের পেছনের ইতিহাস না জানা এবং তৎকালীন সময়ে মুসলিমদের ওপর বিরাজমান পরিস্থিতির বিরূপ প্রভাব কতটা গভীর ছিল সেটি যথাযথভাবে অনুভব বা উপলব্ধি করতে না পারা।

বিষয়ের গুরুত্ব অনুধাবন করে এখানে প্রতিটি বক্তব্যকে পৃথকভাবে আলোচনার জন্য বিবেচনায় নেয়া হয়েছে। বিশেষভাবে স্মরণযোগ্য যে, এসব আয়াত যখন অবতীর্ণ হয়েছে মুসলমানরা তখন অবিশ্বাসীদের নিদারুণ নির্যাতনের স্বীকার ছিল। তৎকালীন সময়ে যুদ্ধের দিক-নির্দেশনা হিসেবে যদিও এসব বাণী বিশ্বাসীদেরকে উদ্দেশ্য করে অবতীর্ণ হয়েছে, তথাপি এসব বাণীর মধ্যে শাশ্বত ও সার্বজনীন দিক-নির্দেশনা আছে। বিশ্বাসী-অবিশ্বাসী নির্বিশেষে সকলের সকল সময়ের জন্য এমনকি বর্তমান সময়েও এ সকল দিক-নির্দেশনা যুদ্ধজনিত বিচার্য্য ক্ষেত্রে অনুসরণীয়।

আয়াতের এ অংশে ‘আল্লাহর পথে’ লড়াই করার কথা বলা হয়েছে। আল্লাহর পথে লড়াই বলতে পায়জামা-পাঞ্জাবী পরিহিত, কিংবা পাগড়ি মাথায়

দাড়ি-টুপিওয়ালা লোকদের পক্ষ নিয়ে লড়াই করাকে বোঝান হয় নাই। বিষয়টি ভালভাবে বুঝতে হবে।

'আল্লাহর পথে' লড়াই হচ্ছে সত্যের পক্ষে, ন্যায়ের পক্ষে, অত্যাচারীত-নির্যাতিত-নিপীড়িত মানুষের পক্ষে, অত্যাচারী-অন্যায়কারীর বিপক্ষে এবং যে কোন প্রকার ভূল বা মিথ্যে ধারণা ও কুসংস্কারের বিপক্ষে লড়াই করা। অতএব প্রথমেই 'আল্লাহর পথে' লড়াইটাকে ভালভাবে বুঝতে হবে।

কেবলমাত্র সম্মুখ যুদ্ধ কিংবা রক্তক্ষয়ি সংঘর্ষই নয় সত্যের পক্ষে অবস্থান গ্রহণ করা এমনকি কথা বলাও এ লড়াইয়ের অংশ। অতএব 'আল্লাহর পথে' যুদ্ধ শব্দটিকে ভূলভাবে গ্রহণ করার কোন অবকাশ নেই। বিষয়টিকে যারা দলীয়ভাবে বিবেচনা করে মুসলিমদের মধ্যেও একটি অংশ সেটিকে মনে-প্রাণে মেনে নিতে পারে না। তাই ওপরে মুসলমানদের মধ্যেও কিছু সংখ্যকের যে সমালোচনা করার কথা বলা হয়েছে সেটির জন্য এমন ভূল ধারণাও একটি কারণ হিসেবে দায়ী।

পার্থিব জগতের সমস্যা হচ্ছে যারা দলে বিভক্ত হয়ে কোন সংঘর্ষ বা যুদ্ধে জড়িয়ে পড়ে তারা সকলেই নিজেদেরকে ন্যায়ের পক্ষ শক্তিরূপে প্রতিষ্ঠা করার প্রয়াস পায়। এর বড় কারণ হচ্ছে এরা নিজেদের স্বার্থকেই ন্যায়রূপে গন্য করে। অবশ্যই মানুষকে 'চরম বা চুড়ান্ত সত্য'কে খুঁজে বের করতে হবে এবং সেটিকে স্বীকৃতি দিতে হবে নিজের বিপক্ষে গেলেও। তবেই সেটি হবে 'আল্লাহর পথে'। দিক নির্দেশনারূপে নিচের আয়াতটি তাই অত্যান্ত গুরুত্বপূর্ণ। বলা হচ্ছে যে,

"হে বিশ্বাসীগণ! তোমরা ন্যায়ের ওপর প্রতির্ষ্ঠিত থাক। 'আল্লাহর পথে' ন্যায়সম্মত সাক্ষ্যদান কর, যদি তা তোমাদের নিজেদের কিংবা পিতামাতা অথবা আত্মীয়-স্বজনের বিপক্ষে যায় (তবুও)। ধনী হোক কিংবা দরিদ্র হোক আল্লাহ উভয়ের জন্যই নিকটতম। অতএব তোমরা কারও জন্য ব্যাথিত হয়ো না। কেননা তাতে তোমাদের সত্য থেকে বিচ্যুত হওয়ার শংকা আছে। আর যদি তোমরা সত্য থেকে বিচ্যুত হও কিংবা তাতে পতিত হও, তবে নিশ্চয়ই! তোমরা যা কর সে বিষয়ে আল্লাহ নিরবিচ্ছিন্নভাবে অবগত।" (আল-কোরআন ৪:১৩৫)

আল্লাহর দিক নির্দেশনায় কোন ত্রুটি নেই। সত্য ও ন্যায়ে পরিপূর্ণ। যেমন বলা হয়েছে নিজের কিংবা নিজের আপনজনদের বিপক্ষে গেলেও সত্যের ওপর প্রতিষ্ঠিত থাকতে। কিন্তু স্বার্থ বা সুবিধাজনিত কারণে আমরা ভূলভাবে বা সংকীর্ণ চিন্তাধারা থেকে বিষয়গুলিকে ঘুরিয়ে-পেঁচিয়ে ব্যাখ্যা করি, কিংবা সত্যকেই পরিপূর্ণভাবে গোপন করি। অথচ সত্যকে গোপন করার অপরাধে একসময় কোরআনেই ইহুদিদের কঠোর সমালোচনা করা হয়েছে (দ্রষ্টব্য ২.৪২)।

উল্লেখ্য যে, এ প্রকান্ড মহাবিশ্বে ব্যাক্তিগতভাবে আল্লাহর কাউকে চেনার প্রয়োজন নেই। ফলে তাঁর জানার প্রয়োজন নেই যে কোন মানুষটি তাঁর পথে আছে। কোন লেবাস দেখেও তিনি এটি বিবেচনা করবেন না। লেবাসের মধ্যে মোনাফেকও থাকে। এমনকি দল দেখেও তা বিবেচনা করবেন না। কেননা দলও স্বার্থের জন্য অন্যায় কাজে লিপ্ত হয়। সার্বিক পরিস্থিতি বিবেচনায় যারা সঠিক পথে আছে, যারা সত্য ও ন্যায়ের ঝান্ডা হাতে নিয়ে আছে তাদেরকেই তিনি তাঁর পথে বলে বিবেচনা করবেন। মানুষের জন্য এমন উপলব্ধিবোধটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। অন্যথায় অন্যায়কারীও নিজেকে আল্লাহর পথে রয়েছে বলে দাবী করার চেষ্টা করবে, সুযোগ নেবে এবং ইসলামের ভাবমূর্তীকে বিশ্ববাসীর সম্মুখে ভূলুন্ঠিত করবে। বোধসম্পন্ন মানুষ তা হতে দিতে পারে না। জুতা চুরির মনোবৃত্তি ও জেহাদ একসাথে যায় না (যেমনটি হতে দেখা গেছে)। এগুলিকেও অনুৎসাহিত ও প্রতিহত করতে হবে।

অতএব লড়াই কর 'আল্লাহর পথে' অর্থাৎ 'সত্য ও ন্যায়ের পথে'। প্রথমেই এ বিষয়টিকে যথাযথভাবে উপলব্ধি করতে হবে এবং এ ধারণাকে যথাযথ বিবেচনা করে প্রতিষ্ঠা করতে হবে। সত্য ও ন্যায় প্রতিষ্ঠায় যারা বাধা হয়ে দাড়ায়, সামাজিক সংস্কারের কাজে যারা প্রতিবন্ধকস্বরুপ হয়ে যায়, যারা অন্যায়ভাবে শত্রুতা ও অত্যাচার-নির্যাতন করে তাদের বিপক্ষে সংগ্রাম করতে বলা হয়েছে। তেমন সংগ্রামই 'আল্লাহর পথে' লড়াই বা যুদ্ধ।

জাহেলিয়াতের যুগে সমাজ সংস্কারের প্রয়োজনে মহানবী (সাঃ) বিশ্বাসীদের সাথে নিয়ে আল্লাহ প্রদর্শিত পথের বা দর্শনের প্রচার-প্রচারণা শুরু করেন। যা ছিল মানবজাতির জন্য মুক্তির পথ। কিন্তু অবিশ্বাসীরা বিশ্বাসীদের ওপর অত্যাচার-নির্যাতন শুরু করে। তারা সত্য, সঠিক ও একটি যথাযথ পথ

প্রতিষ্ঠায় ও সামাজিক-সাংস্কৃতিক সংস্কারের পথে বাধা হয়ে দাড়ায়। মুসলমানরা যখন কিছু শক্তি সঞ্চয় করে তখন বদর যুদ্ধের পূর্বে 'লড়াই কর আল্লাহর পথে' লড়াইয়ের এমন নির্দেশনা অবতীর্ণ হয়। অর্থাৎ শত্রু পক্ষের অত্যাচার-নির্যাতন ও অন্যায় কাজকে সামাজিক-সাংস্কৃতিক-অর্থনৈতিক-রাজনৈতিক প্রচার-প্রচারণার মাধ্যমে প্রতিহত করার চেষ্টার পাশাপাশি যুদ্ধের মাধ্যমেও প্রয়োজনে মোকাবেলা করার নির্দেশনা আসে।

▪ **২.১৯০.২** তাদের বিরুদ্ধে, যারা লড়াই করে তোমাদের বিরুদ্ধে : বলা হচ্ছে যে, তাদের বিরুদ্ধে লড়াই কর যারা তোমাদের বিরুদ্ধে লড়াই করে। বিশেষভাবে লক্ষনীয় যে, এখানে সত্য ও ন্যায়ের পক্ষে বা অন্যায় ও অসত্যের বিপক্ষে লড়াই কর এভাবে বলা হয়নি। বলা হচ্ছে, তাদের বিরুদ্ধে লড়াই কর যারা 'তোমাদের বিরুদ্ধে' লড়াই করে। 'তোমাদের বিরুদ্ধে' বলা হল কেন? তাহলে তো 'আল্লাহর পথে' বলতে ওপরে যে ব্যাখ্যা দেয়া হয়েছে বিষয়টি তার সাথে ভালভাবে যাচ্ছে না। কেমন যেন দলীয় মনে হচ্ছে। অর্থাৎ নির্দেশনাটি একটি দলের পক্ষে যাচ্ছে। ন্যায়-অন্যায়, ভাল-মন্দ ইত্যাদি বিবেচনায় নেয়া হচ্ছে না বলে মনে হচ্ছে!

এভাবে বলারও যথাযথ কারণ আছে। যে সকল নিবেদিত প্রাণ ইসলামের প্রতিষ্ঠাকালে জেহাদ বা সংগ্রাম করেছে, তারা স্পষ্টতই সমাজে কু-প্রথা ও অন্যায়ের বিপক্ষে লড়াই করেছে। এটি সর্বজনবিদিত। সমাজ সংস্কারের লক্ষে জীবনের ঝুঁকি নিয়ে তারা দৃঢ়চিত্ত থেকেছে। তারা সত্য ও ন্যায়ের পক্ষে লড়াই করেছে। তারা বিশ্বাসী বা 'মুসলিম' নামে পরিচিত। তাই এক্ষেত্রে 'যারা ন্যায়ের বিপক্ষে লড়াই করে' সেটি না বলে যারা 'তোমাদের বিরুদ্ধে লড়াই করে' এভাবে বলা হয়েছে। কেননা 'মুসলিম' বা 'বিশ্বাসী' নাম বা শব্দটিই তখন ছিল সত্য ও ন্যায়ের মূর্ত প্রতীক। ফলে মুসলিমদের বিপক্ষে যারা লড়াই করেছে তারা ন্যায়ের বিপক্ষে লড়াই করেছে এভাবেই বিষয়গুলিকে ধরে নেয়া হয়েছে। তাছাড়া সে সময়ে তারা সরাসরি মোহাম্মদ (সাঃ) এর তত্ত্বাবধানে থেকে কাজ করেছে।

উপরন্তু সে সময়ের ঘটনাসমূহ মহানবী (সাঃ) এর জীবদ্দশাতে তাঁর তত্ত্বাবধানেই ঘটেছে। তাঁর জীবদ্দশায় তাঁর পক্ষশক্তিই ছিল সত্য ও ন্যায়ের

পক্ষশক্তি হিসেবে বিবেচিত। এ বিষয়ে সন্দেহ পোষন করার কোন অবকাশ নেই। তাই এভাবে বলা সম্ভব হয়েছে যে, 'লড়াই কর তাদের বিরুদ্ধে, যারা লড়াই করে তোমাদের বিরুদ্ধে'।

সময়ের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষা-দীক্ষার উন্নয়ন হয়েছে। মানুষের জ্ঞান ছড়িয়ে পড়েছে পৃথিবীময়। এখন অনেকেই সত্য ও ন্যায়ের পক্ষে কথা বলে; এমনকি অমুসলিমরাও। মানুষ হিসেবে তারাও আল্লাহর নির্দেশনারই অনুসারী। অতীতেও তেমন মানুষ ছিল। অতএব কেবল আবেগ দিয়ে নয় বিষয়গুলিকে যথাযথ জ্ঞানে বুঝতে হবে।

পরিবর্তীত পরিস্থিতিতে বর্তমানে মুসলিমরাও মুসলিমদের বিরুদ্ধে লড়াই করছে। মুসলিমরাও অনেক ভূল ও অন্যায় কাজে জড়িয়ে যাচ্ছে। অমুসলিম বা অবিশ্বাসীদের প্ররোচনায় প্ররোচিত হয়েও কাজ করছে।

মুসলিম নামে পরিচিত হয়েও ঘুষ-দুর্নীতি করছে, অন্যায়ভাবে সম্পদের পাহাড় গড়ে তুলছে। অথচ দিক-নির্দেশনা দেয়া হয়েছে, 'ধনৈশ্বর্য্য যেন কেবল তোমাদের বিত্তশালীদের মধ্যেই পূঁঞ্জীভূত না হয়' (দ্রষ্টব্য আল-কোরআন ৫৯:৭)।

ছেলেবেলায় পাঠ্য বইয়ে এভাবে আদর্শ শিক্ষা দেয়া হয়েছে যে, হযরত ওমর ব্যাক্তিগত কাজে ব্যাক্তিগত মোমবাতি ও সরকারি কাজে সরকারি মোমবাতি জ্বালিয়ে কাজ করতেন। ব্যাক্তিগত কাজে সরকারি সম্পদের অপচয় করতেন না। কোথায় এখন সে সব শিক্ষা ও আদর্শ। তবে কেন এভাবে প্রতারণামূলক শিক্ষা দেয়া হল বা হচ্ছে?

যারা আদর্শের বুলি শিক্ষা দেয় তারা আদর্শ ভঙ্গের আদর্শ প্রতিষ্ঠা করে। এখন এগুলিই সত্য। তাই কেবল বিশ্বাসী হলেই আল্লাহর পথে আছে এখন তেমনটি মনে করার অবকাশ নেই। মুখে স্বীকার করা বিশ্বাসী ও সত্যিকার অর্থে আল্লাহর পথে থাকা দু'টি ভিন্ন বিষয়। সত্যের আলোকে বিষয়গুলিকে বুঝতে হবে।

মুসলিম হলেই সকলে ন্যায়ের পক্ষশক্তি সেভাবে বলে এখন আর বাড়তি সুবিধা নেয়া যাবে না। এখন বিচার-বিবেচনা করে সত্যকে খুঁজে বের করে প্রতিষ্ঠা করতে হবে। তবেই 'আল্লাহর পথে' কাজ করা সম্ভব হবে।

এ বাণীর আরও একটি দিক আছে। বলা হচ্ছে, 'লড়াই কর তাদের বিরুদ্ধে যারা লড়াই করে তোমাদের বিরুদ্ধে' অর্থাৎ যারা গায়ে পড়ে যুদ্ধ করে বা অন্যায়ভাবে যুদ্ধ শুরু করে তাদের সাথে যুদ্ধ করার কথা বলা হয়েছে। যারা আগ বাড়িয়ে যুদ্ধ শুরু করে না তাদের সাথে যুদ্ধ করার কথা বলা হয়নি এবং নিজেদেরকেও অন্যায়ভাবে আগ বাড়িয়ে যুদ্ধ করার জন্য বলা হয়নি। বিষয়গুলি যথাযথভাবে ও গুরুত্বের সাথে কোরআনের পাঠকদের অনুধাবন করতে হবে।

উল্লেখ্য যে, ইসলামের আবির্ভাবকালীন সময়ে একটি আদর্শের লড়াই হয়েছে। যারা অবিশ্বাসী ছিল তাদের বিশ্বাস ছিল একরকম। বিশ্বাসীদের বিশ্বাস ছিল আরেক রকম। প্রত্যেকেরই তার নিজ নিজ বিশ্বাস নিয়ে থাকার অধিকার আছে। আবার প্রত্যেকেরই তার নিজ বিশ্বাস বা আদর্শের প্রচার-প্রচারণা করার অধিকার আছে। এতে কোন সমস্যা নেই। এ অধিকার সকলের আছে এবং সেটিকে সকলের স্বীকার করতে হবে।

ইসলামের আবির্ভাবকালে দর্শন ও আদর্শের প্রচার-প্রচারণা করতে গিয়ে বিশ্বাসীরা অবিশ্বাসীদের বা আরবীতে 'কাফের'দের অন্যায়-অত্যাচার ও বাধার মুখোমুখী হয়েছে। বিশ্বাসীদেরকে অবিশ্বাসীদের হাতে নিপীড়ন-নির্যাতন সহ্য করতে হয়েছে। তারা মহানবী (সাঃ)-কে হত্যাও করতে চেয়েছে। দেশ থেকে তাঁকে বিতাড়িত করেছে। অথচ সংস্কার কাজ না করলে কুসংস্কার, ভূল চিন্তা-ধারা ও অন্যায় কার্যকলাপের বোঝা সমাজ তথা জগতের সকলকেই বয়ে বেড়াতে হত।

কারও বা কোন পক্ষের নির্জ্ঞানতা কিংবা ভূল পদক্ষেপ বা কার্যকলাপের জন্য জগতের সকল মানুষকে ভূক্তভোগী হতে দেয়া যায় না। অন্তত বোধসম্পন্ন মানুষ সেটি করতে দিতে পারে না। সেটি বন্ধ হওয়া প্রয়োজন। এটিই আল্লাহর প্রতি সবচেয়ে বড় দায়িত্ব ও কর্তব্য পালনরূপে বিবেচিত।

সে সময়ের প্রেক্ষাপটে অবিশ্বাসীরা মহৎ কাজে বাধা হয়ে দাড়ায়। সে কারণেই বিশ্বাসী-অবিশ্বাসীর লড়াইয়ের উৎপত্তি। দর্শনের কারণে নয়। বিষয়টি ভালভাবে বুঝতে হবে। অবিশ্বাসীরা যদি বাধা হয়ে না দাড়াত, অত্যাচার-নির্যাতন না করত তবে দ্বন্দ্ব হওয়ার কথা ছিল না। সকলেই নিজ নিজ

বিশ্বাস নিয়ে থাকত। প্রচার-প্রচারণা করত। যার যেটা ভাল লাগে সে সেটা গ্রহণ করত। যেমন বলা হয়েছে,

"তোমাদের জন্য তোমাদের ধর্ম বা পথ, আমার জন্য আমার ধর্ম বা পথ।" (আল-কোরআন ১০৯:৬)

এমনই ইসলামের মহৎ ও মহান দিক-নির্দেশনা। ধর্মের বিষয়ে জোর-জবরদস্তী নেই (দ্রষ্টব্য ২:২৫৬)। বস্তুত সত্য হচ্ছে মানুষকে নিজ বুঝেই কোন কিছু গ্রহণ বা বর্জন করতে হয় বা হবে। ইসলামের নীতিই তাকে সংঘর্ষ এড়িয়ে চলার দিক-নির্দেশনা দেয়। অতএব বুঝতে হবে যে দর্শনের কারণে বিশ্বাসী-অবিশ্বাসীর দ্বন্দ্ব বা সংঘর্ষ নয় এবং মুসলিমদের দিক থেকেও তার উৎপত্তি নয়।

মুসলমানরা সে সময়ে ছিল দুর্বল। সংঘর্ষ করার মতো তাদের সাজ-সরঞ্জাম বা শক্তিও ছিল না। অবিশ্বাসীদের অত্যাচার-নির্যাতন ও বাধা প্রতিহত করতে গিয়েই তাদেরকে সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়তে হয়েছে। তাই লড়াইয়ের এমন নির্দেশনা অবতীর্ণ হয়েছে। এটি যেমন নিজেদের টিকে থাকার জন্য, তেমনি একই সাথে সমাজ থেকে অন্যায়, মিথ্যে ও ভূল চিন্তাধারার মুলোৎপাটনের জন্যও এ নির্দেশনা অপরিহার্য্য ছিল। অন্যথায় মানবজাতি পরিণত হত দায়িত্ব-জ্ঞানহীন, দায়-বদ্ধতাবিহীন এক অজ্ঞ, মূর্খ বা নির্জ্ঞান সৃষ্টিতে।

যারা একটি প্রয়োজনীয় সংস্কার, ভাল আদর্শ বা উদ্যোগকে নস্যাৎ করার চেষ্টা করবে তাদের সাথে যুদ্ধ হবেই। অন্যথায় সত্য ও ন্যায় প্রতিষ্ঠা পাবে না। ইসলাম সত্য ও ন্যায়কে প্রতিষ্ঠা, সমাজ থেকে দুরাচার দুর করার জন্য সংগ্রাম করেছে। এখানে সে কারণে লড়াই করতে বলা হয়েছে।

এতদ্বসত্বেও কেবলমাত্র তাদের সাথে লড়াই করার নির্দেশনা দেয়া হয়েছে যারা গায়ে পড়ে লড়াই করতে আসে। বিষয়গুলিকে ভালভাবে বুঝতে হবে। তবেই ভূল বোঝার অবসান সম্ভব হবে।

এরপরেও ভূল বোঝার অবসান হবে না। কেননা কিছু মানুষ উদ্দেশ্য প্রণোদিত হয়ে বিরোধীতা করবেই। এসব করে তারা নিজেদের লোভ, আকাংখা ও হীন স্বার্থ উদ্ধার এবং তার নিরাপত্তা বিধানের জন্য।

▪ **২.১৯০.৩** কিন্তু বিরোধীতার সূত্রপাত কর না : কোরআনের নির্দেশনাগুলি অত্যান্ত যুক্তিপূর্ণ, ন্যায়সম্মত ও ত্রুটিহীন। যারা নিরপেক্ষ ও সৎ আন্তর নিয়ে কোরআন বুঝে পাঠ করবে তারা বিষয়গুলি বুঝতে পারবে। ত্রুটিপূর্ণ কোন নির্দেশনা এখানে দেয়া হয়নি।

লড়াইয়ের বিভিন্ন রকমভেদ আছে। সত্যের সন্ধানে যুক্তিতর্কে লিপ্ত হওয়াও একটি লড়াই। লেখনীর মাধ্যমেও এ লড়াই হতে পারে। নিরবে সত্যের পক্ষাবলম্বন করাও একটি লড়াই। কিন্তু লড়াইয়ের সর্বোচ্চ পর্যায় হচ্ছে সরাসরি রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষ, খুনোখুনি বা সশস্ত্র যুদ্ধে জড়িয়ে যাওয়া।

এ বিষয়ে কোরআন সুনির্দিষ্টভাবে উল্লেখ করে দিয়েছে যে, যারা সত্যের পক্ষে অবস্থান করবে তাদের আচরণটি এমন হবে যেন তারা কোনভাবেই বিরোধীতার সূত্রপাত না করে। অর্থাৎ নিজেরা গায়ে পড়ে অহেতুক যুদ্ধ শুরু না করে। সমাজের শান্তি বিনষ্ট না করে বা শান্তি স্থাপনের পথ রুদ্ধ করে না দেয়।

নিজেদের স্বার্থ ও সুবিধার বিষয় জড়িত থাকা সত্বেও প্রকাশ্যে এমন সৎ ও সাহসী নির্দেশনা কেউই কখনও দিতে চাইবে না যেটি কোরআন দিয়েছে। এখানেই কোরআনের মহাত্ব! নির্ভূলতা!! পক্ষপাতহীনতা!!!

▪ **২.১৯০.৪** নিশ্চয়ই! আল্লাহ সীমালঙ্ঘনকারীদের পছন্দ করেন না : ন্যায়ের পক্ষ শক্তিকে বা অন্যভাবে বলা যায় যে, যারা আল্লাহর পথে লড়াই করে তাদেরকে বিরোধীতার সূত্রপাত করতে বারণ করা হয়েছে। এতদ্বসত্বেও যদি কেউ ধূর্ততার আশ্রয় নিয়ে তেমনটি করে তবে সতর্ক করে দেয়া হয়েছে। তেমন আচরণ হবে আল্লাহ প্রদত্ত দিক-নির্দেশনা বা সরাসরি আল্লাহর নির্দেশনার বিরুদ্ধ আচরণ এবং এটি হবে আল্লাহর বেধে দেয়া নির্ধারিত সীমার লংঘন। যারা সীমালংঘন করবে তারা তাদের আচরণের ফলও ভোগ করবে। তেমন আচরণকারীকে নিবৃত করা অপরাপরদের দায়িত্ব। অন্যথায় মন্দ কাজের ফলাফল সকলকেই বহন করতে হতে পারে। তাই যে ভূল করে তাকে নিবৃত করাও দায়িত্বের মধ্যে পরে। আল্লাহ যে সীমা নির্ধারণ করে দিয়েছেন তিনি তা পালনের সুফল ও লংঘনের দীর্ঘমেয়াদি কুফল সম্পর্কে জানেন বিধায় সীমালংঘন করতে নিষেধ করেছেন।

এখানে আরও একটি বিষয় স্পষ্ট হয়েছে যে, আল্লাহ সীমালংঘনকারীদের পছন্দ করেন না। সেটি তার পক্ষাবলম্বনকারী হলেও তিনি তা পছন্দ করেন না। অর্থাৎ তারাই তার সত্যিকার পক্ষাবলম্বনকারী যারা তার নির্দেশনা বা তার প্রদত্ত সীমা মেনে চলে। অতএব একজন মুসলিম কখনই দাঙ্গা-হাঙ্গামার পরিস্থিতি কৃত্রিমভাবে হলেও সৃষ্টি করতে পারে না। যে তা করে সে পথচ্যুত।

উল্লেখ্য যে, মুসলমানদের যুদ্ধের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য কখনই নিজের বা ব্যাক্তিগত স্বার্থ উদ্ধার, বস্তুগত কোন কিছু অর্জন করা বা কোন প্রতিশোধপরায়নতার কারণ থেকে সৃষ্ট নয় বা হতেও পারে না। ফলে যারা বিশ্বাসীদের কাজ বা আদর্শের তথা আল্লাহর বাণীর প্রচার-প্রচারণায় প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়াচ্ছে না বা বিরোধীতা করছে না তাদের সাথে কোন যুদ্ধ নয়।

যুদ্ধের বিষয়ে মোহাম্মদ (সাঃ) মানবিক দিক বিবেচনা করতে দিক-নির্দেশনা দিয়ে গেছেন। যে নির্দেশনা সার্বজনীন ও শাশ্বত। বিশ্বাসী-অবিশ্বাসী নির্বিশেষে সকলের জন্য সে নির্দেশনা প্রযোজ্য। তবে গ্রহণ করা না করা নিজেদের বিবেচ্য বিষয় এবং তার ফলাফল বা পরিণাম ভোগও নিজেদের।

যুদ্ধে কোন প্রকার বর্বর ও নিষ্ঠুর আচরণ করা যাবে না। বিশেষত শিশু, নারী, বৃদ্ধ-বৃদ্ধা ও আহতদের ক্ষতি করতে বারণ করা হয়েছে। মৃতদেহসমুহকে অসম্মান করতেও বারণ করা হয়েছে। গাছ-পালা, শস্য, পশুপাখির ক্ষতিসাধন না করতে বলা হয়েছে। অর্থাৎ কোন প্রকার বর্বর ও নিষ্ঠুর আচরণ করা যাবে না।

বাইবেলের তাওরাতে ইসরাইলের সন্তানদেরকেও যুদ্ধের ক্ষেত্রে এমন নির্দেশনা দেয়া হয়েছিল। যার কিছু কোরআনেও উদ্ধৃত হয়েছে (দ্রষ্টব্য আল-কোরআন ২:৫৮)। কেবলমাত্র যেখানে প্রয়োজন যুদ্ধের ক্ষেত্রে সেখানেই যোদ্ধা বা সৈন্যবাহিনীকে হিংস্রতা প্রদর্শন ও সাহসী হতে বলা হয়েছে।

সীমালঙ্ঘনকারীদের আল্লাহ পছন্দ করেন না। বিষয়টি আল্লাহ নিজেই প্রকাশ্যে ঘোষনা করে দিয়েছেন। অতএব অতি উৎসাহী হয়ে সীমার বাইরে না যাওয়ার বিষয়ে সতর্ক থাকতে হবে। কেননা তেমন আচরণ উপকারের চেয়ে দীর্ঘমেয়াদী অনেক অপকার সৃষ্টিরও কারণ হয়ে দাড়ায়। যা উপকারের চেয়ে অপকার করে বেশী। তাই আল্লাহ যে সীমা নির্ধারণ করে দিয়েছেন তার

বাইরে গিয়ে কাজ করলে এবং সমস্যার সৃষ্টি হলে তার দায় সীমা লংঘনকারীদেরকেই নিতে হবে।

স্মরণ রাখা বাঞ্ছনীয় যে, শাস্তি ও ক্ষমার বিষয় একচ্ছত্র আল্লাহর বিবেচনার অধীন। অতএব ভূল করলে যেমন শাস্তির ভয় আছে, তেমনি আল্লাহর ইচ্ছে সাপেক্ষে রক্ষা পাওয়ারও উপায় আছে। তথাপি সীমা লঙ্ঘন না করার বিষয়ে সর্বোচ্চ সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে।

▪ **২.১৯১.১** তাদেরকে যেখানে পাও বধ কর এবং বের করে দাও সেখান থেকে যেখান থেকে তারা তোমাদেরকে বের করে দিয়েছে : এখানে তাদেরকে বলতে বিরুদ্ধ শক্তি বা অবিশ্বাসীদেরকে বোঝান হয়েছে। যারা সরাসরি আক্রমনাত্মক ভূমিকা পালন করেছে। তারা বিশ্বাসীদেরকে বলপূর্বক অন্যায়ভাবে পবিত্র উপাসনালয় থেকে বের করে দিয়েছে। এটি তৎকালে যুদ্ধকালীন পরিস্থিতিতে বলা হয়েছে।

প্রথম অন্যায় কাজটি অবিশ্বাসীরা করেছে। বিশ্বাসীরা সেসময় শক্তিতেও দুর্বল ছিল। এ অন্যায়কে মেনে নিলে অন্যায়কারী আরও সাহসী হয়ে উঠবে। অন্যায়কে প্রশ্রয় দেয়া হলে অন্যায় বৃদ্ধিই পেতে থাকবে এবং বিশ্বাসীদেরকে আরও নির্যাতিত হতে হবে। দর্শন বা আদর্শ প্রতিষ্ঠা করা এক সময় অসম্ভব হয়ে পড়বে। অন্যায়ের প্রতিবাদ ও প্রতিরোধ করা তাই কর্তব্যের মধ্যে পরে।

অবিশ্বাসীদেরকে ‘বধ’ করার এ নির্দেশনাটি তেমন সময়ে এসেছিল যখন যুদ্ধাবস্থা বিরাজ করছিল। সর্বদাই একে অন্যকে তাড়া করে ফিরছে। একে অন্যকে পেলে হত্যা করতে উদ্ধত হবে এমন পরিস্থিতি বিরাজ করছিল। মুসলমানরা সে সময় দারুণভাবে নির্যাতিত ছিল। ফলে নিজেদের রক্ষায় পূর্বেই ব্যাবস্থা গ্রহণ করার কথা বলা হয়েছে। নয়ত নিজেকেই জীবন দিতে হবে। একজন মন্দের পরিবর্তে একজন ভালকেই বরং জীবিত থাকতে হবে। এ নির্দেশনাটি কোন স্বাভাবিক বা স্থিতিশীল পরিস্থিতির জন্য প্রযোজ্য নির্দেশনা নয়।

তৎকালীন সাংঘর্ষিক ও যুদ্ধাবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে আয়াতের এসব অংশ অবতীর্ণ হয়েছে। তাই এসবের পেছনের ইতিহাস না জেনে-বুঝে শুধু শাব্দিক অর্থ জেনে কেউ যেন ভূল পথে না যায় সে বিষয়ে মুসলমানদের নিজেদেরকেই

অধিক সতর্ক থাকতে হবে। বর্তমানে সে অবস্থাটি বিরাজমান নেই, যেটি ইসলামের প্রাথমিক প্রচার-প্রসারকালীন সময়ে বিরাজমান ছিল। আবার সামগ্রীক বৈশ্বিক পরিস্থিতি ও ব্যাবস্থাপনাও পূর্বের মতো নেই, সে বিষয়গুলিকেও বিবেচনায় নিয়ে এসব আয়াতের মর্মার্থ অনুধাবন করতে হবে।

বর্তমান সময়ে কি মুসলমান, কি অমুসলিম অনেকেই এসব আয়াতের সমালোচনা করার সুযোগ পায় বা সুযোগ গ্রহণ করে। কেউ বুঝে করে, কেউ না বুঝে অন্যের থেকে শুনে করে। দু'টোই ক্ষতিকর ও বিপজ্জনক। অজ্ঞ যেমন বিপজ্জনক, তেমনি ধূর্তও সমাজের শৃংখলা নষ্টের জন্য বিপজ্জনক। কেউ যেন এসব আয়াতের ভূল ব্যাখ্যা করে সমাজে বিশৃংখলা সৃষ্টি করতে না পারে সে বিষয়ে সকলকেই সতর্ক থাকতে হবে।

আজও যদি কোথাও কোন যুদ্ধাবস্থা বিরাজ করে তবে কি কেউ তার শত্রু পক্ষের বিপক্ষে নিজ বাহিনীকে এমন কঠোর নির্দেশনা দেবে না, তা সে যত মানবিকতাসম্পন্ন দেশ বা জাতিই হোক না কেন? এটিও তেমন একটি সময়ে বলা হয়েছে যখন মুসলমানরা ছিল নির্যাতিত, নিপীড়িত। তাদেরকে আত্মরক্ষার জন্য নানান ব্যাবস্থা নিতে হয়েছে। আবার যোদ্ধাদেরকে নানান দিক-নির্দেশনা দিতে হয়েছে। এসব যোদ্ধাদের অনেকেরই যুদ্ধ বিষয়ে তেমন কোন প্রশিক্ষনও ছিল না। তারা যে অবস্থার মুখোমুখী হয়েছে সে অবস্থার বিপরীতের তাদের করণীয় তাদেরকে বুঝিয়ে দিতে হয়েছে। তাই এমন নির্দেশনা।

বিশেষভাবে উল্লেখ্য যে, পূর্বের আয়াতেই কোরআন মুসলমানদেরকে বিরোধীতার সূত্রপাত ও সীমালংঘন করতে বারণ করে দিয়েছে। অতএব তারা যখন আক্রমনের স্বীকার হবে কেবল সেক্ষেত্রেই তাদের জন্য এ নির্দেশনা প্রযোজ্য হবে নয় তো নয়। এখানেও অন্যায় বা ন্যায় বিচ্যুত কোন নির্দেশনা নেই!

তৎকালীন সময়ে বিরুদ্ধবাদীরা মুসলমানদের সঙ্গে অহরহ মন্দ আচরণ করেছে। তারা ধন-জন, অর্থ-সম্পদ সবদিক থেকে শক্তিশালী হওয়ায় এমন আচরণ করেছে বা করতেও পেরেছে। মুসলমানদেরকে হত্যা করতেও দ্বিধাবোধ করেনি। মহানবীকেও হত্যা করার চেষ্টা করেছে। স্বাভাবতই তাদের প্রতিরোধ করতে হলে পাল্টা ব্যাবস্থা না নেয়ার বিকল্প ছিল না। তাই শত্রুপক্ষ তেমন কোন ঔদ্ধত্য প্রদর্শন করলে তাদেরকেও বধ করার কথা বলা হয়েছে।

এটি বুঝতে হবে যে, যুদ্ধকালীন পরিস্থিতি ও স্বাভাবিক পরিস্থিতি এক নয়। যুদ্ধকালীন পরিস্থিতিতে করণীয় ও স্বাভাবিক পরিস্থিতিতে করণীয়ও এক নয়। যখন যুদ্ধ হবে তখন নিশ্চয়ই এক পক্ষ অপর পক্ষকে বুকে জড়িয়ে ধরবে না। কেউ তেমন নির্দেশনাও দেবে না। দাবী করা বর্তমান উন্নত ও মানবিক সমাজেও আধুনিককালের যুদ্ধের প্রশিক্ষনেও নিশ্চয়ই কেউ শত্রুকে বধ না করার কথা বলবে না। কেননা শত্রুও তো তাকে বধ করতে প্রস্তুত হয়ে আছে। তাছাড়া তেমনটি বলতে হলে সব পক্ষকে দিয়ে কাজটি একসঙ্গে করাতে হবে। এক পক্ষ বধ করবে আর অপর পক্ষ চুপ করে বসে থাকবে, নিশ্চয়ই তেমন নির্দেশনা আধুনিক মানবিক সমাজেও কেউ নিজের পক্ষশক্তিকে দেবে না।

ওপরে বধ করার যে বিবৃতিটি রয়েছে সেটি তেমন সময় ও মুহূর্তগুলিকে বিবেচনা করে বলা হয়েছে। এর অর্থ এই নয় যে সবসময়ই বা শান্তিপূর্ণ বা একটি স্থিতিশীল পরিস্থিতিতেও যেখানেই অবিশ্বাসীদেরকে পাওয়া যাবে তাদেরকে ধরে ধরে বধ করতে হবে। কেননা কোরআনের নির্দেশনা তো শাশ্বত ও সার্বজনীন(!)।

অতএব বুঝতে হবে যে, পরিবেশ পরিস্থিতিকে বিবেচনায় নিয়ে নিজেদের জ্ঞান ও প্রজ্ঞাকে কাজে লাগিয়ে সে আঙ্গিকে সবকিছু বিবেচনা করতে হবে। এটিও প্রচ্ছন্নে কোরআনের একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক-নির্দেশনা। তা ছাড়া 'অবিশ্বাসী' কে বা কারা সে বিষয়টিও সত্যের আলোকে বা যথাযথ জ্ঞানে বুঝতে হবে [বিশ্বাসী-অবিশ্বাসী দ্রষ্টব্য ২.৬]। কিছু মানুষ শান্তিপূর্ণ পরিস্থিতিতেও উত্তেজনা সৃষ্টি করার পাঁয়তারা করে। তারা ভূল করে। কিংবা তারা কোন স্বার্থকে জিয়িয়ে রাখার জন্য তেমনটি করে।

এখানে লক্ষনীয় বিষয় এই যে, এতদ্বসত্বেও কোরআনের নির্দেশনা হচ্ছে বিরোধীতার সূত্রপাত না করা এবং সীমালংঘন না করা। এটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশনা। মাঠ পর্যায়ে যারা এ নির্দেশনার বাস্তবায়নের দায়িত্বে নিয়োজিত থাকবে তাদের বিচার-বুদ্ধি-বিবেচনা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার সক্ষমতার বিষয়টিও এক্ষেত্রে সমগুরুত্বসম্পন্ন।

■ **২.১৯১.২** বস্তুত বিশৃংখলা বা দাঙ্গা-হাঙ্গামা (ফিতনা) সৃষ্টি করা হত্যার চেয়েও কঠিন অপরাধ : হত্যা করা অপরাধ। কিন্তু তার পেছনে কারণ থাকে। অনেক কারণের এক কারণ হচ্ছে অত্যাচার-নির্যাতন করা। হত্যাজনিত পরিস্থিতি সৃষ্টির কারণ সেটি। অর্থাৎ বীজ। বীজকে উপরে ফেলতে হবে। নচেৎ সে অপকর্ম অশান্তির জন্ম দিয়েই যেতে থাকবে।

নির্যাতন, বিশৃংখলা সৃষ্টি করাকে তাই হত্যার চেয়েও কঠিন অপরাধ বলা হয়েছে। কেননা একটি হত্যা মানে- একটি হত্যা। কিন্তু অত্যাচার-অনাচার-নির্যাতন বা সামাজিক বিশৃংখলা সৃষ্টি করা অনেক হত্যাকান্ড সৃষ্টির কারণ। ফলে যারা এসবের মাধ্যমে পৃথিবীতে অশান্তি সৃষ্টি করে তাদের বেঁচে থাকার অধিকার কতটুকু? তথাপি এ আয়াত একটি যুদ্ধাবস্থার প্রেক্ষিতে অবতীর্ণ হয়েছে। এটি তাদের জন্য প্রযোজ্য যারা উস্কানি দিয়ে একটি খারাপ পরিস্থিতি সৃষ্টির জন্য দায়ী (দ্রষ্টব্য ২.২১৭.২)।

কোরআনের এসব নির্দেশনা মানবজাতির সকলের জন্য দিক-নির্দেশনা। কোরআন ন্যায়ের পক্ষে কথা বলে। ইসলামের আবির্ভাবকালে অন্যায়কারী বা নির্যাতনকারীরা মুসলমানদের ওপর ভীষনভাবে অন্যায়-অত্যাচার ও নির্যাতন করেছে। এটি এ কারণে যে, বিশ্বাসীরা সত্য ও ন্যায়ের পক্ষে কথা বলেছে, সামাজিক সংস্কারের কথা বলেছে, চিন্তা ও ধারণাগত সংস্কারের কথা বলেছে, কোরআন প্রদত্ত বার্তা মানবসমাজে প্রচার করেছে। অথচ নির্যাতনকারীরা মিথ্যে রটনা, ভয়-ভীতি প্রদর্শন, হাঙ্গামার সৃষ্টি করে তাদেরকে স্তব্ধ করে দেয়ার চেষ্টা করেছে। এগুলি একটি হত্যার চেয়েও কঠিন অপরাধ। সমাজে অনেক হত্যাযজ্ঞ সৃষ্টির কারণ।

মানুষের কথা বলার অধিকার হরণ করা বড় অন্যায়। মানুষ কথা বলতে না পারলে, নতুন ধারণার আবির্ভাব না ঘটলে পৃথিবী আজ এ পর্যায়ে আসতে পারত না। কিন্তু যারা নতুন ধারণার বিরোধীতাকারী বা অন্য কথায় যারা মানুষকে কথা বলতে দিতে চায় না বা স্তব্ধ করে দিতে চায় তারা অত্যাচারী, অন্যায়কারী। তারা কেবল তাদের বর্তমান ও বিদ্যমান স্বার্থ ও অহমিকাকেই বিবেচনা করে। তারা মানবজাতির ভবিষ্যত কল্যাণের কথা ভাবে না।

মানুষ শুরুতেই বা অকারণেই কেউ কাউকে হত্যা করে না। তার পূর্বে কিছু ঘটনা থাকে। সে ঘটনা ধীরে ধীরে মন্দ বা ভয়াবহ পরিস্থিতির দিকে

মোড় নেয়। নিন্দা রটনা করা, নির্যাতন করা, প্রাথমিক দাঙ্গা-হাঙ্গামা সৃষ্টি করার মধ্য দিয়েই এটি বড় রূপ ধারণ করে। যেটি এক পর্যায়ে কেবলমাত্র একটি হত্যাকান্ডের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে না। হাজার হাজার প্রাণ নাশের কারণ হয়ে দাড়ায়।

ফিতনা সৃষ্টি করা একটি কঠিন অপরাধ যা বহু হত্যাকান্ডের কারণ। তাই বলা হয়েছে দাঙ্গা-হাঙ্গামা সৃষ্টি করা হত্যার চেয়েও কঠিন অপরাধ। ফলে যারা অত্যাচার-নির্যাতন করে এবং এর মাধ্যমে কোন নতুন ধারণার বা সমাজ সংস্কারের কাজকে অঙ্কুরেই স্তব্ধ করে দিতে চায়, পৃথিবীর অগ্রগতির পথে বাধা হয়ে দাঁড়ায়, কেবলমাত্র নিজেদের পার্থিব হীন স্বার্থ রক্ষার কারণে যারা বৃহত্তর মানব কল্যাণের কথা বিবেচনা করে না, তাদের বিপক্ষে জেহাদ, সংগ্রাম বা যুদ্ধ করা ন্যায় ও যুক্তিসম্মত। এখানে সে যৌক্তিকতা তুলে ধরা হয়েছে।

▪ **২.১৯১.৩** তাদের সঙ্গে লড়াই কর না উপাসনার পবিত্রতম স্থানে যতক্ষণ না তারা তোমাদের সঙ্গে সেখানে লড়াই করে। যদি তারা তোমাদেরকে আক্রমন করে তবেই তাদেরকে বধ কর : উপাসনার পবিত্রতম স্থানে অর্থাৎ মসজিদুল হারাম ও তার আশেপাশে সংঘর্ষে লিপ্ত হতে বারণ করা হয়েছে। কিন্তু শত্রুপক্ষ যদি সেখানেও আক্রমন করে তবেই তাদের সাথে লড়াই করতে ও শত্রুকে ‘বধ’ করতে বলা হয়েছে।

‘বধ’ করা বিষয়ে আয়াতের শেষাংশ প্রণিধানযোগ্য। কোনভাবেই কোরআন অপরাধ সংঘটনকে প্রশ্রয় দেয়নি এবং ভূল করা থেকে বিরত থাকতে বরাবর বিশ্বাসীদেরকে সতর্ক করেছে। শত্রুপক্ষ যদি আক্রমন করে তবে সেক্ষেত্রেই তাদেরকে কঠিন শাস্তি দিতে দ্বিধাবোধ করতেও বারণ করা হয়েছে। অর্থাৎ তারা যেমন আচরণ প্রদর্শন করবে সেভাবেই তাদেরকে মোকাবেলা করতে হবে। কেবল তেমন ক্ষেত্রেই শত্রুপক্ষকে ‘বধ’ করার কথা বলা হয়েছে। কোরআন সব সময়ই সীমালংঘন করতে বারণ করেছে। কোরআনের নির্দেশনা ক্রটিহীন।

যুদ্ধ পরিস্থিতিতেও কোরআন ন্যায়সম্মত নির্দেশনা জারী করেছে। যারা সৎ অন্তর নিয়ে সঠিকভাবে বুঝে কোরআন অধ্যায়ন করবে তারা এর প্রতিটি নির্দেশনার নিখুঁততা বুঝতে পেরে অভিভূত হবে। এখানে কোন প্রকার

প্রতিশোধপরায়নতার স্থান নেই। কেবল যতটুকু প্রয়োজনীয় ততটুকু করতে বলা হয়েছে।

▪ **২.১৯১.৪** এটিই অবিশ্বাসীদের পুরস্কার : অবিশ্বাসীরা যেমন আচরণ প্রদর্শন করবে সেভাবেই তাদেরকে মোকাবেলা করতে হবে। তারা আক্রমনাত্মক ভূমিকা নিলে তাদের মোকাবেলায় প্রয়োজনে তাদেরকে বধ করার কথা বলা হয়েছে। বলা হচ্ছে এটিই তাদের পুরস্কার। অর্থাৎ যেমন কর্ম তেমন ফল।

'এটিই অবিশ্বাসীদের পুরস্কার' বস্তুত এটি পুরস্কার নয় শাস্তি। কিন্তু অবিশ্বাসীদেরকে উদ্দেশ্য করে তীর্যকভাবে কথাটি বলা হয়েছে। কোরআনে এমনি তীর্যকভাবে আরও কথা বলা হয়েছে। তাই কোরআনে উদ্ধৃত কোন শব্দের কেবল অর্থ নয় মর্মার্থও বুঝতে হবে।

এখানে অবিশ্বাসী বলতে যারা ন্যায়ের বিরুদ্ধে অবস্থান গ্রহণ করেছে তাদেরকে বোঝান হয়েছে। ন্যায়ের পক্ষ অবলম্বনকারীকে কি অবিশ্বাসী বলা সম্ভব? স্বয়ং আল্লাহই তো সত্য ও ন্যায়ের মূর্ত প্রতীক!!

অতএব বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য যে, কেবল তারাই অবিশ্বাসী নয় যারা বিশ্বাসী হওয়ার বিভিন্ন শর্তগুলিতে বিশ্বাস করে না [বিশ্বাসী-অবিশ্বাসী দ্রষ্টব্য ২.৬]। কেননা সেক্ষেত্রে প্রথমেই প্রশ্ন আসবে যে বিশ্বাসী হওয়ার বিবিধ শর্তাবলীতে কেন মানুষকে বিশ্বাস করতে হবে? এর একটি যথোপযুক্ত কারণ, লক্ষ্য বা উদ্দেশ্য থাকতে হবে।

বিশ্বাসী হওয়ার শর্তাবলীতে মানুষকে এজন্যই বিশ্বাস করতে হয় যেন মানুষ সুপথে চলে। মন্দ পথ পরিহার করে চলে। অন্যায় কাজে লিপ্ত না হয় এবং ন্যায়ের পথে চলে- এগুলিই লক্ষ্য।

অতএব যারা তা করে না মূলত তারাই অবিশ্বাসী। আর সেজন্যই কোরআনের বিভিন্নস্থানে সত্যের পক্ষে অবস্থানকারী, ন্যায়ের পথ অবলম্বনকারী অথচ যারা মুসলমানদের মতো হুবহু ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান পালন করে না, তাদেরও ভয়ের কোন কারণ নেই বলে আশ্বস্ত করা হয়েছে। যেমন বলা হয়েছে,

"যে কেউ নিজেকে আল্লাহর কাছে সমর্পন করে এবং ভাল কাজ করে, তার পুরস্কার রয়েছে তার পালনকর্তার কাছে; তাদের অন্তরে না কোন ভীতির

সঞ্চার হবে, না তারা নিপতিত হবে কোনরূপ মনকষ্টে।" (আল-কোরআন ২:১১২)

আরও বলা হয়েছে, "যেদিন তোমার পালনকর্তার পক্ষ থেকে কোন নিদর্শন আসবে, সেদিন তেমন কোন ব্যাক্তির বিশ্বাস স্থাপন তার জন্য ফলপ্রসূ হবে না, যে পূর্ব থেকে বিশ্বাস স্থাপন করেনি কিংবা 'স্বীয় বিশ্বাস অনুযায়ী' কোনরূপ ভাল কাজ করেনি।" (আল-কোরআন ৬:১৫৮)

আল্লাহর কৃপা দৃষ্টিতে থাকতে হলে তাই 'স্বীয় বিশ্বাস অনুযায়ী' হলেও ভাল কাজ করতে হবে। মন্দ কাজ পরিহার করতে হবে। অর্থাৎ সত্য ও ন্যায়ের পথে চলতে ও থাকতে হবে। তবেই সে আল্লাহতে সমর্পিত বলে বিবেচিত হবে তা সে যে বিশ্বাসেই থাকুক না কেন?

বস্তুত কোরআনে একটি আদর্শ দর্শন বা রূপরেখা উপস্থাপন করা হয়েছে যার লক্ষ্য ভাল কিছু অর্জন করা। লক্ষ্য যদি অর্জিত হয় পথটি তবে কোন সমস্যা নয়। তথাপিও সব বিষয় আল্লাহ ভাল জানেন। তিনি যাকে ইচ্ছে শাস্তি দেবেন, যাকে ইচ্ছে ক্ষমা করবেন! সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী!

▪ **২.১৯২** যদি তারা বিরত থাকে তবে আল্লাহ ক্ষমাশীল, দয়ালু : মুসলমান বা বিশ্বাসীদের বা ন্যায়ের পক্ষ শক্তিকে বিরোধীতার সূত্রপাত করতে বারণ করা হয়েছে। সীমালংঘন করতে বারণ করা হয়েছে। 'মুসলমান' বা বিশ্বাসীদেরকে কেন বারবার 'ন্যায়ের পক্ষশক্তি' এভাবে পৃথক করে উল্লেখ করা হচ্ছে?

যে সময়ে কোরআনের বাণী অবতীর্ণ হয়েছে কিংবা আদর্শগতভাবেও মুসলিম বলতেই সত্য ও ন্যায়ের পক্ষ শক্তি, ভূল ও অন্যায়ের বিপক্ষ শক্তি, সামাজিক কুসংস্কারের বিরুদ্ধ শক্তি তাত্বিকভাবে এভাবে ধরে নেয়া হয়েছে এবং অবিশ্বাসী বা আরবীতে 'কাফের' বলতে এর বিপরীত অবস্থানে অবস্থানকারীদেরকে বোঝান হয়েছে।

বর্তমান সময়ে চিত্রটি বিচিত্র ও ভিন্ন। সমাজে প্রচলিত অর্থে যারা অবিশ্বাসী বা 'কাফের' তাদের মধ্যে ন্যায়পরায়ন অসংখ্য মানুষ আছে। যারা অন্যায়-অত্যাচার করে না। অপরের মতামত প্রকাশের পথে বাধা হয়ে দাঁড়ায় না। এরা বোধসম্পন্ন এবং যে কোন প্রকারেই হোক না কেন আল্লাহতে সমর্পিত।

আল্লাহতে সমর্পনই মূল মানব ধর্ম। আচার-বিধি, রীতি-নীতি ধর্মের মূল বিষয় নয় তবে বাস্তবতার কারণে প্রয়োজনীয়।

সমাজে প্রচলিত অর্থে যারা বিশ্বাসী তাদের মধ্যেও অনেক অন্যায়কারী, অসত্য পথ অবলম্বনকারী, ভূল ও কুসংস্কারে নিমজ্জিত মানুষ আছে। আছে খুনি, চোর-বাটপার, ঘুষখোর, দূর্নীতিবাজ ইত্যাদি। চিন্তা-চেতনায় অনেকের মাঝে পশ্চাৎপদতা ও মূর্খতাও আছে। কিন্তু বিশ্বাসী-অবিশ্বাসী শব্দগুলি উচ্চারিত হলে আমরা সাধারণত সমাজে প্রচলিত সঙ্গায় বিশ্বাসী-অবিশ্বাসী বুঝে থাকি [বিশ্বাসী-অবিশ্বাসী দ্রষ্টব্য ২.৬]। কিন্তু বাস্তব চিত্র ভিন্ন হওয়া অস্বাভাবিক নয়।

অবিশ্বাসীদের মধ্যেও সত্য ও ন্যায়পরায়ন মানুষ আছে। আবার মুসলমান-মুসলমানও বর্তমানে যুদ্ধে লিপ্ত হচ্ছে। ফলে কাকে মুসলিম বা ন্যায়ের পক্ষ শক্তি বলে পরিচয় দেওয়া হবে? তাই সবক্ষেত্রেই বিচার-বিবেচনা সাপেক্ষে যারা ন্যায়ের পক্ষে অবস্থানকারী তাদেরকেই বিশ্বাসীরূপে এ লেখায় ধরে নেয়া হয়েছে। অবিশ্বাসী বলতে যারা ন্যায়ের বিরুদ্ধে অবস্থান করেছে তাদেরকে বোঝান হয়েছে। ন্যায়ের পক্ষ অবলম্বনকারীকে কিভাবে অবিশ্বাসী বলা সম্ভব? 'ন্যায়ে'র কষ্টিপাথর দিয়ে যাচাই করা সাপেক্ষে বর্তমানে বিশ্বাসী-অবিশ্বাসীর সঙ্গা নির্ধারিত হতে হবে। বলা হচ্ছে,

"যদি বিশ্বাসীদের অর্থৎ মুসলমানদের দুই দল যুদ্ধে/দ্বন্দ্বে লিপ্ত হয়, তবে তাদের মধ্যে মীমাংসা করে দেবে/শান্তি প্রতিষ্ঠা করবে। অতঃপর যদি তাদের একদল অপর দলের ওপর অন্যায় আচরণ করে, তবে তোমরা আক্রমনকারী দলের বিরুদ্ধে অবস্থান গ্রহণ করবে যে পর্যন্ত না তারা আল্লাহর নির্দেশের মধ্যে ফিরে আসে। অতঃপর যদি তারা ফিরে আসে তবে তাদের মধ্যে ন্যায়ানুগ পন্থায় মীমাংসা করে দেবে এবং সমতার ভিত্তিতে কাজ করবে। নিশ্চয়ই! আল্লাহ ন্যায়পরায়ণদের ভালবাসেন।" (আর-কোরআন ৪৯:৯)

বিশ্বাসী ও বিশ্বাসীর মধ্যকার দ্বন্দ্ব মেটাবার ক্ষেত্রে যেমন ন্যায়ের বিবেচনাটি মুখ্য, ঠিক তেমনি বিশ্বাসী ও অবিশ্বাসীর মধ্যকার দ্বন্দ্বের ক্ষেত্রেও ন্যায়টিই মুখ্য। বস্তুত সকল বিবেচনা নির্বিশেষে মানবজাতির সকল দ্বন্দ্ব-সংঘাত নিবারণে ন্যায়টিই আসল। কেবল একটি লেবাস ধারণ করার কারণে,

কিংবা মুখে স্বীকার করার কারণেই একজন অন্যায়কারী কোন বিচারেই আল্লাহর পক্ষশক্তি হতে পারে না। তাই ন্যায়ের কষ্টিপাথর দিয়ে যাচাই করেই বর্তমান সময়ে বিশ্বাসী-অবিশ্বাসীর সঙ্গা নির্ধারিত হতে হবে।

আলোচ্য আয়াতে বলা হচ্ছে যে, এমনকি যদি অবিশ্বাসীরাও আক্রমন করা থেকে বিরত থাকে, অর্থাৎ অবিশ্বাসীও যদি ভূল আচরণ বা অন্যায় করা থেকে বিরত থাকে তবে সেক্ষেত্রেও আল্লাহ ক্ষমাশীল, দয়ালু। অর্থাৎ অন্যায় না করলে আল্লাহ অবিশ্বাসীদের প্রতিও ক্ষমাশীল। তিনি তাদের ক্ষমা করতে পারেন। বিবেচনা একান্তই আল্লাহর। তথাপি এটিও একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক-নির্দেশনা। মানবজাতিকে গভীরভাবে বিষয়গুলি অনুধাবন করে ইসলামের দর্শনকে বুঝতে হবে।

মুসলিম বা ন্যায়ের পক্ষ শক্তি বলে যারা নিজেদেরকে দাবী করে বা করবে, তারাও যেন অবিশ্বাসীদের সাথে কোনরুপ অন্যায় আচরণ না করে প্রচ্ছন্নে সেটিও এখানে বলে দেয়া হয়েছে। কেননা বিশ্বাসী-অবিশ্বাসী বিষয়টি আল্লাহর কাছেও ন্যায়-অন্যায়, ভাল-মন্দ কর্ম দ্বারাই সত্যিকার অর্থে বিবেচিত হয়ে থাকে। অতএব অবিশ্বাসীরা যদি বিশ্বাসীদের কাজে বাধা না দেয়, কিংবা সংঘর্ষে লিপ্ত না হয়, অন্যায় বা ভূল কাজ করা থেকে বিরত থাকে তবে বিশ্বাসীদেরকেও তেমনই নির্দেশনা দেয়া হয়েছে। বলা হচ্ছে,

“হে বিশ্বাসীগণ! তোমরা যখন আল্লাহর পথে লড়াইয়ে বের হও, সতর্ক থেক বৈষম্য প্রদর্শন না করার বিষয়ে এবং যে তোমাদেরকে শান্তির প্রস্তাব দেয় তাকে বল না ‘তুমি বিশ্বাসী নও’ এবং এর মাধ্যমে পার্থিব জীবনের প্রাপ্তির কোন সুযোগ নিও না। ... কোনরুপ বৈষম্য প্রদর্শনের ক্ষেত্রে সতর্ক থেক। তোমরা যা কর সে বিষয়ে আল্লাহ সদা সর্বদা অবহিত।” (আল-কোরআন ৪:৯৪)

অতএব শত্রুপক্ষ বা অবিশ্বাসীও যদি অন্যায় কাজ না করে তবে কোনরুপ চতুরতার আশ্রয় নিয়েও ভূল বা অন্যায় কাজ করা থেকে বিরত থাকতে দিক-নির্দেশনা দেয়া হয়েছে। অবিশ্বাসী যদি অন্যায় কাজ না করে তবে বলা হচ্ছে আল্লাহ তাদের প্রতিও ক্ষমাশীল, দয়ালু। ভাল-মন্দ, ন্যায়-অন্যায় কর্মই প্রকৃত বিবেচ্য। এমনই কোরআনের দিক-নির্দেশনা।

■ **২.১৯৩.১** এবং লড়াই কর যে পর্যন্ত না 'ফিতনা'র (বিশৃংখলার) অবসান হয় এবং আল্লাহর 'দ্বীন' তথা ধর্ম বা চলার যথাযথ/সঠিক পথ প্রতিষ্ঠা পায় : এটি এমন একটি বিবৃতি যা সর্বকালের জন্য প্রযোজ্য। সার্বজনীন ও শাশ্বত। দেহে যতক্ষণ ভাইরাসের উৎপাত থাকে ততক্ষণই ঔষধ চালিয়ে যেতে হয়। নয়ত রোগ বৃদ্ধি পাওয়ার আশংকা থাকে। এমনকি মৃত্যু পর্যন্ত হতে পারে।

সমাজে ভূল ও অন্যায় আচরণ, অত্যাচার-নির্যাতন কিংবা বিশৃংখলা ইত্যাদি যদি চলতে থাকে অর্থাৎ মানুষ সঠিক পথে না চলে, তবে এ অনাসৃষ্টি নির্মূল না হওয়া পর্যন্ত সত্য পথ অবলম্বনকারী তথা বিশ্বাসীদের লড়াই চলতেই থাকবে। নয়ত জগৎ-সংসার ধ্বংসের দ্বার প্রান্তে উপনীত হবে। ন্যায়পরায়ন মানুষকে তাই এ লড়াই চালিয়ে যেতে হবে ততক্ষণ, যতক্ষণ না চলার যথাযথ পথ তথা আল্লাহর মনোনীত 'দ্বীন' প্রতিষ্ঠা পায়। এটি আল্লাহতে সমর্পিত মানুষদের গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব ও কর্তব্যের মধ্যে পরে।

বিষয়টি এমন নয় যে সুনির্দিষ্ট কোন দল বা গোষ্ঠী বা ব্যাক্তি দ্বারা কাজটি করতে হবে। অর্থাৎ সুনির্দিষ্ট কোন ঔষধ কোম্পানীর ঔষধ সেবন করেই ভাইরাস তাড়াতে হবে বিষয়টি তেমন নয়। বস্তুত যারাই অন্যায়-অত্যাচার-বিশৃংখলা প্রতিরোধে কাজ করবে তারাই আল্লাহর পক্ষ শক্তি। তারাই বিশ্বাসী বা আল্লাহর নির্দেশ পালনকারী বা বাস্তবায়নকারী। তারাই আল্লাহতে সমর্পনকারী। বর্তমান সময়ে সমাজ, বৃহত্তর মানব গোষ্ঠী ও জাগতিক শান্তির স্বার্থে বিষয়গুলিকে এভাবে উপলব্ধি করা অত্যান্ত জরুরী।

এ জগতে আল্লাহর কারও পক্ষ নেবার প্রয়োজন নেই। সকলেই তাঁর সৃষ্টি। বলা হচ্ছে, 'ধনী হোক কিংবা দরিদ্র হোক আল্লাহ উভয়ের জন্যই নিকটতম (দ্রষ্টব্য ৪:১৩৫)।' তিনি এককে দিয়ে অপরকে পরীক্ষা করেন এবং প্রয়োজনীয় কাজটি করিয়ে নেন। যারা তাঁর নির্দেশ পালন করে তারাই তার কাছে গ্রহণযোগ্য। তারাই তাঁর পক্ষশক্তি।

অতএব যতক্ষণ অন্যায়-অসত্য নির্মূল না হয় অর্থাৎ আল্লাহর নির্দেশনার লক্ষ্য অর্জন না হয়, ততক্ষণ এ লড়াই চালিয়ে যেতে হবে তাঁর পক্ষ শক্তিকে। এটি একটি শাশ্বত ও সার্বজনীন বাণী। জগতের যে কোন মানুষ এ নির্দেশনার আওতাভূক্ত হতে পারে সত্য ও ন্যায়ের পথ অবলম্বন সাপেক্ষে।

তথাপি এ বাণী তৎকালীন সামাজিক অবস্থার প্রেক্ষিত বিবেচনায় বিশ্বাসীদেরকে উদ্দেশ্য করে অবতীর্ণ হয়েছে। কেননা বিশ্বাসীরা সে সময়ে সরাসরি মহানবী (সাঃ) এর তত্ত্বাবধানে থেকে সমাজ সংস্কার ও ধারণাগত সংস্কারের কাজে নিয়োজিত ছিল এবং সকল প্রকার অন্যায় ও দুরাচারের বিপক্ষ অবস্থানে ছিল। তারাই ছিল আল্লাহর পক্ষ শক্তি। এ বিষয়ে বিতর্কের অবকাশ নেই। মহানবী (সাঃ) এর অনুপস্থিতিতে বর্তমান সময়ে অবস্থাটি তেমন নয়।

‘লড়াই কর যে পর্যন্ত না ... আল্লাহর ‘দ্বীন’ প্রতিষ্ঠা পায়’। ‘দ্বীন’ হচ্ছে চলার সঠিক বা একেবারে যথার্থ পথ। পদার্থ বিজ্ঞানের সূত্রের মতো। সূত্র সুনিশ্চিতভাবে সুনির্দিষ্ট কাজটি যথাযথভাবে সম্পন্ন করবেই।

মানবজাতির ক্ষেত্রে চলার সে যথাযথ পথটি হচ্ছে আল্লাহতে ‘সমর্পন’। এটিকেই কারও পরিভাষায় ইসলাম বলা হয়। কারও পরিভাষায় সেটি চিরন্তন সত্য বা সনাতন ধর্ম। যেমন এক আল্লাহকেই বিভিন্ন মানুষ বিভিন্ন নামে ডাকে। সমর্পনই মানুষের জন্য নির্ধারিত একমাত্র ও যথার্থ পথ, ধর্ম বা ‘দ্বীন’। যা সার্বজনীন ও শাশ্বত! এটি হিন্দুর জন্য প্রযোজ্য, এটি মুসলমানের জন্য প্রযোজ্য, এটি বৌদ্ধের জন্য প্রযোজ্য, এটি খ্রীষ্টান, ইহুদি সকলের জন্য প্রযোজ্য। তাই বলা হয়েছে,

“আল্লাহর কাছে নিজেকে সমর্পন ব্যাতিত যে ধর্মের সন্ধান করে তা গৃহীত হবে না এবং পরকালে সে ক্ষতিগ্রস্তদের একজন হবে।” (আল-কোরআন ৩:৮৫)

“হে বিশ্বাসীগণ! ... মৃত্যুবরণ কর না নিজেকে আল্লাহর প্রতি সমর্পন না করে।” (আল-কোরআন ৩:১০২)

“নানরূপ ধর্ম পরিত্যাগ কর এবং কেবলমাত্র আমার প্রতি নিজেকে সমর্পন কর। আমি তোমাকে সকল পাপ থেকে মুক্ত করে দেব।” (গীতা ১৮:৬৬)

বস্তুত মানুষের ধর্ম একটিই। মানব জাতি এক জাতি। তাই বলা হয়েছে,

“নিশ্চয়ই! তোমাদের এই জাতি/ধর্ম এক জাতি (মানবজাতি)/এক ধর্ম (ইসলাম/সমর্পন) ... কিন্তু মানুষ তাদের ধর্মকে নিজেদের মধ্যে বহুধা বিভক্ত করেছে। প্রত্যেক সম্প্রদায় নিজ নিজ মতবাদ নিয়ে উল্লসিত। অতএব তাদেরকে

তাদের অজ্ঞতায় নিমজ্জিত থাকতে দাও কিছুকালের জন্য।” (আল-কোরআন ২৩:৫২-৫৪)

‘সমর্পন’ই হচ্ছে আল্লাহর মনোনীত একমাত্র ‘দ্বীন’ বা চলার পথ। সবচাইতে সহজ-সরল পথ। ‘শান্তির পথ’। আল্লাহতে সমর্পনেই ‘শান্তি’। কিন্তু সত্য হচ্ছে যে সমর্পন বিষয়টি বোঝাও খুব সহজ নয় [সমর্পন দ্রষ্টব্য ১.৫]।

আল্লাহর দ্বীন বা সমর্পন বিষয়টির যথার্থ অনুধাবন কেবল মুসলিমদের জন্যই নয়, জগতের সকল মানুষের জন্য সমভাবে প্রযোজ্য ও গুরুত্বপূর্ণ। কেননা আল্লাহর পথ হচ্ছে সে পথ, যে পথ সকল প্রকার অত্যাচার-অনাচার ও দুরাচারকে সমাজ থেকে দুরীভূত করতে বলে। আল্লাহর কাছে সমর্পনের কথা বলে। কিন্তু সমর্পনের সে পথও জটিল হয়েছে মানুষ আরোপিত নানাবিধ জটিল থেকে জটিলতর বিধি-বিধান ও ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ আরোপের কারণে। যার অনেক কিছুই ‘এক অর্থে অপ্রয়োজনীয়’ আবার ‘আরেক অর্থে প্রয়োজনীয়’। যদিও এ কথাটি বলাও এক অর্থে সঠিক, কিন্তু আরেক অর্থে সঠিক নয়। তবুও সময় এসেছে কথাটি বলার।

বস্তুত মানুষের নিজেকেই জ্ঞান, বিচার-বিবেচনা ও সাধনার দ্বারা সত্যকে চিনতে ও জানতে হবে। তাই গীতায় এভাবে বলা হয়েছে,

“.. কেবল বেদ তথা কোন শাস্ত্র গ্রন্থ পাঠ করেই বোঝা বা ধারণা করা সম্ভব নয়; না কোন কঠিন ব্রত পালন করে, না দান করে, না উপাসনা করে; এগুলি সে উপায় নয় যা দ্বারা আমি যা তা একজন দেখতে পাবে।” (গীতা ১১:৫৩)

বস্তুত ঈশ্বর বলি, ভগবান বলি, গড বলি, আল্লাহ বলি তাঁকে পাওয়ার সুনির্দিষ্ট ও যথাযথ কোন উপায় কেউ জানে না। জগতের লক্ষ-কোটি মানুষের ভীড়ে কিছু সংখ্যক হয়তবা উদ্ধৃত উপায়সমূহ অবলম্বন করে তাঁকে পাওয়ার চেষ্টা-সাধনা করতে পারে, কিন্তু সে সকল সাধকদেরও সবাই সফল হতে পারে না। এগুলি কোরআন-গীতার কথা তাই সত্য বিষয়টি তেমন নয়। বস্তুত কথাগুলি সত্য তাই কোরআন-গীতায় স্থান পেয়েছে। যেমন গীতায় বলা হয়েছে,

"হাজার হাজার মানুষের মধ্যে কোন একজন উৎকর্ষ সাধনের জন্য চেষ্টা করে এবং যারা উৎকর্ষ সাধন করে, সত্যি বলতে তাদের মধ্যে কদাচিৎ একজন সত্যিকারভাবে আমাকে জানে, আমার স্বরূপ বুঝতে পারে।" (গীতা ৭:৩)

উদ্ধৃতিগুলি এজন্য তুলে ধরা হল যে, যারা অন্যের ওপর নির্ভর করে সত্যকে জানা বা বোঝার চেষ্টা করবে তারা বস্তুত চরম সত্যকে খুঁজে পাবে না বা বুঝতে সক্ষম হবে না। তবে ব্যাকরণ অনুসরণ করে কিছুটা ভাল থাকতে পারবে। আশংকা থেকে মুক্ত থাকতে পারবে যদি মন্দ কাজ না করে। সে অর্থেই ওপরে এভাবে ব্যাক্ত করা হয়েছে যে, 'আরেক অর্থে প্রয়োজনীয়'। বস্তুত মানুষের নিজেকেই তার জ্ঞান, বিচার-বিবেচনা ও সাধনার দ্বারা বিষয়গুলির মর্মার্থ বা সত্যকে চিনতে, জানতে ও বুঝতে হবে। 'দ্বীন' কি, সমর্পন কি, কিভাবে সমর্পিত হতে হবে উত্তরের সন্ধান করতে হবে।

আলোচ্য আয়াতে বলা হয়েছে 'লড়াই কর যে পর্যন্ত না ফিতনার অবসান হয়'। 'ফিতনা' কি? এর উৎপত্তির উৎস কোথায়?

সমাজের এমন এক দুরাবস্থা যেখানে মানুষের ওপর মানুষের শৃংখল বা কর্তৃত্ব বিদ্যমান এবং জ্ঞান ও বোধসম্পন্ন এমনকি সহজ-সরল মানুষও যেখানে নিজের বোধে চলতে বাধাপ্রাপ্ত হয় বা অপারগ হয়ে যায়- তেমন পরিস্থিতিই 'ফিতনা'। বলপূর্বক এমন পরিস্থিতির সৃষ্টিকারীদের কারণেই সমাজ অশান্ত হয়। সমাজে বিশৃংখলা দেখা দেয়। অর্থাৎ যেখানে আল্লাহর সার্বভৌমত্বের স্বীকৃতি নেই তথা 'আল্লাহর বিধান' প্রতিষ্ঠিত নয় সেখানেই ফিতনার সৃষ্টি হয়। অথচ আল্লাহ প্রতিটি মানুষকেই সৃষ্টি করেছেন মুক্ত পরিবেশে বেঁচে থাকার মতো করে। অথচ ফিতনার জগতে সমর্পিত হতে হয় আল্লাহর পরিবর্তে ক্ষমতাশালী কিছু মানুষ তথা অত্যাচারী মানুষের কাছে। এখান থেকেই 'ফিতনা'র উৎপত্তি। তাই সকল ধর্মেই যেমন আল্লাহতে সমর্পনের কথা বলা হয়েছে, তেমনি আল্লাহর সার্বভৌমত্বের স্বীকৃতির প্রয়োজনীয়তার কথাও বলা হয়েছে।

'আল্লাহর বিধান' শব্দটিকেও যথাযথ অর্থে বুঝতে হবে। কেননা এর ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ নিয়েও জবরদস্তী হওয়ার বা করার সম্ভাবনা আছে। বস্তুত সব স্বাভাবিক নিয়মে চলতে দিতে হবে। সবকিছুকে তার পরিণতির দিকে আপন

মনে যেতে দিতে হবে। বিচার-বিবেচনা আল্লাহর হাতে। এঁকেবেঁকে পানি বা নদী যেমন তার সুবিধামতো গন্তব্যের দিকে ছুটে চলে তেমন। মানব জীবনও তার পছন্দমতো চলতে পারবে। নিয়মের বেড়াজালে ফেলা যাবে না। কোথাও জোর-জবরদস্তী করা যাবে না। এটাই প্রকৃত স্বাধীনতা। আল্লাহতে সকলের সমর্পনই প্রকৃত স্বাধীনতা দান করে।

ব্যাক্তিক পর্যায়ে আল্লাহতে সমর্পন বলতে অন্তরের মন্দ ইচ্ছেগুলিকে পরিহার করে ভাল ইচ্ছেগুলির অনুসরণরূপে ভাবা যেতে পারে। সামষ্ঠিক পর্যায়ে সমাজের সম্মিলিত অন্তরসমুহের ইচ্ছেকে ভাবা যেতে পারে যদি না সেটি কোন ভূল বা মন্দ কাজ হয়ে থাকে।

তবে এটিও বুঝতে হবে যে, প্রচলিত জ্ঞানে স্বাভাবিকের মধ্যেও ব্যাতিক্রম আছে বা থাকে। সেখান থেকে শিক্ষা নিতে হবে। ব্যাতিক্রমের জন্য নতুন পথ বা ব্যাতিক্রমী পথ উন্মোচিত হবে। কিন্তু কোন বিষয়েই জবরদস্তী করা যাবে না। কারও স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করা যাবে না। যদি না সেটি কাউকে সরাসরি মন্দভাবে প্রভাবিত করে। বিচারের ভার আল্লাহর।

পাঠক, বিষয়টির যথাযথ অনুধাবন অত্যান্ত গুরুত্বপূর্ণ। এটি খুব সরল ও সাধারণ কোন ধারণা নয়। এ এক স্বর্গীয় অবস্থার ধারণা। যেখানে কেবল বোধসম্পন্নদের পক্ষেই সে অবস্থায় জীবন পরিচালনা করা সম্ভব। রিপুর তাড়না সম্পন্ন বিচলিত ও বিভ্রান্ত মানুষের জন্য তেমন ধারণা প্রযোজ্য নয়! তারা স্বর্গেও নৈরাজ্য সৃষ্টি করবে। শান্তি বিনষ্ট করবে। তাই আল্লাহ তেমন মানুষদের পরীক্ষার মাধ্যমে ভালদের থেকে পৃথক করে নেবেন। বলা হচ্ছে,

"আল্লাহ ভালদের থেকে দুষ্টদেরকে পৃথক করবেন। দুষ্টদের সকলকে তিনি এক এক করে সমবেত করবেন এবং তাদেরকে নরকে প্রেরণ করবেন।" (আল-কোরআন ৮:৩৭)

ওপরে উদ্ধৃত তেমন স্বর্গীয় অবস্থা- যা আল্লাহর সরাসরি সার্বভৌমত্বের অধীন, তেমন জগত প্রতিষ্ঠার যুদ্ধ কেবল যুদ্ধই নয়, এ এক 'জেহাদ' বা মহাসংগ্রামের নাম। যার লক্ষ্য বাস্তবে বিরাজমান সমাজের বিশৃংখল বা অনাসৃষ্টির অবস্থা সৃষ্টির উৎসকে উৎপাটন করে আল্লাহর পথ প্রতিষ্ঠা করা, যেন বোধসম্পন্ন মানুষ আপনা থেকে এক স্বর্গীয় বিধানের অধীনে জীবন

পরিচালনা করতে পারে। পূর্ণ স্বাধীনতা ভোগ করতে পারে। এমনকি ধারণাগত দিক থেকেও ফিতনাজনিত চিন্তা-ধারাকে দুরীভূত করা এ আন্দোলনের অন্তর্ভূক্ত বিষয়।

মানুষ মানুষের ওপর কর্তৃত্ব করবে না। সকলেই হবে আল্লাহতে সমর্পিত। কিন্তু আল্লাহকে কেউ দেখে না, জানে না, চেনে না। অতএব সকলেই হবে আল্লাহর বিধানে সমর্পিত। আল্লাহর বিধানই হচ্ছে 'দ্বীন'। সকলেই নিজ থেকে বিধান মেনে চলবে। অর্থাৎ দ্বীনের পথে চলবে। কোন সংঘর্ষ নেই। সর্বত্র শান্তি বিরাজ করবে এবং কারও ওপর কারও অত্যাধিক কর্তৃত্ব, নিপীড়ন-নির্যাতন বিরাজ করবে না। প্রত্যেক বোধসম্পন্নই নিজ জ্ঞানে আল্লাহর বিধান তথা বোঝার সুবিধার জন্য এভাবেও বলা যেতে পারে যে, প্রকৃতির স্বাভাবিক বিধান বা নিয়মের সাথে খাপ খাইয়ে চলতে জানবে। কেউ কোথাও কোন চতুরতার আশ্রয় নেবে না। চাতুরতা সমর্পনের বিধানকে সর্বপ্রথম আঘাত করে। অতঃপর শাখা-প্রশাখায় বিস্তৃত হয়ে সর্বত্র ছড়িয়ে পরে। সহজ-সরল পথে চলাকে বাধাগ্রস্ত করে।

'লড়াই কর যে পর্যন্ত না 'ফিতনা'র অবসান হয় ...'। এখানে 'ফিতনা' শব্দটি দ্বারা তৎকালীন সময়ে সামাজিক অবস্থা ও অবস্থানের এমন এক চরম বিশৃংখল অবস্থাকে বোঝান হয়েছে যেখানে আল্লাহর দ্বীন, ধর্ম বা চলার পথ প্রতিষ্ঠা করা ছিল প্রায় অসম্ভব। অতএব যতক্ষণ পর্যন্ত না আল্লাহর পথ সামাজিক বিশৃংখল অবস্থার অবসান ঘটিয়ে সুদৃঢ় অবস্থানে প্রতিষ্ঠা পায়, ততক্ষণ এ লড়াই চালিয়ে যাবার কথা বলা হয়েছে।

ইসলাম হচ্ছে আল্লাহর কাছে সমর্পনের পথ। সমর্পনই জগতের সকল মানুষের জন্য আল্লাহ নির্ধারিত ধর্ম বা দ্বীন [সমর্পন দ্রষ্টব্য ১.৫]। আল্লাহর কাছে সমর্পিত আত্মা সত্য ও ন্যায়ের পথে চলে। সরল পথে চলে। কৃত্রিম সংকট তৈরী করে না। পরিবেশ ও প্রকৃতির স্বাভাবিক গতির সাথে তাল রেখে চলে। একই সাথে মন্দের প্রভাব থেকে নিজেকে রক্ষা করে চলে।

আল্লাহর কাছে যে কেউ নিজেকে সমর্পন করতে পারে। এর জন্য কোন নির্দিষ্ট রং ধারণ করার প্রয়োজন নেই। পূর্বেও উল্লেখ করেছি যে নির্দিষ্ট রংধারীও অন্যায় করে, ভূল পথে চলে। অন্যায়কারী, ভূল-পথগামী কখনও যথাযথ ধর্মের পথে অধিষ্ঠিত বলে বিবেচিত হতে পারে না।

অতএব ততক্ষণ এ লড়াই চালিয়ে যেতে হবে যে পর্যন্ত না 'ফিতনা'র অবসান হয় এবং আল্লাহর 'দ্বীন' তথা ধর্ম বা চলার যথাযথ বা সঠিক পথ বা সত্য প্রতিষ্ঠা পায়। বিষয়গুলিকে এভাবেই বুঝতে হবে।

একই সাথে এটিও বুঝতে হবে যে এক অর্থে 'সত্য' হচ্ছে অনড়, আবার আরেক অর্থে 'সত্য' হচ্ছে নমনীয়। 'সত্য'কে এভাবে বুঝতে না জানলেও পরিবেশ-পরিস্থিতিকে যথাযথভাবে বিবেচনা না করে মানুষ 'সত্যে' অনড় থাকার নাম করে আবার ভূল করবে।

'সত্য' অবশ্যই অনড় কিন্তু মানুষ মহান আল্লাহর বিশাল সৃষ্টি জগতের সকল 'সত্য' বা 'সূত্র'কে যথাযথভাবে জানে না। তাই সত্য আরেক অর্থে নমনীয়। অর্থাৎ জ্ঞান ও অভিজ্ঞতার আলোকে পরিবেশ-পরিস্থিতি বিবেচনা করে নতুন সত্যকেও গ্রহণ করে নিতে হয়। ব্যাতিক্রমকে বোঝার চেষ্টা করতে হয়। সব সময় অনড়তা প্রদর্শন করা হলেও ভূল হবে। অতএব আল্লাহর 'দ্বীন'কে জ্ঞান ও অভিজ্ঞতার আলোকে যথাযথভাবে জানতে ও বুঝতে হবে এবং পরিবেশ-পরিস্থিতি বিবেচনা করে সে আলোকে জীবন পরিচালনা করতে হবে।

▪ **২.১৯৩.২** যদি তারা নিবৃত হয়, তবে পথভ্রষ্টদের ব্যাতিত আর কারও প্রতি কোন শত্রুতা নেই : 'যদি তারা অর্থাৎ শত্রুপক্ষ নিবৃত হয়' পূর্ববর্তী বিবৃতির সঙ্গে এটির একটি যোগসূত্র আছে। অর্থাৎ যে অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে এত কথা বলা হয়েছে সে পরিস্থিতির যদি পরিসমাপ্তি ঘটে অর্থাৎ অবিশ্বাসী, নির্যাতনকারী বা অন্যায়কারীরা যদি তাদের অন্যায়-অত্যাচার করা থেকে নিবৃত হয়, তবে বলা হচ্ছে যে তাদের সাথে আর কোন শত্রুতা নেই।

অবিশ্বাসীরা তাদের মতো চলবে বিশ্বাসীরা বিশ্বাসীদের মতো চলবে। অবিশ্বাসীরা তাদের ধর্ম পালন করবে, প্রচার-প্রচারণা বা দাওয়াতি কাজ করবে। বিশ্বাসীরাও তাদের ধর্ম পালন করবে, প্রচার-প্রচারণা বা দাওয়াতি কাজ করবে। নিজ জ্ঞানে মানুষ যে পথ বেছে নেবে তার ভাল-মন্দের সুফল-কুফল প্রাপ্তি তার নিজ কাঁধে। তাদের ধর্ম তারা পালন করবে, বিশ্বাসীরা বিশ্বাসীদের ধর্ম পালন করবে। প্রত্যেকের সকল কর্মের বিচার আল্লাহর হাতে।

এর চেয়ে উত্তম, যৌক্তিক, ন্যায়সম্মত ও যথাযথ দিক-নির্দেশনা আর কি হতে পারে?

আয়াতের পরবর্তী অংশ অত্যান্ত গুরুত্বপূর্ণ। 'তবে পথভ্রষ্টদের ব্যাতিত আর কারও প্রতি কোন শত্রুতা নেই'। অর্থাৎ অবিশ্বাসীরা নির্যাতন বন্ধ করে নিজেদের মতো চললে তাদের সাথে বিশ্বাসীদের শত্রুতা নেই। কিন্তু সমাজে যারা পথভ্রষ্ট তাদের বিপক্ষে বিশ্বাসীদের সংগ্রাম চলবেই। সত্য ও ন্যায় তথা আল্লাহর দ্বীন প্রতিষ্ঠায় বিশ্বাসীদের সংগ্রাম চলমান থাকবে। ন্যায়ের পথ অবলম্বনকারীদের জন্য এটি একটি অত্যান্ত গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশনা। এটি শাশ্বত ও সার্বজনীন দিক-নির্দেশনা। তাই আয়াতের পূর্বের অংশে এভাবে বলা হয়েছে যে, 'এবং লড়াই কর যে পর্যন্ত না 'ফিতনা'র অবসান হয় এবং আল্লাহর 'দ্বীন' প্রতিষ্ঠা পায়।' আল্লাহর দ্বীন প্রতিষ্ঠা পেলে সমাজ থেকে ফিতনাও দুর হয়ে যাবে। যেখানে প্রত্যেকেই নিজ জ্ঞানে ভাল হয়ে চলবে।

পথভ্রষ্টদের সুপথে ফিরিয়ে আনা একটি গুরু দায়িত্বের মধ্যে পরে। অন্যথায় সমাজে শান্তি ও শৃংখলা ফিরিয়ে আনা সম্ভব হবে না। যারা মন্দ কাজ করে তাদেরকে ভাল পথে ফিরিয়ে আনার জন্য সচেতনতামূলক কার্যক্রমের মাধ্যমে এ কাজ করা যেতে পারে, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমুহে শিক্ষা দেয়া যেতে পারে, ধর্মীয় দাওয়াতি কার্যক্রম যা মানুষকে সুপথে আহবান করে তার মাধ্যমেও হতে পারে। এমনকি সাংগঠনিকভাবে মন্দ কাজের প্রতিবাদ ও মন্দ কাজ প্রতিহত করার মাধ্যমেও হতে পারে। এটি একটি দায়িত্ব সকল সত্য ও ন্যায়ের পক্ষ অবলম্বনকারীদের জন্য। যারা তেমন দায়িত্বশীল কাজে নিয়োজিত থাকবে প্রকৃতপক্ষে তারাই আল্লাহর নির্দেশ পালনকারী। তারাই বিশ্বাসী। অতএব সমাজে পথভ্রষ্টদের নিবৃত করার জন্য বিশ্বাসীদের সংগ্রাম চলমান থাকবেই।

এ পর্যায়ে প্রসঙ্গক্রমে বিশ্বাসী-অবিশ্বাসী নিয়ে কিছু কথা বলে রাখতে চাই। অনেক মানুষ বিশ্বাসী। আল্লাহর নির্দেশ কি তা তারা জ্ঞানতই বোঝে। কেননা আল্লাহ তার নির্দেশনা বুঝতে জ্ঞানীদেরকে তেমন জ্ঞান ও প্রজ্ঞা দান করেন। কিন্তু প্রচলিত বা প্রতিষ্ঠিত কিছু ব্যাকরণিক নিয়মের মধ্যে বিশ্বাসী শব্দটি বর্তমানে বাধা পড়ে গেছে [বিশ্বাসী-অবিশ্বাসী দ্রষ্টব্য ২.৬]। যা থাকতে পারে না বা থাকা উচিত নয়। কেননা এর মাধ্যমে বিশ্বাসী নামধারী একটি গোষ্ঠী প্রয়োজনীয় ও ভাল কাজে নিষ্ক্রিয় থেকেও কেবল ব্যাকরণগত কিছু নিয়ম-রীতি

অনুসরণ করার মধ্য দিয়ে সহজেই জাগতিক সুবিধা লুটে নেবে এবং পরকালীন সুবিধাও কেবলমাত্র তাদের বলে বিশ্বাস ও ধারণা করবে। সমাজে এমন ভূল ধারণার সৃষ্টি করবে। এমন ভূল ধারণা থেকে মানুষকে বের করে আনতে হবে। নইলে মানুষ সত্যিকার অর্থাৎ জাগতিক অতি প্রয়োজনীয় ভাল কাজেও সক্রিয় হবে না। নিষ্ক্রিয় থেকে বসে বসে কেবল স্বর্গে যাবার চিন্তায় মগ্ন হবে।

ব্যাকরণগতভাবে যারা বিশ্বাসী নয় অথচ ন্যায়পরায়ন এবং সত্যের পথ অবলম্বন করে চলে সঙ্গাগত সীমাবদ্ধতার কারণে তবে কি তারা আল্লাহর বিচারে শাস্তি প্রাপ্ত হবে? একটা সঙ্গাই কি মানবের কর্মের ভাগ্য নির্ধারণ করবে? এমন প্রচার-প্রচারণা থেকে বের হয়ে আসা প্রয়োজন।

ইসলামের আবির্ভাবের সময় ও বর্তমান সময় এক নয়। আবার ইসলামের আবির্ভাবের সময়েও সমগ্র পৃথিবী ও আরবের অবস্থা এক ছিল না। তখনও জগতে ন্যায়পরায়ন ও সত্যের পথ অবলম্বনকারী জ্ঞানী-গুণী মানুষ ছিল। যেমন কোরআনে হযরত লোকমানের উদাহরণ তুলে ধরা হয়েছে এবং এখনও তেমন মানুষ আছে যারা সঙ্গাগতভাবে বিশ্বাসী নয়। অথচ বিশ্বাসী হওয়ার মূল লক্ষ্যই হচ্ছে ন্যায়ের পথে থাকা, সত্যের পথে থাকা, ভাল পথে থাকা, মন্দ পথ পরিহার করে চলা এবং তেমন মানুষ পূর্বেও ছিল, আজও আছে।

আজও অনেক মানুষ ন্যায়ের পথে আছে অথচ সঙ্গাগতভাবে বিশ্বাসী না। অথচ তারা আল্লাহর নির্দেশনা মতোই জীবন পরিচালনা করে। অপরদিকে সঙ্গাগতভাবে বিশ্বাসী হয়েও অনেকে মন্দ কাজ করে চলেছে এবং তারা নিজেদেরকে বেহেশতে যাবার উপযুক্ত মনে করছে। এভাবে সমাজে ভূল বার্তা যাচ্ছে এবং মন্দের ছোবল সমাজকে কুড়ে কুড়ে খাচ্ছে। তার চেয়েও বড় বিষয় হচ্ছে ইসলাম ও মুসলিম শব্দ দু'টির গ্রহণযোগ্যতার ওপর কালিমা পড়ছে।

ইসলামের আবির্ভাবকালে একটি নির্দিষ্ট অঞ্চলে একটি আন্দোলনের সূচনা হয়েছিল। কিছু মানুষের ভেতরে সে সময়ে একটা চেতনা কাজ করেছিল। এখন সে পরিস্থিতি নেই। বললেই হঠাৎ বা ইচ্ছে থাকা সত্বেও যে কেউ এক বিশ্বাস থেকে অন্য বিশ্বাসে রাতারাতি চলে যেতে পারে না বা পারবে না। আর্থ-সামাজিক, সাংস্কৃতিক, পারস্পরিক সম্পর্কজনিত অনেক বিষয় ও কারণ আছে বা থাকে যা বাধা হয়ে দাড়ায়, কিংবা যা অতিক্রম করে স্বাভাবিক পরিস্থিতিতে সহজেই চলে আসা যায় না বা সম্ভব হয় না। তবে কি সত্য ও

ন্যায়ের পথ অবলম্বনকারী এই মানুষগুলি সঙ্গাগত কারণে চিরকাল অবিশ্বাসী থেকে যাবে? অন্যদিকে যাদের বাপ-দাদারা কোন কারণে একবার সঙ্গার মধ্যে পড়ে গেছে উত্তরাধীকার সূত্রে কেবল তারাই স্বর্গে বা বেহেশতে যাবার উপযুক্ত গণ্য হবে? এমন ধারণা যুক্তিসম্মত, জ্ঞানসম্মত ও ন্যায়সম্মত বলে বিবেচিত হতে পারে না।

মানুষকে সমাজে চলতে হয়। যারা যুগ যুগ ধরে এক প্রকার রীতি-নীতি, বিধি-বিধান পালন করে আসছে 'বিশেষ পরিস্থিতি' ভিন্ন হঠাৎ করেই তারা সামাজিক আচার-আচরণ, রীতি-নীতি, সংস্কৃতি পরিবর্তন করে ফেলতে পারে না বা তেমনটি সম্ভব হয়ে ওঠে না- যে 'বিশেষ পরিস্থিতি' বা আর্থ-সামাজিক এবং ধারণাগত ও মানসিক পরিবর্তনসাধনকারী একটি বিপ্লবাত্মক পরিস্থিতি ইসলামের আবির্ভাবকালে অত্র অঞ্চলে বিদ্যমান ছিল। অথচ এমন মানুষদের মধ্যেও ন্যায়পরায়ন মানুষ আছে যারা আল্লাহর নির্দেশ ঠিকই বোঝে এবং তারা সমর্পনকারীও।

বললেই কেউ লুঙ্গী পরা সমাজে হঠাৎ প্যান্ট পরতে পারে না। বললেই কেউ নিজের রীতি ছেড়ে তাৎক্ষনিক অন্যের রীতিতে চলে আসতে পারে না। এই না আসতে পারার কারণে কি এটিই বিশ্বাস করতে হবে যে তারা চিরকাল নরকবাসী হয়ে থাকবে? অথচ তাদের মধ্যেও অনেক ন্যায়পরায়ন মানুষ আছে!

বর্তমান সময়ে এমনও মুসলিম আছে যারা কটাক্ষকারী। তাদের আচরণ দেখে কোন অমুসলিম বা প্রচলিত অর্থের অবিশ্বাসী বিশ্বাসী হতে চাইবে না। ইসলামের প্রথম যুগে তেমন আচরণ করা হলে অনেকেই মুসলিম হত না। দাওয়াতি আচরণ হতে হবে ভিন্ন।

কোন বিষয়ের শুরুর সময়কালীন পরিস্থিতি ও পরবর্তী পরিস্থিতি এক নয়। যেমন এক নয় যুদ্ধকালীন পরিস্থিতি ও শান্তিকালীন পরিস্থিতি। তাই কোনরকম পরিস্থিতিতেই যেন কাউকে অবিশ্বাসী সম্বোধন করে কোন অন্যায় সুবিধা না নেয়া হয় সে বিষয়ে সতর্ক থাকতে হবে। যেমন বলা হয়েছে,

"হে বিশ্বাসীগণ! তোমরা যখন আল্লাহর পথে লড়াইয়ে বের হও, সতর্ক থেক বৈষম্য প্রদর্শন না করার বিষয়ে এবং যে তোমাদেরকে শান্তির প্রস্তাব দেয়

তাকে বল না 'তুমি বিশ্বাসী নও' এবং এর মাধ্যমে পার্থিব জীবনের প্রাপ্তির কোন সুযোগ নিও না। .. আজ যার এ অবস্থা ইতিপূর্বে তোমরাও তো (একদিন) এমনই ছিলে, কিন্তু তখন থেকেই আল্লাহ তোমাদের প্রতি অনুগ্রহ করেছেন। অতএব কোন প্রকার বৈষম্য প্রদর্শনের বিষয়ে সতর্ক থেক।" (আল-কোরআন ৪:৯৪)

কোনরূপ বৈষম্য প্রদর্শন করতে বারণ করা হয়েছে। এমনই কোরআনের দিক-নির্দেশনা। 'তুমি বিশ্বাসী নও' বা 'অবিশ্বাসী' এমন কথা বলে পার্থিব জীবনের কোনরূপ সুযোগ গ্রহণ করতে বারণ করা হয়েছে। বলা হচ্ছে, আজ যারা অবিশ্বাসী আজকের বিশ্বাসীরাও একদিন তেমনই ছিল। অতএব মানুষকে যথাযথভাবে সত্যের পথে আহবান করতে হবে। কিন্তু কোন প্রকার বৈষম্য প্রদর্শন করা যাবে না।

জগতের সকল মানুষ ভাই ভাই। এক আদি পিতা ও মাতা থেকে সৃষ্ট। একটি সঙ্গার কারণে এক ভাই অপর ভাইয়ের প্রতি সহমর্মী হতে বা মঙ্গল কামনা করতেও যেন কার্পণ্য প্রদর্শন করছে! এ আচরণটিও কি মানসম্মত বা সঠিক?

পূর্বেও উল্লেখ করেছি যে, সঙ্গার একটি লক্ষ্য থাকতে হবে বা আছে। সে লক্ষ্য অর্জিত না হলে কেবল সঙ্গা মানুষকে রক্ষা করতে পারবে না। তেমন যথাযথ ও জ্ঞানপূর্ণ প্রচারণা অধিক হওয়া প্রয়োজন।

অবিশ্বাসীরা যদি দাঙ্গা-হাঙ্গামা, অন্যায়-অপরাধ, নির্যাতন করা থেকে নিজেরাই নিবৃত থাকে তবে তাদের বিরুদ্ধে কোন ব্যাবস্থা নয়। কোন শত্রুতা নয়। কেননা কোন ব্যাবস্থাই বস্তুত কোন দর্শনে অবিশ্বাসের কারণে গ্রহণ করা হয় না বা করা যায় না। বিশ্বাস-অবিশ্বাসের ক্ষেত্রে মানুষের নিজস্ব স্বাধীনতা আছে। ব্যাবস্থা গ্রহণের সাথে সম্পর্ক ন্যায়-অন্যায়, ভাল-মন্দ কাজের। তাই বলা হয়েছে 'পথভ্রষ্টদের ব্যাতিত আর কারও প্রতি কোন শত্রুতা নেই'। অর্থাৎ যারা অযথাই সমাজে ও জগতে অন্যায় ও বিশৃংখল পরিস্থিতি বা ফিতনা সৃষ্টি করে তাদের বিপক্ষে জেহাদ চলমান থাকবে; হোক সে সঙ্গাগত বিশ্বাসী কিংবা অবিশ্বাসী। সেক্ষেত্রে তেমন ভূল পথগামীদের সুপথে আনতে প্রচেষ্টা অব্যাহত

রাখতে হবে। এটিই জেহাদ বা সংগ্রাম যা জাগতিক শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য করা হয়ে থাকে। প্রয়োজনে তাদের প্রতিরোধও করা যেতে পারে।

যে কোন প্রকার ব্যাবস্থা গ্রহণ কোন অন্যায় বা ভূল কাজ ও আচরণের জন্যই প্রযোজ্য। বিশ্বাস-অবিশ্বাসের জন্য নয়। উদ্ধৃত বাণীতে সে দিক-নির্দেশনাও স্পষ্ট।

অবিশ্বাসীদের কোরআনের রূপরেখায় বিশ্বাসী হতে ইসলাম কখনও যুদ্ধ পরিচালনা বা শক্তি প্রয়োগ করে না। বিশ্বাসের ক্ষেত্রে ইসলাম সকলের স্বাধীনতায় বিশ্বাস করে। যে কেউ জীবন চলার যে কোন পথ বেছে নিতে পারে এবং যে কাউকে বা কোন কিছুকে উপাসনা করতে বা না করতে পারে। প্রত্যেকের ভূল-শুদ্ধের বিচার আল্লাহ করবেন। বলা হচ্ছে,

"তোমরা যে বিষয়ে মতবিরোধ করছ, কিয়ামতের দিন আল্লাহ সে বিষয়ে তোমাদের মধ্যে মিমাংসা করবেন।" (আল-কোরআন ২২:৬৯)

তবে ইসলাম অবিশ্বাসী ও ভূল-পথগামীদের তাদের ভূল ধারণা ও মন্দ পথ পরিত্যাগ করে যথাযথ পথে ফিরিয়ে আনতে যুক্তিসম্মত উপায়ে আহবান করতে বিশ্বাসীদেরকে উদ্বুদ্ধ করে। বলা হচ্ছে,

"তোমার পালনকর্তার পথে মানুষকে আহবান কর জ্ঞানের মাধ্যমে এবং যুক্তিসম্মত উপায়ে ও উত্তম পন্থায়।" (আল-কোরআন ১৬:১২৫)

▪ **২.১৯৪.১** নিষিদ্ধ মাসকে অবশ্যই সন্মানের চোখে দেখতে হবে যদি শত্রুপক্ষও সেটিকে সন্মানের চোখে দেখে : হজ্বব্রত পালন ও ওমরাহ'র সময় হিসেবে জ্বিলক্কাদ, জ্বিলহাজ্ব, মুহাররম ও রজব এ চার মাস 'নিষিদ্ধ মাস' বা 'পবিত্র মাস' নামে পরিচিত ছিল। হজ্বযাত্রীরা যেন নিরাপদে কা'বায় গমনাগমন করতে পারে তাই এ সময়ে যুদ্ধ-বিগ্রহ, চুরি-ডাকাতি, খুন-খারাবি, রাহাজানি ইত্যাদি যে কোন প্রকার মন্দ কাজ করা নিষিদ্ধ ছিল। এ সময়ে এগুলিকে গর্হিত অপরাধ বলে গণ্য করা হত। তাই এ চার মাস 'পবিত্র মাস' নামেও পরিচিত ছিল। এ নিয়ম ইব্রাহীম (আঃ) এর সময় থেকে চলে আসছিল এবং আরবরা সেটি মেনে চলত।

নিষিদ্ধ মাসে অবিশ্বাসীদের সঙ্গে যুদ্ধের প্রসঙ্গ উথ্থাপিত হলে বিশ্বাসীদের জন্য দিক-নির্দেশনামূলক এ বাণী অবতীর্ণ হয়। যেন এ বিষয়ে বিশ্বাসীদের মধ্যে ভূল বুঝাবুঝি বা বিতর্কের কোন অবকাশ না থাকে।

নিষিদ্ধ মাস বা পবিত্র মাসে যুদ্ধ করা গর্হিত কাজ। বিশ্বাসীরা তা করতে পারে না বা করবে না। কিন্তু শত্রুপক্ষ যদি নিষিদ্ধ মাসের সুবিধা নিয়ে বিশ্বাসীদের সাঙ্গে যুদ্ধে লিপ্ত হয় তখন করণীয় কি? বলা হচ্ছে, সেক্ষেত্রে বিশ্বাসীদের জন্যও যুদ্ধ করায় কোন অপরাধ নেই।

নিষিদ্ধ মাসকে অবশ্যই সন্মানের চোখ দেখতে হবে। তবে শত্রু পক্ষকেও বিষয়টিকে একইভাবে সন্মানের চোখে দেখতে হবে। একপক্ষ সন্মানের চোখে দেখবে এবং অপর পক্ষ তার সুবিধা নিয়ে যুদ্ধ জয় করবে এটি হতে পারে না।

▪ **২.১৯৪.২** সকল নিষিদ্ধ কাজের ক্ষেত্রেই বদলাজনিত প্রতিকার বিধিসম্মত। অতএব কেউ যদি নিষিদ্ধ কাজ করার মাধ্যমে সীমালংঘন করে এবং তোমাকে আক্রমন করে, তবে তুমিও তাকে একইরূপে আক্রমন কর : কেউ যদি নিষিদ্ধ কাজ করার মাধ্যমে সীমালংঘন করে এবং আক্রমন করে, তবে তাকে একইরূপে আক্রমন করা বিধিসম্মত। কেননা সে আক্রমন করেছে। তাই বলা হয়েছে ‘সকল নিষিদ্ধ কাজের ক্ষেত্রে বদলাজনিত প্রতিকার বিধিসম্মত’। এটি একটি ন্যায়ানুগ সূত্রও বটে।

পূর্বের আয়াতে বিশ্বাসীদেরকে সতর্ক করে দেয়া হয়েছে যেন তারা বিরোধীতা বা সংঘর্ষের সূত্রপাত না করে। কেননা তারা ন্যায়ের পক্ষ শক্তি। প্রথম আক্রমন করা অন্যায়ের মধ্যে পরে। সেটি আল্লাহর নির্দেশের বাইরে। তেমনটি করা হলে সেটি হবে আল্লাহর নির্ধারণ করে দেয়া সীমার লংঘন। সীমালংঘন বড় রকমের অপরাধ। এর পরিণতি ও ফলাফল ভয়ানক যা কেবল অন্যায়কারীদেরকেই নয় সমাজের সকলকেই ভোগ করতে হয়। অতঃপর আল্লাহর বিচার তো আছেই। তাই এমন কাজকে বাধা দেয়াও সমাজের সকল মানুষের কর্তব্যের মধ্যে পরে।

শত্রুপক্ষ যদি সীমালংঘন করে এবং আক্রমন করে, তবে তাকেও একইরূপে আক্রমন করার কথা পরবর্তীতে বলা হয়েছে। কেননা তখন সেটি ন্যায়সম্মত হয়ে যায়।

আবার যদি নিশ্চিত হওয়া যায় যে শত্রুপক্ষ আক্রমন করবেই এবং তারা পূর্বে আক্রমন করার সুযোগ পেলে নিজেদের পরাজয় নিশ্চিত, তবে সেক্ষেত্রে পূর্বে আক্রমন করার বিষয়টি বিবেচনার দাবী রাখে। আর এটি কেবল যুদ্ধাবস্থায় হতে পারে।

▪ **২.১৯৪.৩** তথাপি আল্লাহকে ভয় কর এবং জেনে রেখ, যারা মন্দ কর্ম/পথ থেকে নিজেদের রক্ষা করে চলে আল্লাহ তাদের সঙ্গে আছেন : যদিও আক্রমনকারীকে একইরূপে বা কঠোরভাবে প্রতিহত করার কথা বলা হয়েছে, বলা হচ্ছে তথাপি আল্লাহকে ভয় কর। অর্থাৎ যথা সম্ভব এ কাজ না করতে পারলেই ভাল। একান্ত বাধ্য হলে তবেই করা যেতে পারে। উপরন্তু কোন অন্যায়ের সুযোগ নেয়া যাবে না।

যদি এ সূত্রের অপব্যাবহার করে অন্যায় সুবিধা নেয়ার চেষ্টা করা হয়, তবে স্মরণ রাখা বাঞ্ছনীয় যে সর্বপরি একদিন আল্লাহর বিচার আছে এবং তিনি গহীনের খবরও বের করে নিয়ে আসবেন। অতএব এ বিষয়েও সতর্ক থাকতে হবে।

তাই আল্লাহর প্রতি ভয় রাখার কথা বলা হয়েছে। কেননা কোন অন্যায় সুবিধা নিয়ে কারও ক্ষতি করলে আল্লাহর বিচার থেকে রক্ষা নেই। যারা তেমন মন্দ কাজ করে না আল্লাহ তাদের সঙ্গে আছেন বা থাকেন এখানে তাই বলা হয়েছে। বিশ্বাসীদেরকে কোন জ্ঞানে চলতে হবে এখানে সে দিক-নির্দেশনা দেয়া হয়েছে। আর তাই বিশ্বাসীকে পরকাল ও বিচার দিবসে কঠিনভাবে বিশ্বাস রাখতে হয়। এ বিশ্বাসই তাকে সত্য, ন্যায় ও সঠিক পথে চালনা করে ও ধরে রাখে। প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ বিশ্বাসী-অবিশ্বাসী চেনেন না। বিশ্বাসী-অবিশ্বাসী চিহ্নিত, নির্ধারিত বা প্রকাশিত হয় ন্যায়-অন্যায়ের মাপকাঠি দ্বারা। আল্লাহ সেভাবেই সত্য-মিথ্যার পার্থক্য জেনে নেন। বলা হচ্ছে,

"মানুষ কি মনে করে যে, তারা একথা বলেই অব্যাহতি পেয়ে যাবে যে, আমরা বিশ্বাস করি এবং তাদেরকে পরীক্ষা করা হবে না? আমি তাদেরকেও

পরীক্ষা করেছি, যারা তাদের পূর্বে ছিল। এভাবেই আল্লাহ প্রকাশ করেন কে সত্যনিষ্ঠ এবং প্রকাশ করেন কে মিথ্যেরূপ ধারণকারী। যারা মন্দ কাজ করে, তারা কি মনে করে যে তারা আমার আয়ত্বের বাইরে চলে যেতে পারবে? তারা যা ভাবে তা তাদের জন্যই অমঙ্গলকর।” (আল-কোরআন ২৯:২-৪)

সব বিবেচনা সত্বেও লড়াইয়ের ক্ষেত্রে আল্লাহর নির্দেশকে মেনে চলার কথা বলা হয়েছে এখানে। অর্থাৎ আল্লাহকে ভয় করার কথা বলা হয়েছে। বলা হচ্ছে, যারা মন্দ কর্ম থেকে নিজেদেরকে রক্ষা করে চলে আল্লাহ তাদের সঙ্গে আছেন। এটি একটি আশার বাণী। আল্লাহ সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী। তিনি ক্ষমা করার অধিকার রাখেন, শাস্তি দেয়ার অধিকার ও ক্ষমতা রাখেন। বিবেচনা একান্তই আল্লাহর। এর অপর অর্থ হচ্ছে, যারা ভূল কাজ করে তারা যে নামেই পরিচিত হোক না কেন আল্লাহ তাদের সঙ্গে নেই।

অতএব আল্লাহর প্রতি ভয় রেখে সাবধানতার সাথে চলার বিকল্প নেই। মানুষের জন্য আল্লাহ একটি ন্যায়সম্মত পরিবেশ সৃষ্টি করে দিতে চান, যেখানে কোন পক্ষই অন্যায় করবে না এবং সে পরিবেশ সৃষ্টির সর্বোচ্চ গুরু দায়িত্ব বিশ্বাসীদের ওপর। অতএব বিশ্বাসীদের অন্যায় কাজ করার কোন সুযোগ নেই।

জগতে একটি যথাযথ (Perfect) পরিবেশ সৃষ্টি হতে হবে। যেমনিভাবে মানুষ ব্যাক্তিক তাকওয়া (Perfection) অর্জনে সচেষ্ট হতে হয় তেমন। বৈশ্বিক পরিবেশকেও তাকওয়ার (Perfection) পর্যায়ে উন্নীত করতে হবে।

➢ (আয়াত ১৯৫) আল্লাহর রাস্তায় ব্যায় করা (Spending in Allah's way) প্রসঙ্গে বলা হয়েছে।

১৯৫	ব্যায় কর আল্লাহর পথে এবং নিজ হাতে নিজের জীবনকে ধ্বংস কর না। ভাল কাজ কর। আল্লাহ অনুগ্রহকারীদের ভালবাসেন। (Spend your wealth for the cause of Allah, and be not cast by your own hands to ruin; and do good. Lo! Allah loveth the beneficent.)

▪ **২.১৯৫** ব্যায় কর আল্লাহর পথে ... আল্লাহ অনুগ্রহকারীদের ভালবাসেন : কোরআনের বাণীসমুহের অধিকাংশই নির্দিষ্ট পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে অবতীর্ণ

হয়েছে। মোহাম্মদ (সাঃ) এর সরাসরি সাহচর্য্যে থেকে তাঁর অনুসারীরা সত্য ও ন্যায়ের স্বপক্ষে সংগ্রাম করেছে। তাদেরকে উদ্দেশ্য করে ও পরামর্শ দিয়েও বাণী অবতীর্ণ হয়েছে। অথচ কোরআন এসেছে সকল মানুষের জন্য। নির্দিষ্ট পরিপ্রেক্ষিতে বাণীসমুহ অবতীর্ণ হলেও সেগুলি সকল সময়ে সকল মানুষের জন্য পথ-প্রদর্শক হয়ে অবতীর্ণ হয়েছে। তাই এর বাণী শাশ্বত ও সার্বজনীন।

আলোচ্য আয়াতে মানুষকে ব্যায় করতে উৎসাহিত করা হয়েছে। এর আরেক অর্থ হচ্ছে কার্পণ্য করতেও বারণ করা হয়েছে। কার্পণ্য যে কোন ভাল উদ্যোগ ও প্রচেষ্টা এবং জাগতিক উন্নয়ন ও কল্যাণ প্রচেষ্টাকে ব্যাহত করে দিতে পারে। মানুষকে কিভাবে, কোথায় ব্যায় করতে হবে আয়াতে সে বিষয়ে বলা হয়েছে এবং উৎসাহিতও করা হয়েছে। ছোট্ট দু'টি শব্দ দিয়ে মানুষকে এ বিষয়ে দিক-নির্দেশনা দেয়া হয়েছে যার অর্থ ব্যাপক!

বলা হচ্ছে, ব্যায় কর 'আল্লাহর পথে'। প্রশ্ন হচ্ছে, 'আল্লাহর পথ' কোনটি? আল্লাহর পথ হচ্ছে 'সত্য ও ন্যায়ের পথ' [আল্লাহর পথে ব্যায় দ্রষ্টব্য ২.৩.৩]। আল্লাহর পথ হচ্ছে তাঁর কাছে 'সমর্পনের পথ' [সমর্পন দ্রষ্টব্য ১.৫]। আল্লাহর পথ হচ্ছে 'মানবজাতির উন্নয়ন ও কল্যাণের পথ'।

অতএব ব্যায় করতে হবে সমাজ থেকে মিথ্যে, ভূল ও অসত্যকে দুরীভূত করার জন্য। সত্যকে প্রতিষ্ঠা করার জন্য। জাগতিক শান্তি ও শৃংখলা প্রতিষ্ঠা ও রক্ষা করা তথা সামাজিক ন্যায়বিচার, ভারসাম্য ও স্থিতিশীলতাকে প্রতিষ্ঠা ও রক্ষা করার জন্য। মানব কল্যাণে তথা জাগতিক উন্নয়নে ব্যায় করতে হবে। এমন এক পরিবেশ প্রতিষ্ঠা করার জন্য ব্যায় করতে হবে যেখানে ব্যাক্তিক বা মানবীয় কর্তৃত্ব নয় স্বয়ং 'আল্লাহর কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা' পাবে। একটি যথাযথ দর্শনকে প্রতিষ্ঠা করার জন্য ব্যায় করতে হবে যা হবে সকলের জন্য কল্যাণকর।

সংকীর্ণ চিন্তা, গোষ্ঠীগত বা দলীয় চিন্তা থেকে নয়, বরং আল্লাহর সমগ্র সৃষ্টি তথা জীবন ও জগতকে ভাবনায় রেখে কাজগুলি করতে হবে। এমনকি পশু-পাখি, উদ্ভিদ সমস্ত প্রাণের কল্যাণকেও বিবেচনায় রাখতে হবে। সত্য ও ন্যায় প্রতিষ্ঠিত হলে 'আল্লাহর পথ' তথা 'সরল পথ' প্রতিষ্ঠা পায়। শান্তি প্রতিষ্ঠিত হয়। এর ব্যাত্যয়ে জগত নোংরা বাঁচা-মরার খেলার ময়দানে পরিণত

হয়। দু'টি পক্ষের স্বার্থের দ্বন্দ্ব ও রেষারিষর ক্ষেত্রে পরিণত হয়। জীবন ও জগত বিশৃংখল, অশান্ত ও ধ্বংসের পথে যায়।

'আল্লাহর কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা'র পরিবেশ নিয়ে ওপরে যে কথাটি বলা হয়েছে সেটি বোঝা সবার জন্য খুব সহজ বিষয় নয়। আল্লাহর কর্তৃত্ব কিভাবে প্রতিষ্ঠা পাবে? আল্লাহ কি জগতে আছেন? তিনি কি সরাসরি নির্দেশনা দিচ্ছেন? কেবলমাত্র এ বিষয়টি নিয়েও সম্ভবত হাজার হাজার পৃষ্ঠার লেখার প্রয়োজন হতে পারে!

এমন এক পরিবেশ যেখানে মানুষ মানুষের ওপর কর্তৃত্ব করবে না। মানুষ মানুষের ওপর তার ইচ্ছের বিপক্ষে জোরপূর্বক কিছু করাতে পারবে না। আবার কোন সূক্ষ্ম উপায়ে কাউকে অত্যাচার করতে পারবে না। মানুষ তার নিজ ইচ্ছেতে কাজ করতে পারবে। কিন্তু অন্যের ক্ষতি কিংবা বিরক্তির কারণ হবে না বা সৃষ্টি করবে না।

এর জন্য স্বর্গীয় রাজ্যে মানুষগুলিকেও তেমন বোধসম্পন্ন হতে হবে। যে চালাবে এবং যে চলবে উভয়ের যথাযথ মাত্রাজ্ঞান থাকতে হবে। তারা মন্দ রিপুর তাড়না থেকে মুক্ত হবে। এগুলি কিছু মৌলিক ধারণামাত্র। এ বিষয়ে ইতিপূর্বে কিছু আলোচনা করা বা ধারণা দেয়া হয়েছে (দ্রষ্টব্য ২.১৯৩.১)।

উদ্ধৃত তেমন এক পরিবেশ সৃষ্টির প্রচেষ্টাই বস্তুত 'আল্লাহর দ্বীন' প্রতিষ্ঠার জেহাদ বা সংগ্রাম এর চূড়ান্ত লক্ষ্য (দ্রষ্টব্য ২:১৯৩)। মানুষকে সে লক্ষ্য অর্জনে সংগ্রাম করে যেতে হবে। যেখানে আল্লাহর সার্বভৌমত্ব বা কেবলমাত্র তাঁর বিধান কার্যকর থাকবে। অর্থাৎ প্রকৃতির স্বাভাবিকত্ব এমনকি মানব মনের প্রকৃতির স্বাভাবিক বিধানও কার্যকর থাকবে, যদি না তা অপর কারও ক্ষতির কারণ হয়। মানুষ মানুষের ওপর কর্তৃত্বের নামে জবরদস্তী করবে না। কোন অযাচিত নিয়ম চাপিয়ে দিয়ে কেউ কোন অনৈতিক সুবিধা নিতে পারবে না। সমাজে অন্যায় প্রবেশের সুযোগ থাকবে না। বোধসম্পন্ন মানুষ স্বেচ্ছায় বা আপনা থেকে বিধান মেনে চলবে।

পরিবেশ ও প্রকৃতির চলমান স্বাভাবিক নিয়মের মাঝে কখনও কখনও ব্যাতিক্রমও দেখা দিতে পারে। সেক্ষেত্রে নতুনভাবে আবির্ভূত ব্যাতিক্রমকে পর্যবেক্ষণ করে যেতে হবে। ভাল-মন্দ পরিণতি দেখতে হবে। করণীয় বিষয়ে আলোচনা ও পরামর্শ করা যেতে পারে। তবে জবরদস্তী আরোপ করা নয়।

ব্যাতিক্রম থেকেই সকল নতুন নিয়মের প্রবর্তন ঘটে। নতুন বোধের জাগরণ হয়- বিষয়গুলিকে যথাযথ জ্ঞানে বুঝতে হবে।

মুক্ত পরিবেশ প্রতিষ্ঠায় বা একটি যথাযথ দর্শন প্রতিষ্ঠায় যা সত্যিকার অর্থেই মানুষকে পূর্ণ স্বাধীনতা এনে দিতে পারে, তেমন পথ প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে ব্যায় করতে উৎসাহিত করা হয়েছে। তেমন মুক্ত পরিবেশ ও প্রকৃতির প্রতি সমর্পনের পথই আল্লাহর পথ। তেমন পথ প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে ব্যায় করাই আল্লাহর পথে ব্যায়। একমাত্র আল্লাহর পথই জগতে ও মানব মনে প্রশান্তি এনে দিতে পারে। অতএব 'আল্লাহর পথ' বিষয়টিকে যথাজ্ঞানে অনুধাবন করতে হবে।

ওপরে উদ্ধৃত কাজসমুহ এককভাবে করা সম্ভব নয়। সম্মিলিত প্রয়াস প্রয়োজন। তাই আল্লাহর পথে ব্যায় করতে মানুষকে উৎসাহিত করা হয়েছে। তবে একবারেই সেটি সহজে প্রতিষ্ঠা পাবে না। সে লক্ষ্যে পৌঁছুবার পূর্বে আরও অনেক ক্ষুদ্র লক্ষ্য পুরণ করার আছে। তাই জীবনের অপরাপর কল্যাণমূলক কাজগুলিতেও ব্যায় করতে হবে যা মূল লক্ষ্য অর্জনের পূর্বশর্ত। অতএব প্রতিটি কল্যাণমূলক কাজে ব্যায় করাই 'আল্লাহর পথে ব্যায়'।

প্রতিটি বর্তমান সময়েই দেখা যায় যে সাধারণ মানুষ সত্য, ন্যায় ও কল্যাণের পথ তথা 'আল্লাহর পথ' প্রতিষ্ঠার গুরুত্ব যথাযথভাবে উপলব্ধি করতে ব্যার্থ হয়। তাৎক্ষণিক লোভের বশবর্তী হয় এবং নিজের সুবিধা ও লাভের চিন্তাটিই সর্বাগ্রে করে। জগত ও মানুষের মঙ্গলের নিমিত্তে ব্যায় করতে কার্পণ্য প্রদর্শন করে। এটি নিজ হাতে নিজের বা নিজেদের জীবনকে ধ্বংস করার সামিল। কথাটি সামষ্ঠিক দিক বিবেচনায় বা সামগ্রীক দৃষ্টিভঙ্গী থেকে বলা হচ্ছে। যার কুফল বুঝতেও মানবজাতির দীর্ঘ সময় লেগে যায়।

কোরআন মানুষকে বিষয়গুলি এভাবেও বুঝতে সহায়তা করেছে। যার কুফল এমনকি নিজেদের ভবিষ্যৎ প্রজন্মকেও মন্দভাবে প্রভাবিত করে। জীবন ও জগত তেমন ভূল কাজের জন্য পিছিয়ে যায়। জগতকে মানুষ তাই পরিপূর্ণ প্রস্ফুটিতরূপে দেখতে ব্যার্থ হয়। যা যথাযথ পথে বা কল্যাণমূলক কাজে ব্যায় না করার কারণেও ঘটে। নিজেদের ভূল কার্যকলাপ ও বোধের কারণে আল্লাহর দেয়া উপহার এত সুন্দর জীবন ও জগতকে এমনিভাবে ধ্বংস করতে নিরুৎসাহিত করা হয়েছে। তাই সকলের কল্যাণার্থে 'আল্লাহর পথে' ব্যায় করতে দিক-নির্দেশনা দেয়া হয়েছে।

ওপরে আল্লাহর পথের যে ধারণা তুলে ধরা হয়েছে সেটিকে যথাযথ জ্ঞানে বুঝতে হবে। বস্তুত সে ধারণার মধ্যেই নিহিত আছে মানবজাতির প্রতিটি সদস্যের চূড়ান্ত স্বাধীনতা। মানুষের মুক্ত হয়ে চলা ও কথা বলার যে স্বাধীনতা তা এ ধারণার মধ্যেই নিহিত আছে। নিজেদের মঙ্গলের জন্যই মানুষকে সে সমাজ প্রতিষ্ঠা করতে হবে। সেটি প্রতিষ্ঠা না পেলে মানুষ চিরকাল স্বাধীনতা স্বধীনতা বলে চিৎকার করবে, কিন্তু কোনদিন স্বাধীন সেই স্বর্গীয় রাজ্যের দেখা পাবে না। মানুষকে তারই মতো অপর কোন মানুষের যাঁতাকলে থাকতে হবে। লোভী অন্তর বস্তুগত প্রাপ্তির নেশায় দেবতাদের আরাধনা করবে। আন্দোলন–সংগ্রাম করবে। কিন্তু কোনদিনই শান্তির দেখা পাবে না। অতএব আল্লাহর ন্যায়সম্মত বিধান প্রতিষ্ঠা করা ও আপনা থেকে সে বিধান মেনে সকলকে চলতেও জানতে হবে।

এ বাণীর ব্যাক্তিক পর্যায়েরও একটি দিক আছে। যা আবার ব্যাক্তি থেকে সামষ্টিক পর্যায়ের জন্যও প্রযোজ্য। অপ্রয়োজনীয় ও কত মন্দ কাজে কিংবা ক্ষণস্থায়ী জীবনে আনন্দ–স্ফুর্তি করার জন্য, কিংবা নিজেদের বড়ত্ব জাহির করার জন্যও মানুষ নানানভাবে ব্যায় করছে। কোন কার্পণ্য করছে না। যদিও এসবের সুদুর প্রসারী কোন ফলাফল নেই। তবে তাৎক্ষণিক মনের তৃপ্তি আছে। মরীচিকার মতো। এখানেই আনন্দ, এখানেই শেষ। অথচ মানুষ এসব কাজে ব্যায় করতে কার্পণ্য করছে না। উপরন্তু অধিক ব্যায় কিংবা অপচয়ও করছে। আবার অনেকে এমন অনেক কাজ করছে বা খেলা খেলছে যার মাধ্যমেও অর্থ নষ্ট করছে। দরীদ্র মানুষ আহার পাচ্ছে না। কেউ নেশা করেও অর্থ অপচয় করছে। নিজেকে নিজে ধ্বংস করছে। এর সব অপ্রয়োজনীয় তাও নয়। মূল লক্ষ্য অর্জনে পরিশ্রান্ত কর্মীর প্রশান্তির জন্য এগুলিরও প্রয়োজন আছে। সেভাবেই আল্লাহ মানুষ ও সকল বিধান সৃষ্টি করেছেন। কিন্তু মূল কাজ ফেলে সহায়ক কর্মে বুঁদ হয়ে পরে থাকলে সেটি নিজের জীবন, প্রজন্মের এবং এমনকি মানবজীবন ধ্বংস করার সামিল।

সবকিছু উপলব্ধি করে মানুষকে ভাল কাজে, কল্যাণকর কাজে ব্যায় করতে উৎসাহিত করা হয়েছে। সকল ভাল ও কল্যাণের পথই ‘আল্লাহর পথ’। নিজ হাতে নিজের জীবন ধ্বংস বলতে কেবল ব্যাক্তিক জীবনকেই বোঝান হয়নি। এর সাথে প্রজন্ম থেকে প্রজন্ম তথা সমগ্র মানবজীবনও সম্পর্কিত যা মানুষের

ভূলের কারণে হুমকির মুখে পরতে পারে। এটিও এর আরও একটি অর্থ প্রকাশ করে।

একটি ভাল দর্শন মানুষের জীবন ও জগতকে পরিবর্তন করে দিতে পারে। উন্নত ও বিকশিত করতে পারে। একটি ভূল চিন্তা বা কুসংস্কার জীবনকে নিচু পর্যায়ে নামিয়ে নিয়ে আসতে পারে। জীবনকে অন্ধকারাচ্ছন্ন ও ধ্বংসের পথে নিয়ে যেতে পারে। যে সময়ে ও স্থানে এ বাণী অবতীর্ণ হয়েছে ইসলাম সে সময়ে অন্ধকারাচ্ছন্ন মানুষের জীবনকে আলোকিত করতে একটি সঠিক দর্শন নিয়ে আবির্ভূত হয়েছিল। সে দর্শন প্রতিষ্ঠায় সহায়তার হাত প্রসারিত করে দিতে মানুষকে এ বাণীর মাধ্যমে উৎসাহিত করা হয়েছে।

এ বাণী ভাল কাজে সম্মিলিত প্রয়াসের অংশ হিসেবে ব্যায় করতে সকলকে উৎসাহিত করেছে। কেননা সকল মহৎ ও বৃহৎ কাজ সম্মিলিত প্রয়াসের মধ্য দিয়েই প্রতিষ্ঠা পায়। একার পক্ষে করা সম্ভব হয়ে ওঠে না। মানব কল্যাণমূলক কাজে অর্থের প্রয়োজন আছে। তাই ভাল কাজে অর্থ ব্যায় করাকে উৎসাহিত করা হয়েছে। অন্যথায় মানুষ কখনও মুক্ত স্বাধীন হতে পারবে না। নানান উদ্ভট ধারণার প্রভাবে মানবজীবন কোন না কোনভাবে কারও না কারও হাতে বন্দি হয়ে থাকবে। তাই আল্লাহকে সমুন্নত করার কথা বলা হয় ইসলামে। অন্য কোথাও মাথানত না করতে বলা হয়। বস্তুত এটি হচ্ছে আত্মবিশ্বাসের সাথে নিজ মেরুদন্ডের ওপর দন্ডায়মান হওয়া। নয়ত অন্যের হাতে চলে যাবে প্রতিটি ব্যাক্তির মুক্ত জীবন।

যারা এ দর্শনের বিরোধীতা করে তারা বিষয়গুলির গুরু রহস্য যথাযথভাবে না বোঝার কারণে বিরোধীতা করে। আবার যারা এ দর্শনের ধারক-বাহক বলে পরিচিত তারাও তাদের ভূল ও পশ্চাৎপদ ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের কারণে বিরোধীতা করে। কিন্তু যারা নিজ স্বার্থ সংরক্ষণে এ পথ প্রতিষ্ঠাকে রহিত করার সর্বাত্মক চেষ্টা করে সত্যিকার অর্থে তারাই এর মর্ম অর্থ বোঝে।

আল্লাহর পথকে প্রতিষ্ঠা করতে হলে মানুষকে সংগ্রাম করতে হবে। এটিই জেহাদ। অতএব আল্লাহর পথ বিষয়টিকে ভালভাবে বুঝতে হবে। যার সাথে ইহজগতের উন্নয়ন ও কল্যাণেরও সম্পর্ক আছে। সে পথ প্রতিষ্ঠায় অংশ নিতে প্রয়োজনে ব্যায় করতে হবে। এমনই আল্লাহর দিক-নির্দেশনা। ‘আল্লাহর পথ’

বিষয়টিকে বুঝতে তাই বর্তমানে বাজারে প্রচলিত সংকীর্ণ সঙ্গার উর্ধ্বে উঠে আসতে হবে।

অপরদিকে জেহাদকেও কেবল অস্ত্রহাতে যুদ্ধ করা হিসেবে বুঝলে হবে না। জেহাদ হচ্ছে লক্ষ্য অর্জনে দীর্ঘমেয়াদী সংগ্রাম। জীবন সংগ্রাম। এটি ধীরেও হতে পারে। তবে হতে হবে নিরবিচ্ছিন্ন প্রচেষ্টায়।

যত রকম সঙ্গাই দেয়া হোক না কেন, কিংবা যে রঙ্গেই মানুষ নিজেকে রাঙ্গিয়ে তুলুক না কেন, যদি না সেখানে 'সত্য ও ন্যায়' এর উপস্থিতি থাকে তবে সেটি 'আল্লাহর পথ' হিসেবে বিবেচিত হবে না বা হতেও পারে না। তাতে দর্শনের অনুসারীরা নিজেদেরকে যত সুন্দর নামেই পরিচিত করার চেষ্টা করুক না কেন তা গৃহীত হতে পারে না। মানবের সম্মিলিত অন্তর তা প্রত্যাখ্যান করবে। বুঝতে হবে যে সেখানেই আল্লাহর অবস্থান। এ অনুধাবন অত্যান্ত গুরুত্বপূর্ণ।

সত্য ও ন্যায় প্রতিষ্ঠা পেলে ওপরে যে পরিবেশের কথা বলা হয়েছে সেটিও আপনা থেকে প্রতিষ্ঠা পাবে। সেক্ষেত্রে কেউই কারও ওপর অযৌক্তিক ও অন্যায় নিয়ম চাপিয়ে দিতে পারবে না। কেবল তখনই 'সরল পথ' বা 'আল্লাহর পথ' প্রতিষ্ঠা পাবে। যে পথে চলার প্রার্থনা শিক্ষা দেয়া হয়েছে 'সূরা ফাতেহা'য়।

তাই বলা হয়, কেবল পূর্ব-পশ্চিমে মুখ করাই সঠিক কাজ নয়। সঠিক কাজ হচ্ছে ... ইত্যাদি (দ্রষ্টব্য ২.১৭৭)। পাঠক যেন ভুল না বোঝেন তাই এটিও বলে রাখা প্রয়োজন যে, পূর্ব-পশ্চিমে মুখ করারও প্রয়োজন আছে। তা না হলে এ সকল নিয়ম প্রতিষ্ঠা করা হত না। ওপরের উদ্ধৃতিটি এটি বোঝাতেই তুলে ধরা হয়েছে যে, ধর্মীয় নিয়ম-বিধি পালনের চেয়েও জীবনের প্রয়োজনে সঠিক কাজগুলি করা অধিক গুরুত্বপূর্ণ। কিংবা যথাযথ কাজ ভিন্ন কেবল ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান পালন করাই সঠিক কাজ নয়। জীবন ও জগতকে সুন্দরভাবে গড়ে তোলাই ধর্মীয় বিধানাবলীর মূল কাজ।

সত্য ও ন্যায়কে প্রতিষ্ঠা করাই সকল ধর্মীয় বিধি-বিধানের মূল লক্ষ্য। এ জগত আজও স্বর্গ হতে পারেনি। এখানে বিভিন্ন রকমের মানুষ আছে। তাই বর্তমান বাস্তবতায় নানান বিধি-বিধানেরও প্রয়োজন আছে। কিন্তু যে কারণে বিধি-বিধান প্রয়োজন যদি সে লক্ষ্যই অর্জন না হয় তবে শুধু বিধি-বিধান পালন করা হবে অর্থহীন।

কিছু মানুষ মূল লক্ষ্যকে পেছনে ফেলে কেবল আচার-অনুষ্ঠান পালনে অতি উৎসাহ প্রদর্শন করে। এর কারণ হচ্ছে সেটি তাদের কাছে সহজ বোধ হয়। তাতে রক্তক্ষরণও কম হয়। স্বর্গে গমনকে লক্ষ্য নির্ধারণ করে নিরবে নিভৃতে অভ্যাসে পরিণত হয়ে যাওয়া আনুষ্ঠানিকতা পালন করা সহজ ও সুবিধাজনক বোধ হয়। আবার যদি সেটি আড়ম্বরপূর্ণ কোন অনুষ্ঠান পালনের মধ্য দিয়ে করা হয় তবে সেখানেও নিজেদেরকে বড় করে প্রকাশ করা হয়। এতেও এক রকম তৃপ্তি আছে। জাগতিক মর্যাদা প্রাপ্তিতে তৃপ্তি আছে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এসব কাজের অন্তর্নিহিতে গুরুত্বপূর্ণ দিকটি হচ্ছে বাস্তবে মানব জীবনকে শান্তিময়, সুখময় ও স্বাচ্ছন্দপূর্ণরূপে গড়ে তোলা। জগতে শান্তি প্রতিষ্ঠা করা। সৃষ্টিকে রক্ষা করা। কিন্তু ন্যায় প্রতিষ্ঠা ভিন্ন সেটি কোনদিন সম্ভব হবে না। তাই আচার-অনুষ্ঠান পালনে অত্যাধিক ব্যায় করার চেয়ে সমাজে ন্যায় ও ন্যায্যতা প্রতিষ্ঠায় সে অর্থ ব্যায় করা অধিক গুরুত্বপূর্ণ।

ধর্মের কাজ শান্তি প্রতিষ্ঠা করা। কথাটি যেমন ব্যাক্তিক পর্যায়ে তেমনি সামষ্ঠিক পর্যায়ের জন্যও প্রযোজ্য। পরিবেশ ও সমাজে ভারসাম্য প্রতিষ্ঠা ভিন্ন কখনই সুখ ও শান্তি অর্জন সম্ভব না। ভারসাম্য প্রতিষ্ঠায় সত্য ও ন্যায়টি প্রধান বিবেচ্য। নয়ত সমাজে ও মানুষে মানুষে বিশাল বৈষম্য সৃষ্টি হবে। যা ব্যাক্তিক ও সামষ্ঠিক শান্তি বিনষ্টিকরণে প্রধান ভূমিকা পালনকারী।

‘আল্লাহর পথ’ বলতে তাই সামষ্ঠিক কল্যাণ সাধন হয় তেমন কাজে ব্যায় করতে উৎসাহিত করা হয়েছে। সম্মিলিত মানুষের সে ব্যায়ের সুফল সকল মানুষ ভোগ করবে। সকল মানুষের জীবনে স্বাচ্ছন্দ আসবে। মানুষ স্বস্তি পাবে। সুবিধা ভোগে বৈষম্য হ্রাস পাবে। মানুষের বেদনা বা কষ্টের ভার লাঘব হবে। অন্তরের ক্ষোভ কমে আসবে।

অপরদিকে যে দর্শন প্রতিষ্ঠার জন্য এখানে ব্যায় করতে উৎসাহিত করা হয়েছে অর্থাৎ ‘ইসলাম’- জীবন চলার সে পথ প্রতিষ্ঠা পেলে মানুষ একে অপরের ওপর চরম নিষ্ঠুরতার আশ্রয় নিয়ে কর্তৃত্ব করতে পারবে না। প্রতিটি মানুষ নিজ ইচ্ছায় মুক্ত স্বাধীনভাবে চলতে পারবে। তবে এ স্বাধীনতার অর্থ ও এর ভেতরের দায়িত্বশীলতাগুলিকেও যথাযথ জ্ঞানে বুঝতে হবে। সঠিক বিধান বিষয়ে যথাযথ ধারণা থাকতে হবে। যার কিছু ধারণা আলোচনার মধ্য দিয়ে তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়েছে।

যখন এসব বাণী অবতীর্ণ হয়েছে পৃথিবী তখন আজকের মতো ছিল না। তখন অনেক বিষয়কে কার্যকরী করার মতো কোন প্রাতিষ্ঠানিক ভিত্তি ছিল না। সমগ্র বিশ্বব্যাপি এখন জাতিসংঘের বিবিধ প্রাতিষ্ঠানের মাধ্যমে ন্যায় প্রতিষ্ঠায় ব্যায় করা সহজ হতে পারে। ব্যায় করার বিষয়টির যেমন কিছু ব্যাক্তিক দিক আছে, তেমনি আছে ছোট পরিসরে সামাজিক দিক। কিন্তু বৃহৎ পরিসরে এটি দেশ ও সমগ্র বিশ্বেরও একটি বিবেচনার দিক আছে।

আল্লাহর পথ সকলের জন্য। সকলের সেখানে অংশগ্রহণ থাকা বাঞ্ছনীয়। সকল মানুষ তাঁরই সৃষ্টি। তিনি এককে দিয়ে অন্যকে পরীক্ষা করেন। আল্লাহর পথ কেউ এককভাবে দাবী করতে পারে না। যারা অন্যায় করে না, অসৎ কাজ করে না নিশ্চয়ই তারা আল্লাহ প্রদর্শিত পথেই রয়েছে। বিষয়গুলিকে সেভাবে বুঝতে হবে। কেননা আল্লাহর পথ এ লক্ষ্যকে সামনে রেখেই রচিত।

কিছু নিয়ম ও আনুষ্ঠানিকতা পালন এবং একটি নির্দিষ্ট সঙ্গার অন্তর্ভূক্ত হওয়ার কারণে কেউ আল্লাহর পথের একক দাবীদার হতে পারে না। অথচ দেখা যায় যে, সমাজে আল্লাহর পথের একক দাবীদার এমন মানুষেরাও নানান ধরণের অন্যায় ও অপকর্মের সাথে জড়িয়ে আছে। তারা কি তবে আল্লাহর পথে আছে? অথচ এটা সত্যি যে তারা সঙ্গার মধ্যে আছে। একটা সঙ্গাই কি মানুষের কর্মের ভাল-মন্দ, বিশ্বাস-অবিশ্বাসের নির্ধারক হতে পারে? বিষয়গুলিকে নিয়ে নতুনভাবে ভাববার আছে। সচেতনতা সৃষ্টি করার প্রয়োজনীয়তা আছে।

কেউ হয়তবা সুনির্দিষ্ট কোন ধর্মের আনুষ্ঠানিকতাসমুহ হুবহু পালন করে না, কিন্তু কোন প্রকার অন্যায় কাজের সাথে সম্পৃক্ত নয় সে কি আল্লাহর পথে নেই? অনেক মানুষ আছে যারা সমাজে নানান ধরণের প্রয়োজনীয় সামাজিক কার্যক্রম ও ভাল কাজের সাথে জড়িত। তারা কি আল্লাহর পথে নেই?

আল্লাহর পথের সঙ্গা সঠিক না হলে ন্যায় প্রতিষ্ঠা পাবে না। সত্যিকার অর্থে মানব কল্যাণে যথাযথ পথে করা ব্যায়ও সেক্ষেত্রে আল্লাহর পথে ব্যায় বলে বিবেচিত হতে পারবে না। সমগ্র মানবজাতিও কোরআনের বিধানের আওতার মধ্যে আসতে পারবে না। সেক্ষেত্রে কোরআন সকল মানুষের পথ প্রদর্শনকারী না হয়ে কেবল কিছু লেবাস ধরণকারীদের দলীয় গ্রন্থে পরিণত

হবে। 'আল্লাহর পথ' বিষয়টিকে সাম্য ও ন্যায়ের ভিত্তিতে নতুন আলোকে ভাববার জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ কথা এগুলি।

আল্লাহর পথে যা কিছু ব্যায় করা হয় তার সুফল সমাজ ও জগতের সকলে ভোগ করে। সেটি কারও একক, দলীয় কিংবা গোষ্ঠীগত মালিকানাভূক্ত বিষয় নয়। সেটি এককভাবে কারই নয় বরং সকলের। তাই সেটিকে 'আল্লাহর পথে' বলা হয়। যেমন একটি রাস্তা নির্মান করা হলে সেটি সকলেই ব্যাবহার করে। তাই সে ব্যায়ও আল্লাহর পথে ব্যায়। যেমন আলো, বাতাস, পানি সকলে ব্যাবহার করে। যা আল্লাহর কর্তৃত্বের অধীন।

মানুষকে তাই ভাল কাজে ব্যায় করতে বলা হয়েছে। ভাল কাজে ব্যায় আল্লাহর পথে ব্যায়। যারা সকলের মঙ্গল চিন্তা করে তারাই অনুগ্রহকারী। আল্লাহ তেমন বিবেচক মানুষদের ভালবাসেন। আল্লাহতে বিশ্বাসী তাঁর ভালবাসার কাজই করবে। তাই সকলকে বিশ্বাসী হতে উদ্বুদ্ধ করা হয়। এভাবে ভাল কাজ করতে অনুপ্রাণীত করা হয়।

আমরা জানি না স্বর্গ কোথায়। সাগরের গভীরে, নাকি আসমানে, নাকি অন্তরে। নাকি পৃথিবীতেই বিরাজ করছে স্বর্গ। আমরা নিশ্চিত জানি না যে মানবীয় সকল কর্মের মধ্য দিয়ে এ পৃথিবীতেই আমরা আমাদের নিজেদের জন্য স্বর্গ কিংবা নরক রচনা করে চলেছি কিনা। আমরা জানি না আল্লাহ আমাদেরকে কাজে লাগিয়েই স্বর্গ ও নরক সৃষ্টি করে চলেছেন কিনা। তাই তো আমরা নিজেদের কর্মের কারণে এ পৃথিবীতে এমন কি অন্তরেও স্বর্গ ও নরকের স্বাদ উপলব্ধি করি!

অপরকে বঞ্চিত করে রাখার মানসিকতা নিয়ে নয়, অপরকে ঘৃণা করে নয়, কেবল এককভাবে স্বর্গ লাভের প্রত্যাশা করে নয়, সত্য-ন্যায় ও সততার পথে সকলকে সম্পৃক্ত করে স্বর্গ লাভ করি- এমন প্রত্যাশায় সংকীর্ণ সঙ্গা পরিহার করে জগতের সকল মানুষের কল্যাণে ব্যায় করি। সেটিই আল্লাহর পথ। সেগুলিই ভাল কাজ। বস্তুত এমনই আল্লাহর দিক-নির্দেশনা। কিন্তু বিষয়গুলিকে যথাযথভাবে বুঝতে আমরা ভূল করি। কিংবা নিজেদের কর্তৃত্ব হারাবার ভয় করি। এ বক্তব্য আজ অনেকের মনঃপুত নাও হতে পারে। তবে একদিন এ আলোকেই কোরআনের নির্দেশনা প্রতিষ্ঠা পাবে। সত্য প্রতিষ্ঠা পাবেই।

জগত ছোট হয়ে এসেছে। সকলের সুখ নিশ্চিত না করে জাগতিক সুখ প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব নয়। সংসারে যেমন একজন অসুখী মানুষ থাকলে সবাই অসুখী হয়ে যায় বিষয়টি তেমন। যদি মানুষ আমরা সেভাবে কাজসমূহ না করতে পারি, তবে আমরা নিজেরাই নিজেদের সুখ স্বাচ্ছন্দ তথা জীবনকে ক্ষতিগ্রস্ত করে ফেলব। ভাল কাজ করা, ভাল পথে চলাই সঠিক ধর্ম। যেটি ভাল সেটি সকল মানুষের জন্য ভাল। তাই ভাল কাজ করতে উৎসাহিত করা হয়েছে এবং সে বিবেচনায় ব্যায় করতে বলা হয়েছে।

যারা মানুষের প্রতি অনুগ্রহশীল আল্লাহও তাদের প্রতি অনুগ্রহ করেন। তিনি তাদেরকে ভালবাসেন। কোরআনের মাধ্যমে তিনি সেটি সকল মানুষকে বুঝতে সহায়তা করেছেন। এমনিভাবে সঠিক ধারণার প্রচার ও প্রসারের কাজ করা সকল বোধসম্মত মানুষের কাজ। যেমন গীতায় বলা হয়েছে,

"যে বিদ্বেষভাবাপন্ন নয়, বরং সকল জীবসত্বার প্রতি সদয় ... যে মিথ্যে অহম থেকে মুক্ত ... যার কারণে কেউ বিপত্তিতে পতিত হয় না ... শত্রু ও মিত্রের প্রতি যে সমভাবাপন্ন ... যে নিজেকে জ্ঞান আহরণ ও আমার প্রতি ভক্তিতে নিবিষ্ট রেখেছে- সে আমার অতি প্রিয়।" (গীতা ১২:১৩-১৯)

অতএব বর্তমান পরিবর্তীত বিশ্বে সকল মানুষের প্রতি সহমর্মী হয়ে সকল মানুষের উন্নয়ন ও কল্যাণে ব্যায় করার কথা বিবেচনা করতে হবে।

আদমকে সৃষ্টির প্রাক্কালে আল্লাহ ও ফেরেশতাদের কথোপকথনে ফেরেশতারা মানুষ সম্পর্কে যে আশংকা প্রকাশ করেছিল আমরা যেন তাকে সত্যে পরিণত না করি। বরং মানুষ সম্পর্কে আল্লাহ যা বলেছিলেন, 'আমি যা জানি তোমরা তা জান না' এর পেছনে যে গুরুত্বপূর্ণ অর্থ লুকিয়ে আছে তাকে সত্যরূপে প্রতিষ্ঠা করি। আল্লাহর ইচ্ছেকে সমুন্নত করি। আল্লাহর পথে ব্যায় করি। সত্য ও ন্যায়কে প্রতিষ্ঠা করি ও সমুন্নত রাখি। জীবন ও জগতকে সুন্দররূপে গড়ে তুলি। যার ফলাফলস্বরূপ আল্লাহ প্রদর্শিত সরল পথে চলার মাধ্যমে পৃথিবীকেই স্বর্গে রূপান্তর করি। অতঃপর আল্লাহর দিক থেকে স্বর্গীয় সুখের প্রতিশ্রুতি তো আছেই, যে বিষয়ে আমাদের সঠিক কোন ধারণা নেই। অথচ সে প্রত্যাশাও সকল মানুষকে ভাল কাজে অনুপ্রাণীত করে! আনন্দিত করে!

➢ (আয়াত ১৯৬-২০৩) হজ্ব ও ওমরাহ (The Pilgrimage and The Visit to Mecca for Allah) সম্পর্কে বলা হয়েছে।

১৯৬	তোমরা আল্লাহর উদ্দেশ্যে হজ্ব ও ওমরাহ পালন কর। যদি তোমরা বাধা প্রাপ্ত হও তবে কুরবানীর জন্য যা কিছু সহজলভ্য তাই তোমাদের ওপর ধার্য্য। আর তোমরা ততক্ষণ পর্যন্ত মাথা মুন্ডন করবে না যতক্ষণ পর্যন্ত না কুরবানীর পশু যথাস্থানে পৌঁছে। তোমাদের মধ্যে যারা অসুস্থ হয়ে পরবে কিংবা মাথায় যদি কোন কষ্ট থাকে তাহলে তার পরিবর্তে রোযা করবে কিংবা দান করবে অথবা কুরবানী করবে। আর যখন তোমরা নিরাপদ বোধ করবে, তখন তোমাদের মধ্যে যারা হজ্বের প্রাক্কালে ওমরাহ পালন করতে চাও, তবে যা কিছু সহজলভ্য তা দিয়ে কুরবানী করাই কর্তব্য। কিন্তু যারা কুরবানীর পশু পাবে না তারা হজ্বের দিনগুলির মধ্যে তিনটি রোযা রাখবে এবং ফিরে যাবার পর সাতটি রোযা রাখবে। এভাবে দশটি রোযা পূর্ণ করবে। এ নির্দেশনাটি তাদের জন্য যাদের পরিবার-পরিজন মসজিদ আল-হারামের নিকটবর্তী বসবাস করে না। আল্লাহর প্রতি তোমাদের কর্তব্য পালন কর এবং জেনে রেখ, শাস্তি প্রদানে আল্লাহ অত্যান্ত কঠোর। (Perform the pilgrimage and the visit (to Mecca) for Allah. And if ye are prevented, then send such gifts as can be obtained with ease, and shave not your heads until the gifts have reached their destination. And whoever among you is sick or hath an ailment of the head must pay a ransom of fasting or almsgiving or offering. And if ye are in safety, then whosoever contenteth himself with the visit for the pilgrimage (shall give) such gifts as can be had with ease. And whosoever cannot find (such gifts), then a fast of three days while on the pilgrimage, and of seven when ye have returned; that is, ten in all. That is for him whoso folk are not present at the Inviolable Place of Worship. Observe your

	duty to Allah, and know that Allah is severe in punishment.)
১৯৭	হজ্বের কয়েকটি মাস আছে সুবিদিত। এসব মাসে যে হজ্বের পরিপূর্ণ নিয়ত করবে (জেনে রেখ) সেখানে স্ত্রীর সঙ্গে নিরাভরণ নয়, নয় কোন অশোভন কাজ, না করা যাবে কোন ক্ষিপ্ত বাক-বিতন্ডা। আর তোমরা যা কিছু ভাল কাজ কর আল্লাহ তা জানেন। তোমরা পাথেয় সঙ্গে নিয়ে নাও (পরকালের জন্য)। নিঃসন্দেহে সর্বোত্তম পাথেয় হচ্ছে মন্দ কর্ম/পথ থেকে নিজেকে রক্ষা করে চলা। সুতরাং আমার প্রতি তোমাদের কর্তব্য পালন কর, হে বোধসম্পন্ন মানুষ! (The pilgrimage is (in) the well-known months, and whoever is minded to perform the pilgrimage therein (let him remember that) there is (to be) no lewdness nor abuse nor angry conversation on the pilgrimage. And whatsoever good ye do Allah knoweth it. So make provision for yourselves (Hereafter); for the best provision is to ward off evil. Therefore keep your duty unto Me, O men of understanding.)
১৯৮	তোমাদের পালনকর্তার অনুগ্রহ অন্বেষন করায় তোমাদের কোন পাপ নেই (ব্যবসার মাধ্যমে)। অতঃপর যখন তাওয়াফের জন্য আরাফাত থেকে ফিরে আসবে, তখন মাশ'আরুল-হারামের নিকটে পৌঁছে আল্লাহকে স্মরণ করবে। যেভাবে তিনি নির্দেশনা দিয়েছেন, সেভাবে তাঁকে স্মরণ কর। যদিও ইতিপূর্বে তোমরা ছিলে পথভ্রান্ত। (It is no sin for you that ye seek the bounty of your Lord (by trading). But, when ye press on in the multitude from 'Arafat, remember Allah by the sacred monument. Remember Him as He hath guided you, although before ye were of those astray.)
১৯৯	অতঃপর তাওয়াফের জন্য দ্রুতগতিতে সেখান থেকে ফিরে আস, যেখান থেকে সবাই ফিরে। আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা কর। নিশ্চয়ই! আল্লাহ ক্ষমাকারী, করুণাময়। (Then hasten onward from the place

	whence the multitude hasteneth onward, and ask forgiveness of Allah. Lo! Allah is Forgiving, Merciful.)
২০০	হজ্বের যাবতীয় ক্রিয়া সমাপ্ত হলে স্মরণ করবে আল্লাহকে। যেমন করে তোমরা স্মরণ কর নিজেদের পিতা-পিতামহদের কিংবা তার চেয়েও বেশী। মানুষের মধ্যে যারা বলে: 'হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদেরকে ইহকালেই দান কর।' বস্তুত তাদের জন্য পরকালে কোন অংশ নেই। (And when ye have completed your devotions, then remember Allah as ye remember your fathers or with a more lively remembrance. But of mankind is he who saith: "Our Lord! Give unto us in the world," and he hath no portion in the Hereafter.)
২০১	তাদের মধ্যে কেউ কেউ বলে: 'হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদেরকে ইহকালে কল্যাণ দান কর এবং পরকালেও কল্যাণ দান কর এবং আমাদেরকে নরকের আগুন থেকে রক্ষা কর।' (And of them (also) is he who saith: "Our Lord! Give unto us in the world that which is good and in the Hereafter that which is good, and guard us from the doom of Fire.")
২০২	তারা যা অর্জন করেছে তার একটি যথাযথ অংশ তাদের জন্য রক্ষিত আছে। আল্লাহ দ্রুত হিসেব নিষ্পন্নকারী। (For them there is in store a goodly portion out of that which they have earned. Allah is swift at reckoning.)
২০৩	নির্দিষ্ট সংখ্যক দিনগুলিতে আল্লাহকে স্মরণ কর। যে তাড়াহুড়ো করে দু'দিনের মধ্যে চলে যাবে তার জন্য কোন পাপ নেই এবং যে বিলম্ব করবে তার জন্যও কোন পাপ নেই, এটি তাদের জন্য যারা মন্দ কর্ম/পথ থেকে নিজেদের রক্ষা করে চলে। আল্লাহর প্রতি তোমাদের কর্তব্য পালন কর এবং জেনে রেখ, তাঁর কাছেই তোমাদেরকে সমবেত হতে হবে। (Remember Allah through the appointed days. Then whoso hasteneth (his departure) by two days, it is no sin

	for him, and whoso delayeth, it is no sin for him; that is for him who wardeth off (evil). Be careful of your duty to Allah, and know that unto Him ye will be gathered.)

▪ **২.১৯৬** তোমরা আল্লাহর উদ্দেশ্যে হজ্ব ও ওমরাহ পালন ... আল্লাহর প্রতি তোমাদের কর্তব্য পালন কর এবং জেনে রেখ, শাস্তি প্রদানে আল্লাহ অত্যান্ত কঠোর : এ আয়াতে হজ্ব ও ওমরাহ পালন করার বিষয়ে নির্দেশনা দেয়া হয়েছে। হজ্ব বিশ্বাসীদের জন্য অবশ্য পালনীয় একটি কর্তব্য। ইসলামের পাঁচটি মূল ভিত্তির একটি। তবে এটির সাথে যেহেতু আর্থিক সামর্থের বিষয় অছে তাই এটি সামর্থবানদের জন্য পালনীয়। এ বিষয়ে যতটুকু নির্দেশনা এখানে দেয়া হয়েছে সেটি অত্যন্ত পরিস্কার ও বোধগম্য।

হজ্ব পালনের নিয়মাবলী বর্তমানে সুপ্রতিষ্ঠিত। তাই এ বিষয়ে এখানে অধিক আলোচনা করা হল না। কিছু বিষয় তৎকালীন সময় ও অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে অবতীর্ণ হয়েছে যে পরিবেশ বা পরিস্থিতি বর্তমানে বিদ্যমান নেই।

▪ **২.১৯৭.১** হজ্বের কয়েকটি মাস আছে সুবিদিত। এসব মাসে যে হজ্বের পরিপূর্ণ নিয়ত করবে (জেনে রেখ) সেখানে স্ত্রীর সঙ্গে নিরাভরণ নয়, নয় কোন অশোভন কাজ, না করা যাবে কোন ক্ষিপ্ত বাক-বিতন্ডা। আর তোমরা যা কিছু ভাল কাজ কর আল্লাহ তা জানেন : জ্বিলক্কাদ, জ্বিলহাজ্ব, মুহাররম ও রজব এ মাসগুলি হজ্ব ও ওমরাহ পালনের সময় এবং এটি সুবিদিত সে প্রসঙ্গে বলা হয়েছে। হজ্ব পালনকালে কি করা যাবে কি করা যাবে না সে বিষয়ে বলা হয়েছে। সেখানে স্ত্রীর সঙ্গে নিরাভরণ, কোন প্রকার অশোভন কাজ, এমনকি কোন ক্ষিপ্ত বাক-বিতন্ডাও করা যাবে না। এগুলি নিষিদ্ধ।

'আর তোমরা যা কিছু ভাল কাজ কর আল্লাহ তা জানেন।' হজ্বে যে সব কাজ করা নিষিদ্ধ তা উল্লেখের পর এ বিষয়টি স্মরণ করিয়ে দেয়া হয়েছে। অর্থাৎ আল্লাহ যা নিষেধ করেছেন যারা তা পালন করে আল্লাহ সেটি জানেন। এটি তাঁর নির্দেশ পালনকারীদের মনে আনন্দ ও আশার সঞ্চার করে। তাদেরকে এই ভেবে প্রাণবন্ত করে তোলে যে তাদের ভাল কাজসমুহ আল্লাহ দেখছেন ও জানছেন। তিনি ভাল কাজের যথাযথ প্রতিদানদাতা।

একই সাথে এটি এ কথাও প্রকাশ করে যে, যেসব কাজ নিষেধ করা হয়েছে এবং কোন মন্দ কাজ যদি কেউ করে তবে সেটিও আল্লাহ জানেন। ফলে যাদের মনে কোন প্রকার মন্দ ভাবনা থাকবে তারাও এ বিষয়ে সতর্ক থাকবে ও নিজেদেরকে ধীরে ধীরে মন্দ থেকে ভাল পথে পরিচালিত করতে অভ্যস্ত হবে। এটি তাদের মনে আল্লাহর ভয় ও পরবর্তী বিচারের ভয় থেকে সৃষ্টি হয়ে থাকে। তাই বিশ্বাস অত্যান্ত গুরুত্বপূর্ণ।

পূর্বের আয়াতের শেষে সতর্ক করে বলা হয়েছে যে, 'আল্লাহর প্রতি তোমাদের কর্তব্য পালন কর এবং জেনে রেখ, শাস্তি প্রদানে আল্লাহ অত্যান্ত কঠোর।' ভাল কাজ করা ও মন্দ কাজ থেকে নিজেদেরকে বিরত রাখা দু'টোই আল্লাহর প্রতি কর্তব্য পালনরূপে বিবেচিত। অতএব আল্লাহ যেমন নির্দেশ করেছেন তা পালন করতে বলা হয়েছে। শাস্তির বার্তা যেমন বিশ্বাসীদেরকে মন্দ কাজ থেকে বিরত রাখে, তেমনি অবিশ্বাসী যারা হজ্বব্রত পালনে বিশ্বাসীদেরকে বাধা দেয় তাদেরকেও সতর্ক করে এবং বিশ্বাসীদের মনে সাহসের সঞ্চার করে এই ভেবে যে, আল্লাহ মন্দদের বা অন্যায়কারীদের সাথে নেই, ভাল কর্ম সম্পাদনকারীদের সঙ্গে আছেন।

▪ **২.১৯৭.২** তোমরা পাথেয় সঙ্গে নিয়ে নাও। নিঃসন্দেহে সর্বোত্তম পাথেয় হচ্ছে মন্দ কর্ম/পথ থেকে নিজেকে রক্ষা করে চলা। সুতরাং আমার প্রতি তোমাদের কর্তব্য পালন কর, হে বোধসম্পন্ন মানুষ : ইসলামের আবির্ভাবের পূর্বে এমন রীতির প্রচলন ছিল যে, হজ্বে যাবারকালে হজ্বযাত্রীরা কোন পাথেয় অর্থাৎ খাবার বা প্রয়োজনীয় কোন কিছু সঙ্গে নিত না। তারা মনে করত এগুলি পার্থিব জীবনের কাজ। তারা এক মনে-এক ধ্যানে কেবলমাত্র আল্লাহর উপাসনায় রত হতে চলেছে। অতএব পার্থিব সকল কিছু তারা পরিত্যাগ করতে চাইত।

বলা হচ্ছে যে, এটি সঠিক কাজ নয়। অবশ্যই পাথেয় সাথে নিয়ে যেতে হবে। এটি না নেওয়ায় কোন বাড়তি উপকার নেই। বরং এর ফলে দৈহিক থেকে শুরু করে নানাবিধ সমস্যার মুখোমুখী হতে হবে যা উপাসনার মূল উদ্দেশ্যকেই ব্যাহত করবে।

'পাথেয়' বিষয়টির আরও একটি দিক আছে। সঠিক পাথেয় হচ্ছে পরকালের জন্য এমন কিছু সঙ্গে নিয়ে যাওয়া যা ভবিষ্যৎ জীবনে উপকারে আসবে। সঠিক পাথেয় হচ্ছে জীবনকে সুন্দর ও পবিত্র করে গড়ে তোলা। সে কারণে আল্লাহকে ভয় করা। যে আল্লাহকে সত্যিকার অর্থে ভয় করবে সে ভাল পথে চলবে। এ দুনিয়ায় করা ভাল কাজই সত্যিকার অর্থে পরকালের মঙ্গলময় জীবনের পাথেয়।

'নিঃসন্দেহে সর্বোত্তম পাথেয় হচ্ছে মন্দ কর্ম/পথ থেকে নিজেকে রক্ষা করে চলা।' পরকালের জন্য উত্তম পাথেয় নিয়ে যাওয়ার অন্যতম উপায় হচ্ছে মন্দ কাজ পরিহার করে চলা। যে আল্লাহকে ভয় করবে সে মন্দ কাজ করতে পারবে না। সে আল্লাহর নির্দেশ মেনে চলবে।

আল্লাহর নির্দেশ মেনে চলার অপর অর্থই হচ্ছে, যে কোন প্রকার খারাপ কাজ থেকে বিরত থাকা। কেননা আল্লাহ কখনই মন্দ কাজের আদেশ দেন না। মন্দ কাজ থেকে নিজেকে বিরত রাখা বা রক্ষা করে চলাই হচ্ছে আল্লাহর প্রতি সবচেয়ে বড় কর্তব্য পালন করা। কেননা এর নানাবিধ বাস্তব সুফলও আছে। যারা মন্দ কাজ করে না তারা পার্থিব বা বাস্তব জীবনের জন্য কোন সমস্যা হয়ে দাড়ায় না। ভাল কাজ করা সম্ভব না হলেও অন্তত মন্দ কাজ না করলে বিপদের আশংকা থাকে না। জীবন ও জগতকে সুখময় করে গড়ে তুলতে সেটিও ভূমিকা রাখে।

একটি ভাল কাজ একটি মূল্য সংযোজন করে। একটি মন্দ কাজ একটি মূল্যকে কর্তন করে। নিচে নামিয়ে দেয়। নেগেটিভ রেজাল্ট দেয়। ভাল কাজ করতে না পারলে মূল্য সংযোজন হয় না। কিন্তু মন্দ কাজ না করলে নেগেটিভ রেজাল্টও হবে না। তাই পরকালের পাথেয় নেয়ার ক্ষেত্রে বুদ্ধিসম্মত ও সর্বোত্তম সহজ উপায় হচ্ছে অন্তত মন্দ কর্ম/পথ থেকে নিজেকে রক্ষা করে চলা।

▪ **২.১৯৮** তোমাদের পালনকর্তার অনুগ্রহ অন্বেষন করায় তোমাদের কোন পাপ নেই (ব্যবসার মাধ্যমে)। ... যেভাবে তিনি নির্দেশনা দিয়েছেন সেভাবে তাঁকে স্মরণ কর। যদিও ইতিপূর্বে তোমরা ছিলে পথভ্রান্ত : হজ্বের বিষয়ে আরবদের মাঝে এমন ভূল ধারণা ছিল যে, হজ্বের সময় কোন প্রকার

ব্যাবসা-বাণিজ্য করা করা যাবে না। কেননা এগুলি পার্থিব জীবনের কার্যকলাপ। তারা মনে করত আল্লাহর ধ্যানে মগ্ন হতে হলে পার্থিব সকল কিছু পরিত্যাগ করতে হবে।

কোরআন এ ভূল ধারণা দুর করে দিয়েছে। বলা হচ্ছে যে, যদি কোন খোদাভীরু আল্লাহর বিধান অনুসরণ করে যথাযথভাবে হজ্বব্রত পরিপালন করে, অতঃপর ব্যাবসার মাধ্যমে জীবিকার অন্বেষন করে তবে তাতে কোন পাপ নেই। কেননা সেক্ষেত্রেও সে আল্লাহর অনুগ্রহই অন্বেষন করে।

হজ্বের সমাবেশের নিয়ম পূর্ব থেকে চালু থাকলেও নিয়ম-বিধি পালনের ক্ষেত্রে নানাবিধ বাহুল্য প্রবেশ করেছিল। অপবিত্রতাও ছিল। কখনও নগ্ন হয়েও মানুষ তাওয়াফ করেছে। নিয়ম-বিধি পালনের ক্ষেত্রে মানুষ পথভ্রান্ত হয়েছিল। তাই বলা হয়েছে ইতিপূর্বে তোমরা ছিলে পথভ্রান্ত।

দেহ-মনে পবিত্র হয়ে আল্লাহ যেভাবে নির্দেশনা দিয়েছেন সেভাবে হজ্বের যাবতীয় কার্যাবলী সম্পন্ন করতে বলা হয়েছে এবং আল্লাহকে অধিক পরিমাণে স্মরণ করার জন্য বলা হয়েছে।

▪ **২.১৯৯** অতঃপর তাওয়াফের জন্য দ্রুতগতিতে সেখান থেকে ফিরে আস, যেখান থেকে সবাই ফিরে। আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা কর। নিশ্চয়ই! আল্লাহ ক্ষমাকারী, করুণাময় : হজ্বের নিয়মানুসারে তীর্থযাত্রীরা সাধারণত জ্বিলহাজ্ব মাসের ৯ তারিখে মক্কা থেকে আরাফাতের উদ্দেশ্যে যাত্রা শুরু করত। এ নিয়ম হযরত ইব্রাহীম (আঃ) ও হযরত ইসমাইল এর সময় থেকেই চলে আসছিল এবং সেখান থেকে ১০ তারিখ ভোরে মুজদালিফা ফিরে আসত।

উল্লেখ্য যে, কুরাইশ বংশের লোকেরা পবিত্র মক্কা নগরীতে বসবাস করত। নিজেদেরকে তারা অপরাপরদের থেকে আভিজাত শ্রেণী বলে মনে করত। তারা সাধারণ আরবদের সাথে একই সাথে আরাফাত যাত্রাকে তাদের আভিজাত্যের সাথে যায় না বলে মনে করত। ফলে তারা কিছু সময়ের জন্য মুজদালিফায় যাত্রা বিরতি করত এবং সাধারণ আরবদের চলে যাবার সুযোগ করে দিত।

পরবর্তীতে দেখা যায় কুরাইশ বংশের সাথে যাদের আত্মীয়তার সম্পর্ক কিংবা উষ্ণ সম্পর্ক ছিল তারাও এ রীতি অনুসরণ করতে শুরু করে।

এ আয়াতের মাধ্যমে তাদের এ স্বাতন্ত্র ও আভিজাত্য প্রদর্শনের রীতিকে দুর করে দেয়া হয়েছে। বিশেষত কুরাইশ, তাদের আত্মীয়-স্বজন ও তাদের অনুসারী এবং সাধারণ আরবদেরকেও এ নির্দেশনা দেয়া হয়েছে যে, হজ্বের নিয়মাবলী পালনে তারা সকলে একে অপরের সঙ্গী ও সহযাত্রী হবে এবং আভিজাত্য প্রমাণের নিমিত্তে ইব্রাহীম (আঃ) প্রদর্শিত পথের অনুসরণ ভঙ্গের কারণে তারা অল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করবে।

আল্লাহর কাছে অধিক পরিমাণে ক্ষমা প্রার্থনা করার কথা বলা হয়েছে। এটি যেমন হজ্বের ভূল-ক্রুটি মাফ করে দেয়ার জন্য, তেমনি জীবনের সকল গুনাহ মাফ করে দেয়ার জন্যও। তবে একই সাথে কোনরূপ ইচ্ছেকৃত বা জ্ঞানত ভবিষ্যৎ ক্রুটি না করার বিষয়েও অন্তরে সংকল্প থাকতে বা রাখতে হবে।

বলা হচ্ছে, নিশ্চয়ই! আল্লাহ ক্ষমাকারী, করুণাময়। আল্লাহর বিষয়ে কোরআন মানুষকে সর্বদাই আশার আলো দেখিয়েছে। যদিও সত্য হচ্ছে যে, অন্তর থেকে ক্ষমা প্রার্থনা করলে আল্লাহ ক্ষমা করেন। বোধসম্পন্ন মানুষ নিজেকে দিয়েও সেটি উপলব্ধি করতে পারে। তবে ক্ষমার কিছু শর্ত আছে। এতদ্বসত্বেও আল্লাহ সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী সেটিও স্মরণে রাখতে হবে এবং মন থেকে হতাশা দুর করে আশাবাদী হতে হবে [আল্লাহ ও ক্ষমা দ্রষ্টব্য ২.২৬৮.১, ২.২৮৫.৪, ২.২৮৬.৩, ২.২৮৬.৫]।

▪ **২.২০০-২.২০২** হজ্বের যাবতীয় ক্রিয়া সমাপ্ত হলে স্মরণ করবে আল্লাহকে। যেমন করে তোমরা স্মরণ কর নিজেদের পিতা-পিতামহদের কিংবা তার চেয়েও বেশী। মানুষের মধ্যে যারা বলে: ‘হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদেরকে ইহকালেই দান কর।’ বস্তুত তাদের জন্য পরকালে কোন অংশ নেই। তাদের মধ্যে কেউ কেউ বলে: ‘হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদেরকে ইহকালে কল্যাণ দান কর এবং পরকালেও কল্যাণ দান কর এবং আমাদেরকে নরকের আগুন থেকে রক্ষা কর।’ তারা যা অর্জন করেছে তার একটি যথাযথ অংশ তাদের জন্য রক্ষিত আছে : হজ্বের ক্রিয়াদি সমাপ্তের পর মীনায় অবস্থানকালে আরবরা সাধারণত নিজেদের ও পিতা-পিতামহদের গৌরবগাঁথা, সাফল্য ও নানাবিধ অর্জন ইত্যাদি বিষয়ে আলাপ-আলোচনায় মশগুল হত। এখানে তাদেরকে অজ্ঞতার যুগের এসব রীতি পরিত্যাগ করতে বলা হয়েছে। পূর্ব-পুরুষদের

গৌরবগাঁথা নিয়ে আলোচনা না করে তার পরিবর্তে আল্লাহকে অধিক পরিমাণে স্মরণ করতে বলা হয়েছে এবং আল্লাহর মহাত্ম বর্ণনা বা প্রকাশ করতে উদ্বুদ্ধ করা হয়েছে।

আয়াত থেকে নানা প্রকারের প্রার্থনাকারীদের ধরণ বিষয়েও একটি ধারণা পাওয়া যায়। এ ধরণ থেকে মানুষের মানসিকতাও বুঝতে পারা যায়। তবে এ দিক-নির্দেশনা মানুষকে সঠিক কাজ ও পথটিকে বুঝতে সহায়তা করে।

বলা হচ্ছে, মানুষের মধ্যে এমন ধরণের মানুষ আছে যারা প্রার্থনাকালে বলে: 'হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদেরকে ইহকালেই দান কর।' বলা হচ্ছে, আল্লাহর প্রতি যাদের প্রকৃতই ভালবাসা নেই তারাই এভাবে প্রার্থনা করে। ইহজীবনকেই এরা সব মনে করে। এখানেই এরা সব পেতে চায়। বস্তুত এরা সত্যিকারের বিশ্বাসী নয়। তাই আল্লাহও তাদেরকে তাদের চাওয়া মত ইহকালেই সব দান করেন। পরকালে তেমন মানুষদের জন্য কোন অংশ নেই।

এমন মনবৃত্তির মানুষ ইহকালে কোন কিছু পাওয়ার জন্য হেন জঘন্য কাজ নেই যা সে করতে পারে না। এ জীবনই তার কাছে সব। পরকালের বিশ্বাস নিয়ে বস্তুত সে এক লুকোচুরি খেলা খেলে। আল্লাহকে নিয়েও সে লোক দেখান খেলা করে। তাই যারা বলে ইহকালেই দান কর তাদের সম্পর্কে এভাবে বলা হয়েছে।

অপরদিকে কিছু মানুষ আছে যারা বলে, 'হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদেরকে ইহকালে কল্যাণ দান কর এবং পরকালেও কল্যাণ দান কর এবং আমাদেরকে নরকের আগুন থেকে রক্ষা কর।' বস্তুত এরা পরকালে বিশ্বাস করে। নরকের অগ্নিকে ভয় করে এবং সে কারণে ভাল হয়ে চলে। তারা ইহকাল-পরকাল সব কালেই কল্যাণ প্রত্যাশা করে। তারা জানে ও বিশ্বাস করে যে, ইহকাল-পরকাল সকল জগতের কর্তৃত্বই কেবলমাত্র আল্লাহর হাতে। এমন মানুষেরা উদার ও বোধসম্পন্ন হয়ে থাকে।

বলা হচ্ছে, এ ধরণের মানুষ পার্থিব জীবনে ভাল যা কিছু অর্জন করেছে তার একটি যথাযথ অংশ তাদের জন্য রক্ষিত আছে। আল্লাহ প্রদত্ত আশার বাণী বিশ্বাসী ও সঠিক মানসিকতাসম্পন্ন মানুষদেরকে অধিকতর ভাল কাজে অনুপ্রাণীত করে। ধর্মীয় সকল বিধি-বিধানের মূল লক্ষ্য বস্তুত এমন

মানসিকতাসম্পন্ন মানুষদের দ্বারাই অর্জিত হয়ে থাকে। তাদের জন্যই পুরস্কারের প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়েছে।

▪ **২.২০২** আল্লাহ দ্রুত হিসেব নিষ্পন্নকারী : আল্লাহ হচ্ছেন দ্রুত হিসেব নিষ্পন্নকারী। কিন্তু আল্লাহ কত দ্রুত হিসেব নিষ্পন্ন করেন মানুষের জন্য সেটি ধারণার মধ্যেও আনা সম্ভব নয় [আল্লাহ দ্রষ্টব্য ২.২০.২]। যদিও বিষয়টি যে যুগে বা সময়ে বলা হয়েছে তখন সেটি কল্পনা করাও কষ্টসাধ্য ছিল।

কিভাবে আল্লাহ একজন মানুষের অতঃপর সমগ্র মানবজাতির হিসেব দ্রুত নিষ্পন্ন করে ফেলবেন? বিজ্ঞানের কল্যাণে আজ বিষয়গুলি কিছুটা আঁচ করা সম্ভব হচ্ছে। নিজেরাই দেখতে পাচ্ছি যে কম্পিউটার কত দ্রুত সকল হিসেব সম্পন্ন করে ফেলে! তাই আল্লাহ বলেছেন যে, মানুষকে তিনি তাঁর নিদর্শন প্রদর্শন করবেন যেন মানুষ বুঝতে পারে যে কোরআন প্রদত্ত বার্তা সত্য। যেমন বলা হয়েছে,

"আমি তাদেরকে আমার নিদর্শনাবলী প্রদর্শন করব, বিশ্বজগতে এবং তাদের নিজেদের মধ্যে, যতক্ষণ পর্যন্ত না এটি তাদের কাছে সুস্পষ্ট হয় যে এটিই (কোরআন প্রদত্ত বার্তা) সত্য।" (আল-কোরআন ৪১:৫৩)

বস্তুত আল্লাহকে মানুষ সঠিকভাবে চিনতে, জানতে ও বুঝতে পারেনি এবং পারেও না। আল্লাহর ক্ষমতা অসীম। তার বৃহত্ব ও ক্ষুদ্রত্ব মানুষের কল্পনারও অতীত। মানুষ কেবল ততটুকু বুঝতে পারে যতটুকু তিনি অনুমোদন করেন।

আল্লাহ মানুষকে ভাল কাজের জন্য পুরস্কার ও মন্দ কাজের জন্য শাস্তি দেবেন। এটি মানুষের জন্য একটি সতর্কবার্তা। আবার একই সাথে আশার আলো জাগানিয়া বার্তা। যারা মন্দ কাজ করবে তারা যেন জানে যে তাদের কর্মের মন্দ ফলাফল প্রাপ্তি খুব বেশী দূরে নয়। যেন তারা সতর্ক হয় ও ভূল পথ পরিত্যাগ করে ভাল পথে দ্রুত ফিরে আসে। অপরদিকে যারা ভাল কাজ করবে তাদের ভেতরে আশা জাগায় যে দ্রুতই তারা তাদের ভাল কাজের ফলাফল প্রাপ্ত হবে। তারা স্বল্প সময়ের পরিসরে অধিক ভাল কাজে আগ্রহী হয়। কোরআনের প্রতিটি বার্তা প্রতিটি শব্দের গুরুত্ব যথাযথভাবে অনুধাবন করতে পারাও একজন মানুষের বোধের মানকে প্রকাশ করে।

■ **২.২০৩.১** নির্দিষ্ট সংখ্যক দিনগুলিতে আল্লাহকে স্মরণ কর। যে তাড়াহুড়ো করে দু'দিনের মধ্যে চলে যাবে তার জন্য কোন পাপ নেই এবং যে বিলম্ব করবে তার জন্যও কোন পাপ নেই, এটি তাদের জন্য যারা মন্দ কর্ম/পথ থেকে নিজেদের রক্ষা করে চলে : 'তাওয়াফের জন্য দ্রুতগতিতে সেখান থেকে ফিরে আস যেখান থেকে সবাই ফিরে (দ্রষ্টব্য ২:১৯৯)।' এর অর্থ এই যে, মীনায় কতদিন অবস্থান করা হল বা মীনা থেকে কত দ্রুত কিংবা কত বিলম্বে মক্কায় ফেরত যাওয়া হল সেটি আসল বিষয় নয়। আসল বিষয় হচ্ছে, আল্লাহর সাথে সম্পর্ক সৃষ্টিতে ঐ দিনগুলি কিভাবে অতিবাহিত করা হল এবং সফলতার সাথে এ সম্পর্ক সৃষ্টি করতে পারায় অন্তরে কতটা সুখ বা আনন্দ অনুভূত হল সেটি।

যারা ভাল কাজ করে বা অপর অর্থে মন্দ কর্ম ও পথ থেকে নিজেদেরকে রক্ষা করে চলে তারা কত দ্রুত কিংবা কত বিলম্বে মক্কায় ফেরত গেল এটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নয়। ভাল কাজের যথাযথ প্রাপ্য সকলেই পাবে। 'উত্তম কর্ম সম্পন্নকারীদের জন্য নিয়মে কোন কঠোরতা ও জটিলতা নেই। বরং সহজতা আছে ও থাকে'। এক্ষেত্রে এটিও একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক-নির্দেশনা যা শাশ্বত ও সার্বজনীন।

■ **২.২০৩.২** আল্লাহর প্রতি তোমাদের কর্তব্য পালন কর এবং জেনে রেখ, তাঁর কাছেই তোমাদেরকে সমবেত হতে হবে : অত্যান্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি বাণী এটি। শাশ্বত ও সার্বজনীন। যদিও সুনির্দিষ্টভাবে হজ্বের প্রসঙ্গে এখানে বিষয়টি উল্লেখ করা হয়েছে, তথাপি এটি সকল সময়ে সকল মানুষের জন্য স্মরণে রাখার মতো একটি বাণী।

উল্লেখ্য যে, পার্থিব জীবনে মানুষের জন্য চিত্ত বিনোদনের প্রয়োজন আছে। সেটি প্রয়োজন মানুষের কর্তব্য কর্ম পালন করতে গিয়ে একটুখানি স্বস্তির জন্য। যেন পুর্ণোদ্যমে পুনরায় কর্তব্য কর্ম যথাযথভাবে পালন করতে পারে। কিন্তু এ জগতে চিত্ত বিনোদনটাই মানুষের আসল কাজ না। জীবনের সত্যিকারের কাজ হচ্ছে আল্লাহর প্রতি কর্তব্য পালন করা।

বস্তুত এ জগতে মানুষের আসলে করণীয় কি? এটি মানুষকেই খুঁজে বের করতে হবে। মানুষের কর্তব্য বা করণীয় যেমন ব্যাক্তিক পর্যায়ে আছে তেমনি

আছে সামষ্ঠিক পর্যায়েও। ব্যাক্তিক পর্যায়ে ব্যাক্তিকেই বুঝতে হবে তার করণীয় কি? কিসের জন্য সে যথাযথ বা উপযুক্ত।

আবার ব্যাক্তিক-সামষ্ঠিক সব পর্যায়েই মানুষের কর্তব্য আছে তার পরিবারের প্রতি, মাতা-পিতার প্রতি, সন্তানের প্রতি, আত্মীয়-স্বজনের প্রতি, পাড়া প্রতিবেশীর প্রতি, সমাজের প্রতি। তেমনি যিনি তাকে সৃষ্টি করেছেন তাঁর প্রতিও মানুষের দায়িত্ব ও কর্তব্য আছে। সেটিও যথাযথভাবে পালন করার কথা বলা হয়েছে।

অপরাপর যেসব দায়িত্বের কথা ওপরে উল্লেখ করা হয়েছে সেগুলিও এক অর্থে আল্লাহর প্রতিই পালিত দায়িত্ব। কেননা সকল পালিত দায়িত্ব কার্যকারণের সম্পর্কে সম্পর্কিত এবং সব মিলে মূল লক্ষ্যকে অর্জনে ব্যাপৃত। আর সে লক্ষ্য হচ্ছে 'এক আল্লাহ'! জগতে কৃত সকল ভাল কাজই আল্লাহর প্রতি পালন করা দায়িত্ব ও কর্তব্য। যা সৃষ্টি রক্ষার কাজে নিয়োজিত।

মানুষ তার পরিবারের প্রতি, মাতা-পিতার প্রতি, সন্তানের প্রতি, আত্মীয়-স্বজনের প্রতি, পাড়া প্রতিবেশীর প্রতি, সমাজের প্রতি দায়িত্ব পালন করে। পালিত দায়িত্ব উল্লেখিতদেরকে সহযোগীতা করে বা উপকৃত করে। কিন্তু আল্লাহকে কিভাবে উপকৃত বা সহযোগীতা করা সম্ভব যা দ্বারা তাঁর প্রতি দায়িত্ব ও কর্তব্য পালন করা সম্ভব হবে?

জীবন, জগত, পরিবেশ, প্রকৃতির কল্যাণ সাধন করাই আল্লাহর প্রতি কর্তব্য পালন করা। এগুলি সৃষ্টিকে যথাযথভাবে ধরে রাখে এবং তার পরিচালনাকে সহায়তা করে। বিষয়গুলি এভাবে বুঝতে হবে এবং মানুষকে সে জ্ঞানে জ্ঞানান্বিত হতে হবে। কিন্তু সকলেই তেমন হবে না বা হতেও পারবে না। তাই আল্লাহ কিছু নির্দেশনা দিয়েছেন যেসব পরিপালন করাও কর্তব্য। কেননা সেগুলি বিশ্বাস করলে এবং পালন করলে উল্লেখিত লক্ষ্যসমুহ তথা মূল লক্ষ্য অর্জনকে সেটি সহায়তা করবে। বলা যায় সূত্রের মতো কাজ করবে।

আল্লাহ যেসব নির্দেশ করেছেন সেসব যথাযথভাবে পালন করা তাঁর প্রতি কর্তব্য পালন করা। অতএব নামাজ, রোযা, হজ্ব, যাকাত এসবের যথাযথ পরিপালন তাঁর প্রতি কর্তব্য পালন করা। কিন্তু একটি বিষয় বুঝতে হবে যে এসবগুলি পালন করার পেছনেও কারণ নিহিত আছে। সে কারণ যদি অর্জিত না হয় তবে সে কর্তব্য পালন যথাযথ হবে না। কোন কাজ করার উদ্দেশ্যই

যদি অর্জিত না হয় তবে পালনকৃত কাজটি বৃথা। অতএব যেসব মন্দ কাজ এর পাশাপাশি না করতে বলা হয়েছে সেসবও যথাযথভাবে মেনে চলতে হবে। তবেই আল্লাহর প্রতি কর্তব্য পালন স্বার্থক হবে। উপাসনা নিয়ম মতো পালন করলাম আবার সকল প্রকার খারাপ কাজ করলাম এটি কর্তব্য পালন নয়। কিন্তু মানুষের মন সেদিকেও টানে। সে কথা কোরআনেও বলা হয়েছে।

"মন্দ ও ভাল সমান নয়, যদিও অসংখ্য মন্দ তোমাকে আকর্ষণ করে। অতএব হে, বুঝ সম্পন্ন মানুষ! আল্লাহর প্রতি তোমাদের কর্তব্য পালনে মনযোগী হও যেন তোমরা সফলকাম হতে পার।" (আল-কোরআন ৫:১০০)

অনেক মন্দ কাজও মানুষকে আকর্ষন করে। এ কথা অস্বীকার করার উপায় নেই। মানুষ নিজেকে দিয়েই সেসব বোঝে। তাই মন্দ কাজ থেকে মানুষকে বিরত রাখতে কিছু উপায় অবলম্বন করার প্রয়োজন হয়। আর সেজন্যই কিছু না দেখা বিষয়ে বিশ্বাস রাখতে হয়।

শেষাংশে তাই স্মরণ করিয়ে দেয়া হয়েছে যে, 'তাঁর কাছেই তোমাদেরকে সমবেত হতে হবে।' এ কথার প্রকৃত অর্থ হচ্ছে, তিনি প্রত্যেকের প্রতিটি কর্মের হিসেব নেবেন। তাঁর হিসেব অনেক সূক্ষ্ম। বিচার করবেন ভাল ও মন্দ কর্মের ভিত্তিতে। অতএব মানুষ যেন আল্লাহর প্রতি কর্তব্যপরায়ন হয়। পুরস্কারের প্রত্যাশা ও শাস্তির ভয় দু'টোই মানুষকে সুপথে চলতে অনুপ্রাণীত করে।

মানুষ আল্লাহর প্রতি কর্তব্যপরায়ন হলে আল্লাহ অনেক উপকৃত হবেন বিষয়টি তেমন নয়। আবার আল্লাহর প্রতি কর্তব্য পালন না করলে আল্লাহর অনেক ক্ষতি হয়ে যাবে তেমনও নয়। সৃষ্টির সূত্রগুলি এমন যে, আল্লাহর প্রতি কর্তব্য পালন করলেই এ জীবন ও জগত প্রশান্তিময় হবে। কেন হবে?

হবে এজন্য যে সূত্র সামগ্রীক বিষয়গুলিকে সে পথে চালনা করবে। ঠিক যেমন নিজ প্রয়োজনে গাছ কার্বন-ডাই-অক্সাইড গ্রহণ করে এবং অক্সিজেন ছাড়ে তাতেই মানবকুল উপকৃত হয়ে যায়। তেমনই স্রষ্টার সকল সৃষ্টির সূত্র। আল্লাহতে ভয় এবং তা থেকে তাঁর প্রতি কর্তব্য পালন মানুষ, জীবন ও জগতকে সঠিক পথে চালনা করবে। সৃষ্টিকে রক্ষা করবে। তাই বিশ্বাসের গুরুত্ব সর্বপ্রথম। বিশ্বাস ভিন্ন এ জগত অচল! কিন্তু সেটি বুঝতে হলে ভাবনার

অনেক গভীরে প্রবেশ করতে হবে। সবকিছু একটি একটির সাথে এক অর্থে সহজ, আবার এক অর্থে জটিল কার্যকারণের সম্পর্কে সম্পর্কিত।

➢ (আয়াত ২০৪-২১১) বিশ্বাসী ও অবিশ্বাসীদের (Believers and Disbelievers) সম্পর্কে বলা হয়েছে।

২০৪	মানুষের মধ্যে এমন মানুষ আছে যার পার্থিব জীবনের কথা তোমাকে চমৎকৃত করবে। সে নিজের মনের কথা বলতে আল্লাহকেও সাক্ষী রাখে। অথচ প্রকৃতপক্ষে সে অত্যান্ত কঠিন বিরোধীতাকারী। (And of mankind there is he whoso conversation on the life of this world pleaseth thee (Muhammad), and he calleth Allah to witness as to that which is in his heart; yet he is the most rigid of opponents.)
২০৫	যখন সে প্রস্থান করে তখন তার চেষ্টা থাকে অকল্যাণ করা এবং শস্যক্ষেত্র ও গবাদীপশু বিনষ্ট করা। আল্লাহ অশান্তি সৃষ্টিকারীদের পছন্দ করেন না। (And when he turneth away (from thee) his effort in the land is to make mischief therein and to destroy the crops and the cattle; and Allah loveth not mischief.)
২০৬	যখন তাকে বলা হয়: আল্লাহর প্রতি কর্তব্য পালনে সতর্ক হও, তখন অহংকার তাকে পাপের পথে নিয়ে যায়। মূলত সে তার হিসেব এক নিকৃষ্টতর বিশ্রামাগারের জন্যই সম্পন্ন করে। (And when it is said unto him: Be careful of thy duty to Allah, pride taketh him to sin. Hell will settle his account, an evil resting-place.)
২০৭	মানুষের মধ্যে এমন মানুষও আছে যে আল্লাহর সন্তুষ্টিকল্পে নিজের জীবনকেও বিসর্জন দিয়ে দেয়। বান্দাদের প্রতি আল্লাহ অত্যান্ত সদয়। (And of mankind is he who would sell himself, seeking the pleasure of Allah; and Allah hath compassion (sympathy) on (His) bondmen.)
২০৮	হে বিশ্বাসীগন! এসো তোমরা পরিপূর্ণভাবে তাঁর প্রতি সমর্পন কর এবং

	শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ কর না। সে তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু। (O ye who believe! Come, all of you, into submission (unto Him); and follow not the footsteps of the devil. Lo! he is an open enemy for you.)
২০৯	এবং তোমাদের প্রতি পরিস্কার নির্দেশ আসার পরেও যদি তোমরা পদস্খলিত হও, তবে জেনে রেখ আল্লাহ পরাক্রমশালী, বিজ্ঞ। (And if ye slide back after the clear proofs have come unto you, then know that Allah is Mighty, Wise.)
২১০	তারা কেবল এ প্রতিক্ষায় আছে যে, আল্লাহ ফেরেশতাদের সঙ্গে নিয়ে মেঘের আড়াল থেকে তাদের সামনে আসবেন, আর তাতেই সব মীমাংসা হয়ে যাবে। বস্তুত সব কার্যকলাপই আল্লাহর কাছে ফিরে যাবে মীমাংসার জন্য। (Wait they for naught else than that Allah should come unto them in the shadows of the clouds with the angels? Then the case would be already judged. All cases go back to Allah (for judgment).)
২১১	ইসরাইলের সন্তানদের জিজ্ঞেস কর তাদেরকে আমি কত সুস্পষ্ট নির্দশনাবলী প্রদান করেছি! কারও কাছে আল্লাহর অনুগ্রহ আগমনের পর কেউ যদি তা পরিবর্তন করে (তবে জেনে রেখ), শাস্তিদানে আল্লাহ অত্যান্ত কঠোর। (Ask of the Children of Israel how many a clear revelation We gave them! He who altereth the grace of Allah after it hath come unto him (for him), lo! Allah is severe in punishment.)

▪ **২.২০৪-২.২০৯** মানুষের মধ্যে এমন মানুষ আছে যার পার্থিব জীবনের কথা তোমাকে চমৎকৃত করবে। ... অথচ প্রকৃতপক্ষে সে অত্যান্ত কঠিন বিরোধীতাকারী। ... মানুষের মধ্যে এমন মানুষও আছে যে আল্লাহর সন্তুষ্টিকল্পে নিজের জীবনকেও বিসর্জন দিয়ে দেয়। ... তোমরা পরিপূর্ণভাবে তাঁর প্রতি সমর্পন কর এবং শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ কর না। ... জেনে রেখ আল্লাহ পরাক্রমশালী, বিজ্ঞ : উদ্ধৃত অংশে মানুষের দু'টি ধরণ সম্পর্কে

বলা হয়েছে। মানুষের মধ্যে এমন মানুষ আছে যার কথা মানুষকে চমৎকৃত করে। কথা বলার সময় তারা ন্যায়সম্মত কথা বলে। কথায় কথায় আল্লাহকে সাক্ষী রাখে। অতি বিশ্বাসীর রূপ ধারণ করে। অথচ স্বার্থ ক্ষুন্ন হলে নিজেরা ন্যায়সম্মত আচরণের কথা বিবেচনা করে না। নিজের স্বার্থ অক্ষুন্ন রাখতে হেন অপকর্ম নেই যা সে করে না বা করতে পারে না। এরা ভূল পথগামী।

এমন মানুষদেরকে সঠিক পথে ফিরে আসার কথা বললে তারা অহংকার প্রদর্শন করে এবং পাপ কর্মের মাত্রা আরও বাড়িয়ে দেয়। এমনকি মানুষের নিত্য প্রয়োজনীয় ফল-ফসল থেকে শুরু করে পালিত প্রাণীদের ক্ষতি বা ধ্বংস সাধন করতেও কুন্ঠাবোধ করে না। বলা হচ্ছে, এরা প্রকৃত বিশ্বাসী নয়। বিশ্বাসীর আচরণ এমন নয়। আল্লাহতে সত্যিকার বিশ্বাসী একজন প্রকৃতই মানুষ। কখনই অমানুষ নয়। বিশ্বাসী কখনই বিদ্বেষপূর্ণ হয়ে ধ্বংসাত্মক কাজে লিপ্ত হয় না বা হতে পারে না। উল্লেখিত আচরণকারীরা সমাজের অকল্যাণ সাধন করে। অশান্তি সৃষ্টিকারীদের আল্লাহ পছন্দ করেন না।

মানুষের এ ধরণের আচরণ সম্পর্কে জানা থকতে হবে। এমন মানুষদের বিষয়ে সতর্ক থাকতে হবে। এরা সমাজের জন্য ক্ষতিকর। নিজ স্বার্থের কারণে বৃহত্তর মানব কল্যাণকেও এরা বাধা বা ক্ষতিগ্রস্ত করে। এরা বিশ্বাসীর ন্যায় আচরণ প্রদর্শন করলেও বস্তুত এরা আল্লাহর যথাযথ নির্দেশনায় বিশ্বাসী বা সমর্পিত নয়। তেমন মানুষেরা ভাল কাজে অত্যান্ত কঠিন বিরোধীতাকারী। বলা হচ্ছে এদের জন্য রয়েছে কঠোর ফলাফল। এদের কাজ ও আচরণ এদেরকে পার্থিব জীবনেও তেমন ফলাফলের দিকে নিয়ে যায়। এরা নিজেরাই নিজেদেরকে শাস্তির পরিণতির দিকে নিয়ে যায়। উপরন্তু পরকালে তেমন আচরণের মানুষদের জন্য রয়েছে কঠিন শাস্তির প্রতিশ্রুতি।

অপরদিকে মানুষের মধ্যে এমন মানুষও আছে যারা আল্লাহর কারণে অর্থাৎ সত্য ও ন্যায়ের কারণে নিজেদের জীবনকে বিপদাপন্ন করতেও কুন্ঠাবোধ করে না। এমনকি জীবনও বিসর্জন দিয়ে দেয়! তাদের কাছে আল্লাহর নির্দেশ পালনের মাধ্যমে তাঁর সন্তুষ্টি অর্জনটিই বড় বিষয়। এরা আল্লাহতে গভীরভাবে বিশ্বাসী। এদের কর্ম এদেরকে মর্যাদা এনে দেয়। অতঃপর আল্লাহর দিক থেকে রয়েছে পুরস্কারের প্রতিশ্রুতি। মানুষ নিজ থেকে, অন্তর থেকে, সত্যের

উপলব্ধিবোধ থেকে আল্লাহর প্রতি সমর্পনের পথ বেছে নিলে বলা হচ্ছে, বান্দাদের প্রতি আল্লাহ অত্যান্ত সদয়। তিনি যথাযথ প্রতিদান দাতা।

এখানে মানুষের দু'টি ভিন্ন ভিন্ন রূপ বা আচরণের উদাহরণ তুলে ধরা হয়েছে। একটি আচরণ হচ্ছে, আল্লাহতে সমর্পিত আচরণ যা আল্লাহর নির্দেশনা মেনে সঠিক পথে চলে। অপরটি হচ্ছে শয়তানের আচরণ। মানুষকে দু প্রকারের আচরণের পার্থক্য অনুধাবন করে সঠিক পথে চলার আহবান জানান হয়েছে এবং আল্লাহর প্রতি পরিপূর্ণরূপে সমর্পন করতে বলা হয়েছে। আল্লাহতে সমর্পন মানুষকে সঠিক পথে চালনা করে। কেননা আল্লাহ কখনই মন্দ কাজের নির্দেশনা দেন না। মন্দ পথটি হচ্ছে শয়তানের পথ। মানুষের নিজেদের উপকারার্থেই শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ করতে বারণ করা হয়েছে।

'সে তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু' [শয়তান দ্রষ্টব্য ২.১৬৮.২]- শয়তান যে মানুষের শত্রু তা উদ্যানে আদম-হাওয়ার শান্তিপূর্ণ অবস্থান থেকে ধূর্ততার সঙ্গে তাদেরকে বের করে দেয়ার মধ্যেই প্রকাশিত। মানুষকে সে বিপদগ্রস্ত করেছে মানুষের সৃষ্টি লগ্ন থেকেই। এটি গোপন কোন বিষয় নয়। তার শত্রুতা সর্বজনবিদিত তাই প্রকাশিত। শয়তানের প্ররোচনায় প্ররোচিত হলে মানুষ নিজেই নিজেকে বিপদগ্রস্ত করে ফেলবে।

শয়তানের প্ররোচনা সব সময় এমনকি আজও মানুষকে বিপদের মুখোমুখী করে দেবে। সে মানুষের অন্তরকেও মন্দভাবে প্ররোচিত করে। মানুষের মধ্যে কেউ কেউ আছে যারা শয়তানের মতো প্ররোচনা দেয়। তাদের প্ররোচনায় প্ররোচিত হলে আল্লাহর আশীর্বাদ ও করুণা থেকে বঞ্চিত হতে হবে।

পবিত্র কোরআনে পরিস্কার ও যথাযথভাবে সকল নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে। তারপরেও যারা ভূল কাজ করবে বা ভূল পথে চলবে তাদেরকে আল্লাহর শাস্তির মুখোমুখী হতে হবে। আল্লাহ নিজেই মানুষকে এ বিষয়ে স্মরণ ও সতর্ক করে দিচ্ছেন।

আদম (আঃ)-কে পৃথিবীতে প্রেরণের প্রাক্কালে আল্লাহ মানবজাতির জন্য পথ-নির্দেশনা প্রেরণের কথা বলেছেন (দ্রষ্টব্য ২:৩৮)। বলা হয়েছে যারা সে পথ-নির্দেশনা অনুসরণ করে চলবে তারা না ভীত হবে না হবে শঙ্কিত। এভাবেই কার্যকারণ সম্পর্ক স্থাপনের মধ্য দিয়ে সমগ্র দর্শনকে প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। এখন মানুষের কাছে পরিস্কার নির্দেশনা এসে গেছে। কোরআন সে

পথ-নির্দেশনা। এর অনুসরণ করতে বলা হয়েছে। পরিস্কার নির্দেশনা আসার পরও যদি মানুষ আবার শয়তানের প্ররোচনায় পড়ে ও ভূল কাজ করে তবে বলা হচ্ছে আল্লাহ পরাক্রমশালী, বিজ্ঞ। অর্থাৎ তিনি তাঁর জ্ঞান দ্বারা সব অবহিত এবং তিনি যদি কারও জন্য শাস্তি নির্ধারণ করেন তবে তা প্রতিহত করার কেউ নেই। মানুষকে সাবধান করে দেয়া হয়েছে। যেন মানুষ বার্তা বিবেচনায় নিয়ে সঠিক পথে চলে। ভূল ও মন্দ পথ পরিত্যাগ করে।

বিশেষভাবে উল্লেখ্য যে, কোরআনের আয়াতসমূহ অবতীর্ণ হওয়ার পেছনে কিছু ঘটনা বা কারণ আছে যাকে 'শানে-নুযুল' বলা হয়। কোন একটি নির্দিষ্ট ঘটনা বা কারণে কোন বাণী অবতীর্ণ হলেও সে বাণী তেমন একই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে মানুষকে সঠিক পথটি বলে দেয়। একটি যথাযথ দিক-নির্দেশনা দেয়। এসব বাণীর যথাযথ ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ কোরআনের বাণীর শাশ্বততা ও সার্বজনীনতাকে তুলে ধরে। অতীতের সেসব ঘটনা বা পরিস্থিতি বর্তমানে বিদ্যমান না থাকলেও সেখান থেকে শিক্ষনীয় আছে। কিন্তু সে শিক্ষাটিকে যথাযথভাবে বুঝতে হবে। আর সে বোঝার বিষয়টি মানুষের নিজেদেরকেই করতে হবে। এখানেও ভূল করলে ভূলের মাশুল গুনতে হবে।

▪ **২.২১০** তারা কেবল এ প্রতিক্ষায় আছে যে, আল্লাহ ফেরেশতাদের সঙ্গে নিয়ে মেঘের আড়াল থেকে তাদের সামনে আসবেন আর তাতেই সব মীমাংসা হয়ে যাবে। বস্তুত সব কার্যকলাপই আল্লাহর কাছে ফিরে যাবে মীমাংসার জন্য : ধর্ম ও আল্লাহ সম্পর্কে ভ্রান্ত পথগামী ও অবিশ্বাসীদের কল্পনাপ্রসূত কিছু ভূল ধারণা আছে। এখানে সে বিষয়টি তুলে ধরা হয়েছে। তারা মনে করে যেন আল্লাহ ফেরেশতাদের সঙ্গে নিয়ে মেঘের আড়াল থেকে তাদের কাছে আসবেন এবং সবকিছু মীমাংসা করে দেবেন। তারা সে প্রতিক্ষায় আছে।

বস্তুত এমন ভূল ও উদ্ভট ধারণা থেকে বের হয়ে এসে সত্যের আলোকে সবকিছুর বিচার-বিবেচনা করতে হবে। আল্লাহ কখন আসবেন, কিভাবে আসবেন, আদৌ আসবেন কিনা সে সব নিয়ে ভাববার প্রয়োজন নেই। পরিশেষে মানুষের ভাল-মন্দ সকল কার্যকলাপই আল্লাহর কাছে ফিরে যাবে মীমাংসার জন্য। শুধু এতটুকু বুঝতে পারাই যথেষ্ট। সে জ্ঞানের আলোকে মন্দ

পথ পরিহার করে চলাই উত্তম। সে বিশ্বাস রেখে মন্দ পথ পরিহার করে ভাল পথে চলতে জানলেই মানুষ পথ পাবে।

এ বক্তব্যের আরও একটি দিক আছে। আল্লাহ মানুষকে পৃথিবীতে পাঠিয়েছেন পরীক্ষা করার জন্য। তিনি কিছু সত্যকে মানুষের নিকট থেকে আড়াল করে রেখেছেন। নানান নিদর্শনের মাধ্যমে মানুষকে দিক-নির্দেশনা দিয়ে চলেছেন। মানুষকে যেমন তার নিজের জ্ঞান প্রয়োগ করতে হবে সত্যকে জানতে ও বুঝতে, তেমনি তিনি মানুষকে দিক-নির্দেশনা দিয়েছেন তাঁর বার্তাবাহক প্রেরণ করে ও প্রেরীত গ্রন্থের মাধ্যমে। মানুষকে স্বাধীনতা দিয়েছেন দিক-নির্দেশনায় বিশ্বাস রাখার বা না রাখার। মানুষ বিশ্বাস রেখে সঠিক পথে চলে কিনা তিনি তা দেখেন। এটিই পরীক্ষা।

বলা হচ্ছে, আল্লাহ বা ফেরেশতাগণের আগমনের জন্য অপেক্ষা করার প্রয়োজন নেই। যখন তারা আগমন করবে বা মানুষ যখন সত্যকে দেখবে বা জানতে পারবে, তখন বিশ্বাস স্থাপনের আর কোন মূল্য থাকবে না। অতএব সে সময় আগমনের জন্য অপেক্ষা না করে আল্লাহতে বিশ্বাস রেখে তাঁর নিকট পরিপূর্ণরূপে সমর্পন করতে বলা হয়েছে। কেননা এরপর আগমন করবে বিচার দিবস এবং মানুষ তার কর্ম অনুযায়ী ফল পাবে। শোধরানোর আর সময় পাবে না।

ওপরে যে উদাহরণ তুলে ধরা হয়েছে তার সাথে ইহুদিদের সম্পর্ক আছে। তাদের মধ্যে কেউ তেমন আচরণ করায় এ উদাহরণটি এসেছে। বলা হচ্ছে, মানুষের নিজেকেই ভাল-মন্দ বিচার-বিবেচনা করে বুঝে চলতে হবে। সকলের সব কার্যকলাপই আল্লাহর কাছে ফিরে যাবে মীমাংসার জন্য। ভাল করলে আল্লাহ পুরস্কৃত করবেন, মন্দ করলে শাস্তি দেবেন।

এ বাণীর আরও একটি দিক আছে। পার্থিব জগতে কিছু আছে স্পষ্ট মিথ্যে ও অন্যায়। কিছু কিছু বিতর্কিত বিষয়ও আছে যেখানে উভয় পক্ষই মনে করে যে তারা সঠিক পথে আছে। এমতাবস্থায় জাগতিক বিচারিক রায় কারও পক্ষে গেলে অপরপক্ষ তুষ্ট হতে পারে না। তাদের ভেতরে আক্ষেপ থাকে। তারা শেষ বিচারের অপেক্ষায় থাকে। এভাবে দেখা যাবে যে সব কার্যকলাপই আল্লাহর কাছে ফিরে যাবে মীমাংসার জন্য। সকল ভূক্তভোগীই ন্যায় বিচারের আশায়

আল্লাহর বিচারের প্রত্যাশায় অপক্ষেমান থাকবে। আবার পার্থিব বিচারকও যদি ভূল বা অন্যায় করে তবে সে বিচারের জন্যও আল্লাহরই দ্বারস্ত হতে হবে।

▪ **২.২১১** ইসরাইলের সন্তানদের জিজ্ঞেস কর তাদেরকে আমি কত সুস্পষ্ট নির্দশনাবলী প্রদান করেছি! কারও কাছে আল্লাহর অনুগ্রহ আগমনের পর কেউ যদি তা পরিবর্তন করে (তবে জেনে রেখ), শাস্তিদানে আল্লাহ অত্যান্ত কঠোর : ইতিপূর্বে মানুষের মধ্যে ভাল ও মন্দ আচরণের দু'টি উদাহরণ তুলে ধরা হয়েছে। বস্তুত মানুষের মন্দ হওয়ার কথা না। কেননা আল্লাহ মানুষকে অনুগ্রহ করেছেন। পথ-নির্দেশনা দিয়েছেন। পথ-নির্দেশনা অনুসরণ করে চললে মন্দ পথে যাবার কথা না। মন্দ ফলাফলও পাবার কথা না। তাই মানুষকে আল্লাহতে পরিপূর্ণরূপে সমর্পন করতে বলা হয়েছে।

আল্লাহ ইসরাইল জাতির উদাহরণ তুলে ধরেছেন। তাদের ঘটনা প্রবাহের মধ্যে মানুষের তথা পরবর্তীদের জন্য শিক্ষনীয় আছে। আল্লাহ এ জাতিকে অনেক অনুগ্রহ করেছেন। তাদের মধ্যে নবী প্রেরণ করেছেন, তাদেরকে নেতৃত্ব দানের ক্ষমতা দিয়েছেন, তাদেরকে গ্রন্থ বা পথ-নির্দেশনা প্রদান করেছেন, বহু বিপদাপদ থেকে তাদেরকে উদ্ধার ও রক্ষা করেছেন। তারপরেও তারা ভূল পথে চলার কারণে আল্লাহর রোষানলে পতিত হয়েছে।

আল্লাহ মানুষকে ইসরাইল জাতির উদাহরণ দিয়ে স্মরণ করিয়ে দিচ্ছেন যে, কারও কাছে আল্লাহ তায়ালার অনুগ্রহ আগমন করলে বা আল্লাহ নিজে কাউকে অনুগ্রহ করলে তা ফিরিয়ে দিতে হয়না। তিনি যখন কারও প্রতি অনুগ্রহ করেন সেটি করেন পছন্দ করে বা বাছাই করে। তা ফিরিয়ে দেয়ার অর্থ হল অহমিকা প্রদর্শন করা। আল্লাহর অনুগ্রহকে অস্বীকার করা। যা আল্লাহর রোষ সৃষ্টির কারণ।

এর আরও অর্থ আছে। যেমন এটি প্রমাণ করে যে, তেমন ব্যাক্তি বা জাতি নিজেরাও তাদের প্রাপ্ত অনুগ্রহের বিষয়ে ওয়াকিবহাল বা সচেতন নয় কিংবা উদাসীন। কেউ যদি আল্লাহর অনুগ্রহ কামনা করে অথচ প্রাপ্ত অনুগ্রহের বিষয়ে উদাসীন থাকে তবে সেটিও এক প্রকার অন্যায় বলা যেতে পারে। এটি অনুগ্রহ প্রাপ্তির বিষয়ে তাদের অনুপযুক্ততাও প্রকাশ করে। নিজেকে কোন বিষয়ে অনুপযুক্ত রেখে অনুগ্রহ কামনা করাও এক প্রকারের ভূল। এটি প্রমাণ

করে যে, সে নিজেকেই নিজে চিনতে ও জানতে শেখেনি। তেমন মানুষ বা জাতি আল্লাহ প্রদত্ত অনুগ্রহের ভারও সইতে পারবে না।

যে উদাসীন বস্তুত সে সচেতন নয়। দায়িত্ব পালনেও উপযুক্ত নয়। সে নিজেকে পরিপূর্ণরূপে যোগ্য করে গড়ে তুলতে পারেনি। যোগ্য না হয়ে কোন কিছু কামনা করা সঠিক কাজ নয়। যথা সময়ে নিজেকে যথোপযুক্ত করে গড়ে তুলতে হবে। সেটি না করা বা করতে না পারাও যথাযথ আচরণ নয়।

ফলে কারও কাছে আল্লাহর অনুগ্রহ আগমনের পর কেউ যদি তা পরিবর্তন করে বা তার যথাযথ ব্যাবহার না করে তবে সে অজ্ঞতা, অযোগ্যতা, কর্তব্য পালনে অবহেলা, উদাসীনতা, সময় ও শ্রমের অপচয় করা ইত্যাদি নানান দোষে দুষ্ট হয়ে যায়। সে শাস্তি তথা পরিণতি ভোগের যোগ্য হয়ে যায়।

আল্লাহ নির্ভূল সিদ্ধান্ত নেন। তিনি যদি কাউকে তাদের ভূল কর্ম ও আচরণের কারণে শাস্তি দিতে চান তবে সেটি অবধারিত। বলা হচ্ছে, শাস্তিদানে আল্লাহ অত্যান্ত কঠোর [শাস্তি দ্রষ্টব্য ২.৩০]। বিষয়টি মানুষকে আল্লাহ প্রকাশ্যে জানিয়ে দিয়েছেন। অতএব যার ইচ্ছে সে এ বিষয়ে সতর্ক হবে।

আল্লাহ পরকালে মানুষকে শাস্তি দিতে পারেন। তিনি ইহকালে শাস্তি দিতে পারেন। তিনি শারীরিক শাস্তি দিতে পারেন, তিনি মানসিক শাস্তি দিতে পারেন। তিনি স্বল্পমেয়াদী শাস্তি দিতে পারেন। তিনি দীর্ঘমেয়াদী শাস্তি দিতে পারেন। তিনি ওপর থেকে শাস্তি দিতে পারেন। তিনি নিচ থেকে শাস্তি দিতে পারেন। তিনি একের মাধ্যমে অপরকে শাস্তি দিতে পারেন। তার প্রদত্ত শাস্তির বর্ণনাও কোরআনে নানাভাবে বিবৃত হয়েছে।

উল্লেখ্য যে, আল্লাহ প্রদত্ত শাস্তিও প্রকৃত অর্থে কোন শাস্তি নয়। এটি মানুষকে যথাযথ পথে ফিরিয়ে আনার একটি কঠোর উপায় বা পদক্ষেপস্বরূপ। আল্লাহ প্রদত্ত শাস্তিও মানুষের প্রতি তাঁর করুণা বা এক প্রকারের অনুগ্রহ। তাকে সঠিক পথে ফিরিয়ে আনার জন্য। উপযুক্ত করে গড়ে তোলার জন্য। তাই তিনি পরম করুণাময়, দয়াময়! বলা হচ্ছে,

“মানুষের নিজ হাতে করা মন্দ কর্মের কারণে স্থলে ও জলে বিপর্যয় ছড়িয়ে পড়েছে। তারা যা করেছে, তার আংশিক ফল আল্লাহ তাদেরকে তাদের কর্মের

শাস্তিস্বরূপ আস্বাদন করাতে চান যেন তারা সঠিক পথে ফিরে আসে।” (আল-কোরআন ৩০:৪১)

ওপরে মানুষের ভাল ও মন্দ অচরণের উদাহরণ তুলে ধরা হয়েছে। আল্লাহ মানুষের জন্য সুসংবাদবাহক ও সতর্ককারীরূপে বার্তাবাহক প্রেরণ করেছেন। চলার পথের দিক-নির্দেশনাস্বরূপ গ্রন্থ আল-কোরআন প্রদান করেছেন। তিনি মানুষকে ভাল ও মন্দ পৃথক পৃথক দু'টি পথ প্রদর্শন করেছেন। ভাল-মন্দের ফলাফল বিষয়ে সতর্ক করেছেন। এ সবই মানুষের প্রতি আল্লাহর অনুগ্রহ যা মানুষকে সমুহ ভবিষ্যৎ বিপদ থেকে রক্ষা করবে।

আল্লাহর এত অনুগ্রহ প্রাপ্তির পরেও যারা তা অগ্রাহ্য করবে এবং ভূল কাজ করবে বা ভূল পথে চলবে তারা অনুগ্রহ প্রাপ্তির পরেও শাস্তিযোগ্য হয়ে যেতে পারে। এখানে সে সতর্ক বাণী উচ্চারণ করা হয়েছে।

আল্লাহ যখন কোন সিদ্ধান্ত নেন বা দেন তিনি তা সার্বিক পরিস্থিতি বিবেচনা করে সৃষ্টির মঙ্গলার্থে দেন। সেক্ষেত্রে ঝুঁকি থাকলেও সে ঝুঁকি মানুষকে নিতে হয় বা হবে। এ জগতে সেটিই মানুষের সর্বোচ্চ পর্যায়ের করণীয়। অন্যথায় এ জীবন কেন?

জীবনটা যতটা না মানুষের নিজের জন্য, তার চেয়েও বেশী তার সৃষ্টিকর্তার জন্য। কেননা তিনিই সৃষ্টি করেছেন। আল্লাহর কারণে ঝুঁকি না নেয়ার অর্থ হল তাঁর প্রতি আস্থা ও বিশ্বাসে ঘাটতি থাকা। উপরন্তু বিশ্বাসী জানে যে আল্লাহই একমাত্র রক্ষাকর্তা। বিষয়টি সে বিশ্বাসেও ঘাটতি থাকাকে প্রকাশ করে। এছাড়াও একদিন সকলকেই মৃত্যুবরণ করতে হবে সে সত্যকেও এ আচরণ ভূলে যাওয়া বা অস্বীকার করাকে বোঝায়। অথচ আল্লাহর কারণে মৃত্যুবরণ করা হচ্ছে সবচেয়ে মর্যাদার! যেমন গীতায় বলা হয়েছে,

“ভগবান বলেন: হে প্রিয় অর্জুন! কিরূপে তোমার মধ্যে এমন অশুদ্ধতা (মৃত্যুভয়) প্রবেশ করল? যারা জীবনের প্রকৃত মূল্য বোঝে তাদের জন্য এমন আচরণ আদৌ যথাযথ নয়। এমন মনোভাব তোমাকে স্বর্গলোকে উন্নীত করবে না; বরং তোমার সুনাম ক্ষুন্ন করবে।

হে পার্থ! এমন দুর্বল বা নিচু পর্যায়ের চিন্তার উদ্ভব কর না। এটি তোমার জন্য শোভনীয় নয়। হে পরন্তপ! অন্তরের দুর্বলতাকে জয় কর; জেগে ওঠ!

যে জন্ম নিয়েছে মৃত্যু তার জন্য সুনিশ্চিত ... অতএব কর্তব্য পালনকালে শোকাবহ হওয়া উচিত নয়।” (গীতা ২:২-৩, ২৭)

আল্লাহ প্রদত্ত নির্দেশনা পরিপালন করা হচ্ছে পার্থিব জীবনে মানুষের জন্য সর্বোচ্চ করণীয়। তেমন ক্ষেত্রে ভীত না হওয়া, দোদুল্যমান না থাকা কিংবা দুর্বলতা প্রদর্শন না করতে অনুপ্রাণীত করা হয়েছে।

মিশরে ইসরাইল জাতি ভীষনভাবে অত্যাচারিত হয়েছিল। তারা সে সময়ে আল্লাহর অনুগ্রহ কামনা করত। আল্লাহ তাদের প্রার্থনা শ্রবন করেন। তাদের প্রতি দয়াপ্রবন হন। তাদের প্রতি তাঁর অনুগ্রহ বর্ষন করেন। তাদেরকে তিনি মিশরের ফেরাউনের অত্যাচারের হাত থেকে উদ্ধার করে আনেন।

মরুর বুকে অবস্থানরত ইসরাইল জাতিকে আল্লাহ তাদের নিজ ভূমি কানানে প্রবেশ করার জন্য নির্দেশনা দেন। কিন্তু কিছু সংখ্যক ব্যাতিত তাদের সবাই সে নির্দেশ পালনে অনীহা প্রকাশ করে। তারা যুদ্ধকে ভয় করতে শুরু করে। তাদের মধ্যে মৃত্যুভয় প্রবেশ করে। আল্লাহর আদেশ অমান্যকারী নেতৃস্থানীয় ব্যাক্তিবর্গ ইসরাইল জাতির মনবল ভেঙ্গে দেয়। আল্লাহর আদেশের মধ্যে যে এক প্রাণবন্ততা থাকে আদেশ অমান্যকরণ তাদের সে প্রাণবন্ততাকে ধ্বংস করে দেয়।

বলা হচ্ছে, ‘কারও প্রতি আল্লাহর অনুগ্রহ আগমনের পর কেউ যদি তা পরিবর্তন করে (তবে জেনে রেখ), শাস্তিদানে আল্লাহ অত্যান্ত কঠোর।’ আল্লাহর আদেশ অমান্য করার শাস্তি ইসরাইল জাতি পেয়েছে এবং আজও তা বহন করে চলেছে। আল্লাহর আদেশ সত্বেও তারা কানান প্রবেশে অস্বীকার করেছিল। অতঃপর তাদেরকে সুদীর্ঘ চল্লিশ বছর মরুর বুকে উদভ্রান্তের মতো ঘুরে বেরাতে হয়েছে। শাস্তিদানে আল্লাহ অত্যান্ত কঠোর।

যুদ্ধ কিংবা মৃত্যুভয়ে যে প্রজন্ম কানান দখল করতে অস্বীকার করেছিল, অতঃপর মরুর বুকেই তারা মৃত্যুবরণ করে। যে মৃত্যুকে তারা ভয় করেছিল সে মৃত্যু তাদেরকে গ্রাস করেছেই। যে প্রজন্মকে তারা রক্ষা করবে বলে যুদ্ধে

যেতে অস্বীকার করেছিল পরবর্তীতে সে প্রজন্মই কানান দখল করেছিল মৃত্যুর ঝুঁকি নিয়ে। বস্তুত রক্ষাকর্তা একমাত্র আল্লাহ!

আজও তারা ফিলিস্তিনের গাজা, আসদদ, আসকেল দখল করতে পারেনি। অথচ আল্লাহ যখন যেভাবে আদেশ দিয়েছিলেন সে নির্দেশনা মোতাবেক কাজ করলে তারা সফল হত।

ইসরাইল জাতিকে আল্লাহ যখন কানান জয় করতে নির্দেশনা দিয়েছিলেন সেটি ছিল আল্লাহর আশীর্বাদ বা অনুগ্রহস্বরূপ। তিনি তাদের সাথে ছিলেন। কিন্তু তারা তা করতে অস্বীকৃতি জ্ঞাপনের পর আল্লাহ মুসা (আঃ)-এর মাধ্যমে তাদেরকে জানিয়ে দেন যে, তিনি আর এ জাতির সাথে নেই। বিষয়টি বাইবেলে উদ্ধৃত হয়েছে। আল্লাহর আদেশ অমান্যের পরিণতি ভয়াবহ!

এটি কেবল একটি উদাহরণ। আল্লাহর অনুগ্রহ যেমন জাতি, গোষ্ঠী, দলের বা বৃহৎ মানবগোষ্ঠীর প্রতি হতে পারে তেমনি হতে পারে ব্যাক্তিক পর্যায়েও। মানুষকে তাই উদাসীন হলে চলবে না। আল্লাহর অনুগ্রহ অগ্রাহ্য করাও চলবে না। তাহলে শাস্তিস্বরূপ সমুহ বিপদ নেমে আসতে পারে যা সম্পূর্ণই আল্লাহর বিবেচনার অধীন।

এক সময়ে মুসলিমদের নেতৃত্বদানকারী ইসরাইল জাতির কার্যকলাপ থেকে বিশ্বাসীদেরকে এখানে শিক্ষা গ্রহণ করতে বলা হয়েছে। ইহুদি জাতির ভূল কর্মকান্ডের কারণে তারা আল্লাহর অনুগ্রহ ও নেতৃত্ব থেকে বঞ্চিত হয়েছে। বিশ্বাসীরা যেন একই কর্ম বা আচরণ না করে এবং বিষয়গুলি স্মরণে রাখে এখানে সে বার্তা রয়েছে। তারাও যেন জানে যে, শাস্তিদানে আল্লাহ অনেক কঠোর এবং আল্লাহর মতো শাস্তি কেউই কখনও কাউকে দিতে পারবে না!

➢ (আয়াত ২১২) বিশ্বাসী ও অবিশ্বাসীদের (Believers and Disbelievers) সম্পর্কে বলা হয়েছে।

২১২	যারা অবিশ্বাস করে তাদের জন্য পার্থিব জীবনকে সুশোভিত করে দেয়া হয়েছে; তারা বিশ্বাসীদের উদ্দেশ্য করে ঠাট্টা-বিদ্রুপ করে। কিন্তু যারা আল্লাহর প্রতি কর্তব্য পালন করে, পুনরুত্থান দিবসে তারা অবিশ্বাসীদের তুলনায় উচ্চ মর্যাদায় থাকবে। আল্লাহ যাকে ইচ্ছে তাকে অপরিমিত

	দান করেন। (Beautified is the life of the world for those who disbelieve; they make a jest of the believers. But those who keep their duty to Allah will be above them on the Day of Resurrection. Allah giveth without stint to whom He will.)

▪ **২.২১২.১** যারা অবিশ্বাস করে তাদের জন্য পার্থিব জীবনকে সুশোভিত করে দেয়া হয়েছে; ... কিন্তু যারা আল্লাহর প্রতি কর্তব্য পালন করে ... উচ্চ মর্যাদায় থাকবে : পার্থিব জীবন এক পরীক্ষা। পূর্বেও উল্লেখ করেছি যে কোরআনের দর্শনের শুরুতেই কিছু বিষয় ধরে নেয়া হয়েছে। তার অন্যতম হচ্ছে যারা এ দর্শনে বিশ্বাস করে তারা অন্যায় করে না বা করতে পারে না। কেননা এ দর্শন অন্যায়কে সমর্থন করে না। এ দর্শন অন্যায় করা থেকে সকলকে বিরত থাকতে বলে। কোরআনে যত দিক-নির্দেশনা আছে সেগুলি এমনভাবে প্রতিষ্ঠিত যে তা বিশ্বাসীকে অন্যায় কাজ করা থেকে বিরত রখবেই। তবে অবশ্যই যদি সে সত্যিকারের বিশ্বাসী হয় [বিশ্বাসী-অবিশ্বাসী দ্রষ্টব্য ২.৬]।

বিশ্বাসীদেরকে ওপরোক্ত সূত্রে ধরে নেয়া হয়েছে। স্বাভাবিকভাবেই অবিশ্বাসীদের ক্ষেত্রে এর বিপরীতটি ধরে নেয়া হয়। তাদের পক্ষে অন্যায় কাজ করা সম্ভব। কেননা তারা পরকালীন বিচার ব্যাবস্থাকে বিশ্বাস করে না। সেভাবেই দর্শন অগ্রসর হয়েছে।

বস্তুত কোন দর্শন প্রতিষ্ঠা করতে হলে কিছু বিষয় এভাবে ধরে নিয়েই এগুতে হয়। এর মানে এই নয় যে বিশ্বাসীদের ভেতরে অন্যায়কারী নেই। যদি থাকে তবে এটিও ধরে নিতে হবে যে সে প্রকৃত বিশ্বাসী নয়। আবার কোরআনের দর্শনে অবিশ্বাসীদের ভেতরেও ন্যায় পথের অনুসারী আছে। অন্যায়কে অপছন্দকারী আছে।

সত্য হচ্ছে, যারা অন্যায়কারী তারাই 'অবিশ্বাসী'। এভাবেই সূত্র প্রতিষ্ঠা পেয়েছে। তাই বলা হয় অবিশ্বাসীরাই অন্যায়কারী (দ্রষ্টব্য আল-কোরআন ২:২৫৪), পথচ্যুত, পথভ্রষ্ট বা ভূল-পথগামী।

অবিশ্বাসীরা এ কারণেই অবিশ্বাসী যে তারা আল্লাহ ও পরকালে বিশ্বাস করে না। তাদের কাছে পার্থিব জীবনই সব। তারা তাতেই ভীষনভাবে আকৃষ্ট। তাই

দর্শনগত দিক থেকেও এ পৃথিবীতে মনের খায়েস মিটিয়ে যে কোন কিছু করায় তাদের কোন প্রতিবন্ধকতা নেই। তারা যা খুশি তাই করতে পারে। যে কোন অন্যায় কাজ করতে পারে। তাদের পরকালের ভয় নেই। বরং যারা তা করবে না তাদের দৃষ্টিতে তারাই ক্ষতিগ্রস্ত। তারা মনে করে বোকারাই ক্ষণস্থায়ী এ এককালীন জীবন যথাযথভাবে ভোগ করতে পারে না।

বিশ্বাসীরা পরকালীন জীবনে বিশ্বাস করে। তারা আল্লাহকে ভয় করে। মনের মধ্যে শেষ বিচার দিবসের আশংকা রাখে। সে কারণে এ জীবনে অনেক ত্যাগ-তিতিক্ষা স্বীকার করে আল্লাহর প্রতি দায়িত্ব ও কর্তব্য পালন করে। অন্যায় কাজ করা থেকে বিরত থাকে। লোভের পেছনে ছুটে না। বিশ্বাসীদের এমন ত্যাগ-তিতিক্ষা দেখে অবিশ্বাসীরা তাদের নিজেদের মধ্যে হাসাহাসি করে। তাদের নিয়ে তারা ঠাট্টা-তামাশা করে। তারা বিশ্বাসীদেরকে বোকা ভাবে।

আল্লাহ বলেন, পুনরুত্থান দিবস সত্য। পুনরুত্থান দিবসে বিশ্বাসীরা উত্তম কর্মের প্রতিদানস্বরূপ অবিশ্বাসীদের তুলনায় উচ্চ মর্যাদায় থাকবে। সেদিন অবিশ্বাসীরাই বোকা প্রতিপন্ন হবে। বিশ্বাসীরাও তাই বিশ্বাস করে। এ বিশ্বাস ও আশাই তাদেরকে মন্দ কাজ করা থেকে বিরত রাখে।

▪ **২.২১২.২** আল্লাহ যাকে ইচ্ছে তাকে অপরিমিত দান করেন : আল্লাহ হচ্ছেন সৃষ্টিকর্তা ও লালন-পালনকর্তা। তিনিই মানুষকে সবকিছু প্রদান করেন। যিনি প্রদান করেন এটি তাঁর ইচ্ছে যে তিনি কাকে কতটুকু দেবেন। তিনি যদি ইচ্ছে করেন কাউকে সীমিত করে দিতে পারেন। আবার অপরিমিত দিতে পারেন। তবে তিনি তাঁর ইচ্ছে অবশ্যই বিবেচনা প্রসূতভাবে ঠিক করেন। সে বিবেচনা একান্তই তাঁর নিজের। আল্লাহ যাকে ইচ্ছে তাকে অপরিমিত দান করেন এবং তিনি সেটি করার সামর্থ ও ক্ষমতা রাখেন। তিনি সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী। আল্লাহ যেমন ভেতর থেকে সহায়তা করেন তেমনি বাহির থেকেও সহায়তা করেন। তিনি সর্বত্র বিরাজমান। বুঝতে হবে যে, আমরা যাকে বাহির বলি সেটিও একটি 'ভেতর' এবং আমরা যাকে ভেতর বলি সেটিও একটি 'বাহির'।

আল্লাহ সম্পর্কিত এমন উত্তম ধারণা কর্মঠ ও পরিশ্রমী মানুষকে আশাবাদী করে তোলে। প্রাণবন্ত করে। স্বতঃস্ফুর্ততা দান করে। কেউ হতাশ হয় না। জন্মের পর নিজের ভাগ্য দেখে কেউ দমেও যায় না। সে বিশ্বাস রাখে যে,

ভাল কাজ ও পরিশ্রম করলে আল্লাহ সব দেখেন। তিনি তার যথাযথ প্রতিদান দাতা। এ আশাবাদ মানুষকে তার কর্মে সফল হতে সহায়তা করে।

সিদ্ধান্ত মানুষের নিজের। এটিই লক্ষ্য বা নিয়ত। মানুষ যখন কিছু করার সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলে বা লক্ষ্য স্থীর করে বা নিয়ত বেধে ফেলে সেটি তার ইচ্ছেতে পরিণত হয়। ইচ্ছে যখন তীব্র হয় মানুষ তখন চেষ্টা করে। মানুষ যখন চেষ্টা করে তখন বিষয়টি ভেতরে আল্লাহর অনুমোদন পায়। আল্লাহর অনুমোদন পেলে তাঁর সহায়তা নেমে আসে। সকল রসায়ন একসাথে হয়ে কাজ করে। অচল দেহও সচল ও উজ্জীবিত হয়ে ওঠে। যেমন শুষ্ক মাটিও শস্য-শ্যামল হয়ে ওঠে তার আশীর্বাদ বর্ষনে। আল্লাহর সার্বিক সহায়তা মানুষকে সফল হতে সহায়তা করে। মানুষ অপরিমিত পায়। এভাবেই আল্লাহ মানুষের ইচ্ছে, লক্ষ্য, নিয়ত, কর্ম প্রচেষ্টার মাধ্যমে মানুষকে তার ইচ্ছে অনুযায়ী অপরিমিত দেন। উল্লেখ্য যে, ইচ্ছে আন্তরীক হতে হবে [আল্লাহর ইচ্ছে দ্রষ্টব্য ২.১৪২.৩]।

এ জগতেও আমরা এমন অনেক উদাহরণ দেখি। ভাল কর্মের কারণে বা পরিশ্রমের কারণে আল্লাহ কাউকে অফুরন্ত দান করেন। তবে কাউকে আবার পরীক্ষা করার জন্যও অফুরন্ত দেন। সেক্ষেত্রে তেমন মানুষ যদি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে না পারে তবে নিজেই নিজের ধ্বংস ডেকে আনে। এ জগতেও এমন উদাহরণ আছে। কর্মটিই আসল।

ওপরোক্ত বাণী বিশ্বাসীদের মনে আশার সঞ্চার করে। তারা হতাশ হয় না। কারও কটাক্ষ তাদেরকে বিচলিত করতে পারে না। ধৈর্য্য সহকারে তারা লক্ষ্য অভিমুখে ছুটে চলার শক্তি পায়। বিশ্বাস রাখে যে আল্লাহ কর্মের যথাযথ প্রতিদান দেবেন। তাঁর সন্তুষ্টি বা তিনি চাইলেই অপরিমিত দান করতে পারেন। তবে অনেককে পরীক্ষা করার জন্য তাদের প্রাপ্তি সীমিতও করে দেন। সেটিও বুঝতে হবে। যাদেরকে অতি কঠিন পরীক্ষায় নিপতিত করা হয় তাদের প্রাপ্ত পুরস্কারও হয় অতি মূল্যবান! অতএব কোন দিক থেকেই হতাশ হওয়ার কোন কারণ নেই।

➢ (আয়াত ২১৩-২১৪) মানব সম্প্রদায় (Mankind), পথ-নির্দেশনা (Scripture or Revelation) ও বার্তাবাহকগণের (Prophets or Messengers) প্রেরণ প্রসংগে বলা হয়েছে।

২১৩	মানুষ একই সম্প্রদায়ভূক্ত ছিল। অতঃপর আল্লাহ তাদের প্রতি বার্তাবাহক প্রেরণ করেন সু-সংবাদদাতা ও সতর্ককারীরূপে এবং তাদের সঙ্গে অবতীর্ণ করেন গ্রন্থ যথার্থ বার্তাসহ, যেন বিতর্কমূলক বিষয়ে এটি মানুষের মধ্যে মীমাংসা করতে পারে। কিন্তু পরিষ্কার নির্দেশ এসে যাবার পরও গ্রন্থপ্রাপ্তরা পারস্পরিক বিদ্বেষ/ঘৃনাবশত বিভক্তি সৃষ্টি করে। অতঃপর আল্লাহ বিশ্বাসীদেরকে পথ প্রদর্শন করেন সেই সত্য বিষয়ে যে বিষয়ে তারা মতভেদে লিপ্ত হয়েছিল। আল্লাহ যাকে ইচ্ছে সরল পথ প্রদর্শন করেন। (Mankind were one community, and Allah sent (unto them) prophets as bearers of good tidings and as warners, and revealed therewith the Scripture with the truth that it might judge between mankind concerning that wherein they differed. And only those unto whom (the Scripture) was given differed concerning it, after clear proofs had come unto them, through hatred one of another. And Allah by His Will guided those who believe unto the truth of that concerning which they differed. Allah guideth whom He will unto a straight path.)
২১৪	তোমারা কি মনে কর যে তোমরা জান্নাতে চলে যাবে, অথচ এখনও সে সব মানুষদের পর্যায় অতিক্রম করনি যারা তোমাদের পূর্বে অতীত হয়েছে। তাদের ওপর এসেছিল বিপদ ও কষ্ট ভূ-কম্পনের মতো; এমনিভাবে তারা শিহরীত হয়েছিল যে আল্লাহর বার্তাবাহক এবং যারা তার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করেছিল সকলেই একথা বলতে বাধ্য হয়েছিল যে কখন আসবে আল্লাহর সাহায্য? জেনে রেখ, এখন অবশ্যই আল্লাহর সাহায্য একান্তই নিকটবর্তী। (Or think ye that ye will enter paradise while yet there hath not come unto you the like of

	(that which came to) those who passed away before you? Affliction and adversity befell them, they were shaken as with earthquake, till the messenger (of Allah) and those who believed along with him said: When cometh Allah's help? Now surely Allah's help is nigh.)

■ **২.২১৩.১** মানুষ একই সম্প্রদায়ভূক্ত ছিল। অতঃপর আল্লাহ তাদের প্রতি বার্তাবাহক প্রেরণ করেন সু-সংবাদদাতা ও সতর্ককারীরূপে ... আল্লাহ বিশ্বাসীদেরকে পথ প্রদর্শন করেন সেই সত্য বিষয়ে যে বিষয়ে তারা মতভেদে লিপ্ত হয়েছিল : কোরআনে উদ্ধৃত 'আহলে কিতাব' বা 'গ্রন্থপ্রাপ্ত সম্প্রদায়' হচ্ছে ইহুদি, খ্রীষ্টান ও মুসলমান সম্প্রদায় (Followers of Abrahamic religion)। যারা আল্লাহর দিক থেকে অবতীর্ণ গ্রন্থ প্রাপ্ত হয়েছে। তাদের প্রত্যেকের দর্শনই বলে পৃথিবীতে প্রথম মানব হচ্ছেন 'আদম' বা 'এ্যাডাম'। আল্লাহ প্রদত্ত গ্রন্থ 'বাইবেল' থেকেই বস্তুত এ আলোচনার শুরু।

একই আল্লাহ সকলের কাছে একই বার্তা প্রেরণ করেছেন বলেই সকলের মূল বক্তব্য এক। সর্বশেষ অবতীর্ণ গ্রন্থ কোরআনেও তার স্বীকৃতি দেয়া হয়েছে। কোরআনও একইভাবে দর্শনকে উপস্থাপন করেছে। এক আল্লাহকে উপাসনা করার কথা বলেছে। যেমন পূর্ববর্তী গ্রন্থসমুহেও বলা হয়েছে।

গ্রন্থপ্রাপ্ত সম্প্রদায়ের সকল দর্শনই বলে প্রথম মানব আদম। তাঁর সন্তানেরা তাঁরই অনুসারী ছিল এটাই ধরে নেয়া যথাযথ। অতএব একটি সময় ছিল যখন মানুষ একই দল বা সম্প্রদায়ভূক্ত ছিল। একই পথের অনুসারী ছিল। এটিই স্বাভাবিক।

মানুষের সংখ্যা বৃদ্ধি পেতে থাকলে মানুষ বিচ্ছিন্ন হতে থাকে। পৃথিবীময় ছড়িয়ে যায়। সময়ের সাথে সাথে বিচ্ছিন্নতা এবং নতুন অভিজ্ঞতা ও ধ্যান-ধারণার আলোকে একই ধর্মের মধ্যে নানান নিয়ম ও রীতি-নীতি প্রবেশ করতে থাকে। মানুষের মাঝে নানান মতামত ও মতবিরোধেরও সৃষ্টি হয়।

আল্লাহ প্রদত্ত সহজ-সরল ধর্ম জটিল হতে থাকে। এক আল্লাহর স্থলে বহু দেব-দেবীর আবির্ভাব ঘটে। কোন দেবতা কিসের জন্য ও কেন, বহু বছরের ব্যাবধানে সাধারণ মানুষ এসব বিষয়ে যথাযথভাবে জানেও না। তবুও

গড্ডালিকায় গা ভাসিয়ে দিয়ে কারও দেখান পথে প্রজন্মের পর প্রজন্ম মানুষ এসবের উপাসনা করে চলেছে। ভ্রান্ত ও অপ্রয়োজনীয় কাজও করে চলেছে।

সহজ-সরল ধর্মে এত এত নিয়ম প্রবেশের অন্যতম কারণ হচ্ছে মানব মনের লোভ বা খায়েস, অহমিকাবোধ এবং নিজের বা নিজেদের স্বার্থ ও ক্ষমতার দ্বন্দ্ব।

মানুষ নিজেদের সুবিধা ও ইচ্ছেমতো ধর্মের মধ্যে নানান নিয়ম-কানুন প্রবেশ করিয়েছে। বস্তুত নিজেদের সুবিধামতো মানুষকে পরিচালনা করার জন্য এসব করেছে বা করতে হয়েছে। নিঃসন্দেহে ক্ষমতার অধিকারী ও স্বার্থের সন্ধানীদের পক্ষেই এসব কাজ করা সম্ভব হয়েছে।

একটি প্রতিষ্ঠিত নিয়মের মধ্যে আরেকটি নিয়ম প্রতিষ্ঠা করে দেয়া খুব সহজ কাজ নয়। কেননা কেউ সেটি মেনে নেবে না। এর জন্য কোন 'উছিলা' প্রয়োজন হয়। 'তাগুদ' হচ্ছে সেই 'উছিলা'। তাগুদের প্রভাবে সমাজে 'শিরক' বা আল্লাহর অংশীদারী ব্যাবস্থা প্রবেশ করে [শিরক বা অংশীদারী দ্রষ্টব্য ২.২২]। যাকে মাধ্যম ধরে আল্লাহর প্রতিষ্ঠিত নিয়মের মধ্যেও সুবিধামতো কোন নিয়ম প্রবেশ করিয়ে দেয়া সম্ভব হয় এবং নিজেদের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করা হয় সেই উছিলার নামে। পেছনে আল্লাহকেও কাজে লাগান হয়।

মানুষ আল্লাহর সমপর্যায়ের মনে করে আরও অনেকের পূঁজা করতে শুরু করে। আল্লাহকে যেমন ভালবাসে তাদেরকেও তেমন ভালবাসতে শুরু করে কিংবা তার চেয়েও বেশী। সমাজে 'উছিলা'র গ্রহণযোগ্যতা সৃষ্টি হয়। অতঃপর তাদের নামে স্বার্থান্বেষী মহল অর্থাৎ যারা এসব নিয়মের স্রষ্টা তারা তাদের সুবিধামতো মানুষের চলার পথে কোন নিয়ম প্রবেশ করিয়ে দেয়। সে নিয়মকে কাজে লাগিয়ে বাণিজ্য, ক্ষমতার ভাগ-বাটোয়ারা ইত্যাদি হয়। যা পূঁজনীয় কারও মাধ্যম ছাড়া নিজেদের পক্ষে প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব হত না। আবার আল্লাহর নামেও করা সম্ভব নয়। কেননা আল্লাহর সত্য ও প্রতিষ্ঠিত বিধান প্রকাশিত এবং প্রত্যেকের অন্তরে অন্তর্গ্রথীত। সকলে সেটি জানে। আল্লাহ কখনই মন্দ কাজের আদেশ দেন না।

যারা আল্লাহর সমপর্যায়ের কোন কিছু প্রতিষ্ঠা করে সমাজে এভাবে নতুন নিয়ম প্রতিষ্ঠা করে, বস্তুত তারা সমাজে পাপ বা অন্যায়ের প্রবেশ ঘটায়। তাদের এসব করার পেছনে উদ্দেশ্য থাকে। এর মাধ্যমে স্বার্থান্বেষীরা নিজেদের

স্বার্থ উদ্ধার করে। অসংখ্য মানুষকে তারা এসব উছিলার উছিলায় আল্লাহ নির্দেশিত সুযোগ-সুবিধা থেকে বঞ্চিত করে এবং নিজেরা ভোগ করে। সমাজে আর্থ-সামাজিক এমনকি মানসিক বৈষম্যের পাহাড় গড়ে তোলে।

সাধারণত ভূল পথগামী ও দুর্বল চিত্তের সাধারণ মানুষ এ ফাঁদে আটকা পরে। তাদের মধ্যেও কিছু সংখ্যক দ্রুত কিছু পাওয়ার লোভে বা আশায় আল্লাহকে ছেড়ে এদের পেছনে ছুটে বেড়ায়। গীতায় এ বিষয়ে সুন্দরভাবে বর্ণনা করা হয়েছে (দ্রষ্টব্য গীতা ৭:২০-২৩)।

আল্লাহ 'শিরক' এর পাপ ক্ষমা করেন না। অনেক পাপ তিনি সহ্য করেন, ক্ষমাও করেন কিন্তু এটি করেন না। কেননা এটি সকল পাপের উৎস। আবার এটি সকল রোষের উৎস। মানুষ নিজেকে দিয়ে বিচার করলেও আল্লাহর এ গুণের বিষয়টি উপলব্ধি করতে পারবে।

প্রশ্ন হচ্ছে, ধর্ম বিষয়টি আসলে কি এবং কেন [ধর্ম দ্রষ্টব্য ২.৩.৩]? পৃথিবীর বুকে সকল প্রকারের দুষ্টুমি, অন্যায়, দুর্নীতি ইত্যাদি করা সত্বেও কিছু ধরা-বাধা ব্যাকরণিক নিয়ম-রীতি পালন করে বেহেশতে যাবার জন্যই কি ধর্ম? এভাবে ধর্মকে বুঝলে সেটি ভ্রান্ত ধারণা। যারা এভাবে ভাবে তারা বিভ্রান্তিতে আছে। তবে এর মাঝে কিছু সত্যও আছে। বিষয়গুলিকে যথাযথ জ্ঞানে বুঝতে হবে।

ধর্মের মূল কাজ 'হিউম্যান রিসোর্স ম্যানেজমেন্ট'। আর সে কারণে বলা যায় 'টোটাল এনভায়রণমেন্ট ম্যানেজমেন্ট'। ধর্ম তাই যৌক্তিক কারণেই জাগতিক সকল বিষয়ের সাথে সম্পৃক্ত। কিন্তু বাস্তবে বা বর্তমান সময়ে দেখা যায় কিছু মানুষ যৌক্তিকভাবে বিষয়গুলিকে না বুঝেই মহব্বতের অন্তর নিয়ে সবকিছুতে ধর্মকে টেনে নিয়ে আসে; আবার আরেক দল ধর্মকে না বুঝেই সবকিছু থেকে একে পরিহার করতে চেষ্টা করে। বস্তুত ধর্ম অনেক শক্তিশালী একটি মাধ্যম; মানুষের ওপর যার ব্যাপক প্রভাব রয়েছে। একে যথাযথভাবে কাজে লাগাতে না পারা মানুষের ব্যার্থতা। যে সময়ে 'হিউম্যান রিসোর্স ম্যানেজমেন্ট' বা 'এনভায়রণমেন্ট ম্যানেজমেন্ট' বিষয়গুলি আজকের পর্যায়ে উপনীত হতে পারেনি সে সময়ে ধর্মই এ কাজগুলি করেছে।

ধর্ম হচ্ছে, 'টোটাল এনভায়রণমেন্ট ম্যানেজমেন্ট'। তাই যারা যে কোন প্রকারে জগতের সুষ্ঠ ও সুন্দর পরিবেশ নষ্ট করবে আল্লাহ তাদের জন্য শাস্তির

বিধান রেখেছেন। যারা পরিবেশের উন্নয়ন, বিকাশ সাধন বা এর যথাযথ পরিচর্যা করবে তারা পুরস্কৃত হবে। এভাবেই শাস্তি ও পুরস্কারের বিধান দ্বারা সৃষ্টিকে কাজে লাগিয়ে আল্লাহ তাঁর সৃষ্টিকে আগলে রাখেন বা রক্ষা করেন। মানুষের জন্যও এগুলি দিক-নির্দেশনা ও করণীয়। বলা হচ্ছে,

"আল্লাহ অবতীর্ণ করেছেন উত্তম বাণী সম্বলিত গ্রন্থ যা সুসামঞ্জস্যপূর্ণ (যেখানে পুরস্কারের প্রতিশ্রুতি ও শাস্তির ভয় পাশাপাশি উল্লেখ রয়েছে)।" (আল-কোরআন ৩৯:২৩)

সৃষ্টিকে ধরে রাখা, সংরক্ষণ করা ও যথাযথভাবে চলতে সহায়তা করাই আল্লাহর প্রতি কর্তব্য পালন করা। আল্লাহর ইচ্ছের সাথে মানুষ কর্মের মাধ্যমে এভাবে সম্পৃক্ত হয় কিংবা অন্যভাবে বলা যায় যে, আল্লাহর প্রতি মানুষ দায়িত্ব ও কর্তব্য পালন করে [দায়িত্ব ও কর্তব্য দ্রষ্টব্য ২.২৩১.৫, ২.২৩৩.৬]।

মানুষের কর্তব্য পালনের সাথে শাস্তি-পুরস্কারের বিষয়টি জুড়ে দেয়া হয়েছে [পুরস্কার দ্রষ্টব্য ২.৩.৩]। মানুষকে দিয়ে কাজ করিয়ে নেয়ার জন্য বা বলা যায় মানুষকে এভাবে উৎসাহিত করা হয়েছে প্রদর্শিত পথে চলতে। পুরো প্রক্রিয়াটি একটি যথাযথ পরিকল্পনার মধ্য দিয়ে স্বয়ংক্রিয়ভাবে লক্ষ্যে উপনীত হয় এ দর্শনকে সামনে রেখে। দর্শনটি হচ্ছে একটি প্রোগ্রাম। যা মানুষকে সঠিক পথে পরিচালিত করে।

সঠিক প্রোগ্রামের মধ্যে যখন ভাইরাস প্রবেশ করে তখন তাকে ঠিক করতে হয়। তেমন অবস্থায় আল্লাহ বার্তাবাহক প্রেরণ করেন। বার্তাবাহকের মাধ্যমে গ্রন্থ প্রেরণ করেন মানবজাতির দিক-নির্দেশনারূপে। যেন সে দিক-নির্দেশনা মানুষের পরস্পরের মধ্যে সৃষ্টি হওয়া কোন দ্বন্দ্ব বা বিতর্ক বা কোন মতবিরোধের মীমাংসা করতে পারে। অর্থাৎ তাদের মধ্যে যে সকল ভূল-ভ্রান্তির প্রবেশ ঘটেছে সেগুলিকে ঠিক করে যথাযথ ধর্মকে পুনঃ প্রতিষ্ঠা করতে পারে। তিনি সঠিক ও ভূল পথের দিক-নির্দেশনা তুলে ধরেন মানুষের সামনে। যেমন গীতায় বলা হয়েছে,

".. যখন এবং যেখানে ধর্মের (ন্যায় পথের বা সুষ্ঠ পরিচালনার) অবনতি ঘটে এবং অধর্মের (অন্যায়ের) অভ্যুত্থান হয়- সে সময়ে আমি

নিজেকে প্রকাশ করে অবতরণ করি। শিষ্টের রক্ষা ও দুষ্টের দমন এবং একইসাথে ধর্মের রীতি-নীতির পুনঃ স্থাপনে আমি যুগে যুগে আবির্ভূত হই।” (গীতা ৪:৭-৮)

দূষিত সমাজে আগত নতুন বার্তাকে যারা গ্রহণ করে নেয় তারা আল্লাহ প্রেরীত আশীর্বাদকে গ্রহণ করে বলে ধরে নেয়া যেতে পারে। কেননা সকল নতুনের আবির্ভাব ঘটে যখন পুরোণোতে ঘুণে ধরে। এমতাবস্থায় যারা নতুনকে গ্রহণ করে তারা নতুন ধারণা বা সত্য ও সঠিক ধারণায় বিশ্বাসী। আল্লাহ তাদেরকে পথ প্রদর্শন করেন অর্থাৎ তারাই আল্লাহ নির্দেশিত পথে চলে।

বস্তুত সত্য ও সঠিক পথের জ্ঞান মানবের মাঝে সৃষ্টিতেই নিহিত আছে। মানুষ ভাল-মন্দ ঠিকই বুঝতে পারে। মানুষ সত্যের জ্ঞানের অভাবের কারণে সবসময় পথচ্যুত হয় না। বরং একে অন্যের প্রতি প্রভাব বিস্তারের চেষ্টার কারণে, স্বার্থের কারণে- যেখান থেকে একের প্রতি অন্যের বিদ্বেষ, ঘৃণা বা হিংসার সৃষ্টি হয় সেখান থেকে বিভাজিত হয়। বিভাজিত একদল ভ্রান্ত পথ অনুসরণ করে। তারা সঠিক পথ থেকে বিচ্যুত হয়। অতঃপর দীর্ঘ সময় পরে সেই বিচ্যুত পথটিই আরেকটি নিয়মে পরিণত হয়। যার উৎপত্তির কারণ বোঝা কঠিন হয়ে যায় পরবর্তী প্রজন্মের কাছে।

বিভ্রান্তির জালে আবদ্ধ বিশৃংখল মানব সমাজে আল্লাহ বার্তাবাহক প্রেরণ করেন সঠিক বার্তাসহ। তাদের সঙ্গে অবতীর্ণ করেন গ্রন্থ যথার্থ বার্তাসহ যা সত্য-মিথ্যে, ভাল-মন্দ বিষয়গুলিকে চিহ্নিত করে দেয়; যেন বিতর্কমূলক বিষয়ে বিশেষত এক আল্লাহর বিষয়ে মানুষ যে ভ্রান্তিতে আছে তা মানুষের মধ্যে মীমাংসা করতে পারে। তাই বার্তাবাহকগণ সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারী।

তাঁরা সুসংবাদ নিয়ে আসেন সঠিক পথ অবলম্বনকারীদের জন্য। তাদের ভাল কাজের জন্য পুরস্কারের বার্তা বহন করে নিয়ে আসেন যা তাদেরকে সুপথে চলতে অনুপ্রাণীত করে। একই সাথে সতর্ক বার্তা বা শাস্তির বার্তা নিয়ে আসেন পথভ্রষ্ট বা মন্দ পথ অবলম্বনকারীদের জন্য যেন তারা সুপথে ফিরে আসে।

কোরআন যৌক্তিকভাবে সমগ্র বিষয়গুলিকে তুলে ধরেছে। যেমন বলা হয়েছে যে, আল্লাহ যখন আদমকে পৃথিবীতে প্রেরণ করেন তখন বলেন তোমাদের জন্য

আমার দিক থেকে পথ-নির্দেশনা আসবে (২:৩৮)। যারা তা অনুসরণ করবে তাদের ভয়ের কোন কারণ নেই। আল্লাহ এক উপাস্যকে উপাসনা করার করার কথা বলেন যা বিশৃংখলা থেকে সৃষ্টিকে রক্ষা করে। তাই বলা হয়ে থাকে,

"যদি আল্লাহ ভিন্ন আর কোন উপাস্য থাকত, তবে অবশ্যই নভোমণ্ডল ও ভূ-মণ্ডল বিশৃংখল হয়ে যেত। অতএব তারা যা আরোপ করে, তা থেকে আরশের অধিপতি আল্লাহ পবিত্র।" (আল-কোরআন ২১:২২)

এভাবেই আল্লাহ ইহুদি জাতির প্রতি বার্তাবাহকরূপে প্রেরণ করেন মুসা (আঃ)-কে। তিনি মূর্তী পূঁজা রহিত করে এক আল্লাহর উপাসনা করার কথা বলেন। তাঁর পূর্বে ইব্রাহীম (আঃ)-ও একই কারণে নমরুদের সময়ে সংগ্রাম করে গেছেন। তারও পূর্বে নূহ (আঃ) একই কাজ করে গেছেন মানবজাতিকে সঠিক পথ প্রদর্শনের জন্য। সকলেই এক আল্লাহর উপাসনা ও তাঁর কাছে সমর্পনের কথা বলে গেছেন।

আয়াতে প্রচ্ছন্নে ইসরাইল জাতির প্রতি ইংগিত রেখে উদাহরণ তুলে ধরা হয়েছে। মিশর থেকে ফিরে আসার কালে তারাও এক সম্প্রদায়ভূক্ত ছিল। আল্লাহ তাদের জন্য বার্তাবাহক প্রেরণ করেন। তাদেরকে গ্রন্থ প্রদান করেন। গ্রন্থের মাধ্যমে চলার সঠিক পথ প্রদর্শন করেন। এভাবে মানবজাতির প্রতি পরিষ্কার নির্দেশ এসে যাবার পরও গ্রন্থপ্রাপ্তরা পারস্পরিক বিদ্বেষ ও ঘৃনাবশত বিভক্তি সৃষ্টি করে। রাজনৈতিক বা ক্ষমতার দ্বন্দ্বের কারণে তারা বিভাজিত হয়। বিভাজিতদের একদল অপর দলের উপাসনা স্থল পরিত্যাগ করে। তারা তাদের জন্য উপাসনার ভিন্ন স্থাপনা গড়ে তোলে। সেখানে মূর্তী স্থাপন করে। এভাবে তাদের মধ্যে মূর্তীর আরাধনা করার প্রচলন শুরু হয়। হযরত সোলায়মানের মৃত্যুর পরে এ ঘটনা ঘটে [লেখকের 'বাইবেল কোরআন ও ইসরাইল' বই দ্রষ্টব্য]। এছাড়াও তারা ইহুদি-খ্রীষ্টানেও বিভাজিত হয়েছে।

আল্লাহ সকলকে সঠিক পথ দেখানো সত্বেও সকলেই সে পথে প্রতির্ষ্ঠিত হতে পারেনি। ইহুদি জাতির একাংশ মূর্তীর উপাসনাকে বেছে নেয়। খ্রীষ্টানরা জেসাসকে আল্লাহর সন্তানরূপে গণ্য করে। অর্থাৎ তারা আল্লাহর সমপর্যায়ে কাউকে গণ্য করে বা 'শিরক' করে। কেবল এক আল্লাহতে সত্যিকার বিশ্বাসী অর্থাৎ শেষ নবীর অনুসারী বা মুসলিমরাই আল্লাহ প্রদর্শিত যথাযথ পথ

অনুসরণ করে চলেছে। তারা আল্লাহর সঙ্গে কোন অংশীদারী আরোপ করে না। তাই বলা হয়েছে, অতঃপর আল্লাহ বিশ্বাসীদেরকে (মুসলিমদেরকে) পথ প্রদর্শন করেন সেই সত্য বিষয়ে যে বিষয়ে তারা (ইসরাইলের সন্তানেরা) মতভেদে লিপ্ত হয়েছিল। কথাগুলি সমগ্র মানবজাতির বিবেচনায়েও প্রযোজ্য।

■ **২.২১৩.২** আল্লাহ যাকে ইচ্ছে সরল পথ প্রদর্শন করেন (Allah guideth whom He will unto a straight path) : আল্লাহ সকলকেই সরল পথ প্রদর্শন করেছেন এবং করেন [আল্লাহর ইচ্ছে দ্রষ্টব্য ২.১৪২.৩]। প্রথমত: তিনি মানুষকে সরল পথ প্রদর্শনের জন্য দিক-নির্দেশনামূলক গ্রন্থ আল-কোরআন প্রেরণ করেছেন। বলা হচ্ছে,

"মানুষকে পথ চলার (ভিন্ন ভিন্ন) দুটি পথ প্রদর্শন করেছি (ভাল ও মন্দ)। কিন্তু সে চেষ্টা করেনি উন্নততর/উচ্চতর পর্যায়ে আরোহনের।" (আল-কোরআন ৯০:১০-১১)

অতএব উচ্চতর বা উন্নততর পর্যায়ে আরোহনের জন্য মানুষের নিজেকেই সচেষ্ট হতে হবে। মানুষের নিজের ভেতরেই সরল পথে চলার ইচ্ছে থাকতে হবে বা জাগ্রত হতে হবে। পথ বেছে নেয়ার ক্ষেত্রে মানুষের নিজের ইচ্ছেটি গুরুত্বপূর্ণ। দ্বিতীয়ত: বলা হচ্ছে,

"... জেনে রেখ, আল্লাহ মানুষ ও তার অন্তরের অন্তর্বর্তী হয়ে থাকেন ..." (আল-কোরআন ৮:২৪)

গীতায় বলা হয়েছে, "... প্রত্যেকের হৃদয়ে পরমেশ্বর উপস্থিত...।" (গীতা ১৮:৬১)

প্রত্যেকের ভেতরে তিনি বিরাজ করেন। মানুষ নিজে কোনকিছু ইচ্ছে বা সিদ্ধান্ত নেবার কালে ভেতর থেকে তিনি তার পক্ষে-বিপক্ষে যুক্তি উপস্থাপন করেন। ব্যাখ্যা-বিশ্লেষন করে ভাল-মন্দ জানান দেন।

তিনি ভেতর থেকে এবং বাহির থেকে সব দিক থেকেই মানুষকে সঠিক পথ বলে দেন। সরল পথ প্রদর্শন করেন। কিন্তু পথ বেছে নেয়ার সিদ্ধান্ত মানুষের নিজের। এ স্বাধীনতাটুকু আল্লাহ মানুষকে দিয়েছেন। তাই কর্মফল ভোগ নিজের। এটিই পরীক্ষা।

একজন মানুষও একজন মানুষকে ভাল-মন্দ পরামর্শ দেয়। একজন মানুষও একজন মানুষের জন্য ভাল-মন্দ কামনা করে। মানুষ যাকে ভালরূপে জানে তাকে ভাল পরামর্শ দেয়। তার ভাল কামনা করে। যাকে মন্দরূপে চেনে-জানে তেমনই হয় তার প্রতি তার আচরণ। বলা হচ্ছে,

'তোমরা যা শোন ও দেখ (প্রকৃতপক্ষে) কে তা শোনে ও দেখে?' (আল-কোরআন ১০:৩১)

অর্থাৎ আল্লাহ জানেন সব। তিনি মানুষের অতীত জানেন। তিনি তার বর্তমান জানেন। এমনকি তিনি তার ভবিষ্যত পরিকল্পানাও জানেন। তিনি জানেন তার কর্মের নিয়ত। তিনি অন্তরের গহীনের খবরও জানেন। তাই তিনি কারও জন্য সরল পথ প্রদর্শন করেন। কেননা তিনি জানেন কে সরল পথে চলতে চায় এবং কে ভূল পথগামী। মানুষ যে পথে চলার সিদ্ধান্ত নেবে আল্লাহ তাকে সে পথেই নিয়ে যাবেন।

যেহেতু আল্লাহ পূর্ব থেকেই ভেতরের খবর জানেন; জানেন যে কে সরল পথে চলতে চায়, তাই তিনি তাকে সরল পথ প্রদর্শন করেন। কিন্তু সাধারণ মানুষ কারও ভেতরের খবর জানেও না বা বুঝতেও পারে না। মানুষ কেবল দেখে আল্লাহ কাউকে সরল পথে চালনা করছেন। অথচ কাউকে সরল পথে চালনা করছেন না। তাই মানুষের বোঝার জন্য এভাবে বলা হয় যে, 'আল্লাহ যাকে ইচ্ছে সরল পথ প্রদর্শন করেন'।

অপরদিকে মানুষের চলার শারীরিক শক্তিটিও তার নিজের নয়। বিভিন্ন জটিল প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে আল্লাহ প্রদত্ত। সমগ্র পরিবেশ-প্রকৃতি-সৃষ্টি সব তাঁরই নিয়ন্ত্রনাধীন! আল্লাহই চালনা করেন। যে সরল পথে যায় তাকে আল্লাহই চালনা করেন। আবার যে ভূল পথে যায় তাকেও আল্লাহই সে পথে যেতে দেন।

চলতে পথে মানসিক শক্তি বা ইচ্ছেরও বড় ভূমিকা আছে। মানুষের চলার গতি, উচ্ছাস সব আসে ভেতর থেকে। ভেতরে তিনি। তিনিই সব উজ্জীবিত করে দেন। তাই মানুষ দুর্বার গতিতে চলতে পারে। অতএব চালিয়ে নিয়ে যান তিনি।

মানুষ কেবল ইচ্ছে পোষন করে। যে যে পথে চলতে চায় তিনি তাকে সে পথে যেতে সাহায্য করেন। তিনি কারও স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করেন না। তাহলে বিচার দিবসের আর প্রয়োজনীয়তা থাকে না। অথচ তার সহায়তা ভিন্ন চলাও সম্ভব না। দেহের শক্তিও তাঁরই দেয়া। মানুষ দেখে যে তারই ইচ্ছেতে কেউ সরল পথে চলছে, আবার কেউ চলছে না। বস্তুত ব্যাক্তির ইচ্ছে আল্লাহর ইচ্ছের পরশ লাভ করে। তাই আল্লাহর ইচ্ছে কথাটি গুরুত্ব পায়।

আল্লাহই যেহেতু চালনা করেন তাই অনেকের মনে এ বিষয়ে প্রশ্ন জাগে যে, তবে কেন তিনি সকলকে সরল পথে চালনা করেন না?

পূর্বেই উল্লেখ করেছি যে, মানুষ যে পথে চলার সিদ্ধান্ত নেবে আল্লাহ তাকে সে পথেই নিয়ে যাবেন। আল্লাহ প্রতিটি মানুষ সম্পর্কে জানেন। বস্তুত মানুষ নিজের সম্পর্কে যা জানে আল্লাহ তার সব জানেন। তিনি জানেন কে কোন পথে যেতে চায়। তাকে তিনি সে পথে নিয়ে যান। সে পথই প্রদর্শন করেন।

যে মন্দ পথে যেতে চায় তবে আল্লাহ কেন তাকে বাধা দেন না বা ভাল পথে চালনা করেন না?

বুঝতে হবে যে, সে কারণেই জীবন ও জগত নামক এ পরীক্ষা। বিষয়টিকে এভাবেও ভাবতে বা বুঝতে হবে যে যদি তিনি তাই করে দেবেন, তবে তো পরীক্ষার কোন প্রয়োজন ছিল না। জগত সৃষ্টিরও প্রয়োজন ছিল না। তিনি তো শুইয়ে-বসিয়ে রেখে মানুষকে খাইয়েও দিতে পারতেন। স্যালাইন দেয়ার মতো! মানুষকে চলতেও হত না। এমনকি তিনি মানুষ সৃষ্টি না করলেও পারতেন। অতএব আল্লাহর বার্তা যথাযথ জ্ঞানে বুঝতে হবে। বলা হচ্ছে,

"যদি আল্লাহ চাইতেন, তিনি সকলকে তার দিক নির্দেশনার মধ্যেই নিয়ে আসতেন। অতএব তুমি বোকাদের অন্তর্ভূক্ত হয়ো না।" (আল-কোরআন ৬:৩৫)

অপরদিকে আল্লাহ নিজেই যদি কাউকে বিপদে ফেলতে চান তবে সেখান থেকে কারও পরিত্রাণ নেই। প্রশ্ন হচ্ছে, কেন তিনি মানুষকে বিপদে ফেলবেন?

এটিও পরীক্ষা। কিংবা হতে পারে তার পূর্বের কর্মের প্রাপ্ত ফল। কিংবা কাউকে কোন শিক্ষা দেয়ার জন্যও এমনটি হতে পারে। অর্থাৎ সিদ্ধান্ত গ্রহীতার জ্ঞান তাকে সঠিক পথে ফিরিয়ে আনে কিনা তিনি সেটি দেখেন। সে নিজেকে

নিয়ন্ত্রন করতে শিখেছে কিনা তিনি তা দেখেন। এগুলিই পরীক্ষা। কেউ যথাযথ পথে ফিরে এলে তিনি ক্ষমাশীল! তাকে গ্রহণ করে নেন। পুরস্কৃতও করেন।

বস্তুত আল্লাহই রক্ষাকারী। তিনি রক্ষা না করলে কারও রক্ষা নেই। ভেতরের নিয়ন্ত্রনহীন ইচ্ছে যদি কাউকে নিয়ন্ত্রন করে তবে তার ফিরে আসার কোন পথ নেই। সে ভূল পথে যেতে যেতে নিজেকে নিঃশেষ করে দেবে। সেটিও আল্লাহই করে দেন যখন কেউ মন্দ ইচ্ছেকে বেছে নেয়। বস্তুত ভেতরে তিনি।

আল্লাহ কাউকেই বিপদে ফেলেন না। তিনি সকলের সকল কিছু এ জনমের পূর্ব থেকেই অবগত। তিনি প্রত্যেকের সৃষ্টির রেসিপি জানেন। তিনি প্রত্যেকের সৃষ্টির ফর্মূলা বা সূত্র জানেন। তিনি সকল পরিকল্পনা জানেন। সম্ভাব্য কে কি করবে তিনি জানেন। তিনি শিক্ষা দিতে চান। বারংবার পরীক্ষা করেন। সকলকে নিজ বুঝ ও জ্ঞানে সঠিক জায়গায় নিয়ে আসতে চান। যেন সে নিজে চলতে শেখে। ভূল পথগামী সঠিক পথে ফিরতে পেরেছে কিনা তিনি তা দেখেন। ঠিক যেমনিভাবে একটা যন্ত্র বা মেশিন তৈরী করে মানুষ বারবার পরীক্ষা করে দেখে যে যন্ত্রটি সঠিকভাবে কাজ করছে কিনা বিষয়টি তেমন। তবে যন্ত্রটি দিয়ে পরবর্তীতে আল্লাহ কি করবেন সে সম্পর্কে কোন ধারণা দেয়া হয়নি। কিছু ইংগিত আছে।

মানব মনে অন্তহীন প্রশ্ন! কেন আল্লাহ মানুষকে এমন পরীক্ষায় ফেলেছেন? সে প্রশ্নের উত্তর তিনি দেননি। সেটি একান্তই তাঁর ইচ্ছে। তবে এ কারণে আমরা এ জীবন উপভোগ করে চলেছি এটিও বুঝতে হবে! জীবন ও জগৎ সম্পর্কে ধারণা লাভ করেছি। এ সবই মানুষের জন্য আশীর্বাদস্বরুপ। এসবের পেছনে কি কারণ নিহিত আছে সেটি তিনিই জানেন।

বস্তুত মানুষ আমরা কেবলই তাঁর ইচ্ছের গোলাম। তাই প্রয়োজন আল্লাহতে ‘সমর্পন’ (Surrender)। সমর্পনেই ‘শান্তি’। ‘ওঁম শান্তি’। শান্তিই লক্ষ্য। আল্লাহতে সমর্পনের এ ধর্মই হচ্ছে ‘ইসলাম’। কেউ বলে চিরন্তন সত্য বা সনাতন ধর্ম। যেমন একই আল্লাহকে বিভিন্নজন বিভিন্ন নামে ডাকে ধর্মের নামের ক্ষেত্রেও বিষয়টি তেমনই।

জগতের সকল ধর্ম এ একই পথ প্রদর্শন করে। সরল পথ। আল্লাহতে সমর্পনের পথ! মানব ধর্ম বস্তুত একটিই। তা তাকে যে নামেই ডাকা হোক না কেন (দ্রষ্টব্য আল-কোরআন ২৩:৫২-৫৪)।

যে আল্লাহর ইচ্ছে ও দিক-নির্দেশনার প্রতি নিজেকে সমর্পন করে আল্লাহ তাকে নিশ্চিতভাবে সরল পথ প্রদর্শন করেন এবং সে পথে চালনা করেন। সিদ্ধান্ত নেয়ার প্রাক্কালে ভেতর থেকে তিনি তাদেরকে ভাল-মন্দ, ঠিক-বেঠিক বলে দেন। দৈবী গুণে গুণান্বিত মানুষই সঠিক পথ বেছে নিতে পারে। তারা সেভাবে গড়ে ওঠে। তারা তাঁর দিক-নির্দেশনা অনুসরণ করে। এটিই সমর্পন।

এমন মানুষ বিপদ থেকে মুক্ত থাকতে পারে। মানুষের কাছে আল্লাহও তেমন কর্ম ও আচরণ প্রত্যাশা করেন। তাই বলা হয়েছে,

"তিনি তোমাদেরকে পরীক্ষা করতে চান যে, তোমাদের মধ্যে কর্ম ও আচরণে কে শ্রেষ্ঠ।" (আল-কোরআন ১১:৭)

এটিই পরীক্ষার 'আপাত' ও মানুষের সীমাবদ্ধ জ্ঞানের আলোকে মূল লক্ষ্য বলা যেতে পারে। 'আপাত' বলা হচ্ছে, কেননা সৃষ্টির প্রকৃত ও মূল লক্ষ্য মানুষের জানা নেই বা আজও মানুষ সে লক্ষ্যের সন্ধান করতে পারেনি।

যারা প্রদর্শিত পথ অগ্রাহ্য করে ভূল বা মন্দ পথে চলতে চায় তাদেরকে আল্লাহ সে পথেই নিয়ে যান। গীতা মতে তারা অসুর স্বভাব প্রাপ্ত। তাদেরকে সে পথে নিয়ে যান শিক্ষা দেয়ার জন্য। সেটিকে তিনি তাদের জন্য পরীক্ষাস্বরূপ করে দেন। যেমন বলা হয়েছে,

"আমি .. যত রাসূল ও নবী প্রেরণ করেছি, তারা যখনই কিছু কল্পনা করেছে তখনই শয়তান তাদের কল্পনায় কিছু মিশ্রণ করে দিয়েছে। ... (এটি) এ কারণে যে শয়তান যা মিশ্রণ করে তিনি (আল্লাহ) তা পরীক্ষাস্বরূপ করে দেন তাদের জন্য যাদের অন্তরে রোগ আছে এবং যারা পাষান হৃদয়।" (আল-কোরআন ২২:৫২-৫৩)

সিদ্ধান্ত গ্রহণ মানুষের নিজের। কেবল মানুষ কিভাবে হিসেব কষে বা জ্ঞানকে কাজে লাগায় এবং নিজেকে নিজে নিয়ন্ত্রন করে কি করে না আল্লাহ সেটি দেখেন। এর ওপরই মানুষের ভাল-মন্দ নির্ভর করে। সে কারণেই বিচার দিবসের প্রয়োজনীয়তা!

আল্লাহ যাকে ইচ্ছে সরল পথ প্রদর্শন করেন। তবে তিনি সবকিছুই করেন সুবিবেচনা প্রসূতভাবে। বিষয়টি মানুষের খামখেয়ালীপনার ইচ্ছের মতো নয়। যদিও আপাত দৃষ্টে মানুষের খামখেয়ালীপনার ইচ্ছের মধ্যেও সন্তর্পনে ও অতি দ্রুত কিছু বিবেচনাও কাজ করে। তবে মানবীয় ইচ্ছেতে কিছু মানুষ নিজেকে সকল সময় নিয়ন্ত্রন করতে পারে না। ফলে মানবীয় ইচ্ছে কখনও কখনও খাম-খেয়ালীপনার দোষে দুষ্ট হতে পারে। কিন্তু আল্লাহর ক্ষেত্রে বিষয়টি তেমন নয়। আল্লাহ হচ্ছেন যথার্থ অর্থাৎ যথাযথ বা ত্রুটিহীন, নির্ভূল। এককথায় তিনিই চরম সত্য। তাঁর ইচ্ছেও বিবেচনা প্রসূত ইচ্ছে। সেখানে কোন খামখেয়ালীপনার স্থান নেই। তিনি বিবেচনা প্রসূত হয়ে যা করেন সেটিকেই তাঁর ইচ্ছে বলা হয়। অর্থাৎ তাঁর ইচ্ছের মধ্যে সুবিবেচনা বিষয়টি অন্তর্গ্রথিত।

যেমন বলা হয় তিনি যাকে ইচ্ছে তাকে ক্ষমা করতে পারেন। সেখানেও তার সিদ্ধান্তের মধ্যে সুবিবেচনার বিষয়টি অন্তর্গ্রথিত। কিন্তু মানুষ আল্লাহর সকল বিবেচনা জানে না বা বুঝতে পারে না বিধায় বা তাঁর অনুমোদন ব্যাতিত জানা বা বোঝা সম্ভব নয় বিধায় 'আল্লাহর ইচ্ছে' কথাটি ব্যবহৃত হয়। মানুষ ভাবে তিনি তাঁর ইচ্ছেতে তেমনটি করেছেন। বস্তুত আল্লাহ কখনই অন্যায় করেন না। এর অপর অর্থই হচ্ছে বিবেচনাবিহীনভাবে তিনি কিছু করেন না। আল্লাহ বলেন,

"যে ভাল কাজ করে সে তা নিজের কল্যাণার্থেই করে। যে মন্দ/ভূল কাজ করে সে তা নিজের বিপক্ষেই করে। তোমার পালনকর্তা তাঁর বান্দাদের প্রতি মোটেই অন্যায় করেন না।" (আল-কোরআন ৪১:৪৬)

অর্থাৎ সিদ্ধান্ত গ্রহণ মানুষের নিজের। বিচার-বিবেচনা করে মানুষকেই সঠিক পথটি বেছে নিতে হবে।

গ্রন্থপ্রাপ্তগণ তথা সমগ্র মানবজাতিকে আল্লাহ বার্তাবাহক ও গ্রন্থ প্রেরণ করে সঠিক পথ প্রদর্শন করেছেন। কিন্তু প্রতিবারই যখন মানুষ ভূল করেছে তিনি আবার বার্তাবাহক ও গ্রন্থ প্রেরণ করেছেন মানুষকে ভূল পথ থেকে ফিরিয়ে আনার জন্য। যারা পূর্বে গ্রন্থ প্রাপ্ত হয়েছে স্বাভাবতই তাদের মনে এ প্রশ্ন আসতে পারে যে, মানব জাতির জন্য পথ প্রদর্শকস্বরূপ তারা তো গ্রন্থপ্রাপ্ত

হয়েছে তবে একই আল্লাহর দিক থেকে পুনরায় গ্রন্থ প্রেরণের প্রয়োজনীয়তা কি?

সত্য হচ্ছে গ্রন্থপ্রাপ্তরা আল্লাহ প্রদত্ত দিক-নির্দেশনা থেকে বিচ্যূত হয়েছে এবং ভূল পথে চলছে। কিন্তু তারা নিজেরা সে বিষয়ে সচেতন নয়। তাই আল্লাহ ধর্মের রীতি-নীতির পুনঃ স্থাপনে যুগে যুগে দিক-নির্দেশনা প্রেরণ করেন (দ্রষ্টব্য আল-কোরআন ২:১০৬) (দ্রষ্টব্য গীতা ৪:৮)।

মহান আল্লাহ কোরআন প্রেরণ করেছেন সমগ্র মানবজাতির জন্য দিক-নির্দেশনারূপে। কিন্তু যে যে পথে যেতে চায় বা যেতে ইচ্ছে করে তিনিই তাকে চালনা করে সে পথে নিয়ে যান। সে বিবেচনায়ই বলা হয়, ‘আল্লাহ যাকে ইচ্ছে সরল পথ প্রদর্শন করেন।’ যে সরল পথে চলতে চায় তিনি তাকে সরল পথে নিয়ে যান। বস্তুত ভেতরে তিনি। অতএব নিজ জ্ঞানে বা বিবেচনায় বিশ্বাসী তথা সকল মানুষকে সুপথ প্রাপ্ত হতে হবে।

সে কারণেই গীতায় দৈবী সম্পদ-সমৃদ্ধ করে নিজেকে গড়ে তোলার ওপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। বলা হচ্ছে,

“দৈবী-সম্পদ বা গুণ জীবকে মুক্ত করে এবং আসূরিক সম্পদ বন্ধনের কারণ।” (গীতা ১৬:৫)

কোরআনে একই কথা এভাবে বলা হয়েছে, “সেই সত্যিকার অর্থে সফল যে আত্মাকে বিকশিত করে এবং সেই সত্যিকার অর্থে ব্যর্থ যে এটিকে স্থবির করে রাখে।” (আল-কোরআন ৯১:৯-১০)

আত্মাই হচ্ছে ‘নিজ’। নিজেকে যে দৈবী গুণে গুণান্বিত করে গড়ে তোলে বা বিকশিত করে সেই মুক্তির পথ বেছে নেয়। আল্লাহ তাকে সরল পথ প্রদর্শন করেন।

বলা হচ্ছে, মানুষ একই সম্প্রদায়ভূক্ত ছিল। তাদের ধর্ম বা চলার পথও একই ছিল। অর্থাৎ এক আল্লাহতে সমর্পনের পথ। কিন্তু মানবজাতি পরস্পরের প্রতি বিদ্বেষ ও ঘৃনাবশত নিজেদের মধ্যে মীমাংসিত বিষয়েও বিভক্তি সৃষ্টি করেছে। কেউ আল্লাহ প্রদর্শিত পথে হয়েছে বিশ্বাসী। কেউ আবার অবিশ্বাসের পথ বেছে নিয়েছে। যে যেমন পথ বেছে নিয়েছে আল্লাহ তাদেরকে সে পথেই

চলতে দিয়েছেন। এমনই আল্লাহর নিয়ম, বিধি বা সূত্র। তিনি কারও ইচ্ছের ওপর বল প্রয়োগ করেন না। যেমন গীতায় বলা হয়েছে,

"জ্ঞান যাদের যেমন কামনা-বাসনা দ্বারা অপহৃত হয়েছে, স্বীয় স্বভাবের বশবর্তী হয়ে তারা তদ্রূপ নিয়ম অবলম্বন করে অপরাপর বিবিধ দেবতাদের ভজনা করে। ভক্তি সহকারে ভক্ত যেমন দেবমূর্তী অর্চনা করতে ইচ্ছে করে, দেবোপাসক ভক্তের নিশ্চিত ভক্তি আমি তেমন দেবমূর্তীতেই বিধান করে দেই। সেই দেবমূর্তী অর্চনাকারী দেবোপাসক ভক্তিযুক্ত হয়ে আরাধ্য দেবতার আরাধনা করে। আরাধ্য দেবতা থেকে সে যে কাম্য বস্তু লাভ করে বস্তুত সে সবই আমার দ্বারা বিহিত হয়ে থাকে। স্বল্প জ্ঞানের সে সমস্ত মানুষদের প্রাপ্ত ফল নশ্বর হয়।" (গীতা ৭:২০-২৩)

আল্লাহকে ছেড়ে যে যেমনই উপাসনা করুক না কেন বস্তুত আল্লাহ একাই সবকিছুর দাতা। কিন্তু স্বল্প জ্ঞানের মানুষ সেটি বোঝে না। মানুষ যখন এভাবে বিপথে যায়, আল্লাহ তখন দিক-নির্দেশামূলক গ্রন্থসহ বার্তাবাহক প্রেরণ করেন মানুষকে সঠিক পথ প্রদর্শনের জন্য। বার্তাবাহকগণ আল্লাহর পরিষ্কার নির্দেশ বা মীমাংসাসহ সু-সংবাদ ও সতর্ক বার্তা নিয়ে আগমন করেন। সঠিক পথ অবলম্বনকারীদের জন্য সুসংবাদ ও ভূল পথকারীদের জন্য সতর্কবার্তা। যেন মানুষ সুপথে ফিরে আসে।

এতদ্বসত্বেও দেখা যায় আল্লাহর বার্তায় বিশ্বাস রেখে কেউ সে পথ অনুসরণ করে, কিন্তু কেউ অবিশ্বাসের পথ বেছে নেয়। একই মানব সম্প্রদায় এভাবে বিভক্ত হয়ে যায়। বলা হচ্ছে, আল্লাহ বিশ্বাসীদেরকে সত্যের পথ প্রদর্শন করেন। আল্লাহ যাকে ইচ্ছে সরল পথ প্রদর্শন করেন। সত্যের পথই সরল পথ। যে যে পথে যেতে চায় আল্লাহ তাকে সে পথেই চালনা করেন। অতএব যে সরল পথে চলতে চায় আল্লাহ তাকে সরল পথ প্রদর্শন করেন। আল্লাহর ইচ্ছে ভিন্ন চাইলেও মানুষ সে পথে যেতে পারবে না। নিজের ভেতরেই আল্লাহ। নিজের ভেতরে নিজেই আল্লাহ। নিজেই নিজের আল্লাহ যখন নিজেকে দৈবীসম্পদপূর্ণ করে গড়ে তোলা সম্ভব হয়। এটিই হচ্ছে তাকওয়া (Perfection) অর্জন করা।

▪ **২.২১৪** তোমারা কি মনে কর যে তোমরা জান্নাতে চলে যাবে, অথচ এখনও সে সব মানুষদের পর্যায় অতিক্রম করনি যারা তোমাদের পূর্বে অতীত

হয়েছে। তাদের ওপর এসেছিল বিপদ ও কষ্ট ভূ-কম্পনের মতো; এমনিভাবে তারা শিহরীত হয়েছিল যে আল্লাহর বার্তাবাহক এবং যারা তার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করেছিল সকলেই একথা বলতে বাধ্য হয়েছিল যে কখন আসবে আল্লাহর সাহায্য? জেনে রেখ, এখন অবশ্যই আল্লাহর সাহায্য একান্তই নিকটবর্তী : বিশ্বাসী, অবিশ্বাসী ও মোনাফেক মানুষের তিনটি ধরণ সম্পর্কে ইতিপূর্বে ধারণা দেয়া হয়েছে। অতঃপর বিশ্বাসীদেরকে অবিশ্বাসীদের ওপরে আল্লাহর বিজয়ের বিষয়ে অধৈর্য্য না হতে বলা হচ্ছে। বিজয় এত সহজে আসে না। পূর্ববর্তী নবীদের সময়ের উদাহরণ তুলে ধরা হয়েছে। এর মাধ্যমে বিশ্বাসীদেরকে ধৈর্য্যের সাথে সব মোকাবেলা করতে বলা হয়েছে। সত্য ও ন্যায়ের পথে আছি বললেই স্বর্গে চলে যাওয়া যায় না। সত্য ও ন্যায় প্রতিষ্ঠায় যদি সংগ্রাম করতে হয় তবে সেটিও করতে হবে। সে কথা বলা হয়েছে। অর্থাৎ এটিও একটি পরীক্ষা যে কারা সত্য সত্যই সত্যের পথে আছে।

সত্য ও ন্যায় প্রতিষ্ঠায় যারা সহায়তার হাত বাড়িয়ে দিয়ে এগিয়ে আসে না তারাও অন্যায় বা অপরাধকরণের দোষে দুষ্ট। কেননা তাদের ভূমিকা অন্যায়কারীদেরকে প্রশ্রয় দেয়। এই প্রশ্রয় অন্যায়কে ছড়িয়ে দেয়। অতএব যারা বিশ্বাস স্থাপন করেছে তারা যেন মনে না করে যে বিশ্বাস স্থাপন করেছে বললেই তারা জান্নাতে চলে যাবে। এ পথ এত সহজও নয়। এর জন্য অনেক ঘাত-প্রতিঘাত সহ্য করার মানসিকতা থাকতে হবে। আবার তার প্রমাণও দিতে হবে। তবে প্রমাণ দেয়ার প্রয়োজন না হলে জোরপূর্বক প্রমাণ দেবারও প্রয়োজন নেই।

যদি সত্য ও ন্যায় প্রতিষ্ঠিত থাকে তবে অপ্রয়োজনীয়ভাবে কষ্টকে বরণ করারও প্রয়োজন নেই। কিংবা তেমন কষ্টের পরিস্থিতি সৃষ্টি করে কৃত্রিমভাবে সওয়াব অর্জন করার চেষ্টা করারও প্রয়োজন নেই। তেমন ভূলভাবেও যেন বিষয়গুলিকে আমরা বুঝে না থাকি।

আজ আমরা যতটুকু সুখ বা প্রশান্তি লাভ করি তার জন্য পূর্বে অনেকে শ্রম দিয়ে গেছে। কষ্ট সহ্য করেছে। তাদের ওপর এসেছিল বিপদ ও কষ্ট ভূ-কম্পনের মতো; এমনিভাবে তারা শিহরীত হয়েছিল যে আল্লাহর বার্তাবাহক এবং যারা তাঁর প্রতি বিশ্বাস এনেছিল সকলেই একথা বলতে বাধ্য হয়েছিল যে কখন আসবে আল্লাহর সাহায্য?

পূর্ববর্তী নবীদের সময়ের উদাহরণ তুলে ধরা হয়েছে। নূহ (আঃ), ইব্রাহীম (আঃ), মুসা (আঃ) সকল যুগেই সকলকে অনেক সংগ্রাম করতে হয়েছে। বার্তাবাহকগন যুগে যুগে আল্লাহর পথ তথা সত্য ও ন্যায়কে প্রতিষ্ঠা করার জন্য জীবনের ঝুঁকি নিয়ে কাজ করে গেছেন। তারা এসব করেছেন তাদের জ্ঞানের কারণে। জ্ঞানই তাদেরকে সঠিক কাজ করতে উদ্বুদ্ধ করেছে। প্রেরণা যুগিয়েছে। জ্ঞান আসে আল্লাহর দিক থেকে। তাই আল্লাহই সব করান। নিজেদের উত্তরসূরীদের জন্য নিজেদেরই কাজ করার ও ঝুঁকি নেয়ার মানসিকতা থাকতে হবে।

ইসলামের আবির্ভাবকালে যখন এ বাণী অবতীর্ণ হয়েছে সেটিও একটি খারাপ সময় অতিবাহিত করছিল। বিশ্বাসীরা সে সময় আর্থ-সামাজিক-মানসিক সর্বদিক থেকে ভীষনভাবে চাপের মুখে ছিল। সে সময়েও বিশ্বাসীরা এমন কামনা করত যে কখন আল্লাহর সহায়তা আসবে। মোহাম্মদ (সাঃ) এর আগমনের প্রতি ইংগিত করে বলা হচ্ছে যে এখন সে সহায়তা নিকটবর্তী। অর্থাৎ সহায়তা এসে গেছে। এ সময়ে বোধসম্পন্ন মানুষদের উচিত তাঁর সহায়তায় এগিয়ে আসা। তবেই সমাজের সংস্কার সম্ভব হবে। অত্যাচার, অনাচার, কুসংস্কার দূরীভূত হবে। মানুষ শৃংখলমুক্ত হবে।

এর জন্য অবশ্য সার্বজনীন ও শাশ্বত বাণী হিসেবে কোরআন যে দর্শন উপস্থাপন করেছে এবং মহানবী (সাঃ) যে শিক্ষা দিয়ে গেছেন তা যথাযথ ব্যাখ্যায় অনুসরণ করতে হবে। কল্পনা প্রসূত কিংবা আজগুবি ব্যাখ্যা নয়, বক্তব্য হতে হবে বাস্তবসম্মত যা যুগের জ্ঞানকে কাজে লাগিয়ে সমাজকে সামনে এগিয়ে নিয়ে যেতে অবদান রাখে।

➢ (আয়াত ২১৫) ব্যায় করা (Spending) প্রসংগে বলা হয়েছে।

২১৫	তারা তোমার কাছে জানতে চায় (হে মোহাম্মদ): কি তারা ব্যায় করবে? বল: ভালর জন্য যাই তোমরা ব্যায় কর তা অবশ্যই হতে হবে পিতামাতার জন্য, নিকট আত্নীয়-স্বজনদের জন্য, ইয়াতীম-অনাথদের জন্য, অসহায়দের জন্য এবং মুসাফিরদের জন্য। আর তোমরা যে ভাল কাজই কর আল্লাহ সে বিষয়ে অবগত। (They ask

	thee, (O Muhammad), what they shall spend. Say: that which ye spend for good (must go) to parents and near kindred and orphans and the needy and the wayfarer. And whatsoever good ye do, lo! Allah is Aware of it.)

- **২.২১৫.১** তারা তোমার কাছে জানতে চায়: কি তারা ব্যায় করবে? বল: .. ব্যায় কর .. পিতামাতার জন্য, ... মুসাফিরদের জন্য : ব্যায় করার ক্ষেত্রে মানুষ কোন কোন ক্ষেত্রে ব্যায় করবে সে বিষয়ে এখানে বলা হয়েছে। কেননা মানুষ সেটি জানতে চায়। এ বিষয়ে কিছু দিক নির্দেশনা প্রত্যাশা করে। সে প্রেক্ষিতে এ বাণী অবতীর্ণ হয়েছে।

এখানে সুনির্দিষ্টভাবে বলে দেয়া হয়েছে যে মানুষ কোথায় কোথায় ব্যায় করবে। সুস্পষ্ট বক্তব্য তুলে ধরা হয়েছে। তবে এভাবেও ভাবা যথাযথ নয় যে মানুষ এর বাইরে আর কোথাও ব্যায় করবে না বা করতে পারবে না। যখন কোন দিক নির্দেশনা দেয়া হয় তখন কিছু বিষয় উল্লেখ করা হয় মানুষের বোঝার সুবিধার জন্য। কিন্তু জগতের সব বিষয় ক্ষুদ্র পরিসরে বলে দেয়া সম্ভব হয় না।

বস্তুত কোন তালিকা প্রণয়ন করে এভাবে কোন দিক-নির্দেশনা দেয়া সম্ভব নয়। বিচিত্র জগতে কত ধরণের প্রয়োজনীয়তা আছে! কত ধরণের কাজ আছে। এখানে ভাল কিছু কাজের উদাহরণ তুলে ধরা হয়েছে মাত্র। তবে সকল ধরণের ভাল কাজে ব্যায় করার দিক-নির্দেশনা দেয়া হয়েছে। যে বিষয়গুলি উল্লেখ করা হয়েছে সেগুলিই সব বা শেষ নয়। এটি কেবল ভাল কাজের কিছু উদাহরণ বিষয়গুলিকে সেভাবে বুঝতে হবে।

বলা হচ্ছে, ভালর জন্য যাই তোমরা ব্যায় করবে, অর্থাৎ সকল ভাল কাজেই মানুষের ব্যায় করার অনুমতি আছে। তবে সুনির্দিষ্টভাবে যে বিষয়গুলি উল্লেখ করা হয়েছে সেগুলির বিষয়ে বিশেষ গুরুত্ব দিতে বলা হয়েছে। সেগুলিকে প্রাধান্য দেয়ার কথা বলা হয়েছে।

এ জগত ক্ষণস্থায়ী। কেবল সুখ ভোগের জন্যই মানুষকে এখানে প্রেরণ করা হয়নি। আবার শুধু সুখ ভোগ করে মৃত্যু কোন অর্থ বহন করে না। যদিও সুখভোগে কোন অন্যায় বা অপরাধও নেই। সুখের বিষয়াদিও আল্লাহ প্রদত্ত।

সুখ ভোগের প্রত্যাশা সকল মানুষেরই ভেতরের প্রত্যাশা। কিন্তু যখন পাশেই দুঃখী, দরীদ্র, নিপিড়ীত মানুষ ও আত্নীয়-স্বজন আছে, তখন তাদের প্রতিও মানুষের কিছু দায়িত্ব ও কর্তব্য আছে। তাদের কষ্ট অনুভব করেও ব্যায় করা প্রয়োজন। এগুলিও আল্লাহর পরীক্ষা। তবে এ ভাবনাটি তুলনামূলক ক্ষুদ্র পরিসরের ভাবনা।

যখন কোন কঠিন সময় আগমন করে যা সমাজ-রাষ্ট্রকে আষ্টে-পৃষ্ঠে কুড়ে কুড়ে খায়, যার যাঁতাকল থেকে মানুষ সহসাই বেরিয়ে আসতে পারে না তখন উদাসীন হয়ে থাকা অপরাধ। বিশেষত যারা অর্থ-সম্পদের মালিক তাদের জন্য। কেননা সব কাজে অর্থের প্রয়োজন হয়। ভাল কাজ বা উদ্যেগেও অর্থের প্রয়োজন আছে। দেহে অক্সিজেন বা রক্তের প্রবাহের মতো। কিংবা ধরার বুকে পানি প্রবাহের মতো। এ সময় সম্পদশালীদের যথাযথ দায়িত্ব পালনের সময়। তেমন সময়ে সমাজ সংস্কার বা পরিবর্তনে উদ্যেগীদের পাশে থাকাও কর্তব্য। তেমন ভাল কাজেও ব্যায় করতে হবে।

যে সময়ে এ বাণী অবতীর্ণ হয়েছে সে সময়ে আরবের সামাজিক অবক্ষয় সম্পর্কে সকলেরই জানা। নিপিড়ীত মানুষ পরিত্রাণ চায়। কোন দৈব সহায়তা কামনা করে। তেমন সময়ে মহানবী (সাঃ) এর আগমন ঘটেছে। চিন্তার জগতে ও সমাজে একটি বিপ্লব ঘটতে চলেছে। একটি পরিবর্তন। পূর্বের আয়াতে যেমন বলা হয়েছে যে, সকলেই একথা বলতে বাধ্য হয়েছিল যে কখন আসবে আল্লাহর সাহায্য? বলা হচ্ছে জেনে রেখ, এখন অবশ্যই আল্লাহর সাহায্য একান্তই নিকটবর্তী। মহানবী (সাঃ) এর আগমনের প্রতি ইংগিত করা হয়েছে।

এ সময়ে সম্পদশালীদের সহযোগীতার হাত প্রসারতি করার সময়। অন্যথায় এ মিশন ব্যার্থ হলে এর দায় তাদের ওপরও বর্তাবে। কেননা নিজেরা ও পরবর্তী প্রজন্মও পরিবর্তনের ব্যার্থতার ফল ভোগ করবে। এটিও সম্মিলিত মানুষেরই ব্যার্থতা। মানুষ নিজের সুখের চাইতেও তার প্রজন্মের সুখের বিবেচনাটি আগে করে। আবার সৃষ্টিকে রক্ষা করা সম্ভব না হলে প্রজন্মও টিকে থাকবে না। অতএব সৃষ্টিকে রক্ষা করার জন্যও এগিয়ে আসা প্রয়োজন। অতএব বিবেচনা সাপেক্ষে সব ধরণের ভাল কাজে ব্যায় করতে হবে। ব্যায়ের ক্ষেত্রে বৃহৎ পরিসরে বিষয়গুলিকে এভাবেও বুঝতে হবে।

আরও একটি দিক আছে। অনেক অর্থশালী মানুষ নিকটাত্মীয়দের দুর্দশাগ্রস্ত রেখে নিজেরা বিলাসী জীবন-যাপন করে। বস্তুত মানুষের উপার্জনের অর্থের সত্যিকারের যথাযথ ব্যাবহার হচ্ছে মানুষকে সহায়তা করার মধ্যে। ভাল কাজে সহায়তা করার মধ্যে। সমাজ সংস্কার ও কাঠামোগত উন্নয়ন সাধনের মধ্যে। প্রাচুর্য্য প্রদর্শনে নয়।

কিছু মানুষ সামান্য সহায়তা দিয়েই মনে করে অনেক করেছি। সবার জন্য করেছি। অতঃপর প্রাচূর্য্য প্রদর্শন করেছি তাতে দোষের কি? কিন্তু প্রাচুর্য্য প্রদর্শনের ঐ অর্থটুকুও ব্যায় করা যেত দুঃখী মানুষের দুর্দশা দুরীকরণের জন্য। মনে রাখতে হবে সম্পদের প্রকৃত মালিক আল্লাহ। তিনি নিশ্চয়ই এমন আচরণ প্রদর্শন ভাল চোখে দেখেন না।

অতএব ব্যায় করার ক্ষেত্রে এখানে সুনির্দিষ্টভাবে যে দিক নির্দেশনা দেয়া হয়েছে, ক্ষুদ্র আঙ্গিকে সেগুলির প্রতি গুরুত্ব দেয়ার পরেও অতি সম্পদশালীদের আরও অনেক অনেক সামাজিক দায়িত্ব পালনের আছে। যদিও বর্তমান সময়ে জটিল অর্থনীতি সাধারণের বোধেগম্যতার বাইরেও আপাতদৃষ্টে মনে হওয়া প্রাচূর্য্যের মধ্যেও কোন না কোনভাবে সে কাজগুলি করে চলেছে।

বর্তমান সময়ে সামষ্ঠিক অর্থনীতির জ্ঞানও অনেক উন্নতি লাভ করেছে। প্রাথমিক সময়ের দিক-নির্দেশনাগুলি এভাবেই মানবজাতিকে আজকের পর্যায়ে নিয়ে এসেছে। এতদ্বসত্বেও যথাযথ কাজে ব্যায় করার নির্দেশনা মেনে চলার ক্ষেত্রে কোরআন আজও মানুষের জন্য অনুপ্রেরণার উৎস। কোরআন কেবল দিক-নির্দেশনাই নয়, মানুষকে দিক-নির্দেশনার পথে চলতে উদ্বুদ্ধকরণেও প্রেরণা হয়ে কাজ করে! এখানেই কোরআনের মহাত্ব!!

▪ **২.২১৫.২** আর তোমরা যে ভাল কাজই কর আল্লাহ সে বিষয়ে অবগত : সবশেষে বলা হয়েছে, 'তোমরা যে ভাল কাজই কর আল্লাহ সে বিষয়ে অবগত।' অর্থাৎ সুনির্দিষ্টভাবে উল্লেখিত বিষয়গুলি সবই ভাল কাজের অন্তর্ভূক্ত কিন্তু এগুলিই শেষ নয়। ব্যায় করার ক্ষেত্রে সর্ব প্রকার ভাল কাজেই ব্যায় করা যাবে।

মানুষ যে ভাল কাজই করুক না কেন আল্লাহ সেটি অবগত [দ্রষ্টব্য ২.২৯.৪]। বস্তুত আল্লাহ মানুষের সকল কর্ম সম্পর্কেই অবগত। অতএব মানুষ

উত্তম কাজে যা কিছু ব্যায় করবে তিনি সেটি জানেন এবং তিনি তার উপযুক্ত প্রতিদানদাতা। প্রচ্ছন্নে সে আশার বাণী তুলে ধরা হয়েছে। বিশ্বাসীকে তেমন বাণী আশান্বিত করে। ভাল কাজ করতে উৎসাহিত করে। তাই মানুষকে কোরআনের বার্তায় বিশ্বাস করতে আহবান করা হয়। যেন বিশ্বাসের কারণে সকল মানুষ ভাল কাজ করতে উদ্বুদ্ধ হয়।

সত্যিকার বিশ্বাস এমনকি গোপনেও মানুষকে দিয়ে ভাল কাজ করায়। কেউ দেখল কি দেখ না, প্রশংসা করল কি করল না এমন চিন্তাও করে না। বিশ্বাসী জানে যে সবার ওপরে যিনি আল্লাহ, তিনি সব জানেন। এটি তার পরবর্তী প্রাপ্তির প্রত্যাশার চেয়েও বর্তমানের মানসিক তৃপ্তি।

কোরআনের দর্শন মানুষকে ভাল কাজ করতে নানানভাবে উদ্বুদ্ধ করে। কোরআন তাই বিজ্ঞানময়! কোরআনের দিক-নির্দেশনার সঙ্গে মনস্তাত্বিক বিজ্ঞান সম্পর্কিত। বস্তুত কোরআনের দর্শনের সাথে বিজ্ঞানের নানাবিধ শাখার ওতোপ্রতো সম্পৃক্ততা বিদ্যমান!

➢ (আয়াত ২১৬-২১৮) জেহাদ, সংগ্রাম বা যুদ্ধ (Warfare) বিষয়ে বলা হয়েছে [জেহাদ-সংগ্রাম-যুদ্ধ দ্রষ্টব্য ২:১৫৪]।

২১৬	তোমাদের ওপর যুদ্ধ নির্দেশিত হয়েছে যদিও এটি তোমাদের কাছে অপছন্দনীয়। কিন্তু এটি হতে পারে যে, তোমরা কোন একটি বিষয়কে অপছন্দ করছ কিন্তু সেটি তোমাদের জন্য কল্যাণকর, আবার হতে পারে যে কোন একটি বিষয়কে পছন্দ করছ, অথচ সেটি তোমাদের জন্য অকল্যাণকর। আল্লাহ জানেন তোমরা জান না। (Warfare is ordained for you, though it is hateful unto you; but it may happen that ye hate a thing which is good for you, and it may happen that ye love a thing which is bad for you. Allah knoweth, ye know not.)
২১৭	তারা তোমার কাছে জানতে চায় (হে মোহাম্মদ) পবিত্র মাসে যুদ্ধ করা বিষয়ে। বল: যুদ্ধ করা এ সময়ে ভীষন বড় সীমালংঘন। কিন্তু আল্লাহর পথে মানুষকে বাধাদান ও তাঁকে অস্বীকার করা, মসজিদ

	আল-হারামে বাধাদান ও বাসিন্দাদের সেখান থেকে বহিস্কার করা আল্লাহর কাছে তার চেয়েও বড় অপরাধ। বিশৃংখলা (ফিতনা) সৃষ্টি করা নরহত্যা অপেক্ষাও মহাপাপ। বস্তুত: তারা তোমাদের সঙ্গে যুদ্ধ করা থেকে কখনই বিরত হবে না, যতক্ষণ না তারা তোমাদেরকে তোমাদেরই ধর্মের বিরুদ্ধাচারণকারী করতে পারে যদি সম্ভব হয়। তোমাদের মধ্যে যারা নিজের ধর্ম থেকে ফিরে যাবে এবং অবিশ্বাসী হয়ে মৃত্যুবরণ করবে, এরাই তারা যাদের সকল কাজ ইহকাল ও পরকাল উভয় স্থানেই বিনষ্ট হয়ে যাবে। এরাই নরকের প্রকৃত অধিকারী, তারা সেখানেই বসবাস করবে। (They question thee (O Muhammad) with regard to warfare in the sacred month. Say: Warfare therein is a great (transgression), but to turn (men) from the way of Allah, and to disbelieve in Him and in the Inviolable Place of Worship, and to expel His people thence, is a greater with Allah; for persecution is worse than killing. And they will not cease from fighting against you till they have made you renegades from your religion, if they can. And whoso becometh a renegade and dieth in his disbelief: such are they whose works have fallen both in the world and the Hereafter. Such are rightful owners of the Fire: they will abide therein.)
২১৮	যারা বিশ্বাস স্থাপন করেছে এবং যারা হিজরত (অত্যাচারীত হয়ে দেশ ত্যাগ) করেছে ও আল্লাহর পথে কষ্ট (জেহাদ) করেছে তাদেরই আল্লাহর দয়া প্রাপ্তির আশা রয়েছে। আল্লাহ ক্ষমাশীল, দয়াময়। (Lo! those who believe, and those who emigrate (to escape the persecution) and strive in the way of Allah, these have hope of Allah's mercy. Allah is Forgiving, Merciful.)

- **২.২১৬.১** তোমাদের ওপর যুদ্ধ নির্দেশিত হয়েছে যদিও এটি তোমাদের কাছে অপছন্দনীয় : যুদ্ধ সকলের কাছেই অপছন্দনীয়। কেননা এতে জীবন, সম্পদ

সবই ক্ষতিগ্রস্ত হয়। কিন্তু যখন ক্ষমতাশালী বা শক্তিশালী কেউ কারও ওপর অন্যায়-অত্যাচার করে তখন সে অত্যাচারের হাত থেকে নিস্কৃতি বা পরিত্রাণ লাভের উপায় কি? সমস্যা সমাধানে যখন আলোচনা থেকে শুরু করে সকল প্রচেষ্টাই ব্যার্থ হয়ে যায় তখন যুদ্ধ বা সংগ্রামের পথই একমাত্র অবশিষ্ট থাকে। মানুষকে নিপীড়নের হাত থেকে রক্ষা করা তথা মানুষের মঙ্গলের জন্যই আল্লাহ এ পথকে সম্পূর্ণরূপে নিষিদ্ধ করেন নাই। মানুষ অপছন্দ করা সত্বেও এর নির্দেশনা রয়েছে।

অন্যায় ও অসত্য পথ থেকে মুক্তি লাভের জন্য কখনও কখনও সংগ্রাম ও যুদ্ধের প্রয়োজন আছে। ন্যায়ের পক্ষ শক্তি যদি সংগ্রাম বা যুদ্ধ না করে এবং ভাল মানুষ সেঁজে বসে থাকে তবে পৃথিবী অন্যায়ে ছেঁয়ে যাবে। তখন ন্যায় থাকবে না। ন্যায়ের পক্ষে মানুষও থাকবে না। বলা হচ্ছে,

"যদি আল্লাহ মানবজাতির একদলকে দিয়ে অপরদলকে প্রতিহত না করতেন, তবে এ পৃথিবী অন্যায়ে ছেঁয়ে যেত।" (আল-কোরআন ২:২৫১)

"আল্লাহ যদি মানবজাতির একদলকে দিয়ে অপর দলকে প্রতিহত না করতেন, তবে সংসারত্যাগীদের ভজনালয়, গির্জা, ইহুদীদের উপাসনালয় এবং মসজিদসমূহ বিধ্বস্ত/নিশ্চিহ্ন হয়ে যেত, যেগুলিতে আল্লাহর নাম অধিক স্মরণ করা হয়।" (আল-কোরআন ২২:৪০)

আরও বলা হয়েছে, "কিভাবে তোমরা আল্লাহর পথে (সত্য, ন্যায় ও কল্যাণের পথে) যুদ্ধ না করে থাকতে পারবে, যখন দুর্বল পুরুষ-নারী ও শিশুরা ক্রন্দন করছে এই বলে, হে আমাদের পালনকর্তা! আমাদেরকে এই জনপদ থেকে নিষ্কৃতি দান কর যেখানের অধিবাসীরা অত্যাচারী। ওহ! তোমার পক্ষ থেকে আমাদের জন্য কোন সাহায্যকারী প্রেরণ কর। তোমার পক্ষ থেকে আমাদের জন্য কোন রক্ষাকারীকে প্রেরণ কর!" (আল-কোরআন ৪:৭৫)

এতদ্বসত্বেও বিশ্বাসীদের ওপর কঠোর নির্দেশনা আছে যে, তারা যেন বিরোধীতার সূত্রপাত না করে এবং আল্লাহকে ভয় করে (দ্রষ্টব্য আল-কোরআন ২:১৯০)। অর্থাৎ যুদ্ধ শুরু না করে। আক্রমনের শিকার হলেই কেবল শত্রুপক্ষকে প্রতিহত করার জন্য যুদ্ধের নির্দেশনা দেয়া হয়েছে এবং সীমালংঘন করতেও বারণ করা হয়েছে। যুদ্ধের বিষয়ে আল্লাহ আরও যে সকল নির্দেশনা

দিয়েছেন তারা যেন সেসব মেনে চলে এবং ভঙ্গ না করে। যুদ্ধের ক্ষেত্রে কোরআন কতটা ন্যায়সম্মত নির্দেশনা দিয়েছে নিচের আয়াতটি থেকে সেটি ভালভাবে অনুধাবন করা সম্ভব। বলা হচ্ছে,

"হে বিশ্বাসীগণ! তোমরা যখন আল্লাহর পথে লড়াইয়ে বের হও, সতর্ক থেক বৈষম্য প্রদর্শন না করার বিষয়ে এবং যে তোমাদেরকে শান্তির প্রস্তাব দেয় তাকে বল না 'তুমি বিশ্বাসী নও' এবং এর মাধ্যমে পার্থিব জীবনের প্রাপ্তির কোন সুযোগ নিও না। ... আজ যার এ অবস্থা ইতিপূর্বে তোমরাও তো এমনি ছিলে, কিন্তু তখন থেকেই আল্লাহ তোমাদের প্রতি অনুগ্রহ করেছেন। অতএব কোনরূপ বৈষম্য প্রদর্শনের ক্ষেত্রে সতর্ক থেক। ...।" (আল-কোরআন ৪:৯৪)

যুদ্ধের ক্ষেত্রে আল্লাহ বিশ্বাসীদেরকে সব সময়েই ন্যায়সম্মত আচরণ করতে নির্দেশনা দিয়েছেন। এমনকি ইসরাইলের সন্তানেরাও যখন কানানে প্রবেশে যুদ্ধাবস্থায় ছিল তাদেরকেও এমনই নির্দেশনা দেয়া হয়েছিল। বলা হয়েছে,

"এ নগরে প্রবেশ কর এবং সেখানে যা আছে তা স্বাচ্ছন্দে আহার কর এবং তোরণ দিয়ে প্রবেশ কর বিনয়ের সাথে এবং বল, আমাদেরকে ক্ষমা করে দাও।" (আল-কোরআন ২:৫৮)

অর্থাৎ তাদেরকে নিষ্ঠুর, নির্দয় ও ঔদ্ধত্য প্রদর্শনকারীদের ন্যায় নগরে প্রবেশ করতে বারণ করা হয়েছে। যুদ্ধের বিষয়ে কোরআন প্রতিটি বিষয়ের মতোই অত্যান্ত সতর্কতার সাথে নির্দেশনা জারী করেছে। যেন মানুষ ভূল বা অতিরঞ্জিত কিছু না করে।

যুদ্ধ অপছন্দনীয় হলেও সত্য ও ন্যায় প্রতিষ্ঠা ও রক্ষায় এবং অত্যাচারীর হাত থেকে নিষ্কৃতি পাওয়ার জন্য কখনও কখনও সেটি প্রয়োজনীয়ও বটে।

▪ **২.২১৬.২** কিন্তু এটি হতে পারে যে, তোমরা কোন একটি বিষয়কে অপছন্দ করছ কিন্তু সেটি তোমাদের জন্য কল্যাণকর, আবার হতে পারে যে কোন একটি বিষয়কে পছন্দ করছ, অথচ সেটি তোমাদের জন্য অকল্যাণকর। আল্লাহ জানেন তোমরা জান না : মানুষ অপছন্দ করা সত্বেও ক্ষেত্র বিশেষে আল্লাহ যুদ্ধ বা সংগ্রামের নির্দেশনা বহাল রেখেছেন। কোন যুদ্ধের ক্ষেত্রেই মানুষ জানে না যে যুদ্ধের ফলাফল কি হবে। কোথায় তার নিজের জন্যই কল্যাণ নিহিত

আছে মানুষ সেটিও জানে না। সব আল্লাহ জানেন। মানুষের কাজ প্রয়োজনে তার কর্তব্য পালন করা।

কোন সমস্যার ক্ষেত্রে যখন আলোচনা থেকে শুরু করে সকল প্রচেষ্টা ব্যার্থ হয়ে যায়; যখন কোন ক্ষমতাশালী ব্যাক্তি অন্যায়-অত্যাচার ও নিপীড়ন করতে শুরু করে তখন সে অত্যাচারের হাত থেকে নিস্কৃতি পাওয়ার এটিই একমাত্র উপায় হয়ে যায়। যুদ্ধ তাই কখনও কখনও মানুষের মঙ্গলের জন্যই প্রয়োজনীয়।

মানুষ অনেক কিছুই পছন্দ করে বা অনেক কিছুতেই আকৃষ্ট হয়- তার সবই কি উপকারী? সত্যি বলতে আকৃষ্টকারী বা পছন্দের অনেক কিছুই এমনকি মঙ্গলজনকও নয়। কখনও কখনও বিপজ্জনকও! আবার অনেক কিছু অপছন্দ করে কিন্তু উপকারী। কোন কিছুর ভবিষ্যৎ বা ভাল-মন্দ ফলাফল মানুষ বলতে পারে না। আল্লাহ জানেন। মানুষের জন্য তাই আল্লাহতে বিশ্বাস ও ভরসা রেখে তাঁর নির্দেশনা অনুসরণ করে চলাই উত্তম পন্থা।

▪ **২.২১৭.১** তারা তোমার কাছে জানতে চায় পবিত্র মাসে যুদ্ধ করা বিষয়ে। বল: যুদ্ধ করা এ সময়ে ভীষন বড় সীমালংঘন। কিন্তু আল্লাহর পথে মানুষকে বাধাদান ও তাঁকে অস্বীকার করা, মসজিদ আল-হারামে বাধাদান ও বাসিন্দাদের সেখান থেকে বহিস্কার করা আল্লাহর কাছে তার চেয়েও বড় অপরাধ : জ্বিলক্কাদ, জ্বিলহাজ্ব, মুহাররম ও রজব এ চার মাসকে 'নিষিদ্ধ মাস' বা 'পবিত্র মাস' বলা হত। এ মাসগুলি হজ্ব ও ওমরাহ পালনের সময়। এ সময়ে যুদ্ধ-বিগ্রহ, চুরি-ডাকাতি-রাহাজানি, খুন-খারাবি যে কোন প্রকার মন্দ কাজ করা গর্হিত অপরাধ হিসেবে বিবেচিত হত; যেন হজ্বযাত্রীরা নিরাপদে কা'বায় গমনাগমন করতে পারে। এ নিয়ম ইব্রাহীম (আঃ) এর সময় থেকে চলে আসছিল এবং আরবের লোকেরা এ নিয়ম কঠোরভাবে মেনে চলত। এ সময়ে যুদ্ধ করা ভীষন বড় অপরাধ বা অন্যায় কাজ হিসেবে বিবেচিত হত।

অবিশ্বাসীদের একটি দলের সাথে মুসলিমদের ছোটখাট একটি সংঘর্ষ হয়। এতে একজন অবিশ্বাসী নিহত হয়। সময়টি ছিল পবিত্র বা নিষিদ্ধ মাসের অন্তর্ভূক্ত। অবিশ্বাসী, মোনাফেক ও ইহুদিরা এ ঘটনাটিকে একটি সুযোগ হিসেবে গ্রহণ করে। তারা মুসলমানদের সমালোচনা করতে শুরু করে এবং বিশ্বাসীদের

বিপক্ষে মন্দভাবে প্রপাগান্ডা শুরু করে। প্রচার করতে শুরু করে যে, এরা কেমন ধরণের ধার্মিক লোক যে পবিত্র বা নিষিদ্ধ মাসেও মানুষ হত্যা করতে দ্বিধাবোধ করে না! তারা এ ঘটনার তীব্র প্রতিবাদও শুরু করে এবং বিশ্বাসীদের কাছে জানতে চায় যে এ সময়ে হত্যাকান্ড সংঘটন করা যথাযথ হয়েছে কিনা?

অতি সাধারন মানের মুসলিমদের কারও কারও মনেও এমন প্রশ্নের উদয় হয় এবং তারা ভাবতে শুরু করে যে, অবিশ্বাসী ও ইহুদিদের উত্থাপিত এ অভিযোগ যৌক্তিক। ফলে এটি তাদের মনবলকেও ক্ষুন্ন করে। তারাও মোহাম্মদ (সাঃ) এর কাছে এ বিষয়ে সঠিক ব্যাখ্যা জানতে চায়।

বলা হচ্ছে, পবিত্র মাসে হত্যাকান্ড সংঘটন একটি বড় রকমের অন্যায় বা গর্হিত অপরাধ এটি সত্য। তবে যারা এ অভিযোগ উত্থাপন করেছে তাদের মুখে এমন অভিযোগ উত্থাপন করা শোভা পায় না। কেননা তারা দীর্ঘ তের বছর তাদের নিজেদের ভাইদের ওপর অত্যান্ত নিষ্ঠুর অত্যাচার-নির্যাতন করেছে শুধুমাত্র এ কারণে যে, তারা এক আল্লাহতে বিশ্বাস রাখে এবং আল্লাহর পথে মানুষকে আহবান করে। তারা শত শত বিশ্বাসী ভাইদেরকে দেশ থেকে বহিস্কার করেছে। এমনকি তাদেরকে তাদের প্রাণের কা'বা পরিদর্শনে যেতেও বাধা প্রদান করেছে। অথচ এ পবিত্র স্থান কারই নিজস্ব সম্পত্তি নয়। সেখানে যেতে কেউ কাউকে বাধা দিতে পারে না। সেটিও নিয়ম বহির্ভূত। তাদের শত্রুতা ও অপরাধ এমন ঘৃণিত পর্যায়ে পৌঁছেছে যে গত দু'হাজার কিংবা তারও বেশী সময়ের মধ্যে এমন ঘটনা কখনও ঘটেনি। যারা এত বড় অন্যায় কাজ করতে পারে তাদের মুখে কি করে এমন অভিযোগ উত্থাপন করা শোভা পায়? ন্যায়ের কোন বোধ থেকে তারা এমন প্রশ্ন উত্থাপন করতে পারে? তারা তো এর চেয়েও জঘন্য অপরাধ করেছে।

পবিত্র মাসে যুদ্ধ না করার রীতির সুযোগ নিয়ে অভিযোগ উত্থাপন করা হচ্ছে, অথচ এর চেয়েও বড় পাপ কাজকে আড়াল করা হচ্ছে। নিয়ম বহির্ভূত বড় পাপকে প্রতিরোধ করতে গিয়ে দুর্ঘটনাক্রমে নিয়ম বহির্ভূত কোন ছোট পাপ ঘটে যেতে পারে। বড় অপরাধের বিপরীতে সেটি তখন আর অপরাধরূপে গণ্য হয় না।

এ বাণী যেমন অন্যায়কারীদের জন্য একটি যথাযথ উত্তর, তেমনি এটি বিশ্বাসী যারা ঘটনাটিকে ভূল বুঝেছিল তাদেরকেও বিষয়টির যৌক্তিকতা তুলে ধরে প্রশান্তি দান করে এবং মানুষের জন্য এটি একটি শাশ্বত ও সার্বজনীন এবং যথাযথ দিক-নির্দেশনা হিসেবে প্রতিষ্ঠা পায়। সূত্র হিসেবে তাই বলা হয়েছে যে, 'সকল নিষিদ্ধ কাজের ক্ষেত্রেই বদলাজনিত প্রতিকার বিধিসম্মত (দ্রষ্টব্য আল-কোরআন ২:১৯৪)।'

এটিও সত্য যে, বিশ্বাসীদের দ্বারা সংঘটিত এ ঘটনাটিকে মহানবী (সাঃ) নিজেও সমর্থন করেননি এবং অপরাপর মুসলমানরাও নয়। কেননা ঘটনাটি ছিল নিয়ম বহির্ভূত ও অননুমোদিত একটি কাজ। মহানবী (সাঃ) মুসলিমদের ক্ষুদ্র এ দলটিকে মক্কা ও তায়েফের মাঝামাঝি এলাকায় কুরাইশদের গতিবিধি পর্যবেক্ষন করা ও তাদের পরিকল্পনা জানার জন্য প্রেরণ করেছিলেন। তিনি তাদেরকে যুদ্ধের অনুমতি দেননি। কিন্তু তারা ক্ষুদ্র একটি বাণিজ্যের দলকে আক্রমন করে। এতে একজন নিহত হয় ও অপরাপরদের তারা বন্দি করে নিয়ে আসে।

▪ **২.২১৭.২** বিশৃংখলা (ফিতনা) সৃষ্টি করা নরহত্যা অপেক্ষাও মহাপাপ : সমাজে বিশৃংখলা সৃষ্টি করা বড় অপরাধ। এমনকি বলা হচ্ছে যে, এটি নর হত্যার চেয়েও বড় অপরাধ। কেননা একটি হত্যা কেবল একটি হত্যা। কিন্তু সমাজে নৈরাজ্য ও বিশৃংখলা সৃষ্টি করা, মানুষের ওপর অত্যাচার-নির্যাতন করা প্রতিশোধ স্পৃহা সৃষ্টি করে- পরিশেষে যা অসংখ্য হত্যাকান্ডের সূত্রপাত করে। 'ফিতনা' হচ্ছে তাই বহু হত্যাকান্ডজনিত পরিস্থিতি সৃষ্টির কারণ বা বীজ।

মানুষ শুরুতেই কেউ কাউকে হত্যা করে ফেলে না। তার পূর্বে কিছু ঘটনা থাকে। সে ঘটনা ধীরে ধীরে মন্দ বা ভয়াবহ পরিস্থিতির দিকে মোড় নেয়। মিথ্যেভাবে কারও নিন্দা রটনা করা, অত্যাচার-নির্যাতন করা, প্রাথমিক দাঙ্গা-হাঙ্গামা সৃষ্টি করার মধ্য দিয়েই এটি বড় রূপ ধারণ করে। যেটি এক পর্যায়ে হাজার হাজার প্রাণ নাশের কারণ হয়ে দাড়ায়। তাই নিন্দা-নির্যাতন, দাঙ্গা-হাঙ্গামা বা বিশৃংখলা (ফিতনা) সৃষ্টি করাকে হত্যার চেয়েও কঠিন অপরাধ বলা হয়েছে।

একটি ভাল আদর্শ প্রতিষ্ঠাকালে তার বিপক্ষে ইচ্ছেকৃতভাবে সমাজে যখন 'ফিতনা' বা নৈরাজ্য সৃষ্টি করা হয়, তখন এর সুদুর প্রসারী ফলাফল বা মন্দ প্রভাব মানবসমাজে ভয়াবহ রকমের খারাপ হতে পারে (দ্রষ্টব্য ২.১৯১.২)। তেমন কর্মকান্ড যুগ যুগ এমনকি শতাব্দীর পর শতাব্দী একটি সমাজ বা গোটা মানবসমাজকেই অন্ধকারের নিচে ফেলে দিতে পারে। মানুষ আলোর মুখ দেখার সম্ভাবনা থেকে বঞ্চিত হতে পারে। সমাজে কুসংস্কার ও সকল প্রকার মন্দ কাজের বিস্তার ঘটাতে পারে। সমাজ অগ্রসর হতে পারে না। এমন অবস্থা বহু মানুষের জীবনকে অর্থহীন করে দিতে পারে। বলা যায় গোটা সমাজ তথা সমাজের সকল মানুষের জীবন তখন ব্যার্থতায় পর্যবসিত হয়। সে অর্থে বলা যায় তেমন নৈরাজ্যকর পরিস্থিতি সমাজের সকল মানুষকে হত্যা করে। মানবসমাজ ডোবার পঁচা পানির মতো মৃতপ্রায় হয়ে যায়। কু-সংস্কার, অজ্ঞতা, মূর্খতা এসে বাসা বাঁধে। মানবজীবন গতিময়তা ও প্রাণ চাঞ্চল্য হারায়। তাই 'ফিতনা' বা নৈরাজ্য তথা সমাজে অত্যাচার-নির্যাতন ও বিশৃংখলার সৃষ্টি করা নরহত্যা অপেক্ষাও বড় অপরাধ হিসেবে বিবেচিত। এর সুদুরপ্রসারী মন্দ ফলাফল আছে।

নৈরাজ্য সৃষ্টির মাধ্যমে মানুষের কথা বলার অধিকার হরণ করে নেয়া বড় অন্যায়। মানুষ কথা বলতে না পারলে জগতে নতুন ধারণার আবির্ভাব সম্ভব হত না। নতুন ধারণার আবির্ভাব না ঘটলে পৃথিবী আজ এ পর্যায়ে আসতে পারত না। কিন্তু যারা নতুন ধারণার বিরোধীতাকারী বা অন্য কথায় যারা মানুষকে কথা বলতে দিতে চায় না বা স্তব্ধ করে দিতে চায় তারা অত্যাচারী, অন্যায়কারী। তারা কেবল তাদের বর্তমান ও বিদ্যমান স্বার্থ ও অহমিকাকেই বিবেচনা করে। তারা মানবজাতির ভবিষ্যত কল্যাণের কথা এমনকি নিজেদের প্রজন্মের কল্যাণের কথাও ভাবে না।

ইসলামের আবির্ভাবকালে বিশ্বাসীরা যখন শান্তিপূর্ণ উপায়ে আল্লাহ তথা সত্য ও ন্যায়ের পথে মানুষকে আহবান করেছে, অবিশ্বাসীরা তখন বিশ্বাসীদের ওপর অত্যাচার-নির্যাতন করেছে। বিশ্বাসীদের স্তব্ধ করে দেয়ার চেষ্টা করেছে। একটি আদর্শ যা সত্য ও ন্যায়কে ধারণ করে তাকে অঙ্কুরেই বিনষ্ট করে দিতে চেয়েছে। তাদেরকে আর্থ-সামাজিকভাবে বয়কট করেছে। তাদেরকে দেশ থেকে বিতাড়িত করেছে। সমাজে একটি বিশৃংখল অবস্থার সৃষ্টি করেছে। যা যুদ্ধ

পরিস্থিতি বা বহু হত্যাকান্ড সংঘটনের মতো পরিস্থিতিতে সকলকে ঠেলে দিয়েছে।

ইসলামের আবির্ভাব মানবজাতির জন্য আশীর্বাদস্বরূপ। কিন্তু ইসলামের আবির্ভাব পৃথিবীতে সত্য ও ন্যায়ের যে বাণী নিয়ে এসেছে ও তাকে সমুন্নত করেছে তাকে শুরুতেই স্তব্ধ করে দিলে তা প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব হত না। মানুষ এক আল্লাহ, পরকাল, বিচার ব্যাবস্থা ইত্যাদি ধারণা দ্বারা উদ্বুদ্ধ হয়ে সঠিক পথে চলতে জানত না। যথাযথ দিক-নির্দেশনাবিহীন কুসংস্কারের অন্ধকারে ডুবে আজও পথ খোঁজার চেষ্টা করে যেত। যার সুদুর প্রসারী ফলাফল গোটা মানবজাতিকেই লক্ষ্যবিহীন মৃতপ্রায় সৃষ্টিতে পরিণত করে দিতে পারত। যা কিনা একটি হত্যার চেয়েও কঠিন অপরাধ। কেননা এটি সমগ্র মানব সভ্যতাকেই বলা যায় ধ্বংস করে দিত। মানবজাতিকে মৃতপ্রায় করে দিত।

অবিশ্বাসীরা যখন বিশ্বাসীদের বিপক্ষে পবিত্র মাসে ওপরে উল্লেখিত হত্যাকান্ডজনিত অভিযোগ উত্থাপন করেছে তখন বলা হচ্ছে আল্লাহর কাজে বাধাদান করা, উপাসনালয়ে যেতে বাধা প্রদান করা, বাসিন্দাদেরকে নিজভূমি থেকে বহিস্কার করা ইত্যাদি নৈরাজ্যকর অবস্থা সৃষ্টি করা হত্যার চেয়েও বড় অপরাধ। এর সুদুর প্রসারী মন্দ ফলাফল আছে।

- **২.২১৭.৩** বস্তুত: তারা তোমাদের সঙ্গে যুদ্ধ করা থেকে কখনই বিরত হবে না, যতক্ষণ না তারা তোমাদেরকে তোমাদেরই ধর্মের বিরুদ্ধাচারণকারী করতে পারে যদি সম্ভব হয় : অবিশ্বাসীরা কখনই বিশ্বাসীদের প্রতি তাদের বিরোধীতা প্রদর্শন করা বা তাদের সঙ্গে যুদ্ধ করা থেকে বিরত হবে না সে প্রসঙ্গে বলা হয়েছে। তারা বিশ্বাসীদেরকে তাদের নিজেদেরই ধর্মের বিরুদ্ধাচারণকারীতে পরিণত করার সর্বোচ্চ চেষ্টা সর্বদাই বজায় রাখবে। বিশ্বাসীদেরকে এ বিষয়ে সতর্ক করা হয়েছে যেন তারা তাদের ফাঁদে পা না দেয় এবং নিজেদের বিশ্বাসে অটল ও দৃঢ় থাকে এবং নিজেরা একতাবদ্ধ থাকে।

এখানে ‘যদি সম্ভব হয়’ কথাটির বিশেষ গুরুত্ব আছে। অর্থাৎ সত্যিকার বিশ্বাসীদেরকে পথভ্রষ্ট করা কখনই সম্ভব হবে না; সে বিশ্বাস ও দৃঢ়তা বিশ্বাসীদের আছে কথাটির অন্তর্নিহিত অর্থ সেটিও প্রকাশ করে।

ওপরে উদ্ধৃত ঘটনার ক্ষেত্রে দেখা গেছে যে, বিশ্বাসীদের বিপক্ষে অবিশ্বাসী ও ইহুদিদের উত্থাপিত অভিযোগকে সাধারন মানের কিছু বিশ্বাসীও যৌক্তিক মনে করেছিল (দ্রষ্টব্য ২.২১৭.১)। বস্তুত তারা জীবনের খুব ক্ষুদ্র একটি বিচ্ছিন্ন অংশকে বিবেচনায় নিয়ে এমন ভাবনা ভেবেছে। সমগ্র জীবনের ইতিহাসকে বিবেচনা করে বিষয়গুলি বোঝার চেষ্টা করেনি।

এখানে বিশ্বাসীদেরকে সতর্ক করে বলা হচ্ছে যে, শত্রুপক্ষ বস্তুত বিষয়টির ব্যাখ্যা জানতে ইচ্ছুক নয় এবং তারা সমস্যার সত্যিকার সমাধানও চায় না। বরং তারা এ ঘটনার সুযোগ নিয়ে বিশ্বাসীদের বিপক্ষে মন্দ প্রচারণা চালাবার সুযোগ নিতে চাচ্ছে। এমনকি নব্য বা দুর্বল প্রকৃতির বিশ্বাসীদেরকেও ভূল বোঝাবার চেষ্টা করছে। তারা বিশ্বাসীদের মাঝেও ভূল ব্যাখ্যা তুলে ধরে তাদেরকে তাদের নিজেদের ধর্ম থেকে কৌশলে ফিরিয়ে নেয়ার চেষ্টা করছে, বা নিজেদের ধর্মের বিরুদ্ধাচারণকারীতে পরিণত করার চেষ্টা করছে। বলা হচ্ছে, অবিশ্বাসীরা সব সময়ই সে চেষ্টা করে যাবে। বিশ্বাসীদের নিজেদেরকেই এ বিষয়ে সচেতন ও সতর্ক থাকতে হবে। সত্যিকার বিশ্বাসীকে কখনই পথভ্রষ্ট করা সম্ভব হবে না। তবে তার জন্য সঠিক জ্ঞানে দর্শনকে বুঝতে হবে। তবেই চিত্তে সে দৃঢ়তা প্রতিষ্ঠা পাবে।

▪ **২.২১৭.৪** তোমাদের মধ্যে যারা নিজের ধর্ম থেকে ফিরে যাবে এবং অবিশ্বাসী হয়ে মৃত্যুবরণ করবে, এরাই তারা যাদের সকল কাজ ইহকাল ও পরকাল উভয় স্থানেই বিনষ্ট হয়ে যাবে। এরাই নরকের প্রকৃত অধিকারী, তারা সেখানেই বসবাস করবে : পূর্বে বলা হয়েছে যে 'যদি সম্ভব হয়' কথাটির বিশেষ গুরুত্ব আছে। সত্যিকার বিশ্বাসীদেরকে পথভ্রষ্ট করা কখনই সম্ভব হবে না। এতদ্বসত্বেও অবিশ্বাসীরা বিশ্বাসীদেরকে পথভ্রষ্ট বা নিজেদের ধর্মের বিরুদ্ধাচারণকারীতে পরিণত করতে তাদের সর্বোচ্চ প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখবে।

সত্যিকার বিশ্বাসী নয় কিংবা দুর্বল প্রকৃতির বিশ্বাসীদের কেউ যদি নিজের ধর্ম ত্যাগ করে চলে যায়, তবে সেক্ষেত্রে তাদেরকে সতর্ক করে বলা হচ্ছে যে, তেমন ক্ষেত্রে তারা নরকের শাস্তি ভোগ করবে এবং আল্লাহ তাদেরকে ক্ষমা করবেন না। এর মাধ্যমে তাদেরকে তেমন ভূল কাজ করতে নিরুৎসাহিত করা হয়েছে।

বিশ্বাসীদেরকে স্মরণ করিয়ে দিয়ে বলা হচ্ছে যে, যারা তাদের ধন-সম্পদ লুট করে নেয়, তাদের চেয়েও অধিক ক্ষতিকর হচ্ছে তেমন একজন যে বিশ্বাসীকে তার 'বিশ্বাস' থেকে ফিরিয়ে নেয়ার চেষ্টা করে। কেননা প্রথমোক্তজন তাদের ইহকালীন জীবনকে নষ্ট করার চেষ্টা করে যা অতি ক্ষণস্থায়ী। কিন্তু শেষোক্তজন তাদের পরকালীন জীবনকে ধ্বংস করে দেয় যা চিরস্থায়ী। অতএব ভূল করতে বারণ করা হয়েছে।

▪ **২.২১৮.১** যারা বিশ্বাস স্থাপন করেছে এবং যারা হিজরত করেছে ও আল্লাহর পথে জেহাদ করেছে তাদেরই আল্লাহর দয়া প্রাপ্তির আশা রয়েছে : 'জেহাদ' হচ্ছে লক্ষ্য অর্জনে সর্বপ্রকার ও সর্বোচ্চ প্রচেষ্টার প্রয়োগ। বস্তুত জেহাদ শব্দটি কেবলমাত্র 'যুদ্ধ' কিংবা 'ধর্মযুদ্ধ' শব্দটির সমার্থক নয়। বরং এর অর্থ অনেক ব্যাপক ও বিস্তৃত। এটি লক্ষ্য অর্জনে সকল প্রকার প্রচেষ্টাকে বুঝিয়ে থাকে।

'জেহাদ' শব্দটিকে আরেক অর্থে 'ধর্মযুদ্ধ'ও বলা চলে। তবে সেক্ষেত্রে ধর্ম শব্দটিকে যথাযথ অর্থে বুঝতে হবে। হিন্দু-মুসলিম, বৌদ্ধ-খ্রীষ্টনের যুদ্ধ মূলত ধর্মযুদ্ধ নয়। এগুলি স্বার্থ সংশ্লিষ্ট যুদ্ধ যেখানে ধর্ম বা কোন আদর্শকে হাতিয়ার হিসেবে কাজে লাগান হয়।

ধর্ম যতভাবেই বিভাজিত হোক না কেন বুঝতে হবে যে সকল ধর্মই সত্য, ন্যায়, সাম্য, শান্তি, মৈত্রী প্রতিষ্ঠার কথা বলে। অতএব সমাজে সে পরিবেশ সৃষ্টির জন্য যে সংগ্রাম বা যুদ্ধ সেটিই হচ্ছে 'ধর্মযুদ্ধ'। স্বার্থসংশ্লিষ্ট ব্যাক্তিবর্গ বর্তমান বাস্তবতায় কেমন ধর্মাচারণ করছে, ধর্মের মূল দর্শনসমুহকে বোঝার ক্ষেত্রে সেটি কোনভাবেই মূখ্য বিবেচ্য নয়।

সমাজে যারা ধর্মের নামে শান্তি বিনষ্ট করে, অন্যায় কাজ করে তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধই হচ্ছে 'ধর্মযুদ্ধ'। কেননা মানব ধর্মের লক্ষ্য হচ্ছে সমাজে ন্যায় ও সাম্য প্রতিষ্ঠা করা এবং বসবাসযোগ্য শান্তিপূর্ণ পরিবেশ বজায় রাখা। যা জগতের সকল মানুষের কেবলমাত্র আল্লাহতে সমর্পনের মাধ্যমেই অর্জন করা সম্ভব। আল্লাহতে সমর্পনই হচ্ছে 'ইসলাম' এবং আল্লাহতে সমর্পিত মানুষই হচ্ছে 'মুসলিম'। ইসলামই হচ্ছে 'সনাতন' বা একমাত্র আদি বা চিরন্তন সত্য ধর্ম।

যারা অন্যায়-অত্যাচার করে তাদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করাই হচ্ছে 'জেহাদ'। এমনকি নিজের মন্দ ইচ্ছের বিরুদ্ধে যুদ্ধ বা সংগ্রাম চালিয়ে যাওয়াও 'জেহাদ'। অতএব একজন মুসলিমের 'জেহাদ' কোন সাধারণ মানের 'যুদ্ধ' নয়। এটি ভেতরে-বাহিরে সর্বত্র চলমান।

যিনি তার শরীর মন সব উজার করে দিয়ে আদর্শ বাস্তবায়নে পরিকল্পনা করা, প্রচার-প্রচারণা করা এমনকি লেখনি থেকে শুরু করে বক্তব্য প্রদান ইত্যাদি সকল প্রকার সংগ্রামের মধ্য দিয়ে সেটি করে থাকেন তিনি হচ্ছেন 'মুজাহিদ'।

একজন মুজাহিদ লক্ষ্য অর্জনে তার সকল প্রচেষ্টা এমনকি সম্পদও নিয়োজিত করে। সকল প্রকার বিরোধীতা মোকাবেলায় প্রচন্ড সংগ্রাম করে। নিজের জীবনকে বিপন্ন করতেও দ্বিধাবোধ করে না। মুজাহিদ এমনটি করে সত্য ও ন্যায়ের জ্ঞানের কারণে অর্থাৎ 'আল্লাহর কারণে'। একজন মুসলিম সে অর্থে জেহাদকে দায়িত্ব মনে করে। কিন্তু ভূল ব্যাখ্যা যেন ভূল পথে বিশ্বাসীদেরকে চালিত না করে সেটিও লক্ষ্য রাখার বিষয় আছে।

একজন মুসলিম কিছু নৈতিকতা ও আদর্শের মধ্যে থেকে জেহাদ করে এবং সেটি করে শুধুমাত্র আল্লাহর কারণে বা পথে। সেটি হচ্ছে সত্য ও ন্যায়কে প্রতিষ্ঠা করা, সমুন্নত রাখা বা রক্ষা করা। এছাড়া অন্য কোন কারণ নেই। তাই 'আল্লাহর পথ' কথাটিকেও যথাযথ অর্থে বুঝতে হবে। 'আল্লাহর পথ' হচ্ছে সত্যের পথ। ন্যায় ও সাম্যের পথ। যেমন কোরআন ও গীতায় বলা হয়েছে,

"... আল্লাহ! তিনিই সত্য ..." (আল-কোরআন ২২:৬)

"... আমার চেয়ে উচ্চতর কোন সত্য নেই ..." (গীতা ৭:৭)

সত্যকে সমুন্নত করা ও রাখাই হচ্ছে প্রকৃত অর্থে 'জেহাদ'। সত্যের মাঝেই আল্লাহ বিরাজমান। 'আল্লাহই সত্য'।

ওপরে নিষিদ্ধ মাসে একটি হত্যার ঘটনা প্রসঙ্গে বলা হয়েছে। যখন বিরোধীপক্ষ দ্বারা এ ঘটনার বিরূপ সমালোচনা করা হচ্ছিল তখন বিশ্বাসীদের মধ্যেও কারও কারও মনবল কিছুটা ক্ষুন্ন হয়েছিল। কেননা পবিত্র বা নিষিদ্ধ মাসের নিয়ম ভঙ্গ করার বিষয়টি তাদের অন্তরের গভীরে রেখাপাত করার

মতো একটি বিষয় ছিল। কেননা এ নিয়ম তারা যুগ যুগ ধরে লালন করে আসছে।

ঘটনার পরে অবতীর্ণ এ আয়াত বিশ্বাসীদের অন্তরকে প্রশান্ত করেছে। আল্লাহর বাণীর মাঝে তারা যথাযথ ব্যাখ্যা ও যৌক্তিকতা খুঁজে পেয়েছে। এটি একটি দিক-নির্দেশনাও যে, যারা অত্যাচারীত হয়ে হিজরত তথা দেশ ত্যাগ করতে বাধ্য হয় অর্থাৎ জীবন সংগ্রামে লিপ্ত হয় এবং কোন আদর্শের কারণে বা সত্যের পথে যুদ্ধ বা সংগ্রাম করে- কিছু ক্রটি-বিচ্যুতি সত্বেও যদি তাদের নিয়তে ক্রটি না থাকে তবে তাদের জন্য আল্লাহর দয়া প্রাপ্তির সম্ভাবনা আছে। বিচারের মালিক আল্লাহ। তিনি কি করবেন কেউ বলতে পারে না। মানুষকে কাজ করে যেতে হবে সঠিক বিবেচনায়- অন্তরে সৎ নিয়তে।

- **২.২১৮.২** আল্লাহ ক্ষমাশীল, দয়াময় (Allah) : [দ্রষ্টব্য ১.২]

➢ (আয়াত ২১৯) মদ ও জুয়া (Strong Drink and Games of Chance) এবং ব্যায় (Spending) সংক্রান্ত বিষয়ে বলা হয়েছে।

২১৯	তারা তোমাকে জিজ্ঞেস করে মদ ও জুয়া সম্পর্কে। বল: এতদুভয়ের মধ্যে রয়েছে মহাপাপ। আর মানুষের জন্য কিছু উপকারিতাও আছে, তবে এগুলির পাপ উপকারিতা অপেক্ষা অনেক বড় এবং তারা তোমার কাছে জানতে চায় (আল্লাহর পথে) কি তারা ব্যায় করবে? বল: নিজেদের প্রয়োজনীয় ব্যায়ের পর তা-ই ব্যায় করবে যা উদ্বৃত্ত থাকে। এভাবেই আল্লাহ তাঁর অবতীর্ণ বাণী তোমাদের জন্য সুস্পষ্টরূপে বর্ণনা করেন যেন তোমরা চিন্তা ভাবনা কর (ইহকাল ও পরকাল বিষয়ে) (They question thee about strong drink and games of chance. Say: In both is great sin, and (some) utility for men; but the sin of them is greater than their usefulness. And they ask thee what they ought to spend. Say: that which is superfluous. Thus Allah maketh plain to you (His) revelations, that haply ye may reflect.)

■ **২.২১৯.১** তারা তোমাকে জিজ্ঞেস করে মদ ও জুয়া সম্পর্কে। বল: ... এগুলির পাপ উপকারিতা অপেক্ষা অনেক বড় : মদ পান এবং জুয়া খেলাকে মহাপাপ বলা হয়েছে। অতএব কোরআনের দর্শনে বিশ্বাসীদের এসবের ধারে কাছে না যাওয়া উত্তম। কিছু মানুষের জন্য এসবের মধ্যে কিছু উপকারীতা আছে। সে কথাও বলা হয়েছে। তবে সেটি যারা এতে অভ্যস্ত হয়ে গেছে তাদের জন্য বলা হয়েছে। কিন্তু এতে অভ্যস্ত না হওয়া উত্তম।

পরিমিত পরিমান মদ্য পান কিছু মানুষকে তাদের নানাবিধ যন্ত্রনা থেকে কিছু সময়ের জন্য মুক্তি দেয় বা ভূলিয়ে রাখে। যন্ত্রনাক্লিষ্ট তেমন মানুষ এ থেকে সাময়িক উপকার পেয়ে থাকে বলে মনে করা হয়। তবে নিয়মিত অভ্যস্ততা এক সময়ে এর মাত্রাকে বাড়িয়ে দেয়। এতে মানুষ হিতাহিত জ্ঞান শূণ্য হয়। মদ্যপ কি করে, কি বলে তার ঠিক থাকে না। এগুলি না শরীর, না মনের, না সমাজে মান-মর্যাদার জন্য ভাল। উপরন্তু এতে অপ্রয়োজনীয় অর্থ ব্যায় আছে। অনেক দরীদ্র মানুষ সংসার চালাতে পারে না, অথচ অভ্যাসও ছাড়তে পারে না। এগুলি পরিত্যাজ্য।

দলগতভাবে মদ্যপানে মদ্যপরা এক প্রকার আনন্দও উপভোগ করে। তাদের মধ্যে এক ধরণের হৃদ্যতা গড়ে ওঠে। ব্যাবসা-বাণিজ্য কাজ-কর্মের আলাপচারিতাও তারা এমনতর আসরে সম্পন্ন করে। কাজগুলি নেশার মতো। তাই শরীর-মন ও মূল্যবান সময় জীবন থেকে এদের নষ্ট হতে থাকে। ভাল কোন কাজে তারা মন বসাতে পারে না। পৃথিবীতে ভাল কাজ করার মতো মানুষ যদি না থাকত এবং যদি শুধু এ ধরণের অভ্যস্ততার মানুষই থাকত তবে মানুষ বুঝতে পারত যে, এ ধরনের মানুষ দিয়ে কোন কাজ হয় না। এরা অকাজে কেবল সময় নষ্ট করে। এদের থেকে ভাল চিন্তা আসে না। এরা সুস্থ্য চিন্তাও করতে পারে না। চিকিৎসা বিজ্ঞানেও বর্তমানে মাদকের কুফল সম্পর্কে বিস্তারিতভাবে জানা সম্ভব।

জুয়ার ক্ষেত্রেও জুয়ারীরা খেলা খেলে আনন্দ উপভোগ করে। সময় অতিবাহিত করে। মদ-জুয়া একই সাথে চলে। আনন্দের চরম পর্যায় এগুলি! টাকার লেনদেনও হয় এসব আসরে। অনেকে এ থেকে উপার্জন করে। একই সাথে কেউ নিঃস্ব হয়। নিদ্রা-বিশ্রাম নষ্ট হয়। নষ্ট হয় শরীর, মন, সময় ও অর্থ। কারও জন্য এসবগুলির উপকারীতা আছে, তবে অসংখ্য আর্থ-সামাজিক,

পারিবারিক, মানসিক ইত্যাদি অপকারীতাও আছে। বিষয়গুলি আজকাল সকলেই জানে। এগুলির উপকারীতার চেয়ে অপকারীতার মাত্রা অধিক। আর্থ-সামাজিক-মানসিক-পারিবারিক এমনকি পরবর্তী প্রজন্মের ওপরও এগুলির নেতিবাচক প্রভাব পড়ে। কোরআন বহু পূর্বেই এসবের ভাল-মন্দ দিক বিচার-বিবেচনা করে এমন মন্দ কাজসমুহকে নিষিদ্ধ ঘোষনা করেছে।

কোরআন এ মন্দ কাজগুলিকে ধাপে ধাপে নিরুৎসাহিতকরণ থেকে পরিপূর্ণ নিষিদ্ধতার দিকে নিয়ে গিয়েছে। প্রাথমিকভাবে মদ্যপ অবস্থায় উপাসনা করতে বারণ করা হয়েছে। পরবর্তীতে সম্পূর্ণরূপে নিষিদ্ধ ঘোষনা করা হয়েছে [মদ-জুয়া দ্রষ্টব্য ৪:৪৩, ৫:৯০]।

▪ **২.২১৯.২** এবং তারা তোমার কাছে জানতে চায় (আল্লাহর পথে) কি তারা ব্যায় করবে? বল: নিজেদের প্রয়োজনীয় ব্যায়ের পর তা-ই ব্যায় করবে যা উদ্বৃত্ত থাকে : ব্যায় করার ক্ষেত্রে অবিবেচক হতে বারণ করা হয়েছে। অতি ভাল প্রদর্শন করতে গিয়ে নিজেকে বিপদে বা কষ্টে ফেলে ব্যায় করা উচিত নয়। এমনভাবে ব্যায় করা উচিত নয় যাতে নিজেকেই নিঃস্ব হয়ে যেতে হয়। অপ্রয়োজনীয় ও সাধ্যের অতীত ব্যায় করতেও অনুৎসাহিত করা হয়েছে। অতএব ব্যায় করতে হবে নিজের প্রয়োজন সমাপ্তের পর যা উদ্বৃত্ত থাকে তা থেকে।

নিজের স্ত্রী, পুত্র, কন্যা অর্থাৎ নির্ভরশীল সকলের হক সবার আগে। অপরের জন্য করতে হবে নিজের দায়িত্বের অন্তর্ভূক্তদের প্রয়োজন মিটাবার পরে।

প্রত্যেক মানুষ যদি নিজ দায়িত্বভূক্তদের জন্য ব্যায় করতে সমর্থ হয় তবে সকলেই কোন না কোনভাবে উপকৃত হয়ে যায়। কেননা সকলেই কারও না কারও দায়িত্বের অন্তর্ভূক্ত বা অধীন। অপরদিকে যাদের দেখা-শোনা করার মতো কেউ নেই তাদের জন্য হকদারদের হক আদায়ের পর উদ্বৃত্ত থেকে দেয়া যেতে পারে।

▪ **২.২১৯.৩** এভাবেই আল্লাহ তাঁর অবতীর্ণ বাণী তোমাদের জন্য সুস্পষ্টরূপে বর্ণনা করেন যেন তোমরা চিন্তা ভাবনা কর (ইহকাল ও পরকাল বিষয়ে) : আল্লাহ তাঁর সকল বাণীই মানুষের কাছে এভাবে সুস্পষ্ট ও বিস্তারিতভাবে

ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করে তুলে ধরেছেন এখানে সে কথা বলা হয়েছে। আর এসব বাণীর মধ্যে মানুষের ইহজাগতিক কল্যাণ ও দর্শন প্রসূত পারলৌকিক কল্যাণের কথা বলা হয়েছে। যারা বিষয়গুলি নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করবে, ভাল-মন্দ বিচার-বিবেচনা করে মন থেকে দর্শনকে গ্রহণ করতে পারবে এবং মেনে চলবে তারা উপকৃত হবে।

➢ (আয়াত ২২০) ইয়াতীমদের (Orphans) বিষয়ে বলা হয়েছে।

২২০	(ইহকাল ও পরকাল বিষয়ে) এবং তারা তোমার কাছে জানতে চায় ইয়াতীমদের বিষয়ে। বল: তাদের বিষয়াদির সুব্যাবস্থা করা উত্তম। আর যদি তোমরা তোমাদের বিষয়াদি তাদের সঙ্গে একত্রিত করে নাও তবে মনে করবে তারা তোমাদের ভাই। বস্তুত: আল্লাহ জানেন কে হিতকারী এবং কে অনিষ্টকারী। আল্লাহ যদি ইচ্ছে করতেন তবে তিনি তোমাদের ওপর এ বিষয়ে অতিরিক্ত বোঝা আরোপ করতেন। আল্লাহ পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়। (Upon the world and the Hereafter. And they question thee concerning orphans. Say: To improve their lot is best. And if ye mingle your affairs with theirs, then (they are) your brothers. Allah knoweth him who spoileth from him who improveth. Had Allah willed He could have overburdened you. Allah is Mighty, Wise.)

▪ **২.২২০.১** তারা তোমার কাছে জানতে চায় ইয়াতীমদের বিষয়ে ... আল্লাহ জানেন কে হিতকারী এবং কে অনিষ্টকারী : ইয়াতীমদের দেখাশুনা ও তাদের ধন-সম্পদের রক্ষনাবেক্ষন বিষয়ে কোরআনে অত্যাধিক গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। বারণ করা হয়েছে যেন কেউ ইয়াতীমদের সম্পদ নিজেরা গ্রাস না করে। এটি গর্হিত অপরাধ এবং এর পরিণতি নিশ্চিতভাবে অগ্নির শাস্তি অর্থাৎ নরক (দ্রষ্টব্য আল-কোরআন ৪:১০)।

বিশ্বাসের গুরুত্ব এখানেই। যদি কেউ কোরআনের দর্শনে বিশ্বাসী হয় তবে সে এ বিধি-নিষেধ আপনা থেকে মনে চলবে। গোপনেও অন্যায় করবে না। সে জানে যে কেউ না দেখলেও আল্লাহ সব দেখেন ও জানেন। তাই কোরআনে

না দেখা বিষয়ে দৃঢ় বিশ্বাস রাখাকে অত্যাধিক গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। মানুষকে ভাল পথে ধরে রাখার জন্য আল্লাহতে বিশ্বাসই যথেষ্ট। এক্ষেত্রে পুলিশ কিংবা গোয়েন্দা নজরদারির প্রয়োজন হয় না। কিন্তু সত্যিকার বিশ্বাসীদের দ্বারা ভরপুর হয়ে পৃথিবী আজও ফেরেশতাদের স্বর্গরাজ্যে পরিণত হতে পারেনি। বাস্তব জীবনে তাই নজরদারিরও প্রয়োজন আছে।

ইয়াতীমদের বিষয়ে কোরআনের কঠোর নির্দেশনা তৎকালীন সময়ে ইয়াতীমদের অভিভাবকদের এতটাই ভীত ও বিচলিত করেছিল যে, এমনকি তারা ইয়াতীমদের খাবারের ব্যাবস্থাও নিজেদের থেকে পৃথক করে দেয় যেন তাদের সম্পদের কোন অংশ নিজেদের সম্পদের সাথে মিশে না যায়। এ বিষয়ে আল্লাহর সুস্পষ্ট নির্দেশনা বিস্তারিত জানার জন্য তারা মহানবীর কাছে আগ্রহ প্রকাশ করত।

সে প্রেক্ষিতে বলা হচ্ছে যে, ইয়াতীমদের বিষয়াদির সুব্যাবস্থা করা উত্তম। তবে একসাথে থাকতে গিয়ে কখনও ইয়াতীমের মালামালের সাথে নিজেদেরটা মিশে যেতে পারে। অনেক ক্ষেত্রে কিছু বিষয় পৃথক করা কষ্টসাধ্যও হয়ে যায়। বলা হচ্ছে, যদি নিয়ত সঠিক থাকে তাতে পাপের কিছু নেই। কেবল সততা, আন্তরীকতা ও যথাযথতার সাথে তাদের বিষয়াদির ব্যাবস্থা করতে বলা হয়েছে।

অপরদিকে ইয়াতীমের সম্পদ যদি নিজেদেরটার সাথে একত্রিত হয়ে যায় তবে তাকে ভাইয়ের মতো বিবেচনা করতে বলা হয়েছে। সেক্ষেত্রে তারটা যেমন নিজেদের ভেতরে এসে যাবে আবার নিজেদেরটাও তার সাথে মিশে যাবে। বস্তুত আল্লাহই ভাল জানেন যে, কে ইচ্ছেকৃতভাবে মন্দ কাজ করছে এবং কে অনিচ্ছাকৃতভাবে করছে। ফলে মানুষকে আল্লাহর প্রতি ভয় রাখতে বলা হয়েছে। অর্থাৎ আল্লাহতে বিশ্বাস। ইহজগতে হয়ত মন্দ কাজ করে কিছুদিন পার পাওয়া যাবে কিন্তু পরকালে সেটি হবে না। ভাল-মন্দের পরিপূর্ণ হিসেব দিতে হবে। বিশ্বাসই এসব ক্ষেত্রে অতন্দ্র প্রহরী হয়ে কাজ করে। তাই এ দর্শনকে মানব অন্তরে সত্যিকারভাবে প্রতিষ্ঠা করার জন্য বলা হয়ে থাকে।

■ **২.২২০.২** আল্লাহ যদি ইচ্ছে করতেন তবে তিনি তোমাদের ওপর এ বিষয়ে অতিরিক্ত বোঝা আরোপ করতেন। আল্লাহ পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময় : আল্লাহ

পরাক্রমশালী। তিনি সব করতে পারেন। কিন্তু একই সাথে তিনি প্রজ্ঞাময়। তাই তিনি যখন কোন নির্দেশনা জারি করেন সেটি করেন যথাযথ বিবেচনা সাপেক্ষে। কারও প্রতি তিনি অতিরিক্ত বোঝা আরোপ করেন না। তিনি তেমনই নির্দেশনা দেন যতটুকু মানুষের পক্ষে করা সহজ এবং সম্ভব।

আল্লাহ চাইলে ইয়াতীমদের বিষয়ে মানুষের ওপর তিনি অতিরিক্ত নিয়মের বোঝা আরোপ করতেন। কিন্তু তিনি তা করেন নাই। আল্লাহ পরাক্রমশালী অথচ প্রজ্ঞাময়। মানুষের পক্ষে যতটুকু বহন করা সম্ভব তিনি সেভাবেই নির্দেশনা দিয়েছেন। মানুষের নিজেদের সকল প্রকারের ব্যাবস্থাপনার ক্ষেত্রেও এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক-নির্দেশনা। এখানে সে বিষয়টিও একইসাথে ফুটে উঠেছে।

➢ (আয়াত ২২১) বিবাহ (Marriage) সংক্রান্ত বিষয়ে দিক-নির্দেশনা দেয়া হয়েছে।

২২১	পৌত্তলিক নারীদের বিয়ে কর না যতক্ষণ না তারা বিশ্বাস স্থাপন করে। একজন বিশ্বাসী ক্রীতদাসী পৌত্তলিক নারী অপেক্ষা উত্তম যদিও সে তোমাকে মোহিত করে এবং তোমাদের কন্যাদের পৌত্তলিকদের সঙ্গে বিবাহ দিও না যতক্ষণ না সে বিশ্বাস আনে। একজন বিশ্বাসী ক্রীতদাসও একজন পৌত্তলিক পুরুষের তুলনায় অনেক ভাল যদিও সে আকৃষ্ট করে। তারা নরকের আগুনের দিকে আহবান করে আর আল্লাহ আহবান করেন উদ্যান ও ক্ষমার দিকে। আল্লাহ তার অবতীর্ণ বাণী বিস্তারিতভাবে তুলে ধরেন যেন মানুষ তা স্মরণ করে। (Wed not idolatresses till they believe; for lo! a believing bondwoman is better than an idolatress though she please you; and give not your daughters in marriage to idolaters till they believe, for lo! a believing slave is better than an idolater though he please you. These invite unto the Fire, and Allah inviteth unto the Garden, and unto forgiveness by His grace, and expoundeth His revelations to mankind that haply they may

	remember.)

▪ **২.২২১** পৌত্তলিক নারীদের বিয়ে কর না ... যদিও সে তোমাকে মোহিত করে ... বিস্তৃতভাবে তুলে ধরেন যেন মানুষ তা স্মরণ করে : প্রকৃতিগতভাবে কোন মানুষের সাথে কোন মানুষের বৈবাহিক সম্পর্কে কোন বাধা নেই। আবার একই আদম-হাওয়ার সন্তান হিসেবে সব মানুষ এক। একই রক্তে-মাংশে গড়া। ফলে কোন মানুষের সাথে কোন মানুষের বৈবাহিক সম্পর্কে বাধা নেই বা থাকার কথা নয়। আবার মানুষ যে ধর্মেরই হোক না কেন, বৈবাহিক বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে গেলে প্রকৃতিগতভাবে তার প্রাপ্ত ফলাফল একই, অর্থাৎ 'সন্তান লাভ'। আল্লাহর স্বাভাবিক বা প্রকৃতিগত বিধান একই সত্যের ওপর প্রতিষ্ঠিত। এতে কোন ব্যাত্যয়ও হয়না বা হবে না। তাহলে প্রতিবন্ধকতা কোথায়? কেন এ নিষেধাজ্ঞা?

এ নিষেধাজ্ঞা 'আদর্শগত' কারণে। এ নিষেধাজ্ঞা 'ধারণাগত' কারণে। কেবল আদর্শ ও ধারণাগত কারণে এমন নিষেধাজ্ঞার কি কোন যৌক্তিকতা থাকতে পারে? অবশ্য সামাজিক শৃংখলা রক্ষা করা এবং সত্য ও ন্যায়কে সমুন্নত রাখার কারণেও এ নিষেধাজ্ঞা। সেটি কিভাবে? বিষয়টি বুঝে নিতে হবে।

বিশ্বাসীদেরকে এখানে পৌত্তলিকদের সাথে বিবাহজনিত সম্পর্কে যেতে বারণ করা হয়েছে। কারণ তাতে তাদের পৌত্তলিক হয়ে যাবার সম্ভাবনা আছে। সত্যি বলতে পৌত্তলিকদেরও তো বিশ্বাসী হবার সম্ভাবনা থাকে। কিন্তু পৌত্তলিক এ কারণে বিশ্বাসী হলে যে উপকার হবে তার চেয়ে একজন বিশ্বাসী পৌত্তলিক হলে এবং বংশ পরম্পরায় তার বিস্তৃতি ঘটলে সেটিকে এখানে অধিকতর ক্ষতিকর বলে গন্য করা হয়েছে। অর্থাৎ একজন বিশ্বাসীর প্রভাবিত হয়ে ভূল পথে যাওয়া অধিক ক্ষতিকর বলে বিবেচিত।

আদর্শ ও ধারণাগত সমস্যাটি কোথায়? কোরআন মূখ্য যে তিনটি কাজ করেছে তার অন্যতম একটি হচ্ছে 'শিরক' এর পাপ থেকে মানবজাতিকে রক্ষা করা [শিরক বা অংশীদারী দ্রষ্টব্য ২.২২]। অন্যভাবে বলা যায় 'তাওহীদ' বা আল্লাহর একত্বের বাণী প্রচার করা। এত বড় ও মহিমান্বিত কোরআনের মূখ্য একটি কাজ এটি! অতএব এর গুরুত্ব অনুধাবন করা অতীব প্রয়োজনীয়। কেন

কোরআন এ বিষয়টিতে এত গুরুত্ব দিয়েছে? আবার সামাজিক শৃংখলা রক্ষা এবং সত্য ও ন্যায়কে সমুন্নত রাখার ক্ষেত্রেও এর গুরুত্ব কি বা কোথায় বা কিভাবে বিষয়গুলি বুঝতে হবে?

'শিরক' এর পাপ মহাপাপ। আল্লাহ স্বয়ং একে এমন পাপরূপে আখ্যায়িত করেছেন যে, চাইলে আল্লাহ মানুষের সব পাপ ক্ষমা করে দিতে পারেন কিন্তু এ একটি পাপকে তিনি ক্ষমা করেন না। এটি এত জঘন্য পাপ হিসেবে আল্লাহর কাছে বিবেচিত।

মানুষ যদি নিজেকে দিয়েও বিবেচনা করে 'যে নিজের সাথে বিধাতার অদৃশ্য সংযোগ আছে, অন্যথায় মানুষ সচেতন বা জীবন্ত হয়ে উঠতে পারত না, কেননা মানুষের নিজস্ব কোন জীবন নেই বা চেতনা নেই' তাহলে সে বুঝতে পারবে যে- মানুষ নিজেও যখন কারও জন্য কিছু করে এবং উপকারভোগী যদি সেটি অস্বীকার করে বা সেটি অন্যের দান বলে প্রকাশ করার চেষ্টা করে তখন তার ভেতরে সেটি ক্ষোভ বা রোষের সৃষ্টি করে। এমনকি সে চিরদিনের জন্য অকৃতজ্ঞ তেমন কারও জন্য আর কিছু করতে পারে না। তার ভেতরের ইচ্ছেশক্তি নষ্ট হয়ে যায়। এ ক্ষোভ বা রোষ চিরস্থায়ী। ওপরে সবকিছু ভাল দেখালেও এ ক্ষোভ ভেতরে গভীর ক্ষত সৃষ্টি করে এবং চিরকাল থেকে যায়। এ আচরণটি অকৃতজ্ঞতা। এটি একটি অন্যায় কাজ। জঘন্য অপরাধ বা পাপ। যার ফলাফল ভয়ানক হতে পারে!

আল্লাহ মানুষের জন্য সব করেছেন। 'আল্লাহ' শব্দটিকে এভাবেই ধরে নিয়ে সৃষ্টিকর্তাকে মানবসমাজ বুঝতে শিখেছে। এমনকি তিনি মানুষকে জীবনও দিয়েছেন এবং তার বসবাসের জন্য এ জগত সৃষ্টি করেছেন। তার আহার ও নিরাপত্তার ব্যাবস্থা করেছেন। সেই মানুষ যখন শিরক করে অর্থাৎ আল্লাহর সাথে তার সমকক্ষ কাউকে গন্য করে এবং নিজ হাতে সৃজন করা সেই সৃজিতকেই মহাজগতের সকল সৃজনের কৃতিত্ব প্রদান করে সেটি আল্লাহর রোষের কারণ হয়ে দাড়ায়। এটি অন্যায় তবে তার চেয়েও বড় বিষয় হচ্ছে যে এটি সত্য না। মনগড়া বা বানোয়াট বিষয় বা মিথ্যে। মানুষের এমন ভূল বা মিথ্যে আচরণের কারণে সকল প্রাপ্তি একদিন বন্ধ হয়ে যেতে পারে। যেমন সতর্ক করে বলা হয়েছে,

"যদি তিনি ইচ্ছে করেন তবে তোমাদেরকে বিলুপ্ত করতে পারেন এবং নতুন সৃষ্টি নিয়ে আসতে পারেন।" (আল-কোরআন ১৪:১৯)

আল্লাহ মহান-উদার, তিনি ক্ষমাশীল তাই তিনি 'শিরক' এর জঘন্য ফলাফল সম্পর্কে মানবসমাজকে অবহিত ও সতর্ক করেছেন। একটি সুযোগ। অতঃপর এ বিষয়ে আর কোন যৌক্তিক আলোচনার প্রয়োজন নেই। এটিও বিশ্বাসজনিত একটি শর্তের মধ্যে পরে। বিশ্বাসী হলে এ কাজ করা যাবে না। কোন মানুষের জন্য এটি সঠিক করণীয় কাজ নয়। তাই অবিশ্বাসীদেরকে এ বিশ্বাসে বিশ্বাসী হতে আহবান করা হয়েছে।

আল্লাহর এ গুণের কারণে 'যে আল্লাহর সঙ্গে মানুষের অদৃশ্য সংযোগ আছে, কোন কোন মানুষ যা অনুভবও করতে পারে না' মানুষের সাথেও মানুষের এমন আচরণ করা কোনভাবেই উচিৎ নয়। কেননা এর ফলাফলও ভয়ানক হতে পারে! আবার এমনও হতে পারে যে অকৃতজ্ঞ মানুষ বুঝেও উঠতে পারবে না যে সে অজান্তেই ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে গেছে।

কৃতজ্ঞতা-অকৃতজ্ঞতা, বিশ্বাস-অবিশ্বাসের উর্ধ্বে উঠে এবার এ বিষয়ে মানব জ্ঞানের আলোকে কিছু আলোচনা তুলে ধরি।

পৌত্তলিক নিজ হাতে মূর্তী সৃষ্টি করে সে মূর্তীর আরাধনা করে। এটি নিশ্চিত যে মূর্তী তাকে সৃষ্টি করেনি, আবার তাকে লালন-পালনও করে না। আহার করতে অক্ষম হলেও মূর্তীর মুখে খাবার তুলে দেয়া হয়!

এসব কর্মকান্ডের সঙ্গে অজ্ঞতা ও মুর্খতার সম্পর্ক আছে। এগুলি জ্ঞানের পরিপন্থী কাজ। জ্ঞান ও বোধসম্পন্ন কোন মানুষ এমন কাজ করা উচিত নয়। কেননা পূঁজারী নিজেও জানে যে এ মূর্তী না তাকে সৃজন করেছে, না তাকে আহার করায়, না তার নিরাপত্তা বিধান করে। অথচ সে তাকে স্রষ্টার সমতুল্য গণ্য করে। যদিও বিষয়টি প্রতীকী তথাপি এ কাজ জ্ঞানসম্মত নয় এবং আত্মবিশ্বাসহীনতার ফল।

এ ধরণের মিথ্যে বা ভূল কাজের সাথে মূলত সম্পর্ক আছে নিজেকে চিনতে ও বুঝতে না পারার সাথে। নিজেকে চিনতে ও বুঝতে না পারলে মানুষ হয়ে যায় আত্মবিশ্বাসহীন। আত্মবিশ্বাসহীন মানুষ কোন কাজে নিজের ওপর ভরসা করতে পারে না। যে 'নিজ' (Self) বা 'আত্মা'র সাথেই বস্তুত সংযোগ বা

সম্পর্ক রক্ষিত হয় সৃষ্টিকর্তার। ফলে সে আল্লাহর ওপর ভরসা করে না। সে অন্যের দ্বারস্ত হয়। প্রতীকী কোন একটা কিছু তৈরী করে হাল ধরার চেষ্টা করা। বিধাতাকে পাওয়ার চেষ্টা করে। যে হাল জ্ঞানের অভাবের কারণে নিজে ধরতে পারছি না। কোরআনে বলা হয়েছে,

"সাবধান! নিষ্ঠাপূর্ণ উপাসনা কেবল আল্লাহরই প্রাপ্য! যারা আল্লাহ ব্যাতিত অপরকে উপাস্যরূপে গ্রহণ করে তারা (নিজেদের কার্যকলাপকে সঠিক প্রতীয়মান করার জন্য) বলে, 'আমরা তাদের উপাসনা করি এ জন্য যে, তারা যেন আমাদেরকে আল্লাহর সান্নিধ্যে নিয়ে আসে।' তারা যে বিষয়ে মতপার্থক্য করছে আল্লাহই তার মিমাংসা করবেন। আল্লাহ তাকে পথ প্রদর্শন করেন না যে মিথ্যে বলে এবং যে অকৃতজ্ঞ।" (আল-কোরআন ৩৯:৩)

অর্থাৎ কম জ্ঞানসম্পন্ন লোকেরা আল্লাহকে বুঝতে পারে না বিধায় প্রতীকী কিছু একটা সৃষ্টি করে তার মাধ্যমে বিধাতায় মনোনিবেশ করার চেষ্টা করে। শিশুদেরকে যেভাবে একটি ছবি, দুইটি ছবি এভাবে দেখিয়ে এক, দুই শেখান হয় বিষয়টি তেমন। কোরআনেও তাদের কার্যকলাপ বিষয়ে সে কথাই বলা হয়েছে। তারা প্রতীক সৃষ্টি করে বিধাতাকে কল্পনা করে। এতে তাদের বিধাতায় মন দিতে সুবিধা হয়। একই কথা গীতায় এভাবে বলা হয়েছে,

"যারা ... আমার অপ্রকাশিত রূপ যা ইন্দ্রিয়গ্রাহ্যতার অতীত, যা সবকিছুকে অধিভূক্ত করে আছে, যাকে ধারণা-কল্পনা করা যায় না, ধ্রুব এবং নিশ্চল- পরম সত্যের নৈর্ব্যক্তিক বা নিরাকার স্বরূপকে পরিপূর্ণরূপে উপাসনা করে, তারা অবশেষে আমাকে লাভ করে। (তবে) যারা ভগবানের অপ্রকাশিত নৈর্ব্যক্তিক রূপে অনুরক্ত, তাদের পক্ষে সে পথে অগ্রগমন অত্যান্ত কষ্টকর। কেননা দেহবিশিষ্টদের জন্য অব্যাক্তের উপাসনা দুরুহ বা কঠিন হয়।" (গীতা ১২:৩-৫)

'দেহবিশিষ্টদের জন্য অব্যাক্তের বা নিরাকারের উপাসনা দুরুহ বা কঠিন হয়।' তাই তারা প্রতীকী কোন একটা কিছু সৃষ্টি করে বা একটি রূপ কল্পনা করে তাতে মনোনিবেশ করার চেষ্টা করে। তবে এটি জ্ঞানসম্মত নয়। তাই গীতায় একই কথা আবার এভাবেও বলা হয়েছে যে, "স্বল্প জ্ঞানের মানুষ (প্রতীকী) দেব-দেবীদের উপাসনা করে।" (গীতা ৭:২৩)

গোটা মানবজাতিকে আত্মবিশ্বাসহীন এমন নির্জ্ঞানতার ছোবলে পড়তে দেয়া যায় না। তাহলে মানবজাতিই একটা মুর্খ ও মেরুদন্ডহীন বা আত্মবিশ্বাসহীন সৃষ্টিতে পরিণত হবে। এমন নির্জ্ঞানতার ছোবল থেকে অবশ্যই মানুষকে তথা সর্ব-সাধারণকে রক্ষা করার দায়িত্ব আছে।

কিছু মানুষ বর্তমান সময়ে এসব বিষয়ের ভাল-মন্দ নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করে না। বস্তুত বর্তমানে শিক্ষিত সমাজে তেমনটি খুব বেশী প্রয়োজনীয়ও নয়। জীবন ও জগতে অনেক পরিবর্তন এসেছে। ওপরের বক্তব্যগুলি সব মানুষই কমবেশী বোঝে। তবে মানুষ একটি সমাজের প্রচলিত ধারা ও সংস্কৃতি মেনে চলে। অপ্রয়োজনীয় ঝামেলা এড়িয়ে চলতে চায়। অন্তত এ বিষয়ের সত্য উদঘাটনে মানুষ এখন আর ততটা আগ্রহী নয়। বলা যায় উদাসীন। উদাসীনতাই বর্তমান সময়ে এসব বিষয় নিয়ে অধিকাংশ মানুষকে ভাবতে দেয় না বা দুরে সরিয়ে রাখে। কিংবা বলা যায় যে, কোন কোন শিক্ষা ব্যাবস্থা ও মিশ্র সংস্কৃতিও (Cross-culture) মানুষের একটা দলকে এসব বিষয় থেকে দৃষ্টি সরিয়ে রাখতে সক্ষম হয়েছে। ফলে এ বিষয়ে অনেকেই আজকাল গড্ডালিকায় গা ভাসিয়ে চলছে। অর্থাৎ সমাজ-সংস্কৃতি যেভাবে চলছে সবাই সে তালে চলছে। বরং অনুষ্ঠানের আনন্দ উপভোগ করছে। বস্তুত মানুষের এখন মূখ্য প্রয়োজন শান্তিতে একটু ভাল থাকা। আর তার জন্য প্রয়োজন অর্থ। মানুষের ভাবনার কেন্দ্রবিন্দুতে এখন 'অর্থনীতি' এবং চিরকালই তাই ছিল।

এটিও সত্য যে, বর্তমান সময়ে জাগতিক ব্যাবস্থাপনায় অকল্পনীয় পরিবর্তন এসেছে। পৃথিবী আগের মতো নেই। ধর্মের মূল কাজ মানুষকে সঠিক পথে চালনা করা [ধর্ম দ্রষ্টব্য ২.৩.৩]। মানব ব্যাবস্থাপনায় ধর্ম একদা যে কাজ করেছে, বর্তমান সময়ে আধুনিক বৈজ্ঞানিক ব্যাবস্থাপনাই সে কাজ করে চলেছে আরও সুচারুরূপে। অর্থাৎ এক অর্থে ধর্মীয় কাজ এখন অনেক উন্নতমানের হয়েছে। কোথাও বিচ্যূতি, অন্যায় বা অশান্তির সৃষ্টি হলে কেবল ধর্মই নয়, যথাযথ কর্তৃপক্ষ বা ব্যাবস্থাপনা বা জগত পরিচালনাকারীরা ব্যাবস্থা গ্রহণে তৎপর। সবকিছু প্রাতিষ্ঠানিক ভিত্তির ওপর দাড়িয়ে গেছে। উপরন্তু সামাজিক চাপও আছে। মানুষ এখন অন্যায়ের বিরুদ্ধে অনেক বেশী সোচ্চার। বর্তমানে ধর্মীয় লেবাসধারী মানুষের চেয়ে জগত পরিচালনাকারীরাই সত্য ও ন্যায়ের

অর্থাৎ ধর্মের বা আল্লাহর পথকে অধিক গুরুত্ব দিয়ে থাকে। ফলে প্রচলিত বা তথাকথিত ধর্মীয় বিষয় নিয়ে অতি ভাবনার আজ আর তেমন প্রয়োজন নেই। এতদ্বসত্ত্বেও ভাল কাজে উদ্বুদ্ধকরণের পেছনে ধর্ম এক দারুণ প্রেরণা হয়ে কাজ করে! একটি দলীয় শক্তি হিসেবে কাজ করে। যা অন্যায়কে উৎপাটনে আল্লাহর সহায়ক শক্তি হয়ে কাজ করে। এর গুরুত্ব কোনদিন ফুরিয়ে যাবে বলে মনে হয় না।

আল্লাহ মানুষকে সহজ-সরল পথে চলার নির্দেশনা দিয়েছেন। কোনটি ভাল, কোনটি মন্দ তা পরিস্কারভাবে নির্দেশ করে দিয়েছেন। আল্লাহর দেখান পথ অনুসরণ করে চললে সমাজে মন্দ কিছুই প্রবেশ করতে পারবে না। কি করা যাবে, কি করা যাবে না তা সুস্পষ্টভাবে মানুষের কাছে আজ প্রতিভাত। সেটি সম্ভব হয়েছে তাঁর প্রদত্ত আদি থেকে চলে আসা দিক-নির্দেশনার কারণে। গভীর মনযোগের সঙ্গে পর্যালোচনা করলে সকলের জন্যই বোঝা সহজ হবে যে, আধুনিক ব্যাবস্থাপনাও বস্তুত বিবিধ ধর্মে বিধাতা প্রদর্শিত দিক-নির্দেশনা সমুহই অনুসরণ করে, এমনকি বিজ্ঞানও!

আল্লাহর সুস্পষ্ট, বিস্তারিতভাবে বর্ণিত এবং প্রকাশিত বা অগোপনীয় দিক-নির্দেশনা সমাজের স্বার্থান্বেষী-লোভী ও ধূর্ত মানুষের দুষ্টুমি করার ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতাস্বরূপ। তাদেরকে তাদের দুষ্টু স্বার্থ উদ্ধার করার জন্য তাই নিজেদের মতো করে কিছু নিয়ম, রীতি-নীতি প্রতিষ্ঠা করে নিতে হয়। সে নিয়মে মানুষকে বশে নিয়ে আসতে হয়। তাই ভূল নিয়মে বিশ্বাস স্থাপন করাতে হয়।

আল্লাহর সুস্পষ্ট দিক-নির্দেশনা জানা থাকলে এবং তা মেনে চলার মানসিকতা থাকলে তার বাইরে গিয়ে কে দুষ্টদের কথা শুনতে যাবে? কে আল্লাহর দিক-নির্দেশনার বাইরে গিয়ে প্রতিষ্ঠা করা অন্য কোন নিয়ম-রীতি মানতে যাবে? ভূল পথে গমন না করতে চাইলে বিশ্বাসীকে তাই কঠিনভাবে বিশ্বাসকে ধারণ করতে হবে। অথচ স্বার্থ উদ্ধারে দুষ্টদের নিজেদের মতো করে কিছু নিয়ম-রীতি প্রতিষ্ঠা করা প্রয়োজন বা করতেই হবে। তারা জানে যে, অন্যথায় সাধারণ মানুষ তাদের কথা শুনবে না।

স্বার্থ উদ্ধারের কৌশল হিসেবে মানব মনে কোন একটা কিছুর প্রতি মিথ্যে ভয় বা আতংক সৃষ্টি করতে হয় বা প্রবেশ করাতে হয়; কিংবা মিথ্যে কোন

একটা কিছুর প্রতি অতি ভক্তি ও ভালবাসা সৃষ্টি করাতে হয়। ফলে তাদেরকে আল্লাহর সমকক্ষ কোন একটা কিছু দাঁড় করিয়ে নিতে হয়। এটিই হচ্ছে 'তাগুদ' [তাগুদ দ্রষ্টব্য ২.১৬৬]। যাকে মাধ্যম ধরে তারা আল্লাহ প্রতিষ্ঠিত নিয়মকেও অতি সুকৌশলে ও সন্তর্পনে ভেঙ্গে ফেলতে সক্ষম হয়। নব্য প্রতিষ্ঠিত 'তাগুদ' এর বিপক্ষে কথা বলা সমাজের মানুষের পক্ষে অসম্ভব হয়ে ওঠে না। বিষয়টিকে সেভাবেই কলে-কৌশলে অসম্ভব করে তোলা হয়। এভাবেই সমাজে 'শিরক' এর প্রবেশ ঘটে। অতঃপর মরণ ছোবল দেয়।

প্রসঙ্গক্রমে বলে রাখি। 'তাগুদ' কিংবা 'শিরক' বিষয়গুলি খারাপ ভাইরাসের মতো কাজ করে। যার পেছনের কারিগর শয়তান বা দুষ্ট ও স্বার্থান্বেষী প্রকৃতির লোক। যে সত্যের মতো করে মিথ্যে কোন একটা কিছু প্রতিষ্ঠা করে। অথচ তারা ভুলে যায় বা জানে না যে আল্লাহর কাছে আছে এন্টি-ভাইরাস। তাই আল্লাহ বলেন,

"আমি সত্যকে মিথ্যের বিপক্ষে নিক্ষেপ করি, অতঃপর সত্য মিথ্যের মস্তক চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দেয় এবং নিশ্চয়ই! মিথ্যে নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়। তোমরা তাঁর (আল্লাহর) প্রতি যে অংশীদারীত্ব আরোপ (শিরক) কর (যা মিথ্যে) তার জন্য তোমাদের দূর্ভোগ পোহাতে হবে।" (আল-কোরআন ২১:১৮)

উল্লেখ্য যে, ভাইরাস যেমন পাতলা মেমব্রেন বা আবরণ ভেদ করে দেহের ছোট্ট একটি কোষে প্রথমে প্রবেশ করে, তারপর তার বিস্তার ঘটিয়ে ভেতরের প্রতিষ্ঠিত নিয়মকে ভেঙ্গে তছনছ করে দেয় এবং দেহ নামক বিশ্ব-ব্যাবস্থাকে অসুস্থ করে তোলে; মানবসমাজে 'শিরক' তেমনিভাবে প্রতিষ্ঠিত সামাজিক ও মানসিক পর্দাকে ছেদ করে প্রাথমিক অবস্থায় মানব দেহের কোষের মতোই ছোট্ট একটি সামাজিক পরিসরে প্রবেশ করে। তারপর ডাল-পালা ছড়িয়ে বিস্তার লাভ করে। বৃহৎ পরিসরে বিশ্ব-ব্যাবস্থার সুষ্ঠু পরিচালনকে বিশৃংখল করে দেয়। যার পরিণতিই হচ্ছে সামাজিক অন্যায়-অত্যাচার-নিপীড়ন-নির্যাতন ও পাহাড় পরিমান আর্থ-সামাজিক বৈষম্যের সৃষ্টি। উল্লেখ্য যে, আজকের এই লেখাটিও একটি এন্টি ভাইরাস তূল্য। যথাযথভাবে প্রচার করা সম্ভব হলে কাজ করবে।

প্রসঙ্গে ফিরে আসি। উল্লেখ করেছি যে, পূঁজনীয় সেই কিছু একটার প্রতি বা 'তাগুদ' এর প্রতি মানুষের ভয় বা ভক্তি-ভালবাসা সৃষ্টি করাতে হয়। যখন সমাজের মানুষের মনে সেটি প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব হয়, তখন আল্লাহর সমকক্ষ নব্য প্রতিষ্ঠিত তাগুদের নামে নিজেদের সুবিধামতো কিছু নিয়ম-রীতি প্রচলন করা সম্ভব হয়ে যায়। যা আল্লাহর নামে করা কখনই সম্ভব হত না। কেননা আল্লাহর সুস্পষ্ট নির্দেশনা জগতবাসীর কাছে প্রকাশিত এবং 'আল-কোরআন' হচ্ছে তারই প্রমান ও নিদর্শন। আল্লাহর নির্দেশনা বিকৃত করতে বা গোপন করতেও নিষেধ করা হয়েছে। প্রচার করতে বলা হয়েছে। আবার এটি জগতব্যাপি এমনভাবে প্রকাশিত যে তা বিকৃত করাও সম্ভব নয়। বলা হচ্ছে,

"তোমার পালনকর্তা তোমার প্রতি যে প্রত্যাদেশ অবতীর্ণ করেছেন তা পাঠ কর (প্রকাশ কর/প্রচার কর)। কেউ নেই যে তাঁর বাণী/শব্দসমুহের পরিবর্তন করতে পারে।" (আল-কোরআন ১৮:২৭)

"(হে মোহাম্মদ) তুমি যা নির্দেশিত হয়েছ তা প্রকাশ্যে জানিয়ে দাও ... যারা আল্লাহর সঙ্গে অন্যান্য উপাস্য সাব্যস্ত করেছে, তারা অতি সত্তর জানতে পারবে।" (আল-কোরআন ১৫:৯৪-৯৬)

"যারা অবতীর্ণ বাণীসমুহকে নিজেদের সুবিধামতো পরিবর্তন/বিকৃত করে, তারা আমার অগোচরে নয়। ... তোমরা যা ইচ্ছে কর; নিশ্চয়ই! তিনি দেখেন তোমরা যা কর।" (আল-কোরআন ৪১:৪০)

সত্য হচ্ছে যে, 'শিরক' সমাজে দুষ্টুমি প্রবেশ করায় বা বলা যেতে পারে যে প্রবেশ করাবার পথ উন্মোচন করে দেয়। অতঃপর সেটি ডাল-পালা ছড়িয়ে একসময় মহা অত্যাচার-অনাচারে পরিণত হয়। মানুষ চাইলেও আর সেখান থেকে অতি সহজেই বেরিয়ে আসতে পারে না। নানান নিয়মের যাঁতাকলে পরে সাধারণ মানুষের জীবনে নাভিঃশ্বাস উঠে যায়। যখন বুঝতে পারে তখন মানুষ ঠিকই এসবের যাঁতাকল থেকে নিষ্কৃতি পেতে চায়; কিন্তু পায় না। মানবীয় হিসেবে সমস্যা সমাধানের বিষয় বা প্রক্রিয়াগুলি ধীর ও দীর্ঘমেয়াদী। একটি ভূল ধারণা সমাজে প্রবেশ করান যেমন সময় সাপেক্ষ ও কঠিন; তেমনি তা দুর করা আরও দুরুহ। যুগে যুগে তাই মহামানবদের আবির্ভাব ঘটে

সাধারণ মানুষকে এমন দুর্দশা বা দুষ্টদের হাত থেকে উদ্ধার করে সহজ-সরল পথ প্রদর্শনের জন্য। ধর্মকে পুনঃপ্রতিষ্ঠা করার জন্য।

তাগুদকে উছিলা ধরে কত ভয়ংকর ও অপরামূলক কাজ মানুষকে দিয়ে করিয়ে নেয়া সম্ভব হয় তা নিচের উদ্ধৃতিগুলি থেকে বুঝে নেয়া সম্ভব।

"তারা ক্ষতিগ্রস্ত যারা নির্জ্ঞানতা বশতঃ নিজ সন্তানদেরকে হত্যা করেছে এবং আল্লাহ তাদেরকে যা দিয়েছেন (কন্যা সন্তান), আল্লাহর প্রতি ভ্রান্ত ধারণা পোষনের মাধ্যমে তারা তা নিজেদের জন্য নিষিদ্ধ করে নিয়েছে। নিশ্চিতভাবেই তারা পথভ্রষ্ট হয়েছে এবং সুপথে পরিচালিত নয়।" (আল-কোরআন ৬:১৪০)

".. (বিচার দিবসে) জানতে চাওয়া হবে 'কন্যা শিশু' যাকে জীবন্ত কবর দেয়া হয়েছে কি অপরাধে তাকে হত্যা করা হয়েছিল" (আল-কোরআন ৮১:৮-৯)

আমরা যদি আমাদের উপমহাদেশের দিকেও দৃষ্টি ফেরাই তবে দেখতে পাব যে, এখানেও সতীদাহ প্রথার নামে নারীদের ওপর কেমন অন্যায় ও নৃশংস আচরণ করা হয়েছে। এ সবই করা হয়েছে কোন না কোন তাগুদের মাধ্যমে ভ্রান্ত নিয়ম সৃষ্টি করে যে নির্দেশনা আল্লাহ প্রদত্ত নয়।

আল্লাহ প্রদর্শিত পথে জটিলতা নেই। সকলেই সে নিয়মের অধীনে থেকে ন্যায্যতার ভিত্তিতে সমঅধিকার, সমমর্যাদা ও অপরাপর সকল সুবিধা ভোগ করতে পারে। কিন্তু যে কোন একটি 'তাগুদ'কে ব্যাবহার করে সমাজে 'শিরক' এর প্রবেশ ঘটানো হয়। অতঃপর সেই উছিলা ধরে আল্লাহও অনুমোদন করেননি সমাজে এমনসব কু-প্রথা প্রতিষ্ঠা করা হয়। এভাবে সমাজে অন্যায়, অত্যাচার-নির্যাতন ও বৈষম্য সৃষ্টির পথ সৃষ্টি করা হয়। একটি অতি বুদ্ধিমান সুবিধাভোগী গোষ্ঠী বা কিছু মানুষ এর পেছনে কাজ করে। তারা কোন মানব মূর্তীকেও দেবতাতূল্যরূপে গড়ে তুলে আর্থিক সুবিধা লুটে নেয়। এমনকি রাষ্ট্রিয় সম্পদও কেবল নিজেরাই ভোগ-দখল করে। তাই 'শিরক' এর উৎপাটন এক অর্থে সমাজ থেকে 'অত্যাচার-নির্যাতনের মূলোৎপাটন' বা 'বৈষম্যের উৎপাটন'। বস্তুত সর্বক্ষেত্রে 'বৈষম্য'ই জীবন ও জগতকে কষ্টকর করে তোলে।

বৈবাহিক সম্পর্ক সৃষ্টির মধ্য দিয়ে জগতময় নির্জ্ঞানতা, অজ্ঞতা, আত্মবিশ্বাসহীনতা ও মন্দ পরিণতি প্রসার লাভ করার সম্ভাবনা তৈরী হয়

বিধায় আয়াতে সে সম্পর্ক স্থাপন করতে বারণ করা হয়েছে। এতে যেমন ইহলৌকিক মন্দ পরিণতি বিদ্যমান আছে, তেমনি বিশ্বাসীদের জন্য পরকালে আল্লাহর দিক থেকে কঠিন শাস্তির কথা বলা হয়েছে। অজ্ঞতা থেকে মুক্তি লাভের জন্য সকলকে তাই কোরআনের দর্শনে বিশ্বাসী হতে আহবান জানান হয়ে থাকে।

পৌত্তলিকদের সাথে সম্পর্ক সৃষ্টি বিশ্বাসীদের অগ্নির শাস্তির দিকে আহবান করে বলে বলা হয়েছে। এটি বলা হয় বিশ্বাসীদেরকে এ নির্দেশ যথযথভাবে পালন করার জন্য বা পথচ্যুত না হওয়ার জন্য। অন্যদিকে জ্ঞানের পরিপন্থী কাজ বিশ্বাসী-অবিশ্বাসী নির্বিশেষে সকলকেই মন্দ পরিণতির দিকে নিয়ে যায়। সকল মন্দ পরিণামই নারকীয় যন্ত্রনায় পূর্ণ। উল্লেখ্য যে, কোন পৌত্তলিক যদি বিশ্বাসের পথে ফিরে আসে তবে তার সাথে বৈবাহিক সম্পর্ক সৃষ্টিতে কোন বাধা নেই।

➢ (আয়াত ২২২-২২৩) ঋতুস্রাব (Menstruation), পরিচ্ছন্নতা (Care for Cleanness) ও নারীদের (Women) প্রসঙ্গে বলা হয়েছে।

২২২	(হে মোহাম্মদ) তারা তোমার কাছে জানতে চায় ঋতুস্রাব সম্পর্কে। বল: এটি একটি অসুস্থতা। এ সময় নারীদেরকে একা থাকতে দাও। তারা পরিচ্ছন্ন না হওয়া পর্যন্ত তাদের নিকটবর্তী হয়ো না। যখন উত্তমরূপে পরিচ্ছন্ন হয়ে যাবে তখন গমন কর, যেভাবে আল্লাহ তোমাদের নির্দেশ করেছেন। সত্যিকার অর্থেই আল্লাহ তাদের ভালবাসেন যারা ক্ষমাপ্রার্থী হয়ে তার অভিমুখে ফিরে এবং যারা পরিচ্ছন্নতার প্রতি বিশেষ যত্নবান। (They question thee (O Muhammad) concerning menstruation. Say: It (menstruation) is an illness, so let women alone at such times and go not in unto them till they are cleansed. And when they have purified themselves, then go in unto them as Allah hath enjoined upon you. Truly Allah loveth those who turn unto Him, and loveth those who have a care for cleanness.)

২২৩	তোমাদের স্ত্রীরা হল তোমাদের জন্য শস্য ক্ষেত্রের মতো। অতএব তোমার শস্য ক্ষেত্রে যাও যখন ইচ্ছে কর। আর তোমার নিজের মঙ্গলের জন্য পূর্বেই ভাল কাজ প্রেরণ কর এবং আল্লাহকে ভয় কর এবং জেনে রেখ, (একদিন) তোমাকে তাঁর সাক্ষাৎ লাভ করতেই হবে। বিশ্বাসীদেরকে সুসংবাদ দাও (হে মোহাম্মদ)। (Your women are a tilth for you (to cultivate) so go to your tilth as ye will, and send (good deeds) before you for your souls, and fear Allah, and know that ye will (one day) meet Him. Give glad tidings to believers, (O Muhammad).)

▪ **২.২২২.১** তারা তোমার কাছে জানতে চায় ঋতুস্রাব সম্পর্কে। বল: এটি একটি অসুস্থতা। এ সময় ... তাদের নিকটবর্তী হয়ো না : নারীদের ঋতুস্রাবকে শারীরিক বিষয় সম্পর্কিত অসুস্থতা বলা হয়েছে। এটি একটি সৃষ্টিগত ও প্রাকৃতিক বিষয়। এ সময়ে তাদের নানা রকমের শারীরিক ও মানসিক সমস্যা হয়। তাদের প্রতি বিশেষ যত্নবান হতে বলা হয়েছে। তাদের অস্বস্তিবোধ হয় বা বিরক্তির কারণ হয় এমন কিছু করতে বারণ করা হয়েছে। তাই বলা হয়েছে 'তাদেরকে (এ সময়ে) একা থাকতে দাও'।

আবার এ 'একা' থাকার মানে এই নয় যে তাদের সাথে স্বাভাবিক চলা-ফেরা, দেখা-সাক্ষাৎ, কথা-বার্তা বলা যাবে না বা একেবারেই তাদের সংস্পর্শে যাওয়া যাবে না বিষয়টি এমন নয়। তাদেরকে এ সময় অস্পৃশ্য ভাবারও কোন কারণ নেই। আল্লাহর কোন নির্দেশনাকে ভূলভাবে বোঝার বা ব্যাখ্যা করার অবকাশ নেই।

সৃষ্টিগতভাবে এটি একটি শারীরিক সমস্যা; উপরন্তু এ কারণে মানসিক সমস্যারও সৃষ্টি হয় এবং শরীর অপরিচ্ছন্ন থাকে তাই 'তাদেরকে একা থাকতে দাও' এর দ্বারা এ সময়ে তাদের সাথে শারীরিক সম্পর্কে না যাওয়াকে বোঝান হয়েছে।

উল্লেখ্য যে, স্বাভাবিক সম্পর্কের কোন কিছুই এ সময়ে নিষিদ্ধ নয় এবং এ সময়ে তাদেরকে অস্পৃশ্য মনে করারও কোন কারণ নেই। তাদের হাতে খাওয়া যাবে না বা ইত্যাকার কোন কুসংস্কারে বিশ্বাস করাও সঠিক নয়।

▪ **২.২২২.২** যখন উত্তমরূপে পরিচ্ছন্ন হয়ে যাবে তখন গমন কর, যেভাবে আল্লাহ তোমাদের নির্দেশ করেছেন : ঋতুস্রাবের বিষয়টি যেহেতু একটি শারীরিক সমস্যা, উপরন্তু এ কারণে মানসিক সমস্যারও সৃষ্টি হয় এবং শরীর অপরিচ্ছন্ন থাকে তাই পরিচ্ছন্ন না হওয়া পর্যন্ত নারীদের নিকট গমন করতে বারণ করা হয়েছে। এ গমন করার অর্থ হচ্ছে এ সময়ে সহবাস নিষিদ্ধ। শারীরিক অসুস্থতা কেটে গেলে এবং পরিচ্ছন্ন হওয়ার পর গমনের পরামর্শ দেয়া হয়েছে।

উল্লেখ্য যে, উপাসনাকে প্রতিষ্ঠা করতে বলা হয়েছে। এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক-নির্দেশনা। মানুষ তার প্রতিটি কর্মের মধ্য দিয়েও স্রষ্টার উপাসনা করে। প্রত্যেকটি কর্মকেই প্রাতিষ্ঠানিক ভিত্তির ওপর দাড়াতে এ নির্দেশনা গুরুত্বপূর্ণ ও ইংগিতপূর্ণ দিক-নির্দেশনা হয়ে কাজ করে। এ দিক-নির্দেশনা সব কাজের প্রাতিষ্ঠানিক ভিত্তির গুরুত্বকে তুলে ধরে।

কোরআনের বার্তা যখন অবতীর্ণ হয়েছে সে সময়ে চিকিৎসা বিজ্ঞান আজকের মতো উন্নত হয়নি। বর্তমানে এ বিষয়ে মানুষের জ্ঞান অনেক সমৃদ্ধ হয়েছে। যখন আধুনিক চিকিৎসা শাস্ত্রের জ্ঞান ছিল না তখন এসব দিক-নির্দেশনা মানুষকে সঠিক পথ প্রদর্শন করেছে। সে আলোর পথ ধরেই মানুষ আজ বর্তমান পর্যায়ে এসে পৌঁছেছে। বর্তমানে এসব বিষয়ে জ্ঞান বা পরামর্শ দেয়ার বা অর্জনের জন্য নানাবিধ প্রাতিষ্ঠান রয়েছে। অর্থাৎ প্রাতিষ্ঠানিক ভিত্তি দাড়িয়ে গেছে যা পূর্বে ছিল না। এসব বিষয়ে বর্তমানে ডাক্তারী পরামর্শ গ্রহণ করে পদক্ষেপ নেয়া বাঞ্ছনীয়।

▪ **২.২২২.৩** সত্যিকার অর্থেই আল্লাহ তাদের ভালবাসেন যারা ক্ষমাপ্রার্থী হয়ে তার অভিমুখে ফিরে এবং যারা পরিচ্ছন্নতার প্রতি বিশেষ যত্নবান : নারীদের অসুস্থতা বা ঋতুস্রাবজনিত সময়টি পেরিয়ে গেলে পরিচ্ছন্ন হওয়ার পর তাদের নিকট গমন করার কথা বলা হয়েছে। তাই স্মরণ করিয়ে দেয়া হয়েছে যে আল্লাহ পরিচ্ছন্নদের ভালবাসেন। আল্লাহ প্রদত্ত নির্দেশনা পালন করার বিষয়ে এভাবে উদ্বুদ্ধ করা হয়েছে।

যারা বিশ্বাসী তারা আল্লাহ যা ভালবাসেন তা পালন করবে। তাই সকলকে বিশ্বাসী হতে আহবান করা হয় যেন আল্লাহকে ভালবেসে সকলে সঠিক পরিচালিত হতে পারে। পবিত্র হয়ে চলা-ফেরা ও কাজ-কর্ম করে।

এতদ্বসত্বেও এ নির্দেশনা পরিপালনের ক্ষেত্রে যদি কেউ ভূল করে থাকে, তবে বলা হচ্ছে যে, 'আল্লাহ তাদের ভালবাসেন যারা ক্ষমাপ্রার্থী হয়ে তার অভিমুখে ফিরে আসে'। অর্থাৎ নিরাশ হতে বারণ করা হয়েছে। সব সমস্যারই সমাধানের পথ আছে। তবে তার জন্য আন্তরীক হয়ে ভূলের বা নির্দেশনা অমান্যের পুনরাবৃত্তি না করার শপথ বা সংকল্প ভেতরে থাকতে হবে। আল্লাহর কাছে ভূলের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করতে হবে।

■ **২.২২৩.১** তোমাদের স্ত্রীরা হল তোমাদের জন্য শস্য ক্ষেত্রের মতো। অতএব তোমার শস্য ক্ষেত্রে যাও যখন ইচ্ছে কর : এটি কেবলই একটি উপমা। এখানে ভূল বোঝার বা বোঝাবার কোন অবকাশ নেই। আল্লাহ পবিত্র কোরআনে এমনি অনেক সাদৃশ্যশীল উপমা তুলে ধরেছেন। এ উপমায় কোন প্রকারের ক্রুটি, বিচ্যুতি বা কোন ভূল নেই।

ফসলের মাঠে লাঙ্গল দিয়ে কর্ষন করে যেমন বীজ বপণ করা হয়, এক্ষেত্রেও তেমনি কর্ষন করে জমিনে বীজ বপন করা হয়। এটি কেবলই একটি উপমামাত্র। অতঃপর নির্দিষ্ট সময় পর ফসল ফলে।

'শস্য ক্ষেত্রে যাও যখন ইচ্ছে কর'- এর দ্বারা যথাসময়ে অর্থাৎ ওপরে উল্লেখিত নিষিদ্ধ সময় ব্যাতিত যাবার অনুমতি দেয়া হয়েছে, কিংবা যাওয়ায় কোন বাধা বা নিষেধ নেই সেটি বুঝিয়েছে। কিন্তু মানুষ কখন যাবে, কেন যাবে, কিভাবে যাবে সেটি অবশ্যই উভয়ের বিবেচনাপ্রসূত বিষয়! যদি শস্য ক্ষেত্রের উদাহরণকেও বিবেচনা করা হয় তবে কৃষকও শস্য ক্ষেত্রে যখন তখন যেতে পারে কিন্তু যখন তখন কর্ষন করতে পারে না। একটা মৌসুম প্রয়োজন হয়। শস্য ক্ষেত্রকে প্রস্তুত হতে হয়। কৃষককেও পরিপূর্ণ প্রস্তুত হতে হয়। একটা নিয়ত থাকতে হয়। অনুমতি থাকলেও সবদিক বিবেচনা করে কাজটি করতে হয়। অতএব বিষয়টি নিয়ে অতি বিশ্লেষণের প্রয়োজনীয়তা আছে বলে মনে হয় না। কোরআন তার বার্তার মাধ্যমে কেবল যাবার অনুমোদন দিয়েছে, যেন

মানুষ ভূলভাবে বিরত না থাকে বা কোন প্রকার কুসংস্কার যেন মানুষকে পেয়ে না বসে।

শস্য ক্ষেত্রে যাও যখন ইচ্ছে কর। কৃষকও তার শস্য ক্ষেতে যখন ইচ্ছে করে যায়। কিন্তু সে সময় জানে। সময়ে সে কাজটি করে। সে নিজের অবস্থা, জমিনের অবস্থা, আবহাওয়া অনেক কিছু ভেবে-চিন্তে কাজটি করে। যখন ইচ্ছে করে বললেই কোন বিচার-বিবেচনা, আলাপ-আলোচনা ছাড়া যখন-তখন কাজ করা যায় না।

যখন ইচ্ছে করে কথাটি কার্যকর হয় তখন যখন প্রয়োজনীয় সব বিষয়গুলি অনুকূলে কাজ করে। এগুলি খুব সাধারণ জ্ঞানের বিষয়। এসব নিয়ে বিতর্ক বা সমালোচনা কিংবা ভূল বোঝার কোন অবকাশ নেই। যেহেতু তেমনটি হতে দেখা যায় তাই কথাগুলি এভাবে বলা হল।

এ বাণীর আরও একটি অর্থ হচ্ছে এই যে, মানুষ যেন কোন প্রকারের ভূল বোঝা বা উপলব্ধি থেকে বা ভূল ব্যাখ্যার কারণে আল্লাহ নির্দেশিত ও অনুমোদিত উত্তম ও পবিত্র এ কাজ থেকে নিজেকে বা নিজেদেরকে কখনও বিরত না রাখে। কাজটি করতে বা চলমান রাখতেও এর মাধ্যমে মানুষকে উৎসাহিত করা হয়েছে। এটি মানুষের অন্যতম একটি গুরু দায়িত্বের মধ্যে পরে। অন্যথায় কারও বংশের ধারা কিংবা পৃথিবী থেকে সম্পূর্ণ মানব সম্প্রদায়ই নিশ্চিহ্ন হয়ে যেতে পারে।

উপরন্তু এটি মানুষের শারীরিক ও মানসিক প্রশান্তির জন্য একটি অপরিহার্য্য কাজ। শরীর-মন সুস্থ্য রাখে। অন্যথায় মানুষের কর্মক্ষমতা কমে আসবে। মানুষ পরিশ্রান্ত হয়ে যাবে। পুনঃ উদ্যোমে কাজ করতে পারবে না। বিষয়গুলিকে যথাযথভাবে বুঝতে হবে।

▪ **২.২২৩.২** আর তোমার নিজের মঙ্গলের জন্য পূর্বেই ভাল কাজ প্রেরণ কর এবং আল্লাহকে ভয় কর এবং জেনে রেখ, তোমাকে তাঁর সাক্ষাৎ লাভ করতেই হবে : কৃষাণ-কৃষাণী নিজেদের ভবিষ্যত চিন্তা করে উত্তম ফসল ফলাবার চেষ্টা করে। তেমনি মানুষকেও তার নিজের মঙ্গলের জন্য পূর্বেই ভাল কাজ করে যেতে হবে। যা পরবর্তীতে উত্তম ফলাফল দেবে। হোক সেটি ইহকাল কিংবা পরকাল।

উত্তম সন্তান মানুষের বার্ধক্যকালের জন্য উপকারী হতে পারে। আবার মৃত্যুর পরেও তারা আল্লাহর কাছে তাদের জন্য আশীর্বাদ প্রেরণকারী হতে পারে। উত্তম মানব সন্তান কেবল পিতা-মাতার জন্যই নয় সমাজ ও পৃথিবীর কল্যাণের জন্যও প্রয়োজন। জগতের শৃংখলা ধরে রাখা, জীবন ও জগতের যথাযথ পরিচর্যা করা ও এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রেও ভাল মানুষের প্রয়োজন আছে। পরবর্তী প্রজন্মকে সঠিকভাবে বিকশিত করতেও ভাল মানুষ প্রয়োজন। এভাবে ধারাবাহিকভাবে সকলেই প্রজন্মের পর প্রজন্ম জীবন ও জগতকে চলমান রাখার ক্ষেত্রে যার যার অংশে অবদান রেখে যায়। তাই শারীরিক ও মানসিক উভয় দিক থেকে সুস্থ্য সন্তান জন্ম দেয়া একটি কর্তব্যকর্ম।

আল্লাহর সৃষ্টির সূত্রগুলিই এমন যে সকলেই নিজ প্রয়োজনে ও আনন্দে একটি কাজ করে, আর তাতেই অপরের বা সকলের বা সৃষ্টির উপকার হয়ে যায়। ফলে সকলেই নিজ প্রয়োজনে, ইচ্ছেতে ও আনন্দে স্বতঃস্ফুর্ততার সাথে সর্বশক্তি নিয়োগ করে কাজ করে। কোথাও কোন জবরদস্তী নেই। অথচ আনন্দ আছে। নিজের উপভোগকৃত আনন্দ আপনাতেই অপরকে উপকৃত করে! এখানে দারুণ দিক-নির্দেশনা আছে মানবীয় ব্যাবস্থাপনার জন্য! শিক্ষনীয় আছে! সঠিক শিক্ষাটি নিতে পারলে মানুষকে অযথা পরিশ্রম ও হয়রানির শিকার হতে হবে না। কিন্তু মানুষ কি সঠিক শিক্ষা গ্রহণ করবে?

প্রসঙ্গে ফিরে আসি। একটা সমাজকে ধ্বংস করার জন্য একজন অসৎ লোকই যথেষ্ট হতে পারে। কৃষক যেমন ভাল ফলনের জন্য ফসলের নিয়মিত পরিচর্যা করে, তেমনিভাবে সন্তানাদির যথাযথ লালন-পালন ও পরিচর্যা করার জন্যও এখানে উদ্বুদ্ধ করা হয়েছে। আগামীর পৃথিবীকে সুন্দর করে গড়ে তোলা ও সৃষ্টিকে রক্ষা করার জন্য এটি সকল মানুষের অন্যতম দায়িত্ব ও কর্তব্য।

অতঃপর বলা হচ্ছে, আল্লাহকে ভয় কর। মানুষ তখনই কর্তব্যকর্মে মনযোগী হবে বা সঠিকভাবে সকল কাজ সম্পন্ন করবে যখন সে আল্লাহকে ভয় করবে। কেননা সে জানে যে, একদিন তাকে তার ইহকালীন ভাল-মন্দ সকল কর্মের জন্য আল্লাহর মুখোমুখী দাড়িয়ে জবাবদিহি করতে হবে। কঠিন হিসেবের মুখোমুখী হতে হবে। কর্তব্য পালনে অবহেলা প্রদর্শন করলে করুণ পরিণতি ভোগ করতে হতে পারে। সর্বময় ক্ষমতা আল্লাহর।

একটি ভাল সন্তান জন্ম দেয়ার জন্য সমগ্র প্রক্রিয়ার শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত যত্নশীল থাকতে হয়। যেমন পূর্বের আয়াতে বলা হয়েছে, 'যখন উত্তমরূপে পরিচ্ছন্ন হয়ে যাবে তখন গমন কর যেভাবে আল্লাহ তোমাদের নির্দেশ করেছেন।' এখানে আল্লাহর নির্দেশনা কি? প্রাতিষ্ঠানিক ভিত্তির ওপর দাড়িয়ে আছে যে জ্ঞান তার যথাযথ অনুসরণ করা। অনিয়ম বা উচ্ছৃংখল কোন কাজ না করা যা উত্তম ফলনের জন্য ক্ষতির কারণ হতে পারে।

বিশিষভাবে উল্লেখ্য যে, এসব বাণী যখন অবতীর্ণ হয়েছে তখন চিকিৎসা বিজ্ঞান আজকের মতো উন্নত ছিল না। বর্তমানে সন্তান জন্ম দেয়ার ক্ষেত্রে চিকিৎসা বিজ্ঞানের পরামর্শ মেনে চলতে হবে। পূর্বের দিক নির্দেশনার হাত ধরেই মানুষ আজকের পর্যায়ে এসেছে। বিষয়গুলিকে এভাবে বুঝতে হবে।

'নিজের মঙ্গলের জন্য পূর্বেই ভাল কাজ প্রেরণ কর' কিংবা 'একদিন তোমাকে তাঁর সাক্ষাৎ লাভ করতেই হবে' আয়াতের এ অংশগুলি অত্যান্ত গুরুত্বপূর্ণ। কেননা এর সাথে মানুষের দায়িত্ব ও কর্তব্য পালনের সম্পর্ক আছে। এসব বার্তায় পুরস্কার প্রাপ্তির আশা ও শাস্তি প্রাপ্তির ভয় আছে। যা মানুষকে কর্তব্য পালনে দু'ভাবে উৎসাহিত করে; যার জন্য যেটি প্রযোজ্য।

সন্তান জন্ম দেয়ার বিষয়টি কেবল নারী-পুরুষের আনন্দ লাভ করারই বিষয় নয়। বরং এটি মানবজাতির দায়িত্ব ও কর্তব্য।

প্রজনন তথা প্রজন্ম সৃষ্টির অংশীদার হওয়া একটি দায়িত্ব পালন। এ প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে আল্লাহ পার্থিব অগ্রগতিকে ত্বরাণ্বিত করেন। আল্লাহর সর্বশেষ লক্ষ্য-উদ্দেশ্য সম্পর্কে মানুষ অবগত নয়। তবে মানুষ কোরআনের মাধ্যমে এতটুকু আপাতত অবগত যে তিনি কোন কিছুই লক্ষ্য বা উদ্দেশ্যবিহীনভাবে সৃষ্টি করেন নাই। বলা হচ্ছে যে,

"আমি আসমান-জমিন ও এতদুভয়ের মধ্যবর্তী কোন কিছু অযথা সৃষ্টি করিনি।" (আল-কোরআন ৩৮:২৭)

মানুষের কাজ হচ্ছে যতটুকু তাকে করতে বলা হয়েছে ততটুকু যথাযথভাবে পালন করা এবং এক্ষেত্রে সেটি হচ্ছে প্রজন্মকে সঠিকভাবে গড়ে তোলা। এটি যেমন তার নিজের মঙ্গলের সাথে জুড়ে দিয়ে কাজটিকে ত্বরান্বিত করার নিয়ম তিনি সৃষ্টি করেছেন, তেমনি এর মাধ্যমেই তিনি পৃথিবীকে বিকশিত করছেন

এবং একটি লক্ষ্যের দিকে নিয়ে যাচ্ছেন। যেমন মাতৃগর্ভে মানব সন্তানের জন্মের প্রক্রিয়ার মধ্যেও এমনি অসংখ্য ক্রিয়াশীল সৃষ্টি ছিল। যারা জন্মের সাথে সাথে বিস্ফোরিত হয়ে হয়তবা ধ্বংস হয়ে গেছে কিংবা রূপান্তরীত হয়েছে।

একজন মানুষের মৃত্যু একজন মানুষের অন্তর্ধান। নারী-পুরুষ দু'জনের মিলনে নতুন মানুষের সৃষ্টি। ক্ষুদ্র আঙ্গিকে বিষয়টির গুরুত্ব তেমনভাবে বোঝা যায় না। কিন্তু জগতের সকল মানুষ যদি প্রজননের কাজ বন্ধ করে দেয় তবে মানবজাতিই বিলুপ্ত হয়ে যাবে। মানবজাতিকে টিকিয়ে রাখার জন্যই এটি অত্যান্ত গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব ও কর্তব্য। সে কারণেই আল্লাহ এ কাজটিকে এত আনন্দদায়ক করে দিয়েছেন যেন মানুষ স্বেচ্ছায় এ দায়িত্ব পালনে উদ্বুদ্ধ হয় এবং এ কাজ থেকে বিরত না থাকে। যে কাজের গুরুত্ব যত বেশী সে কাজটিকে তত বেশী আনন্দদায়ক করে গড়ে তোলা হয়। মানুষকে আকৃষ্ট করা হয়। কাজটি করতে উদ্বুদ্ধ করা হয়।

▪ **২.২২৩.৩** বিশ্বাসীদেরকে সুসংবাদ দাও : ওপরে যেসব পরামর্শ বা নির্দেশনা দেয়া হয়েছে সেগুলি সঠিকভাবে পালন করলে বা যথাযথভাবে মেনে চললে মানুষ ভাল ফলাফল লাভ করবে। এটি যেমন একটি ব্যাক্তিক বা পারিবারিক বিষয় তেমনি এটি সামাজিক থেকে বৈশ্বিক উত্তম ফলাফল প্রাপ্তির সাথেও সম্পর্কিত। প্রতিটি উত্তম সন্তান জগতকে উত্তমরূপে বিকশিত করতে অবদান রাখবে।

যারা কোরআনের দর্শনে বিশ্বাসী তারা আল্লাহ ও শেষ দিবসকে বিশ্বাস করে আল্লাহর নির্দেশনা মেনে চলবে এবং যথাযথভাবে দায়িত্ব পালন করবে। তাদের ফসল বা ফলাফল নিশ্চিতভাবে ভাল হবে। তাই সত্যিকার বিশ্বাসীদেরকে সুসংবাদ দেয়ার কথা বলা হয়েছে। এ বার্তার মাধ্যমে এটিও বোঝা যায় যে, শুধু বিশ্বাসীরাই আল্লাহকে বিশ্বাস করে তাই নয় আল্লাহও বিশ্বাসীদের ওপর আস্থা রাখেন। তাই নিশ্চিতভাবে বলা হয়েছে যে বিশ্বাসীদেরকে সুসংবাদ দাও। ইহকাল ও পরকাল উভয়কালেই রয়েছে তাদের জন্য উত্তম ফলাফল প্রাপ্তি।

➢ (আয়াত ২২৪-২২৫) শপথ (Oath) সম্পর্কে বলা হয়েছে।

২২৪	সঠিক পথে চলার ক্ষেত্রে, আল্লাহর প্রতি তোমার কর্তব্য পালনে এবং মানুষের মাঝে শান্তি স্থাপনে, তোমার নিজের করা শপথ দ্বারা আল্লাহকে তোমার প্রতিবন্ধকস্বরূপ দাঁড় করিও না। আল্লাহ সবকিছুই শোনেন ও জানেন। (And make not Allah, by your oaths, a hindrance to your being righteous and observing your duty unto Him and making peace among mankind. Allah is Hearer, Knower.)
২২৫	অনিচ্ছাকৃত শপথের জন্য আল্লাহ তোমাদেরকে দায়ী করবেন না। কিন্তু তিনি তোমাদের অন্তরের প্রকৃত সংকল্পের জন্য দায়ী করবেন। আল্লাহ ক্ষমাশীল, ধৈর্য্যশীল। (Allah will not take you to task for that which is unintentional in your oaths. But He will take you to task for that which your hearts have garnered. Allah is Forgiving, Clement.)

▪ **২.২২৪** সঠিক পথে চলার ক্ষেত্রে ... নিজের করা শপথ দ্বারা আল্লাহকে তোমার প্রতিবন্ধকস্বরূপ দাঁড় করিও না। আল্লাহ সবকিছুই শোনেন ও জানেন : ‘তোমার নিজের করা শপথ দ্বারা আল্লাহকে তোমার প্রতিবন্ধকস্বরূপ দাঁড় করিও না।’ অর্থাৎ এমন কোন শপথ না করা যা দ্বারা আল্লাহই কোন ভাল কাজ করার ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধক হয়ে দাড়ায় এবং ভাল কাজ করা বন্ধ হয়ে যায়।

সঠিক পথে চলা, মানুষের মাঝে শান্তি স্থাপন করা, আল্লাহর প্রতি কর্তব্য পালন করা ইত্যাদি সবই ভাল কাজের অন্তর্ভূক্ত বিষয়। সমস্ত ভাল কাজই আল্লাহর প্রতি কর্তব্য পালন। কিন্তু কখনও যদি এমন পরিস্থিতির সৃষ্টি হয় যে, আল্লাহকে সাক্ষী রেখে নিজের করা অবিবেচনাপ্রসূত শপথ গ্রহণের কারণে নিজের পক্ষেই আর কোন একটি ভাল কাজ করা সম্ভব হয়ে ওঠে না, তবে তেমন পরিস্থিতি সৃষ্টি করতে বারণ করা হয়েছে। অর্থাৎ তেমন শপথ করতে বারণ করা হয়েছে। এভাবে অবিবেচনাপ্রসূত শপথ নিলে এমনকি ভাল কাজ করাও বন্ধ হয়ে যেতে পারে। কেননা সেক্ষেত্রে আল্লাহকে হাজির রেখে করা শপথ ভঙ্গ হয়ে যায়। কিংবা এভাবেও বলা যায় যে, সেক্ষেত্রে ভাল কাজ করতে গেলে নিজের করা শপথ নিজেকেই ভঙ্গ করতে হয়। অথচ শপথ ভঙ্গ

করা উচিত নয়। কেননা শপথ কোন একটি বিষয় করা বা না-করার ক্ষেত্রে চিত্তে দৃঢ়তা সৃষ্টি করে। কিন্তু শপথ ভঙ্গ করা হলে সেটি অভ্যাসে পরিণত হয়ে যাওয়ার ভয় থাকে। শপথের বিষয়টি তখন অকার্যকর হয়ে পড়ে। তখন আর শপথের কোন গুরুত্ব বা মূল্যই থাকবে না। তাই অবিবেচকের মতো এমন শপথ করতে বারণ করা হয়েছে। আল্লাহর প্রতি যে কর্তব্য পালন করার কথা কিংবা কোন ভাল কাজ করার কথা, শপথের কারণে সে আল্লাহই তখন কাজে প্রতিবন্ধক বা বাধা হয়ে দাড়ায়।

আল্লাহ সবকিছুই শোনেন ও জানেন। মানুষ নিজে যা জানে আল্লাহ তার সবই জানেন। তিনি সর্বত্র এমনকি ভেতরেও বিরাজমান। শপথ গ্রহণের সাথে আল্লাহর সম্পৃক্ততা থাকে। আল্লাহকে অন্তরে হাজির রেখে শপথ গ্রহণ করা হয়। আল্লাহকে ভেতরে হাজির রেখে যিনি শপথ গ্রহণ করেন তিনি আল্লাহতে বিশ্বাসী। বিশ্বাসী না হলে শপথ কার্যকর হবে না। বিশ্বাসীর গৃহীত শপথ বিষয়ে আল্লাহ অবহিত। তিনি গৃহীত শপথের পথে তাকে চালনা করেন। ফলে ভূল শপথ ভূল পথে চালিত করবে। আবার ভঙ্গ করলেও আল্লাহ অবহিত। শপথ কার্যকারীতা হারাবে। উভয় ক্ষেত্রেই মনের ভেতরে ও বাস্তবেও এমন শপথ নেতিবাচক প্রভাব রাখবে।

মানুষ যেন অবিবেচনাপ্রসূত কোন শপথ গ্রহণ করে নিজেই নিজেকে বিপদে না ফেলে ও ক্ষতিগ্রস্ত না করে এবং মানুষ যেন বিষয়টিকে গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করে ও শপথ করার বিষয়ে সতর্ক হয় ও বিবেচনাপ্রসূত শপথ নেয় সেজন্য এটি বলা হয়েছে।

▪ **২.২২৫** অনিচ্ছাকৃত শপথের জন্য আল্লাহ তোমাদেরকে দায়ী করবেন না। কিন্তু তিনি তোমাদের অন্তরের প্রকৃত সংকল্পের জন্য দায়ী করবেন। আল্লাহ ক্ষমাশীল, ধৈর্য্যশীল : অনিচ্ছা সত্বেও অভ্যাসবশত যেসব শপথ মুখ দিয়ে বের হয়ে যায়, তেমন অনিচ্ছাকৃত শপথের জন্য আল্লাহ কোন মানুষকে দায়ী করেন না।

আবার অভ্যসবশত না হলেও কিছু শপথ মানুষ মানুষের সাথে গুরুত্ব না দিয়েই করে থাকে। যেমন বন্ধুর সাথে বন্ধুর করা কোন বিষয়ে শপথ। এমন ক্ষেত্রে হয়তবা খুব গুরুত্ব সহকারে বিষয়টিকে নেয় না এবং শপথের কাজটি

করেও না। বিষয়টিও খুব গুরুত্বপূর্ণ নয়। শপথ করে কথা বললেও দেখা যায় যে, শপথ গ্রহণকালেই শপথ গ্রহণকারী সেক্ষেত্রে শপথ পুরণ করার বিষয়ে আগ্রহীও থাকে না। এ ধরণের শপথ পুরণের বিষয়ে চিত্তে দৃঢ়তা থাকে না। বলা হচ্ছে, এমনতর অনিচ্ছাকৃত শপথের জন্য আল্লাহ মানুষকে দায়ী করেন না।

মানুষের সত্যিকার বা আন্তরীকভাবে করা শপথের বিষয়ে আল্লাহ জানতে চাইবেন। যেমন কেউ শপথ করে বলল সে তার স্ত্রীকে স্পর্শ করবে না এবং সত্যি সত্যি সে তার নিকটে শপথের পরে আর গমন করল না, এর কারণ ও পরিণাম বিষয়ে তাকে জবাবদিহি হতে হবে।

আল্লাহ সবকিছুই শোনেন ও জানেন। অর্থাৎ কোনটি মানুষের প্রকৃত শপথ এবং কোনটি প্রকৃত শপথ না আল্লাহ তা জানেন। বস্তুত তিনি তো প্রত্যেক নিজের সাথেই রয়েছেন। মানুষ নিজে যা জানে সত্যি বলতে আল্লাহই তা জানেন।

আন্তরীকভাবে করা শপথের আবার দু'টি দিক আছে। একটি হল জবাবদিহিতার দিক। অর্থাৎ আল্লাহ মানুষের গ্রহণ করা শপথের সফলতা-ব্যার্থতা, ভাল-মন্দ ফলাফল, তার প্রচেষ্টা ইত্যাদি বিষয়ে জানতে চাইবেন। এর অপর অর্থই হচ্ছে, শপথ নিয়ে মন্দ কাজ করলে তার পরিণতি ভোগ করতে হবে। অতএব মানুষকে শপথের বিষয়ে যথেষ্ট বিবেচক হতে হবে। শপথের সাথে আল্লাহর এ সম্পৃক্ততা মানুষকে তার সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে বিবেচক হতে উদ্বুদ্ধ ও সহায়তা করে।

আবার এর আরেকটি দিক হল আন্তরীকভাবে করা শপথের পথে আল্লাহ মানুষকে এগিয়েও নিয়ে যান। মানুষ যখন সত্যিকারভাবে কোন শপথ গ্রহণ করে সে তা অর্জনে ছুটে চলে। আল্লাহ মানুষকে তার গ্রহণকৃত শপথের পথে যেতে সহায়তা করেন। তিনি ভেতর থেকে তাড়না বা প্রেরণা সৃষ্টি করে দেন। সফলতার বিষয়ে ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গী তৈরী করে দেন। জ্ঞান দান করেন।

অনিচ্ছাকৃত শপথের ক্ষেত্রে মানুষ মন-প্রাণ দিয়ে কাজটি করে না। ফলে আল্লাহও সে পথে মানুষকে নিয়ে যান না। বস্তুত চালক আল্লাহ। মানুষ যে সিদ্ধান্ত নেবে আল্লাহ মানুষকে সে পথে নিয়ে যাবেন। একটি উদাহরণ দিয়ে বিষয়টিকে বোঝাবার চেষ্টা করি।

মনে করি, রথের চালক 'কৃষ্ণ'। 'অর্জুন' যেদিকে যেতে বলবে 'কৃষ্ণ' রথ চালিয়ে তাকে সেদিকেই নিয়ে যাবে। অর্জুন সিদ্ধান্ত নিলেও নিজে যেতে পারবে না। কেননা ঘোড়ার লাগাম কৃষ্ণের হাতে। অপরদিকে অর্জুনের সিদ্ধান্ত বা দিক-নির্দেশনা ছাড়া কৃষ্ণ কিছুই করবে না। বোঝার সুবিধার জন্য উদাহরণটি তুলে ধরা হল।

আল্লাহ ক্ষমাশীল, ধৈর্য্যশীল। শপথের বিষয়ে মানুষের যদি ভাল নিয়ত থাকে এবং লক্ষ্য অর্জনে তার যদি আন্তরীক প্রচেষ্টাও থাকে, তবে ব্যার্থ হলেও আল্লাহ ব্যার্থতার দায়ে তাকে দায়ী করবেন না। সেক্ষেত্রে তিনি ক্ষমাশীল।

আবার বলা হচ্ছে, তিনি ধৈর্য্যশীল। তাই তিনি আন্তরীক ও পরিশ্রমী মানুষকে ব্যার্থ হলেও পুনরায় প্রচেষ্টার সুযোগ দেন। তিনি ধৈর্য্যশীল।

➢ (আয়াত ২২৬-২৩৭) এখানে তালাক (Divorce) প্রসঙ্গে বলা হয়েছে। এছাড়াও সূরা বাকারার আয়াত নং ২৪১-২৪২, সূরা নিসার আয়াত নং ৩৪-৩৫, সূরা আহযাব এর আয়াত নং ৪৯ ও সূরা তালাক এর ১-৭ নং আয়াতেও তালাকের বিষয়ে অবতীর্ণ বাণী রয়েছে।

২২৬	যারা নিজেদের স্ত্রীদের নিকট গমন করবে না বলে শপথ/সিদ্ধান্ত নেয়, তারা অবশ্যই চার মাস অপেক্ষা করবে; অতঃপর যদি তারা তাদের মন পরিবর্তন করে তবে নিশ্চয়ই! আল্লাহ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। (Those who forswear their wives must wait four months; then, if they change their mind, lo! Allah is Forgiving, Merciful.)
২২৭	আর যদি তালাকের সিদ্ধান্ত নেয় তবে তারা যেন জানে যে, আল্লাহ সব শোনেন এবং দেখেন। (And if they decide upon divorce (let them remember that) Allah is Hearer, Knower.)

▪ বিবাহ ও তালাক (Marriage and Divorce) : বিবাহ মানুষের জীবনে একটি অত্যান্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। খুব প্রাথমিকভাবে এর যেমন রয়েছে একটি শারীরিক দিক তেমনি আছে মানসিক দিক। আবার এর পারিবারিক, সামাজিক

এবং কখনও কোন বিশেষ ক্ষেত্রে এর রাজনৈতিক গুরুত্বও আছে। তদুপরি রয়েছে পরবর্তী প্রজন্মের ভাবনা।

দু'জন মানুষের বৈবাহিক জীবনের ভাল-মন্দ অবস্থা, পরিবেশ কিংবা সম্পর্ক জীবনের এক পর্যায়ে গিয়ে কেবল আর তাদের দু'জনের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে না। সন্তানদের তথা পরবর্তী প্রজন্মের জীবনকেও ভীষনভাবে ভাল-মন্দের দিকে প্রভাবিত করে।

এটিও সত্য যে, মানুষের বৈবাহিক জীবনে স্বামী-স্ত্রী দু'জনের সম্পর্ক সবসময় সবক্ষেত্রে ভাল যায় না। অনেক ক্ষেত্রেই দেখা যায় বা বোঝা যায় যে দু'জনের মধ্যে বনিবনা হচ্ছে না বা হবে না। সারাজীবন তাদের একসাথে থাকা প্রায় অসম্ভব হয়ে পরে যা কখনই সুখকর হতে পারে না। এমতাবস্থায় যন্ত্রনা ও কষ্টের মধ্য দিয়ে জীবন অতিবাহিত করার কোন অর্থ হয় না। জীবন অশান্ত ও দুর্বিসহ হয়ে ওঠে। সংসার জীবন ও সম্পর্ক অনেক ক্ষেত্রে ধরে রাখা যায় না বা সম্ভব হয় না।

কোন কোন সমাজে এমনও রীতি আছে যে স্বামী-স্ত্রীর এ বন্ধন বিবাহের মাধ্যমে একবার সম্পন্ন হয়ে গেলে সেটি আর বিচ্ছিন্ন হতে পারে না বা হওয়ার নিয়ম নেই। সেক্ষেত্রে ওপরে যে অবস্থার কথা বলা হয়েছে তার থেকে পরিত্রানের উপায় কি? ইসলামে তাই এমন ক্ষেত্রে বৈবাহিক জীবনের সম্পর্কচ্ছেদের বিধান রাখা হয়েছে যা বিবাহ বিচ্ছেদ বা তালাক নামে পরিচিত।

আরব দেশ যে দেশে কোরআন অবতীর্ণ হয়েছে, সে দেশের কঠোর পুরুষ শাসিত সমাজে তৎকালে স্বামীরা কথায় কথায় স্ত্রীদেরকে তালাক দিয়ে দিত। আবার ফিরিয়েও নিত। এমনকি সকাল-সন্ধ্যার মধ্যেও এমনটি করত। নারীদের জীবন ছিল অনিশ্চয়তায় ভরা ও দুর্বিসহ। তাই তালাকের ক্ষেত্রেও যথাযথ বিধি-বিধানের প্রয়োজন দেখা দেয়।

মানবজীবনের অত্যান্ত গুরুত্বপূর্ণ এ বিষয়টিকেও কোরআন গুরুত্ব দিয়ে বিবেচনা করেছে এবং সময়ের সাথে সামঞ্জস্য রেখে যেখানে যতটুকু কঠোর ও যতটুকু নমনীয় হতে হয় তেমন নির্দেশনা দিয়ে মানুষের জন্য বিধি-বিধান ঠিক করে দিয়েছে। যা আবার সময়ের সাথে সামঞ্জস্য রেখেই এগিয়ে নিয়ে

যেতে হবে বা বিকশিত করতে হবে। এমনই কোরআনের দিক-নির্দেশনা [দ্রষ্টব্য ২.২.২]।

একটা সমাজে যে রীতি ও প্রথা চালু থাকে এবং সমাজপতিরা যাকে দৃঢ়তার সাথে ধরে রাখে তা যদি ভুল, অনড় ও অবিবেচনাপ্রসূত হয় তবে ভুক্তভোগীদের তা থেকে উত্তরণের খুব সহজ কোন পথ বা উপায় নেই বা থাকেও না। তাই তেমন কঠোর নিয়মের মানবসমাজে মৃত স্বামীর সঙ্গে জীবন্ত স্ত্রীকেও আগুনে ঝাঁপ দিতে হয়েছে। অবিবেচনাপ্রসূত নিষ্ঠুর ও বর্বর এসব সামাজিক নিয়ম!

সমাজ-সংস্কার খুব সহজ বিষয় নয়। যারা জীবনের ঝুঁকি নিয়ে সমাজ-সংস্কার করতে যুগে যুগে আবির্ভূত হয়েছেন তারা মহামানব। তবে আল্লাহই সব পরিচালনা করেন। তিনি যখন যার ওপর আশীর্বাদ বর্ষন করেন তিনিই মহামানব।

ইসলামের আগমনের পর নারীদের অধিকার, স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক, তালাকসহ বিবিধ বিষয়ে ন্যায়ানুগ বিধি-বিধানের প্রবর্তন করা হয়েছে। যেসব বিধান স্বামী-স্ত্রী দু'জনের জন্য ন্যায়সম্মত এবং নারীদের জন্য বিশেষভাবে রক্ষা কবচ। অন্ধকার যুগে নারীদেরকে যে দৃষ্টিতে দেখা হত ইসলাম সে দৃষ্টিভঙ্গীর আমূল পরিবর্তন সাধন করেছে।

নারীদেরকে একটা সময়ে জীব-জন্তু বা মাল-সামানার তুল্য গণ্য করা হয়েছে। সেখান থেকে ইসলাম তাদেরকে মানুষ হিসেবে পূর্ণাঙ্গ মর্যাদা দান করেছে এবং পুরুষের সমান মর্যাদার স্বীকৃতি দিয়েছে [দ্রষ্টব্য ২.২২৮.২]। সমাজ, সংসার ও জাগতিক শৃংখলার স্বার্থে কিংবা প্রাকৃতিকভাবে পুরুষের যতটুকু উচ্চ মর্যাদা থাকতে হয় কেবল ততটুকু উচ্চ মর্যাদাই পুরুষের জন্য স্বীকৃতি দেয়া হয়েছে। সেখানেও শর্ত আছে। অর্থাৎ সত্যকে স্বীকার করে পুরুষের বাড়তি মর্যাদা দেয়া হয়েছে। যা যথাস্থানে আলোচনা করা হবে (দ্রষ্টব্য ২.২২৮.২)। এ পর্যায়ে তালাকের বিষয়ে আলোচনা সীমাবদ্ধ রাখতে চাই।

■ **২.২২৬** যারা নিজেদের স্ত্রীদের নিকট গমন করবে না বলে শপথ/সিদ্ধান্ত নেয়, তারা অবশ্যই চার মাস অপেক্ষা করবে; অতঃপর যদি তারা তাদের মন

পরিবর্তন করে তবে নিশ্চয়ই! আল্লাহ ক্ষামাশীল, পরম দয়ালু : যারা প্রাথমিকভাবে তালাকের শপথ বা সিদ্ধান্ত নেয়, তাদেরকে চার মাস সময় নেয়ার জন্য বলা হয়েছে। উল্লেখ্য শপথের বিষয়ে পূর্বে স্মরণ করিয়ে দেয়া হয়েছে যে, 'অনিচ্ছাকৃত শপথের জন্য আল্লাহ তোমাদেরকে দায়ী করবেন না। কিন্তু তিনি তোমাদের অন্তরের প্রকৃত সংকল্পের জন্য দায়ী করবেন।'

সম্পর্ক গড়ে তুলতে যেমন কষ্ট আছে তেমনি সম্পর্ক ছিন্ন করতেও কষ্ট আছে। সুখে থাকা অবস্থায় অনেক সময় মানুষ সুখের মর্ম বুঝতে পারে না। রাগের মাথায় বা উত্তেজিত অবস্থায় তাৎক্ষণিক অনেক সিদ্ধান্ত নিয়ে নেয়। আবার নিয়ম সহজ হলেও নিয়মের অপব্যাবহার করে। ফলে এরকম পরিস্থিতিজনিত ভূল থেকেও পরিত্রানের উপায় থাকতে হবে। তাই যারা প্রাথমিকভাবে তালাকের সিদ্ধান্ত নেয় তাদেরকে চার মাস সময় নেয়ার জন্য বলা হয়েছে। যে সময়ে আইনগতভাবে উভয়ে স্বামী-স্ত্রী থাকবে এবং বৈবাহিক সম্পর্ক ছিন্ন ব্যাতিত পৃথকভাবে বসবাস করবে। ইসলামি পরিভাষায় এ অবস্থাটিকে 'ইলা' বলা হয়।

এ অবস্থায় স্বামী-স্ত্রী পৃথকভাবে অবস্থান করে ধীর-স্থির মানসিক অবস্থায় সার্বিক বিষয় পুনঃ বিচার-বিবেচনা করে সুচিন্তিতভাবে সিদ্ধান্ত নেয়ার সুযোগ পাবে। তাই এ অপেক্ষা বা ধৈর্য্যধারণের নিয়ম এবং সেটিই উত্তম; যেন রাগের মাথায় বা উত্তেজিত অবস্থায় জীবনের এমন একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে কোন ভূল সিদ্ধান্ত নেয়া না হয়।

চার মাস সময়কে একটি সর্বনিম্ন সীমা ধরে নিতে হবে। পরিপূর্ণ সিদ্ধান্ত নেবার পূর্বে কমপক্ষে এতটুকু সময় নেয়া যথাযথ বিবেচিত হতে পারে। এ সময়ের মধ্যে তালাক ফিরিয়ে নিলে সেটি উত্তম সিদ্ধান্ত।

তবে এ সময়ের মধ্যেও কোন সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে না পারলে প্রয়োজনে আরও সময় নেয়া যেতে পারে। অর্থাৎ উভয়ের বিবেচনায় যতদিন তারা এভাবে থাকতে ইচ্ছুক ততদিন সময় নেয়া যেতে পারে।

উভয়ের সম্মতি ব্যাতিত নিয়মের বাধ্যবাধকতার কথা বলে একটি সম্পর্ক ভেঙ্গে দেয়া যায় না বা সেটি করা সমীচীনও নয়; কিংবা তেমন নিয়ম থাকাও উচিত নয়। কেননা একটি সম্পর্কচ্ছেদের নানামুখী প্রভাব আছে। যেমন সেটি নিজেদের মধ্যে আছে, তেমনি সম্পর্কিত অন্যান্যদের মাঝেও আছে।

বিষয়টি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। তাই এ বিষয়ে পরিপূর্ণ সিদ্ধান্ত নিতে হবে দু'জনকেই। অর্থাৎ নিয়মের বাধ্যবাধকতাকে যেন অধিক গুরুত্ব দেয়া না হয়। এর ব্যাতিক্রম ভাবলে সেটি হবে অবিবেচনাপ্রসূত ভাবনা।

উভয়ের সম্মতিতে যদি সিদ্ধান্ত গ্রহণের ভার বিচারকের ওপর ন্যাস্ত হয়, সেক্ষেত্রে বিচারক চাইলে 'ইলা' আইন মোতাবেক বিচার কাজ সম্পন্ন করতে পারেন। তথাপি বিচারক উভয়ের মানসিক অবস্থাকে বিচেনায় নিয়ে ভাল মনে করে সিদ্ধান্ত নেয়া বাঞ্ছনীয়। আইনের কারণে সংসার ভেঙ্গে দেয়া কোন যথাযথ আইনের কাজ নয়। কোন সুবিবেচনাপ্রসূত বিচার কাজ নয়। আইনটি গুরুত্বপূর্ণ নয় বরং গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে সম্পর্ক ও জীবন। জীবনের জন্য সঠিক ও উত্তম সিদ্ধান্ত গ্রহণ করাটিই হচ্ছে গুরুত্বপূর্ণ। মনে রাখা বাঞ্ছনীয় যে, আইনের জন্য জীবন নয় বরং জীবনের প্রয়োজনে আইন।

উল্লেখ্য যে, চার মাস সময়ের পূর্বেও স্বামী-স্ত্রী নিজেদের সম্মতিতে তালাক তুলে নিতে পারে। তবে সেক্ষেত্রে অবশ্য কাফফারা দেয়া ভাল। না দিলেও বাধ্যবাধকতা নেই। কাফফারা মানুষকে কোন একটি বিষয়ে বা সার্বিকভাবে সচেতন করে তোলে এবং ভবিষ্যতে খাম-খেয়ালীপনা বা অবিবেচনাপ্রসূত সিদ্ধান্ত নেয়ার পূর্বে মানসিকভাবে বাধা প্রদান করে বা বলা যায় বিবেককে কাজে লাগাতে উদ্বুদ্ধ করে।

কাফফারা মানুষকে দিয়ে কিছু ব্যায় করায়। মানুষ যখন কোন বিষয়ে বা কোন কারণে কিছু ব্যায় করে তখন সে উক্ত বিষয়ে মনযোগী হয়। কাফফারা না দিলে বিষয়গুলি সহজ হয়ে যায় এবং মানুষ তখন যখন-তখন যাচ্ছে-তাইভাবে বারেবারে একই ভূল করে যেতে থাকে।

কোরআনের প্রত্যেকটি নির্দেশনা বা উদ্বুদ্ধকরণের ক্ষেত্রে বিজ্ঞান ও বাস্তবসম্মত কারণ আছে। কিন্তু সকলের জন্য এত কারণ অনুসন্ধানের প্রয়োজন নেই। তাই অধিকাংশ মানুষকে বিশ্বাসী হতে আহবান করা হয় এবং বিশ্বাসী হয়ে আল্লাহর নির্দেশ পালন করতে উদ্বুদ্ধ করা হয়। আল্লাহর নির্দেশনার যথাযথ পরিপালনের মধ্যেই আছে উত্তম ও শান্তির পথ।

তালাকের ক্ষেত্রে কাফফারা মূলত এজন্য যেন মানুষ অবিবেচনাপ্রসূতভাবে বা খামখেয়ালীপনার বশবর্তী হয়ে যখন-তখন তালাকের সিদ্ধান্ত নিতে অভ্যস্ত বা উৎসাহিত না হয়। যে অবস্থাটি তৎকালীন সময়ে আরব্য সমাজে বিদ্যমান

ছিল। তবে এমন কাফফারা কোন মূল্য বহন করে না যদি না সেটির সাথে আল্লাহকে সম্পৃক্ত করা হয়। অর্থাৎ একটা দায়বদ্ধতা সৃষ্টি করা না হয়। আবার আল্লাহতে বিশ্বাস ভিন্ন এ দায়বদ্ধতার বিষয়টিও কার্যকরী হবে না। আল্লাহতে বিশ্বাস গুরুত্বপূর্ণ। তাই সকল মানুষকেই বিশ্বাসী হতে আহবান করা হয় যেন মানুষ সুপথে চলতে পারে। সত্য হচ্ছে, মানসিক বিষয়গুলি বিশ্বাসের কারণে দৃঢ়তা পায়। এ আরেক বিজ্ঞান! বলা যেতে পারে মনোবিজ্ঞানের আওতার অন্তর্ভূক্ত বিষয়!

চারমাস অতিবাহিত হওয়ার পরেও যদি কোন সিদ্ধান্তে উপনিত হওয়া না যায়, তবে সেটিকে তালাক নয় বরং তালাক না নেয়ার সিদ্ধান্তরূপে বিবেচনা করা উচিত। কিংবা সময়ের বর্ধিতকরণের প্রয়োজনরূপে বিবেচনা করা উচিত। অর্থাৎ বুঝতে হবে যে উভয়ের অন্তর এ বিষয়ে এখনও কোন যথাযথ সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারেনি। মনের মধ্যে দ্বিধা-দ্বন্দ্ব বা দোদূল্যমানতা আছে। এক্ষেত্রে দ্বিধা-দ্বন্দ্ব মানে উভয়ের প্রতি উভয়ের অন্তরের একটি টান আছে বলে ধরে নেয়া যেতে পারে। যদিও কিছু ব্যাতিক্রমও থাকতে পারে। এভাবে ভাবতে হবে সম্পর্ককে যথাসাধ্য টিকিয়ে রাখার স্বার্থে। নিয়মের বাধ্যবাধকতার নামে একটি সম্পর্ক ভেঙ্গে দেয়া যথাযথ ও বিবেচনাপ্রসূত কাজ হতে পারে না। সেরকম নিয়মও থাকা উচিত নয়।

যদি কোনরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হতে না পারার কারণে নিজেদের উদ্যেগে উভয়ে বিচারালয়ের স্মরণাপন্ন হয়, তবে সেক্ষেত্রে বিচারক 'ইলা' আইন মোতাবেক বিচার কাজ সম্পন্ন করতে পারেন।

নির্দিষ্ট সময় পরে যদি উভয়ে তালাক তুলে নেয়ার সিদ্ধান্ত নেয়, তবে বলা হচ্ছে আল্লাহ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। অর্থাৎ সুচিন্তিতভাবে সঠিক সিদ্ধান্ত নিলে তারা ইতিপূর্বে যে ভূল সিদ্ধান্ত নিয়েছিল আল্লাহ সেটি ক্ষমা করে দেবেন।

বলা হচ্ছে তিনি ক্ষমাশীল, দয়ালু। অবশ্যই এটি সত্য এবং এটি কোরআনের বাণী! বিশ্বাসীর কাছে এ বাণীর মূল্য অপরিসীম। বিশ্বাসীর অন্তর এতে প্রশান্ত হয়। ভূলের বা অপরাধবোধের কারণে অন্তরে যে মানসিক ক্ষত সৃষ্টি হয় তা দুরীকরণে আশাপ্রদ এ বাণীর গুরুত্ব একজন বিশ্বাসীর কাছে অনেক মূল্যবান ও গুরুত্ববহ।

সব বিষয়ে আল্লাহর একটি সম্পৃক্ততা মানুষকে বিপদ বা কোন সমস্যায় অনেক শক্তি, সাহস ও প্রশান্তি দান করে। যদিও শক্তি, সাহস ও মানসিক প্রশান্তির বিষয়গুলি মানবীয় ভাবনা বা মানসিক অবস্থার সাথে সম্পর্কিত। তথাপি প্রকৃত সত্য হচ্ছে যে, আল্লাহই মানসিক অবস্থার উত্তরণের কাজগুলিতে ভেতর থেকে মানুষকে সহায়তা করেন। তার জন্য অন্তরে আল্লাহকে জাগরুক ও সর্বদা সম্পৃক্ত করে রাখার অভ্যাস গড়ে তুলতে হবে এবং নিজেকে ও আল্লাহকে এবং এ দুয়ের মাঝে সম্পর্ককে যথাযথভাবে বোঝার চেষ্টা করে যেতে হবে। সত্যিকার আন্তরীক চেষ্টা থাকলে নিজেকে বুঝতে হবে না। আল্লাহই অন্তরকে সত্য বা যথাযথতার পথে নিয়ে যাবেন এবং ধীরে ধীরে বুঝতে সহায়তা করবেন! বলা হচ্ছে,

"হাজার হাজার মানুষের মধ্যে কোন একজন উৎকর্ষ সাধনের জন্য চেষ্টা করে এবং যারা উৎকর্ষ সাধন করে, সত্যি বলতে তাদের মধ্যে কদাচিৎ একজন সত্যিকারভাবে আমাকে জানে, আমার স্বরূপ বুঝতে পারে।" (গীতা ৭:৩)

"জড় জাগতিক প্রকৃতির তিনটি অবস্থা স্বত্বঃ, রজঃ ও তমঃ দ্বারা বিভ্রান্ত হওয়ার ফলে সমগ্র জগৎ এই সমস্ত অবস্থার ওপরে- অব্যয়, অক্ষয় ও অফুরান আমাকে জানতে বা বুঝতে পারে না।" (গীতা ৭:১৩)

".. শুধুমাত্র অবিচ্ছিন্ন ভক্তির মাধ্যমেই আমি যা তা একজন জানতে, বুঝতে ও আমার স্বরূপ প্রত্যক্ষ করতে পারে। শুধুমাত্র এ পথেই তুমি আমাকে বুঝতে, আমার মায়াময় জগতে প্রবেশ করতে পারবে।" (গীতা ১১:৫৪)

"যারা নিয়ত ভক্ত এবং ভালবাসার সাথে আমার উপাসনা করে তাদেরকে আমি জ্ঞান-বুদ্ধি দান করি, যার দ্বারা তারা আমাকে লাভ করে।" (গীতা ১০:১০) [দ্রষ্টব্য ২:২৬৯, ৪৭:১৭, ৫৭:২৮]

আল্লাহতে বিশ্বাস ও প্রশ্নাতীত ভক্তি আল্লাহকে ও তার নিয়মকে বা নিয়মের যথাযথতাকে বুঝতে সহায়তা করে।

বিশেষভাবে উল্লেখ্য যে, তালাকের প্রক্রিয়াকে এখানে ধীর বা সময়সাপেক্ষ করে দেয়া হয়েছে যেন মানুষ আবেগ তাড়িত বা রাগের বশবর্তী হয়ে কোন

ভূল সিদ্ধান্ত না নেয়। এ প্রক্রিয়া সুচিন্তিত ও সুবিবেচনাপ্রসূত সিদ্ধান্ত নেয়ার ক্ষেত্রে সহায়ক।

একইসাথে উল্লেখ্য যে, এ সম্পর্কিত সমস্ত বিষয়গুলিকে বর্তমানে বর্তমান সময়ের আর্থ-সামাজিক অবস্থার প্রেক্ষাপটে বিবেচনা করতে হবে। এমনই কোরআনের দিক-নির্দেশনা (দ্রষ্টব্য ২.২২৮.২)।

■ **২.২২৭** আর যদি তালাকের সিদ্ধান্ত নেয় তবে তারা যেন জানে যে, আল্লাহ সব শোনেন এবং দেখেন : উল্লেখিত চার মাসের নির্দিষ্ট সময় পর যদি উভয়ে তালাকের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে তবে বলা হচ্ছে যে, তারা যেন জানে যে আল্লাহ সব শোনেন এবং দেখেন। এ বাণীর গভীর তাৎপর্য আছে।

তালাক জীবনের একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের সিদ্ধান্ত। একবার একটি সম্পর্ক হয়ে গেলে এবং এর পরিসর বড় হয়ে গেলে দু'জনের গ্রহণ করা তালাকের সিদ্ধান্ত অনেককে প্রভাবিত করে। পূর্বেও উল্লেখ করেছি যে, এর সাথে পারিবারিক, সামাজিক কখনও কখনও কোন পর্যায়ে রাজনৈতিক বিষয়ও সম্পর্কিত থাকে। এটি দু'জনকে বা কোন একজনকে মানসিকভাবেও বিপর্যস্ত করতে পারে। তদুপরি আছে সন্তান বা পরবর্তী প্রজন্ম সম্পর্কিত বিষয়। মা-বাবার সম্পর্ক তাদের জীবনকেও ভীষনভাবে প্রভাবিত করে। পরবর্তী প্রজন্মের ক্ষতিরও একটি দায় আছে। এমন একটি সিদ্ধান্তের কু-প্রভাব সকলের ওপর পতিত হবে।

অতএব দু'জনের গৃহিত সিদ্ধান্ত যদি সঠিক না হয় এবং এর মন্দ প্রভাব যদি সম্পর্কিত অপরাপরদের ওপর পরে, তবে বলা হচ্ছে তারা যেন জানে যে আল্লাহ সব দেখেন, জানেন। তাদেরকে এটি স্মরণ করতে বলা হচ্ছে। কেননা অবিবেচনাপ্রসূত কোন ভূল সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও অপরাপরদের ওপর পতিত তার মন্দ প্রভাবের জন্য তাদেরকে আল্লাহর কাছে একদিন জবাব দিতে হবে।

কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে যেন ভালভাবে বা সুচিন্তিতভাবে বিষয়গুলি বিচার-বিবেচনা করা হয় সে বিষয়ে তাগিদ দেয়া হয়েছে। খাম-খেয়ালীপনার ওপর ভর করে যেন কোন সিদ্ধান্ত নেয়া না হয়। কেননা এর মন্দ প্রভাবের দায় সিদ্ধান্ত গ্রহীতাদের ওপর বর্তাবে।

যারা বিশ্বাসী তাদের ওপর আল্লাহর এ ইংগিতপূর্ণ বার্তার যথেষ্ট মূল্য আছে। সকল মানুষই যেন সব বিষয়ে আল্লাহর বার্তাকে এভাবে মূল্য দিয়ে সুচিন্তিত সিদ্ধান্ত নেয় সে কারণেই বিশ্বাস গুরুত্বপূর্ণ। আল্লাহ ও পরকালে বিশ্বাস ভিন্ন এ উপদেশ কাজ করবে না।

➢ (আয়াত ২২৮) তালাক (Divorce) ও নারী-পুরুষের অধিকার (Rights) বিষয়ে বলা হয়েছে।

২২৮	তালাকপ্রাপ্তা নারী নিজেকে অপেক্ষায় রাখবে তিন মাস (তিনটি ঋতুস্রাব/হায়েয) পর্যন্ত। এটি তাদের জন্য বিধিসম্মত নয় যে, আল্লাহ তার গর্ভে যা সৃষ্টি করেছেন তা তারা গোপন করবে যদি তারা আল্লাহ এবং পরকালে বিশ্বাসী হয়। সেক্ষেত্রে যদি তারা সদ্ভাব বজায় রেখে চলতে চায় তাহলে তাদেরকে ফিরিয়ে নেয়া তাদের স্বামীদের জন্য উত্তম। নারীদের সমান অধিকার রয়েছে পুরুষদের ওপর সদয়তার সঙ্গে, যদিও পুরুষের নারীদের ওপর শ্রেষ্ঠত্ব আছে। আল্লাহ পরাক্রমশালী, বিজ্ঞ। (Women who are divorced shall wait, keeping themselves apart, three (monthly) courses. And it is not lawful for them that they should conceal that which Allah hath created in their wombs if they are believers in Allah and the Last Day. And their husbands would do better to take them back in that case if they desire a reconciliation. And they (women) have rights similar to those (of men) over them in kindness, and men are a degree above them. Allah is Mighty, Wise.)

▪ **২.২২৮.১** তালাকপ্রাপ্তা নারী নিজেকে অপেক্ষায় রাখবে তিন মাস ... ফিরিয়ে নেয়া তাদের স্বামীদের জন্য উত্তম : তিনটি মাসিক পর্যন্ত তালাকপ্রাপ্তা নারী নিজেকে অপেক্ষমান রাখবে। এটি করতে হবে গর্ভে সন্তান আছে কিনা সেটি নিশ্চিত হওয়ার জন্য। যারা আল্লাহ ও পরকালে বিশ্বাসী তাদেরকে গর্ভে সন্তান থাকলে তা গোপন না করতে বলা হয়েছে। এতে নবজাতকের

সনাক্তকরণ যথাযথ হবে না। যা সত্যের বরখেলাফ। তাই এমন কাজ বিশ্বাসী-অবিশ্বাসী অর্থাৎ কোন মানুষেরই করা উচিত নয়। সে কারণেই সকলকে বিশ্বাসী হতে আহবান জানান হয়ে থাকে যেন সকলেই আল্লাহর নির্দেশ মেনে যথাযথ বা সত্যের ওপর চলে। মিথ্যে কাজ না করে। এটিই কোরআনের দিক-নির্দেশনা। এটি বিধিসম্মত নয় যে আল্লাহ কারও গর্ভে যা সৃষ্টি করেছেন তালাকের কারণে তারা তা গোপন করবে।

গর্ভে সন্তানজনিত কারণে স্ত্রী যদি সদ্ভাব বজায় রেখে চলতে চায় তবে স্বামীদেরকে বিবেচকের মতো আচরণ করতে আল্লাহ উদ্বুদ্ধ করেছেন এবং স্ত্রীদেরকে ফিরিয়ে নিতে বলেছেন। অন্যথায় নারীকে কঠিন পরিস্থিতিতে পরতে হতে পারে। বস্তুত আল্লাহ বিচ্ছেদ বিষয়টিকেই অনুৎসাহিত করেছেন। তবে যেক্ষেত্রে একেবারেই সদ্ভাব বজায় রেখে একত্রে বসবাস করা সম্ভব নয়, সেক্ষেত্রে বিপদাপন্নের জন্য একটি পথ বা বিকল্প উপায় হিসেবে বিচ্ছেদের নিয়ম বজায় রাখা হয়েছে।

তিনটি মাসিক শেষ হলেই আপনা-আপনি ছাড়াছাড়ি হয়ে যায় না, যতক্ষণ না তা উভয় পক্ষ বা একপক্ষ থেকে বিচ্ছেদের বিষয়টি নিশ্চিত করা হচ্ছে। এক্ষেত্রে আপনা-আপনি তালাক কার্যকর হওয়ার কোন সীমা রেখা নেই বা থাকা উচিত নয়। তালাক হতে হলে তা কমপক্ষে এক পক্ষকে চূড়ান্তভাবে নিশ্চিত করতে হবে।

কমপক্ষে এক পক্ষ দ্বারা তালাক নিশ্চিত না হওয়া পর্যন্ত উভয়ে পুনরায় একসাথে বসবাসের সিদ্ধান্ত নিতে পারবে। কোন বিচ্ছেদ কখনও মানুষের কাম্য হতে পারে না। একটি বিচ্ছেদ অনেককে মন্দভাবে প্রভাবিত করে। বিশেষত প্রজন্মকে। এমন নিয়ম হতে পারে না বা থাকতে পারে না বা থাকা উচিত নয় যে নিয়মের কারণে সময় শেষ হলেই তালাক কার্যকর হয়ে যাবে। তবে তেমনটি যদি উভয় পক্ষের পূর্ব গৃহিত সিদ্ধান্ত হয় সেটি ভিন্ন কথা।

বস্তুত বিচ্ছেদকে নিয়মের কারণে উৎসাহিত করে কারও কোন লাভ নেই। এমনকি আল্লাহরও এতে কোন লাভ-ক্ষতি বা কোন প্রাপ্তি নেই। তিনি তেমন নির্দেশনা দেননি। তিনি মানুষের জন্য কিছু উদাহরণ তুলে ধরে দিক-নির্দেশনা দিয়েছেন মাত্র। যেন মানুষ দিক-নির্দেশনাকে ভিত্তি ধরে সমাজে ন্যায় প্রতিষ্ঠা করতে পারে। সামাজিক ও পারিবারিক অবস্থাকে শান্ত ও মানুষের মানসিক

অবস্থাকে তা প্রশান্তি দান করে। মানুষ নিজেরাই নিজেদের মতো ব্যাখ্যা করে বিবিধ কঠোর নিয়ম প্রতিষ্ঠা করেছে। অথচ সকল নিয়ম মানুষের সুবিধার জন্য হতে হবে। এমন নিয়ম থাকতে পারে না যা মানুষের সুবিধা-অসুবিধাকে বিবেচনা না করে কেবল নিয়মের কারণে বিচ্ছেদের সিদ্ধান্ত নেবে।

নিয়ম অনুযায়ী তৃতীয় তালাকের মাধ্যমে তালাক চূড়ান্তভাবে নিশ্চিত করা হয়। তবে এ আয়াত যখন অবতীর্ণ হয় তখন তৃতীয় তালাকের নিয়ম ছিল না। তালাক নিশ্চিত না হওয়া পর্যন্ত উভয়ে পুনরায় মিলিত হতে পারবে। এক্ষেত্রে কোন বাধা নেই বা থাকা উচিত নয়। নিয়মের বাধ্যবাধকতা দিয়ে এসব বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেয়া উচিত নয়। দু'জনের ইচ্ছেটাই বড়। এটিই স্বাভাবিক নিয়ম।

তালাকের ক্ষেত্রে স্ত্রীর মতামতও গুরুত্বপূর্ণ। যে যুগে এ বার্তা অবতীর্ণ হয়েছে সে সময়কার আর্থ-সামাজিক অবস্থার প্রেক্ষিতে এ বাণী অবতীর্ণ হয়েছে। এর দ্বারা কোরআন এ দিক-নির্দেশনাই দিচ্ছে যে, নিয়ম হতে হবে যুগের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ এবং সেটিকে যথাযথভাবে ঠিক করে নেয়ার দায়িত্ব মানবসমাজের। তিনি মানুষের জন্য উদাহরণ তুলে ধরে কিছু দিক-নির্দেশনা দিয়েছেন মাত্র। যা ছিল তৎকালীন যুগের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। যেন মানুষ দিক-নির্দেশনাকে ভিত্তি ধরে সমাজে ন্যায় প্রতিষ্ঠা করতে পারে। অতএব নারীরও অধিকার আছে সর্বক্ষেত্রে তার মতামত ব্যাক্ত করার। তালাকের ক্ষেত্রেও।

▪ **২.২২৮.২** নারীদের সমান অধিকার রয়েছে পুরুষদের ওপর সদয়তার সঙ্গে, যদিও পুরুষের নারীদের ওপর শ্রেষ্ঠত্ব আছে। আল্লাহ পরাক্রমশালী, বিজ্ঞ : নারী-পুরুষের অধিকার বিষয়ে কোরআন অত্যান্ত সুন্দরভাবে সংক্ষিপ্ত অথচ অন্তর্নিহিতে গভীর অর্থ ও তাৎপর্যপূর্ণ এবং বাস্তবসম্মত দিক-নির্দেশনা তুলে ধরেছে। বলা হচ্ছে, নারী ও পুরুষের অধিকার সমান। তবে অবশ্যই সেটি সদয়তার সঙ্গে। এটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি কথা। কেননা সদয়তা না থাকলে সমান অধিকার অর্জন হয় না। সেক্ষেত্রে কোন পক্ষ দ্বারা জবরদস্তী চলে আসে। সেটি যুদ্ধের মতো। যে জিতে সে-ই রাজত্ব করে। তখন আর

অধিকারের প্রশ্ন আসে না। ন্যায়-অন্যায়ের প্রশ্ন আসে না। 'জোর যার মুল্লুক তার' অবস্থাটি তেমন এক পর্যায়ে উপনীত হয়।

বলা হচ্ছে, যদিও সদয়তার সঙ্গে উভয়ের অধিকার সমান, তথাপি প্রকৃতির নিয়ম অনুসারে এবং জাগতিক শৃংখলার স্বার্থে দু'জন সমান হতে পারে না বা সমান অধিকার দিতে নেই। একজন একজনকে মেনে নিতে হয় বা হবে। না হলে শৃংখলা থাকবে না।

সেক্ষেত্রে এটি মানুষেরও বিষয় নয়, বরং স্বয়ং বিধাতা বা যারা বিধাতায় বিশ্বাসী নয় তাদের ক্ষেত্রে বলা যেতে পারে যে প্রকৃতিই সে ব্যাবস্থা পুরুষের দিকে করে দিয়েছে। নারীদের ওপর তাদের শ্রেষ্ঠত্ব রয়েছে। সেটি শারীরিক, মানসিক, চিন্তা-ভাবনা-চেতনায়, আশ্রয়ে নানাভাবে। তবে সবগুলিকে বাদ দিলেও শারীরিক শক্তির দিক থেকে হলেও পুরুষের কিছুটা শ্রেষ্ঠত্ব রয়েছে এবং এটি প্রকৃতি প্রদত্ত বা আল্লাহ প্রদত্ত বিষয়। নারীর জন্য পুরুষ একটি আশ্রয়ও বটে। যদিও নারীও পুরুষের জন্য একটি প্রশান্তির স্থান এবং সেটিও কম গুরুত্বপূর্ণ নয়। পুরুষের সচলতার প্রেরণাও নারী!!

পুরুষের শ্রেষ্ঠত্বের অর্থ এই নয় যে পুরুষ শক্তি দিয়ে জবরদস্তী বা নিয়ম-কানুনের উর্ধ্বে উঠে নারীর ওপরে তার ক্ষমতা বা শ্রেষ্ঠত্ব ফলাতে পারবে। সে অনুমতি নারী কিংবা পুরুষ কাউকেই দেয়া হয়নি। সত্যের ওপর ভিত্তি করে অর্থাৎ যথাযথ নিয়মের মধ্যে থেকে সকলকে চলতে হবে। এমনই আল্লাহর দিক-নির্দেশনা।

তাই এখানে বিশেষভাবে উল্লেখ করা হয়েছে বা স্মরণ করিয়ে দেয়া হয়েছে যে, 'আল্লাহ পরাক্রমশালী'। অর্থাৎ সকলের ওপরে তিনিই পরাক্রমশালী। কেউ যদি শ্রেষ্ঠত্ব ফলাতে চায় কিংবা শক্তি বা ক্ষমতাবলে কারও ওপরে অত্যাচার-নির্যাতন করে বা করতে চায়, তবে তার ওপরেও পরাক্রমশালী আছেন যার অত্যাচার সেই অত্যাচারীরও সইবার ক্ষমতা থাকবে না। বিষয়টি স্মরণ রেখে সকলকে বিবেচনাপ্রসূত হয়ে কর্ম ও আচরণ করতে উদ্বুদ্ধ করা হয়েছে। অতএব আল্লাহতে বিশ্বাস রেখে, তাঁর বিবেচনার ন্যায্যতার ওপর আস্থা রেখে, তাঁর প্রতি ভালবাসা মিশ্রিত ভীতি রেখে সকলেই যেন ন্যায়সম্মত আচরণ করে সে কথা স্মরণ করিয়ে দেয়া হয়েছে।

বলা হচ্ছে, 'তিনিই বিজ্ঞ'। তিনি যে ফয়সালা দিয়েছেন এর চেয়ে ভাল আর কোন সমাধান নেই। তিনি নারীদের সার্বিক সমান অধিকারের বিষয় জানিয়ে দিয়েছেন, আবার পুরুষের তুলনামূলক শ্রেষ্ঠত্বের কথাও বলে দিয়েছেন। এমনভাবে বিষয়গুলি তুলে ধরেছেন যেন অন্যায়ভাবে কেউ কারও অধিকার অপরের চেয়ে অধিক এটি দাবী করতে না পারে। কিংবা কেউ কারও ওপর বল প্রয়োগ করার কোন যৌক্তিকতা খুঁজে না পায়। বস্তুত আল্লাহ প্রদত্ত বিবেচনা ও সিদ্ধান্তে সমর্পনই শান্তি। মানুষকে সে বিবেচনায় চলতে দিক-নির্দেশনা দেয়া হয়েছে।

সমাজ, সংসার ও জাগতিক শৃংখলার স্বার্থে যেখানে পুরুষের দায়িত্ব ও কর্তব্য আছে সেটি তাকে পালন করতে হবে। আবার পুরুষ তার শ্রেষ্ঠত্বের কারণে নারীর ওপর অত্যাচারীর ভূমিকায়েও অবতীর্ণ হতে পারবে না যদি কেউ নিশ্চিতভাবেই আল্লাহ ও পরকালে বিশ্বাস করে। আর সকল মানুষ যেন আল্লাহর ন্যায়সম্মত আদেশ পালন করে তাই সকলকেই বিশ্বাসী হতে কোরআন আহবান জানিয়ে থাকে। এ আহবান শান্তির স্বার্থে, জাগতিক মঙ্গলের স্বার্থে, সমাজ-সংসার ও বিশাল মানব জনগোষ্ঠীর যথাযথ ব্যাবস্থাপনার স্বার্থে।

উল্লেখ্য যে, জীবন দর্শন এবং সেই সাথে সমাজ ও যুগের আর্থ-সামাজিক কাঠামো ও বাস্তব অবস্থার ওপর ভিত্তি করে সমাজে মানুষ সম্পর্কে মানুষের দৃষ্টিভঙ্গী গড়ে ওঠে। তাতেই সমাজে কারও মূল্য, মর্যাদা, গুরুত্ব ও অধিকার বৃদ্ধি বা প্রতিষ্ঠা পায় আবার কারওটা ক্ষুন্ন হয়। তৎকালীন সমাজেও নারী-পুরুষের সম্পর্কের ক্ষেত্রে অধিকারের বিষয়গুলি সেভাবেই গড়ে উঠেছে। কোরআনে বলা হয়েছে,

"পুরুষেরা নারীদের ওপর দায়িত্বশীল এজন্য যে, ... পুরুষেরা অর্থ-সম্পদ ব্যায় করে।" (আল-কোরআন ৪:৩৪)

সত্য হচ্ছে, সমাজ সংসারে কে বেশী দায়িত্বশীল হবে এটি কেবল নারী-পুরুষ হওয়ার ওপরই নির্ভর করে না। এটি নির্ভর করে অর্থ-সম্পদের ওপর কার কর্তৃত্ব রয়েছে এবং সে সম্পদ ব্যায় করার অধিকার কার হাতে তার ওপর। তৎকালীন আর্থ-সামাজিক কাঠামো, জীবন দর্শন ও বাস্তব অবস্থা কঠোরভাবে পুরুষ শাসিত ছিল। যার প্রভাব প্রতিফলিত হয়েছে সর্বত্র।

জীবন দর্শন সে সময় আজকের মতো ছিল না। নারীরা ছিল পশ্চাতপদ। নারী-পুরুষের মূল্য, মর্যাদা, গুরুত্ব, অধিকার ইত্যাদি বিষয়ে চিন্তা-ভাবনায় পরিবর্তন আনয়নের সূচনাস্বরূপ কোরআনের ওপরোক্ত বাণী গুরুত্বপূর্ণ একটি দিক-নির্দেশনা। বাস্তবে মর্যাদা ও গুরুত্ব প্রতিষ্ঠায় মানুষকে উপার্জনক্ষম হতে হয়। কিন্তু একটি নির্দেশনা জারী করে হঠাৎ করেই সে অবস্থার পরিবর্তন করে দেয়া সম্ভব নয়। কেননা এ পরিবর্তন এবং পরিবার ও সমাজে নারীর মান-মর্যাদা বৃদ্ধির সাথে তাদের আয়-উপার্জনক্ষম হওয়ার একটি সম্পর্ক আছে। যা নারীর মর্যাদা বৃদ্ধি ও অধিকার প্রতিষ্ঠায় জোরালো ভূমিকা রাখতে পারে। কিন্তু সেটি রাতারাতি হয়ে যাওয়া সম্ভব নয়। বিষয়টি সময় সাপেক্ষ।

কোরআন তাই যুগের বাস্তব অবস্থার সাথে সামঞ্জস্য রেখে চলতে নির্দেশনা দিয়েছে। এটিও কোরআনের একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক-নির্দেশনা যে, যুগের সাথে সামঞ্জস্য রেখে বিধি-বিধান ঠিক করে নিতে হবে। তথাপি তেমন সমাজিক অবস্থার প্রেক্ষাপটেও কোরআন নারীদের সমান অধিকারের স্বীকৃতি দিয়ে তাদের মর্যাদাকে জগতব্যাপি সমুন্নত করেছে এবং তাদের যথাযথ অধিকার প্রতিষ্ঠার ভিত্তি রচনা করে দিয়েছে। আজও সর্বক্ষেত্রে এ অবস্থার পরিপূর্ণ পরিবর্তন এসেছে বলা যাবে না। তাই যুগের সমান্তরালে সবকিছু সংশোধন করে নিতে হবে।

বর্তমান সময়ে নারীদের সার্বিক অবস্থার অনেক পরিবর্তন ঘটেছে এটিও সত্য। আর্থ-সামাজিক কাঠামো এবং বাস্তব অবস্থায়েও পরিবর্তন এসেছে। পরিবর্তন এসেছে জীবন দর্শনে এবং সেই সাথে নারীদের প্রতি দৃষ্টিভঙ্গীর ক্ষেত্রেও।

নারীরা এখন আয়-উপার্জন করছে এবং সে পরিসংখ্যান পূর্বের তুলনায় বহুগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। সংসারের প্রয়োজনে তারা অর্থ-সম্পদ ব্যায় করছে, আলোচনায় অংশ নিচ্ছে, কথা বলছে, মতামত ব্যাক্ত করছে এবং সকল কাজে অংশগ্রহন করছে। উপরন্তু জনমত গড়ে তোলার ক্ষেত্রেও তারা বলিষ্ট ভূমিকা পালন করে চলেছে সফলতার সাথে। বস্তুত তৎকালীন সমাজে পুরুষের সমান তালে নারীদের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ কাজে এমন জোরালো ভূমিকা না থাকার কারণেই নারীরা পশ্চাতপদ ছিল। একজন পুরুষকে তাই সে সময়ে যতটা গুরুত্বপূর্ণ ও মর্যাদাসম্পন্ন বলে মনে করা হত নারীকে তেমনভাবে দেখা হত

না। অতএব সময়ের সাথে প্রয়োজনে আজও অনেক নিয়মের পরিবর্তন বা সংশোধন করে নিতে হবে। সূরা আল-জুখরুফ এর নিচের উদ্ধৃত অংশটি এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যেতে পারে। বলা হচ্ছে,

"তারা কি আল্লাহর জন্য এমন কাউকে (কন্যা বা নারীদেরকে) নির্ধারণ করে, যে অলংকারে মন্ডিত হয়ে লালিত-পালিত হয় এবং বিতর্কে কথা বলতে অক্ষম? (আল-কোরআন ৪৩:১৮)

এর অর্থ এই নয় যে, কোরআন এটি স্বীকৃতি দিচ্ছে যে নারীরা অলংকারে মন্ডিত হয়ে লালিত-পালিত হয় বা হবে বা হতে হবে এবং তারা বিতর্কে কথা বলতে সৃষ্টিগতভাবে অক্ষম। বিষয়টি তেমন নয়। এমন ভূলভাবে বিষয়গুলিকে ব্যাখ্যা করার অবকাশ নেই। উপরন্তু অলংকারে মন্ডিত হওয়া দোষেরও কিছু না। যার জন্য যেটি প্রযোজ্য।

এ বাণী তৎকালীন সমাজে নারীদের প্রকৃত অবস্থার একটি চিত্র তুলে ধরেছে। পুরুষ শাষিত সমাজ যেভাবে নারীদেরকে চাপের মুখে রেখেছে, যার কারণে তারা মুখ ফুটে ন্যায্য কথাটিও বলতে পারত না, আয়াতে সে বিষয়ের প্রতি আলোকপাত করা হয়েছে এবং প্রচ্ছন্নে এ অবস্থার সমালোচনা করে এর উত্তরণের প্রতি ইংগিত প্রদান করা হয়েছে।

অতএব কোরআনের দিক-নির্দেশনাকে যথাযথভাবে উপলব্ধি করে সে আলোকে মানবসমাজকে তাদের নিয়ম, রীতি-নীতি ও বিধি-বিধানসমুহকে ন্যায়সম্মতভাবে সাঁজাতে হবে বা প্রয়োজনীয় সংশোধন করে নিতে হবে।

কোরআন যে সময়ে বিধি-বিধান নিয়ে আগমন করেছে তখনও তা যুগোপযোগী করে দিয়েছে। এমনই আল্লাহর দিক-নির্দেশনা। অর্থাৎ সব বিষয়গুলিকে যুগোপযোগী করে নিতে হবে। এমনকি কোরআন কোরআনেরও কোন আয়াতকে প্রয়োজনে রহিত করেছে তেমন দৃষ্টান্তও মানবসমাজের সামনে তুলে ধরেছে (দ্রষ্টব্য ২.২৪২)। আল্লাহ প্রদত্ত পূর্ববর্তী গ্রন্থসমুহেরও প্রয়োজনীয় সংশোধন করেছে বিশেষত যেখানে ভূল-ভ্রান্তি প্রবেশ করেছিল। গুরুত্বপূর্ণ ও প্রয়োজনীয় সংশোধনে দোষের কিছুই নেই। বরং সেটি অপরিহার্য এবং না করা অপরাধ। অন্যথায় মানবসমাজ ভ্রান্তি ও বিশৃংখলার মাঝে পতিত হবে। এমনই আল্লাহর দিক-নির্দেশনা [দ্রষ্টব্য ২.২২৮.২]। তাই বলা হয়েছে,

“আমি কোন অবতীর্ণ বাণী রহিত করলে কিংবা বিস্মৃত করিয়ে দিলে তার স্থানে তার চেয়ে উত্তম অথবা সমপর্যায়ের বাণী নিয়ে আসি। (হে মোহাম্মদ) তুমি কি জান না যে আল্লাহ সবকিছু করতে সক্ষম?” (আল-কোরআন ২:১০৬)

এ বিষয়ে আরও উদাহরণস্বরূপ তুলে ধরা যেতে পারে। যেমন ওসীয়তের ক্ষেত্রে বলা হয়েছে যে,

“যদি কেউ ওসীয়তকারীর পক্ষ থেকে অন্যায় কিংবা কোন অপরাধমূলক সিদ্ধান্তের আশংকা করে এবং তা পক্ষসমুহের মধ্যে মীমাংসা করে দেয় তবে সেটি তার জন্য কোন অপরাধ হবে না। নিশ্চয়ই! আল্লাহ ক্ষমাশীল, অতি দয়ালু।” (আল-কোরআন ২:১৮২)

অর্থাৎ সমাজ ও জাগতিক মঙ্গল, শান্তি ও ন্যায় প্রতিষ্ঠার স্বার্থে প্রয়োজনে সংশোধন করে নেয়ার অনুমোদন আছে। বরং সেটি না করা অন্যায় যা অশান্তি সৃষ্টির কারণ হতে পারে। এগুলিই মানুষের জন্য প্রয়োজনীয় ও গুরুত্বপূর্ণ দিক-নির্দেশনা। বস্তুত শান্তি প্রতিষ্ঠা করাই ধর্মের মূল কাজ নিয়ম রক্ষা নয়। নিয়মকে রক্ষাই করা হয় শান্তি ও শৃংখলা প্রতিষ্ঠা করার জন্য।

আমাদের প্রিয় নবী মোহাম্মদ (সাঃ) সর্বশেষ নবী ও রাসূল (দ্রষ্টব্য আল-কোরআন ৩৩:৪০)। তার পরে আর কোন নবী-রাসূল আগমন করবে না। ফলে আল্লাহর সরাসরি নির্দেশনা প্রাপ্তি এখন আর সম্ভব নয়। পৃথিবী চলমান থাকবে হয়তবা আরও লক্ষ-কোটি বছর। সঠিক জানা নেই। তবে কি সময়ের সাথে আর কোন প্রয়োজনীয় সংশোধন করা যাবে না? বলা হচ্ছে,

“আল্লাহ তোমাদের জন্য সহজ পথটিকেই নির্দেশ করেন; তিনি তোমাদের জন্য কঠিন নিয়ম প্রবর্তনের ইচ্ছে করেন না।” (আল-কোরআন ২:১৮৫)

এটিও আল্লাহর একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক-নির্দেশনা। অপ্রয়োজনীয়ভাবে বা কোন উদ্ধৃত নিয়মের কারণে জীবনকে কঠিন করা যাবে না। অনড় হয়ে বসে থাকা যাবে না। জীবন চলার পথকে সহজ ও মসৃন করে নিতে হবে। আল্লাহ সব উপায় রেখেছেন। বলা হচ্ছে,

"যাদেরকে জ্ঞান ও প্রজ্ঞা দান করা হয়েছে (অর্থাৎ যারা বোধসম্পন্ন) তাদের অন্তরে এটি (কোরঅনের বাণী/দিক-নির্দেশনা) সুস্পষ্ট নিদর্শন।" (আল-কোরআন ২৯:৪৯)

অতএব এখন সে কাজ করবে সমাজের জ্ঞান-গুণী ও বোধসম্পন্ন মানুষগণ। যেখানে প্রয়োজন সেখানে সংশোধন করে নিতে হবে। বিধি-বিধানসমুহকে যুগোপযোগী করে নিতে হবে। শুধু লক্ষ্য রাখতে হবে উদ্দেশ্য প্রণোদিতভাবে নয়, সৎ নিয়তে সত্যকে প্রতিষ্ঠা করার জন্য সবকিছু করতে হবে।

➢ (আয়াত ২২৯-২৩০) তালাক (Divorce) সম্পর্কে বলা হয়েছে।

২২৯	তালাক অবশ্যই দুইবার উচ্চারিত হতে হবে; অতঃপর নারীকে সন্মানের সঙ্গে রাখবে, না হয় সহৃদয়তার সঙ্গে মুক্ত করে দেবে। এটি বিধি সম্মত নয় যে তুমি তাকে যা দিয়েছ তা তার নিকট থেকে ফিরিয়ে নেবে; তবে যে ক্ষেত্রে উভয়েই আশংকা করে যে তারা আল্লাহর নির্দেশ বজায় রেখে চলতে পারবে না সে ক্ষেত্র ব্যাতিত। অতঃপর যদি তোমাদের আশংকা হয় যে তারা উভয়েই আল্লাহর নির্দেশ বজায় রাখতে পারবে না, সেক্ষেত্রে স্ত্রী যদি বিনিময় দিয়ে অব্যাহতি নিয়ে নেয় তবে উভয়ের মধ্যে কারই কোন পাপ নেই। এই হল আল্লাহ কর্তৃক নির্ধারিত সীমা। একে অতিক্রম কর না। বস্তুতঃ যারা আল্লাহ কর্তৃক নির্ধারিত সীমা লঙ্ঘন করবে তারাই বিপথগামী। (Divorce must be pronounced twice and then (a woman) must be retained in honour or released in kindness. And it is not lawful for you that ye take from women aught of that which ye have given them; except (in the case) when both fear that they may not be able to keep within the limits (imposed by) Allah. And if ye fear that they may not be able to keep the limits of Allah, in that case it is no sin for either of them if the woman ransom herself. These are the limits (imposed by)

	Allah. Transgress them not. For whoso transgresseth Allah's limits: such are wrong-doers.)
২৩০	অতঃপর যদি স্ত্রীকে (তৃতীয়বার) তালাক দেয়া হয়, তবে সে স্ত্রী তার জন্য বিধিসম্মত নয় যতক্ষণ পর্যন্ত না সে অন্য কোন স্বামীর সঙ্গে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হচ্ছে। তৎপর যদি দ্বিতীয় স্বামী তাকে তালাক দেয়, তবে তাদের উভয়ের জন্যই পরস্পরকে পুনরায় বিয়ে করাতে কোন পাপ নেই যদি তারা আল্লাহর নির্ধারিত সীমা বজায় রাখে। এই হল আল্লাহ কর্তৃক নির্ধারিত সীমা। তিনি সে সব মানুষের জন্য এসব বিষয় তুলে ধরেন যাদের জ্ঞান/উপলব্ধিবোধ আছে। (And if he hath divorced her (the third time), then she is not lawful unto him thereafter until she hath wedded another husband. Then if he (the other husband) divorce her it is no sin for both of them that they come together again if they consider that they are able to observe the limits of Allah. These are the limits of Allah. He manifesteth them for people who have knowledge.)

▪ **২.২২৯.১** তালাক অবশ্যই দুইবার উচ্চারিত হতে হবে; অতঃপর নারীকে সন্মানের সঙ্গে রাখবে, না হয় সহৃদয়তার সঙ্গে মুক্ত করে দেবে : তালাক দুইবার উচ্চারিত হতে হবে। অর্থাৎ দুইটি তালাকের বিধান রয়েছে। তবে এতে বিবাহ বন্ধন ছিন্ন হয় না। ইদ্দত শেষ হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত তা ফিরিয়ে নেয়ার বিধান আছে। ইদ্দতকাল শেষ হলে এবং এর মাঝে তালাক ফিরিয়ে না নিলে বিবাহ বিচ্ছেদ হয়। এভাবেই নিয়ম সাব্যস্ত হয়েছে।

যেহেতু তালাক উচ্চারণ করে পুরুষ, অতএব এর ফিরিয়ে নেয়ার অধিকারও পুরুষেরই। বলা হচ্ছে, যদি তালাক যথাসময়ে ফিরিয়ে নেয়া হয় তবে অবশ্যই নারীকে সন্মানের সঙ্গে রাখতে হবে। আর যদি তালাক বহাল রাখারও সিদ্ধান্ত নেয়া হয় তবে সহৃদয়তার সঙ্গে নারীকে মুক্ত করে দিতে হবে।

নারীর প্রতি কোনরকম অন্যায়-অত্যাচার করা যাবে না। এগুলি আল্লাহর নির্দেশ। আল্লাহতে যে বিশ্বাসী সে নিজে থেকেই আল্লাহর নির্দেশ মেনে চলবে বা

সেটি ভঙ্গ করবে না দর্শনে বিষয়গুলি এভাবেই ধরে নেয়া হয়েছে। সে জন্যই বিশ্বাসের এত গুরুত্ব। কিন্তু আল্লাহ ও পরকালে বিশ্বাস না থাকলে কেউ বিষয়গুলি যথাযথভাবে পালন করবে না। তাই সকল মানুষকে বিশ্বাসী হওয়ার জন্য আহবান করা হয়ে থাকে।

একটা অন্ধকার যুগে পশ্চাতপদ সমাজে উন্নত বিধানের দিক-নির্দেশনা দিয়েছে কোরআন। নারীদের নিরাপত্তা বিধানে সকল রকম প্রয়োজনীয় নির্দেশনা জারী করা হয়েছে। কোরআনের ভাষা থেকেই সেটি সুস্পষ্ট।

তালাক ফিরিয়ে নিলে স্ত্রীকে সন্মান বা যথাযোগ্য মর্যাদার সাথে রাখতে বলা হয়েছে। আবার বহাল রাখলেও সদয়তার সঙ্গে সে কাজটি করতে নির্দেশনা দেয়া হয়েছে। আর এ বিধান যেমন পক্ষসমুহ মেনে চলবে আল্লাহতে বিশ্বাসের কারণে, ঠিক তেমনি এ বিধানের কার্যকারীতা সমাজকেও রক্ষা করতে হবে।

ইসলামের আবির্ভাবের পূর্বে আরব দেশে বিদ্যমান একটি পারিবারিক ও সামাজিক দুষ্ট ক্ষতকে সংস্কারের নিমিত্তে এ বাণী অবতীর্ণ হয়। তৎকালে সে দেশে একজন স্বামী যখন খুশি তখন যতবার খুশি ততবার স্ত্রীকে তালাক দিতে পারত। আবার নিজের ইচ্ছেমতো যখন খুশি তখন তা ফিরিয়েও নিত। যেহেতু এক্ষেত্রে সুনির্দিষ্ট কোন নিয়ম-বিধি বা কোন সীমা নির্ধারণ করা ছিল না ফলে এমনটি বারবার ঘটত। একজন স্ত্রী লোকের না ছিল তার স্বামীর সঙ্গে বৈবাহিক সুসম্পর্ক বা মর্যাদাপূর্ণ সম্পর্ক, না সে অপর কাউকে বিবাহ করতে পারত। কোন স্বাধীনতা ছিল না। কোরআন এই নিষ্ঠুর-নির্যাতনমূলক ব্যাবস্থা এ বাণীর মাধ্যমে রুদ্ধ করে দিয়েছে। ফলে স্বামী তার সম্পূর্ণ বৈবাহিক জীবনে একজন স্ত্রীকে তালাক প্রদান ও তা ফিরিয়ে নেয়ার অধিকার মাত্র দু'বার গ্রহণ করতে পারবে। অতঃপর যদি সে তৃতীয়বার তালাক দিয়ে দেয়, তবে স্ত্রীর সঙ্গে তার বৈবাহিক সম্পর্ক চিরতরে ছিন্ন হয়ে যাবে। সে স্ত্রী তার জন্য আর বৈধ নয়।

তালাক ঘোষনার ক্ষেত্রে তাড়াহুড়ো করাকে নিবৃত করা ও পুনর্মিলনের সুবিধার্থে কোরআন ধাপে ধাপে তালাক দেয়ার বিধান শিক্ষা দিয়েছে। যদি তালাক দেয়া অনিবার্য হয়ে পড়ে তবে প্রথম তালাকের পর সে পরবর্তী মাসিকের সময় পর্যন্ত অপেক্ষা করবে। অতঃপর যদি সে তালাক দেয়ার সিদ্ধান্ত

নেয় তবে দ্বিতীয় তালাক উচ্চারণ করবে। অতঃপর সে তৃতীয় মাসিকের সময় পর্যন্ত অপেক্ষা করবে যদি সে তৃতীয় ও চূড়ান্ত তালাক দিতে চায়।

প্রথম ও দ্বিতীয় তালাকের পর অপেক্ষা করা ও বিষয়টি পুনর্বিবেচনা করা উত্তম। এ সময়ে স্বামীর তালাক ফিরিয়ে নেয়ার বা পুনর্মিলনের কথিত নিয়মানুযায়ী অধিকার থাকে। কিন্তু তৃতীয় তালাক উচ্চারিত হলে স্বামী তার স্ত্রীকে ফিরে পাবার কথিত নিয়মানুযায়ী অধিকার হারায়। যারা এক বৈঠকে তিনটি তালাক একসাথে উচ্চারণ করে তাদের সে কাজ মূর্খতার সামিল ও পাপ বা অন্যায় বলে বিবেচিত হয়। তারা এর পূর্বাপর বিষয়গুলি ভেবে-চিন্তে কাজ করে না।

▪ **২.২২৯.২** এটি বিধি সম্মত নয় যে তুমি তাকে যা দিয়েছ তা তার নিকট থেকে ফিরিয়ে নেবে : স্ত্রীকে দেয়া বিয়ের মোহর বা উপহার যেমন স্বর্ণ, শাড়ি-কাপড় ইত্যাদি ফিরিয়ে নেয়া বা মাফ করিয়ে নেয়ার অধিকার স্বামীর নেই এবং এটি বৈধ নয়। উপহার হিসেবে কাউকে কিছু প্রদান করে তা ফেরত চাওয়া ইসলামের দৃষ্টিতে নৈতিকতা বা যথাযথ আচরণ বিরোধী। সত্যি বলতে তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রীকে বিদায় দেয়ার কালে ইসলাম বরং তাকে কিছু উপঢৌকন প্রদান করাকে উৎসাহিত করেছে।

তাই বলা হয়েছে যে, এটি বিধি সম্মত নয় যে তুমি তাকে যা দিয়েছ তা তার নিকট থেকে ফিরিয়ে নেবে।

▪ **২.২২৯.৩** তবে যে ক্ষেত্রে উভয়েই আশংকা করে যে তারা আল্লাহর নির্দেশ বজায় রেখে চলতে পারবে না সে ক্ষেত্র ব্যাতিত। অতঃপর যদি তোমাদের আশংকা হয় যে তারা উভয়েই আল্লাহর নির্দেশ বজায় রাখতে পারবে না, সেক্ষেত্রে স্ত্রী যদি বিনিময় দিয়ে অব্যাহতি নিয়ে নেয় তবে উভয়ের মধ্যে কারই কোন পাপ নেই : স্ত্রীকে দেয়া বিয়ের উপহার বা মোহর ফিরিয়ে নেয়া বা মাফ করিয়ে নেয়া বৈধ নয়। তবে কোন কোন ক্ষেত্রে এর ব্যাতিক্রমী বিধানও রাখা হয়েছে। যেমন স্ত্রী যদি মনে করে যে সে স্বামীর হক আদায় করতে পারেনি এবং স্বামীও যদি তেমন অনুভব করে, তবে তেমন ক্ষেত্রে মোহর ফিরিয়ে নেয়া বা মাফ করিয়ে নেয়া যেতে পারে। এতে কোন ত্রুটি নেই।

অর্থাৎ সত্যিকার অবস্থা বিবেচনা করে ও উভয় পক্ষের নিয়তের যথাযথতা সাপেক্ষে ব্যাবস্থা নেয়ায় কোন ত্রুটি নেই। সত্যিকার অবস্থা বিবেচনা ও পক্ষসমুহের নিয়তের যথাযথতা সাপেক্ষে ব্যাবস্থা নেয়ার এ দিক-নির্দেশনা সকল ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য হতে পারে। এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক-নির্দেশনা।

স্ত্রী যদি কোন বিনিময় মূল্য দিয়ে স্বামীর নিকট থেকে তালাক নিয়ে নেয়, ইসলামের পরিভাষায় এটিকে 'খুলা' বলা হয়। যদি এ বিষয়ে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে মতৈক্য হয় তবে সেটিই বলবৎযোগ্য। কিন্তু যদি বিষয়টি আদালত পর্যন্ত যায় তবে সেক্ষেত্রে সর্বাগ্রে এটি নিশ্চিত হতে হবে যে স্ত্রী সত্যি সত্যিই তার স্বামীর সঙ্গে বসবাস করতে ইচ্ছুক নয় এবং আদালত যদি এ বিষয়ে বুঝতে পারে যে তাদের পক্ষে একত্রে সুখে বসবাস করা সম্ভব নয়, তবে আদালত উপযুক্ত বিবেচনা করে যে কোন কিছু বিনিময় নির্ধারণ করে দিতে পারে এবং স্বামীকে তা গ্রহণ করে পালন করতে হবে। তবে সেটি নির্ধারিত মোহরের অধিক হওয়া উচিত নয় বলে অধিকাংশ মতামত দিয়ে থাকেন।

এরূপ ক্ষেত্রে স্ত্রীকে স্বামীর পুনর্বিবাহের অধিকার ক্ষুন্ন হয়। কেননা তালাক সেক্ষেত্রে স্ত্রী কর্তৃক ক্রয় করে নেয়া হয়েছে বলে বিবেচ্য হয়। তবে উভয়ের সম্মতিতে সেটিও সম্ভব।

▪ **২.২২৯.৪** এই হল আল্লাহ কর্তৃক নির্ধারিত সীমা। একে অতিক্রম কর না। বস্তুতঃ যারা আল্লাহ কর্তৃক নির্ধারিত সীমা লঙ্ঘন করবে তারাই বিপথগামী : তালাকের ক্ষেত্রে ওপরে যে বিধান দেয়া হয়েছে সেটি আল্লাহর নির্দেশ। এ নির্দেশনা স্বামী-স্ত্রীর দৈহিক-মানসিক, আচার-আচরণ থেকে শুরু করে সকল ক্ষেত্রে একটি সীমা নির্ধারণ করে দিয়েছে। সমাজের মানুষের জন্যও একটি দিক-নির্দেশনা দিয়েছে। আল্লাহর নির্ধারিত সীমা ভঙ্গ করতে বারণ করা হয়েছে। কেননা এগুলি পূর্বাপর ভাল-মন্দ সকল অবস্থা বিবেচনা করে নির্ধারণ করা হয়েছে। যদি কেউ তা ভঙ্গ করে তবে বিশৃংখলা দেখা দেবে এবং সমাজ আবার পূর্বের অবস্থায় ফিরে যাবে। শুধু তাই নয় সহসা সামাজিক রীতিতে আবার একটি পরিবর্তন প্রত্যাশা করলেও সেটি সহজে পাওয়া যাবে না। এ সীমা লংঘনের অনেক রকমের সুদুর প্রসারি মন্দ ফলাফল আছে। তাই সীমা লঙ্ঘন করতে বারণ করা হয়েছে।

আল্লাহর বিধানের লংঘন হচ্ছে সীমা অতিক্রম। কেবল তালাকের ক্ষেত্রেই নয়, কোন ক্ষেত্রেই আল্লাহর নির্ধারিত সীমা ভঙ্গ করা সমীচীন নয়। আল্লাহ ও পরকালে বিশ্বাস ভিন্ন কেউ বিষয়গুলির প্রতি গুরুত্ব দিতে চাইবে না। তাই মানুষ যেন বেধে দেয়া সীমার মধ্যে নিজে থেকে চলে সে জন্যই বিশ্বাসের এত গুরুত্ব। আবার এসব বিধানের কার্যকারীতা সমাজকেও রক্ষা করতে হবে যথাযথ জ্ঞানে।

▪ **২.২৩০.১** অতঃপর যদি স্ত্রীকে তালাক দেয়া হয়, তবে সে স্ত্রী তার জন্য বিধিসম্মত নয় যতক্ষণ পর্যন্ত না সে অন্য কোন স্বামীর সঙ্গে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হচ্ছে। তৎপর যদি দ্বিতীয় স্বামী তাকে তালাক দেয়, তবে তাদের উভয়ের জন্যই পরস্পরকে পুনরায় বিয়ে করাতে কোন পাপ নেই যদি তারা আল্লাহর নির্ধারিত সীমা বজায় রাখে। এই হল আল্লাহ কর্তৃক নির্ধারিত সীমা : অতঃপর স্বামী যদি স্ত্রীকে তালাক দেয়ার চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেয়, অর্থাৎ তৃতীয়বার তালাক দেয় তবে সে স্ত্রী তার জন্য বৈধ নয়। পরিপূর্ণ বা তৃতীয় তালাকের পর স্বামী যদি স্ত্রীকে পুনরায় ফিরে পেতে চায়, তবে কঠিন শর্তের মধ্য দিয়ে তাকে যেতে হবে। কি সেই কঠিন শর্ত?

স্ত্রীকে ইদ্দতের পরে অন্য কোন পুরুষের সঙ্গে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হতে হবে। অতঃপর যদি সেই স্বামী তাকে তালাক দেয় কিংবা মৃত্যুবরণ করে, তবেই যথাযথভাবে ইদ্দত পালনের পরে পূর্বের স্বামী পুনরায় তাকে বিবাহ করতে পারবে। স্ত্রী সন্তান সম্ভাবনা কিনা সেটি নিশ্চিত হওয়ার জন্যই ইদ্দতের বিধান।

বিবাহ ও তালাক সংক্রান্ত বিষয়ে সমাজে বিদ্যমান অরাজক অবস্থাকে উপরে ফেলতেই এ বিষয়ে এমন কঠোর বিধান আরোপ করা হয়েছে। এ কঠোর বিধান তালাকের সিদ্ধান্ত নেয়ার ক্ষেত্রে মানুষকে বিবেচক হতে সহায়তা করে। ভেবে-চিন্তে কাজ করতে উদ্বুদ্ধ করে। খাম-খেয়ালীপনা করতে নিরুৎসাহিত করে। এর কিছু ভাল-মন্দ মানসিক দিকও আছে।

আল্লাহ এভাবেই সীমা নির্ধারণ করে দিয়েছেন। আল্লাহর নির্ধারিত সীমা বজায় রেখে কাজ করতে বলা হয়েছে। তৃতীয় তালাকের পর কঠোর এ নিয়মকে পাশ কাটিয়ে তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রীকে ফিরে পেতে যদি লোক দেখানর জন্য

পরিকল্পিতভাবে বিষয়টিকে সাজানো হয়, তবে অনেকের মতে সেটি বৈধ হবে না।

উল্লেখিত বিষয়টিকে নিয়ম বা বিধানের একটি কঠোর বা সর্বোচ্চ সীমা হিসেবে ধরে নেয়া যেতে পারে এবং পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে এ বিধানের কঠোরতা কিংবা নমনীয়তার বিষয়টি সমাজ কর্তৃক পুনর্বিবেচনা করা যেতে পারে। এমনকি স্বামী-স্ত্রী উভয়ের সম্মতি ও ইচ্ছেতেও বিধানটি নমনীয় করা যেতে পারে।

▪ **২.২৩০.২** এই হল আল্লাহ কর্তৃক নির্ধারিত সীমা। তিনি সে সব মানুষের জন্য এসব বিষয় তুলে ধরেন যাদের জ্ঞান/উপলব্ধিবোধ আছে : বলা হচ্ছে যে, এই হল আল্লাহ কর্তৃক নির্ধারিত সীমা। তালাকের ক্ষেত্রে আল্লাহ এভাবেই সীমা নির্ধারণ করে দিয়েছেন। এক্ষেত্রে আল্লাহ কেন এমন কঠিন নিয়ম প্রবর্তন করেছেন?

এটি ছিল তৎকালীন সমাজ ও সময়ের প্রেক্ষিতে গৃহীত একটি যথাযথ পদক্ষেপ। বলা হচ্ছে, জ্ঞান ও উপলব্ধিবোধ সম্পন্ন মানুষ এ কঠোর বিধান প্রবর্তনের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা নিশ্চয়ই উপলব্ধি করতে পারবেন। কি সেই উপলব্ধি? নিচে এ বিষয়ে সংক্ষেপে কিছু আলোচনা তুলে ধরা হল।

আজকের পৃথিবীতে নারীরা কাজ করছে। নারীরা অর্থও উপার্জন করছে। তবে সবাই করছে না। যে নারী অর্থ উপার্জন করছে এবং যে নারী অর্থ উপার্জন করছে না- স্বামী বা পরিবারের কাছে তাদের দু'জনের গুরুত্ব দু'রকম।

যে সময় ও সমাজে তালাকজনিত ওপরোক্ত বিধানসমূহ এসেছে সে সময়ে নারীরা সাধারণত অর্থ উপার্জনকারী ছিল না। স্বামীরা তাদেরকে পশু-পাখির মতো বিবেচনা করেছে। যখন ইচ্ছে এবং যতবার ইচ্ছে ততবার তালাক দিয়েছে এবং আবার তা নিজের ইচ্ছেতে ফিরিয়েও নিয়েছে। সকাল-সন্ধ্যার মধ্যেও এমনটি ঘটে যেত। নারীদের জীবনে না সামাজিক কোন মর্যাদা ছিল, না ছিল নিরাপত্তা। বিষয়গুলিকে আজকের অবস্থা, অবস্থান ও পর্যায় থেকে ভাবলে ভূল হবে। এমনকি আজকের সময় ও সমাজেও নারীরা যে প্রকাশ্যে ও সূক্ষ্মভাবে

হয়রানির স্বীকার হয় না তাও নয়। আবার আজকের সমাজেও উচ্চ, মধ্য ও নিম্নবিত্ত সব পর্যায়ের চিত্রটি একই রকম নয়।

সমাজে একটি অবস্থা থেকে আরও একটি অবস্থায় উত্তরণ ব্যাক্তির জন্য যেমন সহজ নয়, তেমনি কোন গোষ্ঠী বা কারও পক্ষেই বিষয়টি সহজ নয়। কোন সমাজে কোন কালে যারা প্রবল হয়ে সামাজিক রীতি-নীতি বা চিন্তার জগতে পরিবর্তন আনতে এগিয়ে আসেন, সেটিকে মানুষের জন্য স্বয়ং বিধাতা প্রদত্ত আশীর্বাদ বলা যেতে পারে। আর সে সময়ে তার সহযোগী হয়ে সকলে এগিয়ে না এলে সহসাই আরেকটা পরিবর্তনের সুযোগ বা মুখ দেখতে পাবে না মানুষ। কুসংস্কারাচ্ছন্ন সামাজিক রীতি-নীতির যাঁতাকলে পিষ্ট হতে থাকবে মানুষ যুগের পর যুগ, শতাব্দির পর শতাব্দি।

সমাজে নারীদের বৈবাহিক বিষয় সংক্রান্ত অবস্থা যখন শোচনীয় পর্যায়ে নেমে গিয়েছিল, তখন এ অবস্থা থেকে উত্তরণে কিছু নিয়ম, বিধি-বিধান ও সীমারেখা আল্লাহ বেধে দিয়েছেন। যা ন্যায়সম্মতভাবে করা হয়েছে। এতে না পুরুষ ক্ষতিগ্রস্ত হবে না নারী। উভয়ের যথাযথ মর্যাদা সংরক্ষণ করেই বিধি-বিধানের সীমারেখাসমূহ ঠিক করে দেয়া হয়েছে।

এমন অনেক সমাজ আছে যেখানে নারী একবার বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হলে আর মুক্ত হতে পারে না। এ বন্ধনকে বিধাতা কর্তৃক নিয়তির বন্ধনরূপে বিবেচনা করা হয়। কিন্তু সকল সময় এ বন্ধন ঠিকভাবে কাজ করে না। তখন উত্তরণের উপায় কি?

এমন অবস্থা থেকে উত্তরণের জন্য ইসলামে বিবাহ বিচ্ছেদের বিধান রাখা হয়েছে। বস্তুত বিবাহ একটি চুক্তি। তালাক বা বিবাহ বিচ্ছেদ চুক্তির কার্যকারীতার সমাপ্তি।

একই স্বামী তার স্ত্রীকে পরিপূর্ণ তালাক দেয়ার পর তাকে পুনরায় বিবাহ করতে চাইলে ওপরে যে কঠিন নিয়মের কথা বলা হয়েছে, সেটি তৎকালীন সমাজে নারীদেরকে কঠিন ও শোচনীয় অবস্থা থেকে উত্তরণের জন্যই একটি কঠিন নিয়মের প্রবর্তনস্বরূপ বলা যেতে পারে। অর্থাৎ কঠিন কে কঠিন দিয়ে মোকাবেলা করার চেষ্টা করা হয়েছে। বস্তুত এটি করা হয়েছে অবিবেচনাপ্রসূত, খাম-খেয়ালীপনার তালাককে নিরুৎসাহতি করার জন্য। কেননা বিবেচনাপ্রসূত

যে তালাক, সে তালাকে একে অপরকে পুনর্বার বিবাহ করার প্রশ্ন আসে না। যদিও আসে তো সেটি হয় কদাচিৎ যা ধর্তব্যের মধ্যে পরে না।

বস্তুত এর মাধ্যমে তালাককে নিরুৎসাহিত করা হয়েছে। বলা হচ্ছে, 'যারা নিজেদের স্ত্রীদের নিকট গমন করবে না বলে শপথ বা সিদ্ধান্ত নেয়, তারা অবশ্যই চার মাস অপেক্ষা করবে; অতঃপর যদি তারা তাদের মন পরিবর্তন করে ..' অর্থাৎ তালাক দেয়াকে নিরুৎসাহিত করা হয়েছে। ভেবে-চিন্তে কাজ করতে বলা হয়েছে। খাম-খেয়ালীপনা বা রাগের বশে কিংবা নিজের বা নিজেদের সামাজিক সুবিধাজনক অবস্থার সুযোগ নিয়ে যেন কোন সিদ্ধান্ত না নেয়া হয় তাই সময় নিতে বলা হয়েছে এবং মনের যথাযথ পরিবর্তনটিকেই প্রত্যাশা করা হয়েছে। আবার বলা হয়েছে, যদি স্ত্রীরা সদ্ভাব বজায় রেখে চলতে চায়, তাহলে তাদেরকে ফিরিয়ে নেয়া তাদের স্বামীদের জন্য উত্তম। তালাক না হওয়াটি উত্তম।

ওপরোক্ত বিধানসমুহ যে সময়ে ও স্থানে দেয়া হয়েছে, সে সময় ও স্থানের আর্থ-সামাজিক অবস্থাকে বিবেচনা করেই সেটি করা হয়েছে। এটিও কোরআনের একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক নির্দেশনা যে, কোন নিয়ম স্থান-কাল ও পাত্রের বিবেচনায় সর্বোচ্চ ন্যায়সম্মত হতে হবে। কোরআন মূলত এ বার্তা বা দিক-নির্দেশনা নিয়েই এসেছে।

বর্তমান আর্থ-সামাজিক অবস্থায় কোন সমাজে যদি আরবের তৎকালীন সময়ের মতো অবস্থা বিরাজ না করে, তবে সে নিয়ম স্থগিত রাখা যেতে পারে এবং স্থান-কাল-পাত্রের বিবেচনায় যা উত্তম তা গ্রহণ করা যেতে পারে।

এ কথার মাধ্যমে তবে কি আল্লাহর নির্ধারিত সীমা অতিক্রম করা হল? উত্তর হচ্ছে, 'না'। অত্যান্ত খারাপ সামাজিক অবস্থায় যেমনটি আরবে তৎকালীন সময়ে বিরাজমান ছিল তেমন অবস্থার প্রেক্ষিতে এ বিধানটি হচ্ছে একটি সর্বোচ্চ কঠোর নির্ধারিত সীমা। এ সীমা আল্লাহ নিজে নির্ধারণ করে দিয়েছেন। কোন মানুষের বা এমনকি কোন প্রতিষ্ঠানের পক্ষেও মানবসমাজে গ্রহণযোগ্য করে এমন কঠোর বিধি প্রবর্তন করা সম্ভব ছিল না এবং আজও সম্ভব নয় যেটি কোরআনের পক্ষেই কেবল করা সম্ভব হয়েছে।

মনে রাখা বাঞ্ছনীয় যে, এটি হচ্ছে একটি সর্বোচ্চ সীমা যা আল্লাহ কর্তৃক নির্ধারিত। স্থান-কাল-পাত্রের বিবেচনায় এ সীমা সময়োপোযোগী করে নির্ধারণ

করা যেতে পারে, কিংবা পরিবেশ ও পরিস্থিতি বিবেচনায় স্থগিত করে রাখা যেতে পারে। যদি ভবিষ্যতেও কোথাও একই রকম সমস্যার সৃষ্টি হয় বা এ নিয়মটি বলবৎ কিংবা প্রয়োগ করার প্রয়োজন হয়, তবে কোরআনের এ বিধানের কারণেই সেটি বলবৎ করা সম্ভবও হবে।

স্পর্শকাতর বিষয়ে দুরাচার দুরীকরণের জন্য একটি কঠিন ও সর্বোচ্চ পর্যায়ের সীমাকে আল্লাহ মানুষের বিবেচনার জন্য উন্মুক্ত করে দিয়েছেন। বিষয়টিকে এভাবে বিবেচনা করতে হবে। সিদ্ধান্ত মানুষের নিজেদের ও সমাজের। মনে রাখা বাঞ্ছনীয় যে, আল্লাহর অনুমোদন ব্যাতিত এমন একটি কঠোর নিয়ম সর্বব্যাপী বলবৎ করা কখনই কারও পক্ষে সম্ভব ছিল না। স্পর্শকাতর বিষয়ে অসহায় নারীদের প্রতি অত্যাচার ও দুরাচার দুরীকরণের প্রয়োজনে এমন কঠোর নিয়মের সুযোগ রাখা হয়েছে। দুরাচারের বিরুদ্ধে এবং উৎপীড়িতের পক্ষে কঠোর বিধান নিয়ে কোরআন একটি শক্তি হয়ে দাড়িয়ে আছে। অসহায়ের জন্য কোরআনের বিধানই ভরসা।

যারা অত্যাচারের মুখোমুখী হয়নি তারা এ কঠোর নিয়মের প্রয়োজনীয়তা হয়তবা উপলব্ধি করতে পারবে না। আবার এর উল্টোটিও হতে পারে। কেউ হয়তবা এ নিয়মের কারণেও অত্যাধিক মানসিক যন্ত্রনায় পড়ে যেতে পারে।

বস্তুত নিয়ম প্রবর্তন করা হয়েছে কারও যন্ত্রনা লাঘব করার জন্য। যন্ত্রনা লাঘব করাই মূখ্য উদ্দেশ্য। সেই নিয়মের কারণেই যেন আবার অন্য কারও যন্ত্রনার সৃষ্টি না হয় সে বিষয়টিকেও গুরুত্বের সাথে বিবেচনায় নিতে হবে। বস্তুত সকল ক্ষেত্রেই যন্ত্রনা লাঘবই উদ্দেশ্য হতে হবে। সেভাবেই বিধির প্রয়োগ হতে হবে। বিধির জন্য মানুষ নয়, বরং মানুষের হিতার্থে বিধি এ বিষয়টিকে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিতে হবে।

নিয়ম বা বিধি-বিধানের প্রয়োগে তাই অনর্থক অনড়তা প্রদর্শন নয়। পরিবেশ-পরিস্থিতি বিবেচনায় নিয়ে প্রতিটি ক্ষেত্রে ন্যায়সম্মত ও যথাযথ পদক্ষেপ নিতে হবে। এসব ক্ষেত্রে স্বামী-স্ত্রী উভয়ের ইচ্ছেকেই সর্বাধিক প্রাধান্য দিতে হবে। নিয়মের কঠোরতা বা বাধ্যবাধকতার কথা বলা যাবে না। কেউ যেন এর সুযোগ নিতে না পারে বা নিয়মের অসৎ ব্যাবহার করতে না পারে সে বিষয়টিকেও বিবেচনায় রাখতে হবে।

আল্লাহ যদি এক্ষেত্রে এমন কাঠিনভাবে একটি সর্বোচ্চ সীমা নির্ধারণ করে না দিতেন, তবে প্রয়োজনে মানুষ কঠোরভাবে এমনতর সামাজিক সমস্যা মোকাবেলা করতে পারত না। একই পরিস্থিতিতে তেমন বিধান কখনও বলবৎ করা যেতে পারে। এর মাধ্যমে সে পথ উন্মুক্ত থাকল। তবে পরিস্থিতি ততটা খারাপ না হলে সর্বোচ্চ সীমাকে স্থগিত করে রাখা যেতে পারে বা রাখাটি উত্তম।

➢ (আয়াত ২৩১) তালাক (Divorce) সম্পর্কিত বিষয়ে বলা হয়েছে।

২৩১	যখন তোমরা স্ত্রীদেরকে তালাক দাও এবং তারা নির্ধারিত ইদ্দত সমাপ্ত করে, তৎপর তোমরা নিয়ম অনুযায়ী তাদেরকে সদয়তার সঙ্গে গ্রহণ কর অথবা সহানুভুতির সঙ্গে মুক্ত করে দাও। তাদেরকে কষ্ট দেয়ার জন্য সীমালংঘন করে আটকে রেখ না। যারা এমনটি করবে, নিশ্চয়ই! তারা নিজেদেরই ক্ষতি করবে। আল্লাহর নির্দেশকে (তোমার আচরণ দিয়ে) হাস্যকর বিষয়ে পরিণত কর না; বরং আল্লাহর অনুগ্রহের কথা স্মরণ কর যা তিনি তোমাদের ওপর অবতীর্ণ করেছেন- গ্রন্থ ও জ্ঞান যা দ্বারা তিনি তোমাদেরকে অনুপ্রানীত করেন। আল্লাহর প্রতি কর্তব্য পালন কর এবং জেনে রেখ, আল্লাহ সর্ববিষয়েই সচেতন। (When ye have divorced women, and they have reached their term, then retain them in kindness or release them in kindness. Retain them not to their hurt so that ye transgress (the limits). He who doeth that hath wronged his soul. Make not the revelations of Allah a laughing-stock (by your behaviour), but remember Allah's grace upon you and that which He hath revealed unto you of the Scripture and of wisdom, whereby He doth exhort you. Observe your duty to Allah and know that Allah is Aware of all things.)

▪ **২.২৩১.১** যখন তোমরা স্ত্রীদেরকে তালাক দাও এবং তারা নির্ধারিত ইদ্দত সমাপ্ত করে, তৎপর তোমরা নিয়ম অনুযায়ী তাদেরকে সদয়তার সঙ্গে গ্রহণ

কর অথবা সহানুভুতির সঙ্গে মুক্ত করে দাও : তালাকের ক্ষেত্রে তিনটি তালাকের বিধান থাকলেও এর অর্থ এই নয় যে তালাক পূর্ণ হওয়ার জন্য তিনটি তালাকই পরিপূর্ণ করতে হবে। কেবলমাত্র প্রথম তালাকেই তালাক সম্পন্ন বা বিবাহ বিচ্ছেদ হয়ে যেতে পারে।

প্রথম তালাক দেয়ার পর স্ত্রী ইদ্দত পালনে যাবে। এ সময়ে তারা উভয়ে তালাকের বিষয়টি পুনর্বিবেচনা করার সময় পাবে। স্ত্রীর ইদ্দতকালীন অবস্থায় স্বামী তালাক ফিরিয়ে নিতে পারে। এতে বৈবাহিক সম্পর্ক ছিন্ন হবে না।

ইদ্দতকালীন সময়ে স্বামী যদি তালাক ফিরিয়ে না নেয় এবং স্ত্রীর ইদ্দতকাল যদি সম্পন্ন হয়ে যায়, তবে বৈবাহিক সম্পর্ক আপনাতেই ছিন্ন হয়ে যাবে। এভাবেই তালাকের বিষয়টি সাব্যস্ত হয়েছে।

প্রথম তালাকে বিবাহ বিচ্ছেদ হলে বিবাহের নবায়ন করে উভয়ে পুনরায় বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপন করতে পারবে।

ইদ্দতকালীন সময়ের মধ্যে যদি কেউ দ্বিতীয় তালাক দেয়, তবে বিষয়টি তালাক প্রদানের দ্বিতীয় পর্যায়ে উপনীত হয়। কিন্তু বিষয়টি একই রকম থেকে যায়। অর্থাৎ ইদ্দতের মধ্যে তালাক প্রত্যাহারের সুযোগ থাকে। ইদ্দত শেষ হলে উভয়ের সম্মতিতে বিয়ের নবায়ন হতে পারে। তবে দ্বিতীয় তালাকে বিষয়টি এমন পর্যায়ে যায় যে আর একটি তালাক দিলে সম্পর্ক চিরতরে ছিন্ন হয়ে যাবে।

বলা হচ্ছে, যদি তালাক যথাসময়ে ফিরিয়ে নেয়া হয় তবে অবশ্যই নারীকে সন্মানের সঙ্গে রাখতে হবে। আর যদি তালাক বহাল রাখারও সিদ্ধান্ত নেয়া হয় তবে সহৃদয়তার সঙ্গে নারীকে মুক্ত করে দিতে হবে। সম্পর্ক রাখুক কিংবা না রাখুক উভয় ক্ষেত্রেই পুরুষের জন্য আচরণগত দিক-নির্দেশনা দেয়া হয়েছে এবং কোরআনের দিক-নির্দেশনার মাধ্যমে নারীর প্রতি সহিংস আচরণ না করতে এবং সহৃদয় হতে বলা হয়েছে। প্রতিটি নির্দেশনায় এমনিভাবে কোরআন নারীকে মর্যাদা দান করেছে এবং তাদের নিরাপত্তা বিধানের ব্যাবস্থা করেছে। তৎকালীন সমাজে নারীদের না ছিল যথাযথ মর্যাদা না নিরাপত্তা। সামাজিক নিপীড়ন থেকে তাদের মুক্তির কোন উপায় ছিল না। ইসলামের আবির্ভাব তা সম্ভব করেছে।

▪ **২.২৩১.২** তাদেরকে কষ্ট দেয়ার জন্য সীমালংঘন করে আটকে রেখ না। যারা এমনটি করবে, নিশ্চয়ই! তারা নিজেদেরই ক্ষতি করবে : বলা হচ্ছে, যদি তালাক যথাসময়ে ফিরিয়ে নেয়া হয় তবে অবশ্যই নারীকে সন্মানের সঙ্গে রাখতে হবে। আর যদি তালাক বহাল রাখারও সিদ্ধান্ত নেয়া হয় তবে সহৃদয়তার সঙ্গে নারীকে মুক্ত করে দিতে হবে। কিন্তু নারীকে কষ্ট দেয়ার অভিপ্রায়ে যদি তালাক প্রত্যাহার করা হয় তবে সেটি সঠিক কাজ নয়। সেটি হবে সীমালংঘন। যারা সীমালংঘন করবে তারা নিজেদেরই ক্ষতি করবে।

বলা হচ্ছে, তালাক প্রত্যাহার করা হলে সেটি অন্তর থেকে মনোমালিন্যকে দুর করে সুন্দর ও সুখী জীবন যাপনের জন্য করতে হবে। পরস্পরের অধিকার ও কর্তব্য যথাযথভাবে আদায় করার ইচ্ছে রেখে করতে হবে। স্ত্রীকে যন্ত্রনা দেয়ার উদ্দেশ্যে তা করা যাবে না।

অন্যায় কাজ করলে পৃথিবীতেও মানুষ তার কিছু ফল ভোগ করে। ফলে অন্যায় আচরণ নিজেরই ক্ষতি করে। উপরন্তু আল্লাহ তো আছেন। তিনি সব দেখেন ও শোনেন। তিনি সব বিষয়ে সচেতন। আল্লাহর নির্দেশ অমান্য না করতে সকলকে এ বিষয়ে এভাবে সতর্ক করা হয়েছে।

▪ **২.২৩১.৩** আল্লাহর নির্দেশকে (তোমার আচরণ দিয়ে) হাস্যকর বিষয়ে পরিণত কর না : একটা কঠিন সামাজিক পরিস্থিতি থেকে সহসাই মানুষের উত্তরণ ঘটানো সম্ভব হয় না। যারা সমাজে পরিবর্তন আনবে তেমন উদ্যোগী মানুষ সব সময় আসে না। এগুলি আল্লাহর আশীর্বাদে ঘটে। আল্লাহ তেমন কোন মানুষকে প্রয়োজনে কোথাও জাগ্রত করে তোলেন।

যুগ যুগ পরে সমাজ পরিবর্তনে তেমন কেউ উদ্যোগী হয়ে যখন এগিয়ে আসে, তখন সমাজ থেকে অন্যায় ও কুসংস্কার বা নিয়মের যাঁতাকল অপসারণে, উৎপীড়কের উৎপীড়ন বন্ধে এবং উৎপীড়িতের কষ্ট লাঘবে তাদের সহায়ক হয়ে সকলের এগিয়ে আসা কর্তব্য।

তেমনই এক নাজুক সামাজিক পরিবেশে আরবের মাটিতে মোহাম্মদ (সাঃ) এর আগমন ঘটে। মহান আল্লাহ তার মাধ্যমে সাম্য ও ন্যায় প্রতিষ্ঠায়, সামাজিক সংস্কার সাধনে নানান বিধি-বিধান ও দিক-নির্দেশনা মানবজাতির জন্য অবতীর্ণ করেন। কিন্তু কাজগুলি করা সহজ ছিল না। তাঁকে প্রচন্ড

বাধার মুখোমুখী হতে হয়েছে। জীবনের ঝুঁকি নিয়ে কাজ করতে হয়েছে। সামাজিক পরিবর্তন সাধন করা সহজ কাজ না। এক একটা বিধান কিভাবে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে এবং তৎপূর্বে সামাজিক অবস্থা কত দুর্বিসহ ছিল বহু পরের মানুষ সে সব বুঝতে পারে না। বুঝতে পারে না বিধায় কিছু মানুষ বিধি-বিধানসমুহকে নিয়েও হাস্যকর অবস্থার সৃষ্টি করে এবং বিধানসমুহের গুরুত্বকে ম্রিয়মান করে দেয়।

তাই বলা হয়েছে নিয়মের পরিপালন করতে গিয়ে, কিংবা তা পরিপলন না করার নানান ছূঁতো সৃষ্টি করে আল্লাহর নির্দেশনাকে সমাজের মানুষের কাছে হাস্যকর বিষয়ে পরিণত না কর। এমন আচরণ কর না যার ফলে সাধারণ মানুষ তা পরিপালনে নিরুৎসাহিত হয় এবং মুক্তির সম্ভাবনার যে পথ সৃষ্টি হয়েছে তা রুদ্ধ হয়ে যায়। এমন আচরণের সুদুরপ্রসারী ফলাফল মন্দ। কেননা সেক্ষেত্রে বিধান সমাজ থেকে ধীরে ধীরে তার কার্যকারীতা হারিয়ে ফেলবে। একসময় মানুষ আবার নানান সামাজিক উৎপীড়নের শিকারে পরিণত হবে। তাই এমন অবিবেচকের মতো কাজ ও আচরণ করতে নিষেধ করা হয়েছে যা মুক্তির পথকে রুদ্ধ কিংবা পিছিয়ে দিতে পারে।

একজন সত্যিকার বিশ্বাসী যেখানে অপরকে সৎ পথ প্রদর্শন করবে, সেখানে যদি সে নিজেই নিজ ঘরে এমন কাজ করে যা তার আদর্শের সঙ্গে যায় না, তবে সেটি যেমন হাস্যকর বিষয়ে পরিণত হবে, তেমনি আদর্শের অনুসারী অপরাপরদেরকেও মন্দভাবে প্রভাবিত করবে বা আল্লাহর নির্দেশনা বিষয়ে ভূল বার্তা দেবে। তাই এমন কাজ করতে নিষেধ করা হয়েছে।

■ **২.২৩১.৪** বরং আল্লাহর অনুগ্রহের কথা স্মরণ কর যা তিনি তোমাদের ওপর অবতীর্ণ করেছেন- গ্রন্থ ও জ্ঞান যা দ্বারা তিনি তোমাদেরকে অনুপ্রানীত করেন : নিজেদের আচরণ দিয়ে আল্লাহর নির্দেশনাকে হাস্যকর বিষয়ে পরিণত না করে বরং আল্লাহর অনুগ্রহের কথা স্মরণ করতে বলা হয়েছে। যা তিনি অবতীর্ণ করেছেন। যে জ্ঞান ও প্রেরণা ভিন্ন দেশ, সমাজ, সংসার সবই অন্ধকারে পতিত হত। নিপীড়িত মানুষ সমাজের নানান নিয়মের যাঁতাকল থেকে সহসাই মুক্তি পেত না।

আল্লাহর অবতীর্ণ নির্দেশনা সমাজে পরিবর্তন বা সংস্কারসাধনকে সম্ভব করেছে। সর্বক্ষেত্রে ন্যায়সম্মত বিধি-বিধানকে প্রতিষ্ঠা করেছে। কোন একক ব্যাক্তির পক্ষে এসব করা সম্ভব ছিল না। স্বয়ং আল্লাহর নামে কাজগুলি সম্পন্ন হয়েছে বিধায় মানুষের কাছেও বিষয়গুলি গুরুত্ব পেয়েছে ও গ্রহণযোগ্য হয়েছে এবং সেভাবে প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব হয়েছে।

আল্লাহ কেবল বিধি-বিধানই দেননি। তাঁর বাণী মানুষকে এমনভাবে অনুপ্রাণীত করে যে, মানুষ স্বেচ্ছায় তার নির্দেশনা বাস্তবায়ন করে। আল্লাহর আশীর্বাদেই মানুষ যুগে যুগে শৃংখল মুক্ত হতে পেরেছে। এমন আশীর্বাদকে স্মরণ করে তাঁর প্রদত্ত দিক-নির্দেশনাকে হাস্যকর বিষয়ে পরিণত না করে প্রচ্ছন্নে মানুষকে তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞ হওয়ার কথা বলা হয়েছে।

▪ **২.২৩১.৫** আল্লাহর প্রতি কর্তব্য পালন কর এবং জেনে রেখ, আল্লাহ সর্ববিষয়েই সচেতন : মানুষ তার প্রতিটি কাজের মধ্য দিয়েই প্রচ্ছন্নে কিংবা অপ্রচ্ছন্নে, প্রত্যক্ষ কিংবা পরোক্ষে আল্লাহর প্রতি কর্তব্য পালন করে। কিন্তু প্রতিটি কাজই যথাযথভাবে সম্পন্ন না হলে সেটি যথাযথ কর্তব্য পালনরূপে বিবেচিত হয় না।

সমাজে বিশৃংখল পরিস্থিতি বিরাজ করার অপর অর্থ হচ্ছে দায়িত্ব ও কর্তব্য পালনে মানুষ কোথাও না কোথাও অবহেলা করছে। মানুষের পালিত কোন কর্মই বিচ্ছিন্ন কিছু না; কোন না কোনভাবে সেটি আল্লাহর প্রতি দায়িত্ব ও কর্তব্য পালনেরই অংশ। তাই যখন যে কাজ করণীয় তখন সেটি সর্বোচ্চ গুরুত্ব ও মনোযোগ দিয়ে যথাযথতার সাথে পালন করাই হচ্ছে আল্লাহর প্রতি আন্তরীকতার সাথে দায়িত্ব ও কর্তব্য পালন।

তালাকের ক্ষেত্রেও যথাযথতার সাথে আল্লাহর নির্দেশনা মেনে চলা তাঁর প্রতি কর্তব্য পালন করা। তাই আল্লাহর প্রতি দায়িত্ব ও কর্তব্য পালনের বিষয়টিকে স্মরণ করিয়ে দেয়া হয়েছে। আল্লাহর নামে পালনকৃত দায়িত্ব ও কর্তব্যই হচ্ছে প্রকারান্তরে মানুষের প্রতি মানুষের কর্তব্য পালন ও সৃষ্টি জগতের প্রতিও মানুষের কর্তব্য পালন। সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম বিষয়গুলিও জাগতিক বিশালাকারের বিষয়গুলির পেছনে প্রভাব রাখে। তেমনিভাবে সংসার জীবনের শান্তি-অশান্তি, ঠিক-বেঠিক সিদ্ধান্ত, পারস্পরিক আচার-আচরণ মানবের কর্মক্ষেত্রেও প্রভাব

ফেলে। সার্বিক পরিবেশকে দারুণভাবে প্রভাবিত করার ক্ষমতা রাখে। আল্লাহর প্রতি পালিত সকল দায়িত্ব ও কর্তব্যকে বিনষ্ট করতে পারে। এমন কোন আচরণ করা উচিত নয় যা সমাজ ও সংসারকে মন্দভাবে প্রভাবিত করতে পারে। তাই এক্ষেত্রেও যথাযথতার সাথে আল্লাহর প্রতি কর্তব্য পালন করতে বলা হয়েছে।

অতঃপর বলা হচ্ছে, জেনে রেখ আল্লাহ সর্ববিষয়েই সচেতন। অর্থাৎ তিনি মানুষের সকল কর্মকান্ড জানেন। অতএব অবহেলা নয়। এটি একটি সতর্কবার্তা। যা বিশ্বাসীকে সতর্কতার সাথে তার কর্তব্য যথাযথভাবে পালন করতে অনুপ্রাণীত করে। কেননা বিশ্বাসী জানে যে দায়িত্ব পালনের বিষয়ে আল্লাহর কাছে একদিন জাবাবদিহি হতে হবে। এ বিশ্বাসের কারণে সে নিজ থেকে আন্তরীক হয়ে এবং কোনরূপ অবহেলা বা উদাসীনতা প্রদর্শন না করে যথাযথতার সাথে তার দায়িত্ব ও কর্তব্য পালন করবে। আর এ মনোবৃত্তি গড়ে তোলার জন্যই সকল মানুষকে বিশ্বাসী হতে আহবান করা হয় [দায়িত্ব ও কর্তব্য দ্রষ্টব্য ২.২১৩.১]।

➢ (আয়াত ২৩২) তালাক (Divorce) সম্পর্কে বলা হয়েছে।

২৩২	যখন তোমরা স্ত্রীদেরকে তালাক দিয়ে দাও এবং তারা তাদের নির্ধারিত ইদ্দত পূর্ণ করতে থাকে, তখন তাদেরকে পারস্পরিক সম্মতির ভিত্তিতে পূর্ব স্বামীর সঙ্গে নিয়মানুযায়ী বিয়ে করতে বাধাদান কর না। এটি একটি সতর্কবার্তা তার জন্য যে আল্লাহ ও শেষ বিচার দিবসকে বিশ্বাস করে। এটি তোমাদের জন্য অধিকতর সঠিক ও পরিচ্ছন্ন। আল্লাহ জানেন তোমরা জান না। (And when ye have divorced women and they reach their term, place not difficulties in the way of their marrying their husbands if it is agreed between them in kindness. This is an admonition for him among you who believeth in Allah and the Last Day. That is more virtuous for you, and cleaner. Allah knoweth; ye know not.)

■ **২.২৩২** যখন তোমরা স্ত্রীদেরকে তালাক দিয়ে দাও ... পূর্ব স্বামীর সঙ্গে নিয়মানুযায়ী বিয়ে করতে বাধাদান কর না। ... আল্লাহ জানেন তোমরা জান না : তালাকপ্রাপ্ত স্বাধীন মেয়ের বিয়েতে বাধাদান করা নিষিদ্ধ। এটি যেমন মেয়ের অভিভাবকদের জন্য নিষিদ্ধ, আবার তার পূর্বের স্বামীও যদি তেমনটি করে বা করতে চায় তবে সেক্ষেত্রে সেটিও নিষিদ্ধ। সামাজিকভাবেও বাধাদান করা নিষিদ্ধ।

স্বাধীন নারী যদি পারস্পরিক সম্মতির ভিত্তিতে পূর্ব স্বামীর সাথেও বন্ধনে আবদ্ধ হতে চায় তবে সেক্ষেত্রেও বাধাদান করা নিষিদ্ধ।

যারা আল্লাহ ও শেষ দিবসকে বিশ্বাস করে অর্থাৎ বিশ্বাসীদের জন্য এমন কাজ ও আচরণ করাকে নিষিদ্ধ করা হয়েছে। এটি মানুষের অধিকারের ওপর হস্তক্ষেপ। মানুষের অধিকারের ওপর হস্তক্ষেপ করা কেবল বিশ্বাসীদের জন্যই নয়, মন্দ সব কাজ জগতের সকল মানুষের জন্যই নিষিদ্ধ। তাই তো কোরআন জগতের সকল মানুষের জন্য দিক-নির্দেশনা!

কেউ নিষিদ্ধ কাজ করলে তাকে পাহাড়া দেবে কে? সেটি কি সম্ভব? তাই সকলকে বিশ্বাসের পথে আহবান করা হয়। মন্দ কাজ না করার ক্ষেত্রে এটি একটি প্রথমিক ও মানসিক বাধা। সত্যিকার বিশ্বাসী আল্লাহর নির্দেশনা মেনে চলবে নিজ থেকে। সত্যি বলতে অধিকাংশ মানুষই বিশ্বাসের কারণে জগতে নিজ থেকে ভাল হয়ে চলে। কিছু মানুষ যারা কিছুই মানে না তাদের জন্য সমাজকে বা সমাজের মানুষকে একত্র হয়ে কাজ করতে হয়। তাই বিশেষ ক্ষেত্র বিবেচনায় বলা হয়েছে,

"যদি আল্লাহ মানবজাতির একদলকে দিয়ে অপরদলকে প্রতিহত না করতেন, তবে এ পৃথিবী অন্যায়ে ছেঁয়ে যেত।" (আল-কোরআন ২:২৫১)

কারও অধিকারে অযাচিত হস্তক্ষেপ না করার বিধানই সবচেয়ে সঠিক, পরিচ্ছন্ন ও পবিত্র বিধান। আল্লাহ মানুষের মঙ্গলার্থেই সকল বিধান প্রণয়ন করেছেন। তিনি জানেন ভাল-মন্দ এবং কর্ম ও আচরণের পরিণতি। কিন্তু যদি কেউ সীমালংঘন করে, তবে তারা কেবল পরকালেই নয় এ জগতেও সীমা লংঘনের ফলাফল কখনও না কখনও, কারও না কারও দ্বারা পেয়ে থাকে। যদিও সব আল্লাহই করেন ও করান।

অতএব আল্লাহর দিক-নির্দেশনা লংঘন করে পারস্পরিক সম্মতির ভিত্তিতে নিয়মানুযায়ী পূর্ব স্বামীর সঙ্গে বিয়ে করতে স্ত্রীদেরকে বাধাদান করতে বারণ করা হয়েছে। এটি অধিকতর সঠিক ও পরিচ্ছন্ন বিধান। যা কারও স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করে না। কারও স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করার সুদুর প্রসারী মন্দ ফলাফল থাকে। এমনকি প্রজন্মের ওপরও এর প্রভাব প্রতিফলিত হতে পারে। সমাজেও পরতে পারে। যার সবকিছু মানুষ তাৎক্ষণিক বুঝতে পারে না। তাই বলা হয়েছে, আল্লাহ জানেন তোমরা জান না।

এটি একটি সতর্কবার্তা তার জন্য যে আল্লাহ ও শেষ বিচার দিবসকে বিশ্বাস করে। অর্থাৎ যারা আল্লাহ ও শেষ বিচার দিবসকে বিশ্বাস করে তারা যেন এমন কাজ না করে তাদেরকে সতর্ক করা হয়েছে। বস্তুত সতর্কীকরণ বার্তা দেয়ার মাধ্যমে আল্লাহর বিধানকে কার্যকর করতে মানবজাতিকে উৎসাহিত করা হয়েছে।

➢ (আয়াত ২৩৩) তালাক (Divorce) সম্পর্কে বলা হয়েছে।

২৩৩	সন্তানবতী নারীরা তাদের সন্তানদেরকে পূর্ণ দু'বছর দুধ পান করাবে, যদি পূর্ণ মেয়াদ সমাপ্ত করতে চায়। আর সন্তানের অধিকারী পিতার ওপর প্রচলিত নিয়ম অনুযায়ী নারীর খোর-পোষের দায়িত্ব। কাউকে তার সামর্থের অতিরিক্ত চাপের সম্মুখীন করা যাবে না। আর মাকে তার সন্তানের জন্য ক্ষতিগ্রস্ত করা যাবে না এবং যার সন্তান তাকেও তার সন্তানের কারণে ক্ষতির সম্মুখীন করা যাবে না। উত্তরাধিকারদের ওপরও দায়িত্ব এমনই। অতঃপর যদি পিতামাতা ইচ্ছে করে, তবে নিজেদের পারস্পরিক পরামর্শক্রমে স্তন্যপান ছাড়িয়ে নিতে পারে। তাতে তাদের কোন পাপ নেই। আর যদি তোমরা কোন ধাত্রীর দ্বারা নিজেদের সন্তানদেরকে দুধপান করাতে চাও, সেক্ষেত্রে যদি তোমরা সদয়তার সঙ্গে সাব্যস্তকৃত বিনিময় দিয়ে দাও, তাতেও কোন পাপ নেই। আল্লাহর প্রতি কর্তব্য পালন কর এবং জেনে রেখ, তোমরা যা কর আল্লাহ তা দেখেন। (Mothers shall suckle their children for two whole years; (that is) for those who wish to complete the

	suckling. The duty of feeding and clothing nursing mothers in a seemly manner is upon the father of the child. No-one should be charged beyond his capacity. A mother should not be made to suffer because of her child, nor should he to whom the child is born (be made to suffer) because of his child. And on the (father's) heir is incumbent the like of that (which was incumbent on the father). If they desire to wean the child by mutual consent and (after) consultation, it is no sin for them; and if ye wish to give your children out to nurse, it is no sin for you, provide that ye pay what is due from you in kindness. Observe your duty to Allah, and know that Allah is Seer of what ye do.)

▪ **২.২৩৩.১** সন্তানবতী নারীরা তাদের সন্তানদেরকে পূর্ণ দু'বছর দুধ পান করাবে, যদি পূর্ণ মেয়াদ সমাপ্ত করতে চায় : এ বাণী তালাক কিংবা স্বামী-স্ত্রীর যে কোন প্রকারের পৃথকীকরণের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। যেমন, খুলা কিংবা আদালত কর্তৃক সাব্যস্তকৃত পৃথকীকরণ ইত্যাদি। এক্ষেত্রে সন্তানের পিতা যদি তেমন ইচ্ছে করে তবে সন্তানবতী নারীরা তাদের সন্তানদেরকে দু'বছর দুধ পান করাবে যদি পূর্ণ মেয়াদ সমাপ্ত করতে চায়। এখানে এটিও বোঝা গেল যে সন্তানের দুধ পান করাবার পূর্ণ মেয়াদ হচ্ছে দু'বছর। এটি সন্তানের অধিকার এবং মায়ের দায়িত্ব। এ কারণে মাতা সন্তানের পিতার নিকট থেকে কোন বিনিময় পেতে পারে না।

▪ **২.২৩৩.২** আর সন্তানের অধিকারী পিতার ওপর প্রচলিত নিয়ম অনুযায়ী নারীর খোর-পোষের দায়িত্ব। কাউকে তার সামর্থের অতিরিক্ত চাপের সম্মুখীন করা যাবে না : যদি সন্তানবতী নারীর তালাক হয়ে যায় তবে সন্তানের অধিকারী পিতার ওপর প্রচলিত নিয়ম অনুযায়ী নারীর খোর-পোষের দায়িত্ব আছে। কাউকে তার সামর্থের অতিরিক্ত চাপের সম্মুখীন করা যাবে না। স্ত্রী যদি মর্যাদাশালী হয় তবে তাকে পুরুষের সামর্থের মধ্যে যথাসম্ভব মর্যাদা রক্ষা করে খোর-পোষ দেয়া উত্তম।

▪ **২.২৩৩.৩** আর মাকে তার সন্তানের জন্য ক্ষতিগ্রস্ত করা যাবে না এবং যার সন্তান তাকেও তার সন্তানের কারণে ক্ষতির সম্মুখীন করা যাবে না : সন্তান থাকার সুবিধা নিয়ে মাকে ক্ষতিগ্রস্ত বা কষ্ট দেয়া যাবে না। যেমন মা যদি কোন অসুবিধার কারণে সত্যি সত্যি সন্তানকে দুধ পান করাতে না পারে তবে বাধ্য করা চলে না। আবার পিতাকেও তার সন্তানের কারণে ক্ষতির সম্মুখীন করা যাবে না। এমন কোন মানসিকতা যেন কেউই প্রদর্শন না করে সে বিষয়ে সতর্ক করা হয়েছে।

▪ **২.২৩৩.৪** উত্তরাধিকারদের ওপরও দায়িত্ব এমনই : পিতার অবর্তমানে সন্তানের অভিভাবকদের দায়িত্ব ওপরে বর্ণিত নিয়মানুযায়ী হবে।

▪ **২.২৩৩.৫** অতঃপর যদি পিতামাতা ইচ্ছে করে, তবে নিজেদের পারস্পরিক পরামর্শক্রমে স্তন্যপান ছাড়িয়ে নিতে পারে। তাতে তাদের কোন পাপ নেই। আর যদি তোমরা কোন ধাত্রীর দ্বারা নিজেদের সন্তানদেরকে দুধপান করাতে চাও, সেক্ষেত্রে যদি তোমরা সদয়তার সঙ্গে সাব্যস্তকৃত বিনিময় দিয়ে দাও, তাতেও কোন পাপ নেই : যদি পিতামাতা ইচ্ছে করে তবে নিজেদের পারস্পরিক পরামর্শক্রমে সন্তানের স্তন্যপান ছাড়িয়ে নিতে পারে। তাতে তাদের কোন পাপ নেই।

আর যদি কোন ধাত্রীর দ্বারা সন্তানকে দুধপান করাতে উভয়ে সম্মত হয়, সেক্ষেত্রে সদয়তার সঙ্গে সাব্যস্তকৃত বিনিময় দিয়ে সেটি করানো যেতে পারে তাতেও কোন পাপ বা অন্যায় নেই।

▪ **২.২৩৩.৬** আল্লাহর প্রতি কর্তব্য পালন কর এবং জেনে রেখ, তোমরা যা কর আল্লাহ তা দেখেন : [দ্রষ্টব্য ২.২৩১.৫] [দায়িত্ব ও কর্তব্য দ্রষ্টব্য ২.২১৩.১]।

➢ (আয়াত ২৩৪-২৩৫) তালাক (Divorce) সম্পর্কে বলা হয়েছে।

২৩৪	তোমাদের মধ্যে যারা স্ত্রীদের রেখে মৃত্যুবরণ করে তারা যেন চার মাস দশ দিন নিজেদের অপেক্ষারত রাখে। অতঃপর যখন ইদ্দত পূর্ণ হবে, তখন নিজের বিষয়ে নীতিসঙ্গত ব্যাবস্থা নিলে কোন পাপ নেই। তোমরা যা কর সে বিষয়ে আল্লাহ অবহিত। (Such of you as die and

	leave behind them wives, they (the wives) shall wait, keeping themselves apart, four months and ten days. And when they reach the term (prescribed for them) then there is no sin for you in aught that they may do with themselves in decency. Allah is informed of what ye do.)
২৩৫	আর যদি তোমরা আকার ইঙ্গিতে সে নারীর জন্য বিবাহের প্রস্তাব দাও, কিংবা নিজেদের মনে গোপন রাখ তবে তাতেও তোমাদের কোন পাপ নেই। আল্লাহ জানেন যে তোমরা সে নারীদের কথা স্মরণ করবে। কিন্তু তাদের সঙ্গে বিয়ে করার গোপন প্রতিশ্রুতি দিয়ে রেখ না। নির্ধারিত নিয়ম অনুযায়ী কথা সাব্যস্ত করে নেবে। আর নির্ধারিত ইদ্দত সমাপ্তি পর্যায়ে না যাওয়া অবধি বিয়ে করার কোন ইচ্ছে কর না। জেনে রেখ, তোমাদের মনে যা আছে আল্লাহ তা জানেন। অতএব তাঁর বিষয়ে সতর্ক থেক। জেন যে, আল্লাহ ক্ষমাশীল ও সহনশীল। (There is no sin for you in that which ye proclaim or hide in your minds concerning your troth with women. Allah knoweth that ye will remember them. But plight (dilemma, difficulty) not your troth with women except by uttering a recognised form of words. And do not consummate the marriage until (the term) prescribed is run. Know that Allah knoweth what is in your minds, so beware of Him; and know that Allah is Forgiving, Clement.)

▪ **২.২৩৪** তোমাদের মধ্যে যারা স্ত্রীদের রেখে মৃত্যুবরণ করে তারা যেন চার মাস দশ দিন ... তোমরা যা কর সে বিষয়ে আল্লাহ অবহিত : স্ত্রীদের রেখে কেউ মৃত্যুবরণ করলে সেক্ষেত্রে স্ত্রীদের ইদ্দতকাল হবে চার মাস দশ দিন। কিন্তু গর্ভবতী হলে সন্তান প্রসব করা পর্যন্ত ইদ্দতকাল হবে।

মানব সৃষ্টির বিষয়টিকে এভাবে ধরে নেয়া হয়েছে যে, সন্তান ৪০ দিন মায়ের গর্ভাশয়ে বীর্য আকারে থাকে, ৪০ দিন জমাট রক্ত আকারে থাকে, ৪০ দিন মাংশপিন্ড আকারে থাকে। অতঃপর প্রাণ বা আত্মা প্রবেশ করে। তখন

সন্তানের গতি বা নড়াচড়া অনুভব হতে থাকে। অর্থাৎ গর্ভধারণ সম্পূর্ণরূপে প্রকাশ পায়। মোট সময় ১২০ দিন বা ৪ মাস। সতর্কতার জন্য আরও দশ দিন যোগ করা হয়। তাই ইদ্দতকাল চার মাস দশ দিন। দাসীদের ক্ষেত্রেও ইদ্দতকাল সমান। কেননা এটি প্রাকৃতিক বিষয়।

ইদ্দতকাল পূর্ণ হলে নিজের বিষয়ে নীতিসঙ্গত ব্যাবস্থা নেয়ায় নারীদের কোন পাপ নেই।

বলা হচ্ছে, তোমরা যা কর আল্লাহ সব দেখেন [আল্লাহ দ্রষ্টব্য ২.২০.২]। অর্থাৎ মানুষ আল্লাহর নির্দেশনা পরিপালন করে নাকি অগোচরে তার অন্যথা করে আল্লাহ তার সবই জানেন। ফলে যে বিশ্বাসী সে এ কথা স্মরণ করে হলেও যথাযথ কাজটি করবে। এ কথা দ্বারা বিশেষত বিশ্বাসীকে তথা সকল মানুষকেই এ বিষয়ে যে দিক-নির্দেশনা দেয়া হয়েছে তা পালন করতে উদ্বুদ্ধ করা হয়েছে।

■ **২.২৩৫** আর যদি তোমরা আকার ইঙ্গিতে সে নারীর জন্য বিবাহের প্রস্তাব দাও, ... নির্ধারিত নিয়ম অনুযায়ী কথা সাব্যস্ত করে নেবে। ... আল্লাহ ক্ষমাশীল ও সহনশীল : তালাকপ্রাপ্ত নারীর বিষয়ে আকারে-ইঙ্গিতে বিবাহের প্রস্তাব দিলে কিংবা মনে গোপন রাখলে তাতে কোন পাপ নেই। কেননা এটি খুবই স্বাভাবিক যে কোন পুরুষ তেমন নারীদের কথা স্মরণ করতে পারে। এর স্বাভাবিকত্ব বিষয়ে আল্লাহ অবহিত। মানব সমাজে তেমনটি ঘটতেই পারে। তবে তেমন নারীদের সঙ্গে বিয়ের গোপন প্রতিশ্রুতি দিয়ে রাখা নিয়মসিদ্ধ নয়। ‘গোপন প্রতিশ্রুতি দিয়ে রেখ না’- অর্থাৎ এমন প্রতিশ্রুতি দিয়ে ব্যাভিচার না করা।

নির্ধারিত নিয়ম অনুযায়ী কথা সাব্যস্ত করে নিতে বলা হয়েছে। বিশেষত যার স্বামী মারা গেছে সেক্ষেত্রে ইদ্দতকালে এমন প্রস্তাবের বিষয়ে বলা হয়েছে। তৃতীয় তালাকের ক্ষেত্রেও ইদ্দতকালে এমন প্রস্তাবনা দেয়া যাবে। কেননা এটি বিবাহ বিচ্ছেদের চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত। তবে দ্বিতীয় তালাক পর্যন্ত এমন প্রস্তাবনা সঙ্গত নয়। কেননা সেক্ষেত্রে বিচ্ছেদ চূড়ান্ত পর্যায়ে যায় না। স্বামী-স্ত্রী পুনর্মিলনের সিদ্ধান্ত নিতে পারে। ফলে তেমন প্রস্তাবনা এক্ষেত্রে নিয়মসিদ্ধ নয়।

নির্ধারিত ইদ্দতকাল সমাপ্তি পর্যায়ে না যাওয়া অবধি বিয়ে করতে বারণ করা হয়েছে। নির্দেশনা মানতে আল্লাহকে স্মরণ করিয়ে দেয়া হয়েছে। বলা হচ্ছে, মানুষের মনে যা আছে আল্লাহ তা জানেন। অতএব আল্লাহর বিষয়ে সতর্ক থাকতে বলা হয়েছে। অন্যায় বা ভূল করলে সেখানে পার পাওয়া যাবে না। কেবল আইন বা সংবিধান নয় আল্লাহর ভয় নিয়ম প্রতিষ্ঠা ও ধরে রাখতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। তবে সেটি কাজ করে সত্যিকারের বিশ্বাসীর ওপর। তাই সকলকে আল্লাহ ও পরকালীন বিচার ব্যাবস্থায় বিশ্বাসী হতে আহবান করা হয়।

আল্লাহ ক্ষমাশীল ও সহনশীল। বলা হচ্ছে, এতদ্বসত্বেও কেউ যদি কিছু ভূল-ক্রটি করেই থাকে এবং যথাযথ নিয়মে ক্ষমা প্রার্থনা করে তবে আল্লাহকে ক্ষমাশীল ও সহনশীল পাবে। একটি আশার বাণী। বস্তুত মানুষ নিজেকে দিয়েও বুঝতে পারে যে অন্যায়কারী ভূল স্বীকার করে ক্ষমা প্রার্থনা করলে অন্তর ক্ষমা করে দেয়। যদি সে প্রার্থনা আন্তরীক হয়।

➢ (আয়াত ২৩৬-২৩৭) তালাক (Divorce) সম্পর্কে বলা হয়েছে।

২৩৬	স্ত্রীদেরকে স্পর্শ করার আগে এবং মোহর সাব্যস্ত করার পূর্বে যদি তালাক দিয়ে দাও, তবে তাতেও তোমাদের কোন পাপ নেই। তবে তাদেরকে কিছু খরচ দেবে। সামর্থ্যবানদের জন্য তাদের সামর্থ্য অনুযায়ী এবং কম সামর্থ্যবানদের জন্য প্রচলিত নিয়মানুসারে তাদের সাধ্য অনুযায়ী। যারা ভাল কাজ করে তাদের জন্য এটি একটি দায়িত্ব। (It is no sin for you if ye divorce women while yet ye have not touched them, nor appointed unto them a portion. Provide for them, the rich according to his means, and the straitened according to his means, a fair provision. (This is) a bounden duty for those who do good.)
২৩৭	আর যদি মোহর সাব্যস্ত করার পর, স্পর্শ করার পূর্বে তালাক দিয়ে দাও সেক্ষেত্রে যে মোহর সাব্যস্ত করা হয়েছে তার অর্ধেক প্রদান করতে হবে। অবশ্য যদি নারীরা ক্ষমা করে দেয়, কিংবা বিয়ের বন্ধন যার

	অধিকারে সে যদি ক্ষমা করে তবে তা স্বতন্ত্র কথা। ক্ষমা করে দেয়া বিশ্বস্ততা বা পবিত্রতার নিকটবর্তী। তোমরা পারস্পরিক সহানুভূতির কথা বিস্মৃত হয়ো না। তোমরা যা কর আল্লাহ সব দেখেন। (If ye divorce them before ye have touched them and ye have appointed unto them a portion, then (pay the) half of that which ye appointed, unless they (the women) agree to forgo it, or he agreeth to forgo it in whose hand is the marriage tie. To forgo is nearer to piety. And forget not kindness among yourselves. Allah is Seer of what ye do.)

▪ **২.২৩৬** স্ত্রীদেরকে স্পর্শ করার আগে এবং মোহর সাব্যস্ত করার পূর্বে যদি তালাক দিয়ে দাও ... যারা ভাল কাজ করে তাদের জন্য এটি একটি দায়িত্ব : স্ত্রীকে স্পর্শ করার পূর্বে এবং মোহর সাব্যস্ত করার আগে যদি তালাক দেয়া হয় তবে তাতে কোন পাপ নেই। এটি করা যেতে পারে। এটি বৈধ। তবে এতে মেয়েদের কষ্ট হয়। তাই তাদেরকে নিজ থেকে কিছু খরচ বা উপহার দেয়ার কথা বলা হয়েছে। এটি উত্তম পন্থা।

যেহেতু মোহর নির্ধারণ হয়নি ফলে এক্ষেত্রে কতটুকু পর্যন্ত দেয়া যেতে পারে সেটি বিবেচনার বিষয়। বলা হচ্ছে, সামর্থ্যবানদের জন্য তাদের সামর্থ্য অনুযায়ী এবং কম সামর্থ্যবানদের জন্য প্রচলিত নিয়মানুসারে তাদের সাধ্য অনুযায়ী। বংশে যেমন মোহর হয়ে থাকে সে বিবেচনায় দেয়া যেতে পারে। যারা ভাল কাজ করে তাদের জন্য এটি একটি দায়িত্ব। কোরআন সকলকেই ভাল কাজ ও আচরণ করতে দিক-নির্দেশনা দেয় এবং উদ্বুদ্ধ করে।

▪ **২.২৩৭** আর যদি মোহর সাব্যস্ত করার পর, স্পর্শ করার পূর্বে তালাক দিয়ে দাও ... তোমরা যা কর আল্লাহ সব দেখেন : আর যদি স্ত্রীকে স্পর্শ করার পূর্বে এবং মোহর সাব্যস্ত করার পরে তালাক দেয়া হয়, সেক্ষেত্রে যে মোহর সাব্যস্ত করা হয়েছে তার অর্ধেক দিয়ে দিতে হবে। নির্জন ঘরে গেলে পূর্ণ মোহর। সহবাস হলে পুরো মোহর দিতে হবে।

অবশ্য যদি নারী ক্ষমা করে দেয় কিংবা বিয়ের বন্ধন যার অধিকারে সে যদি ক্ষমা করে, অর্থাৎ নারীর ক্ষেত্রে যাদের অধিকারে বিয়ের বন্ধন রয়েছে

যেমন তার অভিভাবক তারাও ক্ষমা করতে পারে। তবে সেটি হবে স্বতন্ত্র কথা।

আবার স্বামী যদি পুরো মোহর দিয়ে দেয় তবে সেটিও স্বতন্ত্র কথা। পুরুষের পূর্ণ মোহর দিয়ে দেয়াকেও ক্ষমার মানসিকতার দৃষ্টিতে দেখা হয়েছে। ক্ষমা উভয় পক্ষ থেকে হতে পারে। সম্পূর্ণ কাজটি যে একটি ভাল মানসিকতা ও উত্তম পন্থায় সম্পন্ন হয়েছে এই ক্ষমা তার একটি নিদর্শন। 'তোমরা পারস্পরিক সহানুভূতির কথা বিস্মৃত হয়ো না।' এ কথা দ্বারা ক্ষমা করে দেয়ার বিষয়টিকেই উদ্বুদ্ধ করা হয়েছে।

বলা হচ্ছে, তোমরা যা কর আল্লাহ সব দেখেন [আল্লাহ দ্রষ্টব্য ২.২০.২]। অর্থাৎ মানুষ ভাল কাজটিকে বেছে নেয় নাকি মন্দ কাজটিকে আল্লাহ তা দেখেন। ফলে যে বিশ্বাসী এ কথা স্মরণ করে হলেও সে ভাল পন্থাটিকে বেছে নেবে। এ কথা দ্বারা বিশেষত বিশ্বাসীকে তথা সকল মানুষকেই ভাল কাজ করতে উদ্বুদ্ধ করা হয়েছে। কেননা বিশ্বাসী জানে যে আল্লাহর কাছে ভালদের জন্য পুরস্কার রয়েছে।

বলা হচ্ছে, 'ক্ষমা করে দেয়া বিশ্বস্ততা বা পবিত্রতার নিকটবর্তী।' বিষয়টিকে একটু বোঝার চেষ্টা করি।

কোন কারণে কারও প্রতি তীব্র রোষ বা ঘৃণাবোধের সৃষ্টি হলে প্রতিশোধপরায়নতা জেগে ওঠে। তেমন মানুষকে ক্ষমা করা যায় না। ক্ষমা তাকেই করা যায় যার প্রতি সহানুভূতি থাকে বা সৃষ্টি হয়। অতএব ক্ষমা করতে পারার সাথে সহানুভূতির একটি সম্পর্ক আছে। বিষয়টি আবার দু'পক্ষের আচরণের ওপর নির্ভর করে।

কাউকে ক্ষমা করতে হলে তার জন্য ভেতরে সহানুভূতির সৃষ্টি হতে হবে। যাকে ক্ষমা করা হয় সেও তার আচার-আচরণ বা কর্ম দিয়ে সেটিকে ক্ষমাকারীর মধ্যে জাগিয়ে তুলতে পারে। ফলে যেখানে ক্ষমা আছে সেখানে পরস্পরের প্রতি পরস্পরের একটি সুপ্ত সহানুভূতিও আছে বলে মনে করা যেতে পারে।

অপরদিকে পরস্পরের প্রতি পরস্পরের বিশ্বাস না থাকলে বা না জন্মালে এ সহানুভূতি আসতে পারে না। ফলে ক্ষমা করার বিষয়টির মধ্যে পরস্পরের প্রতি বিশ্বস্ততা সৃষ্টি হওয়া বা থাকারও একটি বিষয় আছে। আর এর সবই

আচরণের পরিশুদ্ধতা বা পবিত্রতার সাথে সম্পর্কিত বিষয়। তাই বলা হয়েছে, ‘ক্ষমা করে দেয়া বিশ্বস্ততা বা পবিত্রতার নিকটবর্তী।’

অতঃপর ‘বিয়ের বন্ধন যার অধিকারে’ কথাটি বেশ তাৎপর্যপূর্ণ। এর সাথে গুরুত্বপূর্ণ কিছু বিষয় সম্পর্কিত। সাধারণত বিবাহ বন্ধনের মালিক হচ্ছে স্বামী। বিষয়টিকে এভাবেই দেখা হয়। তাই বিবাহ বহাল রাখা ও রদ করার অধিকারও স্বামীর। অতএব তালাক দেয়ার অধিকারও স্বামীর। স্ত্রীলোকের তালাক দেয়ার সুযোগ সীমিত।

বর্তমান সময় ও পূর্বের প্রেক্ষাপট ভিন্ন এ বিষয়টিকেও বিবেচনায় রেখে বিধি-বিধান সাঁজাতে হবে বা প্রয়োজনীয় সংশোধন করে নিতে হবে। অর্থাৎ বিধি-বিধানকে যুগোপযোগী করে নিতে হবে। যে সময়ে কোরআন বিধি-বিধান দিয়েছে তখনও যুগোপযোগী করে দিয়েছে। এমনই আল্লাহর দিক-নির্দেশনা [দ্রষ্টব্য ২.২২৮.২]।

উল্লেখ্য নারী-পুরুষের অধিকারের বিষয়টি সমাজ ও যুগের আর্থ-সামাজিক কাঠামো ও অবস্থার ওপর নির্ভর করেও প্রতিষ্ঠা পায়। কোরআনে সে কথাও বলা হয়েছে (দ্রষ্টব্য ২.২২৮.২)। এটিও গুরুত্বপূর্ণ একটি দিক-নির্দেশনা। এগুলিকে বিবেচনায় নিয়ে মানবসমাজকে তাদের বিধি-বিধান ন্যায়সম্মতভাবে সাঁজাতে বা তৈরী করে নিতে হবে। আজকের পৃথিবীতে নারীরা কথা বলছে, কাজ করছে। নারীরা অর্থ উপার্জন করছে। সংসারের সিদ্ধান্ত গ্রহণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে। বিবাহ বন্ধনের অধিকারের বিষয়টি বর্তমানে তাই নারী-পুরুষ উভয়ের সমান সমান হতে পারে। এমনই কোরআনের দিক-নির্দেশনা। কোরআনের দিক-নির্দেশনাকে মানবসমাজেরও সঠিকভাবে বিচার-বিশ্লেষণ করতে জানতে ও পারতে হবে।

➢ (আয়াত ২৩৮-২৩৯) উপাসনা ও প্রার্থনা (Worship and Prayer) সম্পর্কে বলা হয়েছে।

২৩৮	তোমরা উপাসনার প্রতি যত্নবান হও, বিশেষ করে মধ্যবর্তী (উসতা) নামাযের বিষয়ে এবং উপাসনায় রত হও আল্লাহর প্রতি অনুরক্ত হয়ে। (Be guardians of your prayers, and of the midmost prayer,

	and stand up with devotion to Allah.)
২৩৯	যদি তোমরা কোনরূপ শঙ্কায় থাক তবে পদচারী কিংবা আরোহী অবস্থায়ই উপাসনা সম্পন্ন কর। অতঃপর যখন নিরাপদ বোধ কর, তখন আল্লাহকে স্মরণ কর যেভাবে তোমাদেরকে শিক্ষা দেয়া হয়েছে যা তোমরা পূর্বে জানতে না। (And if ye go in fear, then (pray) standing or on horseback. And when ye are again in safety, remember Allah, as He hath taught you that which (heretofore) ye knew not.)

▪ **২.২৩৮** তোমরা উপাসনার প্রতি যত্নবান হও ... উপাসনায় রত হও আল্লাহর প্রতি অনুরক্ত হয়ে : সালাত আদায়ে বিশেষ যত্নবান হতে বলা হয়েছে। অর্থাৎ যথার্থতার সাথে নামাজ বা আল্লাহর উপাসনা করতে বলা হয়েছে। এটি যেমন যথাসময়ে ও নিয়মের শুদ্ধতা রক্ষা করে করতে হবে, তেমনি আল্লাহকে স্মরণকালে পরিবেশের পবিত্রতার দিকেও লক্ষ্য রাখতে হবে। উপাসনাকালে নিরবতা পালন করতে হবে বা বাজে আলোচনা পরিহার করতে হবে। সকল দিক থেকে যত্নবান হয়ে পরিপূর্ণভাবে আল্লাহতে মনোনিবেশ করতে হবে। সৃষ্টিকর্তার প্রতি গভীর ভালবাসা নিয়ে উপাসনা করার জন্য উদ্বুদ্ধ করা হয়েছে। মধ্যবর্তী নামাজ বলতে সম্ভবত 'আসর' নামাযকে বোঝান হয়েছে।

সকল ধর্মেই উপাসনার বিধান রয়েছে এবং উপাসনায় গভীরভাবে মনোযোগী হতে বলা হয়েছে। যেমন গীতায়েও বলা হয়েছে,

"তোমার অন্তরকে সর্বদা আমার স্মরণে নিয়োজিত কর, শ্রদ্ধা অর্পন কর এবং আমার উপাসনা কর। আমার মাঝে পরিপূর্ণভাবে নিবিষ্ট হলে অবশ্যই তুমি আমাকে লাভ করবে।" (গীতা ৯:৩৪)

"সর্বদা আমাকে স্মরণ কর- আমাতে চিত্ত অর্পন কর এবং আমার ভক্ত হও। আমার উপাসনা বা পূঁজা কর এবং আমার প্রতি তোমার আনুগত্য, শ্রদ্ধা, সন্মান প্রদর্শন কর। এইভাবে তুমি নিশ্চিতভাবে আমাকে প্রাপ্ত হবে।" (গীতা ১৮:৬৫)

▪ **২.২৩৯** যদি তোমরা কোনরূপ শঙ্কায় থাক তবে ... আল্লাহকে স্মরণ কর যেভাবে তোমাদেরকে শিক্ষা দেয়া হয়েছে যা তোমরা পূর্বে জানতে না : শঙ্কাজনক অবস্থায়, যেমন যুদ্ধাবস্থায় বা পদচারী কিংবা আরোহী অবস্থায় যেভাবেই সম্ভব সেভাবেই সালাত আদায় করে নিতে বলা হয়েছে। তথাপি নির্দিষ্ট সময়ে পালন করা উপাসনাকে ছাড়তে বারণ করা হযেছে। এমন কঠোর নির্দেশনা থেকে আল্লাহর উপাসনা পালন করার প্রতি কতটা গুরুত্ব দেয়া হয়েছে সেটি বোঝা যায়।

আল্লাহ সর্বত্র বিরাজমান। অতএব আশঙ্কাজনক কোন পরিস্থিতিতে যদি কেবলার দিকে মুখ করা সম্ভব না হয় তবুও নামায আদায় করে নিতে বলা হয়েছে। এমনকি ইশারায় হলেও নামাজ পড়ে নিতে হবে। একান্ত অপারগ হলে পরবর্তীতে কাজা পড়ে নিতে হবে। অর্থাৎ বিপদসঙ্কুল অবস্থার জন্য নিয়ম সহজ করে দিয়ে বোঝা কিছুটা হালকা করে দেয়া হয়েছে। তবুও নামাজ ছাড়া যাবে না।

অতঃপর বিপদ বা শঙ্কামুক্ত হওয়ার পর যথাযথভাবে আল্লাহকে স্মরণ করার কথা বলা হয়েছে। অর্থাৎ সালাত আদায়ে যে নিয়ম মহানবীর আবির্ভাবের পূর্বে মানুষের জানা ছিল না বা যেভাবে সালাত আদায়ের শিক্ষা দেয়া হয়েছে সেভাবে যথাযথতার সাথে তা পালন করতে বলা হয়েছে।

➢ (আয়াত ২৪০–২৪২) তালাক ও ওসিয়ত (Divorce and Bequeath) বিষয়ে নির্দেশনা দেয়া হয়েছে।

২৪০	তোমাদের মধ্যে কারও মৃত্যু সন্নিকটবর্তী হলে, তারা যেন স্ত্রীদের বহিস্কার না করে তাদের খরচের বিষয়ে এক বছরের জন্য ওসিয়ত করে যায়। কিন্তু যদি স্ত্রীরা নিজ থেকে বেরিয়ে যায়, যে সিদ্ধান্ত গ্রহণে নারীর অধিকার আছে এবং নারী যদি নিজের বিষয়ে কোন উত্তম ব্যাবস্থা গ্রহণ করে, তবে সেক্ষেত্রে তোমাদের কোন পাপ নেই। আল্লাহ পরাক্রমশালী, বিজ্ঞ। ((In the case of) those of you who are about to die and leave behind them wives, they should bequeath unto their wives a provision for the year

	without turning them out, but if they go out (of their own accord) there is no sin for you in that which they do of themselves within their rights. Allah is Mighty, Wise.)
২৪১	তালাকপ্রাপ্তা নারীদের জন্য প্রচলিত নিয়ম অনুযায়ী বা সদয়তার সাথে খরচ দেয়া তাদের জন্য কর্তব্য যারা নিজেদের মন্দ থেকে রক্ষা করে চলে। (For divorced women a provision in kindness: a duty for those who ward off (evil).)
২৪২	এভাবেই আল্লাহ তোমাদের জন্য স্বীয় নির্দেশ বর্ণনা করেন যেন তোমরা বুঝতে পার। (Thus Allah expoundeth unto you His revelations so that ye may understand.)

▪ **২.২৪০.১** তোমাদের মধ্যে কারও মৃত্যু সন্নিকটবর্তী হলে, তারা যেন স্ত্রীদের বহিস্কার না করে তাদের খরচের বিষয়ে এক বছরের জন্য ওসিয়ত করে যায় : স্বামীর মৃত্যু হলে স্ত্রীর ইদ্দতকাল ছিল এক বছর। এটি ছিল ইসলামের আবির্ভাবের পূর্বে বা জাহেলিয়াত যুগের নিয়ম। ইসলামের আবির্ভাবের পরে এ সময়কাল চার মাস দশ দিন নির্ধারণ করা হয়।

কোরআনের এ আয়াত যখন অবতীর্ণ হয় তখনও উত্তরাধিকারের বিধান অবতীর্ণ হয়নি। অর্থাৎ স্বামীর সম্পদে স্ত্রীর কোন অংশ নির্ধারিত ছিল না বা হয়নি। স্বামীর করা ওসিয়তের ওপর স্ত্রীর অর্থ-সম্পদ প্রাপ্তির বিষয়টি নির্ভর করত। তাই বলা হয়েছে, স্বামীর মৃত্যুর পর স্ত্রী যদি তার বাড়িতে থাকতে চায় তবে এক বৎসর পর্যন্ত থাকার অধিকার আছে। যেহেতু সে সময় ইদ্দতকাল ছিল এক বছর।

স্ত্রীর ভরণ-পোষন স্বামীর অর্থ-সম্পদ থেকে এক বৎসর অর্থাৎ ইদ্দতের সময় পর্যন্ত দিতে হবে। এ আয়াতে সে নির্দেশনা দেয়া হয়েছে। তবে যেহেতু এটি স্ত্রীর অধিকারের বিষয় তাই এ অধিকার গ্রহণ করা বা না করার সিদ্ধান্ত নেয়ার অধিকারও স্ত্রীর রয়েছে।

▪ **২.২৪০.২** কিন্তু যদি স্ত্রীরা নিজ থেকে বেরিয়ে যায়, যে সিদ্ধান্ত গ্রহণে নারীর অধিকার আছে এবং নারী যদি নিজের বিষয়ে কোন উত্তম ব্যাবস্থা

গ্রহণ করে, তবে সেক্ষেত্রে তোমাদের কোন পাপ নেই। আল্লাহ পরাক্রমশালী, বিজ্ঞ : ইদ্দত শেষ হওয়ার পর স্ত্রীর অন্যত্র বিয়ে করা বিধিসম্মত। নিজের বিষয়ে নারীর এমন সিদ্ধান্ত নেয়ার অধিকার আছে। এতে কোন পাপ বা অন্যায় নেই বলে বলা হয়েছে। তবে ইদ্দতকালীন সময়ে ঘর থেকে বের হওয়া বা বিয়ে করা তৎকালীন সময়ে নিষিদ্ধ ছিল।

▪ **২.২৪১** তালাকপ্রাপ্তা নারীদের জন্য প্রচলিত নিয়ম অনুযায়ী বা সদয়তার সাথে খরচ দেয়া তাদের জন্য কর্তব্য যারা নিজেদের মন্দ থেকে রক্ষা করে চলে : ওপরে যে নিয়মের কথা উল্লেখ করা হয়েছে অর্থাৎ প্রচলিত রীতি অনুসরণ করা সেটিই উত্তম। আর এটা তারাই করবে যারা মন্দ কাজ পরিত্যাগ করে চলতে চায় বা উত্তম পথ অবলম্বন করে চলতে চায় তেমন মানসিকতার মানুষ। কোরআন সকলকেই তেমন উত্তম পথ অবলম্বন করতে উদ্বুদ্ধ করেছে।

▪ **২.২৪২** এভাবেই আল্লাহ তোমাদের জন্য স্বীয় নির্দেশ বর্ণনা করেন যেন তোমরা বুঝতে পার : মানুষের বোঝার সুবিধার জন্য আল্লাহ সকল বিষয়ের বিস্তারিত তুলে ধরেন সে কথা বলা হয়েছে।

এ আয়াত যখন নাযিল হয় তখনও উত্তরাধিকারের বিধান অবতীর্ণ হয়নি। স্বামীর সম্পদে স্ত্রীর কোন অংশ নির্ধারিত ছিল না। স্বামীর ওসিয়তের ওপর তাদের অংশ নির্ধারিত হত। পরে যখন উত্তরাধিকারের বিধান অবতীর্ণ হয় তখন এ আয়াতের কার্যকারীতা রহিত হয়ে যায়। কেননা তখন স্বামীর সম্পত্তিতে স্ত্রীর সুনির্দিষ্ট অধিকার স্বীকৃত হয় এবং সেখান থেকে স্ত্রীর ব্যায় করার অধিকার প্রতিষ্ঠা পায়।

➢ (আয়াত ২৪৩-২৪৫) এ অংশে বাইবেলে বর্ণিত ইসরাইল জাতির কর্ম ও পরিণতির উদাহরণ তুলে ধরে বিশ্বাসীদেরকে আল্লাহর পথে জেহাদ, সংগ্রাম বা যুদ্ধ (Warfare) করতে উদ্বুদ্ধ করা হয়েছে এবং সে কারণে আর্থিক সহায়তা (Goodly Loan) প্রদানেও সকলকে এগিয়ে আসতে উদ্বুদ্ধ করা হয়েছে।

২৪৩	তাদের কথা স্মরণ কর (হে মোহাম্মদ) যারা তোমাদের পূর্বে ছিল; মৃত্যুভয়ে নিজেদের আবাসভূমি ছেড়ে দিয়েছিল অথচ তারা ছিল হাজার

	হাজার। আল্লাহ তাদেরকে বলেন, 'মৃত্যু বরণ কর।' অতঃপর তিনি তাদেরকে 'পুনর্জীবিত' করেন। নিশ্চয়ই! আল্লাহ মানুষের প্রতি অত্যান্ত সদয়। কিন্তু অধিকাংশ মানুষ কৃতজ্ঞতা প্রকাশ/স্বীকার করে না। (Bethink thee (O Muhammad) of those of old, who went forth from their habitations in their thousands, fearing death, and Allah said unto them: Die; and then He brought them back to life. Lo! Allah is a Lord of Kindness to mankind, but most of mankind give not thanks.)
২৪৪	আল্লাহর পথে তথা সত্য ও ন্যায়ের পথে লড়াই কর এবং জেনে রেখ, আল্লাহ সবকিছু শোনেন, জানেন। (Fight in the way of Allah, and know that Allah is Hearer, Knower.)
২৪৫	এমন কে আছে যে আল্লাহকে উত্তম ঋণ (কর্যে হাসানা) প্রদান করবে; ফলে আল্লাহ তাকে তা বহুগুন বৃদ্ধি করে দেবেন। আল্লাহই সংকুচিত করেন এবং তিনিই প্রবৃদ্ধি দান করেন। তোমরা তাঁরই নিকট প্রত্যাবর্তন করবে। (Who is it that will lend unto Allah a goodly loan, so that He may give it increase manifold? Allah straiteneth and enlargeth. Unto Him ye will return.)

▪ **২.২৪৩.১** তাদের কথা স্মরণ কর যারা তোমাদের পূর্বে ছিল; মৃত্যুভয়ে নিজেদের আবাসভূমি ছেড়ে দিয়েছিল অথচ তারা ছিল হাজার হাজার : এখানে ইসরাইল জাতির মহাপ্রস্থানকালীন সময়ে মিশর ছেড়ে কানান বা ফিলিস্তিন ভূমিতে প্রবেশের ঘটনাকে ইংগিত করা হয়েছে। তারা ছিল হাজার হাজার। মরুর বুকে তারা তখন নিরুদ্দেশ হয়ে ঘুরে ফিরছিল। নিজেদের জন্য একটি বাসভূমির সন্ধান করছিল। সে সময় আল্লাহ তাদেরকে উদ্বুদ্ধ করেন। আল্লাহর নির্দেশে মুসা (আঃ) তাদেরকে ফিলিস্তিন ভূমি দখল করতে নির্দেশ দেন। কানানাইটসদেরকে সেখান থেকে বিতাড়িত করতে বলেন। কিন্তু মৃত্যুভয়ে তারা কাপুরুষতা প্রদর্শন করে। তারা যুদ্ধ করতে অস্বীকার করে।

অতি সন্নিকটে পেয়েও তারা তাদের আবাসভূমি হাতছাড়া করেছিল। তারা আল্লাহর নির্দেশ অমান্য করেছিল। এ কারণে আল্লাহ তাদেরকে শাস্তিস্বরূপ চল্লিশ বছর মুরুর বুকে নিরুদ্দেশ ঘুরিয়ে বেরিয়েছেন।

যে মৃত্যুকে তারা ভয় করেছিল নির্দেশ অমান্যকারী সেই প্রজন্ম মরুর বুকেই মৃত্যুবরণ করেছিল। যে প্রজন্মকে রক্ষা করবে বলে তারা যুদ্ধ করতে অস্বীকার করেছিল, পরবর্তীতে সে প্রজন্মই কানান জয় করে [লেখকের 'বাইবেল কোরআন ও ইসরাইল' বই দ্রষ্টব্য]।

তাদের মৃত্যুভয়কে এখানে ভাল চোখে দেখা হয়নি। কেননা তারা ছিল সংখ্যায় অনেক। যথাসময়ে কানান জয় করে আল্লাহ প্রদত্ত প্রতিশ্রুত আবাসভূমিতে তারা প্রবেশ করতে পারত। কিন্তু তারা তা করেনি। ফলে আল্লাহ তাদেরকে চল্লিশ বছর মরুর বুকে উদভ্রান্তের মতো ঘুরিয়ে বেরিয়েছেন।

বছরের পর বছর নির্যাতিত হয়ে মক্কা থেকে মদীনায় হিজরত করে আসার পর বিশ্বাসীরা অবিশ্বাসীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের অনুমতি প্রার্থনা করে আসছিল। কিন্তু যখন তাদেরকে সে অনুমতি দেয়া হয় তখন বিশ্বাসীদের অনেকের মনে মৃত্যভয় প্রবেশ করেছিল (দ্রষ্টব্য আল-কোরআন ২:২১৬, ২২:৩৯)। তাদের সামনে তাই ইসরাইলিদের উদাহরণ তুলে ধরা হয়েছে এবং তাদেরকে এমন আচরণের পরিণতির বিষয়ে সতর্ক করা হয়েছে, যে কারণে ইসরাইল জাতি শাস্তিপ্রাপ্ত ও অধঃপতিত হয়েছিল।

অন্যায়কে মেনে নেয়া ইসলাম সমর্থন করে না। তাতে অন্যায়ের প্রসার ঘটে। অন্যায় হলে তা প্রতিরোধ ও প্রতিহতকরণকে উৎসাহ দান করা হয়েছে। বস্তুত এটিই মানুষের সর্বোর্চ্চ পর্যায়ের দায়িত্বশীলতা ও কর্তব্যপরায়নতা। যারা তাদের দায়িত্ব পালন করবে না তারা তাদের কর্মের ফল ভোগ করবে।

ইহুদি জাতির ঘটনা স্মরণ করিয়ে দেয়ার মধ্য দিয়ে বিশ্বাসীদেরকে একই রকম আচরণ তথা দুর্বলতা প্রদর্শন না করতে বলা হয়েছে। এমন কাজের পরিণতি বিষয়ে সতর্ক করা হয়েছে এবং প্রয়োজনের তাগিদে জেহাদ, যুদ্ধ বা সংগ্রাম করতে উদ্বুদ্ধ করা হয়েছে (দ্রষ্টব্য ২.২১৮.১)।

■ **২.২৪৩.২** আল্লাহ তাদেরকে বলেন, 'মৃত্যু বরণ কর।' অতঃপর তিনি তাদেরকে 'পুনর্জীবিত' করেন : ইসরাইল জাতির যে প্রজন্ম যুদ্ধে যেতে

অস্বীকার করেছিল তারা মরুর বুকে উদভ্রান্তের মতো ঘুরে বেরিয়ে মৃত্যুবরণ করে। অতঃপর অতি কষ্টের মধ্য দিয়ে পরবর্তী এক নতুন প্রজন্মের উত্থান ঘটে। ফলে নতুনভাবে জাতি জাগ্রত বা পুনর্জীবিত হয়। যে প্রজন্মকে রক্ষা করবে বলে মৃত্যুভয়ে পূর্ববর্তী প্রজন্ম যুদ্ধ করতে অস্বীকার করেছিল, অস্বীকারকারী সে গোষ্ঠীর পরবর্তী প্রজন্ম বা নতুন বংশধরেরাই পরিশেষে কানান বিজয় করেছিল। 'পূর্ববর্তী প্রজন্মের মৃত্যুবরণ ও পরবর্তী প্রজন্মের উত্থান' এটিকেই এখানে 'মৃত্যুবরণ ও পুনর্জীবন' বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে।

▪ **২.২৪৩.৩** নিশ্চয়ই! আল্লাহ মানুষের প্রতি অত্যান্ত সদয়। কিন্তু অধিকাংশ মানুষ কৃতজ্ঞতা প্রকাশ/স্বীকার করে না : এখানে ইসরাইল জাতির উদাহরণ তুলে ধরে এটি বলা হয়েছে। আল্লাহ তাদেরকে মিশরের শাসকদের হাতে নিগৃহীত হওয়ার হাত থেকে উদ্ধার করে এনেছেন। তাদের জন্য বাসভূমির ব্যাবস্থা করেছেন। কিন্তু তারা মৃত্যুভয়ে সেখানে যেতে ও যুদ্ধ করতে অস্বীকার করেছিল। তারা পরবর্তী প্রজন্মের জন্য নিজেদের জীবনকে উৎসর্গ করার মানসিকতা ও সাহস দেখাতে ব্যার্থ হয়েছিল। অথচ সত্য হচ্ছে যে, যুদ্ধ না করেও তাদেরকে একদিন মরতে হয়েছে!

বস্তুত পৃথিবীতে মানুষ কতদিন বাঁচবে? অধিক দিন বেঁচেও বা কি করবে? কেবলি আনন্দ? এটিই কি জীবনের লক্ষ্য? সেজন্যই কি পৃথিবীতে মানুষের আগমন? কিভাবে এলো মানুষ এ জগতে? না তারা নিজ ইচ্ছায় নিজেরাই এসেছে? বস্তুত তারা তাদের দায়িত্ব ও কর্তব্য বিষয়ে অবগত ও সচেতন নয়।

মানুষ ভূল করে। এতদ্বসত্বেও আল্লাহ মানুষকে ক্ষমা করেন। সুযোগ দেন। এক্ষেত্রেও আল্লাহ তাই করেছেন। ইসরাইল জাতির নতুন বংশধরদেরকে উজ্জীবিত করেছেন। কিন্তু দেখা যায় যে একসময় তারাও আল্লাহর অফুরন্ত অনুগ্রহকে ভূলে যায়। অনেকে অস্বীকার করে। মানুষের মধ্যে এমন একটি প্রবণতা আছে। আল্লাহ সেটি তুলে ধরেছেন এবং এ আচরণটি যে সঠিক নয় এখানে তা স্মরণ করিয়ে দেয়া হয়েছে।

মানুষ ভূল আচরণ করা সত্বেও আল্লাহ বারবার মানুষের জন্য সব কিছুই করেন। আল্লাহ সবসময় মানুষের প্রতি সদয়তা প্রদর্শন করেন। মানুষের উচিত

কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা এবং আল্লাহর প্রতি কর্তব্য পালন করা। যদিও অধিকাংশ মানুষ তা করে না। বিষয়গুলি স্মরণ করিয়ে দেয়া হয়েছে।

▪ **২.২৪৪.১** আল্লাহর পথে তথা সত্য ও ন্যায়ের পথে লড়াই কর : ওপরের উদাহরণ তুলে ধরার মধ্য দিয়ে পার্থিব জীবনে মানুষের অনেক দায়িত্ব ও কর্তব্যের মধ্যে একটি অত্যান্ত গুরুত্বপূর্ণ কর্তব্যের বিষয় এখানে স্মরণ করিয়ে দেয়া হয়েছে। বস্তুত ভাল পথে করা সকল কাজ ও প্রচেষ্টাই এক প্রকারের যুদ্ধ। জগতের উন্নতি বিধান ও মানব কল্যাণে করা সকল কাজও সংগ্রাম বা যুদ্ধ [জেহাদ-সংগ্রাম-যুদ্ধ দ্রষ্টব্য ২:১৫৪]। কিন্তু সর্বোর্চ্চ পর্যায়ের যুদ্ধ বা জেহাদ হচ্ছে যখন কেউ জাগতিক শান্তি ও উন্নয়নকে ধ্বংস বা ব্যাহত করতে প্রবৃত্ত হয় এবং অন্যায় ও অসত্যের প্রসার ঘটাতে সচেষ্ট হয় তখন তা প্রতিরোধ ও প্রতিহত করা। এটি মানুষের অত্যান্ত গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব ও কর্তব্যের মধ্যে পরে। অন্যথায় পৃথিবী ধ্বংস হয়ে যেত। বলা হচ্ছে,

"যদি আল্লাহ মানবজাতির একদলকে দিয়ে অপরদলকে প্রতিহত না করতেন, তবে এ পৃথিবী অন্যায়ে ছেঁয়ে যেত। কিন্তু আল্লাহ তাঁর সৃষ্টির প্রতি একান্তই দয়াশীল।" (আল-কোরআন ২:২৫১)

জেহাদের বিষয়টি অত্যান্ত গুরুত্বপূর্ণ বিধায় আল্লাহর সারাসরি নির্দেশনার অন্তর্ভূক্ত হয়েছে। এটি আল্লাহর পথে দায়িত্ব ও কর্তব্য পালনের অন্তর্ভূক্ত একটি অত্যান্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। 'সত্য ও ন্যায়' এর পথে দায়িত্ব পালনই 'আল্লাহর পথে' দায়িত্ব পালন। মানুষকে আল্লাহ যে জ্ঞান দান করেছেন সে সাধারণ জ্ঞানও একে সমর্থন করে। অর্থাৎ কোরআনের জ্ঞান আল্লাহ মানুষের মধ্যে পূর্ব থেকেই প্রবেশ করিয়ে রেখেছেন। মানুষ তাই আপনা থেকে অন্যায়ের বিপক্ষে জেগে ওঠে। কিন্তু বোধসম্পন্ন মানুষ ব্যাতিত কেউ তা উপলব্ধি করে না। এখানে আল্লাহর পথে তথা সত্য ও ন্যায়ের পথে মানুষকে সংগ্রাম-লড়াই করতে উদ্বুদ্ধ করা হয়েছে।

সত্য ও ন্যায় প্রতিষ্ঠায় ইসলামের প্রচার-প্রসারে, অনিয়ম-কুসংস্কার দুরীকরনে বিরুদ্ধবাদীদের বিপক্ষে যে সংগ্রাম অব্যাহত আছে আয়াতে সে পথে লড়াই করাকে উৎসাহিত করা হয়েছে। এটিই আল্লাহর পথ। এখানে ইসরাইলের

উদাহরণ তুলে ধরা হয়েছে যেন বিশ্বাসীরা বা মুসলমানেরা তাদের মতো কর্ম ও আচরণের পুনরাবৃত্তি না করে যার মন্দ পরিণাম তারা ভোগ করেছিল।

▪ **২.২৪৪.২ এবং** জেনে রেখ, আল্লাহ সবকিছু শোনেন, জানেন : কেউ দায়িত্ব অবহেলা করলে বা পালন না করলে আল্লাহ সব দেখেন বা জানেন সেটি স্মরণ করিয়ে দেয়া হয়েছে [আল্লাহ দ্রষ্টব্য ২.২০.২]। আবার দায়িত্ব পালনকালে কেউ ইচ্ছেকৃতভাবে অন্যায় করলে সেটিও আল্লাহ দেখেন। বিশ্বাসী আল্লাহতে বিশ্বাসের কারণে নিজ থেকে সঠিক পথে চলবে। সে জন্যই দর্শনে বিশ্বাস স্থাপনের কথা বলা হয়ে থাকে। এর প্রতি জোর দেয়া হয়।

একজন সত্যিকারের বিশ্বাসী কখনই নিজ জ্ঞানে ভূল করবে না। কেবল বিশ্বাসী নামধারী ভূল করতে পারে। কেননা সে সত্যিকার বিশ্বাসী নয়। এক্ষেত্রে মানুষকে সঠিক পথে চালাবার জন্য পার্থিব আইন-কানুনের দরকার হয় না। পুলিশ কিংবা গোয়েন্দা নজরদারীর দরকার হয় না। আবার পুলিশ বা গোয়েন্দা বাহিনী থাকা সত্বেও কি ভূল-ত্রুটি হচ্ছে না? বিশ্বাস থাকা সত্বেও তেমনি কিছু ত্রুটি-বিচ্যুতি হতে পারে। তবে যতটা সম্ভব কমিয়ে আনার চেষ্টায় রত থাকতে হয়। বাস্তবেও সকল কাজে বিশ্বাসের গুরুত্বকে এড়িয়ে যাওয়া কঠিন।

আল্লাহতে বিশ্বাস সকল কিছুর উর্ধ্বে। আইন-কানুন, নিয়ম-রীতিকে ধরে রাখার ক্ষেত্রেও বিশ্বাসই মূল বিষয়। তাই সব ক্ষেত্রেই আল্লাহর বিষয়টি মানুষকে তথা বিশ্বাসীদেরকে স্মরণ করিয়ে দেয়া হয়।

▪ **২.২৪৫.১** এমন কে আছে যে আল্লাহকে উত্তম ঋণ (কর্যে হাসানা) প্রদান করবে; ফলে আল্লাহ তাকে তা বহুগুন বৃদ্ধি করে দেবেন : এ অংশে বাইবেলে বর্ণিত ইসরাইল জাতির কর্ম ও পরিণতির উদাহরণ তুলে ধরা হয়েছে। বিশ্বাসীদেরকে একইরকম কর্ম ও আচরণ করতে বারণ করা হয়েছে এবং আল্লাহর পথে জেহাদ, সংগ্রাম বা যুদ্ধ করতে উদ্বুদ্ধ করা হয়েছে। সে কারণে প্রয়োজনে আর্থিক সহায়তার হাত প্রসার করতে বা ঋণ প্রদান করতে সকলকে উদ্বুদ্ধ করা হয়েছে।

'কর্যে হাসানা' বা 'আল্লাহকে উত্তম ঋণ প্রদান' কথাটি রূপক অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে [উত্তম ঋণ দ্রষ্টব্য ২.২৫৪.১]। বস্তুত আল্লাহর কোন ঋণের প্রয়োজন

নেই। সবকিছুর মালিক তিনি। কিন্তু ঋণ দিলে যেমন অধিক প্রাপ্তি ঘটে, তেমনি আল্লাহর পথে ব্যায় করলেও অধিক বা অগনিত কল্যাণ বা সুফল পাওয়া যায়। সমৃদ্ধি ঘটে। এর প্রতিদান প্রাপ্তির বিষয়টি বস্তুত আল্লাহর সৃষ্টির সূত্রে গাঁথা। সেটিই আল্লাহর প্রতিদান। অতঃপর পরকালের উত্তম প্রতিশ্রুতি তো রয়েছেই।

বস্তুত কোনরূপ প্রাপ্তি, প্রতিদান বা লাভের আশায় নয়, নিঃস্বর্থভাবে কেবলমাত্র আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার মানসে যখন জীবন ও জগতের কল্যাণে ব্যায় করা হয়, সেটিই হচ্ছে 'আল্লাহর পথে' ব্যায়। এককভাবে বৃহদাকারে জনকল্যাণমূলক কাজে ব্যায় করা কঠিন। সামষ্ঠিক অর্থের প্রয়োজন হয়। তাই আল্লাহর কারণে ব্যায় করার জন্য রূপক অর্থে আল্লাহকে ঋণ প্রদানের কথা বলা হয়েছে।

মানব কল্যাণে যা কিছু ব্যায় করা হয় তার সুফল অবধারিত। সেটি যেমন ব্যাক্তিক পর্যায়ে যিনি ব্যায় করেন তিনি পান, তেমনি সমাজের সকল মানুষ তেমন কল্যাণমূলক কাজ থেকে উপকৃত হয়। সমাজ ও জগতসংসারকে সুষ্ঠুভাবে ধরে রাখার জন্য আল্লাহর রাস্তায় ব্যায় করা তাই একটি অতি প্রয়োজনীয় কাজ।

বস্তুত এর ফলে মানুষ যা ব্যায় করে তদাপেক্ষা বহুগুণ বেশী কল্যাণ লাভ করে। তবে বিষয়গুলিকে একান্ত ব্যাক্তিগত লাভ-ক্ষতির পর্যায়ে বিবেচনা করা সমীচীন নয়। আল্লাহর পথে ব্যায়ে সামষ্ঠিক কল্যাণ সাধিত হয়। সে হিসেবে ব্যাক্তিক লাভও হয়ে থাকে। আল্লাহর পথে যা কিছু ব্যায় করা হয় তা সকলের এবং তার সুফলও সকল মানুষ পায়। তাই এটিকে আল্লাহর পথে বলা হয়।

আল্লাহর পথে ব্যায়ের লাভজনক ফলাফল মানুষ তাৎক্ষণিক বুঝে উঠতে পারে না। আবার অনেক সময় মানুষ নিজে কোন সমস্যার মুখোমুখী না হওয়া পর্যন্ত অনেক কল্যাণমূলক কাজের গুরুত্ব যথাযথভাবে উপলব্ধি করে না। সবাই একসাথে বিপদে পড়ে না বিধায় তেমন কর্মের কল্যাণজনিত ফলাফল কেউ বোঝে কেউ বোঝে না। তবে সবাই নয়। জ্ঞান ও উপলব্ধিবোধ সম্পন্ন মানুষ বিষয়গুলি ঠিকই বোঝে।

সমাজ বা জনকল্যাণমূলক কাজগুলিকে আল্লাহর পথে ব্যায়ের অন্তর্ভূক্ত বিষয় বলে জানতে হবে। যার সুফল সমাজের সকল মানুষ পায়। যেমন অবকাঠামো

নির্মাণের কথা উল্লেখ যেতে পারে। কোন এলাকায় রাস্তা নির্মান কিংবা বিদ্যুতের লাইন তৈরী করার কাজে ব্যায় করা আল্লাহর পথে ব্যায়। এর ফলে ব্যাবসা-বাণিজ্য থেকে শুরু করে কর্মসংস্থান পর্যন্ত সকল ক্ষেত্রে দীর্ঘমেয়াদে উন্নতি সাধিত হয়। যা ব্যায় হয় তার বহুগুণ বৃদ্ধি হয়। এভাবেই আল্লাহ বহুগুন বৃদ্ধি করে দেন।

মানুষের জীবন কেমনভাবে পরিচালিত হবে এটি নির্ভর করে জীবন দর্শনের ওপর। একটি ভূল দর্শন জীবনকে দুর্বিসহ করে তুলতে পারে। এমনকি উপরে উল্লেখিত অবকাঠামোসমুহকেও সেক্ষেত্রে মানুষ ধ্বংস করে দিতে পারে। কিংবা তার প্রতিষ্ঠাকে ব্যাহত বা বাধাগ্রস্ত করতে পারে। সমাজের নানান অনিয়ম ও কুসংস্কার এসবের পেছনে কাজ করে।

একটি যথাযথ জীবন দর্শন প্রতিষ্ঠা করা তাই অত্যান্ত গুরুত্বপূর্ণ। তেমন দর্শন প্রতিষ্ঠার পেছনে যে সংগ্রাম সে সংগ্রামের পেছনেও ব্যায় করতে হয়। তাই ইসলামের প্রচার-প্রসার ও প্রতিষ্ঠায় ব্যায় করতে বিশ্বাসীদেরকে উদ্বুদ্ধ করা হয়েছে। কেননা আল্লাহর বার্তা ও নির্দেশনাই মানুষকে সমাজে ন্যায় প্রতিষ্ঠা ও কল্যাণমূক কাজে সবচেয়ে বেশী উদ্বুদ্ধ করে। যারা সে কাজগুলি করতে গিয়ে নিজেদের সংসার, পরিবার-পরিজনের জন্য সময় দিতে পারে না, তাদের জন্য ব্যায় করাও আল্লাহর পথে ব্যায় করা বলে গণ্য হতে পারে।

অন্যায় ও অসত্যকে প্রতিরোধে জেহাদ, সংগ্রাম বা যুদ্ধ যখন অবশ্যম্ভাবী হয়ে পড়ে, তখন সে কারণে ব্যায় করাও আল্লাহর পথে ব্যায়। যা সৃষ্টিকে যথাযথভাবে ধরে রাখে। এমন আরও উদাহরণ আসতে পারে।

তৎকালীন প্রেক্ষাপটে যদিও বিশ্বাসীদেরকে আল্লাহর পথে ব্যায় করতে আহবান করা হয়েছে, তবে পরিবর্তিত বর্তমান প্রেক্ষাপটে জাগতিক উন্নয়ন, সৃষ্টির সুরক্ষা ও মানব কল্যাণ সাধনে সকলকেই দান বা কল্যাণমূলক কাজে ব্যায় করার মাধ্যমে এগিয়ে আসতে হবে। যার সুফল প্রত্যক্ষ হোক কিংবা পরোক্ষ হোক হিন্দু-মুসলিম, বৌদ্ধ-খ্রিষ্টান নির্বিশেষে সকল মানুষই পাবে।

মানব কল্যাণের নিমিত্তে ভাল কাজে মানুষকে এগিয়ে আসার জন্য এখানে উদ্বুদ্ধ করা হয়েছে। কেননা এ কাজগুলি এককভাবে কারও পক্ষেই সম্পন্ন করা সম্ভব নয়। এর জন্য সম্মিলিত উদ্যোগ ও প্রচেষ্টা প্রয়োজন। যারা সে পথে ব্যায় করে সেটিও আল্লাহর পথেই করা ব্যায় হিসেবে বিবেচিত হয়।

আল্লাহর পথে ব্যায় করতে গিয়ে এখানে ঋণের কথা বলা হয়েছে কেন? ঋণ প্রদান করলে মানুষ যেমন তার একটি লাভ বা সূদ পায়, তেমনি নিঃস্বার্থভাবে আল্লাহর পথে বা কল্যাণমূলক কাজে ব্যায় করলে আল্লাহ সৃষ্ট সূত্রের কারণেই সমগ্র সমাজ বাড়তি সুফল লাভ করে।

এছাড়া এটিও বিবেচনায় রাখতে হবে যে, প্রয়োজনে ও দুর্দিনে যারা সহায়তার হাত বাড়িয়ে দিয়ে এগিয়ে আসে, প্রতিষ্ঠিত হলে তারা সেখানে সকল ক্ষেত্রেই অগ্রগণ্য বিবেচিত হয়। এটিও একটি খুবই সাধারণ নিয়ম বা সূত্র। সে বিবেচনায়েও বলা হয় যে, 'আল্লাহ তাকে তা বহুগুন বৃদ্ধি করে দেবেন।'

▪ **২.২৪৫.২** আল্লাহই সংকুচিত করেন এবং তিনিই প্রবৃদ্ধি দান করেন : সমগ্র জগত সংসারের ব্যাবস্থাপনা আল্লাহর নিয়ন্ত্রনাধীন [আল্লাহ দ্রষ্টব্য ২.২০.২]। সেটি যে কত বৃহৎ কর্মযজ্ঞ মানুষের পক্ষে তা ধারণা করাও কষ্টসাধ্য! কেবল একটি পিপড়ে ও তাল গাছকে লক্ষ্য করলেও বোঝা যায় যে, সৃষ্টির একটি কত বড় ও অপরটি কত ছোট হতে পারে!

সমগ্র মহাবিশ্ব যা আমরা দেখতে পাই না কিংবা কল্পনায়েও বুঝি না, সেটি যে কত বড় আর মানুষ যে কত ক্ষুদ্র ভাবতেও অবাক লাগে! একটি ভাইরাস বা ব্যাকটেরিয়া হয়তবা জানেই না যে মানব দেহ নামক এ মহাবিশ্ব তার তুলনায় কত বড়! পরিপূর্ণ মানুষ সম্পর্কে হয়তবা তার কোন ধারণাই নেই। যেমন আল্লাহর বিশালত্ব সম্পর্কে আমাদের ধারণা নেই।

মানুষ আলোচনাচ্ছলে কখনও আল্লাহকে নিয়ে এমনভাবে কথা বলে মনে হয় যেন তিনি এই দলের কিংবা বিরোধী দলের পক্ষের কেউ। অথচ সত্যিকারভাবে তাঁকে আমরা কেউ চিনি না, জানি না এমকি যথাযথভাবে বুঝিও না। মানুষকে তিনি যতটুকু পর্যন্ত অনুমোদন দিয়েছেন তাতে কি আমরা আদৌ তাঁকে বোঝার সক্ষমতা রাখি? সেটিও আমরা নিশ্চিত নই।

কথাগুলি এ কারণে বলছি যে যখন আমরা আল্লাহ সম্পর্কে কোন কথা বলি তখন সে কথা তাঁর বৃহত্তের দিক থেকেও আমাদের বিবেচনা করার আছে। বিষয়গুলি আবার ব্যাক্তিক ও বৈশ্বিক পর্যায়েও বিবেচনা করার আছে।

আল্লাহ আমাদের সকল কিছু সরবরাহ করেন বলতে তিনি আমাদের খাদ্য-খাবার দ্বারে দ্বারে পৌঁছে দেবেন বিষয়গুলি এভাবে ভাববার নয়। কিন্তু আমরা কেউ কেউ এভাবেও ভেবে থাকি।

মহাবিশ্বে যত পানি, ঋতুতে ঋতুতে যত প্রকারের ফল-ফসলের সরবরাহ হয় এসব কে করে? নিশ্চয়ই মানুষ করে না। সব তিনিই সরবরাহ করেন।

কোন বছর উৎপাদন বেশী হয় আবার কোন বছর কম হয়। বৃষ্টি তিনিই বর্ষন করেন কোন প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে। যে প্রক্রিয়া মানুষ তৈরী করেনি। আবার দুর্যোগও তিনি প্রেরণ করেন। এমনিভাবে চাইলে কোথাও তিনি সরবারহ কমিয়ে দিতে পারেন আবার বৃদ্ধিও করে দিতে পারেন। সামগ্রীক বিবেচনায় কোন কিছুই মানুষের নিয়ন্ত্রনে নয়।

মানব সৃষ্ট দুর্যোগ দ্বারাও তিনি একের দ্বারা অন্যকে বিপদগ্রস্ত করতে পারেন। এভাবেও কোথাও সরবরাহ কমিয়ে দিতে পারেন। নানানভাবেই তিনি জীবনোপকরণের সরবরাহ সংকুচিত কিংবা বৃদ্ধি করে দিতে পারেন। মাটির গুণাগুণ কমিয়ে দিতে পারেন। বলা হচ্ছে, কোনদিন যদি দেখ পৃথিবীতে পানি নেই তবে কে পানি সরবরাহ করবে?

“বল: তোমরা ভেবে দেখেছ কি, যদি সব পানি ভূ-গর্ভে অন্তর্ধান হয়ে যায়, তবে কে তোমাদের জন্য পানির স্রোতধারা নিয়ে আসতে পারবে (আল্লাহ ব্যাতিত)?” (আল-কোরআন ৬৭:৩০)

আল্লাহর সরবরাহ করার পর্যায় ও মাত্রাকে তাঁর বৃহত্তের দিক থেকে বিবেচনা করতে হবে। তিনি দ্বারে দ্বারে সব পৌঁছে দেবেন না। তিনি পৃথিবীতে অফুরন্ত দিয়ে রেখেছেন! পরবর্তী কাজ মানুষের। নয়ত এ জগতে মানুষের প্রকৃতই করণীয় কি?

মানুষের কাজ সুষ্ঠু ও ন্যায্যতার ভিত্তিতে আল্লাহ বর্ষিত আশীর্বাদকে বন্টন করা। এটি যেমন মানুষের কাজ তেমনি আল্লাহ মানুষকে এর মাধ্যমে পরীক্ষাও করেন। সেখানেও মানুষ সুশাসনের অভাবের কারণে নিজেরাই নিজেদের দুর্গতির জন্য দায়ী। নয়ত পৃথিবীও হত স্বর্গ। মানুষ নিজেই নিজের স্বর্গ-নরক রচনার জন্য দায়ী। মানুষ যদি আল্লাহর নির্দেশনা মেনে চলত তবে স্বর্গ হত এই পৃথিবী। কিন্তু কিছু মানুষ ভাইরাসের মতো কাজ করে। তাদেরকে সচেতন

করে গড়ে তোলা কিংবা প্রয়োজনে তিরোহিত করাও মানুষের কাজ। আর সে কারণেই কখনও জেহাদ প্রয়োজনীয় হয়ে ওঠে। মানব কল্যাণের নিমিত্তে জেহাদের প্রয়োজনে তাই ব্যায় করতে মানুষকে অনুপ্রাণীত করা হয়েছে।

বলা হচ্ছে, আল্লাহই সংকুচিত করেন এবং তিনিই প্রবৃদ্ধি দান করেন। ওপরে এ বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে। অতএব আল্লাহর পথে ব্যায় করাতে কার্পণ্য নয়। ভাল কাজ করলে তিনি অধিক দেবেন। তিনি সব দেখেন, শোনেন এবং জানেন। প্রত্যেকের ভাল-মন্দ কর্ম সম্পর্কে তিনি পরিপূর্ণভাবে অবহিত; এমনকি অন্তরে যা গোপন আছে সেগুলিও। মানুষকে ভাল পথে বা আল্লাহর পথে ব্যায় করতে উদ্বুদ্ধ করা হয়েছে। যারা ভাল পথে তথা আল্লাহর পথে ব্যায় করবে তাদের সে কর্মের ফল বৃথা যাবে না। বলা হচ্ছে,

"... নিশ্চয়ই! আল্লাহ ভালদের প্রাপ্য পারিশ্রমিককে বিনষ্ট করেন না।" (আল-কোরআন ১১:১১৫)

■ **২.২৪৫.৩** তোমরা তাঁরই নিকট প্রত্যাবর্তন করবে : মানুষ আমরা আজ পৃথিবীতে আছি। একদিন ছিলাম না। তখন কোথায়, কি অবস্থায় ছিলাম? কিংবা আদৌ কি আমি ছিলাম? এই আমি কে? আমার আদৌ কি কোন অস্তিত্ব আছে? আমার অস্তিত্ব কি মরণশীল নাকি চিরজীবি? জটিল সব ভাবনা।

অনেক কিছু না জানলেও মানুষ নিশ্চিতভাবেই এটি জানে যে এক সময় সে এই পৃথিবীতে অস্তিত্বশীল ছিল না। আবার এটিও নিশ্চিতভাবে জানে যে একদিন সে থাকবে না। তখন এ অস্তিত্বের কি হবে? নানান দর্শন নানান কথা বলে। কোরআন বলে মানুষকে আল্লাহর কাছে ফিরে যেতে হবে এবং এ ভাবনায় অযৌক্তিকতাও নেই। এমনই কোরআনের দর্শন!

কোরআনের এ দর্শনে অযৌক্তিকতা নেই এ কারণে যে, আমি কে আমি জানি না। পূর্বে জীবন্ত ছিলাম কিনা কিংবা কোথায় ছিলাম তাও জানি না। পৃথিবীতে নিজে নিজে বা নিজ ইচ্ছেতে আসিনি। তাহলে কিভাবে এলাম? কে পাঠালো? অর্থাৎ নিজের কোন কিছুর ওপর নিজের চূড়ান্ত নিয়ন্ত্রন নেই। নিয়ন্ত্রন অন্যের হাতে। যার হাতে নিয়ন্ত্রন তিনিই স্রষ্টা থেকে শুরু করে সব।

তিনিই আল্লাহ! বা তাঁকেই আল্লাহ নামে অভিহিত করি। যে যে নামেই তাঁকে ডাকুক না কেন তাতে কিছু আসে যায় না।

এবার এখানে আগমনের কারণ নিয়ে ভাবি। কেন তিনি মানুষকে পৃথিবীতে পাঠালেন? আমরা তো খাই-দাই ফুর্তি করি; মায়া মহব্বতে আটকে যাই। এখানে আসার কি এগুলিই কারণ? কেন তিনি এগুলি করতে আমাদেরকে এখানে পাঠাবেন?

কোরআনের দর্শন বলছে পার্থিব জীবন একটি পরীক্ষা। পৃথিবী হচ্ছে একটি পরীক্ষা ক্ষেত্র। মানুষ এখানে ভাল-মন্দ যা কিছু করবে তার ফলাফল প্রাপ্ত হবে পরবর্তীতে। সেই পরবর্তী সময় হচ্ছে বিচার দিবস। বিচার দিবসে বিচারক থাকবেন স্বয়ং আল্লাহ। মানুষকে তাই আল্লাহর কাছে ফিরে যেতে হবে। বিচারের মুখোমুখী হতে হবে। পার্থিব ভাল-মন্দ কর্মের হিসেব দিতে হবে। আল্লাহর কাছে কৃতকর্মের জন্য জবাবদিহি করতে হবে।

আল্লাহ কি কারণে এমনটি করবেন অর্থাৎ কেন মানুষের এ পরীক্ষা নেবেন? তাঁর সর্বশেষ লক্ষ্য সম্পর্কে কোথাও কিছু বলা হয়নি। অতএব ধরে নেয়া যেতে পারে যে ঘুরে ঘুরে বারবার এমনটিই ঘটতে থাকবে। এটিই আল্লাহর দিক থেকে জীবনের আপাত লক্ষ্য কিংবা মানব জ্ঞানে চূড়ান্ত লক্ষ্য। কোরআন এবং গীতায় তেমন ইংগিতও রয়েছে (দ্রষ্টব্য আল-কোরআন ও গীতা যথাক্রমে ২১:১০৪, ৯:৭-৮)। 'তোমরা তাঁরই নিকট প্রত্যাবর্তন করবে' এখানে আয়াতে সে কথা স্মরণ করিয়ে দেয়া হয়েছে।

প্রথমে পৃথিবীকে বাসযোগ্য করে গড়ে তোলার জন্য 'আল্লাহর পথে' তথা 'সত্য ও ন্যায়' প্রতিষ্ঠায় সংগ্রাম করার আহবান জানান হয়েছে। দুষ্ট দানবের অত্যাচার-অনাচার ও সমাজে বিদ্যমান কুসংস্কার দূরীকরণে সংগ্রাম করতে বলা হয়েছে। অতঃপর সে কারণে সকলকে আল্লাহর পথে স্বতঃস্ফূর্ততার সাথে ব্যায় করতে বলা হয়েছে। সতর্ক ও আশ্বাসের বাণী শোনান হয়েছে যে, আল্লাহই জীবনোপকরণ সংকুচিত ও প্রশস্ত করেন। তারই হাতে সবকিছুর নিয়ন্ত্রন! অতএব আল্লাহর পথে ব্যায় করাতে কার্পণ্য নয়।

আল্লাহর রাস্তায় ব্যায় প্রকৃত অর্থে কোন ব্যায় নয়। আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন অধিক প্রাপ্তির সম্ভাবনার দুয়ার উন্মোচন করে দেয়। যার সুফল সকল মানুষ ভোগ করে। আল্লাহর ওপর ভরসা রাখতে বলা হয়েছে।

সবশেষে সতর্ক করা হয়েছে যে তোমরা তাঁরই নিকট প্রত্যাবর্তন করবে। অর্থাৎ পার্থিব ভাল-মন্দ কাজের হিসেব হবে। কর্ম অনুযায়ী ফল প্রাপ্ত হবে। সতর্কতামূলক এ বার্তার মাধ্যমে সামষ্ঠিক ভাল কাজে ব্যায় করতে মানুষকে উদ্বুদ্ধ করা হয়েছে। অন্যথায় দায়িত্বহীনতার কারণে পরকালে মানুষকে বিপদের মুখোমুখী হতে হবে প্রচ্ছন্নে সে বার্তা রয়েছে।

সত্য হচ্ছে যে, ব্যাক্তিক লাভবিহীন কল্যাণমূলক কোন কাজ কিংবা ঝুঁকিপূর্ণ বৃহত্তর কোন কাজ এককভাবে কারও পক্ষে করা সম্ভব নয়। সেক্ষেত্রে সম্মিলিত উদ্যোগ ও প্রচেষ্টার প্রয়োজন হয়। ফলে মানুষকেই মানুষের নিজেদের কল্যাণে প্রকারান্তরে সৃষ্টির সুরক্ষায় এগিয়ে আসতে হবে। এমনই কোরআনের দিক-নির্দেশনা। যার অন্তর্নিহিত বক্তব্য শাশ্বত ও সার্বজনীন।

➢ (আয়াত ২৪৬-২৫৩) এ অংশে বাইবেলে বর্ণিত ইসরাইল (Children of Israel) জাতির ঘটনা শিক্ষনীয় হিসেবে তুলে ধরা হয়েছে। মূলত জেহাদ সম্পর্কে ধারণা দিতেই এসব উদাহরণ উদ্ধৃত হয়েছে। তৎকালীন সময়ের প্রেক্ষিতে আসন্ন জেহাদের জন্য মুসলমানদেরকে মানসিকভাবে প্রস্তুত করার লক্ষ্যেই এসব বাণী অবতীর্ণ হয়েছে। জেহাদের (Warfare) কারণে বিশ্বাসীদেরকে কষ্ট স্বীকার করতে হবে ও নানান পরীক্ষার মুখোমুখী হতে হবে। ধৈর্য্যের সাথে সেসব মোকাবেলা করার জন্য পূর্বেই প্রস্তুতিমূলক সতর্কবাণী উচ্চারণ করা হয়েছে।

২৪৬	স্মরণ কর মূসার পরবর্তী সময়ে ইসরাইলের নেতৃস্থানীয়দের কথা, কিভাবে তারা তাদের নবীকে বলেছিল যে, 'আমাদের জন্য একজন বাদশাহ নির্ধারণ করে দিন, যেন আমরা আল্লাহর পথে যুদ্ধ করতে পারি।' সে বলল, 'যদি যুদ্ধের নির্দেশ দেয়া হয় তবে কি তোমরা যুদ্ধ করা থেকে বিরত থাকবে?' তারা বলল, 'কেন আমরা আল্লাহর পথে যুদ্ধ করব না যখন নিজেদের বাসভূমি ও পরিবার-পরিজন থেকে

	বিতাড়িত হয়েছি।' তথাপিও যখন যুদ্ধের নির্দেশ হল, স্বল্প সংখ্যক ব্যাতিত তাদের সবাই ঘুরে দাঁড়াল। দুষ্টদের সম্পর্কে আল্লাহ ভালভাবেই অবগত। (Bethink thee of the leaders of the Children of Israel after Moses, how they said unto a prophet whom they had: Set up for us a king and we will fight in Allah's way. He said: Would ye then refrain from fighting if fighting were prescribed for you? They said: Why should we not fight in Allah's way when we have been driven from our dwellings with our children? Yet, when fighting was prescribed for them, they turned away, all save a few of them. Allah is aware of evil-doers.)
২৪৭	তাদের নবী বলল, 'নিশ্চয়ই! আল্লাহ তালূতকে তোমাদের জন্য বাদশাহ সাব্যস্ত করেছেন।' তারা বলল, 'কিরূপে আমাদের ওপর তার রাজত্ব হতে পারে যখন রাজত্ব পাওয়ার ক্ষেত্রে তার চেয়ে আমাদেরই অধিকার বেশী এবং সম্পদের দিক থেকেও সে সচ্ছল নয়।' নবী বলল, 'নিশ্চয়ই! আল্লাহ তোমাদের ওপর তাকে পছন্দ করেছেন এবং স্বাস্থ্য ও জ্ঞানের দিক দিয়েও তাকে প্রাচুর্য দান করেছেন।' আল্লাহ যাকে ইচ্ছে তাকে তাঁর সার্বভৌমত্ব দান করেন। আল্লাহ সবকিছু পরিবেষ্টনকারী, সবজান্তা।' (Their Prophet said unto them: Lo! Allah hath raised up Saul to be a king for you. They said: How can he have kingdom over us when we are more deserving of the kingdom than he is, since he hath not been given wealth enough? He said: Lo! Allah hath chosen him above you, and hath increased him abundantly in wisdom and stature. Allah bestoweth His Sovereignty on whom He will. Allah is All-Embracing, All-Knowing.)
২৪৮	এবং তাদের নবী আরও বলল, 'তার নেতৃত্বের চিহ্ন হল এই যে, তোমাদের পালনকর্তার পক্ষ থেকে তোমাদের নিকট একটি সিন্দুক

	(বাইবেলে উল্লেখিত 'আর্ক') আসবে তোমাদের চিত্ত সন্তুষ্টির জন্য এবং তাতে মূসা ও হারুনের পরিবারের পরিত্যক্ত কিছু সামগ্রী থাকবে। ফেরেশতারা সিন্দুকটিকে বহন করে নিয়ে আসবে। নিশ্চয়ই! এতে তোমাদের জন্য নিদর্শন রয়েছে যদি তোমরা (সত্যিকার) বিশ্বাসী হও।' (And their Prophet said unto them: Lo! the token of his kingdom is that there shall come unto you the ark wherein is peace of reassurance from your Lord, and a remnant of that which the house of Moses and the house of Aaron left behind, the angels bearing it. Lo! herein shall be a token for you if (in truth) ye are believers.)
২৪৯	অতঃপর তালূত যখন সৈন্য-সামন্ত নিয়ে বের হল তখন বলল, 'নিশ্চয়ই! আল্লাহ তোমাদেরকে পরীক্ষা করবেন একটি নদীর মাধ্যমে। যে কেউ সেখান থেকে পান করবে সে আমার দলভূক্ত নয়। যে তার স্বাদ গ্রহণ করবে না সে আমার দলভূক্ত। তবে যে নিজ হস্তে সামান্য আস্বাদ করে নেবে সে ব্যাতিত। কিন্তু সামান্য কয়েকজন ব্যাতিত সবাই পানি পান করল। অতঃপর সে এবং তার বিশ্বাসী সঙ্গীগন যখন নদী অতিক্রম করল তারা বলল, 'আজকের দিনে জালূত (গোলিয়াথ, ফিলিস্তিনিদের বিখ্যাত পালোয়ান) এবং তার সৈন্য বাহিনীর (ফিলিস্তিন বাহিনীর) সঙ্গে যুদ্ধ করার শক্তি আমাদের নেই।' কিন্তু যারা জানত যে তাদেরকে একদিন আল্লাহর সামনে উপস্থিত হতে হবে তারা বলল, 'আল্লাহর হুকুমে কত ক্ষুদ্র দল কত বৃহৎ শক্তিকে পরাভূত করেছে।' যারা ধৈর্য্যশীল আল্লাহ তাদের সঙ্গে আছেন। (And when Saul set out with the army, he said: Lo! Allah will try you by (the ordeal of) a river. Whosoever therefore drinketh thereof he is not of me, and whosoever tasteth it not he is of me, save him who taketh (thereof) in the hollow of his hand. But they drank thereof, all save a few of them. And after he had crossed (the river), he and those who believed with

	him, they said: We have no power this day against Goliath and his hosts. But those who knew that they would meet Allah exclaimed: How many a little company hath overcome a mighty host by Allah's leave! Allah is with the steadfast.)
২৫০	এবং যখন তারা (যুদ্ধের) ময়দানে জালূত ও তার সৈন্যবাহিনীর সম্মুখীন হল তখন বলল, 'হে আমাদের পালনকর্তা! আমাদেরকে ধৈর্য্যশক্তি দাও এবং আমাদেরকে অবিচল রাখ এবং আমাদেরকে সাহায্য কর অবিশ্বাসীদের বিরুদ্ধে।' (And when they went into the field against Goliath and his hosts they said: Our Lord! Bestow on us endurance, make our foothold sure, and give us help against the disbelieving folk.)
২৫১	আল্লাহর অনুগ্রহে তারা জালূতের বাহিনীকে পরাজিত করে দিল এবং দাউদ (ডেভিড) জালূতকে (গোলিয়াথকে) হত্যা করল। আল্লাহ তাকে (দাউদকে) দান করলেন রাজত্ব ও জ্ঞান এবং তিনি যা চাইছিলেন তাকে তা শিক্ষা দিলেন। যদি আল্লাহ মানবজাতির একদলকে দিয়ে অপরদলকে প্রতিহত না করতেন তবে এ পৃথিবী অন্যায়ে ছেঁয়ে যেত। কিন্তু আল্লাহ তাঁর সৃষ্টির প্রতি একান্তই দয়াশীল। (So they routed them by Allah's leave and David slew Goliath; and Allah gave him the kingdom and wisdom, and taught him of that which He willeth. And if Allah had not repelled (resist) some men by others the earth would have been corrupted. But Allah is a Lord of Kindness to (His) creatures.)
২৫২	এগুলি আল্লাহর বাণী যা আমি তোমার নিকট যথাযথভাবে বর্ণনা করছি। নিশ্চয়ই! তুমি (মোহাম্মদ) আমার বার্তাবাহকগনের অন্তর্ভুক্ত। (These are the portents of Allah which We recite unto thee (Muhammad) with truth, and lo! thou art of the number of (Our) messengers;)
২৫৩	বার্তাবাহকগনের মধ্যে আমি একের ওপর অপরকে মর্যাদা দান করেছি

এবং তাদের মধ্যে কেউ এমন রয়েছে যার সঙ্গে আল্লাহ কথা বলেছেন, আবার কারও মর্যাদা তিনি করেছেন উচ্চতর এবং আমি মরিয়ম পুত্র ঈসাকে প্রকৃষ্ট নিদর্শনসমূহ দান করেছি এবং তাকে শক্তি দান করেছি পবিত্র আত্মার মাধ্যমে। আল্লাহ যদি তেমন ইচ্ছে করতেন, তবে স্পষ্ট প্রমাণ সমাগত হওয়ার পর তাদের (বার্তাবাহকগনের) পরবর্তীরা পরস্পর যুদ্ধ-বিগ্রহে লিপ্ত হত না। কিন্তু তারা (ইসরাইলের সন্তানেরা) একে অন্যের সঙ্গে মতবিরোধ করেছে। তাদের কেউ বিশ্বাস এনেছে, কেউ হয়েছে অবিশ্বাসী। যদি আল্লাহ তেমন ইচ্ছে করতেন তবে তারা পরস্পর যুদ্ধ-বিগ্রহে লিপ্ত হত না; কিন্তু আল্লাহ তাই করেন যা তিনি ইচ্ছে করেন। (Of those messengers, some of whom We have caused to excel others, and of whom there are some unto whom Allah spake, while some of them He exalted (above others) in degree; and We gave Jesus, son of Mary, clear proofs (of Allah's Sovereignty) and We supported him with the holy Spirit. And if Allah had so willed it, those who followed after them would not have fought one with another after the clear proofs had come unto them. But they differed, some of them believing and some disbelieving. And if Allah had so willed it, they would not have fought one with another; but Allah doeth what He will.)

■ **২.২৪৬.১** স্মরণ কর মূসার পরবর্তী সময়ে ইসরাইলের নেতৃস্থানীয়দের কথা, কিভাবে তারা তাদের নবীকে বলেছিল যে, আমাদের জন্য একজন বাদশাহ নির্ধারণ করে দিন, যেন আমরা আল্লাহর পথে যুদ্ধ করতে পারি : খ্রীষ্টপূর্ব প্রায় ১০০০ বছর পূর্বের কথা। ইসরাইল জাতি বহিঃশত্রু দ্বারা বারবার আক্রান্ত হচ্ছিল। সে সময় নেতৃত্ব দেবার মতো তাদের কোন নেতা ছিল না।

যাজক স্যামুয়েলও তখন বার্ধক্যে। ইসরাইলবাসী তাদের নবী স্যামুয়েলের কাছে আগমন করে। তারা তাঁকে একজন যোগ্য নেতা নির্ধারণ করে দিতে বলে যে তাদেরকে শত্রুর মোকাবেলায় নেতৃত্ব দেবে।

ইসরাইল জাতি সে সময় বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছিল। যোগ্য নেতৃত্বের অভাবে তারা একত্রিত হতে পারছিল না। নিজেদের সম্মিলিত শক্তিকেও তারা কাজে লাগাতে পারছিল না। এখানে সে উদাহরণটি উদ্ধৃত হয়েছে। নেতৃত্বের প্রয়োজনীয়তা ও গুরুত্বের বিষয়টি এখানে উঠে এসেছে।

■ **২.২৪৬.২** সে বলল, যদি যুদ্ধের নির্দেশ দেয়া হয় তবে কি তোমরা যুদ্ধ করা থেকে বিরত থাকবে? তারা বলল, কেন আমরা আল্লাহর পথে যুদ্ধ করব না যখন নিজেদের বাসভূমি ও পরিবার-পরিজন থেকে বিতাড়িত হয়েছি : ইসরাইলবাসী যখন নেতৃত্বের প্রয়োজনীয়তা বিষয়ে নবীকে এসে বলল নবী তখন তাদের কাছে জানতে চাইল যে, নেতা যদি তাদেরকে যুদ্ধের জন্য ডাক দেয় তবে কি তারা যুদ্ধ করবে? তারা নেতার ডাকে যুদ্ধ করবে বলে নবীকে জানায়।

সত্য হচ্ছে, নেতার ডাকে সাধারণ মানুষ যদি স্বতঃস্ফুর্ততার সাথে সাড়া না দেয় তবে নেতা নির্বাচন করে লাভ নেই। জনগনের সাড়া ছাড়া নেতারও করণীয় থাকে না।

জনগন স্বতঃস্ফুর্তভাবে তখনই একজন নেতাকে প্রত্যাশা করে যখন তারা দুর্দশার চরমে পৌঁছে যায়। সে সময় ইসরাইলবাসীর পরিস্থিতি তেমন হয়েছিল। এ উদাহরণ এখানে তুলে ধরার প্রয়োজন ছিল। আলোচনার পরবর্তী পর্যায়ে বিষয়টি স্পষ্ট হবে (দ্রষ্টব্য ২.২৪৯.২, ২.৫০)।

■ **২.২৪৬.৩** তথাপিও যখন যুদ্ধের নির্দেশ হল, স্বল্প সংখ্যক ব্যাতিত তাদের সবাই ঘুরে দাঁড়াল : ইসরাইলবাসী নবীকে কথা দিয়েছিল যে নেতা যদি তাদেরকে যুদ্ধের জন্য ডাক দেয় তবে তারা সাড়া দেবে। কিন্তু পরবর্তীতে দেখা গেল যে নেতা যখন তাদেরকে যুদ্ধের জন্য ডাক দিয়েছে, স্বল্প সংখ্যক ব্যাতিত কেউ সাড়া দেয়নি।

■ **২.২৪৬.৪** দুষ্টদের সম্পর্কে আল্লাহ ভালভাবেই অবগত : এটি একটি শাশ্বত ও সার্বজনীন বক্তব্য। আল্লাহ সব দেখেন, জানেন ও বোঝেন। তিনি মানুষ সৃষ্টি করেছেন। বিভিন্ন জাতি সৃষ্টি করেছেন। তাদের জাতিগত আচরণ তিনি জানেন। তিনি সকলের পূর্বাপর আচরণও জানেন। আচরণের প্রবণতা ব্যাক্তি থেকে শুরু করে সমাজ বা জাতিতেও পরিলক্ষীত হয়।

দেখা যায় যে প্রাথমিক অবস্থায় মানুষ অতি উৎসাহ নিয়ে কোন কাজে এমনকি ঝুঁকিপূর্ণ কাজেও এগিয়ে যেতে ইচ্ছে প্রকাশ করে। বড় বড় বক্তব্য দেয়। কিন্তু কাজের সময় এলে জীবন-সংসার-সম্পদ ইত্যাদির মায়ায় ঝুঁকিপূর্ণ বা পরিশ্রমসাধ্য কাজে আর এগিয়ে আসতে চায় না।

এখানে বিশেষভাবে ইসরাইল জাতিকে উদ্দেশ্য করে সে কথা বলা হয়েছে। মুসা (আঃ) এর সময়কালে মরুর বুকে অসহায়ভাবে থাকা অবস্থায় তাদেরকে কানান জয় করতে নির্দেশ দেয়া হয়েছিল। এ জাতি আল্লাহর সে নির্দেশ অমান্য করেছিল। যার ফলশ্রুতিতে তাদেরকে চল্লিশ বছর মরুর বুকে উদভ্রান্ত হয়ে ঘুরে বেরাতে হয়েছিল। অস্বীকারকারী প্রজন্মের মৃত্যু ও নতুন প্রজন্মের উত্থানের মধ্য দিয়ে পরে সে কাজ সম্পন্ন হয়েছিল।

আল্লাহ সকলকে জানেন বিধায় কৃতকর্মের ফলস্বরূপ মানুষের মাঝে বা জাতিতে জাতিতে এমন দুর্যোগ নেমে আসে। অতীতেও এ জাতি বারবার এমনসব আচরণ করেছিল যার কারণে তারা আল্লাহর রোষানলে পতিত হয় ও শাস্তিভোগ করে। যেসব বিষয় ইতিপূর্বে তুলে ধরা হয়েছে।

তারা মুসা (আঃ) এর অনুপস্থিতিতে অল্প ক'দিনেই আল্লাহকে ভূলে গো-বৎসের আরাধনা শুরু করেছিল। তারা সরাসরি আল্লাহকে দেখতে চেয়েছিল। আল্লাহকে না দেখে তারা বিশ্বাস করতে চায়নি। তাদের অতীত কার্যকলাপ সম্পর্কে জানা থাকার কারণেই এভাবে বলা হয়েছে যে, 'দুষ্টদের সম্পর্কে আল্লাহ ভালভাবেই অবগত।' তবে সত্য হচ্ছে, সত্যিকার অন্তর নিয়ে কেউ যদি আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করে তবে তিনি তাদেরকে সুযোগ দেন।

▪ **২.২৪৭.১** তাদের নবী বলল, নিশ্চয়ই! আল্লাহ তালূতকে তোমাদের জন্য বাদশাহ সাব্যস্ত করেছেন। তারা বলল, কিরূপে আমাদের ওপর তার রাজত্ব হতে পারে যখন রাজত্ব পাওয়ার ক্ষেত্রে তার চেয়ে আমাদেরই অধিকার বেশী এবং সম্পদের দিক থেকেও সে সচ্ছল নয় : ইসরাইলবাসির দাবীর প্রেক্ষিতে যাজক স্যামুয়েল বেঞ্জামিন বংশের তালূতকে, বাইবেল অনুসারে স'লকে তাদের জন্য বাদশাহরূপে বাছাই করেন।

বেঞ্জামিন বংশ হচ্ছে তাদের বারটি বংশের মধ্যে তুলনামূলকভাবে ছোট বংশ। ইসরাইবাসী তাকে মেনে নিতে পরছিল না। তাদের মতে, তার না আছে

অর্থ-সম্পদ না আছে ক্ষমতা যে সে এ রাজত্বের দাবীদার হতে পারে? বরং তারা তাদের নিজেদের মধ্য থেকে পছন্দের কাউকে প্রত্যাশা করছিল।

সাধারণত মানুষ অর্থ-সম্পদ বা কোন মহাক্ষমতাধর কাউকে নেতা হিসেবে পেতে চায়। আবার মানুষের প্রবণতা হচ্ছে নিজেদের পছন্দের কাউকে নেতৃত্বে পাওয়া। কিন্তু কার পছন্দকে প্রাধান্য দেয়া হবে? আবার ক্ষমতাবান কে? বিষয়গুলি ভাববার আছে।

একের পছন্দকে প্রাধান্য দিলে অপরে নাখোশ হয়। আবার জনগন সাথে না থাকলে কারই প্রকৃত কোন ক্ষমতা নেই। জনগন সাথে থাকলেই কেউ একজন ক্ষমতাবান হয়ে ওঠে। অতএব এটি জনগনের সিদ্ধান্ত যে তারা কারও সাথে থাকবে কি থাকবে না। জনগন সাথে থাকলে যে কোন নেতাই ক্ষমতাবান হয়ে ওঠে। অতএব কাউকে ক্ষমতাহীন মনে করার কোন কারণ নেই। যারা তেমনটি ভাবছে, বস্তুত এটি তাদের নিজেদের ওপরই নির্ভর করছে যে তারা তাদের নেতাকে ক্ষমতাধর করে তুলবে কি তুলবে না। অর্থাৎ নবীর সিদ্ধান্ত মেনে নিয়ে তালূতের সঙ্গে স্বতঃস্ফুর্ততা ও বিশ্বস্ততার সাথে থাকলে তাতেই তালূত ক্ষমতাধর হয়ে উঠবে।

■ **২.২৪৭.২** নবী বলল, নিশ্চয়ই! আল্লাহ তোমাদের ওপর তাকে পছন্দ করেছেন এবং স্বাস্থ্য ও জ্ঞানের দিক দিয়েও তাকে প্রাচুর্য দান করেছেন : স'লকে নেতা নির্বাচন করা হলে ইসরাইলবাসী সন্তুষ্ট হতে পারেনি। কিন্তু নবী বলেন, আল্লাহ তোমাদের ওপর তাকে পছন্দ করেছেন এবং স্বাস্থ্য ও জ্ঞানের দিক দিয়েও তাকে প্রাচুর্য দান করেছেন। অতএব সেই নেতা হওয়ার যোগ্য।

নবীর বক্তব্য থেকে এটি স্পষ্ট হয় যে সার্বভৌম ক্ষমতার প্রাপ্যতা অর্থ-সম্পদ কিংবা আপাত দৃষ্টিতে দেখা ক্ষমতার ওপর নির্ভর করে না। এর জন্য নেতৃত্বের গুণাবলী থাকতে হয়। সু-স্বাস্থ্যের অধিকারী হতে হয়। ঝুঁকিপূর্ণ কাজেও স্বতঃস্ফুর্ততা ও উদ্দীপনার সাথে এগিয়ে যাওয়ার সাহস থাকতে হয়। এগুলিও স্বাস্থ্যের সাথেই সম্পর্কিত বিষয়।

সু-স্বাস্থ্যের সাথে সুস্থ্য চিন্তা ও মানসিকতাও সম্পর্কিত বিষয়। সুস্থ্য চিন্তা ও মানসিকতা ব্যাতিত সঠিক সিদ্ধান্ত নেয়া যায় না।

নেতাকে জ্ঞানসম্পন্ন হতে হয়। তালূতের মধ্যে নেতৃত্বের গুণাবলী বিদ্যমান ছিল। সর্বপরি আল্লাহর আশীর্বাদ থাকতে হয়। নবী সকল দিক বিবেচনা করে তাকে সঠিক মনে করেছেন। তবে উদ্ধৃত গুণাবলীই সব নয়। উদাহরণ হিসেবে এখানে গুরুত্বপূর্ণ কিছু বিষয় তুলে ধরা হয়েছে।

▪ **২.২৪৭.৩** আল্লাহ যাকে ইচ্ছে তাকে তাঁর সার্বভৌমত্ব দান করেন (Allah bestoweth His Sovereignty on whom He will) : এ পরিবেশ-প্রকৃতি কে নিয়ন্ত্রন করে? এগুলি কি মানুষের হাতে? মানুষ যে কাজগুলিকে সে নিজে করছে বলে মনে করে, বস্তুত সে কি সেসব নিজে করছে? সাধারণ চিন্তায় তেমন মনে হয় বা হওয়া স্বাভাবিক। কিন্তু মানুষ যা করে, সে তা করে প্রকৃতি ও জটিল সংযোগপূর্ণ পরিবেশের ক্রিয়ার প্রতিক্রিয়ায়। বিষয়টিকে গীতায় এভাবে বলা হয়েছে,

“বস্তুগত প্রকৃতির অবস্থার প্রেক্ষিতে সৃষ্ট স্পন্দনের কারণে সকল মানুষ অসহায়ভাবে ক্রিয়া করতে বাধ্য হয়।’ (গীতা ৩:৫)

কোরআনে বলা হয়েছে, “নিশ্চয়ই! আমি মানুষকে এক পরিবেশের মধ্যে সৃষ্টি করেছি, সে কি মনে করে যে তার ওপর কারও কোন ক্ষমতা বা নিয়ন্ত্রন নেই?” (আল-কোরআন ৯০:৪-৫)

এ পরিবেশ ও প্রকৃতি মানুষের নিয়ন্ত্রনে নয়। সকল কিছু যার নিয়ন্ত্রনে তিনিই বিধাতা। আমরা আল্লাহ নামে ডাকি। বিভিন্নজন বিভিন্ন নামে ডাকে। এ সূত্রে তিনিই নির্ধারণ করেন কার কাছে তাঁর সার্বভৌম ক্ষমতা যাবে।

তিনি যখন যাকে চান তাকে উজ্জীবিত করে তোলেন। তাকে নেতৃত্ব বা নবুয়ত দান করেন। মানবীয় হিসেবে কখনও বহুপূর্বে এ প্রক্রিয়ার সূত্রপাত ঘটে (দ্রষ্টব্য ২.২৫৩.৩)। বাস্তবায়ন হয় হয়তবা অনেক পরে।

কিছু মানুষ ধারণা করে যে, অর্থ-সম্পদশালী ব্যাক্তি বা ক্ষমতাশালী ব্যাক্তি নেতৃত্ব কিংবা সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী হওয়ার যোগ্য। কিন্তু সে ভূল ধারণা বাইবেল ও কোরআন নাকচ করে দিয়ে বলছে যে, ‘আল্লাহ যাকে ইচ্ছে তাকে তাঁর সার্বভৌমত্ব দান করেন।’

এটিও বুঝতে হবে যে আল্লাহর ইচ্ছে একটি সুবিবেচনাপ্রসূত বিষয়। কিন্তু মানব জ্ঞানের চৌহদ্দির মধ্যে আল্লাহর ইচ্ছেকে বিশ্লেষণ করা কঠিন। যদি না

তিনি তা মানুষের জন্য অনুমোদন করেন। তাই বলা হয়, 'আল্লাহ যাকে ইচ্ছে তাকে তাঁর সার্বভৌমত্ব দান করেন।' কেননা এর সাথে সম্পর্কিত সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম জটিল বিষয়গুলির ব্যাখ্যা-বিশ্লেষন মানুষের সরল অংক সব বুঝে উঠতে পারে না।

তালূতের ওপর নেতৃত্বের যে দায়িত্ব বর্তেছে সেটিকে আল্লাহর ইচ্ছে হিসেবে গ্রহণ করে নিয়ে জনগণকে এগিয়ে যেতে হবে। পরিশেষে এমন ভাবনাটিই কল্যাণকর ও বিশৃংখলা পরিহার করে কাজ এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য সহায়ক।

- **২.২৪৭.৪** আল্লাহ সবকিছু পরিবেষ্টনকারী, সবজান্তা (Allah is All-Embracing, All-Knowing) : সমগ্র জগত, বিশাল এ প্রকৃতিকে আল্লাহ পরিবেষ্টন করে আছেন। কিংবা সবই তাঁর অন্তরস্থ বিষয় [আল্লাহ দ্রষ্টব্য ২.২০.২]। তাই তিনি সবজান্তা। যেমন গীতায় বলা হয়েছে,

"ভগবান! যিনি সকলের উর্ধ্বে ... যদিও তিনি তাঁর ধামে বর্তমান, তথাপি তিনি সকল কিছুকে পরিবেষ্টনকারী এবং সবকিছু তাঁর মধ্যেই স্থিত।" (গীতা ৮:২২)

বিষয়গুলি বিজ্ঞান দ্বারা আজও প্রমাণিত নয়। অতএব এসবে কেবল বিশ্বাসই রাখতে হবে। যদিও এসব ধারণা বিজ্ঞানের সম্মুখবর্তী কাজের ক্ষেত্রেও পথ প্রদর্শন করে।

আল্লাহ যেহেতু সবকিছুকে পরিবেষ্টনকারী তাই তিনি সব বিষয়ে অবহিত। যেমন বলা হয়েছে,

"..ভগবানরূপে আমি অতীত, বর্তমান, ভবিষ্যত সবকিছু জানি। আমি সকল জীবসত্বাকে জানি, কিন্তু কেউ আমাকে জানে না।" (গীতা ৭:২৬)

যেহেতু তিনি সব জানেন তাই তিনি সমগ্রের ওপর বিবেচনা করে সিদ্ধান্ত নেন। মানুষ তাঁর সিদ্ধান্ত গ্রহণের পেছনের কারণ জানতে বা বুঝতে পারে না। তিনি গৃহিত সিদ্ধান্তের ভাল-মন্দ বিষয়ে অগ্রীম জানেন। তাই আল্লাহকে বিশ্বাস করে তাঁর ওপর ভরসা রাখাই উত্তম ও প্রশান্তিদায়ক।

আল্লাহ যাকে খুশি তাকে তাঁর সার্বভৌমত্ব দান করেন। কোন এক জটিল প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে তিনিই সেটি নির্ধারণ করেন। মানুষের ক্ষমতার আয়ত্বের

বাইরে সম্পূর্ণ সে প্রক্রিয়া। প্রকৃতি, পরিবেশ-পরিস্থিতি সবকিছু আল্লাহ তাঁর পরিকল্পনা মতো নির্ধারণ করে দিলে মানুষ শেষ মূহুর্তে বাধ্য হয় বেধে দেয়া অবস্থা বা সীমানার মধ্যে সিদ্ধান্ত নিতে (দ্রষ্টব্য গীতা ৩:৫)। এর সাথে সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম, ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র বহুবিধ বিষয় জড়িত থাকে। কোনটি কোন সময়ে কাকে উপযুক্ত বিবেচনা করবে কেউ বলতে পারে না।

আল্লাহ সবকিছুকে পরিবেষ্টন করে আছেন। তিনিই ভাল জানেন কারও উপযুক্ততা ও প্রয়োজনীয়তা বিষয়ে এবং সেটিই সময়ে কাউকে প্রয়োজনীয় করে তোলে। তাই বিধাতার ওপর ভরসা করাই উত্তম। কিন্তু মানুষ মনে করে মানুষই সব পরিচালনা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ করছে। কিন্তু সে যে একটি বেধে দেয়া সীমানার মধ্যে সবকিছু করতে বাধ্য সেটি ভূলে যায়।

▪ **২.২৪৮** এবং তাদের নবী আরও বলল তার নেতৃত্বের চিহ্ন হল এই যে, তোমাদের পালনকর্তার পক্ষ থেকে তোমাদের নিকট একটি সিন্দুক আসবে তোমাদের চিত্ত সন্তুষ্টির জন্য এবং তাতে মূসা ও হারুনের পরিবারের পরিত্যক্ত কিছু সামগ্রী থাকবে। ফেরেশতারা সিন্দুকটিকে বহন করে নিয়ে আসবে। নিশ্চয়ই! এতে তোমাদের জন্য নিদর্শন রয়েছে যদি তোমরা বিশ্বাসী হও : তালূতের নেতৃত্বের চিহ্ন হিসেবে বাইবেলে উল্লেখিত ‘আর্ক’ বা যে সিন্দুকটির কথা এখানে বলা হয়েছে ইসরাইলবাসী সেটিকে অত্যান্ত পবিত্র মনে করে। গডের সাথে তাদের কৃত অঙ্গীকারনামার একটি প্রতীকস্বরুপ এটিকে গণ্য করা হয়। তারা বিশ্বাস করে যে, এটির বদৌলতে গড তাদের কাছে আগমন করবেন এবং তাদেরকে সব ধরণের বিপদ থেকে উদ্ধার করবেন।

আর্কটিতে মোসেস ও হারুন পরিবারের পরিত্যাক্ত কিছু সামগ্রী ছিল। যেগুলিকে পবিত্র মনে করা হয়। সিনাই পর্বতে অবস্থানকালীন সময়ে মহান আল্লাহ দিক-নির্দেশনা সম্বলিত যে পাথরের ফলক মোসেসকে দিয়েছিলেন তার কিছু ভগ্নাবশেষ ছিল। আরও ছিল তোরাহর মূল কপি যা মুসা (আঃ) এর সরাসরি তত্বাবধানে লিখিত হয়েছিল যেটি ইসরাইলের লেভী বংশকে প্রদান করা হয়েছিল। ইসরাইলের লেভী বংশ ধর্মীয় বিষয়াদি দেখভালের দায়িত্বপ্রাপ্ত ছিল। এ বংশ মূসা (আঃ) এর নিজের বংশ।

'মান্না'র একটি বোতলও সংরক্ষিত ছিল এতে। যেন ইসরাইলের পরবর্তী প্রজন্ম জানতে পারে যে তাদের পূর্ব-পুরুষেরা মরুর বুকে কিভাবে আল্লাহর অনুগ্রহ লাভ করেছিল এবং যেন তারা কৃতজ্ঞচিত্ত হয়। খুব সম্ভবত মূসা (আঃ) এর বিখ্যাত লাঠিটিও ছিল এতে। যা আল্লাহ তাঁকে অলৌকিক নিদর্শস্বরূপ দিয়েছিলেন।

ফিলিস্তিনিদের সাথে কোন এক যুদ্ধে তারা এই আর্কটিকে হারিয়েছিল। সে যুদ্ধে তারা সব ছেড়ে পিছু হটতে বাধ্য হয়েছিল। আর্কটিকে হারিয়ে তারা হতাশ হয়েছিল। তাদের ধারণা আর্কটিকে হারিয়ে তাদের সকল গৌরব তারা হারিয়েছে। ফিলিস্তিন ভূমিতে আর্কটি সাত মাস ছিল।

আর্কটি ফিলিস্তিনিদের মধ্যেও আতঙ্ক ছড়িয়েছিল। তারা এটিকে তাদের ভূমিতে রাখতে চায়নি। তারা এটিকে ফেরত পাঠাবার সিদ্ধান্ত নেয় এবং কোন চালকের সহায়তা ছাড়াই এটিকে ফেরত পাঠিয়ে দেয়। মনে করা হয় ফেরেশতারা আল্লাহর দিক-নির্দেশনায় এটিকে ইসরাইলিদের মাঝে নিয়ে আসে।

তালূতের রাজত্ব প্রাপ্তির সাথে আর্কটিকে তারা পুনরায় ফিরে পাবে এ প্রতিশ্রুতি বা বার্তা ইসরাইলবাসীর চিত্তকে প্রশান্ত করে। এটি তাদের কাছে অত্যান্ত প্রিয় ও পবিত্র হিসেবে বিবেচিত ছিল।

▪ **২.২৪৯.১** অতঃপর তালূত যখন সৈন্য-সামন্ত নিয়ে বের হল তখন বলল, নিশ্চয়ই! আল্লাহ তোমাদেরকে পরীক্ষা করবেন একটি নদীর মাধ্যমে। যে কেউ সেখান থেকে পান করবে সে আমার দলভূক্ত নয়। যে তার স্বাদ গ্রহণ করবে না সে আমার দলভূক্ত। তবে যে নিজ হস্তে সামান্য আস্বাদ করে নেবে সে ব্যাতিত। কিন্তু সামান্য কয়েকজন ব্যাতিত সবাই পানি পান করল। অতঃপর সে এবং তার বিশ্বাসী সঙ্গীগন যখন নদী অতিক্রম করল তারা বলল, আজকের দিনে জালূত এবং তার সৈন্য বাহিনীর সঙ্গে যুদ্ধ করার শক্তি আমাদের নেই : তালূত সৈন্যবাহিনী নিয়ে যুদ্ধের জন্য রওনা হয়। পথিমধ্যে তাদেরকে একটি নদী অতিক্রম করতে হয়েছিল। সম্ভবত জর্ডান নদী বা তার কোন শাখা বা প্রশাখা।

সৈন্যবাহিনীর মধ্যে খুব বেশী শৃংখলা ছিল না। তাই নদীটি অতিক্রমকালে সৈন্যদের মনবল পরীক্ষা করা হয়। পরীক্ষার মাধ্যমে নিষ্টাপরায়ন, একাগ্র,

ধৈর্য্যশীল, দৃঢ় প্রতিজ্ঞ, নিবেদিত প্রাণ, সাহসী ও সত্যিকার যোগ্যতাসম্পন্ন যোদ্ধাদের চিহ্নিত করে নেয়া হয়।

নদী অতিক্রমকালে অধিকাংশ সৈন্যই পানি পান করে। অথচ তাদেরকে সেটি করতে বারণ করা হয়েছিল। তৃষ্ণার্ত অবস্থায় তারা তাদের কৃত প্রতিজ্ঞা বা অঙ্গীকার রক্ষা করতে পারেনি।

পরীক্ষা শেষে স্বল্প সংখ্যক যোদ্ধাকে চিহ্নিত করে নেয়া হয় যারা ছিল ধৈর্য্যশীল, দৃঢ়চিত্ত ও দৃঢ় প্রতিজ্ঞ। অধিকাংশই এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে পারেনি। যুদ্ধের জন্য তারা সত্যিকার অর্থে মানসিকভাবে প্রস্তুত নয়। তাদের অনেকেই ভাবল যে, এমন বাহিনী নিয়ে আজ আর জালূত এবং তার সৈন্যবাহিনীর সঙ্গে যুদ্ধে জয়লাভ করা সম্ভব নয়। এখানে সে কথাটি উঠে এসেছে।

এ যুদ্ধে স'ল বা তালূত বাইবেল অনুসারে গোলিয়াথ বা জালূত এর বাহিনীর মোকাবেলা করে। জালূত হচ্ছে ফিলিস্তিনিদের বিখ্যাত পালোয়ান।

▪ **২.২৪৯.২** কিন্তু যারা জানত যে তাদেরকে একদিন আল্লাহর সামনে উপস্থিত হতে হবে তারা বলল, আল্লাহর হুকুমে কত ক্ষুদ্র দল কত বৃহৎ শক্তিকে পরাভূত করেছে : সত্যি বলতে যারা উদ্যেমী ও সাহসী, লক্ষ্যের পানে ছুটে যেতে যারা দৃঢ় চিত্ত ও দৃঢ় প্রতিজ্ঞ তারা ভিন্নরকম এক মানসিক উচ্চতায় গড়ে ওঠে। আর এমন মানসিকতা গড়ে ওঠে আল্লাহতে সত্যিকারের বিশ্বাসের কারণে। বিশ্বাসীরা জানে যে, আল্লাহর সম্মুখে কোন একদিন কৃতকর্ম নিয়ে দাড়াতে হবে। ভাল কাজ করলে ভাল ফল প্রাপ্ত হবে এবং মন্দ কাজ করলে বা দায়িত্বে অবহেলা করলে মন্দ ফল ভোগ করতে হবে। তাদের মধ্যে আল্লাহর দিক থেকে যেমন প্রাপ্তির প্রত্যাশা থাকে তেমনি থাকে ভীতি।

এ জগতে আল্লাহ মানুষকে অনর্থক প্রেরণ করেননি। মানুষের অবশ্যই কিছু গুরুত্বপূর্ণ কাজ ও দায়-দায়িত্ব আছে। গুরুত্বপূর্ণ কাজ হচ্ছে আল্লাহর সৃষ্টিকে নষ্ট বা ধ্বংস হওয়ার হাত থেকে রক্ষা করা। তার সৃষ্টির পরিচালনায় ক্ষতিকর কোন কিছুর প্রবেশ ঘটতে না দেয়া। আর সেটি করতে হলে অন্যায়-অন্যায্যতার প্রবেশকে রোধ করতে হবে। তার জন্য জেহাদী চেতনা ও মনোভাব থাকতে হবে। বিশ্বাসীরা চেতনায় সেটি ধারণ করে। কিছু মানুষ

জগতে তেমন চেতনায় গড়ে না উঠলে পৃথিবীতে নৈরাজ্যকর পরিস্থিতি সৃষ্টি হত।

তেমন চেতনায় গড়ে ওঠা মানুষদের মানসিকতা থাকে উচ্চ পর্যায়ের। তারা নিজ জ্ঞানে উদ্বুদ্ধ হয়ে সত্য ও ন্যায়কে প্রতিষ্ঠা করার জন্য লড়াই করে। তাদের চিন্তা-চেতনা ও মানসিকতাকে কেউ কোনকিছু দিয়ে পরাভূত করতে পারে না।

এমন মানসিকতার কারণে তারা ক্ষুদ্র হওয়া সত্বেও বৃহৎ দলের মুখোমুখী হতেও কুন্ঠাবোধ করে না। ভীত হয় না। তারা জানে যে প্রতিপক্ষ সংখ্যায় বেশী হলেও চিন্তা-চেতনা ও মনের দিক থেকে দুর্বল। বিশ্বাসীর শক্তিটি সেখানেই। আবার তাদের এ বিশ্বাসই তাদেরকে আরও সাহসী করে তোলে। এমন সাহসের কারণ বুঝতে না পেরে প্রতিপক্ষ আরও দুর্বলচিত্ত হয়। এতে সঠিক পথ অবলম্বনকারীদের সাহসের সাথে আরও সাহস যুক্ত হয়। সাহস, প্রতিজ্ঞা, দৃঢ়চিত্ততা যুদ্ধ জয়ের জন্য এগুলিই প্রধান ভূমিকা পালন করে। পেছনে প্রভাবক হয়ে কাজ করে আল্লাহতে দৃঢ় বিশ্বাস।

আয়াতে তেমন মানসিকতার সৈন্যদের উদাহরণ তুলে ধরা হয়েছে যারা আল্লাহতে দৃঢ় বিশ্বাসী। তারা তাদের দায়িত্ব কর্তব্য বিষয়ে পূর্ণ সচেতন। তারা জানে যে তাদের ভাল-মন্দ কর্মের জন্য তাদেরকে একদিন আল্লাহর সম্মুখে জবাবদিহি করতে হবে। এখানে সে প্রসঙ্গে বলা হয়েছে যে, যারা জানত যে তাদেরকে একদিন আল্লাহর সামনে উপস্থিত হতে হবে তারা বলল, 'আল্লাহর হুকুমে কত ক্ষুদ্র দল কত বৃহৎ শক্তিকে পরাভূত করেছে।' এরাই তারা যারা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছিল।

এখানে এ উদাহরণ তুলে ধরার গুরুত্ব রয়েছে। এ উদাহরণ তৎকালীন অবস্থার প্রেক্ষিতে মুসলমানদের অন্তরে এ বিশ্বাসের জন্ম দেয় যে সংখ্যায় অল্প হলেও যুদ্ধ জয় সম্ভব। মনবলসম্পন্ন দল ক্ষুদ্র হলেও তারা বৃহৎ দলকেও পরাজিত করার সক্ষমতা রাখে। এমন বার্তা বিশ্বাসীদের মনবলকে আরও বৃদ্ধি করে দেয়।

ইসলামের জাগরণের প্রাথমিক কালে যুদ্ধ পরিস্থিতি দেখা দিলে শত্রুর মোকাবেলায় বিশ্বাসীদের মনবলকে উচ্চে উন্নীত করার জন্য এসব উদাহরণ

তুলে ধরার প্রয়োজন ছিল। পরবর্তীতে বিশ্বাসী ও অবিশ্বাসীদের মধ্যে সংঘটিত বদর যুদ্ধেও এমন সফলতার উদাহরণ দেখা গেছে (দ্রষ্টব্য ২.২৪৬.২)।

▪ **২.২৪৯.৩** যারা ধৈর্য্যশীল আল্লাহ তাদের সঙ্গে আছেন (Allah is with the steadfast) : আল্লাহ মাহজ্ঞানী। বিজ্ঞানময়। তিনি জানেন কোন কাজের যথাযথ সময়টি। তার কাছে সব সুনির্দিষ্ট পরিমাপে পরিমাপিত। যথাসময়ের পূর্বে বা পরের গৃহিত পদক্ষেপ সফল হয় না। লোহাকে কোন পর্যায়ে কতটুকু গরম করার পর পেটাতে হয় বিষয়টি তেমন। ততটুক উত্তাপ দিতে হবে। ততটুকু সময় অপেক্ষা করতে হবে। তবেই কাঙ্খিত ফল আসবে। উপযুক্ত সময়ের অপেক্ষায় অস্থির চিত্তকে শান্ত রাখতে হয়। সে জন্যই ধৈর্য্য প্রয়োজন [আল্লাহ দ্রষ্টব্য ২.২০.২]।

ভূল বোঝাবার অবকাশ নেই। ধৈর্য্য অর্থ এই নয় যে চুপ করে বসে থাকা। এ সময়ে প্রয়োজনীয় অপরাপর কাজগুলি চালিয়ে নিতে হয়। আবার চুপ করে বসে থাকাও যদি প্রয়োজনীয় হয় তবে সেটিই করতে হবে। তখন সেটিও যথাযথ কাজের অন্তর্ভূক্ত বিষয় হয়ে যায়। বসে থাকা তখন বসে থাকা নয়। কাজ।

যারা যথাসময়ে যথাযথ কাজটি করে বলা হচ্ছে, আল্লাহ তাদের সঙ্গে থাকেন। তারাই সফলতার মুখ দেখতে পায়। আবার এভাবেও বলা যায় যে, তারাই সফলতার মুখ দেখে যাদের সাথে আল্লাহ রয়েছেন। বস্তুত আল্লাহ থাকেন জ্ঞানসম্পন্নদের সাথে। ধৈর্য্যের বিষয়টি কাজ করে অংকের মতো। জ্ঞান ও বুঝসম্পন্নরাই এর মর্মার্থ বোঝে। যথাযথ সময়টি বোঝে। এটি কেবল একটিমাত্র ব্যাখ্যা। আরও ব্যাখ্যা হতে পারে। তবে এখানে সব আলোচনার প্রয়োজন নেই।

ধৈর্য্যের সঙ্গে সহনশীলতা, চারিত্রিক দৃঢ়তা, অবিচলতা ইত্যাদি বহু বিষয় সম্পৃক্ত আছে বা থাকে। তবে সব বিষয় ঘুরে-ফিরে সময়ের সাথে সম্পর্কিত। উপযুক্ত বা যথাযথ সময় পর্যন্ত অপেক্ষা করাই হচ্ছে ধৈর্য্য। আল্লাহ তেমন গুণসম্পন্ন মানুষদের সাথে থাকেন। অর্থাৎ তিনি উদাসীন বা অবিবেচকদের সাথে থাকেন না। যে বা যারা সার্বিক বিষয়গুলিকে এভাবে হিসেব কষে বিবেচনা করে না এখানে সে অর্থে অবিবেচক বা উদাসীন এ শব্দ দু'টি

ব্যাবহার করা হয়েছে। তারা কেবলি আবেগী। অংক কষে হিসেব করে না। সত্যের আলোকে বিষয়গুলিকে নিয়ে চিন্তা করে না। তাই উপযুক্ত সময়ও চিহ্নিত করতে পারে না। আবার চিহ্নিত করতে পারলেও কাজে লাগাতে পারে না।

যুদ্ধে জয়লাভের জন্য ভীষন হিসেব-নিকেশ দরকার। বলা যায় যে, বাস্তব জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ ও সর্বশেষ পর্যায়ের খেলা হচ্ছে যুদ্ধ। জীবন-মরণের খেলা। সফল হতে হলে এক্ষেত্রে তাই যথাযথ সময় বুঝে যথাযথ কাজটি করা দরকার। তাই বলা হয়েছে, যারা ধৈর্য্যশীল আল্লাহ তাদের সঙ্গে আছেন। তারাই সফলতার মুখ দেখতে পায়। বিশ্বাসীদের এখানে যথোপযুক্ত গুণ সম্পন্ন হওয়ার জন্য উদ্বুদ্ধ করা হয়েছে। অস্থির চিত্ত হয়ে কাজের ক্ষতি সাধনে প্রবৃত্ত হতেও এর মাধ্যমে নিরুৎসাহিত করা হয়েছে। নেতৃত্বের সিদ্ধান্তের প্রতি আস্থা রাখতেও উদ্বুদ্ধ করা হয়েছে। অধৈর্য্য হতে বারণ করা হয়েছে।

■ **২.২৫০** এবং যখন তারা ময়দানে জালূত ও তার সৈন্যবাহিনীর সম্মুখীন হল তখন বলল, হে আমাদের পালনকর্তা! আমাদেরকে ধৈর্য্যশক্তি দাও এবং আমাদেরকে অবিচল রাখ এবং আমাদেরকে সাহায্য কর অবিশ্বাসীদের বিরুদ্ধে : যুদ্ধের ময়দানে আল্লাহকেই অধিক স্মরণ করতে হয়। এটি যেমন সফলতার জন্য প্রয়োজন তেমনি বিফল হলেও প্রশান্তি। মৃত্যু তো একদিন সকলেরই হবে। কিন্তু আল্লাহর ভাবনার মধ্য দিয়ে যারা তাঁর সাথে আত্মিক সম্পর্ক গড়ে তুলতে পেরেছে তাদের জন্য এটি এক দারুণ প্রেরণা এবং অসম সাহসেরও উৎস। বস্তুত আল্লাহই সাহস ও শক্তিদাতা।

এমন জ্ঞানে যারা যুদ্ধের ময়দানেও আল্লাহকে স্মরণ করে তারা সব পরিত্যাগ করতে পারে। তারা জানে যে, যিনি সৃষ্টি করেছেন তাঁর দেয়া জীবনটাই এক দয়ার ফল। তাঁর কাছেই সব প্রাপ্তির জন্য কৃতজ্ঞ হতে হয়। তাঁরই কারণে জীবনকেও বিসর্জন দিতে হয়।

তিনি মানুষকে অযথা সৃষ্টি করেননি। স্থান-কাল-পাত্রের বিবেচনায় এ জগতে মানুষের কিছু দায়-দায়িত্বও আছে। সত্য ও ন্যায় যেখানে বিপর্যস্ত হবে তাকে সমুন্নত করা ও রাখা মানুষের কর্তব্যের মধ্যে পড়ে। তেমন বোধসম্পন্ন মানুষ তার উৎসর্গকে জগতের অন্যতম মূল কাজ হিসেবে দেখে বা বিবেচনা

করে। সে যখন আল্লাহকে স্মরণ করে তখন সে শত্রুকে নিয়ে যতটা না ভাবে তার চেয়েও অধিক ভাবে আল্লাহর প্রতি তার যথাযথভাবে কর্তব্য পালন করাকে নিয়ে। এ মানসিকতা তাকে যুদ্ধের ময়দানে অবিচল থাকতে সহায়তা করে। পাশাপাশি সে এটিও জানে, বোঝে বা বিশ্বাস করে যে শত্রুর ভেতরে সে চেতনা নেই।

তালূতের রাজত্বকালে ইসরাইলকে অনেক শত্রুর মোকাবেলা করতে হয়েছে। মোয়াবাইটস, অ্যামোনাইটস, ইডিয়োমাইটস, অ্যামেলেকাইটস এবং বিশেষত ফিলিস্তিনীদের। ইসরাইল ও ফিলিস্তিনিদের মধ্যকার যে যুদ্ধের উদাহরণ এখানে তুলে ধরা হয়েছে, সেখানে বিশ্বাসীরা অবিশ্বাসীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে কৃতকার্য হওয়ার জন্য আল্লাহর সাহায্য কামনা করছে।

পূর্বে যারা অসম সাহস নিয়ে যুদ্ধ করেছে বা দায়িত্ব পালন করেছে, আল্লাহর প্রতি তাদের অবিচল আস্থা ও তাদের উদাহরণগুলি পরবর্তীদের জন্য প্রেরণা। আবার যারা কর্তব্যকর্ম অবহেলা করেছে তাদের পরিণতিও উদাহরণ ও শিক্ষা।

সফলতার জন্য যুদ্ধের ময়দানে আল্লাহকেই অধিক স্মরণ করতে হয়। আল্লাহই শক্তিদাতা, সাহসদাতা ও বিজয়দাতা। তথাপি জয়-পরাজয় নির্বিশেষে সেখানেই প্রশান্তি। যুদ্ধের ময়দানে চিত্তের দৃঢ়তা ও সাহস কোন জ্ঞানে ধরে রাখতে হবে বিশ্বাসীদের কাছে তাই উদাহরণগুলি তুলে ধরা হয়েছে (দ্রষ্টব্য ২.২৪৬.২)। আল্লাহ এভাবেই তাঁর দিক-নির্দেশনা বিস্তারিতভাবে তুলে ধরেন।

একটি বিষয় বিশেষভাবে লক্ষ্যনীয় যে, কোরআনে ইসরাইল ও ফিলিস্তিনীদের যুদ্ধের যে উদাহরণ এখানে তুলে ধরা হযেছে সেখানে দেখা যাচ্ছে যে, বিশ্বাসী 'ইসরাইল' জাতি অবিশ্বাসী ফিলিস্তিনিদের বিপক্ষে কৃতকার্যতার জন্য আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করেছে। অথচ বর্তমান সময়ে চিত্রটি ঠিক তার উল্টো দেখা যাচ্ছে। পৃথিবীর সব মুসলমান অবিশ্বাসী ইসরাইলের বিপক্ষে বিশ্বাসী ফিলিস্তিনীদের পক্ষে। এ পরিবর্তন কখন, কিভাবে হল সেটি নিয়েও একটি অনুসন্ধান প্রয়োজন আছে বলে মনে হয়।

▪ **২.২৫১.১** আল্লাহর অনুগ্রহে তারা জালূতের বাহিনীকে পরাজিত করে দিল এবং দাউদ জালূতকে হত্যা করল। আল্লাহ তাকে দান করলেন রাজত্ব ও জ্ঞান

এবং তিনি যা চাইছিলেন তাকে তা শিক্ষা দিলেন : ইসরাইল ও ফিলিস্তিন যুদ্ধের জন্য মুখোমুখী অবস্থান নেয়। ফিলিস্তিনীদের পক্ষে বিশালদেহী পালোয়ান 'জালূত' দন্ডায়মান। বাইবেলে জালূতকে 'গোলিয়াথ' বলা হয়েছে। জালূত যুদ্ধের জন্য ইসরাইলবাসীকে আহবান করছে। তার আহবান শুনে ইসরাইলিরা ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে পড়ে!

ইসরাইলের হর্তাকর্তা তালূত ঘোষনা করে যে জালূতকে যে হত্যা করতে পারবে তাকে প্রচুর ধন-সম্পদ ও তার মেয়ের সঙ্গে বিবাহ দেয়া হবে। 'দাউদ' নামের অজ্ঞাত এক যুবক তালূতের নিকটবর্তী হয়। বাইবেলে তাকে 'ডেভিড' নামে অভিহিত করা হয়েছে। সে জালূতের সঙ্গে যুদ্ধ করার জন্য তালূতের অনুমতি প্রার্থনা করে।

ডেভিডের অল্প বয়স এবং অপরদিকে জালূত অভিজ্ঞ যোদ্ধা ও বিশালদেহী পালোয়ান। সর্বদিক বিবেচনা করে তালূত তাকে অনুমতি দেয়া থেকে বিরত থাকে। কিন্তু দাউদও নাছোড়বান্দা। সে জালূতের সঙ্গে যুদ্ধ করার জন্য বার বার তার আগ্রহের কথা তালূতের কাছে প্রকাশ করতে থাকে।

অতঃপর এক পর্যায়ে তালূত নিজ হাতেই দাউদকে যুদ্ধের পোষাকে সজ্জিত করে দেন। যুদ্ধে দাউদ জালূতের মতো অভিজ্ঞ ও ফিলিস্তিনীদের শ্রেষ্ঠ পালোয়ানকে হত্যা করে। ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে ফিলিস্তিনীরা পালাতে শুরু করে। তাদের পালাতে দেখে ইসরাইলিরা অধিকতর সাহসী হয়ে ওঠে। তারা তাদেরকে তাড়িয়ে নিয়ে যায়। এ ঘটনার পর ইসরাইলবাসীদের কাছে দাউদ অত্যাধিক প্রিয় ব্যাক্তিত্ব হয়ে ওঠে।

প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী তালূত তার নিজের মেয়েকে দাউদের সাথে বিবাহ দেন। তালূতের পরে দাউদ (আঃ) রাজত্ব লাভ করেন। তখন তার বয়স মাত্র তিরিশ বছর। আল্লাহ তাকে অশেষ জ্ঞান দান করেন। দাউদ (আঃ) ইসরাইল শাসন করেন চল্লিশ বছর। আল্লাহ তাই করেন যা তিনি চান।

■ **২.২৫১.২** যদি আল্লাহ মানবজাতির একদলকে দিয়ে অপরদলকে প্রতিহত না করতেন তবে এ পৃথিবী অন্যায়ে ছেঁয়ে যেত : অনেকের কাছে যুদ্ধ অপছন্দনীয়। যুদ্ধে ঝুঁকি আছে। প্রাণ ক্ষয়ের সম্ভাবনা আছে। সম্পদ বিনষ্ট হওয়ার ভয় আছে। কিন্তু বলা হচ্ছে,

"কিভাবে তোমরা আল্লাহর পথে (সত্য, ন্যায় ও কল্যাণের পথে) যুদ্ধ না করে থাকতে পারবে, যখন দুর্বল পুরুষ-নারী ও শিশুরা ক্রন্দন করছে এই বলে, হে আমাদের পালনকর্তা! আমাদেরকে এই জনপদ থেকে নিষ্কৃতি দান কর যেখানের অধিবাসীরা অত্যাচারী। ওহ! তোমার পক্ষ থেকে আমাদের জন্য কোন সাহায্যকারী প্রেরণ কর। তোমার পক্ষ থেকে আমাদের জন্য কোন রক্ষাকারীকে প্রেরণ কর!" (আল-কোরআন ৪:৭৫)

যখন নিরীহ ও অত্যাচারীত ক্রন্দন করে তখন অত্যাচারীর দুর্বিসহ অত্যাচার থেকে রক্ষা পাওয়ার উপায় কি? তাই বলা হয়েছে, যদি আল্লাহ মানবজাতির একদলকে দিয়ে অপরদলকে প্রতিহত না করতেন তবে এ পৃথিবী অন্যায়ে ছেঁয়ে যেত।

মানব জাতিরই একদল অপর দলের ওপর অত্যাচার করে। উৎপীড়কের হাত থেকে উৎপীড়িতের মুক্তির জন্য আল্লাহই অপর একটি দলকে জাগ্রত করে তোলেন। এভাবেই মানুষ মুক্তি লাভ করে। যুদ্ধ তাই কখনও কখনও প্রয়োজনীয়ও বটে।

পৃথিবীতে শান্তি ও শৃখলা রক্ষার্থে আল্লাহ একটি নির্দিষ্ট সীমারেখার মধ্যে বিভিন্ন জাতি, উপজাতি, বিভিন্ন দল বা ভাগে কিছু ক্ষমতা দান করেন এবং তাকে বলবৎ রাখেন। যখনই কেউ সীমালংঘন করে তখন তিনি অপরাপরদের দ্বারা সীমালংঘনকারীকে প্রতিহত করেন। তাদের ক্ষমতাকে ভেঙ্গে দেন কিংবা প্রতিস্থাপন করেন। যদি আল্লাহ কোন একটি দল বা জাতিকে চিরদিনের জন্য ক্ষমতায় থাকার সুযোগ দিতেন, তবে তারা স্বেচ্ছাচার হয়ে উঠত। পৃথিবী সংশয়াপূর্ণ ও বিশৃংখলায় নিমজ্জিত হয়ে যেত।

▪ **২.২৫১.৩** কিন্তু আল্লাহ তাঁর সৃষ্টির প্রতি একান্তই দয়াশীল (But Allah is a Lord of Kindness to His creatures) : অত্যাচারী গোষ্ঠীর হাত থেকে অত্যাচারীতকে উদ্ধার করার জন্য আল্লাহ মানবজাতির অপর একটি দলকে জাগ্রত করে তোলেন। এভাবে একদলকে দিয়ে তিনি অপরদলের অন্যায়-অত্যাচারকে প্রতিহত করেন। যদি আল্লাহ তা না করতেন তবে পৃথিবী অন্যায়ে ছেঁয়ে যেত। অত্যাচারীর অত্যাচার আরও বেড়ে যেত। নিষ্পেষিত গোষ্ঠী কোনদিনই নিষ্পেষন থেকে মুক্তি পেত না।

বলা হচ্ছে যে, আল্লাহ তাঁর সৃষ্টির প্রতি একান্তই দয়াশীল [আল্লাহ দ্রষ্টব্য ২.২০.২]। তিনি দয়াশীল বিধায় মানবজাতির শক্তিমান দলের হাত থেকে দুর্বল দলকে উদ্ধার ও রক্ষা করেন। তিনিই তাঁর সৃষ্টিকে রক্ষা করেন। একই কথা গীতায় এভাবে বলা হয়েছে,

".. যখন এবং যেখানে ধর্মের (সত্য ও ন্যায় পথের) অবনতি ঘটে এবং অধর্মের (অন্যায় ও অসত্যের) অভ্যুত্থান হয়- সে সময়ে আমি নিজেকে প্রকাশ করে অবতরণ করি। শিষ্টের রক্ষা ও দুষ্টের দমন এবং একইসাথে ধর্মের রীতি-নীতির পুনঃস্থাপনে আমি যুগে যুগে আবির্ভূত হই।" (গীতা ৪:৭-৮)

▪ **২.২৫২** এগুলি আল্লাহর বাণী, যা আমি তোমার নিকট যথাযথভাবে বর্ণনা করছি। নিশ্চয়ই! তুমি (মোহাম্মদ) আমার বার্তাবাহকগনের অন্তর্ভুক্ত : ওপরে যেসব ঘটনা বিবৃত করা হয়েছে তা বাইবেল থেকে বিবৃত হয়েছে [অবতীর্ণ বাণী দ্রষ্টব্য ২.২৩]। মহানবী (সাঃ) বাইবেল পাঠ করেননি। তিনি অক্ষর জ্ঞানসম্পন্নও ছিলেন না। অনেকে অভিযোগ করে বলত যে কেউ তাঁকে তা পাঠ করে শুনিয়েছে বা কেউ তাঁকে শিক্ষা দিয়েছে। যেমন কোরআনেই এ বিষয়ে এভাবে উদ্ধৃত হয়েছে যে,

"আমি (আল্লাহ) তো ভালভাবেই জানি যে তারা বলে তাকে জনৈক ব্যাক্তি শিক্ষা দেয়। যার দিকে তারা ইঙ্গিত করে তার ভাষা তো আরবী নয় এবং এ কোরআন পরিষ্কার আরবী ভাষায় (অবতীর্ণ)।" (আল-কোরআন ১৬:১০৩)

অবিশ্বাসীরা অনারব কিছু ক্রীতদাসের প্রতি ইংগিত করে এমন মিথ্যে অভিযোগ রচনা করার চেষ্টা করত বলে বলা হয়। সে প্রেক্ষিতে এটি বলা হয়েছে। আরও বলা হয়েছে,

"এমনিভাবে আমি আমার নিদর্শনাবলী বিভিন্ন প্রকারে বর্ণনা করি যেন তারা (অবিশ্বাসীরা) না বলে যে তুমি তো পড়ে নিয়েছ (পূর্বের গ্রন্থসমুহ, অর্থাৎ বাইবেল)।" (আল-কোরআন ৬:১০৫)

বস্তুত এসব বার্তার মাধ্যমে এটিই বলা হয়েছে যে মহানবী (সাঃ) পূর্বের কোন আসমানী গ্রন্থ তথা বাইবেল পাঠ করেননি। কেউ তাঁকে শিক্ষাও দেয়নি বা পড়েও শোনায়নি। এসব সংবাদ তার কাছে আল্লাহর নিকট থেকে অবতীর্ণ হয়েছে।

অবতীর্ণ বাণী কি, বার্তাবাহক কি এসব বিষয়ে আরবের লোকদের তেমন কোন পূর্ব ধারণা ছিল না। তাই এর যথাযথতা বা সত্যাসত্য বিষয়ে তারা নিশ্চিত ছিল না। কিন্তু ইসরাইলিরা অবতীর্ণ বাণী সম্পর্কে অবগত ছিল। কেননা তাদের নবী মুসা (আঃ) এর নিকটও আল্লাহর বাণী অবতীর্ণ হয়েছিল। ফলে এ বিষয়ে তাদের পূর্ব ধারণা ছিল এবং আরবরা তাদের কাছে এসব বিষয়ে জানতে চাইত।

আল্লাহ বলছেন, ‘এগুলি আল্লাহর বাণী, যা আমি তোমার নিকট যথাযথভাবে বর্ণনা করছি।’ অন্যত্র বলা হয়েছে,

“বল: একে পবিত্র ফেরেশতা (জিবরাইল) পালনকর্তার পক্ষ থেকে নিশ্চিত সত্যসহ অবতীর্ণ করেছেন।” (আল-কোরআন ১৬:১০২)

অর্থাৎ এসব বার্তা আল্লাহ সরাসরি মোহাম্মদ (সাঃ) এর প্রতি অবতীর্ণ করেছেন। কারণ মোহাম্মদ (সাঃ) আল্লাহর প্রেরিত রাসূল বা বার্তাবাহক। আল্লাহ সরাসরি মানুষের সাথে কথা বলেন না। তিনি বার্তাবাহকের মাধ্যমে তাঁর বার্তা মানুষের কাছে পৌঁছে দেন। কোরআনে বিষয়টি তাই নিশ্চিত করে বলা হয়েছে যে, ‘নিশ্চয়ই! তুমি (মোহাম্মদ) আমার বার্তাবাহকগনের অন্তর্ভুক্ত।’ যেন এ বিষয়ে কারও মনে কোন দ্বিধা-দ্বন্দ্ব না থাকে। যেমন বলা হয়েছে,

“কোন মরণশীলের জন্য এমন হওয়ার নয় যে আল্লাহ তার সঙ্গে কথা বলবেন কোন ওহীর মাধ্যম ব্যাতিত অথবা কোন পর্দার অন্তরাল অথবা কোন দূত প্রেরণ করার মাধ্যম ব্যাতিত যে তাঁর অনুমতিক্রমে তিনি যা চান সে বার্তা পৌঁছে দেবে।” (আল-কোরআন ৪২:৫১)

ইসরাইলের সন্তানেরা তাদের বার্তাবাহকগনকে বিশ্বাস করে। তাদের কাছে আল্লাহর বার্তা অবতীর্ণ হয়েছিল সেসব বিশ্বাস করে। তেমনি এখানে বলা হয়েছে যে মোহাম্মদ (সাঃ)-ও আল্লাহর প্রেরীত বার্তাবাহক। তার কাছেও

বার্তা অবতীর্ণ হয়েছে। অবতীর্ণ বাণী কিংবা আল্লাহর বার্তাবাহক এসব বিষয়গুলি যে সত্য তা তারা জানে। অতএব মোহাম্মদ (সাঃ) এর কাছে অবতীর্ণ বার্তায় তাদের বিশ্বাস রাখা উচিত এবং এ বিষয়ে তাদের অবিশ্বাস করা উচিত নয়। কিন্তু ইসরাইলিরা মোহাম্মদ (সাঃ) এর নবুয়ত প্রাপ্তিকে মেনে নিতে চাইছিল না। তারা এ বিষয়ে নানান ধরণের মিথ্যে ও ভূল কথা রটনা করার চেষ্টা করত। আয়াতে তাই মোহাম্মদ (সাঃ) যে আল্লাহর প্রেরিত একজন বার্তাবাহক সে বিষয়টি নিশ্চিত করা হয়েছে।

▪ **২.২৫৩.১** বার্তাবাহকগনের মধ্যে আমি একের ওপর অপরকে মর্যাদা দান করেছি এবং তাদের মধ্যে কেউ এমন রয়েছে যার সঙ্গে আল্লাহ কথা বলেছেন, আবার কারও মর্যাদা তিনি করেছেন উচ্চতর এবং আমি মরিয়ম পুত্র ঈসাকে প্রকৃষ্ট নিদর্শনসমুহ দান করেছি এবং তাকে শক্তি দান করেছি পবিত্র আত্মার মাধ্যমে : মহান আল্লাহই মানবজাতিকে সঠিক পথ প্রদর্শনের জন্য যুগে যুগে বার্তাবাহক প্রেরণ করেছেন। তাদের মধ্যে একের ওপর অপরকে মর্যাদা দান করেছেন। তাদের কারও সাথে তিনি সরাসরি কথা বলেছেন, যেমন মুসা (আঃ)। বলা হচ্ছে যে,

"আল্লাহ মূসার সঙ্গে সরাসরি কথা বলেছেন।" (আর-কোরআন ৪:১৬৪)

বার্তাবাহকগণের কারও মর্যাদাকে তিনি করেছেন উচ্চতর। যেমন বলছেন, মরিয়ম পুত্র ঈসাকে আল্লাহ প্রকৃষ্ট নিদর্শনসমুহ প্রদান করেছেন এবং তাকে শক্তি দান করেছেন পবিত্র আত্মার মাধ্যমে।

অবিশ্বাসীরা বিশেষত ইসরাইলের সন্তানেরা মোহাম্মদ (সাঃ) এর নবুয়ত প্রাপ্তিকে মেনে নিতে চাইছিল না। তারা এ বিষয়ে নানান ধরণের মিথ্যে ও ভূল কথা রটনা করার চেষ্টা করত। এটা রাসূলের জন্য ছিল কষ্টকর।

আল্লাহ মহানবীকে এখানে শান্তনার বাণী শুনিয়েছেন। বলা হচ্ছে, আল্লাহ কত প্রিয় ও কত মর্যাদাসম্পন্ন নবী প্রেরণ করেছেন, কিন্তু কারও সব উম্মতই কখনও বিশ্বাসী হয়নি। এমনকি ইসরাইলের সন্তানদের প্রতি আল্লাহ অনেক নবী-রাসূল প্রেরণ করেছেন, অথচ স্পষ্ট প্রমাণ আগমনের পরেও তারা সকলে বিশ্বাসী হয়নি। তাদের কেউ বিশ্বাসী হয়েছে কেউ হয়েছে অবিশ্বাসী।

আগত বার্তাবাহকগনের পরবর্তীতে তারা পরস্পর যুদ্ধ-বিগ্রহেও লিপ্ত হয়েছে। তারা একে অন্যের সঙ্গে মতবিরোধ করেছে। কিন্তু সকলে বা সত্যিকার বিশ্বাসী হলে তারা তেমন করত না। তাদের কেউ বিশ্বাস এনেছে, কেউ হয়েছে অবিশ্বাসী [এ বিষয়ে লেখকের 'বাইবেল কোরআন ও ইসরাইল' বই দ্রষ্টব্য। সেখানে ধারাবাহিকভাবে বিষয়গুলি তুলে ধরা হয়েছে।]।

বার্তাবাহকগণের মাধ্যমে স্পষ্ট প্রমাণ আগমনের পরও ইসরাইলের সন্তানেরা নিজেদের মধ্যেই যুদ্ধ-বিগ্রহ করেছে। তাই বোঝান হয়েছে যে, মোহাম্মদ (সাঃ) এর প্রতি তারা অবিশ্বাসী হলেও এতে কষ্ট বা দুঃখ পাওয়ার কিছু নেই। বস্তুত আল্লাহ যৌক্তিক ও বাস্তবতার নিরিখেই তাঁর বার্তাবাহককে শান্তনার বাণী শুনিয়েছেন।

■ **২.২৫৩.২** আল্লাহ যদি তেমন ইচ্ছে করতেন, তবে স্পষ্ট প্রমাণ সমাগত হওয়ার পর তাদের পরবর্তীরা পরস্পর যুদ্ধ-বিগ্রহে লিপ্ত হত না। কিন্তু তারা একে অন্যের সঙ্গে মতবিরোধ করেছে। তাদের কেউ বিশ্বাস এনেছে, কেউ হয়েছে অবিশ্বাসী : (দ্রষ্টব্য ২.২৫৩.১, ২.২৫৩.৩)।

■ **২.২৫৩.৩** যদি আল্লাহ তেমন ইচ্ছে করতেন তবে তারা পরস্পর যুদ্ধ-বিগ্রহে লিপ্ত হত না; কিন্তু আল্লাহ তাই করেন যা তিনি ইচ্ছে করেন : বলা হচ্ছে, যদি আল্লাহ তেমন ইচ্ছে করতেন তবে আল্লাহর বার্তাবাহকগণ চলার পথের সঠিক বার্তা নিয়ে আগমন করার পরেও ইসরাইলের সন্তানেরা পরস্পর যুদ্ধ-বিগ্রহে লিপ্ত হত না। তারা সকলেই আল্লাহর দেখান পথ অনুসরণ করে চলত। কিন্তু দেখা যাচ্ছে যে তাদের কেউ আল্লাহর বার্তায় বিশ্বাস এনেছে আবার কেউ হয়েছে অবিশ্বাসী। তাই বলা হয়েছে,

"আল্লাহ যদি তেমন ইচ্ছে করতেন, তবে স্পষ্ট প্রমাণ সমাগত হওয়ার পর তাদের পরবর্তীরা পরস্পর যুদ্ধ-বিগ্রহে লিপ্ত হত না। কিন্তু তারা একে অন্যের সঙ্গে মতবিরোধ করেছে। তাদের কেউ বিশ্বাস এনেছে, কেউ হয়েছে অবিশ্বাসী।"

যেহেতু তারা আল্লাহর দিক-নির্দেশনা অমান্য করেছে স্বাভাবতই আল্লাহ তাদেরকে তাদের মতো চলতে দিয়েছেন। তবে তার জন্য তাদেরকে তাদের মন্দ কর্মের ফল ভোগ করতে হবে এবং হয়েছেও তাই। তারা নিজেদের মতো

চলেছে। একে অন্যের সঙ্গে মতবিরোধ করেছে। যুদ্ধ-বিগ্রহ করে নিজেরাই নিজেদের জীবনকে দুর্বিসহ করে তুলেছে। ক্ষণস্থায়ী জীবনে তাতে কি প্রাপ্তি হয়েছে?

যখন কেউ আল্লাহর দিক-নির্দেশনা অনুসরণ করে চলবে না তখন তিনি তাদেরকে তাদের নিজেদের মতো চলতে দেবেন। অর্থাৎ যে যে পথে চলতে চায় আল্লাহ তাকে সেভাবেই চলতে দেন। এক্ষেত্রেও তাই করা হয়েছে। দিক-নির্দেশনা প্রেরণের পর তিনি কারও ইচ্ছে বা স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করেননি। যদি আল্লাহ তেমন ইচ্ছে করতেন তবে তারা পরস্পর যুদ্ধ-বিগ্রহে লিপ্ত হত না। কিন্তু তিনি তেমন ইচ্ছে করেননি। আল্লাহ তাই করেন যা তিনি ইচ্ছে করেন [আল্লাহর ইচ্ছে দ্রষ্টব্য ২.১৪২.৩]। এক্ষেত্রে তিনি যেমন ইচ্ছে করেছেন তাই করেছেন। তাদেরকে নিজেদের ইচ্ছে অনুযায়ী চলতে দিয়েছেন।

তবে সৃষ্টির সূত্র অনুযায়ী তারা প্রত্যেকেই তাদের কৃতকর্মের ফল পেয়ে যাবে। সেভাবেই আল্লাহর সৃষ্টিকর্ম সাঁজান। যেন তারা শিক্ষা লাভ করে।

বিষয়টিকে আবার এভাবেও দেখা যেতে পারে যে, আল্লাহ চেয়েছেন বিধায় তারা বিভাজিত হয়েছে। পরস্পরের সাথে দ্বন্দ্বে লিপ্ত হয়েছে। সেটিও একেবারেই অমূলক ভাবনা নয়।

এভাবে ভাববার মাঝেও এ বাণীর গভীর তাৎপর্য্য নিহিত আছে। তবে কেউ সেটি বুঝতে ব্যার্থ হলেও বাণীর ওপর বিশ্বাস রাখাটি উত্তম। অর্থাৎ 'আল্লাহ তাই করেন যা তিনি ইচ্ছে করেন।'

বস্তুত আল্লাহর ইচ্ছেও সুবিবেচনা প্রসূত বিষয়। আল্লাহ চাইলেই সকলে তাঁর দিক-নির্দেশনার মধ্যে চলে আসত। কিন্তু তিনি তেমনটিও চাচ্ছেন বলে মনে হচ্ছে না। যেমন বলা হয়েছে,

"যদি আল্লাহ চাইতেন, তিনি সকলকে তার দিক নির্দেশনার মধ্যেই নিয়ে আসতেন। অতএব তুমি বোকাদের অন্তর্ভূক্ত হয়ো না।" (আল-কোরআন ৬:৩৫)

আল্লাহ মানুষকে পরীক্ষা করেন। তাই এটি তাঁর ইচ্ছে নয় যে তিনি নিজেই সকলকে তাঁর দিক-নির্দেশনার মধ্যে নিয়ে আসবেন। কেননা পার্থিব জীবন এক

পরীক্ষা। যদি তিনি মানুষের থেকে তার চলার বা ইচ্ছের স্বাধীনতা কেড়ে নেন তবে পরীক্ষা কোন মূল্য বহন করে না। বলা হচ্ছে,

“তিনি তোমাদেরকে পরীক্ষা করতে চান যে তোমাদের মধ্যে কর্ম/আচরণে কে শ্রেষ্ঠ।” (আল-কোরআন ১১:৭)

এ পরীক্ষারও একটি আপাত লক্ষ্য আছে। আপাত বলা হচ্ছে, কেননা আল্লাহর মূল লক্ষ্য বিষয়ে কেউই অবগত না। কেন তিনি এসব করেন কেউ জানে না। তিনি তাঁর বার্তাবাহক প্রেরণ করেছেন মানুষকে সঠিক পথে আহবান করার জন্য। নিদর্শন প্রদর্শন করেছেন তাঁর সকল সৃষ্টির মধ্যে। দর্শনকে উপস্থাপন করেছেন জ্ঞানসম্পন্নদের জন্য সত্যের ভিত্তিতে যৌক্তিকতার আলোকে। এতদ্বসত্বেও মানুষ কোন পথ গ্রহণ করে তিনি তা দেখেন। কর্ম ও জ্ঞানের প্রয়োগের যথার্থতার ভিত্তিতে মানুষ ফলাফল প্রাপ্ত হবে এবং মন্দদেরকে তিনি ভালদের থেকে পৃথক করে নেবেন। বলা হচ্ছে,

“অবশ্যই তিনি (আল্লাহ) ভালদের থেকে মন্দদেরকে পৃথক করবেন। তবে অদৃশ্য বিষয় সম্পর্কে তোমাদেরকে অবহিতকরণের মাধ্যমে নয়।” (আল-কোরআন ৩:১৭৯)

জীবন ও জগত সম্পর্কে বস্তুত মানবের পূর্ণাঙ্গ কোন ধারণা নেই। তাই মানুষের জন্য এভাবে বুঝতেই সুবিধা হয় যে, ‘আল্লাহ তাই করেন যা তিনি ইচ্ছে করেন।’ বস্তুত তাঁর ইচ্ছেও সুবিবেচনাপ্রসূত বিষয়। সত্যের ভিত্তিতে অংকের হিসেবে সবকিছু করা হয়ে থাকে। কিন্তু তিনি কি ইচ্ছে করবেন, কেন করবেন, কখন করবেন কেউ তা জানেও না, বোঝেও না। তিনি সমগ্রের ওপর বিবেচনা করে তাঁর ইচ্ছেকে প্রকাশ করেন। যা কিনা মানব জ্ঞানে পরিপূর্ণভাবে বোঝা সম্ভব নয়। বলা হচ্ছে,

“সত্য প্রত্যাখ্যানে সব মানুষের এক মতাবলম্বী হয়ে যাওয়ার আশংকা না থাকলে, যারা দয়াময়কে অস্বীকার করে আমি তাদেরকেও দিতাম তাদের গৃহের জন্য রৌপ্য নির্মিত ছাদ ও সিড়ি, যেখানে তারা আরোহন করত এবং তাদের গৃহের জন্য দরজা ও পালংক যেখানে তারা বিশ্রাম নিত এবং স্বর্ণ নির্মিত অলংকার।” (আল-কোরআন ৪৩:৩৫)

একটি নির্দিষ্ট সীমার মধ্যে তিনি মানুষকে কর্ম ও সিদ্ধান্ত গ্রহণে স্বাধীনতা দিয়েছেন। ভাল ও মন্দ দুটি পথই মানুষকে প্রদর্শন করেছেন। নিজ বিবেচনায় মানুষেরও কিছু করণীয় আছে। এটিই তো পরীক্ষা!

মহাবিশ্বে যদি সব সৃষ্টি দোষযুক্ত হয়ে যায় এবং দোষযুক্ত সকল সৃষ্টি যদি এক হয়ে যায় তবে মহাবিশ্ব বিশৃংখল ও বিনষ্ট হয়ে যাবে। তিনি এককে দিয়ে তাই অপরকে প্রতিহত করেন। সত্য ও ন্যায়কে এভাবে সমুন্নত রাখেন। সৃষ্টিকে রক্ষা করেন। বলা হচ্ছে,

"যদি আল্লাহ মানবজাতির একদলকে দিয়ে অপরদলকে প্রতিহত না করতেন, তবে এ পৃথিবী অন্যায়ে ছেঁয়ে যেত। কিন্তু আল্লাহ তাঁর সৃষ্টির প্রতি একান্তই দয়াশীল।" (আল-কোরআন ২:২৫১)

আল্লাহ যা করেন সৃষ্টিকে রক্ষা করার জন্য করেন। সৃষ্টির কল্যাণার্থে করেন। সৃষ্টির প্রতি তিনি একান্তই দয়াশীল।

বার্তাবাহকগন আগমনের পরবর্তীতে ইসরাইলের সন্তানেরা পরস্পর যুদ্ধ-বিগ্রহে লিপ্ত হয়েছে। যদি আল্লাহ তেমন ইচ্ছে করতেন তবে তারা পরস্পর যুদ্ধ-বিগ্রহে লিপ্ত হত না। কিন্তু আল্লাহ তাই করেন যা তিনি ইচ্ছে করেন। তাঁর ইচ্ছেও সুবিবেচনা প্রসূত। তাদের একদল হয়েছে বিশ্বাসী এবং অপরদল হয়েছে অবিশ্বাসী।

বস্তুত বিশ্বাসী-অবিশ্বাসী বড় বিষয় নয়। এগুলি কর্মের ধরণ অনুযায়ী এক একটি পরিচয়। বড় বিষয় হচ্ছে সত্যকে সমুন্নত রাখা। সৃষ্টিকে সুরক্ষা দেয়া। সত্যকে বুকে ধারণ করলে অবিশ্বাসীও পুরস্কৃত হওয়ার যোগ্য। সত্য প্রত্যাখ্যানে সব মানুষের এক মতাবলম্বী না হওয়াটিই গুরুত্বপূর্ণ। আল্লাহ তাঁর সৃষ্টির প্রতি একান্তই দয়াশীল। তাই সৃষ্টিকে তিনি এ প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে রক্ষা করেন।

সকল মানুষের এক মতাবলম্বী হয়ে যাওয়াটি প্রত্যাশিত নয়। তাই কেউ নাম ধারণ করে ইহুদি, কেউ খ্রীষ্টান, কেউ মুসলিম। কেউ বিশ্বাসী, কেউ অবিশ্বাসী। বস্তুত প্রত্যেকেই নিজ নিজ জ্ঞানে বিধাতায় সমর্পনকারী। বিধাতায় সমর্পনই প্রকৃত ধর্ম। এককে দিয়ে তিনি অপরকে প্রয়োজনে ও যথাসময়ে প্রতিহত করেন। যখন যে সত্য ও ন্যায়ের পক্ষে অবস্থান গ্রহণ করে তখন সেই হচ্ছে বিধাতায় প্রকৃত সমর্পনকারী। তখন সেই আল্লাহর পক্ষ শক্তি।

সুনির্দিষ্ট কোন দল, নাম বা লেবাসধারীই কেবল আল্লাহর পক্ষ শক্তি নয়। সকল সৃষ্টিই তাঁর। বস্তুত সত্য ও ন্যায়কে সমুন্নত রাখাই মূখ্য বিবেচ্য বিষয়।

বিরোধীতার মধ্য দিয়েই বিবিধ জাতি ও সম্প্রদায় গড়ে ওঠে। যেমন গাছের অনেক শাখা-প্রশাখা গড়ে ওঠে। সব শাখা-প্রশাখাই উপকারী, প্রয়োজনীয় ও গুরুত্বপূর্ণ। সকলেই এক একটি নির্দিষ্ট অংশে ছাঁয়া দেয়। প্রয়োজন ফুরিয়ে গেলে নিজেই ঝড়ে পড়ে বা নিঃশেষ হয়ে যায়। বিরোধীতার মধ্য দিয়েই সত্য ও ন্যায়কে সমুন্নত রাখা হয়। যেন সত্য প্রত্যাখ্যানে সব মানুষ এক মতাবলম্বী হয়ে না যায় এবং সৃষ্টি ধ্বংসের কারণ না হয়। ভূল ও অপ্রয়োজনীয় পথ সময়ে আপনাতেই নিঃশেষ হয়ে যাবে। সেভাবেই সকল সৃষ্টিকর্ম সাঁজানো। এমনই মহান কারিগরের সৃষ্টিকর্মের মহাত্ম।

ইহুদি জাতি সৃষ্টি হয়েছে। বিভাজিত হয়ে খ্রীষ্টান সম্প্রদায় গড়ে উঠেছে। মুসলিম জাতিকে এক মধ্যপন্থী জাতিরূপে প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে (দ্রষ্টব্য আল-কোরআন ২:১৪৩)। এখানে কেবলমাত্র 'আব্রাহামিক রিলিজিয়ন' বা ধর্মসমুকে বিবেচনায় নিয়ে কথাগুলি বলা হচ্ছে। যদিও আকাশে অনেক 'তারা' আছে। কোন এক প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়েই তিনি সৃষ্টির সূত্রকে ধরে রাখেন যেন সকলে সত্য বিচ্যুত না হয়ে যায়।

পূর্বেও উল্লেখ করেছি যে, মানবীয় হিসেবে পরিকল্পনা বা ধারণার কাজগুলির শুরু হয় বহুপূর্বে (দ্রষ্টব্য ২.২৪৭.৩)। মানুষ তার বাস্তবায়ন দেখতে পায় অনেক পরে। যেমন বহু পূর্বেই আল্লাহ ইসমাইলের বংশধরদের মধ্য থেকেও একটি মহান জাতি গড়ে তুলবেন বলে বাইবেলে বলা হয়েছে। এ প্রতিশ্রুতি তিনি দিয়েছিলেন ইব্রাহীম (আঃ)-কে। কেননা হযরত ইসমাইলও ছিলেন তাঁর পুত্র [লেখকের 'বাইবেল কোরআন ও ইসরাইল' বই দ্রষ্টব্য]।

হযরত ইসমাইলের ধারা থেকে মুসলিম জাতি জাগরিত হয়েছে। পরিকল্পনা অনেক পূর্বের। প্রক্রিয়াও শুরু হয়েছে অনেক পূর্বে। কিন্তু মানুষ তাৎক্ষণিক সব বুঝে উঠতে পারে না। অথচ আল্লাহ সমগ্রের ওপর বিবেচনা করে তাঁর ইচ্ছে বাস্তবায়ন করেন। তিনি পূর্বাপর সব জানেন। সকলের সকল হিসেব তাঁর কাছে আছে।

সমাজ গঠনের বিষয়টি এক অর্থে পরমাণু গঠনেরই অনুরূপ। যেমন পরমাণুতে রয়েছে ইলেকট্রন, প্রোটন ও নিউট্রন ও আরও অনেকের উপস্থিতি

(দ্রষ্টব্য ২.৩০)। তারা একে অপরের সাথে মিথষ্ক্রিয়া করে। যা সকল সৃষ্টির সচলতা ও ভারসাম্য রক্ষার পেছনের কারণ ও শক্তি হিসেবে কাজ করে।

তেমনি সত্যের ওপর প্রতিষ্ঠিত ‘নিরপেক্ষ’ ও ‘গ্রহণযোগ্য’ কোন দল, গোষ্ঠী বা ব্যাক্তি মানবসমাজে ‘আসন’ অলংকৃত করে। আসন গ্রহণকারী তখন ‘সত্য’ হিসেবে আবির্ভূত হয়। আসন গ্রহণকারী সকলের ‘কেন্দ্রে’ বা ‘মধ্যবর্তী’ স্থানে অবস্থান গ্রহণ করে। মনে করি তার নাম ‘নিউট্রন’।

কার্য সম্পাদন বা বাস্তবায়নে এককভাবে আসন গ্রহণকারীর নিজস্ব ‘স্বক্ষমতা’ কমই থাকে। সকল পক্ষের দিক থেকে তার ওপর চাপও থাকে। তবে সকলের কাছে তার গ্রহণযোগ্যতা অধিক থাকে। সকলে তার নিকটবর্তী হতে চায়। আল্লাহকে কেউ চেনে না, জানে না। আল্লাহর ‘আসন’ তাই মানব সমাজে তাঁর ‘প্রতীকী প্রতিনিধিত্ব’ করে।

ওপরের উদাহরণে ‘নিরপেক্ষ’ ও ‘গ্রহণযোগ্য’ কথাগুলি গুরুত্বপূর্ণ। এসব গুণে গুণান্বিত হতে হলে নীতি-নৈতিকতা থাকতে হবে। সত্য ও ন্যায়ের ওপর প্রতিষ্ঠিত থাকতে হবে। পরিচালন সূত্র বা সত্যকে ধরে রাখার যোগ্যতা ও ইচ্ছেও থাকতে হবে। গুণ বিসর্জন দিলে আসন হারাতে হবে।

বস্তুত কোন একটি পক্ষের আকুন্ঠ সমর্থনে ‘নিরপেক্ষ’ জন আসন অলংকৃত করতে সমর্‌থ হয়। এতেই তার পরিচালন ক্ষমতা বা কার্য নির্বাহের সক্ষমতা বৃদ্ধি পায়। ফলে সমাজে ভারসাম্য ধরে রাখতে সমর্থ হয়। সমর্থনদাতা শক্তি তখন পক্ষশক্তি বা সত্যে বিশ্বাসীরূপে পরিচিতি পায়। অর্থাৎ সে আসনে সমাসীন ‘সত্যে’ বিশ্বাসী। মনে করি তার নাম ‘প্রোটন’। দু’য়ে মিলে শক্তির কেন্দ্রে অবস্থান করে।

পরিস্থিতি বিবেচনায় সে সময়টিতে একটি বিরোধী শক্তিও গড়ে ওঠে। বিরোধী শক্তিকে অবিশ্বাসীরূপে চিত্রায়িত করা হয়। বিরোধীশক্তি পক্ষশক্তির ওপর তীক্ষ্ণ নজর রাখে। সূক্ষ্ণ ফাঁক-ফোকর খোঁজে আসনে সমাসীন হতে বা পক্ষশক্তিকে অপসারণ করতে। মনে করি তার নাম ‘ইলেকট্রন’।

বিরোধী শক্তির চাপের কারণে পক্ষশক্তি সদা সতর্ক ও সচেতন থাকতে বাধ্য হয়। ভূল করার অবকাশ নেই। তাহলে ‘আসন’ হারাতে হবে। এভাবে সত্য ও ন্যায় সমুন্নত থাকে।

পরমাণুর গঠনের সাথে সমাজ গঠনের একটি সাদৃশ্য তুলে ধরা হল। প্রশ্ন হচ্ছে সামাজিক কাঠামোর বিবেচনায় 'গ্রহণযোগ্য জন' কার কাছে 'গ্রহণযোগ্য'?

পূর্বেও উল্লেখ করেছি যে আকাশে অনেক 'তারা' আছে। সমাজে অনেক অনেক জাতি, গোষ্ঠী, দল, উপদল ও সাধারণ মানুষ আছে। 'গ্রহণযোগ্য জন' গ্রহণযোগ্য হচ্ছেন সম্মিলিত মানুষের কাছে। সত্য হচ্ছে, সকল মানুষের কাছে কেউ কখনও গ্রহণযোগ্য হতে পারে না। তাই ধরে নিতে হবে অধিকাংশের কাছে।

'আল্লাহর ইচ্ছে' মিশে আছে সম্মিলিত মানুষের ইচ্ছের মধ্যে। এভাবেও বলা যেতে পারে যে, সমসাময়িক সময়ে আল্লাহর ইচ্ছে প্রকাশ পায় সম্মিলিত মানুষের ইচ্ছের মধ্য দিয়ে।

সৃষ্টির সর্বত্র এই একই মৌলিক সূত্র ক্রিয়ারত। বাইবেলে বলা হয়েছে, 'গড তাঁর আদলে মানব সৃষ্টি করেছেন'। এ একই আদল সমগ্র সৃষ্টির মধ্যে বিরাজমান। এ আদলের মধ্যেই সমগ্র সৃষ্টির পরিচালন প্রক্রিয়া অন্তর্ভূক্ত। সৃষ্টির পরতে পরতে তারতম্য দৃশ্যমান সত্বেও একই প্রক্রিয়া ক্রিয়ারত।

আল্লাহর ইচ্ছের আছে ব্যাক্তিক এবং সামগ্রীক দিক। তিনি সবার সাথে বিদ্যমান। সর্বত্র বিদ্যমান। সবার মধ্য দিয়ে তিনি সৃষ্টি পরিচালনা করেন। সমগ্র সৃষ্টিকে তিনি একাই পরিবেষ্টন করে আছেন। সম্পূর্ণ প্রক্রিয়ার সমন্বয়েই গড়ে উঠেছে একটি 'একক'। তাই তিনি 'এক'। কোন প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়েই তিনি তাঁর সৃষ্টির ভারসাম্য ধরে রাখেন। সৃষ্টিকে সুরক্ষা দেন।

একই সূত্রে আল্লাহই নির্ধারণ করেন কার কাছে তাঁর 'সার্বভৌম ক্ষমতা' বা 'প্রতীকী আসন'টি যাবে। তিনি যখন যাকে চান তাকেই তা প্রদান করেন। যেমন বলা হয়েছে, 'আল্লাহ যাকে ইচ্ছে তাকে তাঁর সার্বভৌমত্ব দান করেন (দ্রষ্টব্য ২.২৪৭.৩)।' আল্লাহর ইচ্ছে সুবিবেচনাপ্রসূত বিষয় যা সমগ্রের ওপর ভিত্তি করে করা হয়। যে সমগ্রের জ্ঞান মানবের নেই। পক্ষসমুহের মধ্যে যে যখন শক্তি সঞ্চয় করে প্রবল হয় তখন তারাই আসন অংকৃত করে। 'আল্লাহ'কে তাই প্রতীকীরূপে 'আসন' দ্বারাও চিহ্নিত করা হয়। অর্থাৎ আল্লাহর 'আসন' বা 'কুরসি'।

প্রসঙ্গে ফিরে আসি। আল্লাহ তাই করেন যা তিনি ইচ্ছে করেন। অতএব আল্লাহ চেয়েছেন বিধায় মানুষ বিভাজিত হয়েছে। পরস্পরের সাথে দ্বন্দ্বে লিপ্ত

হয়েছে। সেটিও একেবারেই অমূলক ভাবনা নয়। দ্বন্দ্বের মধ্য দিয়েই তিনি সত্যকে সমুন্নত রাখেন। মিথ্যে ও অসত্যকে প্রতিহত করেন।

মানুষ কখনও আল্লাহ থেকে প্রাপ্ত ইচ্ছে ও কর্মের সীমিত স্বাধীনতারও অপব্যাবহার করে। যথাযথভাবে সেগুলিকে কাজে লাগায় না। আল্লাহ প্রদত্ত পথ বা দিক-নির্দেশনাকে অগ্রাহ্য করে। নিজেরা ভিন্ন মত ও পথ উদ্ভাবন করে। তখন ভিন্ন মতাদর্শের সৃষ্টি হয় এবং মানুষ বিভক্ত হয়ে যায়। একদল হয় বিশ্বাসী এবং অপরদল হয় অবিশ্বাসী। অতঃপর বিরোধীতায় লিপ্ত হয়।

বার্তাবাহকগন সত্যের বার্তা নিয়ে আগমনের পরেও ইসরাইলের সন্তানেরা পরস্পর যুদ্ধ-বিগ্রহে লিপ্ত হয়েছে। যদি আল্লাহ তেমন ইচ্ছে করতেন তবে বার্তাবাহকগনের আগমনের পরে তারা পরস্পর যুদ্ধ-বিগ্রহে লিপ্ত হত না। কিন্তু আল্লাহ তাই করেন যা তিনি ইচ্ছে করেন। যা তিনি ভাল মনে করেন। তাঁর ইচ্ছেও সুবিবেচনা প্রসূত বিষয়। তার ইচ্ছের মধ্যেও সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য ও কল্যাণ নিহিত আছে। এভাবেই কোন প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে তিনি সত্যকে সমুন্নত রাখেন। সৃষ্টিকে রক্ষা করেন। আল্লাহর ইচ্ছে একটি অত্যান্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। সবকিছুর চালক।

➢ (আয়াত ২৫৪) আল্লাহর পথে ব্যায় (Spending in Allah's way) করতে মানুষকে আহবান করা হয়েছে। এছাড়াও অবিশ্বাসী (Disbelievers) বা অন্যায়কারীদের (Wrong-Doers) সম্পর্কে বলা হয়েছে।

২৫৪	হে বিশ্বাসীগন! আমি তোমাদেরকে যা দিয়েছি তা থেকে ব্যায় কর সেদিন আসার পূর্বে, যেদিন থাকবে না কোন লেনদেন, না কোন বন্ধুত্ব, না কোন সুপারিশ। অবিশ্বাসীরাই অন্যায়কারী/পথভ্রষ্ট। (O ye who believe! spend of that wherewith We have provided you ere a day come when there will be no trafficking, nor friendship, nor intercession. The disbelievers, they are the wrong-doers.)

▪ **২.২৫৪.১** হে বিশ্বাসীগন! আমি তোমাদেরকে যা দিয়েছি তা থেকে ব্যায় কর সেদিন আসার পূর্বে, যেদিন থাকবে না কোন লেনদেন, না কোন বন্ধুত্ব,

না কোন সুপারিশ : বিশ্বাসীদেরকে অর্থ-সম্পদ ব্যায় করার জন্য উদ্বুদ্ধ করা হয়েছে। কিন্তু কোথায় এবং কেন?

'আল্লাহর পথে' ব্যায় করতে বলা হয়েছে। তাই প্রথমেই আল্লাহর পথটিকে ভালভাবে বোঝার প্রয়োজন আছে [আল্লাহর পথে ব্যায় দ্রষ্টব্য ২.৩.৩] [উত্তম ঋণ দ্রষ্টব্য ২.২৪৫.১]।

কোরআন এসেছে জগতের সকল মানুষের চলার পথের দিক-নির্দেশনারূপে। আল্লাহই মানুষকে পৃথিবীতে প্রেরণ করেছেন। অতএব সকল মানুষের তথা সৃষ্টির কল্যাণে ব্যায় করাই হচ্ছে 'আল্লাহর পথে ব্যায়'। আল্লাহর পথে ব্যায়ের সুফল জগতের সকলেই ভোগ করে এবং করবে।

বিশ্বাসী-অবিশ্বাসী নির্বিশেষে জগতের সকল মানুষের জন্যই আল্লাহ আলো-বাতাস থেকে শুরু করে সকল জীবনোপকরণ সমানভাবে সরবরাহ করেন। সুতরাং এ ক্ষেত্রে এটিও একটি দিক-নির্দেশনা যে সকল মানুষের কল্যাণের জন্যই ব্যায় করতে হবে। ইব্রাহীম (আঃ) যখন আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করে বললেন,

"হে আমার প্রতিপালক! এ স্থানের তুমি নিরাপত্তা বিধান কর এবং এর অধিবাসীদের মধ্যে যারা আল্লাহ ও শেষ দিবসে বিশ্বাস করে তাদের আহার্য্য দান কর। আল্লাহ বললেন, যারা অবিশ্বাস করে আমি তাদেরকেও পরিপূর্ণ তৃপ্তি দান করব কিছুকালের জন্য। অতঃপর আমি তাদেরকে অগ্নির শাস্তি ভোগে বাধ্য করব- পথ পরিক্রমার এক হতাশাজনক/দূর্ভাগ্যজনক সমাপ্তি।" (আল-কোরআন ২:১২৬)

স্বয়ং আল্লাহও বিশ্বাসী-অবিশ্বাসী নির্বিশেষে সকলের জন্য জীবিকা সরবরাহ করেন। অতঃপর কে কেমন কর্ম করে এবং তিনি কার জন্য কি নির্ধারণ করবেন সেটি তাঁর বিবেচনার বিষয়।

তারপরেও কিছু কথা থেকে যায়। এ জগতে মানুষ দুই ধরনের কাজ করে। একটি ভাল কাজ, অপরটি মন্দ কাজ। মন্দ কাজে করা ব্যায় কি আল্লাহর পথে ব্যায় বলে বিবেচিত হবে? না, সেটি হতে পারে না। আল্লাহর নির্দেশনাও তেমন নয়। যা কিছু সৃষ্টির কল্যাণার্থে ব্যায় করা হয় তাই 'আল্লাহর পথে ব্যায়'।

উল্লেখ্য যে, কোন একটি বিষয়ে উদ্যোগ গ্রহণকালীন সময়, যুদ্ধকালীন সময় এবং স্বাভাবিক সময়ের গৃহিত পদক্ষেপসমুহ এক রকম হয় না বা হতেও পারে না। কোরআন সমগ্র মানুষের জন্য দিক-নির্দেশনাস্বরূপ এলেও কিছু মানুষ মন্দ কাজ করে। কিছু মানুষ মন্দ কাজে সহযোগীতা করে। কিছু মানুষ তাদের সমর্থন করে। কিছু মানুষ আবার মন্দ কাজকে প্রতিহত করে।

মানুষের ধরণ, কর্ম ও পরিস্থিতির পার্থক্যজনিত কারণে কখনও সকল মানুষের জন্য নয়, কেবল ন্যায় পথে অবস্থানকারীদের জন্য করা ব্যায়ই 'আল্লাহর পথে ব্যায়' বলে বিবেচিত হয়। তেমন পরিস্থিতির ক্ষেত্রেই কেবল বিশ্বাসীদের জন্য ব্যায় করার কথা বলা যেতে পারে। কেননা তাত্বিকভাবে ন্যায় পথ অবলম্বনকারীদেরকেই বিশ্বাসী বলে ধরে নেয়া হয়।

অন্যায় পথ অবলম্বনকারীদেরকে অবিশ্বাসী বলে ধরে নেয়া হয়। বিশ্বাসী-অবিশ্বাসী যখন লড়াইয়ের জন্য মুখোমুখী অবস্থান করে তেমন পরিস্থিতিতে অবিশ্বাসীদের জন্য ব্যায় করার কথা কেউই কখনও বলবে না। কিন্তু স্থিতিশীল বা স্বাভাবিক সময়ের ব্যাবস্থাপনা ভিন্ন।

স্বাভাবিক পরিস্থিতিতে সমগ্র মানবের মঙ্গলের জন্য ব্যায় করাই হচ্ছে 'আল্লাহর পথে ব্যায়'। আল্লাহ চাইলেই অবিশ্বাসীদেরকে ধ্বংস করে দিতেন, কিংবা তাদের সৃষ্টি রহিত করে দিতেন। কিন্তু তিনি তা করছেন না। আল্লাহ অবিশ্বাসীদেরকেও সমান তালে জীবনোপকরণ সরবরাহ করে যাচ্ছেন। মানুষের জন্য এগুলিও ইংগিতপূর্ণ দিক-নির্দেশনা।

তথাকথিত সঙ্গার আওতাভূক্ত অবিশ্বাসীদের ধ্বংস বা নিঃশেষ করে দেয়া বিশ্বাসীদের কাজ না। বিশ্বাসীদের কাজ হচ্ছে সমাজে বিরাজমান অন্যায়-অসত্যকে প্রতিরোধ-প্রতিহত করা। অবিশ্বাসীদেরকে সুপথে ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করা। অন্যায়ের বিপক্ষে দাড়ানই হচ্ছে বিশ্বাসী তথা মানবজাতির মূখ্য কাজ। সেজন্যই বিশ্বাসী সম্প্রদায়ের সৃষ্টি করা হয়েছে। তাদের ওপর সুনির্দিষ্টভাবে এ দায়িত্ব দেয়া হয়েছে। নইলে বিশ্বাসীদেরও প্রয়োজন হত না। তাই বিশ্বাসীদেরকে উদ্দেশ্য করে বলা হয়েছে,

"তোমরাই হলে সর্বোত্তম উম্মত; মানবজাতির কল্যাণের জন্যই তোমাদের আবির্ভাব হয়েছে। তোমরা সৎ কাজের আদেশ দেবে এবং অন্যায় কাজে বাধা দেবে।" (আল-কোরআন ৩:১১০)

বস্তুত লড়াইটা হচ্ছে সত্য-অসত্য, ন্যায়-অন্যায়ের। বিশ্বাসী-অবিশ্বাসী কথাগুলি দ্বারা সত্য ও ন্যায়ের পক্ষ-বিপক্ষ শক্তিকে বোঝান হয়ে থাকে। বিশ্বাসী বলতে সত্য ও ন্যায়ের পক্ষ শক্তিকে বোঝান হয়ে থাকে তা সে যেই হোক না কেন। বিপক্ষশক্তির প্রতীকী নামই হচ্ছে 'শয়তান'। শয়তান হচ্ছে ভাইরাসের মতো। বিশ্বাসীদেরকে বস্তুত একটি ভাইরাসের বিপক্ষে এন্টি ভাইরাসের মতো বলা যেতে পারে। বলা হচ্ছে,

"আমি সত্যকে মিথ্যের বিপক্ষে নিক্ষেপ করি; অতঃপর সত্য মিথ্যের মস্তক চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দেয় এবং নিশ্চয়ই! মিথ্যে নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়।" (আল-কোরআন ২১:১৮)

আয়াতে বিশ্বাসীদেরকে সত্য-ন্যায় ও কল্যাণের পথ তথা 'আল্লাহর পথে ব্যায়' করতে উৎসাহিত করা হয়েছে। বলা হচ্ছে, 'আমি তোমাদেরকে যা দিয়েছি তা থেকে ব্যায় কর।' সবাই ব্যায় করার সামর্থ রাখে না। কিন্তু কিছু মানুষকে আল্লাহ অফুরন্ত দান করেন। প্রয়োজনে সত্য ও ন্যায় প্রতিষ্ঠায়, সামাজিক অত্যাচার-দুরাচার দুরীকরণে তাদের এগিয়ে আসা কর্তব্য।

এগুলিও আল্লাহর পরীক্ষা। অর্থাৎ মানুষ বা আল্লাহর আশীর্বাদপুষ্ট মানুষ তার চলার যথাযথ পথ বা করণীয় কাজটিকে চেনে কিনা এবং সে পথে সক্রিয় অংশগ্রহণ করে কিনা আল্লাহ সেটি দেখেন। নইলে আল্লাহ অন্য কাউকে সে সুযোগ দিতে পারেন। যেমন বলা হয়েছে,

"তোমাদেরকে আল্লাহর পথে ব্যায় করার জন্য আহবান করা হয়েছে, তথাপি তোমাদের কেউ কেউ তা জমা করছে। যে জমা করছে সে মূলত তার নিজের প্রতিই অবিচার করছে। আল্লাহ অভাবমুক্ত এবং তোমরা অভাবগ্রস্থ। যদি তোমরা তাঁর দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নাও, তবে তিনি তোমাদের পরিবর্তে অন্য জাতিকে প্রতিষ্ঠা করবেন এবং তারা তোমাদের মতো হবে না।" (আল-কোরআন ৪৭:৩৮)

বস্তুত একজন মানুষের মাধ্যমে আল্লাহ অনেকের জন্য সরবরাহ করেন। তেমন আশীর্বাদপুষ্ট মানুষের দায়িত্ব আল্লাহর অনুগ্রহ মানুষের মাঝে ছড়িয়ে দেয়া। কিন্তু যারা তা না করে কেবল নিজেরা গোগ্রাসে ভোগ করে ও জমা করে তারা ভুল করে। তারা জমানো সবটা ভোগও করে যেতে পারে না। অথচ অসংখ্য মানুষ না খেয়ে, ডাষ্টবিন থেকে কুড়িয়ে খেয়ে, কাপড় না পরে শীতে-বর্ষায় দিনাতিপাত করে। এরা তাদের দায়িত্ব পালন করে না। অন্য কথায় এরা আল্লাহর পথে ব্যায় করে না। এরাই অকৃতজ্ঞ। অকৃতজ্ঞ এ অর্থে যে, যে আল্লাহ তাকে দিয়েছেন সে আল্লাহ তাকে যা করতে বলেছেন সে তা করছে না। আল্লাহর আশীর্বাদপ্রাপ্ত হয়ে আল্লাহরই সম্পদকে সে নিজের মনে করছে। যেমন আল্লাহ বলেন,

"তারা কি দেখে না যে আমার হাতে সৃষ্ট বস্তুসমুহের মধ্যে চতুস্পদ জন্তু সৃষ্টি করেছি, ফলে এখন তারাই এগুলির মালিক। আমি এগুলিকে তাদের বশীভূত করে দিয়েছি। এদের কতগুলি তাদের বাহন এবং কতগুলি খাদ্য হিসেবে ব্যাবহৃত হয়। তাদের জন্য এসবের মধ্যে রয়েছে অনেক উপকারিতা ও পানীয়। তবুও কি তারা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করবে না।" (আল-কোরআন ৩৬:৭১-৭৩)

আল্লাহ যা করতে বলেছেন তা করাই কৃতজ্ঞতার বহিঃপ্রকাশ। মানুষকে বিচার দিবস আগমনের পূর্বেই আল্লাহর পথে ব্যায় করতে বলা হয়েছে। বিচার দিবস চলে এলে ব্যায় করার যেমন সুযোগ নেই, তেমনি আর লাভ কিংবা প্রয়োজনও নেই। অর্থাৎ ততদিনে পরীক্ষা শেষ। তখন কেবল কৃতকর্মের ফলভোগ হবে।

এটি একটি সতর্কবার্তা বা তাগিদ যেন মানুষ সঠিক সময়ে সঠিক কাজটি করে। যারা ন্যায়ের পথে সহযোগী হবে না বিচার দিবসে তাদের প্রতি কোন অনুকম্পা প্রদর্শন করা হবে না। ন্যায়ের পক্ষে না থাকাও অন্যায়কে সহযোগীতা করার সামিল।

কোন ভাল কাজ বা বড় উদ্যেগই এককভাবে সম্পন্ন করা সম্ভব হয় না। সম্মিলিত প্রয়াস প্রয়োজন হয়। সে সময়ের পরিস্থিতি বিবেচনায় ইসলামের প্রচার-প্রসার ও প্রতিষ্ঠায় ব্যায় করার বিষয়টি ছিল খুবই প্রয়োজনীয়।

বিশ্বাসীদেরকে তাই সত্য ধর্ম বা দর্শন প্রতিষ্ঠায় ব্যায় করার জন্য উদ্বুদ্ধ করা হয়েছে।

■ **২.২৫৪.২** অবিশ্বাসীরাই অন্যায়কারী/পথভ্রষ্ট (The disbelievers, they are the wrong-doers) : অবিশ্বাসীরাই অন্যায়কারী। উদ্ধৃত অংশটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ এবং একটু বিস্তারিত ব্যাখ্যার দাবী রাখে [বিশ্বাসী-অবিশ্বাসী দ্রষ্টব্য ২.৬]।

কোরআনের দর্শন একটি পক্ষকে বিশ্বাসী ধরে নিয়েছে, অর্থাৎ যারা এ দর্শনের রূপরেখায় হুবহু বিশ্বাস করে তারা এবং যারা সেটি করে না তাদেরকে এ দর্শনে অবিশ্বাসী বলে ধরে নেয়া হয়। কিন্তু তারা সাধারণ অর্থে অবিশ্বাসী নয়। তাদের মধ্যেও বিশ্বাসী আছে। যারা আল্লাহকে ভিন্ন নামে হলেও বিশ্বাস করে। কর্মের একটি পরিণতিকেও বিশ্বাস করে। সেটাকেই কোরআনে বিচার দিবস বলা হয়েছে। ভিন্ন রূপরেখায় হলেও তারা পরকালে এবং কর্মফলে বিশ্বাস করে এবং সেটি করে কোরআনের দর্শন আগমনেরও বহু পূর্ব থেকে। বস্তুত এক আল্লাহ সকল সমাজে একই বার্তা প্রেরণ করেছেন। তবে সময়ের সাথে সবকিছুর মাঝেই ভূল-ভ্রান্তি ও কুসংস্কারও প্রবেশ করে।

সামজে অন্যায়-অত্যাচার বৃদ্ধি পেলে সেটি প্রতিরোধে একসময় একটি শক্তি জেগে ওঠে। সে শক্তি তার দর্শনের ছায়াতলে মানুষকে সমবেত করার চেষ্টা করে। নিজ দর্শনে সকলকে বিশ্বাসী হতে আহবান করে। এভাবে শক্তি সঞ্চয় করে। এটিই স্বাভাবিক। এটিই নিয়ম। এটিই সূত্র। এটিই সত্য।

একটি ভাল দর্শন, কিছু নিয়ম-বিধি এগুলি ভিন্ন অনুসারীদেরকে এক রাখা সম্ভব হয় না। তাদেরকে দিয়ে বড় ও মহৎ কোন কাজও করান সম্ভব হয় না। অন্যায়কে প্রতিরোধ ও প্রতিহত করাও সম্ভব হয় না। এ রূপরেখাই অনুসারীদের মধ্যে চেতনার সৃষ্টি করে যা তাদেরকে কর্মে উদ্দীপ্ত করে। লক্ষ্য অভিমুখে তাড়িত করে।

কোরআন তেমনিভাবে একটি রূপরেখা নিয়ে কু-সংস্কারে জর্জরিত ও অত্যাচারীত সমাজের কু-প্রথার মূলোৎপাটনে আগমন করেছিল একটি নির্দিষ্ট অঞ্চলে। লক্ষ্যের পানে এগিয়ে যেতে হলে একটি নির্দিষ্ট রূপরেখায় থেকে চলতে

হয়। দশ নৌকায় পা রেখে চলা যায় না। কিছু নিয়ম, কিছু শৃংখলা প্রতিষ্ঠা করতে হয়। সে কারণে অনুসারীদের জন্য কিছু শর্তও আরোপ করে দিতে হয়।

একটি সংগ্রাম বা একটি যুদ্ধকালীন পরিস্থিতিতে সত্য ও ন্যায়ের রূপরেখা অনুসারীদের জন্য প্রেরণা বা শক্তির উৎস হয়ে কাজ করে। যা অন্যায়কে প্রতিরোধে সহায়ক হয়ে কাজ করে। উল্লেখ্য যে, পরিবর্তীত পরিস্থিতিতে সেখানেও ঘুণে ধরার সম্ভাবনা থাকে। যুদ্ধকালীন বা সংগ্রামরত পরিস্থিতি ও শান্তিপূর্ণ বা স্থিতিশীল পরিস্থিতির ব্যাবস্থাপনা তাই একরকম নয় বা হয় না।

রূপরেখার অনুসারীগণ হয় সে রূপরেখায় বিশ্বাসী। যারা বিশ্বাস করে না তারা হয় অবিশ্বাসী। এভাবেই বিষয়গুলিকে তুলে ধরা হয়। এভাবেই একটি দর্শনের পক্ষ-বিপক্ষ শক্তি দাড়িয়ে যায়।

তৎকালীন অরাজক সামাজিক পরিস্থিতিতে কোরআন আগমন করেছে সত্য ও ন্যায়ের বার্তা নিয়ে। ফলে যারা কোরআনের দর্শনে বিশ্বাসী নয় তারাই সত্য ও ন্যায়ের বিরোধী শক্তি এভাবেই ধরে নেয়া হয়েছে। তাদেরকে অবিশ্বাসীরূপে আখ্যায়িত করা হয়েছে। কেননা বিশ্বাসীরা সে সময়ে অন্যায়-অত্যাচার, কুসংস্কার, কু প্রথার বিরুদ্ধে সংগ্রাম বা জেহাদ করেছে। সত্য ও ন্যায়ের পক্ষে কাজ করেছে। অবিশ্বাসীরা হয়েছে সে পথ প্রতিষ্ঠার প্রতিবন্ধকস্বরূপ। অর্থাৎ সে সময়ে ও সে সমাজে কোরআনের দর্শনে অবিশ্বাসীরাই বিবেচিত হয়েছে অন্যায়কারীরূপে। বাস্তব সত্য হচ্ছে, সব অবিশ্বাসীই অন্যায়কারী না, আবার সব বিশ্বাসীই ন্যায় পথে চলে না।

একটি দর্শন তার নিজের রূপরেখাকে পরিহার করে চলতে পারে না। তাকে তার নিজের রূপরেখা ধরেই চলতে হয়। তাই ‘বিশ্বাসী’ বলতে তাদেরকেই ধরে নিতে হয় যারা সে নির্দিষ্ট দর্শনের রূপরেখায় বিশ্বাস করে। এভাবে ধরে নিয়ে কাজ না করলে বিশাল জনগোষ্ঠীর মাঝে কে ভাল, কে মন্দ, কে ন্যায়ের পক্ষ শক্তি, কে অন্যায়ের পক্ষে তা সামষ্ঠিকভাবে চিহ্নিত করা কঠিন। দর্শনের রূপরেখায় বিশ্বাসী-অবিশ্বাসী এভাবে বিভাজন করে নিলে বুঝতে সুবিধা হয় যে কে কোন পক্ষে। অর্থাৎ কে ন্যায়ের পক্ষ শক্তি এবং কে তার বিরোধীতাকারী।

বিশ্বাসীদের ক্ষেত্রে ধরে নেয়া হয় যে তাদের পক্ষে কোন মন্দ কাজ বা অন্যায় কাজ করা সম্ভব নয়। কেননা দর্শন তাদেরকে তা করতে বলে না। ঠিক একই সূত্রে রূপরেখায় অবিশ্বাসীদেরকেও অন্যায়কারী বলে ধরে নেয়া হয়।

তাই বলা হয়েছে 'অবশ্বিাসীরাই অন্যায়কারী/পথভ্রষ্ট'। বস্তুত এটিও ঐ সূত্র ধরেই ধরে নেয়া হয়েছে। সত্য হচ্ছে অন্যায়কারীরাই 'অবিশ্বাসী'।

এটিও সত্য যে, বিশ্বাসীর মধ্যে অবিশ্বাসী-মোনাফেক আছে এবং কোরআনের আলোচনার শুরুতেই তাদের নিয়ে কথা বলা হয়েছে। তেমনিভাবে অবিশ্বাসীদের মধ্যেও প্রকৃত বিশ্বাসী আছে। যারা আল্লাহকে ভিন্ন নামে হলেও বিশ্বাস করে। কর্মের একটি পরিণতিকেও বিশ্বাস করে। অর্থাৎ ভিন্ন রূপরেখায় হলেও পরকাল ও কর্মফলে বিশ্বাস করে। বিশ্বাসের বিষয়টি অন্তরের গভীরের সাথে সম্পর্কিত। একমাত্র আল্লাহই অন্তরকে জানেন। তিনিই জানেন সত্যিকার অর্থে কে বিশ্বাসী, কে অবিশ্বাসী এবং কে মোনাফেক। এগুলি নির্ধারণের ভার আল্লাহর বিচার ব্যাবস্থার ওপরই থাকতে হবে। তাই কেউ কাউকে অবিশ্বাসী বলা নিষেধ। এটি অত্যান্ত বড় পাপ বা অন্যায় কাজ। কেননা সব পক্ষেই ভাল-মন্দ আছে এবং থাকে।

বিশ্বাসী নামধারী দলীয় কিছু লোক বিষয়গুলিকে এমন উদার বিশ্লেষণাত্মকভাবে গ্রহণ করে নিতে চাইবে না। তারা সব রকম কাজ করা সত্বেও বিশ্বাসী হওয়ার সুবিধাগুলি লুটে নিতে চায়। মনে করে যেন আল্লাহ তাদের নিজেদের সম্পদ। নিজেদের মতো করে সকল বিষয়গুলিকে সঙ্গায়িত করতে চায়। অন্যায় কাজ করলেও কেবলমাত্র তারাই বিশ্বাসী। তারাই স্বর্গ লাভের একমাত্র অধিকারী, অন্য কেউ নয়।

ইহুদি বা ইসরাইলের সন্তানেরাও একসময় তাই মনে করত। তাদের এমন ভ্রান্ত ধারণার কারণে কোরআনে তাদের সমালোচনা করে বলা হয়েছে,

"তারা বলে কেউই স্বর্গে প্রবেশ করবে না যদি না সে ইহুদী অথবা খ্রীষ্টান হয়। এটি তাদের নিজেদের মনের বাসনা। বল: যদি তোমরা সত্যবাদী হও তবে প্রমাণ উপস্থিত কর। (বস্তুত) যে কেউ নিজেকে আল্লাহর কাছে সমর্পন করে এবং ভাল কাজ করে, তার পুরস্কার রয়েছে তার পালনকর্তার কাছে; তাদের অন্তরে না কোন ভীতির সঞ্চার হবে, না তারা নিপতিত হবে কোনরূপ মনকষ্টে।" (আল-কোরআন ২:১১১-১১২)

বর্তমান কালেও সুযোগ সন্ধানি কিছু বিশ্বাসীদের মধ্যে একই প্রকারের ত্রুটি বা প্রবণতা প্রবেশ করেছে। ঘুষ খাচ্ছে, দুর্নীতি করছে, অন্যায়ভাবে অর্থ-সম্পদ

অর্জন করছে, অন্যের সম্পদ নিজ নামে করে নিয়ে দরবেশ হয়ে যাচ্ছে। অতঃপর মসজিদ তৈরী করছে। এখন এরাও বিশ্বাসী। ন্যায়-অন্যায়ের বাছ-বিচার নেই।

কাজ করতে গেলে একটি রূপরেখা ধরে এগুতে হয়। তাই দর্শনের আলোচনা করতে গেলে বিশ্বাসী-অবিশ্বাসী কথাগুলি চলে অসে। এর অর্থ এই নয় যে, কোরআনের দর্শনে যে বা যিনি বিশ্বাসী নন তিনি ন্যায়কারী নন বা সত্যের পথে নেই। আবার এমনও নয় যে, কোরআনের দর্শনে যে বা যিনি বিশ্বাসী কেবল তিনিই ন্যায় ও সত্যের পথ অবলম্বনকারী।

সত্য হচ্ছে যে, যিনি ন্যায় ও সত্য পথের অনুসারী অন্তরের গভীরে তিনি অবশ্যই বিশ্বাসী। সে আত্মা আল্লাহতে প্রকৃতই সমর্পিত। বিষয়গুলিকে এভাবেই বুঝতে হবে। নইলে অন্যায়কারীরাও বিশ্বাসীর তকমা লাগিয়ে সমাজের হর্তাকর্তা সেঁজে ঘুরে বেরাবার সুযোগ পাবে। বলা হচ্ছে,

"যারা অবিশ্বাস করে তারা বস্তুত মিথ্যের (ভূল সূত্রের) অনুসরণ করে এবং যারা বিশ্বাসী তারা তাদের পালনকর্তার নিকট থেকে আগত সত্যের (সঠিক সূত্রের) অনুসরণ করে।" (আল-কোরআন ৪৭:৩)

অতএব সত্যের পথ অনুসরণকারীই প্রকৃত 'বিশ্বাসী'। অসত্যের পথ অবলম্বনকারী 'অবিশ্বাসী'। কে বিশ্বাসী কে অবিশ্বাসী বিচারের ভার সম্পূর্ণ আল্লাহর হাতে। তিনি যাকে খুশি শাস্তি দেবেন যাকে খুশি পুরস্কৃত করবেন। প্রকৃত সত্য তিনি জানেন। তিনি অন্তর্যামী। আর কেউ নয়।

আয়াতে আল্লাহর পথে ব্যায় করতে উৎসাহিত করা হয়েছে। আল্লাহর পথ হচ্ছে সত্যের পথ, ন্যায়ের পথ, সাম্যের পথ, মানবজাতির কল্যাণের পথ। মানুষকে পার্থিব জীবনেই ব্যায় করতে উৎসাহিত করা হয়েছে। কেননা পরে আর সময় পাওয়া যাবে না। তখন পার্থিব জীবনে করা ভাল-মন্দ কর্মের হিসেব নেয়া হবে ও প্রতিফল দেয়া হবে। সেদিন কোন সুপারিশ-পক্ষপাতিত্ব হবে না। পার্থিব জীবনে ভূল করলে সেদিন রক্ষা নেই। এটি সতর্কবার্তা বিশ্বাসী-অবিশ্বাসী নির্বিশেষে সকল মানুষের জন্য।

এ জগতে মানুষ অনেক কাজ করে। প্রতিটি মুহূর্ত কেটে যায় কাজ আর কাজে। যার কাজ নেই তার সময়ও কেটে যায় ভাবনায়। মস্তিষ্ক কাজ করে। কোন অবসর নেই। এই যে এত কাজ এর কারণ কি? লক্ষ্য কি?

পার্থিব জীবনে এতসব কাজের লক্ষ্য জীবন ধারণ এবং জীবনকে একটু আনন্দ ও প্রশান্তি দান করা। আপাত দৃষ্টিতে আমরা তাই দেখি, বুঝি এবং তাই করি। অবশ্যই এগুলিও কাজ। কিন্তু এগুলিই কি মানব জীবনের মূল কাজ? শুধু এজন্যই কি আল্লাহ মানুষকে পৃথিবীতে প্রেরণ করেছেন? মানবের আনন্দ-ফুর্তি ও উদর পূর্তিতে আল্লাহর কি আসে যায়? আল্লাহ কেন মানুষকে অনর্থক আনন্দ-ফুর্তি, আত্মতৃপ্তিতে উদ্বেলিত হতে ও ভূরীভোজ করাতে এ জগতে প্রেরণ করবেন? যেমনটি পবিত্র গীতায় বলা হয়েছে,

"কেবলমাত্র ইন্দ্রিয়ের অনুভূতির জন্য উৎফুল্ল হয়ে বেঁচে থাকা কোন মানুষের জন্য বৃথাই জীবনধারণ।" (গীতা ৩:১৬)

বস্তুত মানুষের প্রকৃত কাজ হচ্ছে তাঁর জন্য কাজ করা যিনি তাকে সৃষ্টি করেছেন। মানুষের কাজ আল্লাহর জন্য কাজ করা। সে কারণেই তিনি মানুষ সৃষ্টি করেছেন। সেটিই সঠিক কাজ। বাকীগুলি আনুসঙ্গিক। কিন্তু আল্লাহর জন্য করণীয় কাজটি কি বা সঠিক কাজটি কি সেটিও যথাযথভাবে বোঝার আছে।

মানুষের কাজ আল্লাহর উপাসনা বা এবাদত করা। কিন্তু সেটিও কি বা কিভাবে করতে হবে বোঝার আছে। কেবল রুকু ও সেজদা করাই কি একমাত্র উপাসনা বা যথাযথ কাজ? বলা হচ্ছে,

"নিজ নিজ স্বভাবজাত কর্ম বা স্বকর্ম অনুসরণ করে সকল মানুষ উৎকর্ষ সাধন করতে পারে। ... মানুষ তার নিজ দায়িত্ব পালন করার মাধ্যমে ভগবানের অর্চনা করে সিদ্ধি, উৎকর্ষতা বা পরিপূর্ণতা লাভ করতে পারে।" (গীতা ১৮:৪৫-৪৬)

মানুষ সততার সাথে করা নিজের কাজের মধ্য দিয়েই আল্লাহর উপাসনা করে। জগতের সকল কর্মই যা ভাল, যা ন্যায্যতা সৃষ্টি করে সেগুলি আল্লাহর কাজ। সেগুলি সৃষ্টিতে ভারসাম্য রক্ষা করে। সৃষ্টিকে রক্ষা করে। সৃষ্টিকে রক্ষা করাই যথাযথ কাজ। এভাবে নিজের প্রতিটি কাজের মধ্য দিয়েই মানুষ

উৎকর্ষতা বা পূর্ণতা লাভ করে। এগুলো সব আল্লাহরই এবাদত বা উপাসনার অন্তর্ভূক্ত বিষয়।

কোরআনে বলা হয়েছে, "সঠিক কাজ শুধু এই নয় যে পূর্ব কিংবা পশ্চিম দিকে মুখ করা, বরং সে-ই সঠিক পথ অবলম্বনকারী যে বিশ্বাস করে আল্লাহতে, শেষ দিবসে, ... যে তাঁকে ভালবেসে সম্পদ ব্যায় করে আত্মীয়-স্বজন, ইয়াতীম, অভাবী, ভবঘুরে, ভিক্ষুক ও ক্রীতদাসদের মুক্ত করার জন্য এবং যারা যথাযথভাবে উপাসনা পালন করে এবং গরীবের প্রাপ্য অংশ (যাকাত) প্রদান করে এবং যারা কৃত প্রতিজ্ঞা পালন করে এবং অভাবে, বিপদ-আপদে ও চাপের মুখে ধৈর্য্যধারণ করে। তারাই হল সত্যনিষ্ঠ। তারাই খোদাভীরু।" (আল-কোরআন ২:১৭৭)

কোন কাজই এ জগতে অর্থহীন নয়। তাই বলা হয়েছে কেবল পূর্ব-পশ্চিমে মুখ করাই একমাত্র সঠিক কাজ নয়। জীবনের জন্য প্রয়োজনীয় সকল কাজ যথাযথভাবে পালন করাই সঠিক কাজ। সকল কাজই আল্লাহর কাজ। আল্লাহর কাজ করাই আল্লাহর এবাদত করা। এর মাধ্যমেই আল্লাহর সৃষ্টি রক্ষা পায়।

সৃষ্টিকে রক্ষা করতে হলে জীবন ও জগতকে প্রশান্ত করতে হয়। অর্থ-সম্পদের সঠিক ও যথাযথ ব্যাবহার নিশ্চিত করা না গেলে জগত অশান্ত হয়। অক্সিজেন বা রক্তের যথাযথ ও ভারসাম্যপূর্ণ প্রবাহ যেমন জীবনকে সুস্থতা দান করে ও সচল রাখে, তেমনি অর্থ-সম্পদের ন্যায্য ও যথাযথ প্রবাহ জীবনকে সচল ও সুস্থ্য রাখে। তাই কেবল পূর্ব-পশ্চিমে মুখ করাই একমাত্র সঠিক কাজ নয়। জীবন ও সৃষ্টি সুরক্ষার প্রয়োজনে বাস্তবে সকল কাজ যথাযথভাবে পালন করাই যথাযথ কাজ [আল্লাহর পথে ব্যায় দ্রষ্টব্য ২.৩.৩]। সত্যিকার এবাদত! বাকিগুলি মূল কাজের সহায়ক।

জীবনের অতি প্রয়োজনীয় কাজসমূহ যথাযথভাবে পালনের মাধ্যমে তাই শান্তি প্রতিষ্ঠা করতে হয়। তাই ইসলাম শান্তির ধর্ম। সকল ধর্মের একই লক্ষ্য। তাই কেউ উচ্চারণ করে 'ওঁম শান্তি'।

কোরআন কোন দলীয় গ্রন্থ নয়। এর নির্দেশনা যেমন সকল মানুষের জন্য পালনীয়, তেমনি এর নির্দেশনা পালনের পরবর্তী উপকারভোগীও হবে জগতের সকল মানুষ। সকল মানুষ যেমন আল্লাহ প্রদত্ত আলো-বাতাস সমভাবে ভোগ

করে, তেমনি এর নির্দেশনার পরিপালনের ফলও সকলে ভোগকারী হবে। অতঃপর ভাল-মন্দ বিচারের ভার আল্লাহর। মানুষ কেবল তার অংশের কর্তব্যটুকু যথাযথভাবে পালন করে যাবে। পরিশেষে আল্লাহ করবেন তার কাজ। তাই এভাবে বলা হয়েছে,

"নিশ্চয়ই! আমারই কাছে তাদের প্রত্যাবর্তন এবং তাদের হিসেব (গ্রহণ) সে তো আমারই (কাজ)।" (আল-কোরআন ৮৮:২৫-২৬)

ওপরের আলোচনায় এটিই বলার চেষ্টা করা হয়েছে যে, অন্যায়কারীরাই অবিশ্বাসী বা অন্যকথায় অবিশ্বাসীরাই অন্যায়কারী। কেননা যারা কোরআনের দর্শনের রূপরেখায় বিশ্বাস করে না বা অবিশ্বাসী তাদেরকে ন্যায় পথের বিপক্ষ শক্তি ধরে নিয়ে দর্শন প্রতিষ্ঠা পেয়েছে। যা তৎকালীন সাংঘর্ষিক অবস্থায় এমনিভাবে ধরে নিয়ে ন্যায়ের পক্ষ শক্তি তথা বিশ্বাসীদের ভেতরে অন্যায়ের বিরুদ্ধে রুখে দাড়াবার চেতনা ও প্রেরণার সৃষ্টি করা হয়েছে।

যারা ব্যায় করতে অনাগ্রহী বা জমা করতে ভালবাসে তাদের দ্বারা কল্যাণ হয় না। তারা মহৎ কাজে অংশগ্রহণ করে না। তারা তাদের অর্জন সত্য ও ন্যায়কে প্রতিষ্ঠা করার জন্য ব্যায় করতে কার্পণ্য করে। এমন আচরণকারী বস্তুত অদায়িত্বশীল। এরা ভাল পথের সহগামী/সহযোগী নয়, পথবিচ্যুত। কোরআনের সুপথে চলার আহবানে অবিশ্বাসী। বস্তুত অবিশ্বাসী তারা যারা মন্দ পথ বা ভূল পথ অবলম্বন করে, অন্যায় কাজ করে। শান্তি ও ভারসাম্য রক্ষার্থে যারা কাজ করে না এবং সে পথে অর্থ-সম্পদ ব্যায় করতে কার্পণ্য করে। যা সৃষ্টি ধ্বংসের কারণ হতে পারে।

➢ (আয়াত ২৫৫) আল্লাহকে মানুষ চেনে না, জানে না। কিন্তু জানতে চাওয়ার আগ্রহের শেষ নেই। আয়াতে আল্লাহ (Allah) সম্পর্কে কিছু ধারণা তুলে ধরা হয়েছে। এ আয়াতটি আয়াত 'আল-কুরসি' নামে পরিচিত। 'কুরসি' অর্থ হচ্ছে 'আসন' (His Throne)।

২৫৫	আল্লাহ! তিনি ছাড়া কোন উপাস্য নেই; জীবন্ত, শাশ্বত/চিরঞ্জীব, সর্বসত্তার ধারক! না তন্দ্রা তাঁকে স্পর্শ করে, না নিদ্রা! নভোমন্ডল ও ভূমন্ডলে যা কিছু আছে সবই তাঁর। কে আছে এমন, যে তাঁর অনুমতি

	ব্যাতিত তাঁর কাছে সুপারিশ করতে পারে? তিনি জানেন যা আছে দৃষ্টির সামনে এবং দৃষ্টির অন্তরালে, অথচ তাঁর জ্ঞানের কিছুই তারা তাদের জ্ঞানের পরিসীমার মধ্যে আনতে সক্ষম নয় তাঁর ইচ্ছে ব্যাতিত। তাঁর আসন (কুরসী) নভোমন্ডল ও ভূমন্ডলকে অন্তর্ভূক্ত করে রেখেছে এবং সেগুলিকে ধারণ করে রাখতে তাঁকে কখনই ক্লান্তি স্পর্শ করে না। তিনি প্রেরণা সৃষ্টিকারী, মহান। (Allah! There is no God save Him, the Alive, the Eternal. Neither slumber nor sleep overtaketh Him. Unto Him belongeth whatsoever is in the heavens and whatsoever is in the earth. Who is he that intercedeth with Him save by His leave? He knoweth that which is in front of them and that which is behind them, while they encompass nothing of His knowledge save what He will. His throne includeth the heavens and the earth, and He is never weary of preserving them. He is the Sublime (inspiring), the Tremendous.)

■ **২.২৫৫.১** আল্লাহ! (Allah) : এ জগতে মানুষের মনে বড় বড় যত প্রশ্ন আবির্ভূত হয় তার প্রধানতমটি হল কে এই জগতের স্রষ্টা? তিনিই হচ্ছেন 'আল্লাহ'! তবে এক এক দর্শন তাঁকে এক এক নামে অভিহিত করে। আল্লাহ জীবন ও জগতের সৃষ্টি, লালন-পালন ও প্রলয়কর্তা। তিনিই সবকিছুর হর্তাকর্তা। সবকিছু তাঁর অধীন। গীতায় বলা হয়েছে,

"এই জগতে যা কিছু জড় ও চেতন বস্তু আছে ... নিশ্চিতভাবে জেন যে, আমিই এর উৎস বা সৃষ্টি এবং সংহারের মূল কারণ।" (গীতা ৭:৬)

"সকল জীবসত্বা বা বিদ্যমানের মধ্যে আমি সৃষ্টিগত বীজ। কোন সচল ও অচল সত্বা নেই যা আমি ভিন্ন বিদ্যমান থাকতে পারে।" (গীতা ১০:৩৯)

স্রষ্টাভিন্ন কোন কিছুর কোন অস্তিত্ব নেই। আল্লাহই সৃষ্টির মূল। তাঁকে কেউ জন্ম দেয়নি, না তিনি কাউকে জন্ম দিয়েছেন। তাঁর সমকক্ষ কেউ নেই। তিনিই সর্বশ্রেষ্ঠ। যেমন বলা হয়েছে,

"যে আমাকে জন্মহীন বা জন্মরহিত এবং শুরুহীন বা অনাদিরূপে সমগ্র বিশ্ব-জাহানসমুহের পরম পালনকর্তারূপে জানে, মানুষের মধ্যে সেই ভ্রান্তিহীন ও সকল পাপ থেকেও মুক্ত।" (গীতা ১০:৩) (দ্রষ্টব্য আল-কোরআন ১১২:১-৪)

মানুষ অজানা-অচেনা রহস্যময় আল্লাহকে আরও ভালভাবে বুঝতে চায়। তাই সবার মনে প্রশ্ন জাগে- কে তিনি? তিনি কি বা কেমন? বস্তুত তাঁর বিষয়ে কেউই নিশ্চিত কিছু জানে না। আল্লাহকে চেনা-জানা বা বোঝা মানব জ্ঞানের ধারণ ক্ষমতার উর্ধ্বে বলা যেতে পারে। এ বিষয়ে সমগ্র মানবজাতি যেসব গ্রন্থকে দিক-নির্দেশক হিসেবে বিবেচনা করে সেসব গ্রন্থেও এভাবে বলা হচ্ছে যে,

"দৃষ্টি/অন্তর্দৃষ্টি তাঁকে ধারণা/কল্পনা করতে সক্ষম নয়।" (আল-কোরআন ৬:১০৩)

"তিনি .. অতীন্দ্রিয় যা মনুষ্য জ্ঞানের অতীত ..।" (গীতা ৮:৯)

মানব জ্ঞান ও ভাষার সর্বোচ্চ সীমাকে অন্তর্ভূক্ত করে আল্লাহ সম্পর্কে যতটুকু ধারণা দেয়া সম্ভব আয়াতে সে বিষয়ে ধারণা দেয়া হয়েছে। আয়াতটি আল্লাহ সম্পর্কে কিছুটা ধারণা দানের মাধ্যমে মানব অন্তরসমুহকে প্রশান্তি দান করেছে। মানুষের জানার আগ্রহ ও ব্যাকুলতাকে কিছুটা হলেও স্বস্তি দান করেছে বলা যেতে পারে।

সকলেই বিধাতা, সৃষ্টিকর্তা বা আল্লাহকে ভালভাবে জানতে চায়। এ বিষয়ে সত্য কেউ কিছু জানে না। তাই এ বিষয়ের আলোচনাকে কেবল ধারণা বলা যেতে পারে। আয়াতে আল্লাহর মহাত্বকে তুলে ধরার মাধ্যমে কোরআন মানুষের সামনে আল্লাহর বিষয়ে একটি ধারণা উপস্থাপন করেছে মাত্র। গীতায় বলা হয়েছে,

"না দেবতা না জ্ঞানীগণ আমার উৎস সম্পর্কে জানে ...।" (গীতা ১০:২)

"হে ভগবান .. তুমি কেবল নিজেই নিজের সম্পর্কে জান।" (গীতা ১০:১৫)

পবিত্র কোরআনের এ আয়াতটি 'আয়াত-আল-কুরসি' নামে পরিচিত। কেননা এখানে আল্লাহর 'আসন' বা 'কুরসি' সম্পর্কে বলা হয়েছে। 'কুরসি' হচ্ছে আসন। ইরেজীতে চেয়ার। এখানে আল্লাহর আসন কথাটি প্রতীকী অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে যা দ্বারা তাঁর সার্বভৌম ক্ষমতা ও কর্তৃত্বকে বোঝান হয়েছে। অত্যান্ত মহাত্বপূর্ণ একটি আয়াত হিসেবে এটিকে গন্য করা হয় [কুরসি দ্রষ্টব্য ২.৩০]।

আয়াতে আল্লাহ বা তাঁর মহাত্ব সম্পর্কে যে ধারণাগুলি পাওয়া যায় নিচে সংক্ষেপে পৃথকভাবে সেগুলি তুলে ধরা হল [আল্লাহ দ্রষ্টব্য ২.২০.২]। বস্তুত আল্লাহর মহাত্বই তাঁর পরিচয় বহন করে। যেমন গীতায় বলা হয়েছে,

"ঐশ্বর্য্যশীল, সুন্দরতম, মহিমান্বীত যা কিছু অস্তিত্ব আছে- তা সবই আমার শক্তিজাত বলে জানবে।" (গীতা ১০:৪১)

■ **২.২৫৫.২** তিনি ছাড়া অন্য কোন উপাস্য নেই (Allah; There is no God save Him) : আল্লাহ সম্পর্কে কেউই নিশ্চিত কিছু জানে না। যেহেতু তিনিই সব। তাঁর সমকক্ষ কেউ নেই। তিনি সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী। আল্লাহর বিষয়ে এভাবেই আমরা সবকিছু ধরে নেই। অতএব তিনি ভিন্ন আর কোন উপাস্য নেই বা হতে পারে না। কোরআনের দর্শন মানুষকে এভাবেই শিক্ষা দেয়। প্রকৃতপক্ষে আল্লাহর বিষয়ে সকল দর্শনেই এভাবে শিক্ষা দেয়।

যিনি সৃষ্টির মূল তিনিই তো উপাস্য হবেন। তিনি ছাড়া অন্য কোন উপাস্য নেই বা হতে পারে না। বলা হচ্ছে,

"আমার সকল ঐশ্বর্য্য ও ক্ষমতা সম্পর্কে যে যথার্থই জানে, সে অবশ্যই আমার নিরবিচ্ছিন্ন ভক্তিতে নিবিষ্ট হবে- এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই।" (গীতা ১০:৭)

"আমি জড় ও চেতন বা আধ্যাত্ম জগতের সবকিছুর উৎস। সবকিছু আমা হতে উদ্ভূত। তত্ত্বজ্ঞানী যে এটি অবগত সে ভক্তি সহকারে যথাযথভাবে আমার সেবায় নিজেকে নিয়োজিত করে এবং অন্তর দিয়ে আমার উপাসনা করে।" (গীতা ১০:৮)

স্রষ্টার মহাত্ব সম্পর্কে যে যথার্থই জানবে বা বুঝতে পারবে সে অপর কোন কিছুর উপাসনা করবে না। সে কেবল তাঁরই উপাসনা করবে (দ্রষ্টব্য ১.৪.১)।

কোরআন আল্লাহর মহাত্বকে মানবসমাজে যথার্থভাবে তুলে ধরেছে। তিনিই সৃষ্টির মূল, উৎস বা আদি। তিনিই লালন-পালনকর্তা। তিনিই রক্ষাকর্তা। প্রলয়কর্তাও তিনি। যেহেতু আল্লাহই সৃষ্টি জগতের মূল বা সব অতএব তিনিই একমাত্র উপাস্য। কোরআনের দর্শন এভাবেই শিক্ষা দেয় যে আল্লাহ ছাড়া অন্য কোন উপাস্য নেই।

আল্লাহর সমকক্ষ কাউকে গণ্য করা কোরআনের দর্শন মতে ক্ষমার অযোগ্য অপরাধ। কেননা এর সাথে অকৃতজ্ঞতার একটি সম্পর্ক আছে। আল্লাহ সব ক্ষমা করেন কিন্তু এই একটি পাপ বা অন্যায়কে ক্ষমা করেন না।

বাইবেলেও কঠোরভাবে এ বিষয়ে নিষিদ্ধতা আরোপ করা হয়েছে। যেমন বলা হয়েছে, "আমিই গড। আমি ব্যাতিত আর কোন গড নেই। আমি ব্যাতিত কোন ছবি, মূর্তী এমনকি আসমান-জমিন ও পানিতে কোন কিছুকেই উপাসনা করবে না।" (দ্রষ্টব্য বাইবেল বা ওল্ড টেষ্টামেন্ট, 'দশ নির্দেশনা' বা 'Ten Commandments' দ্রষ্টব্য)

স্রষ্টার মহাত্ব উপলব্ধি করে গীতায় এভাবে বলা হয়েছে, "তুমিই এই সৃষ্টি জগতের .. উপাস্যগণের প্রধান, প্রেরণাদাতা। কেউ তোমার সমকক্ষ নয়, না কেউ তোমার সমপর্যায়ে হতে পারে। এই ত্রিভূবনে তুমি অসীম। তুমিই সকল জীব সত্বার পরম পূঁজ্য। আমি তোমাকে প্রণাম বা সেজদা করে তোমার কৃপা/ক্ষমা প্রার্থনা করছি।" (গীতা ১১:৪৩-৪৪)

কোরআনে বলা হয়েছে, "আল্লাহ! তোমাদের প্রতিপালক। সার্বভৌমত্ব তাঁরই। তিনি ব্যতিত কোন উপাস্য নেই।" (আল-কোরআন ৩৯:৬)

"নভোমণ্ডল ও ভূ-মণ্ডলে যা কিছু আছে সবই আল্লাহর মহিমা প্রকাশ করে। সার্বভৌমত্ব তাঁরই এবং প্রশংসা তাঁরই প্রাপ্য এবং তিনি সবকিছু করতে সক্ষম।" (আল-কোরআন ৬৪:১)

■ **২.২৫৫.৩** জীবন্ত, শাশ্বত/চিরঞ্জীব, সর্বসত্তার ধারক (Allah; the Alive, the Eternal) : আল্লাহ জীবন্ত! বস্তুত এ ভাবনাটি কোরআন নিশ্চিত করে

না জানালে অনেকের ভাবনাতে এটি নাও আসতে পারত। জীবন তাঁরই মাঝে। তিনিই একমাত্র সচেতন! অপরাপর সকল জীবন তার এ জীবন্ততার পরশ, স্পর্শ বা ছোঁয়া থেকে সৃষ্ট! প্রাণের একমাত্র উৎস তিনি। যেমন গীতায় বলা হয়েছে,

"সর্বজীবে আমিই প্রাণ।" (গীতা ৭:৯)

"আমিই জীবন এবং মৃত্যুও আমিই।" (গীতা ৯:১৯)

তিনি জীবন্ত! চিরজীবি! তাঁর মৃত্যু নেই। যেমন বলা হয়েছে,

"ভূ-পৃষ্ঠে যা কিছু আছে সবই (ধ্বংসশীল) ধ্বংসপ্রাপ্ত হবে, কেবল থেকে যাবে তোমার মহিমাময় মহানুভব স্রষ্টার সত্বা।" (৫৫:২৬-২৭)

গীতায় বলা হয়েছে, "... মূঢ় লোকেরা আমাকে জন্মরহিত অক্ষয় বলে জানতে বা বুঝতে পারে না।" (গীতা ৭:২৫)

এ আয়াত আল্লাহকে জন্ম-মৃত্যুহীন বলে মানবজাতিকে ধারণা দেয়। তিনি সর্বসত্তার ধারক। সর্বদা বিদ্যমান এবং অন্যকেও বিদ্যমান রাখেন। সবকিছু তারই অন্তরস্থ। যেমন গীতায় বলা হয়েছে,

"... সকল কিছু আমাতে স্থিত, আমি সৃষ্টিসমুহের ধারক।" (গীতা ৯:৪-৫)

- **২.২৫৫.৪** না তন্দ্রা তাঁকে স্পর্শ করে, না নিদ্রা (Allah; Neither slumber nor sleep overtaketh Him) : না তন্দ্রা তাঁকে স্পর্শ করে, না নিদ্রা। তাঁকে কোন কিছুই ক্লান্ত করে না। সর্বদা তিনি একইভাবে বিদ্যমান। ত্রুটিমুক্ত, অব্যয়-অক্ষয়। কোন কিছুই তাকে ক্ষয় করে না।

বিশেষভাবে উল্লেখ্য যে, বাইবেলে বলা হয়েছে গড ছয়দিনে সকল সৃষ্টিকর্ম সম্পন্ন করেন। কোরআনেও তাই বলা হয়েছে। কিন্তু বাইবেল বলছে, সপ্তম দিনটিকে গড বিশ্রামের দিনস্বরূপ নির্ধারণ করেন। সে দিনটিই ইসরাইলিদের 'সাব্বাথ দিবস'। যে দিবসে সকল কাজ-কর্ম করা নিষিদ্ধ।

কিন্তু বাইবেলের এ বক্তব্যকে কোরআন নাকচ করে দিয়েছে। কোরআন মতে আল্লাহর কোন বিশ্রামের প্রয়োজন নেই। ক্লান্তি তাঁকে স্পর্শ করে না।

তিনি অব্যায় ও অক্ষয়। সর্বদা যথাযথরূপে (Perfect) বিদ্যমান। যেমন গীতায় বলা হয়েছে,

"আমি যোগমায়ায় সমাবৃত; সকলের নিকট প্রকাশিত নই। তাই মূঢ় লোকেরা আমাকে জন্মরহিত অক্ষয় বলে জানতে পারে না।" (গীতা ৭:২৫)

অর্থাৎ তাঁর কোন অবচয় বা ক্ষয় নেই। তিনি অব্যায় ও অক্ষয়। সর্বদা যথাযথরূপে (Perfect) বিদ্যমান। সর্বদা তাঁর সকল গুণে পরিপূর্ণ। অতএব তন্দ্রা, নিদ্রা কিংবা ক্লান্তির মতো বিষয়গুলি তাঁর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয় (দ্রষ্টব্য ২.২৫৫.৮)।

▪ **২.২৫৫.৫** নভোমন্ডল ও ভূমন্ডলে যা কিছু আছে সবই তাঁর (Allah; Unto Him belongeth whatsoever is in the heavens and the earth) : বস্তুত এটি পার্থিব মালিকানার মতো কোন বিষয় নয়। সবকিছু তাঁর মাঝে বিদ্যমান এবং সেক্ষেত্রে ভাগাভাগীর কোন বিষয় নেই। কোন অংশীদার নেই। তিনি এক এবং তাতেই পরিপূর্ণ। যেমন গীতায় বলা হয়েছে,

"আমার অব্যাক্ত রূপে সমগ্র বিশ্বজগৎ পরিব্যাপ্ত। সকল সৃষ্টিই আমাতে স্থিত।" (গীতা ৯:৪)

"জীব ও জড় সবই আমি।" (গীতা ৯:১৯)

বলা হচ্ছে, "তুমি এক, তুমিই স্বর্গ-মর্ত্য ও এর মধ্যবর্তী সর্বত্র পরিব্যাপ্ত হয়ে আছ।" (গীতা ১১:২০)

▪ **২.২৫৫.৬** কে আছে এমন, যে তাঁর অনুমতি ব্যাতিত তাঁর কাছে সুপারিশ করতে পারে : কেউই আল্লাহর কাছে সুপারিশ করার ক্ষমতা রাখে না। তবে এখানে 'তাঁর অনুমতি ব্যাতিত' কথাটি খুবই গুরুত্ব বহন করে। অর্থাৎ সবকিছুই সম্ভব যদি আল্লাহ অনুমোদন দেন। তিনি কাউকে অনুমতি দিতে পারেন। যেমন মোহাম্মদ (সাঃ) সকল মানুষের জন্য সুপারিশকারী হবেন। আল্লাহ সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী। তিনি স্বাধীন। তাঁর সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত।

যারা মনে করে বা প্রচার করে যে- কোন দেবতা, কোন ফেরেশতা, কোন সাধু পুরুষ কিংবা কোন ধর্মগুরু মানুষের জন্য তাদের হয়ে আল্লাহর কাছে সুপারিশ করবে বা তাদের ত্রুটি-বিচ্যুতিসমূহ ক্ষমা করিয়ে নেবে, এ আয়াত

তেমন ভ্রান্ত ধারণাকে নাকচ করে দেয়। এমন ভূল ধারণা সমাজে ছড়িয়ে দিয়ে ধর্মের নামে অনেকে ব্যাবসাও করে চলেছে। মানুষকে এমন ভূল ধারণা থেকে বের হয়ে আসতে এ আয়াত দিক-নির্দেশনা দেয়। মানুষকে কারও মুখাপেক্ষী না হয়ে আত্মবিশ্বাসী হয়ে কাজ করতে প্রেরণা দেয় এ আয়াত।

এখানে সতর্ক করে দেয়া হয়েছে যে, তাঁর সৃষ্টির কেউই তাঁর সম্মুখে কারও জন্য সুপারিশকারী হয়ে দাড়াতেও পারবে না। না কোন বার্তাবাহক, না কোন ফেরেশতা বা দেবতা, না কোন ধর্মগুরু বা সাধু পুরুষ- যদি না তিনি তাকে অনুমতি দেন।

উল্লেখ্য যে, বাস্তবতা ও তত্ব দুটি ভিন্ন বিষয়। বাস্তবের ত্রুটি-বিচ্যূতি দুর করে তত্বের পর্যায়ে পৌঁছানই লক্ষ্য। যদি সবকিছু ঠিকঠাক যথাযথ থাকত তবে মানুষের কোন কাজই থাকত না। ওপরে বলা হয়েছে যে, ধর্মের নামে অনেকে ব্যাবসাও করে চলেছে। যারা ব্যাবসা করে চলেছে এক্ষেত্রে ত্রুটি যতটা না তাদের, তার চেয়েও অধিক ত্রুটি হচ্ছে জ্ঞান ও বিশ্বাসহীন সাধারণ মানুষের। এমনকি কিছু কিছু শিক্ষিত মানুষেরও। তাদের জ্ঞান ও বিশ্বাসহীনতার কারণেই কিছু মানুষ ব্যাবসা করার সুযোগ নিতে পারছে। বস্তুত এরা দুর্বল চিত্তের আত্মবিশ্বাসহীন মানুষ। তাই নিজেকে চিনতে ও বুঝতে মানুষকে উদ্বুদ্ধ করা হয়।

এ কথাও অনস্বীকার্য যে, যতদিন ত্রুটিহীন মানুষ ও সমাজ গড়ে না উঠছে ততদিন এরাও কিছু মানুষের মাঝে প্রশান্তি ও আশার আলো জ্বালিয়ে রাখছে। জগতে যা কিছু ঘটে তা সময়ের প্রয়োজনেই ঘটে বা সৃষ্টি হয় বা গড়ে ওঠে। আবার যারা নিজেদেরকে আত্মবিশ্বাসী সচেতন বলে মনে করে, যদি সমাজের সকল মানুষ তেমন ত্রুটিহীনই হয়ে যেত তবে তাদেরও কোন কাজ থাকত না। তাদের সচেতনতা সৃষ্টিমূলক কাজেরও প্রয়োজন হত না।

নানান প্রকারের কাজ করে মানুষ জীবিকা নির্বাহ করছে। তাদের পোষ্যরাও এতে উপকৃত হচ্ছে। জ্ঞানের প্রসারই কোন একদিন এসব কর্মকান্ডকে বাতিল করে দেবে। অতএব প্রত্যেকেরই সর্বোচ্চ প্রচেষ্টায় নিজ নিজ কর্তব্য পালন করে যাওয়া উত্তম। সময়ে আল্লাহই সব কিছুকে লক্ষ্যের দিকে নিয়ে যাবেন। প্রসঙ্গক্রমে কথাগুলি বলে রাখা হল।

▪ **২.২৫৫.৭** তিনি জানেন যা আছে দৃষ্টির সামনে এবং দৃষ্টির অন্তরালে, অথচ তাঁর জ্ঞানের কিছুই তারা তাদের জ্ঞানের পরিসীমার মধ্যে আনতে সক্ষম নয়, তাঁর ইচ্ছে ব্যাতিত : মানুষের তথা সমগ্র সৃষ্টি ও জগতের অতীত, বর্তমান, ভবিষ্যত সবকিছুই আল্লাহ জানেন। তিনি জানেন যা আছে আলোতে যা আছে অন্ধকারে। তিনি জানেন যা আছে দৃষ্টির সামনে, যা আছে দৃষ্টির অন্তরালে। কোন কিছুই তাঁর অগোচরে নয়। গীতায় বলা হয়েছে,

"আমি অতীত, বর্তমান, ভবিষ্যত সবকিছু জানি। কিন্তু কেউ আমাকে জানে না।" (গীতা ৭:২৬)

"সর্বত্র তাঁর হস্ত-পদ, সর্বত্র অক্ষি, শিরঃ ও মুখবিশিষ্ট এবং সর্বত্র শ্রবনেন্দ্রিয় হয়ে জগতে সবকিছুকে আবৃত করে স্থিত।" (গীতা ১৩:১৪)

কোরআনে বলা হয়েছে, "নভোমণ্ডল ও ভূ-মণ্ডলের অদৃশ্য বিষয়ের জ্ঞান তাঁরই কাছে। কত স্বচ্ছ তাঁর দৃষ্টি এবং কি তীক্ষ্ণ তাঁর শ্রবণশক্তি!" (আল-কোরআন ১৮:২৬)

"তিনি সকল বিষয় তাঁর জ্ঞানের দ্বারা পরিবেষ্টন করে রেখেছেন।" (আল-কোরআন ২০:৯৮)।

তাঁর জ্ঞানের কিছুই মানুষের পক্ষে আনা সম্ভব নয়। মানুষকে ততটা সক্ষমতা দেয়াই হয়নি। কম্পিউটার যেমন জ্বলে-পুড়ে ছাই হয়ে গেলেও যে সক্ষমতা তাকে দেয়া হয়নি তার পক্ষে সেটি করা সম্ভব নয় বিষয়টি তেমন। তবে 'তাঁর ইচ্ছে ব্যাতিত' কথাটি গুরুত্বপূর্ণ। অর্থাৎ তিনি চাইলে সবকিছুই হওয়া বা করা সম্ভব। সেভাবে তিনিই সবকিছুকে এ্যাডজাষ্ট করে দেবেন।

মানুষ, ফেরেশতা, দেবতা বা জ্বিন কিংবা অন্য যে কোন সৃষ্টির জ্ঞান এতটাই সীমিত ও অস্বচ্ছ যে, তাদের কেউই এ জগতের সার্বিক ব্যাবস্থা সম্পর্কে যথাযথ ও পরিপূর্ণরূপে অবগত নয়, জানে না বা জানতেও পারে না। কেউই তাঁর সমকক্ষ নয় বা হতে পারে না (দ্রষ্টব্য আল-কোরআন ২:৩২)। এমনকি মানুষ তার নিজের ভাল-মন্দ বিষয়েও জানে না বা বুঝতেও পারে না যা আল্লাহ জানেন। তাই আল্লাহতে ভরসা রাখাই জ্ঞানসম্মত ও উত্তম।

■ **২.২৫৫.৮** তাঁর আসন নভোমন্ডল ও ভূমন্ডলকে অন্তর্ভূক্ত করে রেখেছে (Allah; His throne includeth the heavens and the earth) : তাঁর আসন অর্থাৎ 'কুরসি' বা 'চেয়ার' বা 'আসন' প্রতীকী শব্দ। এটি বোঝার ক্ষমতা প্রকৃত অর্থে মানুষের নেই (কুরসি দ্রষ্টব্য ২.৩০-২.৩৯)। কিন্তু এটিকে বোঝাবার জন্য মানুষের জ্ঞানের ভান্ডারেও তেমন কিছু নেই। অনুমান করে মানুষ অনেক কিছু বলতে পারে। কিন্তু কল্পনা বা অনুমান কখনও সত্যের স্থান নিতে পারে না।

এ আয়াতে আল্লাহর আসন সম্পর্কে বলা হয়েছে বলে এটি 'আয়াত আল-কুরসি' নামে পরিচিত। তাঁর আসন নভোমন্ডল ও ভূমন্ডলকে অন্তর্ভূক্ত করে রেখেছে। এতে আল্লাহর অসম্ভব বিশালত্ব সম্পর্কে ধারণা পাওয়া যায়। বর্তমানে বিজ্ঞানও মহাজগতের বিশালত্ব সম্পর্কে ধারণা দিয়ে থাকে। গীতায় যেমন বলা হয়েছে যে,

"অনুগ্রহ করে তোমার দিব্য শক্তি সম্পর্কে আমাকে বিস্তারিত বল, যা দ্বারা তুমি সকল বিশ্বসমুহকে পরিব্যাপ্ত করে আছ এবং একইসাথে তাতে অবস্থান কর।" (গীতা ১০:১৬)

আরও বলা হচ্ছে, "জেনে রেখ যে- আমার কেবলমাত্র এক অতি ক্ষুদ্র অংশ দ্বারা আমি সমগ্র মহাবিশ্বকে পরিব্যাপ্ত করে সহায়তা দিয়ে যাই।" (গীতা ১০:৪২)

কোরআনে বলা হয়েছে, "তারা আল্লাহকে যথাযথভাবে অনুধাবন/উপলব্ধি করতে পারেনি, যেমন যথাযথভাবে তাঁকে বোঝা উচিত; পুনরুত্থান দিবসে সমগ্র পৃথিবীটাই থাকবে তাঁর হাতের মুঠোয় এবং আসমানসমূহ তাঁর দক্ষিন হস্তে ঘূর্ণায়মান/ভাঁজ করা অবস্থায় থাকবে। তিনি মহিমান্বিত ..." (আল-কোরআন ৩৯:৬৭)

আল্লাহর আসন ও তাঁর বিশালত্ব তাঁর একচ্ছত্র সার্বভৌম ক্ষমতা ও কর্তৃত্বকেও প্রকাশ করে। যেমন বলা হয়েছে,

"নভোমণ্ডল ও ভূ-মণ্ডলের সার্বভৌমত্ব আল্লাহরই। আল্লাহ সবকিছু করতে সক্ষম।" (আল-কোরআন ৩:১৮৯)

▪ **২.২৫৫.৯** এবং সেগুলিকে ধারণ করে রাখতে তাঁকে কখনই ক্লান্তি স্পর্শ করে না (And He is never weary of preserving them) : তাঁর আসন নভোমন্ডল ও ভূমন্ডলকে অন্তর্ভূক্ত করে রেখেছে এবং নভোমন্ডল ও ভূমন্ডলে যা কিছু আছে সেগুলিকে তিনি একাই ধারণ করে আছেন। গীতায় এভাবে বলা হয়েছে,

"... সমস্ত জীব ও জড় আমাতে স্থিত; আমি সৃষ্টিসমুহের ধারক।" (গীতা ৯:৪-৫)

"সূতোয় যেমন মুক্তো গাঁথা থাকে তেমনি সবকিছু আমাতে গ্রথীত।" (গীতা ৭:৭)

বলা হচ্ছে, এ সব কিছুকে ধারণ করে রাখতে তাঁকে কখনই ক্লান্তি স্পর্শ করে না। যে কোন প্রকার ত্রুটি থেকে তিনি মুক্ত। তিনি পরিপূর্ণ, স্বয়ংসম্পূর্ণ, যথাযথ (Perfect)। তাই অব্যয়-অক্ষয়। তাঁর কোন অবচিতি নেই।

সৃষ্টি সম্পর্কে বলতে গিয়ে বাইবেলে বলা হয়েছে যে ছয়দিনে গড সৃষ্টিকর্ম সম্পন্ন করেন এবং সপ্তম দিনে তিনি বিশ্রাম গ্রহণ করেন। গডের বিশ্রামের সে দিবসটিই হচ্ছে ইহুদিদের 'সাব্বাথ' দিবস। কোরআনের এ বিবৃতি বাইবেলের সে ধারণাকে নাকচ করে দিয়েছে। বলা হচ্ছে, আল্লাহর বিশ্রামের কোন প্রয়োজন নেই। তাঁকে কখনই ক্লান্তি স্পর্শ করে না। বলা হচ্ছে,

"প্রত্যহ তিনি তাঁর কর্মে রত।" (আল-কোরআন ৫৫:২৯)

▪ **২.২৫৫.১০** তিনি প্রেরণা সৃষ্টিকারী, মহান (Allah, He is the Sublime/Inspiring, the Tremendous) : জীবন নিজেই এক প্রেরণা। কেননা জীবন না থাকলে কোন কাজ করা সম্ভব হয় না। জীবনই মানুষকে উজ্জীবিত ও সচল রাখে।

জীবিত মানুষও মৃত, যদি না ভেতরটা উজ্জীবিত থাকে। প্রেরণাবিহীন জীবন অর্থহীন। জীবন থাকতেও জীবনকে অর্থপূর্ণ করে তুলতে যিনি প্রেরণা দান করেন- তিনি মহান। তিনিই আল্লাহ!

আল্লাহ ভেতর ও বাহির থেকে প্রেরণা সৃষ্টি করেন। তাঁর নির্দেশনাও মানুষকে প্রেরণা দান করে। সর্বপরি তাঁর ভাবনাই মানুষকে উজ্জীবিত হয়ে উঠতে সহায়তা করে।

বিশ্বাসীর কাছে তাঁর ওপরে আর কোন প্রেরণাদানকারী নেই। যে সেটি হারিয়ে ফেলে সে মৃত। তিনিই প্রেরণা সৃষ্টিকারী, মহান! মানব ধারণায় তিনিই সর্বোচ্চ। মহান! তাঁর ওপরে কিছু নেই। তিনিই আল্লাহ!

আয়াত নং ২৪৩ থেকে এ পর্যন্ত বিশ্বাসীদেরকে আল্লাহ তাঁর পথে চলতে আহবান করেছেন এবং সে পথ প্রতিষ্ঠায় জীবন ও অর্থ-সম্পদ ব্যায় করার জন্যও উদ্বুদ্ধ করেছেন। আল্লাহর পথ প্রতিষ্ঠায় ইসরাইলের সন্তানেরা যেমন দুর্বলতা প্রদর্শন করেছে বিশ্বাসীদেরকে তেমন না করতে সতর্ক করা হয়েছে।

জেহাদ সম্পর্কে বলা হয়েছে। আল্লাহ জগতের একদলকে দিয়ে অপর দলকে প্রতিরোধ করেন এবং ভারসাম্য রক্ষা করেন। অন্যথায় প্রতিপক্ষের বিপরীতে জীবন পরিচালনা করা অপর পক্ষের জন্য দুর্বিসহ হয়ে উঠত।

বলা হচ্ছে, সফলতা কেবল সংখ্যা, জীবনোপকরণ ও শক্তির ওপরই নির্ভর করে না। এটি যথাযথ জ্ঞান, বিশ্বাস, ধৈর্য্য, শৃংখলা, একাগ্রতা এমনি সব বিষয়ের ওপরও নির্ভর করে।

অবশ্যই আল্লাহ মানুষের চলার পথ বা ধর্মের বিষয়ে তথা সকল বিষয়ে মানুষের মতপার্থক্য দুর করার সক্ষমতা রাখেন। কিন্তু এটি তাঁর ইচ্ছে নয় যে তিনি সেটি বলপূর্বক করবেন। তাই তিনি সত্য বার্তাসহ বার্তাবাহক প্রেরণ করেন। কিন্তু উপদেশ গ্রহণ করা বা বর্জন করার স্বাধীনতাও মানুষকে দেয়া হয়েছে। অতঃপর সকলকেই একদিন তাঁর সম্মুখে উপস্থিত হতে হবে। আয়াতে আল্লাহ জানাচ্ছেন যে, বস্তুত সকল ক্ষমতা তাঁর কাছে। তাঁর বিশালত্ব সম্পর্কে ধারণা তুলে ধরা হয়েছে। অতএব বোধসম্পন্ন মানুষ যথাজ্ঞানে তাঁর কাছেই নিজেদেরকে সমর্পন করবে।

➢ (আয়াত ২৫৬-২৫৭) এ অংশে ধর্ম বা দ্বীন (Religion) এবং বিশ্বাসী ও অবিশ্বাসদের (Believer and Disbeliever) বিষয়ে বলা হয়েছে।

২৫৬	ধর্ম বা দ্বীন এর বিষয়ে কোন জবরদস্তী নেই। নিঃসন্দেহে সঠিক দিক-নির্দেশনা ভূল পথ থেকে সুস্পষ্ট/পৃথক হয়ে গেছে। যারা মিথ্যে প্রতিমূর্তী/তাগুদ পরিত্যাগ করেছে এবং আল্লাহতে বিশ্বাস স্থাপন করেছে, তারা সুদৃঢ়ভাবে তা ধারণ করেছে যা ভাঙ্গবার নয়। আল্লাহ সব

	শোনেন, জানেন। (There is no compulsion in religion. The right direction is henceforth distinct from error. And he who rejecteth false deities and believeth in Allah hath grasped a firm handhold which will never break. Allah is Hearer, Knower.)
২৫৭	যারা বিশ্বাসী আল্লাহ তাদের রক্ষাকর্তা/অভিভাবক। তিনি তাদেরকে অন্ধকার থেকে আলোর পথে নিয়ে আসেন। আর যারা অবিশ্বাস করে তাদের অভিভাবক হচ্ছে মিথ্যে প্রতিমূর্তী/তাগুদ। তারা তাদের আলো থেকে অন্ধকারের দিকে নিয়ে যায়। এরাই হল আগুনের প্রকৃত অধিকারী। তারা সেখানেই বসবাস করবে। (Allah is the Protecting Guardian of those who believe. He bringeth them out of darkness into light. As for those who disbelieve, their patrons are false deities. They bring them out of light into darkness. Such are rightful owners of the Fire. They will abide therein.)

■ **২.২৫৬.১** ধর্ম বা দ্বীন এর বিষয়ে কোন জবরদস্তী নেই : জবরদস্তী করে ধর্মে দীক্ষিত করা বা কোন ধর্মে অন্তর্ভূক্ত করা, এমনকি ধর্মের যে কোন বিষয়ে জোর-জবরদস্তী করা অনুচিত। এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক-নির্দেশনা।

ধর্মের কাজ শান্তি স্থাপন করা, অরাজকতা সৃষ্টি করা নয়। একটি দল, সংগঠন বা সম্প্রদায়ে বিভিন্ন রকমের সদস্য থাকে। সবাই সবকিছু একইভাবে বোঝে না। কেউ সরাসরি শাব্দিক অর্থ বোঝে। কেউ অন্তর্নিহিতি অর্থ বোঝে। কেউ গায়ের জোরে সবকিছু প্রতিষ্ঠা করতে চায়, কেউ পরিবেশ-পরিস্থিতি বুঝে পদক্ষেপ নেয়। ফলে অনুসারীদের ভূল কাজ করার মাধ্যমে কোনরূপ অরাজকতা সৃষ্টি করার সম্ভাবনাকে এ দিক-নির্দেশনার মাধ্যমে প্রথমেই তিরোহিত করে দেয়া হয়েছে।

মানুষ তার নিজের মত, পথ ও দর্শনের প্রচার-প্রচারণা করার অধিকার রাখে। পছন্দ হলে কেউ সেটি গ্রহণ করবে, পছন্দ না হলে গ্রহণ করবে না। আল্লাহ প্রত্যেক মানুষকে সে স্বাধীনতা দিয়েছেন। নিজ বিবেচনায় প্রত্যেকেই

কোনকিছু গ্রহণ বা বর্জন করতে পারে। সুস্থ্য মস্তিষ্কসম্পন্ন সকল মানুষের জ্ঞানপ্রসূত হৃদয়ের কথা এটি। উপরন্তু এটি কোরআনেরও নির্দেশ। সকল মানুষের এ বার্তা থেকে শিক্ষা নেয়ার আছে।

এ নির্দেশনা কেবল ধর্মের ক্ষেত্রেই নয়। জীবন চলার প্রতিটি ক্ষেত্রের জন্যই এ নির্দেশনা প্রযোজ্য। বস্তুত ধর্ম বা দ্বীনই হচ্ছে জীবন চলার প্রতিটি ক্ষেত্রের জন্য প্রযোজ্য যথাযথ পথ [ধর্ম দ্রষ্টব্য ২.৩.৩]। কোন আদর্শ, কোন দর্শন বা এমনকি কোন ব্যাক্তিগত মতামত কোন ক্ষেত্রেই জবরদস্তী কাম্যও নয়; গ্রহণযোগ্যও নয়। এটি একটি সার্বজনীন ও শাশ্বত বাণী।

জন্মগত কারণে অনেকে একটি দর্শনের আওতার মধ্যে পড়ে যায়। জীবনে একবার যে জন্মগত কারণে কোন একটি দর্শনের অন্তর্ভূক্ত হয়ে যায় তার সাথে তার দৈহিক, মানসিক, আত্মিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক নানান বিষয় সম্পৃক্ত হয়ে যায়। পূর্বসূরীদের স্মৃতি, উত্তরসূরীদের নানান কর্মকান্ড জড়িয়ে থাকে। যদি সেটি ভূলও হয় তবুও জবরদস্তী বা সহজেই এক বিশ্বাস থেকে আরেক বিশ্বাসে চলে আসা যায় না। এসব ক্ষেত্রে আবেগ কাজ করে। ধর্ম বিষয়টি অন্তরের সাথে সম্পর্কিত বিষয়। অন্তরের সাঁয় ভিন্ন ধর্ম বা চলার পথে কার্যকরী কোন পদক্ষেপ গ্রহণ করা সম্ভব হয় না।

অন্তরের সাঁয় আবার জ্ঞানের সাথে সম্পর্কিত বিষয়। ফলে ধর্মের বিষয়ে মানুষকে নানানভাবে বোঝাবার চেষ্টা করা যেতে পারে, সম্পর্ক গড়ে তোলার মাধ্যমে নিজের পথে আহবান করা যেতে পারে কিন্তু বল প্রয়োগ অনুচিত ও অকার্যকর।

সত্য হচ্ছে, মানুষ নিজে যতক্ষণ কোন বিষয় না বোঝে বা না বুঝতে চায়, ততক্ষণ তাকে বোঝান যায় না। বুঝটা নিজের ভেতর থেকে আসতে হবে। কারও মস্তিষ্কে নিউটনের দ্বিতীয় সূত্র না ঢুকলে বল প্রয়োগ করে সেটি ঢোকান সম্ভব নয়। চেষ্টার মাধ্যমে নিজেকেই কোন না কোনভাবে বিষয়টি জেনে-বুঝে এর ভেতরে প্রবেশ করতে হবে। কিংবা তাকে বোঝাবার চেষ্টা করা যেতে পারে। তবেই সে আপনা থেকে সে পথে চলবে। জোর-জবরদস্তী নয়; মানুষের ভেতরে যথাযথ জ্ঞান প্রবেশ করিয়েই তাকে দ্বীনের বা চলার সঠিক পথে আনতে হবে। মানুষকে আহবানের এটিই যথাযথ পথ। বলা হচ্ছে,

"তোমার পালনকর্তার পথে মানুষকে আহবান কর জ্ঞানের মাধ্যমে এবং যুক্তিসম্মত উপায়ে ও উত্তম পন্থায়।" (আল-কোরআন ১৬:১২৫)

'ধর্মের বিষয়ে কোন জোর জবরদস্তী নেই' এ বাণীতে বস্তুত সত্যের ওপর জোর দেয়া হয়েছে। অর্থাৎ দর্শনের বিষয়গুলি নিজ থেকে বুঝতে হবে। এটিই হচ্ছে সত্য। ভাল-মন্দ চিনতে হবে নিজেকেই। ন্যায়-অন্যায় বুঝতে হবে নিজেকেই। ব্যাক্তিকেই অন্তর্নিহিত বিষয় বুঝে পথে আসতে হবে বা এসে বুঝতে হবে অর্থাৎ বোঝার অন্তর নিয়ে আসতে হবে। জোর করে মানুষকে কোন কিছু বোঝান সম্ভব না। এ আয়াত সে সত্যকে সমুন্নত করেছে। যারা এর ব্যাত্যয় করতে চাইবে তারা ভূল পথে আছে। তেমন কাজ করা থেকে সত্যিকার বিশ্বাসীদেরকে বিরতও থাকতে হবে। এটিও দিক-নির্দেশনা। বলা হচ্ছে,

"যদি তোমার পালনকর্তা চাইতেন তবে পৃথিবীর বুকে যারা আছে তাদের সবাই একসঙ্গে বিশ্বাস স্থাপন করত। তুমি কি (মোহাম্মদ) যতক্ষণ না তারা নিজেরা বিশ্বাস স্থাপন করছে তাদের বিশ্বাস করাবার জন্য বাধ্য করবে?" (আল-কোরআন ১০:৯৯)

তবে সত্যের বার্তা মানুষের দুয়ারে পৌঁছে দিতে হবে। সেটি না করা বরং কর্তব্য অবহেলা বা পালন না করা হিসেবে বিবেচিত হতে পারে।

ইসলামের আবির্ভাবকালে ধর্মের বাণীর প্রচার-প্রচারণা করতে গিয়ে মুসলমানদেরকে নানামুখী বাধার মুখোমুখী হতে হয়েছে। মহানবী (সাঃ) মক্কায় যে দর্শন বা ধর্ম প্রচার করছিলেন সেখানে কোন জবরদস্তী ছিল না। তিনি তার দর্শন বা মাতামত ব্যাক্ত করেছেন। কারও ইচ্ছে বা পছন্দ হলে সে সেটি গ্রহণ করবে নয়ত নয়। কিন্তু মক্কার অবিশ্বাসী কুরাইশরা তাঁর পথে বাধা হয়ে দাড়ায়।

তারা অত্যাচার শুরু করে। মহানবীকে তাঁর সহচর ও অনুসারীদেরসহ দেশ থেকে বিতাড়িত করে। তাদেরকে আক্রমন করে। নবীকে হত্যা করার চেষ্টা করে। সেখান থেকেই মূলত বিরোধীতার সূত্রপাত ঘটে।

অন্যায়কে প্রতিরোধ করতে গিয়েই যুদ্ধ-বিগ্রহ, বিশ্বাসী-অবিশ্বাসী বিভাজন সৃষ্টি হয়েছে। কোরআনের দর্শনে অবিশ্বাসীরা বস্তুত এখানেই সত্য, সঠিক ও

ন্যায় পথ থেকে বিচ্যুত হয়েছে। ভূল করেছে। অন্যায়ের সূত্রপাত করেছে। তাদের ভূলের কারণেই এত সাংঘর্ষিক ইতিহাসের সৃষ্টি হয়েছে।

ধর্মের বিষয়ে ইসলাম কখনই জবরদস্তী করেনি। বরং প্রথম থেকেই জবরদস্তীর স্বীকার হয়েছে। সেটি স্পষ্ট করার জন্যই কথাগুলি এখানে তুলে ধরতে হয়েছে। অন্যথায় কিছু মানুষের ভূল প্রচারণা এ বিষয়ে মানুষকে বিভ্রান্ত করতে পারে।

উল্লেখ্য যে, এখন থেকে প্রায় দেড় হাজার বছর পূর্বে আরবের তৎকালীন আর্থ-সামাজিক, সাংস্কৃতিক পরিবেশ ও পরিস্থিতি বিবেচনায় নেয়া নানাবিধ নিয়ম-রীতি, বিধি-বিধানসমূহকে কিছু মানুষ বর্তমান সময়েও জগতের সর্বত্র একইভাবে চাপিয়ে দেয়ার চেষ্টা করে। কোন প্রেক্ষিতে কেন একটি বিষয়ে সে সময়ে এমন দিক-নির্দেশনা দেয়া হয়েছে সেটিকেও তারা বিবেচনায় নেয় না। সে অবস্থাটি বর্তমানেও কোথাও বিদ্যমান আছে কিনা সেটিও বিবেচনা করে না। সমাজ-সংস্কৃতির পার্থক্যগুলিকেও বিবেচনায় নেয় না। মনে রাখতে হবে যে এটিও একটি ভূল বা জবরদস্তীমূলক কাজ।

কোরআন এমন শিক্ষা দেয়নি। কোন বিষয়টি শাশ্বত ও সার্বজনীন এবং কোন বিষয়ে পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে সামঞ্জস্য বিধান করে সিদ্ধান্ত নিতে হবে এ বিষয়ের বোদ্ধাদেরকে সে বিষয়গুলিও যথাযথভাবে বুঝতে হবে। বিষয়টি কোরআনের দিক-নির্দেশনার সঙ্গে কোনভাবেই সাংঘর্ষিক নয়। মানুষকে জ্ঞান ও বোধের এ পর্যায়ে আসতে হবে। অন্যথায় কিছু মানুষের কর্মদোষে কোরআন তার সার্বজনীন গ্রহণযোগ্যতা হারাতে থাকবে।

কোরআন যে সময়ে যে সকল সিদ্ধান্ত নিয়েছে বা পথ-নির্দেশনা দিয়েছে তা সে সময়ের উপযোগী করে শ্রেষ্ঠ পথটিকে দেখিয়েছে। এখনও অনেক বিষয়ে বর্তমান সময়ের প্রেক্ষিতে শ্রেষ্ঠ সিদ্ধান্ত নিতে হবে। কোরআন শিক্ষা দিয়েছে স্থান-কাল-পাত্র বিবেচনা করে শ্রেষ্ঠ সিদ্ধান্তটি নিতে। কোরআনে তেমন অনেক দৃষ্টান্ত উপস্থাপিত হয়েছে। জবরদস্তী কোন কিছু বলবৎ করা বা রাখাও জবরদস্তীই।

ধর্মের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় ও সত্য হচ্ছে পথ-নির্দেশনা বা দর্শনের যথার্থতা, সঠিকতা, ন্যায্যতা, ন্যায়-পরায়নতা, সততা, সত্যতার বিষয়গুলি।

কিন্তু বাস্তবে দেখা যায় যে সাধারণ মানুষ ধর্মের বিষয়ে ওপরোক্ত বিষয়গুলি নিয়ে খুব বেশী আগ্রহ প্রদর্শন করে না। তাই গীতায় এভাবে বলা হয়েছে যে,

"বেদবাক্যে অনুরক্ত স্বল্প জ্ঞানের কিছু মানুষ স্বর্গসুখ ভোগ, জন্মরূপ কর্মফল, ভোগৈশ্বর্য্য প্রাপ্তির উপায়স্বরূপ বিবিধি ক্রিয়াকলাপ এই সমস্ত শ্রুতি সুখকর বচনে অধিক আসক্ত। তারা মনে করে এর অধিক আর কিছু নাই।" (গীতা ২:৪২)

ধর্ম বিষয়ে স্বল্প জ্ঞানের মানুষের দৃষ্টিভঙ্গী এমনই। তারা কিছু ব্যাকরণ বা রীতি-নীতি অনুসরণ করে স্বর্গে যেতে চায়। জগতেও সম্পদশালী হতে চায়। সে অর্থেই তারা ধর্মকে বুঝে থাকে। তাদের ভেতরে আল্লাহ বা সত্যের চেয়েও কোন সুবিধা প্রাপ্তির লোভ কাজ করে বেশী।

বিশেষভাবে উল্লেখ্য যে, অনেকে আবার বাস্তব জীবনে সত্য ও ন্যায়ের প্রতিষ্ঠা ও এর প্রয়োজনীয়তা বা গুরুত্বকে যথাযথভাবে অনুধাবনও করে না। ধর্ম, দ্বীন বা চলার পথ যে এ বিষয়গুলির সাথেই অধিক সম্পর্কিত সেটিও বোঝে না। আবার অনেকে এসব বিষয় নিয়ে ভাববার খুব একটা প্রয়োজনও বোধ করে না। জীবন যেভাবে চলছে সেভাবেই চালিয়ে নিয়ে যাচ্ছে।

অপরদিকে কিছু মানুষ যারা সুখী অবস্থায় আছে তারা এসব বিষয় নিয়ে কোন ঝামেলায় জড়াতে চায় না। তারা নিজেদের জীবনকে একভাবে সাঁজিয়ে নিয়েছে। নির্ঝঞ্ঝাট থাকতে চায়।

ধর্মের নামে তাই সত্য ও ন্যায় বলে কোনকিছু হঠাৎ চাপিয়ে দেয়ার চেষ্টা করা হলে সেটিও সমাজকে অশান্ত করে তোলে। তাই জোর-জবরদস্তীর নয়? ধৈর্য্য ও বুদ্ধিসম্মত উপায়ে, কৌশলে মানুষকে ন্যায়ের পথে, সত্যের পথে, ধর্মের পথে আহবান করতে হবে। সেভাবে জগতের সিষ্টেমকে গড়ে তুলতে হবে। এমনই দিক-নির্দেশনা।

▪ **২.২৫৬.২** নিঃসন্দেহে সঠিক দিক-নির্দেশনা ভূল পথ থেকে সুস্পষ্ট/পৃথক হয়ে গেছে : ধর্ম বা দ্বীন হচ্ছে জীবন চলার সঠিক পথ। আল্লাহ সে পথ সম্পর্কে মানবজাতীকে সুস্পষ্ট ধারণা দিয়েছেন। সে লক্ষ্যে তিনি পথ-নির্দেশনা আল-কোরআন প্রেরণ করেছেন। কোরআনে সত্য-মিথ্যা, ভূল-শুদ্ধ, ন্যায়-অন্যায়,

ভাল-মন্দকে পৃথক করে চিহ্নিত করে দিয়েছেন। ফলে সঠিক দিক-নির্দেশনা ভূল পথ থেকে সুস্পষ্ট ও পৃথক হয়ে গেছে।

সঠিক পথ হচ্ছে আল্লাহতে বিশ্বাস স্থাপন করা, তাঁর নির্দেশনা মেনে চলা এবং অপর কোথাও নয় কেবল তাঁর কাছেই প্রার্থনা বা যাঞ্চা করা। তাঁরই দ্বারস্থ হওয়া।

আয়াতের পরবর্তী লাইনে তাগুদ সম্পর্কে বলা হয়েছে। কিছু মানুষ আল্লাহকে ভূলে গিয়ে তাগুদের আরাধনা করে। তারা আল্লাহর নির্দেশনাকে পাশ কাটিয়ে তাগুদের নির্দেশনাও মেনে চলে। বলা হচ্ছে যে এটি একটি ভ্রান্ত পথ। এর আর্থ-সামাজিক থেকে শুরু করে বহুবিধ কুফল আছে।

এটি মনোজগতকেও দুর্বল ও বিশ্বাসহীন করে তোলে। এটিই হচ্ছে আত্মবিস্মৃত হওয়া। মানুষ তখন আল্লাহকে ভূলে যায়। মানুষ আত্মবিশ্বাসহীন হয়। এতে নিজের ভেতরে নিজে করতে পারার যে বিশ্বাস সেটি নষ্ট হয়। মানুষ তাগুদের ওপর ভরসাকারী হয়। অর্থাৎ নিজের সক্ষমতা হারিয়ে ধীরে ধীরে একটি পরনির্ভরশীল সৃষ্টিতে পরিণত হয়।

কোরআন তাগুদ পরিহার করে আল্লাহকে উপাসনা করার কথা বলে। আল্লাহকে কোথায় পাওয়া যাবে? বলা হচ্ছে,

"... জেনে রেখ, আল্লাহ মানুষ ও তার অন্তরের অন্তর্বর্তী হয়ে থাকেন ..." (আল-কোরআন ৮:২৪)

"... প্রত্যেকের হৃদয়ে পরমেশ্বর উপস্থিত...।" (গীতা ১৮:৬১)

অতএব হৃদয়ে স্থিত আল্লাহকে জাগিয়ে তুলতে হবে। নিজেকে বুঝতে হবে। নিজের সক্ষমতা ও গুণাবলীকে জাগিয়ে তুলে আত্মবিশ্বাস নিয়ে নিজ প্রচেষ্টায় লক্ষ্য অর্জন করতে হবে।

যেহেতু সৃষ্টিকর্তা, বিধাতা বা আল্লাহর কোন রূপ সম্পর্কে কারই জানা নেই, তাই কোরআন নিরাকার আল্লাহর উপাসনা করতে বলে। মিথ্যে রূপের বা কোন তাগুদের পূঁজা বা আরাধনা করতে বারণ করে। বস্তুত এটি হচ্ছে একটি ভূল পথ। তাগুদের পূঁজারীরা আল্লাহরই বিবিধ শক্তির প্রতীকরূপে কল্পনা করে তাগুদের আরাধনা করে। এটি একটি মিথ্যে আচরণ। এটি সত্য বা শুদ্ধ

নয়। তাই বলা হয়েছে যে, কোরআন আগমনের পর ভূল পথ ও সঠিক পথ সুস্পষ্ট ও পৃথকভাবে চিহ্নিত হয়ে গেছে।

▪ **২.২৫৬.৩** যারা মিথ্যে প্রতিমূর্তী/তাগুদ পরিত্যাগ করেছে এবং আল্লাহতে বিশ্বাস স্থাপন করেছে, তারা সুদৃঢ়ভাবে তা ধারণ করেছে যা ভাঙ্গবার নয়। আল্লাহ সব শোনেন, জানেন : তাগুদ হচ্ছে একটি মরণ ছোবল। কিন্তু সাধারণ মানুষ এর ক্ষতিকর দিকটি ভালভাবে বোঝে না। তাই এটি বর্জনের গুরুত্ব যথাযথভাবে অনুধাবন করতে পারে না। কেবল ধর্মই নয়, বাস্তব জীবনেও এর ভীষণ রকমের ক্ষতিকর দিক আছে। আবার ধর্ম বাস্তব জীবন থেকে বিচ্ছিন্নও কিছু নয়।

আল্লাহ অন্যায় কাজ নিষিদ্ধ করেছেন। তাঁর নির্দেশনা বা কোরআনের বাণী মানব সমাজে প্রকাশিত ও বহুল প্রচারিত। সেখানে গোপন কোন বিষয় নেই। কেউ চাইলেও তা সহজেই পরিবর্তন করে ফেলতে পারবে না। বলা হচ্ছে,

"এমন কিছুই নেই যে তাঁর বাণী/নির্দেশনার কোনরূপ পরিবর্তন সাধন করতে পারে।" (আল-কোরআন ৬:১১৫)

আল্লাহর নির্দেশনা মেনে চললে স্বার্থান্বেষী মানুষ তাদের হীন স্বার্থ চরিতার্থ করতে পারে না। ফলে যে কোন প্রকারেই হোক দুষ্টদেরকে বুদ্ধিসম্মতভাবে আল্লাহর নির্দেশনাকে পাশ কাটিয়ে তাদের স্বার্থের অনুকুলে কিছু নিয়ম প্রতিষ্ঠা করে নিতে হয়।

কিন্তু কে তাদের গড়া নিয়ম-বিধি মেনে চলবে? আল্লাহর নির্দেশকে উপেক্ষা করে কেউ তাদের কথা শুনবে না। তাদের প্রতিষ্ঠা করা নিয়মকে গ্রহণও করে নেবে না। অথচ তাদেরকে তাদের স্বার্থ উদ্ধার করতেই হবে। তাহলে উপায়?

উপায় হচ্ছে 'তাগুদ' [তাগুদ দ্রষ্টব্য ২.১৬৬] [শিরক বা অংশীদারী দ্রষ্টব্য ২.২২]। যা কিছু কারও ওপরে আল্লাহর সমপর্যায়ের বা তার চেয়েও অধিক প্রভাব বিস্তার করতে পারে তাই হচ্ছে 'তাগুদ'। আল্লাহর নির্দেশ উপেক্ষা করতে মানুষকে যা কিছু টানে সেগুলি সবই তাগুদের অন্তর্ভূক্ত বিষয়। হতে পারে সেটি কোন দেবতার প্রতিকৃতি বা মূর্তী, কোন ধর্মগুরু, রাজনৈতিক নেতা-নেত্রী, স্ত্রী-পুত্র-কন্যা, আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব, সরকার ব্যাবস্থা, নাচ-গান, নারী, জুয়া, ক্ষমতার অন্ধ লোভ ইত্যাদি সব।

এগুলি তাগুদের অন্তর্ভূক্ত এ কারণে যে, এগুলির সবই মানুষের ওপর প্রভাব রাখতে সক্ষম। তাগুদের কারণে মানুষ তার স্বকীয়তা হারায়। তার আত্মবিশ্বাস নষ্ট হয়। সে নিজেকে বিস্মৃত হয়। মানুষ তাগুদের দাসে পরিণত হয়। তাগুদের ছোবল মারাত্মক।

তাগুদের সৃষ্টিকারীরা তাগুদকে সমাজে অতি উচ্চে উন্নীত করে। এ কাজে তাদের নিজস্ব একটি ক্ষুদ্র সুবিধাভোগী দল থাকে। নিজেদের স্বার্থে সেসবকে তারা অন্তর দিয়ে ধারণ করার কেবল অভিনয় করে। কিন্তু অনুসারীরা এসবের সত্যিকার ভক্ত হয়ে যায়।

তাগুদ যখন মানুষের মনে শক্তিশালী স্থান করে নেয় তখন তাগুদের উছিলায় এমন কিছু নির্দেশনা জারী করা হয়, যা আল্লাহ নির্দেশিত ন্যায় ও সরল পথের নির্দেশনাকেও ছলে-বলে-কৌশলে ভঙ্গ করে বা পাশ কাটিয়ে যায়। তারা তাগুদের নামে নিজেদের স্বার্থের অনুকূলে নানান নিয়ম প্রতিষ্ঠা করে। সে উদ্দেশ্যকে সামনে রেখেই তাগুদের সৃষ্টিকারীরা এসব সৃষ্টি করে। এসবের বিরুদ্ধে কারও কিছু বলার সাহস থাকে না। সমাজ স্তব্ধ হয়ে যায়।

অতি সাধারণ মানুষ ধূর্তদের এসব দুষ্টুমি বুঝতে পারে না। দুষ্টরা এসবের মধ্য দিয়ে ক্ষমতা থেকে শুরু করে অর্থ-সম্পদ সবকিছু অন্যায়ভাবে লুটে নেয়ার পথ করে নেয়। সমাজে বিশাল বৈষম্য সৃষ্টি হয়। আর্থ-সামাজিক অবস্থা বিপন্ন হয়। বাস্তবেই এর মন্দ প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। তাগুদের প্রতি ভক্তি, ভালবাসা ও ভয় সৃষ্টি করে শোষক তাগুদের দাসকে শোষন করে। প্রকৃতপক্ষে মানুষ তাগুদের নয়, পেছনের কারিগর তাগুদ সৃষ্টিকারীদের দাসে পরিণত হয়।

তাগুদের অনুসারীরা বাস্তব জীবনে তাগুদ সৃষ্টিকারীদের দাস হয়ে তাদের নির্দেশনায় চলে। মানুষ তখন ভক্তি-উপাসনা করে তাদেরই নিজ হাতে গড়ে তোলা কোন প্রতীককে। ছবির কোন দেবতা তূল্য নেতা বা নেত্রীকে। আল্লাহকে ভূলে যায়। অজ্ঞতা থেকে কিংবা তাগুদের প্রতি অন্ধ হয়ে আল্লাহ নির্দেশিত সত্য, ন্যায় ও যৌক্তিকতার পথও মানুষ ভূলে যায় বা উপেক্ষা করে।

সমাজ সত্য ও ন্যায়ের পথ ছেড়ে তাগুদের নিয়মে বা তাগুদ সৃষ্টিকারীদের সৃষ্টিকরা নিয়মে চলে। এসব নিয়ম একসময় সামাজিক কু প্রথা বা কুসংস্কারে পরিণত হয়। সামাজিক কু প্রথার মধ্য দিয়ে মানুষ ভূল পথে চলতে থাকে।

সমাজ সঠিক পথ থেকে বিচ্যুত হয়। অতঃপর মানবসমাজ প্রজন্ম থেকে প্রজন্ম একটা কুসংস্কারাচ্ছন্ন প্রথার দাস হয়ে যায়। অন্ধকারে পতিত হয়।

যুগের পর যুগ চেষ্টা-সাধনা করেও মানুষ এই মরণ ছোবল থেকে মুক্তি পায় না। কেবল সতীদাহ প্রথাকে বিবেচনা করলেই এ বিষয়ে নিঠুর সত্যকে উপলব্ধি করা সহজ হয়ে যায়। আরবেও তেমন অবস্থা ছিল। তারা কন্যা সন্তানদেরকে জীবিত কবর দিত। তাই বলা হয়েছে,

"তারা ক্ষতিগ্রস্ত যারা নির্জ্ঞানতাবশতঃ নিজ সন্তানদের হত্যা করেছে।" (আর-কোরআন ৬:১৪০)

এগুলি কু-সংস্কার, ভূল পথ, ভূল ধারণা থেকে সৃষ্ট! আজকের আধুনিক সময়েও এসব ভ্রান্ত রীতিকে সমাজ থেকে দুর করা সম্ভব হয়ে উঠছে না। অথচ কখনও না কখনও মানুষই এসব রীতি সৃষ্টি করেছে নিজেদের হীন উদ্দেশ্য চরিতার্থ করার জন্য। আল্লাহ এমন নির্দেশনা দেননি। আল্লাহ মানুষকে ভাল পথে চলার নির্দেশনা দিয়েছেন এবং মন্দ কাজ করতে নিষেধ করেন। বলা হচ্ছে,

"নিশ্চয়ই! আল্লাহ ন্যায়পরায়ণতা, সদয়তা এবং আত্মীয়-স্বজনকে দান করার নির্দেশ দেন এবং তিনি অশ্লীলতা, ঘৃণিতকাজ এবং দুষ্ট প্রকৃতির কাজ নিষিদ্ধ করেন।" (আল-কোরআন ১৬:৯০)

আল্লাহ নিজে দিক-নির্দেশনা দিয়েছেন এক, অথচ মানুষ তাগুদের পেছনে তাঁর নামকে ব্যাবহার করেই করছে আরেক কাজ। পৃথিবীর নানান প্রান্তে এমনিভাবে মানুষ নানানভাবে জীবন চলার ভূল পথ অবলম্বন করে চলেছে।

আল্লাহর নির্দেশনাকে তাই প্রকাশ্যে প্রচার করতে বলা হয়েছে। যেন জগতের সকল মানুষ সত্য ও সঠিক পথ সম্পর্কে জানতে পারে। কেউ কাউকে ভূল পথে চালনা করতে না পারে। তাই আল্লাহ বলেন,

"হে বার্তাবাহক! তোমার প্রতিপালকের পক্ষ থেকে তোমার প্রতি যা অবতীর্ণ হয়েছে, তা সকলকে জানিয়ে দাও। আর যদি তুমি তা না কর তবে জেন যে, তুমি তাঁর বার্তা পৌঁছালে না। আল্লাহ তোমাকে মানুষের নিকট থেকে রক্ষা করবেন।" (আল-কোরআন ৫:৬৭)

জীবনের ঝুঁকি নিয়ে মহামানবেরা স্বার্থান্বেষী মানুষদের সৃষ্টি করা এমন সব ভূল পথকে সমাজ থেকে উৎপাটন করার জন্য কাজ করে গেছেন। তারা সমাজ থেকে কু-প্রথা বিলুপ্ত করতে মানুষকে উজ্জীবিত করে গেছেন। সত্য ও সঠিক বাণী প্রচার করে গেছেন। যুগে যুগে তাই মহামানবদের আবির্ভাব ঘটে আল্লাহর ইচ্ছেতে। যেমন গীতায় বলা হয়েছে,

“.. যখন এবং যেখানে ধর্মের (দ্বীনের) অবনতি ঘটে এবং অধর্মের অভ্যুত্থান হয়- সে সময়ে আমি নিজেকে প্রকাশ করে অবতরণ করি। শিষ্টের রক্ষা ও দুষ্টের দমন এবং একইসাথে ধর্মের (দ্বীনের) রীতি-নীতির পুনঃ স্থাপনে, আমি যুগে যুগে আবির্ভূত হই।” (গীতা ৪:৭-৮)

যে সময়কালে বাইবেল-কোরআন অবতীর্ণ হয়েছে সে সময়েও মহামানবদের আগমনের পেছনে নিয়মের এমনসব বেড়াজালকে ছিন্ন করার কথা বলা হয়েছে। যার যাঁতাকল থেকে সাধারণ মানুষের বেড়িয়ে আসার কোন উপায় ছিল না। অবতীর্ণ গ্রন্থ এবং মহামানবদের আগমনও ঘটেছে এসব কারণে। যেমন বলা হয়েছে,

“(জেসাস বলে- আমি এসেছি) ... যেন আমি তোমাদের জন্য আইনসিদ্ধ করে দেই সে সব বস্তু যা তোমাদের জন্য নিষিদ্ধ ছিল।” (আল-কোরআন ৩:৫০)

আবার বলা হয়েছে, “.. বার্তাবাহক (মোহাম্মদ) ... সে তাদের নির্দেশ দেবে সঠিক কাজের এবং বারণ করবে যা মন্দ তা। সে তাদের জন্য যাবতীয় ভাল বস্তু বিধি-সম্মত ঘোষনা করবে এবং নিষিদ্ধ করবে শুধুমাত্র মন্দ বস্তুসমূহ এবং যে তাদের ওপর অর্পিত বোঝা থেকে তাদেরকে অব্যাহতি দেবে এবং শৃংখল অপসারণ করবে যা তাদের ওপর বিদ্যমান ছিল।” (আল-কোরআন ৭:১৫৭)

সবকালেই ক্ষমতাশালী স্বার্থান্বেষী মহল তাগুদকে সামনে রেখে অনেক নিয়ম প্রতিষ্ঠা করে। তাগুদের উছিলায় তারা অনেক ভাল কিছুকে অবৈধ এবং মন্দ বিষয়কে বৈধ করে নেয়। তারা আল্লাহর নিয়মে নয়, বরং তাদের নিজেদের প্রতিষ্ঠা করা নিয়মের বিষয়ে অনড় থাকে। সাধারণ মানুষ নিয়মের যাঁতাকলে পড়ে যায়। নানান কুসংস্কার ও সামাজিক নিয়মের দ্বারা সাধারণ মানুষ

যেভাবে বাধা পড়ে যায়, নিয়মের এসব বোঝা থেকে মহামানবগণ মানুষকে মুক্তি দিতে আসেন। আল্লাহ এভাবেই মানুষকে অন্ধকার থেকে আলোর পথে নিয়ে আসেন। ওপরের বাণীগুলি সে প্রসঙ্গে উদ্ধৃত হয়েছে।

আল্লাহর সুস্পষ্ট নির্দেশনা বা বিধি-নিষেধ থাকা সত্বেও মানুষ কেন তাগুদের পেছনে ছোটে? গীতায় বলা হয়েছে,

"ইহজগতে যারা কর্ম থেকে ফল লাভ কামনা করে তারা দেব-দেবীর আরাধনা করে। মনুষ্যলোকে এভাবে কর্মজনিত ফল দ্রুতই লাভ হয়।" (গীতা ৪:১২)

ইহজগতে যারা তাৎক্ষণিক সবকিছু পেতে চায় তারা নেতা-নেত্রী, দেব-দেবীর আরাধনা করে এবং দ্রুত কিছু পেয়েও যায়। তাদেরকে পরজীবনের জন্য অপেক্ষা করতে হয় না। তাই তারা দেব-দেবী, নেতা-নেত্রী এমনসব পূঁজনীয়দের বা তাগুদের দ্বারস্থ হয়। তাই বলা হয়েছে,

"যাদের মন বস্তুগত কিছু প্রাপ্তির প্রত্যাশায় বিচ্যুত, তারা ... প্রাপ্তির প্রত্যাশা থেকে ... বিবিধ দেব-দেবতার ভজনা-উপাসনা করে। ... ... তেমন বিশ্বাসে থেকে ভক্ত দেব-দেবীর আনুকূল্য কামনা করে এবং তার প্রত্যাশিত বিষয় বা বস্তু লাভ করে।

কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এই সকল সুবিধা, অনুগ্রহ বা কাম্য বস্তু আমি একাই প্রদান করি। স্বল্প জ্ঞানের মানুষ দেব-দেবীদের উপাসনা করে।" (গীতা ৭:২০-২৩)

আল্লাহর সুস্পষ্ট বিধি-নিষেধ থাকা সত্বেও মানুষ ভূল কাজ করে। পেছনে কাজ করে লোভ বা পাওয়ার তীব্র বাসনা।

জ্ঞান ও বোধসম্পন্ন মানুষ যারা তেমন ভূল পথ পরিত্যাগ করতে পেরেছে, মিথ্যে প্রতিমূর্তী/তাগুদ পরিত্যাগ করেছে এবং আল্লাহতে বিশ্বাস স্থাপন করেছে, বলা হচ্ছে তারা সুদৃঢ়ভাবে তা ধারণ করেছে যা ভাঙ্গবার নয়। কেননা জবরদস্তীতে কাউকে এক পথ থেকে আরেক পথে সত্যিকারভাবে আনা যায় না। জ্ঞানত বুঝতে পারলেই কেবল মানুষ সত্যের পথ আকড়ে ধরতে পারে।

অতএব যারা মিথ্যে প্রতিমূর্তী বা কোন তাগুদকে পরিহার করে আল্লাহতে বিশ্বাস স্থাপন করেছে, তারা যৌক্তিকভাবে বুঝেই তা ধারণ করেছে। আর

জ্ঞান যখন মানুষকে কোন কিছু বোঝাতে সক্ষম হয়, বোধসম্পন্ন মানুষ তখন সেটিকে শক্তভাবেই ধারণ করে। সেটি বিচ্ছিন্ন হওয়ার মতো নয়। আয়াতে সে কথা জোর দিয়ে বলা হয়েছে।

যারা সত্যিকার অর্থে শক্তভাবে আল্লাহ তথা সত্যের পথ ধারণ করেছে, বলা হচ্ছে আল্লাহ তাদেরকে চেনেন, জানেন। আল্লাহ সত্যিকার বিশ্বাসীদেরকে জানেন। তাদের কর্ম ও আচরণই কথা বলে। আল্লাহর এ নিশ্চিতকরণ বিশ্বাসীদের অন্তরকে আরও দৃঢ়তা দান করে। এসব বাণী সত্যিকার বিশ্বাসীদের জন্য প্রেরণার উৎস হয়ে কাজ করে।

▪ **২.২৫৭.১** যারা বিশ্বাসী আল্লাহ তাদের রক্ষাকর্তা/অভিভাবক। তিনি তাদেরকে অন্ধকার থেকে আলোর পথে নিয়ে আসেন। আর যারা অবিশ্বাস করে তাদের অভিভাবক হচ্ছে মিথ্যে প্রতিমূর্তী/তাগুদ। তারা তাদের আলো থেকে অন্ধকারের দিকে নিয়ে যায়। এরাই হল আগুনের প্রকৃত অধিকারী। তারা সেখানেই বসবাস করবে : তাগুদ হচ্ছে একটা মরণ ছোবল যা দীর্ঘকাল একটা সমাজকে কু-সংস্কারের অভিশাপে আবদ্ধ করে অন্ধকারে নিমজ্জিত করে রাখে। তাগুদের সৃষ্টি করা নিয়ম-বিধি সমাজ ও মানবজাতিকে ধীরে ধীরে অজ্ঞতা ও মূর্খতার অন্ধকারে নিয়ে যায়। এগুলি নিষ্পেষনের হাতিয়ার হয়ে কাজ করে। মানুষকে আত্মবিশ্বাসহীন করে দেয়। মানুষ নিজ জ্ঞান ও বিশ্বাসে চলার যোগ্যতা হারিয়ে ফেলে [ধর্ম দ্রষ্টব্য ২.৩.৩] [শিরক বা অংশীদারী দ্রষ্টব্য ২.২২]।

ধর্মের দু'টি দিক আছে। একটি হচ্ছে তার আধ্যাত্মিক বা পারলৌকিক দিকের বিষয় এবং অপরটি হচ্ছে জীবনের সাথে সম্পর্কিত বিষয়। তাগুদ, শিরক শব্দগুলিকে কেবল ধর্মের সাথেই সম্পর্কিত বিষয় বলে মনে করার কারণ নেই। জীবনের সাথেই এদের ঘনিষ্ট সম্পর্ক আছে। বস্তুত ধর্ম জীবন থেকে পৃথক কিছু নয়। জীবন চলার সঠিক সূত্র বা পথই হচ্ছে ধর্ম। যা ইহকাল ও পরকাল উভয় ক্ষেত্রেই সফলতার সাথে মানুষকে লক্ষ্যে পৌঁছে দেয়, যদি মানুষ সে পথ যথাযথতার সাথে অনুসরণ করে চলে।

তাগুদ, শিরক বিষয়গুলি বাস্তব জীবনের ভাল-মন্দের সাথেও সম্পর্কিত (দ্রষ্টব্য ২.২৫৭.১)। কিন্তু কিছু মানুষ ধর্মকে এক প্রকার গ্রামার বা ব্যাকরণে

পরিণত করে ফেলেছে। ব্যাকরণ মেনে চললেই যেন নিশ্চিতভাবে স্বর্গ লাভ হবে। যেমনটি এক সময় ইহুদি-খ্রীষ্টানরাও করেছিল। যার সমালোচনা কোরআনেও করা হয়েছে।

কোরআনের দর্শনের নির্দেশনা, এর মর্মবাণী ও এর সঠিক বিশ্লেষণকে তাই যথাযথ জ্ঞানে জানতে ও বুঝতে হবে। কেবল 'বিশেষণে' জর্জরিত ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ বা ব্যাকরণ বইয়ের মতো 'শব্দের বুৎপত্তিগত অর্থ' দিয়ে সেটি বোঝা সম্ভব হবে না। বরং এভাবে কোরআনের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করা হলে প্রকৃত সত্য আড়াল হয়ে যায়। মানুষ তখন শুদ্ধ উচ্চারণ করে কিন্তু অন্যায় কাজও করে। বাস্তব জীবনে কোরআনের বাণীর প্রয়োগের প্রয়োজনীয়তা থেকে চিন্তা ও দৃষ্টি বিচ্যুত হয়ে যায়। কোরআন কোন বিজ্ঞান বই নয়। এটি হচ্ছে জীবন চলার পথের সঠিক দিক-নির্দেশনামূলক গ্রন্থ (Guidance)।

যথার্থভাবে কোরআনকে জানতে ও বুঝতে হলে তাই বাস্তবতার নিরিখে, যুগের সমান্তরাল জ্ঞানে জ্ঞানান্বিত হয়ে কোরআনের সঠিক বিচার-বিশ্লেষণ করে এর মর্মবাণী বুঝতে হবে। নিজের কিংবা নিজেদের দলগত বা গোষ্ঠীগত স্বার্থ উদ্ধারের চিন্তাকে পরিহার করতে হবে। জগতের সকল মানুষের মঙ্গলের ভাবনা মস্তিষ্কে ধারণ করতে হবে।

ধর্মকে নির্দিষ্ট নিয়ম পালনের ব্যাকরণে পরিণত করার মধ্যে সীমাবদ্ধ করে ফেলার কারণে সমাজে আজ এত এত অনাচার-দুরাচার। ধর্ম পালনকারীরা ব্যাকরণ অনুসরণ করে স্বর্গে যাবার বাসনা পোষন করছে। অথচ সমাজে গরীব-দুঃখী-দুস্থ মানুষ আছে। আছে ভিক্ষুকের অনাহারী জীবনের গল্প, আছে হিজরাদের সমস্যা, আছে বেশ্যাবৃত্তির সমস্যা, আছে দুর্বলের ওপর সবলের অত্যাচার ... ইত্যাদি।

এসব সমস্যার সমাধানের দিকে বর্তমান সময়ে না ধর্মের না তথাকথিত ধর্মীয় ব্যাক্তিবর্গের নজর আছে? কিন্তু অসহায় মানুষকে ঘৃণা করার মনোবৃত্তি পূর্ণমাত্রায় অটুট আছে।

বাস্তব জীবনেও তাগুদের মন্দ দিক বিষয়ে ইতিপূর্বে আলোচনা করা হয়েছে। বলা হচ্ছে, যারা তাগুদ সৃষ্টিকারীদের কর্মকান্ড থেকে বের হয়ে এসে কোরআনের দর্শনে বিশ্বাস রেখেছে আল্লাহ তাদেরকে সে অজ্ঞতা, মূর্খতা ও কুসংস্কারের অন্ধকারে নিমজ্জিত হওয়ার হাত থেকে রক্ষা করেছেন। শোষন,

নিপীড়নের যন্ত্রনার শিকার হওয়ার হাত থেকে রক্ষা করেছেন। তারা ভূল নিয়ম বা মিথ্যে পরিত্যাগ করে সত্যের পথকে ধারণ করেছে। যা সমাজকেও তাগুদের বিষাক্ত ছোবল থেকে রক্ষা করে।

চতুর লোকেরা মানুষকে ঠকাবার নানান ফন্দি আঁটবেই। তারা তাদের নিয়মে চলে। কিন্তু মানুষের নিজেদেরকেই নিজেদের ভাল বুঝতে হবে।

আল্লাহ সত্য বার্তা প্রেরণ করেছেন। সকল মানুষকে তাগুদের সমুহ বিপদ সম্পর্কে সতর্ক ও অবহিত করেছেন। তিনি মানুষকে এর মরণ ছোবল থেকে রক্ষা করতে চান। অন্ধকার থেকে আলোর পথে নিয়ে আসতে চান। যেমন গীতায় বলা হয়েছে,

“যারা নিয়ত ভক্ত .. তাদেরকে আমি জ্ঞান-বুদ্ধি দান করি .. তাদের প্রতি দয়া পরবশ হয়ে, তাদের হৃদয়ে বসবাস করে জ্ঞানের আলো দ্বারা আমি তাদের অজ্ঞতার অন্ধকার দূর করি।” (গীতা ১০:১০-১১)

যারা বিশ্বাসী তারাই বিধাতার দেয়া বিধান বা পথ অনুসরণ করে। ফলে তারা তাগুদের মন্দ ছোবল থেকে নিজেদেরকে রক্ষা করতে পারে। তাই বলা হয়েছে যে, আল্লাহ বিশ্বাসীদের অভিভাবক বা রক্ষাকর্তা। তিনিই সত্য পথ প্রদর্শন করেন। বস্তুত তিনি সকলকেই রক্ষা করার জন্য দিক-নির্দেশনা প্রেরণ করেছেন। তিনি সকলেরই অভিভাবক বা রক্ষাকর্তা। কিন্তু যারা অবিশ্বাস করে তারা তাঁর পথ অনুসরণ করে না। তারা তাগুদের পথ অনুসরণ করে। তারা নিজ দোষেই বিপদে পতিত হয়। তাগুদ তাদেরকে আলো থেকে অন্ধকারের দিকে নিয়ে যায়। ইতিপূর্বে সে বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

সতর্ক বার্তা প্রেরণের পরেও নিজেদের বোকামির কারণে যারা ভূল পথে চলবে ও ভূল কাজ করবে এবং যাদের কারণে মানবসমাজ বিপদাপন্ন হবে তাদেরকে তার দায় নিতে হবে। আল্লাহর কাছে জবাবদিহি হতে হবে এবং কর্মের ফল কখনও ইহকালে ও পরকালেও ভোগ করতে হবে।

মানুষকে তাই গড্ডালিকায় গা ভাসালে চলবে না। বিচার-বিবেচনা করে সঠিক পথ বেছে নিতে হবে। অর্থ-সম্পদ অর্জনের ক্ষেত্রে আমরা যেমন জ্ঞান-বুদ্ধি ও শ্রম দিয়ে থাকি, তেমন শ্রম ও বুদ্ধি-জ্ঞান দিয়ে চলার সঠিক পথটিকেও খুঁজে নিতে হবে। ভাল কিছু অর্জন করা খুব সহজ কাজ নয়।

পৃথিবীতে আগমনের পর এটিও মানুষের অন্যতম একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ। বাকীগুলি সহায়ক। অন্যথায় স্বল্পকালীন জীবনের এই ভোগ-বিলাস কি-ই বা মূল্য বহন করে। সঠিক পথে চলে সৃষ্টিকে সুরক্ষা দিতে হবে।

নিজ জ্ঞানে যে ভূল ও মন্দ পথ থেকে নিজেকে রক্ষা করে যথাযথ পথে চলতে পারবে, কিংবা ভূল পথ থেকে ফিরে আসতে পারবে সেক্ষেত্রে নিশ্চয়ই! আল্লাহ ক্ষমাশীল!

কুসংস্কারাচ্ছন্ন একটি ভূল পথ থেকে বেরিয়ে আসা মোটেও সহজ কাজ নয়। যারা ভূলের মধ্যে ইতিমধ্যেই জড়িয়ে আছে তাদের মধ্যেও কিছু মানুষ জ্ঞানত নিজেদের পালন করা ভূলগুলি বুঝতে পারে। কিন্তু পারিবারিক ও সামাজিক কারণে পালনকৃত চিরাচারিত রীতি-নীতি থেকে বেরিয়ে আসতে পারে না। এসব ক্ষেত্রে মানসিক প্রতিবন্ধকতাও কাজ করে। ফলে যদিও অনেকেই অন্তরে সত্যকে উপলব্ধি করতে পারে তথাপি একটি বৈপ্লবিক পরিবর্তন ভিন্ন স্বাভাবিক পরিস্থিতিতে চিরাচারিত রীতি বা অভ্যস্ততা পরিত্যাগ করে ভিন্ন অরেকটি রীতিতে চলে আসা খুব সহজেই সম্ভব হয় না। তেমন ক্ষেত্রে ভূল অভ্যস্ততা থেকে বেরিয়ে আসতে হলে নিজের ভেতরে মিথ্যে ও অসত্যের বিরুদ্ধে প্রচন্ড বিদ্রোহী মনোভাবের প্রয়োজন হয়। তবে যথাযথ জ্ঞানে বিষয়গুলির অন্তর্নিহিত অর্থ বুঝতে না পারলেও সেটি করা সম্ভব হয় না। তেমন মনোভাব আল্লাহ ভিন্ন কেউ সৃষ্টিও করে দিতে পারে না। এ অবস্থায় কারও সহযোগীতার প্রয়োজন হয়। মানুষের জন্য সহযোগীতা প্রাপ্তির তেমন মাধ্যম হচ্ছে আসমানী কিতাব 'আল-কোরআন'।

কোরআন তাগুদের মন্দ দিক সম্পর্কে মানুষকে সচেতন করে তোলে। তাগুদের পেছনে ছুটতে বারণ করে। লোভে আত্মাহুতি দিতে না করে। ধৈর্য্যের সাথে আল্লাহর কাছে যাঞ্চা করতে বলে। না চাইতেই তিনি যেমন জীবন দান করেছেন, তেমনি জীবনের সকল উপকরণও তিনিই সরবরাহ করেন ও করছেন। সেক্ষেত্রে ন্যায্যতার সাথে নিজেদের প্রাপ্তির পথে প্রতিবন্ধকতাগুলিকে দুর করার উপায় অবলম্বন করতে হবে। সত্য ও ন্যায় পথে থেকেই তা অর্জন করে নিতে হবে। তবুও লোভে পড়ে তাগুদের কাছে নিজেকে সমর্পন করা বাঞ্চনীয় নয়। এমন কাজ করতে নিষেধ করা হয়েছে। কোরআন পাঠ করলে বিষয়গুলি সম্পর্কে যথাযথভাবে জানা সম্ভব হয়।

কোরআনের জ্ঞান মানুষকে অজ্ঞতা ও কলুষতার জঞ্জাল থেকে মুক্ত করে নিয়ে আসে। মানুষকে অন্ধকার থেকে আলোর পথে নিয়ে আসে। সমুহ বিপদের হাত থেকে আল্লাহ এভাবে সঠিক জ্ঞান দান করে মানুষকে রক্ষা করেন। আল্লাহ সকল মানুষকেই রক্ষা করতে উন্মুখ। কিন্তু যারা বিশ্বাসী কিছু ব্যাতিক্রম ব্যাতিত অবশেষে তারাই রক্ষা পায়। তাই বলা হয়, আল্লাহই বিশ্বাসীদের অভিভাবক বা রক্ষাকর্তা। তিনি তাদেরকে অন্ধকার থেকে বের করে আলোর পথে নিয়ে আসেন।

কোরআন অজ্ঞতা ও কুসংস্কার থেকে বের হয়ে আসতে মানুষের মধ্যে চিন্তার উন্মেষ ঘটায়। যুক্তির ভিত্তি দাঁড় করিয়ে দেয়। নীতিগত ও আইনগত সহায়তা হয়েও কাজ করে। প্রেরণা হয়ে কাজ করে। সর্বপরি পেছনে থাকে সত্য ও ন্যায় পথের নির্দেশনা এবং ধারণায় আল্লাহর উপস্থিতি।

কোরআন ভূল বা কোন অন্যায়ের ক্ষেত্রে প্রতিবাদ করার একটি উপায় ও সমর্থন হয়েও কাজ করে। তাই সকল দিক বিবেচনায় আল্লাহ বিশ্বাসী তথা সত্য ও সঠিক পথের অনুসারীদের জন্য রক্ষাকর্তা হয়ে দাড়িয়ে যান।

কোরআন মানুষকে অজ্ঞতা ও কুসংস্কারের অন্ধকার থেকে আলোর দিক প্রদর্শন করে। আলো-আধার এখানে সত্য-মিথ্যের প্রতিনিধিত্ব করে। অপরদিকে যারা অবিশ্বাস করে তাদের অভিভাবক হচ্ছে মিথ্যে মূর্তী বা তাগুদ। তারা মানুষকে আলো থেকে অন্ধকারের দিকে নিয়ে যায়।

তাগুদের পূজাঁরীরা নিজেরাও জানে যে তারা মিথ্যে কিছু একটার পূঁজা বা আরাধনা করছে। কেননা কোন মূর্তী, কোন ছবি বা নেতা-নেত্রী, দেব-দেবী কোন কিছুই না তাদের স্রষ্টা, না তাদের লালন-পালনকর্তা। তারা নিজেদের কল্পনা থেকে নিজ হাতে এগুলিকে মহিমাময় করে গড়ে তোলে। এগুলি তাদের স্রষ্টা নয়, বরং তারাই এগুলির স্রষ্টা।

তাগুদের নামে বা উছিলায় ক্ষমতাধর যে কেউ যখন-তখন কোন বিষয়ে নির্দেশনা জারী করে দিতে পারে। সে পথে সমাজের মানুষকে চলতে বাধ্য করতে পারে। কিন্তু আল্লাহর নামে তেমনটি করা কখনই সম্ভব নয়। কেননা আল্লাহর নির্দেশনা সুস্পষ্ট ও প্রকাশিত। সকলেই জানে। সেখানে কোন মন্দ ও অন্যায় নির্দেশনা নেই। কুসংস্কারের কোন অবকাশ নেই।

যারা প্রতীকী কোন কিছু বা তাগুদের আরাধনা করে বলে মনে করা হয়, বস্তুত তারা তাগুদেরও আরাধনা করে না। পরোক্ষে তারা আরাধনা করে ধূর্ত কিছু ‘মানুষের’ যারা আল্লাহর অনুমোদনবিহীন নানান সব জটিল নিয়মের প্রবর্তনকারী। এসব করে তারা নিজেদের স্বার্থ হাসিল করে। বলা হচ্ছে, এরাই হল আগুনের প্রকৃত অধিকারী। তারা সেখানেই বসবাস করবে। অর্থাৎ তাদের স্থান হবে নরক। কেন তাদের স্থান নরকে হবে বলে বলা হচ্ছে?

তাদের সৃষ্টি করা অন্ধকার নিয়ম বা সূত্র মানুষকে দিয়ে ভূল ও অন্যায় কাজ করায়। ভূল করলে মানুষকে ভূলের মাশুল গুণতে হয়। সেখানেই যন্ত্রনা। ভূল করলে মানুষকে যন্ত্রনার আগুনে পুড়তে হয়।

সমাজে ভূল-পথগামী ও স্বার্থান্বেষী লোভী মানুষদের কারণে সত্যকে পরিপূর্ণরূপে প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব হয় না। ভূল বা নিজেদের মূর্খতা বা বোকামীর শাস্তি তাই সূত্রের কারণেই পতিত হয়। মানুষের মুক্তির জন্য যখন কোন বার্তা আগমন করে তখন হিংসে-বিদ্বেষ বা অহমিকা নয়, তার ভাল-মন্দ সৎ অন্তরে যাচাই করে নিতে হয়। তা না হলে সেটি উদাসীনতার দোষে দুষ্ট হয়। ইচ্ছেকৃত উদাসীনতার জন্যও পরিণতি ভোগ করতে হতে পারে।

সবকিছুই সূত্র বা নিয়ম মেনে চলে। কোরআন কেবল আল্লাহর নিয়ম, সূত্র বা সত্যটি মানবসমাজে তুলে ধরেছে মানুষেরই মঙ্গলের জন্য। যেন মানুষ ভূল না করে, ভূল পথে না চলে। বস্তুত সকল জ্ঞান ও সাধারণ সূত্র মানবসমাজে প্রেরণ করে আল্লাহই মানুষকে সমুহ বিপদ থেকে রক্ষা করেন। তাই আল্লাহই বিশ্বাসীদের রক্ষাকর্তা। অর্থাৎ যারা তার পথ-নির্দেশনা অনুসরণ করে তারাই বিপদ থেকে রক্ষা পায়। কথাটি সে অর্থেও বলা হয়েছে।

আল্লাহ নানানভাবে মানুষকে রক্ষা করেন। মানুষ সব বুঝতে পারে না। তাই কিছু কিছু বিষয় অলৌকিকও মনে হয়ে থাকে। আল্লাহ চিত্তকে অশান্ত করে দিতে পারেন। মানুষকে বিপদে ফেলে দিতে পারেন। আবার চিত্তকে শান্ত করে দিয়ে রক্ষাও করতে পারেন। উপলব্ধিবোধের মাধ্যমে জ্ঞানকে সমৃদ্ধ করে দিয়ে চিত্তকে শান্ত করে দিতে পারেন। আবার নির্জ্ঞানতার কারণে অশান্ত চিত্তকে ভূল পথে নিয়ে যেতে পারেন। এসবই মানুষকে শিক্ষা দেয়ার জন্য। এভাবে শিক্ষা দিয়েও তিনি রক্ষা করেন। আল্লাহই বিপদে ফেলেন আবার তিনিই রক্ষা করেন।

তাই বলা হয়, “তিনিই হাসান তিনিই কাঁদান” (আল-কোরআন ৫৩:৪৩)। অর্থাৎ আল্লাহ একাই মানুষের ভাল-মন্দের নিয়ন্ত্রক।

সঠিক আচরণকারীকে তিনি রক্ষা করেন নানানভাবে। যার কিছু উদাহরণ এখানে উল্লেখ করা হয়েছে মাত্র। ভূল আচরণকারীকে বিপদে ফেলেন সঠিক পথে ফিরে আসার জন্য। বস্তুত যাই তিনি করেন মানুষের মঙ্গলের জন্য করেন। এভাবেই তিনি সকলকে সঠিক পথে ফিরিয়ে আনেন, রক্ষা করেন এবং সঠিক পথে চালনা করেন।

■ আল্লাহর অবাধ্যতা ও তাগুদ : মানুষ তিনভাবে আল্লাহর প্রতি তাদের বিদ্রোহী আচরণের প্রকাশ ঘটায়। এগুলি হচ্ছে যেমন,

১) ফাসিক (অবাধ্য): যে আল্লাহকে স্বীকার করে কিন্তু বাস্তবে তাঁর নির্দেশনা মেনে চলে না।

২) কাফির (অবিশ্বাসী): যে আল্লাহ থেকে নিজেকে স্বাধীন করে নেয় এবং অন্য কোন কিছুর প্রতি কৃতজ্ঞচিত্ত হয় এবং

৩) তাগুদ: সাধারণ অর্থে ‘তাগুদ’ বলতে তেমন সবকিছুকে বোঝায় যা সীমালংঘন করে। বিশেষত আল্লাহ নির্ধারিত সীমা লংঘন করে। অর্থাৎ আল্লাহর প্রতি বিদ্রোহী আচরণের সৃষ্টিকারী যে বা যা কিছু আল্লাহরই বান্দাদেরকে যে কোন প্রকারে তার নিজের বশ্যতা স্বীকার করে নিতে মানসিকভাবে বা ভ্রান্ত ধারণা বা জ্ঞানে বাধ্য করে ফেলে তাই ‘তাগুদ’।

তাগুদ বিভিন্ন প্রকারের হতে পারে যা মানুষকে তার দাসে পরিণত করে নেয়। যেমন হতে পারে শয়তান যে নানাভাবে মানুষকে আকর্ষন করে বা তার ভেতরে উত্তেজনার সৃষ্টি করে ও ভূল পথে চালনা করে।

এমনকি মানুষ নিজেও ‘তাগুদ’ হতে পারে যখন নানা প্রকারের লোভ তাকে আকর্ষন করে এবং মন্দ পথে চালিত করে।

আরও অনেক কিছুই তাগুদের অন্তর্ভূক্ত হতে পারে যেমন স্ত্রী-পুত্র-কন্যা, আত্মীয়-স্বজন, পরিবার-পরিজন ও গোষ্ঠী, বন্ধু-বান্ধব, জাতী, কোন ধর্মযাজক, কোন রাজনৈতিক নেতা, কিংবা রাষ্ট্র প্রধান এমনকি রাষ্ট্র বা প্রতীকী কোন মূর্তী ইত্যাদি।

সবকিছুই তাগুদের অন্তর্ভূক্ত হতে পারে যখন সেটি তার নিজের ইচ্ছে ও আকাংখা পুরণার্থে অপর কাউকে তার ইচ্ছের দাসে পরিণত করে ফেলে। তাগুদ তার মানসিক দাসের সম্পূর্ণ জীবনকে ক্ষয় করে দেয় তার নিজের আকাশচুম্বি ইচ্ছে, আকাংখা ও লোভ-লালসাকে তার মাধ্যমে পুরণার্থে। তাই তাগুদকে অস্বীকার না করা পর্যন্ত কেউই কখনও সত্যিকার অর্থে বিশ্বাসী হতে পারে না। কেননা তাগুদ মানুষকে আল্লাহর পথ থেকে বিচ্যূত করে দেয়।

➢ (আয়াত ২৫৮-২৬০) এ অংশে বিশ্বাস-অবিশ্বাস (Believe-Disbelieve) এবং আলো ও অন্ধকারের পথ সম্পর্কিত উদাহরণ তুলে ধরা হয়েছে।

২৫৮	তুমি কি দেখনি তাকে, যে পালনকর্তার বিষয়ে ইব্রাহীমের সাথে এ কারণে বাদানুবাদ করেছিল যে আল্লাহ তাকে কর্তৃত্ব দান করেছিলেন (নমরূদ) এবং যখন ইব্রাহীম বলল, 'আমার পালনকর্তা হলেন তিনি, যিনি জীবন দান করেন এবং মৃত্যু ঘটান।' সে বলল, 'আমিও জীবন দান করি এবং মৃত্যু ঘটিয়ে থাকি।' ইব্রাহীম বলল, 'নিশ্চয়ই! তিনি সূর্য্যকে উদিত করেন পূর্ব দিক থেকে, এবার তুমি তাকে পশ্চিম দিক থেকে উদিত কর।' তখন সে অবিশ্বাসী বিমর্ষ হয়ে গেল। আল্লাহ সীমালংঘনকারীদের পথ প্রদর্শন করেন না। (Bethink thee not of him who had an argument with Abraham about his Lord, because Allah had given him the kingdom; how, when Abraham said: My Lord is He Who giveth life and causeth death, he answered: I give life and cause death. Abraham said: Lo! Allah causeth the sun to rise in the East, so do thou cause it to come up from the West. Thus was the disbeliever abashed. And Allah guideth not wrongdoing folk.)
২৫৯	অথবা তুমি কি তাকে দেখনি, যে এমন এক জনপদ দিয়ে যাচ্ছিল যা ধ্বংসস্তপে পরিণত হয়েছিল? সে বলল, 'কেমন করে আল্লাহ এ নগরকে তার মৃত্যুর পর জীবিত করবেন?' আল্লাহ তাকে মৃত অবস্থায় রাখলেন একশ বছর। অতঃপর তাকে পুনর্জীবিত করলেন। তিনি বললেন,

	‘কতকাল তুমি এভাবে ছিলে?’ সে (লোকটি) বলল, ‘আমি ছিলাম একদিন কিংবা একদিনের কিছু অংশ।’ তিনি বললেন, ‘তা নয়; বরং তুমি তো এক’শ বছর ছিলে। চেয়ে দেখ তোমার খাবার ও পানীয়ের দিকে– সেগুলি অবিকৃত রয়েছে এবং দেখ তোমার গাধাটির দিকে! তোমাকে আমি মানবজাতির জন্য এক দৃষ্টান্তস্বরূপ করতে চাই। অস্থিগুলির দিকে লক্ষ্য কর– কিরূপে আমি এগুলিকে একটির সাথে অপরটিকে জুড়ে দেই, অতঃপর মাংসের আবরণ দিয়ে ঢেকে দেই।’ বিষয়টি যখন তার কাছে পরিস্কার হল তখন সে বলল, ‘এখন আমি বুঝতে পারছি আল্লাহ সব কিছুই করতে সক্ষম।’ (Or (bethink thee of) the like of him who, passing by a township which had fallen into utter ruin, exclaimed: How shall Allah give this township life after its death? And Allah made him die a hundred years, then brought him back to life. He said: How long hast thou tarried? (The man) said: I have tarried a day or part of a day. (He) said: Nay, but thou hast tarried for a hundred years. Just look at thy food and drink which have not rotted! Look at thine ass! And, that We may make thee a token unto mankind, look at the bones, how We adjust them and then cover them with flesh! And when (the matter) became clear unto him, he said: I know now that Allah is Able to do all things.)
২৬০	যখন ইব্রাহীম বলল: হে আমার পালনকর্তা! আমাকে দেখাও কেমন করে তুমি মৃতকে জীবিত কর। তিনি বললেন: তুমি কি বিশ্বাস কর না? ইব্রাহীম বলল: অবশ্যই বিশ্বাস করি, তবে আমি এজন্য দেখতে চাই যেন আমার অন্তর প্রশান্তি লাভ করে। তিনি বললেন: চারটি পাখী নাও। সেগুলিকে নিজের বশীভূত করে নাও, সেগুলির একেকটি অংশকে বিভিন্ন পাহাড়ের ওপর ছড়িয়ে দাও। অতঃপর সেগুলিকে ডাক। তারা তোমার নিকট দ্রুততার সঙ্গে চলে আসবে। জেনে রেখ, আল্লাহ

	পরাক্রমশালী, অতি জ্ঞানসম্পন্ন। (And when Abraham said (unto his Lord): My Lord! Show me how Thou givest life to the dead, He said: Dost thou not believe? Abraham said: Yea, but (I ask) in order that my heart may be at ease. (His Lord) said: Take four of the birds and cause them to incline unto thee, then place a part of them on each hill, then call them, they will come to thee in haste, and know that Allah is Mighty, Wise.)

■ **২.২৫৮.১** তুমি কি দেখনি তাকে, যে পালনকর্তার বিষয়ে ইব্রাহীমের সাথে .. বাদানুবাদ করেছিল ... তখন সে অবিশ্বাসী বিমর্ষ হয়ে গেল : পূর্বের আয়াতে ধর্মের সঠিক পথ সম্পর্কে বলা হয়েছে। বলা হয়েছে আল্লাহ বিশ্বাসীদেরকে অন্ধকার থেকে আলোর পথে নিয়ে আসেন। অথচ মিথ্যে প্রতিমূর্তী বা তাগূদ মানুষকে আলো থেকে অন্ধকারের দিকে নিয়ে যায় এবং যারা বিশ্বাসী আল্লাহ স্বয়ং তাদের রক্ষাকর্তা।

এখানে ইব্রাহীম (আঃ) এর ঘটনা বাস্তব উদাহরণ হিসেবে তুলে ধরা হয়েছে। আল্লাহতে বিশ্বাসের কারণে তাঁকে কিভাবে শাস্তি দেয়া হয়েছিল, কিন্তু আল্লাহ তাঁকে রক্ষা করেছেন। আল্লাহই বিশ্বাসীদের রক্ষাকর্তা। এটি তারই একটি উদাহরণ।

উল্লেখ্য যে, ইব্রাহীম (আঃ) এর পিতা ইরাকের সে সময়ের হর্তাকর্তা ‘নমরূদ’ এর প্রিয়ভাজন ও তার সভাসদের উচ্ছ পর্যায়ের কর্মকর্তা ছিল। তারা ছিল মূর্তী পূঁজারী। কিন্তু ইব্রাহীম (আঃ) ধীরে ধীরে আল্লাহর একত্বের ধারণায় উপনীত হন (দ্রষ্টব্য আল-কোরআন ৬:৭৪-৮২)। তিনি কাউকেই আল্লাহর সমকক্ষ গণ্য করেন না। মূর্তী পূঁজার ঘোর বিরোধী হয়ে ওঠেন। তিনি তার দর্শনের প্রচার করতে শুরু করেন।

ক্ষিপ্ত হয়ে তিনি মন্দিরে পূঁজার জন্য রক্ষিত কিছু মূর্তী ভেঙ্গে ফেলেন। তাকে বিচারের জন্য নমরূদের সামনে উপস্থিত করা হয়। সেসময় ‘নমরূদ’ এর সঙ্গে তার যে কথোপকথন বা বাদানুবাদ হয় তারই কিছু অংশ আয়াতে তুলে ধরা হয়েছে।

নমরূদ তাঁকে শাস্তিস্বরূপ অগ্নিতে নিক্ষেপ করে। কিন্তু মহান আল্লাহ তাঁর কুদরতে ইব্রাহীম (আঃ)-কে রক্ষা করেন। সত্য ও সঠিক পথের অনুসারী বা বিশ্বাসীদের জন্য আল্লাহই রক্ষাকর্তা এ ঘটনার মধ্য দিয়ে সে বিষয়টি তুলে ধরা হয়েছে। নমরূদের ঘটনাটি এখানে উদ্ধৃত হওয়ার আরও কিছু কারণ আছে। যেমন-

প্রথমত: মানব ইতিহাসের বেশকিছু গুরুত্বপূর্ণ দিক একটি ধারাবাহিকতা বজায় রেখে কোরআন মানুষের সামনে তুলে এনেছে। বাইবেলে উদ্ধৃত বিষয়াবলী থেকে শুরু করে তৎকালীন বা তারও পূর্বের অনেক ঘটনা কোরআনে বিবৃত হয়েছে। ইতিহাসের অনেক দিক সম্পর্কে মানুষ কোরআন থেকে ইংগিত বা ধারণা পায় যা ইতিহাস হিসেবে আজও স্বীকৃত নয়। কোরআনে উদ্ধৃত হওয়ার কারণে ঐতিহাসিক ঘটনাসমুহ মানবসমাজে বহুলভাবে প্রচারিত হয়েছে। মানুষ বিষয়গুলি জানতে পেরেছে। যা পরবর্তী অনুসন্ধান কার্যক্রমের জন্য পথ প্রদর্শক হয়ে থাকবে।

দ্বিতীয়ত: আল্লাহর একত্বের ধারণা প্রতিষ্ঠা করতে গিয়ে মানব ইতিহাসে যেসকল গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা সংঘটিত হয়েছে কোরআনে ধারাবাহিকভাবে সেসবও উদ্ধৃত হয়েছে। বিভিন্ন নবী-রাসূলদের জীবন সংগ্রামের কথা উদ্ধৃত হয়েছে। একটি সত্য, যথাযথ ও যৌক্তিক ধারণাকে প্রতিষ্ঠা করতে গিয়ে মানুষকে কি প্রকারে কষ্ট ও নির্যাতন সহ্য করতে হয়েছে কোরআনের মাধ্যমে মানুষ বিষয়গুলি অবহিত হয়েছে। পরবর্তী প্রজন্মের জন্য এসব উদাহরণ প্রেরণার উৎস হয়ে থেকে যাবে!

কেবল স্বার্থের কারণেই নয়, একটি সত্য ও ন্যায়সম্মত ধারণা বা দর্শন যা মানবসমাজ ও জীবনকে বিকশিত করে তা প্রতিষ্ঠায় মানুষ কিভাবে ঝুঁকি নিতে পারে, আল্লাহর কারণে মানুষ কিভাবে নিজের জীবনকেও বিসর্জন দেয় এগুলি তার উদাহরণ। মানুষকে মহৎ কাজে উজ্জীবিত করে।

তৃতীয়ত: কোরআন যে দর্শন প্রতিষ্ঠা করেছে সেখানে আল্লাহর একত্বের ধারণাকে যথাযথ ও সত্য বলে প্রচার করেছে। আল্লাহকে বিশ্বাসীদের রক্ষাকর্তা বলা হয়েছে। যে গ্রন্থ এত ইতিহাস তুলে ধরেছে এবং একটি পূর্ণাঙ্গ জীবন দর্শন মানবজাতির সামনে উপস্থাপন করেছে সে কি তার বক্তব্যের যথার্থতা প্রতিষ্ঠায়

যারা জেহাদ বা সংগ্রাম করেছে এবং সফল হয়েছে সেসব বাস্তব উদাহরণ তুলে ধরবে না? এখানেও তাই করা হয়েছে।

আল্লাহই নমরুদকে নমরুদরূপে প্রতিষ্ঠা করেছেন। তাকে তার পর্যায়ে নিয়ে এসেছেন। কিন্তু তার ভেতরে সে উপলব্ধিবোধ নেই। কিংবা থাকলেও তার যথাযথ প্রকাশ নেই। যেখান থেকে সাধারণ মানুষ সত্য ও সঠিক আচরণ শিখতে ও জানতে পারবে এবং তার অনুসরণ করবে। ক্ষমতার দম্ভে আল্লাহকে বিস্মৃত হয়ে নিজেকে সে স্বাধীন, সার্বভৌম ও সর্বশক্তিমান মনে করছে।

ভাবছে চাইলেই সে কারও জীবন নিয়ে নিতে পারে। অতএব সে মানুষের মৃত্যু ঘটাতে পারে। কিন্তু সে কারও জীবন নিয়ে নিচ্ছে না, সে অর্থে সে জীবনও দান করছে। আবার পিতৃত্বের বিবেচনায়ও সে জীবন দান করছে। অতএব সে মানুষের মৃত্যু ঘটাতে পারে আবার জীবনও দান করতে পারে। যা আল্লাহ করেন। এখানে জীবন-মৃত্যু প্রসংগটি আলোচিত হয়েছে মানুষের সক্ষমতার সর্বোচ্চ পর্যায়কে বিবেচনায় নিয়ে। এর মাধ্যমে সে নিজেকে আল্লাহর সক্ষমতার সমকক্ষ বোঝাতে চেয়েছে। আল্লাহ যা করেন সেও তা করতে পারে। তাই এভাবে বলা হয়েছে যে, 'আমিও জীবন দান করি এবং মৃত্যু ঘটিয়ে থাকি।'

অতঃপর যখন সূর্য্যকে পশ্চিম দিক থেকে উদিত করার প্রসঙ্গটি এল তখন নমরুদ কোন উত্তর দিতে পারল না। অর্থাৎ তখন তার নিজের দম্ভ প্রকাশের মাঝেও দ্বিধা-দ্বন্দ্ব বা সংকোচের ভাব চলে এল। তাৎক্ষণিক অনুভব করল বা তার মনে পড়ে গেল যে সে-ই সর্বেসর্বা নয়। সকল ক্ষমতা তার নয়। আরও কিছু বা কেউ আছে যাকে 'আল্লাহ' নামে অভিহিত করা হয় এবং ইব্রাহীম (আঃ) যাকে তাঁর একমাত্র হর্তাকর্তা বলে স্বীকার করে। ঘটনাটিকে নিম্নরূপে বিশ্লেষণ করা যেতে পারে।

- পার্থিব জীবনে আল্লাহ যাকে তাঁর সার্বভৌম ক্ষমতা দান করেন, তার অধীনস্ত বা অনুসারী বা তার আওতাভূক্ত মানুষকে পথ প্রদর্শন করার তার একটি ক্ষমতা ও অধিকার প্রতিষ্ঠা পায়। জাগতিক বা তার সীমানার আওতায় সকল কিছুর ওপর তার একচ্ছত্র সার্বভৌমত্ব থাকে বলেও মনে করা হয়। ফলে

তেমন ক্ষমতাধরের প্রত্যাশা ও দাবীও থাকে যে সর্বসাধারণ তার নির্দেশনা মেনে চলবে।

অতীতে রাজকীয় পরিবারগুলি সার্বভৌম ক্ষমতা প্রাপ্তির বিষয়টিকে বিধাতা প্রদত্ত বলে মনে করত। তারা নিজেদেরকে বিধাতার উত্তরাধিকাররূপে প্রচার করত। পুরোহিতরা সে ধারণাকে সমর্থন দিয়ে শক্তিশালী করত। অতঃপর পরিকল্পিতভাবে নিজেদের স্বার্থও চরিতার্থ করত।

উল্লেখিত ঘটনায়, নমরুদ আল্লাহকে অস্বীকার করেছে বিষয়টি তেমন নাও হতে পারে। যা কোন মুশরিকরাই করে না। মুশরিকরা আল্লাহকে সকল দেবতাদের দেবতা বা গড বা কর্তারূপে স্বীকৃতি দেয়। মুশরিকরা দেবতাদেরকে অতিপ্রাকৃত ও সার্বভৌম এভাবে বিভাজন করে দেখে। অতিপ্রাকৃত গড বা প্রধান দেবতা হচ্ছে সেই কারণ যা একটি কার্য সৃষ্টি করে। তারা তাদের যে কোন প্রকার চাহিদা ও বিপদাপদে তাঁর স্মরণাপন্ন হয়। সেটি হচ্ছে শেষ ভরসাস্থল।

কিন্তু তারা আল্লাহর পাশাপাশি অন্যান্য দেবতাদেরও উপাসনা করে। অজ্ঞতাবশত তারা চন্দ্র, সূর্য্য, তারকা, জ্বিন, ফেরেশতা বা কৃত্রিমভাবে সৃষ্ট কোন দেবতাদের সেই মূখ্য গডের বিভিন্ন গুণ ও কর্মের অংশীদাররূপে বিবেচনা করে এবং তাদেরও পূঁজা-অর্চনা করে। তাদের নামে মন্দিরে কোন কিছু উৎসর্গ কিংবা দান করে। গডের বিবিধ শক্তির ধারক-বাহকরূপে তারা তাদের কাছে প্রার্থনা করে ও উক্ত দেবতার আওতাধীন বিষয়, বস্তু বা গুণাগুণ যাচ্ঞা করে। মুসলমানেরা তেমন কাজ করেনা। তারা কেবলমাত্র এক আল্লাহর উপাসনা করে। তার কাছেই যাঞ্চা করে।

অতিপ্রাকৃত গড বা যাকে 'দেবতাদের দেবতা' বলা হয় মুশরিকরা তার থেকে জাগতিক সার্বভৌম ক্ষমতার হর্তাকর্তাকে পৃথক করে দেখে। তারা মনে করে আল্লাহর সার্বভৌম ক্ষমতার পার্থিব অধিকারী বা প্রতিনিধি তেমন একজন বা রাজা-মহারাজারাও তার আওতাধীন সর্বসাধারণের জন্য চলার পথ নির্দেশ করার অধিকার রাখে এবং প্রত্যাশাও করে যে তারা তার নির্দেশনা মেনে চলবে।

পার্থিব সকল কর্মকান্ডের ওপর তার একচ্ছত্র ক্ষমতা থাকে; সকল ক্ষমতার উৎস অতি প্রাকৃত গড বা দেবতা বা আল্লাহ থেকে সেই ক্ষমতা রাজকীয়

পরিবারগুলির ওপর অর্পিত বলে মনে করা হয়, কিংবা কোন যাজক বা ধর্মগুরু বা কোন পথ প্রদর্শক বা সমাজের বয়োজেষ্ঠদের ওপর সেই সার্বভৌম ক্ষমতা তারা আরোপ করে।

এভাবে তারা গড বা অতি প্রাকৃত দেবতা বা আল্লাহ থেকে পার্থিব সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী গড বা দেবতাকে পৃথক করে দেখে। সে কারণেই রাজ পরিবারগুলি এতকাল নিজেদেরকে দেবতাতূল্য দাবী করে এসেছে এবং তারা নিজেদেরকে তেমনটি মনেও করেছে। তাদের দাবীকে জোরাল করার জন্য তারা নিজেদেরকে গডের উত্তরসূরীরূপে দাবী করেছে। ধর্ম যাজকেরা এসব ধারণাকে সমর্থন দিয়ে আরও শক্তিশালী করেছে। উভয়ে মিলে তাদের মিথ্যে, ভূল বা দুষ্ট পরিকল্পনায় দেবতা সেঁজে বসেছে। অতঃপর জাগতিক সকল সুবিধা চরমভাবে ভোগ করেছে। কখনও জীবন-মৃত্যু নিয়ে নৃশংস খেলায়েও মেতেছে।

উদ্ধৃত ঘটনায় নমরূদও নিজেকে ইরাক ও তার অধিবাসীদের ওপর সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী বলে মনে করে এবং দাবী করে। সে যা নির্দেশ করবে সেটিই আইন ও পালনীয়। তার উর্ধ্বে এ জগতে বা তার আওতাভূক্ত এলাকায় কেউ নেই যে তাকে জবাবদিহিতায় আনতে পারে। ফলে সেখানের কোন অধিবাসী তাকে ক্ষমতার একমাত্র অধিকারী মনে না করা বিদ্রোহের সামিল। তৎকালীন সমাজে এমন ধারণা প্রচলিত ও বিদ্যমান ছিল।

ইব্রাহীম (আঃ) এক আল্লাহ ভিন্ন কাউকেই লালন-পালন ও হর্তাকর্তা মনে করেন না। এটিই ছিল এ ঘটনায় ইব্রাহীম (আঃ) এর ত্রুটি। অন্তত নমরূদ ও তার সাঙ্গপাঙ্গদের দৃষ্টিতে। এমনকি প্রচলিত ধারণার বিপরীতেও। এখানেই নমরূদের সাথে ইব্রাহীম (আঃ) এর বিরোধীতার সূত্রপাত।

ইব্রাহীম (আঃ) এর নীতি প্রচলিত ধর্ম ও শাসকের সার্বভৌম ক্ষমতার ধারণায় সরাসরি আঘাত হানে এবং নমরূদকে বিচলিত করে, যে কিনা নিজেকে ইরাকের একচ্ছত্র ক্ষমতার অধিকারী বলে মনে করে। ইব্রাহীম (আঃ) যে আন্দোলন করে গেছেন এবং মানবজাতিকে যে শিক্ষা দিয়ে গেছেন সে লক্ষ্য আজও পরিপূর্ণভাবে অর্জন করা সম্ভব হয়নি। আজও কোথাও বা কখনও কোন শাসক তেমন অবিবেচকের মতো আচরণ করে। তবে এসব আন্দোলন ও

শিক্ষাই শাসন ব্যাস্থায় ধীরে ধীরে পরিবর্তনের সূচনা করেছে। তাই আমরা আধুনিককালে শাসন ব্যাবস্থা সমুহে অনেক পরিবর্তন দেখতে পাই।

উল্লেখ্য যে, সে সময়ে ইব্রাহীম (আঃ) এর দর্শনের আদ্যোপান্ত বিষয়ে নমরুদ ও অপরাপরদের বা সাধারণের মাঝে তেমন কোন স্বচছ ধারণা ছিল না এবং তেমনটি না থাকারই কথা বা স্বাভাবিক। কেননা ধারণাটি ছিল নতুন। ফলে বিষয়টিকে নমরুদ সরাসরি তার বিরুদ্ধে চ্যালেঞ্জ হিসেবে মনে করেছে। আশেপাশে উত্তেজিত করার পরামর্শদাতারও নিশ্চয়ই অভাব ছিল না। আবার সে যুগটাকেও বিবেচনায় নিতে হবে। ফলে বিষয়টি নমরুদের পক্ষে সহ্য করার মতো ছিল না এবং ইব্রাহীম (আঃ)-কে বিদ্রোহী হিসেবে বিচারের কাঠগড়ায় দাঁড় করান হয়েছে।

ইব্রাহীম (আঃ) যখন বলছিলেন যে আল্লাহ ছাড়া কোন মাবুদ নেই, নমরুদ সেটিকে ঔদ্ধ্যত্যপূর্ণভাবে প্রত্যাখ্যান করছিল। নমরুদ নিজেও জানে যে, সে চন্দ্র-সূর্য্য কিংবা প্রাণের সৃষ্টিকর্তা না এবং সে সেটি দাবীও করে না। কিন্তু সে নিজেকে ইরাক ও তার অধিবাসীদের ওপর একচ্ছত্র ক্ষমতাধর মনে করে। তার দাবী মতে সে যা বলবে তাই ইরাকের আইন ও সকলের পালনীয়। তার ওপরে কেউ নেই এবং কারও কাছে সে জবাবদিহি হতে বাধ্য নয়। ইরাকের কোন অধিবাসী যদি তাকে একমাত্র ভাগ্য বিধাতারুপে স্বীকার করে না নেয়, তবে সে প্রচলিত ধারণায় বিদ্রোহী এবং এটি মনে করাই ছিল তখনকার সময়ে স্বাভাবিক।

এ বিতর্ক তখনই শুরু হয় যখন ইব্রাহীম (আঃ) ঘোষনা করেন যে, আল্লাহ ছাড়া কাউকেই তিনি তার হর্তাকর্তারুপে মনে করেন না। আল্লাহই একমাত্র উপাস্য এবং আর কেউ নয়।

স্বাভাবতই এটি সে সময়ে কেবল তাদের ধর্মীয় বিশ্বাসেই আঘাত হেনেছে তা নয়, এটি শাসকগোষ্ঠীকে বিচলিতও করেছিল। সে দৃষ্টিকোন থেকেই ইব্রাহীম (আঃ) এর এ অপরাধকে সহ্য করা হয়নি এবং তাকে বিদ্রোহী মনে করা হয়েছে এবং বিচার করা হয়েছে।

ইব্রাহীম (আঃ) এর বক্তব্য নমরুদকে বিচলিত করে। উপরন্তু ইব্রাহিম (আঃ) এর ধারণা বা বক্তব্য সত্য হলেও তাকে জনসম্মুখে স্বীকৃতি দিয়ে মেনে নেয়া ছিল নমরুদের জন্য পরাজয় বরণ করার মতো। অন্যভাবে বলা যায়

যে, ইব্রাহিম (আঃ)-কে একচ্ছত্র ক্ষমতা দিয়ে দেয়ার মতো। জনগনের কাছে ইব্রাহীম (আঃ) এর জনপ্রিয়তা ও গ্রহণযোগ্যতা তার উর্ধ্বে উঠে যেত। বিষয়গুলিকে সে সময়কালের প্রেক্ষিতে ভেবে নিয়ে বলা হচ্ছে।

নমরুদের পক্ষে তাই ইব্রাহীম (আঃ) এর বক্তব্যকে গ্রহণ করে নেয়া সম্ভব ছিল না। অথচ সে নতুন দর্শনকে স্বীকার করে নিলে সঠিক, যথাযথ বা সত্যের পথকেই বেছে নিত। কিন্তু তার অন্তর তাকে সত্যের পথে যেতে দেয়নি। সে নিজেকেই সর্বেসর্বা প্রমাণ করতে চেয়েছে। নিজ তাগূদের প্ররোচনায় সে মিথ্যেকে গ্রহণ করেছে এবং সত্যকে অস্বীকার করেছে।

ঘটনার পরে ইব্রাহিম (আঃ)-কে দশ দিন কারাগারে রাখা হয়। অতঃপর অগ্নিতে জীবন্ত দগ্ধ করার সিদ্ধান্ত হয়।

এ ঘটনায় ইব্রাহীম (আঃ)-এর কাকে উপাস্য বা হর্তাকর্তারূপে গ্রহণ করে নেয়া উচিত ছিল? নমরুদকে নাকি আল্লাহকে? কোন বিবেচনাটি সঠিক ছিল? এটি একটি বড় প্রশ্ন। মানুষের এখানে ভাববার আছে। কোন পথটি যথাযথ?

স্বয়ং আল্লাহই নমরুদকে সার্বভৌম ক্ষমতা দিয়েছেন। ক্ষমতাধর করে গড়ে তুলেছেন। বস্তুত নমরুদের নিজস্ব কোন ক্ষমতাই নেই। এমনকি সে নিজের জীবনটাও নিজে সৃষ্টি করে নাই। ইব্রাহীম (আঃ) যথার্থই আল্লাহকে তাঁর একমাত্র উপাস্যরূপে গ্রহণ করেছেন। নমরুদ কখনও তার উপাস্য হতে পারে না। নমরুদকে যিনি সৃষ্টি করেছেন ইব্রাহীম (আঃ)-কেও তিনিই সৃষ্টি করেছেন। যদিও তৎকালীন বা প্রচলিত ব্যাবস্থায় কোন ক্ষমতাধরের সম্মুখে এভাবে ভাববার অবকাশ সীমিত ছিল। এমনকি আজও কোন ক্ষমতাধরের সম্মুখে এভাবে বলা সম্ভব হয় না। বিষয়গুলিকে সে সময়ে কেউই যথাযথ অর্থে বোঝেনি। ইব্রাহীম (আঃ) এর বক্তব্যের মর্মার্থ উপলব্ধি করতে পারেনি। এভাবে ভাববার মতো জ্ঞান ও আত্মবিশ্বাসও হয়তবা কারও ছিল না।

উল্লেখ্য যে, অবিশ্বাসীরাও ভগবানকে তাদের লালন-পালনকর্তা ও সকল দেবতাকুলের উর্ধ্বে স্বীকার করে। কিন্তু আল্লাহ বা ভগবানের পাশে একই সাথে তারা অন্যান্য দেবতাদেরকেও আল্লাহর অংশীদার সাব্যস্ত করে এবং তাদেরও উপাসনা করে। অপরদিকে লালন-পালন ও হর্তাকর্তারূপে মানুষ আল্লাহকে

যেমন মানে তেমনি আবার জাগতিক সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী রাজ-রাজাদেরকেও মান্য করে।

বিপদ-আপদে মানুষ ঠিকই আল্লাহর স্মরণাপন্ন হয়, কিন্তু অজ্ঞতা বা বিশ্বাসহীনতার কারণে আবার কোন আত্মা, দেবতা, জ্বিন, চাঁদ-তারা-সূর্য্য বা অন্যান্য কিছুকে আল্লাহর অংশীদার সাব্যস্ত করে তাদের কাছেও সহায়তার জন্য প্রার্থনা করে, তাদের উপাসনা করে এবং তাদের প্রতি নানান কিছু উৎসর্গ করে। গীতায় বিষয়টিকে এভাবে তুলে ধরা হয়েছে যে,

"যাদের মন বস্তুগত (জাগতিক) কোন প্রাপ্তির প্রত্যাশায় বিচ্যুত, তারা অপরাপর বিবিধ দেব-দেবতায় নিজেদেরকে সমর্পন করে এবং ... কোন নির্দিষ্ট দেব-দেবীর আনুকূল্য কামনা করে ... কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এই সকল সুবিধা, অনুগ্রহ বা কাম্য বস্তু আমি একাই প্রদান করি।" (গীতা ৭:২২)

অর্থাৎ সব কিছুর দাতা মূলত 'একজনই'। 'এক আল্লাহ'। ইব্রাহীম (আঃ) এর জ্ঞান সর্বোচ্চ স্থানকে যথাযথভাবেই চিহ্নিত করছে এবং তিনি সেভাবেই বিষয়গুলিকে মূল্যায়ন করেছেন ও প্রচার করেছেন। আল্লাহকে তিনি মহিমান্বিত করেছেন যা কিনা 'সত্য'। সত্য ধারণাকে মানুষের মাঝে সমুন্নত করার জন্য তিনি 'জেহাদ' বা 'জীবন সংগ্রাম' করেছেন।

বস্তুত সত্য ধারণা ও জ্ঞানে পূর্বতনদের বিশ্বাস স্থাপন এবং অব্যাহতভাবে সত্যের প্রচার-প্রচারণায় তাদের সংগ্রামী জীবন মানুষকে ধীরে ধীরে আজকের উন্নত ধারণায় উপনীত করেছে। বর্তমান সময় ও প্রজন্মের অনেকের কাছে বিষয়গুলির আলোচনা অপ্রয়োজনীয় মনে হয় বা হতে পারে। কিন্তু তারা তৎকালীন সময়, যুগ, সমাজ, রীতি-নীতি, অন্যায়-অত্যাচার ও নিষ্পেষনকে দেখেনি। তাই বিষয়গুলির তীব্রতা উপলব্ধি করতে পারে না। তাগুদের উছিলায় স্বার্থান্বেষীদের তাদের স্বার্থ সংশ্লিষ্ট নিয়ম-বিধি মানুষের জীবনে নাভিঃশ্বাস তুলে দেয়। আল্লাহ তাই তাগুদের উপাসনা করতে বারণ করেছেন।

সত্য বলতে ইতিহাসভিত্তিক এমন কিছু শিক্ষনীয় সিনেমা আছে যা কিনা মধ্যযুগীয় বা তৎকালীন সময়ে সমাজের মানুষের অজ্ঞতা-নির্জ্ঞনতা এবং ফলাফলস্বরূপ মানুষের ওপর মানুষের করা অত্যাচার-নির্যাতন, নিষ্ঠুরতা-নির্মমতাকে বুঝতে বা উপলব্ধিতে আনতে সহায়তা করে! মিথ্যে, ভূল,

ক্ষমতাধরদের অন্যায়-অত্যাচার ও নানান কুসংস্কারের যাতনায় অনেক অসহায় মানুষ যুগে যুগে ক্লিষ্ট হয়েছে। সমসাময়িক সমাজ তাদেরকে সহায়তা করতে পারেনি। সমাজে প্রচলিত মিথ্যে ও ভূল ধারণাই দাপটের সাথে রাজত্ব করেছে। বস্তুগত ও ধারণাগতভাবে উন্নত দাবী করা আজকের সমাজেও কি তেমন ঘটছে না? যুগে যুগে মহামানবদের আবির্ভাব ঘটে সর্বসাধারণকে উৎপীড়কের উৎপীড়ন থেকে মুক্তি দিতে।

অনেক সংগ্রামের পথ পাড়ি দিয়ে মানুষকে আজ এ পর্যায়ে আসতে হয়েছে। ইন্টারনেটে ক্লিক করে হাতের নাগালে সব পেয়ে যাওয়া আজকের প্রজন্মের অনেকে সেসব ইতিহাস জানতেও আগ্রহ প্রকাশ করে না, কিংবা পুরোন বা সেকেলে চিন্তা-ভাবনা বলে বিষয়গুলিকে ভাববার প্রয়াস পায়!

সত্য হচ্ছে সবাইকে সব বিষয় জানতেও হবে না। যেমন নিউটনের সূত্র সবাইকে জানতে বা বুঝতে হয় না। বেশীরভাগ মানুষ কেবল সূত্রকে কাজে লাগিয়ে সৃষ্টি করে দেয়া যন্ত্রের সুফল ভোগ করবে। কিন্তু বোধসম্পন্ন কিছু মানুষকে আল্লাহর সৃষ্টির সূত্রের জ্ঞান ধরে রাখার সাথে অবশ্যই সম্পৃক্ত থাকতে হয় এবং হবে। নয়ত মানবজাতির সামগ্রীক অর্জন কখনও হারিয়ে যেতে পারে।

▪ **২.২৫৮.২** আল্লাহ সীমা লংঘনকারীদের পথ প্রদর্শন করেন না (Allah guideth not wrongdoing folk) : পদার্থ থেকে শুরু করে গণিত, বিজ্ঞান সর্বত্র আছে সূত্রের ছড়াছড়ি। যখন আমরা লেখাপড়া করি তখন সূত্র রপ্ত করি। সূত্র ধরে চললে সমস্যার সঠিক সমাধান খুঁজে পাওয়া যায়। সূত্রের বাইরে গেলে সমাধান মিলবে না। পদার্থ-গণিত কিংবা যে কোন বিষয়ই হোক না কেন সেটি এ জীবন ও জগতের বাইরের কিছু নয়। জীবন চলার পথের প্রতিটি ক্ষেত্রে তেমনি আছে যথাযথ সূত্র ও সমাধান।

সূত্রের পথ ধরে চললে লক্ষ্যে পৌঁছান সম্ভব ও সহজ হয়ে যায়। যদি সফলতা নাও আসে তবুও বিপদে পড়তে হয় না, কিংবা বিপদ থেকে রক্ষা পাওয়া যায়। সূত্রই সীমানা নির্ধারণ করে দেয়। সূত্রের বাইরে চলাই মাত্রা বা সীমার লংঘন।

বলা হচ্ছে, 'আল্লাহ সীমা লংঘনকারীদের পথ প্রদর্শন করেন না'। এক অর্থে আল্লাহ সকলকেই পথ প্রদর্শন করেছেন। কোরআন নিজেই তার প্রকৃষ্ট প্রমাণ। কোরআনের মাধ্যমে আল্লাহ মানবজাতির সম্মুখে ভাল-মন্দ সূত্রগুলি সব প্রকাশ্যে তুলে ধরেছেন। তিনি চলার পথের সীমানা বা মাত্রা নির্ধারণ করে দিয়েছেন।

এ জগত মানুষের জন্য এক পরীক্ষার ক্ষেত্র। তাই সীমানার বাইরে যাওয়ার স্বাধীনতা ও সক্ষমতা মানুষকে দেয়া হয়েছে। কিন্তু যেতে বারণ করা হয়েছে। কেননা সঙ্গে আছে সমুহ বিপদ। মানুষের স্বাধীনতা আছে উপদেশ গ্রহণ করার কিংবা না করার। তবে কর্ম অনুযায়ী ভাল-মন্দ ফল প্রাপ্তি আছে। সে সূত্রেই সকল সৃষ্টিকর্ম সাঁজান। সূত্র আপনা থেকে কাজ করবেই।

মানুষ যেন কোনদিন বলতে না পারে যে বিষয়গুলি বা সূত্রগুলি তার জানা ছিল না তাই আল্লাহ বলেন,

"বার্তাবাহকগণ সু-সংবাদদাতা এবং সতর্ককারী। বার্তাবাহকগণকে এ জন্যই প্রেরণ করা হয়েছে, যেন তাদের প্রেরণের পর আল্লাহর প্রতি মানুষের আর কোন যুক্তি না থাকে।" (আল-কোরআন ৪:১৬৫)

আল্লাহ মানুষকে পথের দিশা নাও দিতে পারতেন। কিন্তু মানুষের প্রতি তিনি দয়াশীল। মানবজাতিকে তিনি সূত্রগুলি ধরিয়ে দিয়েছেন যেন মানুষ বুঝে ও সতর্ক হয়ে চলে এবং সমুহ বিপদ থেকে নিজেদেরকে রক্ষা করে সফলভাবে লক্ষ্যে পৌঁছাতে পারে।

আল্লাহ নিজেই সত্য। সত্যের ধারক সত্যের বাইরে কোন কিছুকে গ্রহণ করেন না। এটিই স্বাভাবিক বা সূত্রজনিত ক্রিয়ার ফল। ফলে যে বা যারা বারংবার সূত্রের বাইরে যেতে থাকবে তার থেকে তিনি নিজেকে প্রত্যাহার করে নেবেন। তাকে নিজ দায়িত্বে ছেড়ে দেবেন। এ সূত্রও প্রকাশিত। সিদ্ধান্ত মানুষের নিজের।

মানব জীবনে সফলতা-বিফলতা লাভ, সফলতার উচ্চ শিখরে আরোহন করে পতিত হওয়া এগুলি অনেক বিষয়ের ওপর নির্ভর করে। তবে অত্যান্ত গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে মানুষের কর্ম ও আচরণ।

আল্লাহ তাঁর সকল সৃষ্টি এবং মানুষের নিজেদেরকে দিয়েও নানান নিদর্শন প্রদর্শন করেন এবং চলার ভাল-মন্দ পথগুলিকে বুঝতে সহায়তা করেন।

বোধসম্পন্ন মানুষ তাই গভীর পর্যবেক্ষণ ও উপলব্ধিবোধের মাধ্যমে আল্লাহকে একটু একটু করে বুঝতে শেখে। অধিকাংশ মানুষ নিজেকে দিয়েও বোঝে যে, আচরণ যাদের ঔদ্ধত্যপূর্ণ তাদেরকে মানুষ পছন্দ করে না। ভালবাসে না। তারা সহজেই মানুষের সহমর্মীতা-সহযোগীতা ও সমর্থন লাভ করতে পারে না। মানুষের সহযোগীতা ভিন্ন কাজে সফলতা আসে না। এটি একটি উদাহরণ মাত্র। অর্থাৎ আচরণের সীমা লংঘন করলেও মানুষকে বিপদে পড়তে হয়। কাজে সফল হতে পারে না। বাস্তবেও সূত্রগুলি এভাবেই কাজ করে।

সামাজিক থেকে শুরু করে সকল ক্ষেত্রে যারাই প্রতিনিয়ত কোন নিয়ম বা বিধানের সীমা লংঘন করে, এমনকি অতি কাছের মানুষ বা আপনজনও তাদেরকে পছন্দ করে না এবং তাদেরকে একসময় আর সুপথ বাৎলে দেয় না। তাদের থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়। তারা তাদের নিজেদের কর্মের ফল ভোগ করে।

পথ প্রদর্শন করার পরেও কেউ যদি তা অনুসরণ না করে এবং প্রতিনিয়ত সীমালংঘন করেই চলে তবে তার থেকে আল্লাহও মুখ ফিরিয়ে নেন। নানানভাবে আল্লাহ তাঁর সহায়তা প্রত্যাহার করে নেন। তাকে তিনি পথ চলতে ভেতর থেকে সহায়তা করেন না। ভেতরের পরামর্শ ও সহায়তার ক্রিয়াগুলি সঠিকভাবে কাজ করেনা। আবার পরামর্শ ধারণ করে চলার যে শক্তি সেটিও ভেতর থেকে উজ্জীবিত হয় না। অর্থাৎ তিনি পথ প্রদর্শন করেন না। সে কারণেই বলা হয় যে, 'আল্লাহ সীমা লংঘনকারীদের পথ প্রদর্শন করেন না'। ফলে তেমন চরিত্র ও আচরণের মানুষেরা বিপদগ্রস্ত হয়। এতদ্বসত্ত্বেও তিনি তাঁর সৃষ্টির প্রতি দয়াময়। মানুষ চাইলেই পথে ফিরে আসতে পারে।

আল্লাহ অকৃতজ্ঞ, অস্বীকারকারী, ঔদ্ধত্যপূর্ণ আচরণকারীদেরকে পছন্দ করেন না। এসবের প্রতিটিই সীমার লংঘন। কোরআনের মাধ্যমে সূত্রসমূহও প্রকাশ্যে জানিয়ে দেয়া হয়েছে। আল্লাহর সূত্র এ কারণেই মেনে চলা শ্রেয় যে এসবের মন্দ পরিণতি আছে। মানুষ নিজেকে রক্ষা করে চলবে নাকি বিপদগ্রস্ত করবে সেটি নিজের সিদ্ধান্ত। কিন্তু দয়াময় আল্লাহ সূত্র ও সূত্রের লংঘনজনিত ফলাফল সম্পর্কে মানুষকে অবহিত করেছেন।

ওপরে আলোচনা করা হয়েছে (দ্রষ্টব্য ২.২৫৮.১) যে, নমরুদ তৎকালীন সমাজ, রাষ্ট্রীয় রীতি-নীতি, বিধি-বিধান ও সমসাময়িক জ্ঞান ইত্যাদি

বিষয়সমুহকে বিবেচনায় নিয়ে কাজ করেছে। আবার পরামর্শকদের পরামর্শও তাকে শুনতে হয়েছে, হয়তবা প্রভাবিতও হয়েছে। তাহলে এখানে নমরুদের সীমালংঘনজনিত অপরাধটি কোথায় বা কিভাবে?

তৎকালীন সমাজ বা রাষ্ট্রীয় গোড়ামীর নিয়ম-কানুনে অবশ্যই ভূল-ভ্রান্তি ছিল। যুগে যুগে নতুন ধারণার আবির্ভাব ভিন্ন জগত আজ এ পর্যায়ে আসতে পারত না। না জেনে-বুঝে নতুন ধারণাকে গলাটিপে হত্যা করা অন্যায়। সেটি অধিকতর বড় অন্যায় হয়ে দেখা দেয় যখন সেটি রাষ্ট্রের মতো বড় দায়িত্বশীল জায়গা থেকে করা হয়।

একটি নতুন ধারণা নিয়ে আগত কোন মানুষকে হত্যা করার মত অপরাধ কেবলমাত্র তারাই করতে পারে,

প্রথমত: যারা বিষয়টির আদ্যোপান্ত জানতে বা বুঝতেও আগ্রহী নয়। এর ভাল-মন্দ, সত্যাসত্য কিছুই জানতে চায় না। তারা যেভাবে জীবনের মজা লুটে নিচ্ছে সেভাবেই থাকতে চায়। সমগ্র সৃষ্টির ভাল-মন্দের বিবেচনা এমনকি প্রজন্মের ভবিষ্যৎ ভাল-মন্দের ভাবনাও তাদের মধ্যে নেই বা কাজ করে না; কিংবা তেমন বিবেচনা তাদের কাছে গুরুত্ব পায় না। তারা সত্যের সন্ধান করে না। নিজেদের ভূল-ভ্রান্তি জেনে নিয়ে সংশোধিত হতে চায় না। বস্তুত এভাবে তারা একটি মুর্খের রাজত্ব কায়েম করে এবং অহংকার ও দাপটের সঙ্গে জীবন যাপন করে। জাগতিক অগ্রগতিকে ব্যাহত করে।

দ্বিতীয়ত: ক্ষণকালীন এ পার্থিব জীবনে সমসাময়িককালে প্রাপ্ত সাময়িক সময়ের ক্ষমতা ও সক্ষমতার দম্ভে যারা হিতাহিত জ্ঞান শূণ্য, কেবল আত্মমর্যাদা ও অহংকারের চিন্তায় নিমগ্ন এবং সকল মাত্রা ছাড়িয়ে যারা সীমা লংঘন করে- তারা বিবেচনাহীনভাবে শুধু এমন নিছক কারণে হত্যার মতো একটি জঘন্য ও নৃশংস আদেশ জারী করতে পারে। অথচ জীবন দেয়ার মতো ক্ষমতা তারা রাখে না। একটি জীবন কেড়ে নেয়া তাদের কাছে ছেলে খেলার মতো।

বাস্তব জীবনের উদাহরণ তুলে ধরার মাধ্যমে ওপরে এটিই তুলে ধরা হয়েছে যে, মাত্রা বা সীমালংঘন ও ঔদ্ধত্যপূর্ণ আচরণের কারণে নমরুদের ক্ষমতা কোন কাজে আসেনি। অথচ এমন বিপদের মুখ থেকেও আল্লাহ ইব্রাহীম (আঃ) কে রক্ষা করেছেন। তাই পূর্বেই উদ্ধৃত হয়েছে যে, যারা বিশ্বাসী আল্লাহ তাদের

রক্ষাকর্তা। তিনি তাদের অন্ধকার থেকে আলোর পথে নিয়ে আসেন (দ্রষ্টব্য ২.২৫৭.১)। এটি বিশ্বাসীদের বিশ্বাসকে দৃঢ়তা দান করে।

ভূল পথগামীরা সীমা লংঘনজনিত আচরণের মাধ্যমে নিজেরাই নিজেদেরকে বিপদগ্রস্ত করে। তাই সকলেরই আল্লাহর বাণী ও সূত্রের মর্মার্থ ও পরিণতি বিবেচনা করে চলা শ্রেয়। এমনই আল্লাহর অর্থপূর্ণ দিক-নির্দেশনা।

প্রসঙ্গক্রমে বলে রাখা ভাল যে, নমরুদ যদি ব্যাক্তিগতভাবে বিবেচকও হয়ে থাকে এবং পরামর্শকদের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে এমন ভূল সিদ্ধান্ত নিয়ে থাকে, তবে রাষ্ট্রনায়ক হিসেবে পরামর্শদাতাদের সম্মিলিত সে অন্যায় বা ভূল কাজের দায় তার কাঁধেই বর্তায়। অন্যথায় পরিষদবর্গের পরামর্শ সত্বেও নিজ জ্ঞানে তার সত্যের পথই অবলম্বন করা উচিৎ ছিল। রাষ্ট্রিয় সকল সুযোগ-সুবিধা ভোগ করে জনগনকে যথাযথ বা সঠিক পথ দেখাতে ব্যার্থ হওয়া বা এমন গুরুত্বপূর্ণ পদে অধিষ্ঠিত থেকে সঠিক পথ অবলম্বনে যথেষ্ট সাহসী ভূমিকা না রাখাও অন্যায় বা অপরাধের পর্যায়ে পরে। প্রধান হিসেবে সে দায় তার কাঁধেই বর্তায়। সত্যিকার অর্থে এ বিবেচনাটিকেই সকলের পক্ষে ভাল-মন্দ কাজের দায়িত্ব নেয়া বলে। অন্তত তেমন গুরুত্বপূর্ণ ও পদমর্যাদায় আসীন থাকা অবস্থায়। এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক-নির্দেশনা; বিশেষত গুরুত্বপূর্ণ আসনে অসীন ব্যাক্তিবর্গের বিবেচনা ও অনুধাবনের জন্য।

▪ **২.২৫৯** অথবা তুমি কি তাকে দেখনি, যে এমন এক জনপদ দিয়ে যাচ্ছিল যা ধ্বংসস্তুপে পরিণত হয়েছিল? সে বলল, কেমন করে আল্লাহ এ নগরকে তার মৃত্যুর পর জীবিত করবেন? আল্লাহ তাকে মৃত অবস্থায় রাখলেন একশ বছর। অতঃপর তাকে পুনর্জীবিত করলেন। তিনি বললেন, ... তোমাকে আমি মানবজাতির জন্য এক দৃষ্টান্তস্বরূপ করতে চাই। অস্থিগুলির দিকে লক্ষ্য কর- কিরূপে আমি এগুলিকে একটির সাথে অপরটিকে জুড়ে দেই, অতঃপর মাংসের আবরণ দিয়ে ঢেকে দেই। ... সে বলল, এখন আমি বুঝতে পারছি আল্লাহ সব কিছুই করতে সক্ষম : জনপদ কোনটি কিংবা ব্যাক্তিটি কে তা নিশ্চিত নয়। তবে শিক্ষনীয় নিদর্শনটি অনুধাবন করার বিষয়টি গুরুত্বপূর্ণ। ঘটনাটি মানবজাতির অনুধাবনের জন্য একটি দৃষ্টান্তস্বরূপ।

আল্লাহর পক্ষে সব করা সম্ভব। তিনি চব্বিশ ঘন্টায় দিন নির্ধারণ করেছেন। পার্থিব জীবনে এসে আমরা সে অভিজ্ঞতা লাভ করেছি। তেমনি তিনি একশ বছরেও একটি দিন করতে পারেন। এ বোধটি যেমন ব্যাহ্যিক দৃষ্টিতে হতে পারে, তেমনি মস্তিষ্কের ভেতরেও ঘটতে পারে। এগুলি দিক-নির্দেশনা বোধসম্পন্ন মানুষদের জন্য। এসব ধারণাকে কাজে লাগিয়েই বিজ্ঞানীরা নতুন নতুন তত্ব উদ্ভাবন করে। বাস্তবে প্রয়োগের চেষ্টা করে। বস্তুত তারাই বোধসম্পন্ন মানুষ। কিংবা বিজ্ঞানীরা যখন কোন সত্যকে খুঁজে পায় তখন তা এসব ধারণার সাথে মিলে যায়। কেননা ধারণাগুলির পেছনে অজানা সত্য লুকিয়ে আছে।

আয়াতের শেষাংশে কিভাবে মানুষকে একটির পর একটি বা পর্যায়ক্রমে সৃষ্টি করা হয়েছে সে বিষয়টি তুলে ধরা হয়েছে। কিভাবে আল্লাহ মৃতকে জীবিত করেন তার একটি ইংগিতপূর্ণ দিক-নির্দেশনা রয়েছে বোধসম্পন্নদের জন্য। তিনি সুজলা-সুফলাকে মরুতে পরিণত করেন। মরুকে শস্য-শ্যামল করে গড়ে তোলেন। মৃতকে জীবতি করেন। যে সময়ে এসব বাণী অবতীর্ণ হয়েছে সে সময়ে বিষয়গুলি তেমন বোধগম্য ছিল না। বিজ্ঞানের কল্যাণে ও প্রাকৃতিক পরিবর্তন পর্যবেক্ষণ করে মানুষ আজ বিষয়গুলি বুঝতে পারছে। এভাবেই আল্লাহ তাঁর নিদর্শন তুলে ধরে মানুষকে পথ প্রদর্শন করেছেন। বোধসম্পন্ন মানুষদের জন্য এসবই দিক-নির্দেশনা হয়ে কাজ করে।

আল্লাহ নবী, রাসূল বা জ্ঞানীদের মধ্যে এভাবেই জ্ঞান দান করেছেন। যাদেরকে তিনি পছন্দ করেছেন তাদেরকে আলোর পথ প্রদর্শন করেছেন। তারই ধারাবাহিকতায় মানুষ কাজ করে চলেছে। বিজ্ঞান একদিনেই এ পর্যায়ে আসে নাই। ধারণা প্রাপ্তি থেকে শুরু করে ধীরে ধীরে আজকের পর্যায়ে এসেছে। শুরু হয়েছে এভাবেই। আল্লাহ সূত্র ধরিয়ে দিয়েছেন। যুগে যুগে পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তরে আসমানী গ্রন্থ প্রেরণ করেছেন। তিনি এভাবেই শিক্ষা দেন। অতঃপর মানুষেরও কিছু করণীয় আছে। এ প্রক্রিয়ায় তিনি জগত পরিচালনা করেন। তাই এসব গ্রন্থ মানবজাতীর জন্য পথ প্রদর্শক।

আয়াতে উদ্ধৃত ব্যাক্তি কে ছিলেন বিষয়টি নিশ্চিত নয়। কারও মতে তিনি ছিলেন হযরত উজায়ের। আরও বিভিন্নজনের নাম আছে। তবে নামের অনুসন্ধানটি এ ঘটনায় খুব বেশী গুরুত্বপূর্ণ নয়। শিক্ষনীয় বিষয়টি গুরুত্বপূর্ণ।

■ **২.২৬০** যখন ইব্রাহীম বলল: হে আমার পালনকর্তা! আমাকে দেখাও কেমন করে তুমি মৃতকে জীবিত কর। ... তিনি বললেন: চারটি পাখী নাও। সেগুলিকে নিজের বশীভূত করে নাও, ... অতঃপর সেগুলিকে ডাক। তারা তোমার নিকট দ্রুততার সঙ্গে চলে আসবে। জেনে রেখ, আল্লাহ পরাক্রমশালী, অতি জ্ঞানসম্পন্ন : যুগে যুগে মানব মনে আল্লাহকে নিয়ে অনেক প্রশ্ন উঁকি-ঝুঁকি দিয়ে আসছে। সবাই আল্লাহকে জানতে ও বুঝতে চায় এমনকি দেখতেও চায়। প্রাণ কি, কিভাবে মানুষের ভেতরে প্রাণ প্রবেশ করে, কিভাবে বিষয়গুলি কাজ করে ইত্যাদি অনেক প্রশ্নের উত্তর জানার বিষয়টি অন্তরের চাওয়া। কেউ স্বীকার করুক কিংবা না করুক কথাগুলি সত্যি। যার মনে তেমন প্রশ্নের উদয় হয় না সে তো আল্লাহকেও স্মরণ করে না। আল্লাহ কিংবা সৃষ্টিকর্তা বা সৃষ্টিকে নিয়েও হয়তবা তার মনে কোন প্রকার ভাবনারও উদয় হয় না।

একজন বিশ্বাসীর মনে যখন এমন প্রশ্নের উদয় হয় সে তখন দ্বিধা-দ্বন্দ্বে পড়ে যায়। তবে কি শয়তান তাকে কোন কুমন্ত্রনা দিচ্ছে? আমার বিশ্বাস কি বিফলে যাচ্ছে। আমি কি সত্যিকার বিশ্বাসী নই? আমার ভেতরে কি সন্দেহ প্রবেশ করছে বা করেছে? কিভাবে আমি বিশ্বাসী হব? কিভাবে আমি আমার বিশ্বাসকে ধরে রাখব? কিভাবে এ বিশ্বাসকে আরও শক্তিশালী করব বা উচ্চ পর্যায়ে উন্নীত করব? আমার ভেতরে যেসব প্রশ্ন ঘুরপাক খাচ্ছে তা কি সন্দেহ থেকে সৃষ্টি হচ্ছে নাকি কোন অবিশ্বাস থেকে?

এ আয়াত দুর্বল প্রকৃতির তেমন ভাবনাসম্পন্ন মানুষ বা বিশ্বাসীদের জন্য এক আশীর্বাদস্বরূপ। কেননা যাদের নিকট থেকে একজন বিশ্বাসী বিশ্বাস, আল্লাহ, আল্লাহর একত্ব ইত্যাদি বিষয়গুলি সম্পর্কে জেনেছে বা শিখেছে তাদের সেই পিতা ইব্রাহীম (আঃ) এর মনেও এমন প্রশ্নের উদয় হয়েছে। বিশ্বাসীর সন্দেহপ্রবণ অন্তর এতে শান্তনা লাভ করে।

এটি কোন সন্দেহ থেকে নয়, এটি বিশ্বাসের কোন ঘাটতি থেকেও নয়, এটি কারও কোন কু-মন্ত্রনা থেকেও সৃষ্ট নয়, বরং এটি কৌতুহলী মানব মনের এক স্বাভাবিক প্রশ্ন। যে কৌতুহল মানব মনে বিধাতা নিজেই সৃষ্টিকালে প্রবেশ করিয়ে দিয়েছেন। এ কৌতুহলের কারণেই মানুষ একটু একটু করে আল্লাহকে এবং নিজেকে জানতে ও বুঝতে শেখে।

আল্লাহ সকলের নিকট থেকে নিজেকে আড়াল করে রেখেছেন। অথচ তিনি মানুষের নিজের থেকেও অতি সন্নিকটে। সকলেই তাঁকে বা তাঁর কার্যাবলী কিংবা বলা যায় যে সৃষ্টি রহস্য সম্পর্কে জানতে ও বুঝতে চায়। এ চাওয়া খুবই স্বাভাবিক। বুঝতে পারলে মানব অন্তর প্রশান্ত হয়। এখানে সে সত্যটি ফুটে উঠেছে। মানুষের মাঝে এ সত্যের উপস্থিতির কারণেই মানুষ আজ এত অগ্রগতির মুখ দেখতে পারছে। জীবন ও জগতকে আজ এ পর্যায়ে এগিয়ে নিয়ে আসতে পেরেছে। যে শেখার কোন শেষ নেই।

কোরআনে বলা হয়েছে যে মানুষ আল্লাহকে দেখতে পাবে না। বাইবেলেও বলা হয়েছে। গীতায়েও এমন একটি বক্তব্য রয়েছে যে মানুষ তার বর্তমান চোখ দিয়ে তাঁকে দেখতে পাবে না। স্বর্গীয় দৃষ্টি প্রয়োজন হবে। ধর্মীয় গ্রন্থগুলি এভাবেই মানুষকে সত্যকে বুঝতে ও শিখতে দিক-নির্দেশনা দিয়ে এসেছে।

অতঃপর পরবর্তী কাজ মানুষের নিজেদের। তা না হলে এ জগতে মানুষের আর কাজ কি? তাই আজ ‘হাবল’ টেলিস্কোপ বা আরও উন্নত প্রযুক্তি উদ্ভাবনের চেষ্টা করা হচ্ছে। মানবের দৈনন্দিন জীবনের সব কাজের পরেও বিজ্ঞজনদের মূল কাজ নিজেকে সন্ধান করা। আল্লাহ ভিন্ন নিজের কোন অস্তিত্ব নেই। মানুষ যে কাজই করে বস্তুত আল্লাহরই আরাধনা করে। আরাধনা, উপাসনা, পূঁজা ইত্যাদি শব্দগুলি নিয়ে বিতর্ক অনর্থক। মূল লক্ষ্যের দিকে দৃষ্টি দিতে হবে।

এখানে ইব্রাহীম (আঃ) এর উদাহরণ তুলে ধরা হয়েছে। তিনি প্রাণ সম্পর্কে আল্লাহর কাছে জানতে চেয়েছেন। অতঃপর তাকে যা বলা হয়েছে আয়াতে তা পরিস্কারভাবে উদ্ধৃত হয়েছে। এর অতিরঞ্জিত কোন ব্যাখ্যার প্রয়োজন নেই। বোধসম্পন্ন মানুষ এখান থেকে মর্ম কথাটি ঠিক অনুধাবন করে নেবে।

চৌম্বকীয় টানে সব ছুটে আসে। সচলতা সৃষ্টি হয়। সচলতাই অস্তিত্ব বা প্রাণের প্রকাশ ঘটায়। এ ছুটে আশার মধ্যেই মানুষ জীবনের অস্তিত্ব খুঁজে পায়। এটি প্রাণবন্ত করে তোলে সবকিছুকে। প্রাণবন্ততাই জীবন। আল্লাহর বিশালত্ব ও মহা আকর্ষন ক্ষমতা বহুদুর থেকে কোন কিছুকে টেনে আনতে সক্ষম।

পদার্থ যেমন তার কঠিন, তরল ও বায়বীয় অবস্থায় বিরাজ করে, তেমনি প্রাণের চৌম্বকীয় আকর্ষনও মায়া-মমতা-ভালবাসা বা আরও বিবিধ প্রকারের হতে পারে। বিষয়গুলিকে এভাবেও ভেবে নেয়া যেতে পারে। বস্তুত আল্লাহর

মহাজ্ঞানের কিছুই মানুষ আমরা অবগত নই। তাই এ বিশ্বাসটুকু রাখাই উত্তম যে, তিনি যা ইচ্ছে করেন তাই করতে পারেন (দ্রষ্টব্য আল-কোরআন ২২:১৪)। আল্লাহ পরাক্রমশালী, অতি জ্ঞান সম্পন্ন।

কোরআনে বা বিবিধ আয়াতে উল্লেখিত বার্তাসমুহ মানুষের জন্য ইংগিতপূর্ণ দিক-নির্দেশনা হয়ে কাজ করে। কিছু কাজ আছে যা পরবর্তীতে মানুষের জন্য করণীয়। মানুষের মধ্যে যে যে কলায় নিয়েজিত তারা সে কাজের দায়িত্বপ্রাপ্ত। এখন সব কাজ প্রাতিষ্ঠানিক রূপ লাভ করেছে। এসব বাণী যখন অবতীর্ণ হয়েছে তখন বিষয়গুলি সেভাবে প্রতিষ্ঠা পায়নি। এসব জ্ঞান সম্বলিত কাজ এখন জ্ঞানের প্রতিটি শাখায় নিয়োজিত স্ব স্ব জ্ঞানী বা বিজ্ঞানীদের।

কোন কিছুকে পোষ মানিয়ে ডাকলে সে চলে আসে। সে নির্দেশনা পালন করে। তার এ ছুটে চলা বা নির্দেশনা পালন করার মধ্যেই জীবনের অস্তিত্ব খুঁজে পাওয়া যায়। এখানে ইঙ্গিতপূর্ণ ধারণা রয়েছে। কিন্তু বিষয়টির পূর্ণ জ্ঞান নেই।

আল্লাহ সব করতে পারেন .. মানুষের জন্য যতটুকু প্রয়োজন ততটুকু বলা হয়েছে। ডাকলে যা চলে আসে সেটিতে সেই বৈশিষ্টপূর্ণ উপাদান রয়েছে যা চৌম্বকীয় টানে চলে আসে। কিন্তু সেটি কেন তা করে তার ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ নেই। এর অধিক সাধারণ মানুষের জানার প্রয়োজনও হয়তবা নেই। কিংবা তিনি পরবর্তী ধাপের অনুমোদন দিলে সেটিও একদিন জানা যাবে।

আল্লাহ পরাক্রমশালী, অতি জ্ঞান সম্পন্ন। তিনি সব করতে পারেন। তাঁর অনুমতি ব্যাতিত মানুষের পক্ষে কিছুই করা সম্ভব নয়। তাই বলে হাত-পা গুটিয়ে বসে থাকলে চলবে না। মানুষকে অনুসন্ধানে বা চেষ্টায় রত থাকতে হবে। মানুষের চেষ্টা, আন্তরীকতা ও এর মাধ্যমে অর্জিত তার যোগ্যতাই তাকে আল্লাহর সন্তুষ্টি ও অনুগ্রহ প্রাপ্তির মাধ্যমে সত্যের জ্ঞানপ্রাপ্তিকে সম্ভব করে তুলবে।

➢ (আয়াত ২৬১-২৬৭) এ অংশে আল্লাহর পথে ব্যায় (Spending in Allah's way) করতে মানুষ তথা বিশ্বাসীদেরকে উৎসাহিত করা হয়েছে। আয়াত নং ২৪৩ থেকে যে আলোচনা শুরু হয়েছে তাতে বিশ্বাসীদেরকে মহৎ উদ্দেশ্য অর্জনে জীবন ও অর্থ-সম্পদ ব্যায় করতে উদ্বুদ্ধ করা হয়েছে।

আল্লাহতে বিশ্বাসের ভীতকে শক্তিশালী করার জন্য পূর্বের আয়াতসমুহে কিছু উদাহরণ তুলে ধরা হয়েছে। অতঃপর যে কারণে তাদেরকে জীবন ও অর্থ-সম্পদ ব্যায় করতে উদ্বুদ্ধ করা হয়েছে সে বিষয়ে বিস্তারিত ও যথাযথ দিক-নির্দেশনা দেয়া হয়েছে এখানে। যেন মানুষের মধ্যে তেমন মনোভাব ও আচরণ গড়ে ওঠে যা লক্ষ্য অর্জনে এক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় ও যথাযথ।

২৬১	যারা আল্লাহর রাস্তায় স্বীয় ধন সম্পদ ব্যায় করে, তাদের উদাহরণ একটি বীজের মতো যা থেকে সাতটি শীষ জন্ম নেয়। প্রত্যেকটি শীষে একশত করে দানা থাকে। আল্লাহ যাকে ইচ্ছে বহুগুনে বৃদ্ধি করে দেন। আল্লাহ সবকিছুকে পরিবেষ্টন করে রাখেন, সর্বজ্ঞ। (The likeness of those who spend their wealth in Allah's way is as the likeness of a grain which groweth seven ears, in every ear a hundred grains. Allah giveth increase manifold to whom He will. Allah is All-Embracing, All-Knowing.)
২৬২	যারা স্বীয় ধন সম্পদ আল্লাহর রাস্তায় ব্যায় করে, অতঃপর সে অনুগ্রহের কথা প্রকাশ করে না এবং কষ্টও দেয় না তাদেরই জন্য তাদের পালনকর্তার কাছে রয়েছে পুরস্কার। তাদের অন্তরে না কোন ভীতির সঞ্চার হবে, না তারা নিপতিত হবে কোনরূপ মনকষ্টে। (Those who spend their wealth for the cause of Allah and afterward make not reproach and injury to follow that which they have spent; their reward is with their Lord, and there shall no fear come upon them, neither shall they grieve.)
২৬৩	দান করে কষ্ট দেয়ার চেয়ে সদয় কথায় ক্ষমা চেয়ে নেয়া উত্তম। আল্লাহ পরিপূর্ণ, প্রশান্তিময়। (A kind word with forgiveness is better than almsgiving followed by injury. Allah is Absolute, Clement.)
২৬৪	হে বিশ্বাসীগন! তোমরা অনুগ্রহের কথা প্রকাশ করে এবং কষ্ট দিয়ে নিজেদের করা দানকে অর্থহীন করে দিও না, সে ব্যাক্তির মতো যে নিজের ধন-সম্পদ ব্যায় করে লোক দেখানোর উদ্দেশ্যে এবং আল্লাহ ও

	শেষ দিবসকে বিশ্বাস করে না। তার অবস্থা তেমন পাথরের মতো যার ওপর ধূলো জমেছিল, অতঃপর এক বৃষ্টি আঘাত করে তাকে মসৃন ও শূন্য করে দিল। তারা যা অর্জন করেছে তার ওপর তাদের কোন নিয়ন্ত্রন নেই। আল্লাহ অবিশ্বাসী সম্প্রদায়কে পথ প্রদর্শন করেন না। (O ye who believe! Render (make) not vain (ineffective) your almsgiving by reproach and injury, like him who spendeth his wealth only to be seen of men and believeth not in Allah and the Last Day. His likeness is as the likeness of a rock whereon is dust of earth; a rainstorm smiteth it, leaving it smooth and bare. They have no control of aught of that which they have gained. Allah guideth not the disbelieving folk.)
২৬৫	যারা আল্লাহর রাস্তায় স্বীয় ধন-সম্পদ ব্যায় করে আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য এবং নিজের অন্তকরণকে শক্তিশালী করার জন্য, তাদের উদাহরণ যেন এক উচ্চ ভূমি যেখানে বৃষ্টি বর্ষিত হয় এবং তা দ্বিগুন ফসল দান করে। যদি এমন প্রবল বৃষ্টিপাত নাও হয় তবে হাল্কা বর্ষনই যথেষ্ট। তোমরা যা কর আল্লাহ তা দেখেন। (And the likeness of those who spend their wealth in search of Allah's pleasure, and for the strengthening of their souls, is as the likeness of a garden on a height. The rainstorm smiteth it and it bringeth forth its fruit twofold. And if the rainstorm smite it not, then the shower. Allah is Seer of what ye do.)
২৬৬	তোমাদের কেউ কি এমন পছন্দ কর যে, তার একটি খেজুর ও আঙ্গুরের বাগান হবে যার নিম্নদেশ দিয়ে নহর প্রবাহিত হবে এবং তাতে সর্বপ্রকার ফল-ফসল থাকবে এবং সে বার্ধক্যে পৌঁছাবে, তার দুর্বল সন্তান সন্ততিও থাকবে, এমতাবস্থায় বাগানে ঘূর্নিবায়ু আসবে যাতে রয়েছে অগ্নি এবং বাগানটি ভষ্মীভূত হয়ে যাবে? এমনিভাবে

	আল্লাহ তোমাদের জন্য নিদর্শনসমূহ বর্ণনা করেন যেন তোমরা চিন্তা-ভাবনা কর। (Would any of you like to have a garden of palm-trees and vines, with rivers flowing underneath it, with all kinds of fruit for him therein; and old age hath stricken him and he hath feeble (weak) offspring; and a fiery whirlwind striketh it and it is (all) consumed by fire. Thus Allah maketh plain His revelations unto you, in order that ye may give thought.)
২৬৭	হে বিশ্বাসীগন! তোমরা স্বীয় উপার্জন থেকে ভাল বস্তুটি ব্যায় কর এবং যা আমি তোমাদের জন্য ভূমি থেকে উৎপন্ন করেছি তা থেকে উৎকৃষ্ট বস্তু ব্যায় কর এবং দান করার ক্ষেত্রে নিকৃষ্ট দ্রব্য ব্যায় করতে মনস্থ কর না যখন তোমরা নিজেরাও তা গ্রহণ করতে ইচ্ছুক নও, যদি না তোমরা চোখ বন্ধ করে সেটি নিয়ে নাও। জেনে রেখ, আল্লাহ পরিপূর্ণ, প্রশংসার্হ। (O ye who believe! Spend of the good things which ye have earned, and of that which We bring forth from the earth for you, and seek not the bad (with intent) to spend thereof (in charity) when ye would not take it for yourselves save with disdain; and know that Allah is Absolute, Owner of Praise.)

▪ **২.২৬১.১** যারা আল্লাহর রাস্তায় স্বীয় ধন সম্পদ ব্যায় করে, তাদের উদাহরণ একটি বীজের মতো যা থেকে সাতটি শীষ জন্ম নেয়। প্রত্যেকটি শীষে একশত করে দানা থাকে। আল্লাহ যাকে ইচ্ছে বহুগুনে বৃদ্ধি করে দেন : মানুষকে আল্লাহর রাস্তায় ব্যায় করতে বলা হয়েছে। অতএব নিঃশেষ হয়ে যাওয়ার ভয়ে কার্পন্য নয়। আল্লাহ চাইলে বহুগুণে বৃদ্ধিও করে দিতে পারেন। সে জ্ঞানে বিশ্বাস রেখে আল্লাহর রাস্তায় ব্যায় করতে হবে। এর সুফল আছে।

বস্তুত আল্লাহর রাস্তায় ব্যায় করার প্রয়োজনীয়তা আছে। কিন্তু অর্থ খরচে মানুষ কষ্ট অনুভব করে। তারা ব্যাতিত যারা সত্যিকার অর্থেই জীবন ও জগতের প্রয়োজনে ব্যায় করাকে গভীরভাবে উপলব্ধি করে। প্রতিদানে আল্লাহ

বহুগুণে বৃদ্ধি করে দেন। আল্লাহর পক্ষে সেটি সম্ভব। বাস্তব উদাহরণের মাধ্যমে সেটিই তুলে ধরা হয়েছে। যেন মানুষের কাছে বিষয়টি বিশ্বাসযোগ্য হয় এবং মানুষ আল্লাহর পথে ব্যায় করতে কার্পণ্য না করে।

আল্লাহ যে তাঁর অনুগ্রহ বহুগুণে বৃদ্ধি করে দেন মানুষকে বিশ্বাসযোগ্যভাবে বোঝাবার জন্য ধানের শীষের উদাহরণটি তুলে ধরা হয়েছে। কল্পনা নয় এমনটি বাস্তবেই ঘটে। এক থেকে তিনি বহুগুণ বৃদ্ধি করে দেন। এটি কেবল একটি উদাহরণ মাত্র। বস্তুত আল্লাহর সক্ষমতা সীমাহীন। তাঁর সক্ষমতাকে কোন সংখ্যা দ্বারা পরিমাপ করা যায় না।

কোন একক ব্যাক্তির আল্লাহর রাস্তায় ব্যায় করার কারণে সমষ্ঠিগতভাবেও মানুষ উপকৃত হয়। একটি রাস্তা নির্মাণ করা হলে সকলেই উপকৃত হয়। এলাকায় আয়-উন্নতি হয়। সেটিও বহুগুণে বৃদ্ধির একটি উদাহরণ। এসব উদাহরণের মাধ্যমে মানুষকে আল্লাহর রাস্তায় ব্যায় করতে উদ্বুদ্ধ করা হয়েছে।

আল্লাহর রাস্তায় ব্যায় বিষয়টি কি [আল্লাহর পথে ব্যায় দ্রষ্টব্য ২.৩.৩]? প্রসঙ্গক্রমে এ বিষয়েও কিছু আলোচনা করা প্রয়োজন।

জীবন ও জগতের কল্যাণে সকল ব্যায়ই আল্লাহর রাস্তায় ব্যায়। আল্লাহর রাস্তায় বলা হয় কেননা এর কোন একক, গোষ্ঠীগত বা দলগত মালিকানা থাকে না। এর সুফল জগতের সকলেই পায় এবং পাওয়ার অধিকারও রাখে। কেননা সেটি আল্লাহর। আল্লাহ সকলের। তিনি যা করেন তা সকলের জন্য করেন। যেমন তিনি সকলের জন্যই অফুরন্ত আলো-বাতাস-পানি সরবরাহ করেন। তিনি বিশ্বাসী-অবিশ্বাসী দেখেন না। সকলেই তাঁর সৃষ্টি।

সমাজে শান্তি প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে অন্যায়, অপরাধ দমনের পেছনে ব্যায়িত অর্থও আল্লাহর রাস্তায় ব্যায়। একটি ভূল চিন্তা বা দর্শন জীবন ও জগতকে দুর্বিসহ করে তুলতে পারে। সেটিকে দুর করার জন্য যে ব্যায় সেটি আল্লাহর রাস্তায় ব্যায়। একটি সঠিক দর্শনকে প্রতিষ্ঠা করা যা মানুষকে সঠিক পথে চালিত করে সে পথে করা ব্যায় আল্লাহ রাস্তায় ব্যায়।

আল্লাহ রাস্তায় ব্যায় হচ্ছে সেই ব্যায় যা ব্যায় করা হয় ভাল নিয়তে ও কাজে; কোন বিনিময় প্রাপ্তির প্রত্যাশায় নয় কিংবা কোন সুনাম অর্জনের ইচ্ছেতেও নয় বা কারও আনুকূল্য প্রাপ্তির জন্যও নয়, কেবলমাত্র আল্লাহর

সন্তুষ্টির প্রত্যাশায় করা ব্যায় যা মানবজাতির বৃহত্তর কল্যাণের জন্য করা হয়।

মানুষের অর্থে আল্লাহর কোন প্রয়োজন নেই। কিন্তু এ বাণী দ্বারা আল্লাহ সামর্থবানদেরকে সমাজ ও জনকল্যাণে অর্থ ব্যায় করতে অনুপ্রাণীত করেছেন। তাতেই আল্লাহ সন্তুষ্ট হন। এভাবেই তিনি জগত পরিচালনা করেন। যারা তাঁর কাজে সহায়ক হয়ে তাঁর নির্দেশ পালন করে সত্যিকার অর্থে তারাই তাঁর কর্মে রত।

আল্লাহর রাস্তায় ব্যায় করার ক্ষেত্রে তাই জগতের সকল মানুষের ভাবনা বিবেচনায় রাখার মনোবৃত্তি থাকতে হবে। সংকীর্ণ চিন্তা পরিহার করতে হবে। মানব কল্যাণে যারা ব্যায় করে, সত্য ও ন্যায় প্রতিষ্ঠায় যারা ব্যায় করে তারাই বস্তুত আল্লাহর পথে ব্যায় করে। বৃহৎ ভাবনায় এগুলিই জাগতিক ভারসাম্য বজায় রাখে, জীবের কল্যাণ সাধন করে, জগতকে শান্তিময় ও বাসযোগ্য করে গড়ে তোলে।

যাদের উদ্বৃত্ত বা সীমাহীন অর্থ-সম্পদ আছে যা কিনা আল্লাহ প্রদত্ত, সে অর্থে আল্লাহর পথে ব্যায় করা তাদের দায়িত্ব ও কর্তব্য। এ কাজটি অর্থনৈতিক কাজের অন্তর্ভূক্ত। সমগ্র শরীরের সুস্থতার জন্য অক্সিজেন ও রক্ত যেমন শরীরের সর্বত্র প্রবাহিত হওয়া প্রয়োজন, তেমনি অর্থের প্রবাহ সর্বত্র তার আনুপাতিক হিসেবে যথাযথভাবে ও যথাযথস্থানে পৌঁছে যাওয়া প্রয়োজন এবং এর অবাধ চলাচলের ব্যাবস্থা সুপ্রতিষ্ঠিত হওয়া প্রয়োজন নিজেদেরই স্বার্থে।

আল্লাহর পথে ব্যায়ের ক্ষেত্রে বর্তমান সময়কেও বিবেচনায় নিতে হবে। আজকের বিশ্ব এবং যে সময়ে কোরআন অবতীর্ণ হয়েছে সে সময়ের বিশ্ব ও বিশ্বব্যাবস্থা একরকম নয়। কোরআনের শিক্ষা বা দিক-নির্দেশনা হচ্ছে স্থান-কাল-পাত্রকে বিবেচনা করা। কোরআন যখন অবতীর্ণ হয়েছে তখনও এটি সে সময়কাল, স্থান ও এর সাথে সংশ্লিষ্টদের বিবেচনায় রেখে পথ প্রদর্শন করেছে। এমনই কোরআনের দিক-নির্দেশনা।

বর্তমান সময়কে বিবেচনায় নিয়ে সে আঙ্গিকে কোরআনের দিক-নির্দেশনার বাস্তবায়ন করতে হবে। কোরআনের মৌলিক দিক-নির্দেশনা হচ্ছে, সব কালেই সামর্থবানদেরকে জীবন ও জগতের উন্নয়ন বা কল্যাণে তথা আল্লাহর রাস্তায়

ব্যায় করতে হবে। এর পারিবারিক, সামাজিক, রাষ্ট্রিয় ও বৈশ্বিক অনেক ভাল দিক আছে।

আল্লাহ একের দ্বারা অপরকে উপকৃত করেন। এভাবেই সমগ্র সৃষ্টি উপকৃত হয়। যখন কেউ যথাযথ পথে ব্যায় করে না, জমা করে রাখে বস্তুত সে দায়িত্ব পালন করে না। আল্লাহর অনুগ্রহ লাভ করেও আল্লাহর নির্দেশনা পালন করে না। এগুলি আল্লাহর পরীক্ষা। মানুষ কৃতজ্ঞ হয় নাকি অকৃতজ্ঞ হয় আল্লাহ দেখেন। এভাবে বলা হয় যেন মানুষ সঠিক কাজটি করে। মানুষকে ভাল কাজে উৎসাহ দেয়া হয়।

যাকাত দেয়া, দান করা এগুলিও আল্লাহর রাস্তায় করা ব্যায়। বিশেষত অর্থ-সম্পদ ব্যায় করার বিষয়গুলিকে এমনিভাবে নানা প্রকারে উৎসাহিত করা হয়েছে। তবে যাকাত, দান এগুলিকে সাময়িক বা তাৎক্ষণিক ব্যাবস্থা বলে ধরে নেয়া উচিত। কেননা এসব ব্যাবস্থা চিরদিনের জন্য মানুষের কাম্য নয় বা হতে পারে না। মানুষের তেমন দুর্দশাগ্রস্ত অবস্থা চিরতরে দুরীভূত হওয়া প্রয়োজন। সে লক্ষ্যে কাজ করা প্রয়োজন এবং সে ধারণারও প্রচার-প্রসার প্রয়োজন।

পৃথিবীর প্রতিটি মানুষই কোন না কোন কাজে নিয়োজিত আছে। প্রতিটি কাজের যদি স্বীকৃতি থাকে বা দেয়া হয় এবং সে কাজের বিনিময়ে যদি যথাযথ প্রাপ্তি নিশ্চিত করা হয়, তবে তো কাউকেই কারও দান-খয়রাতের ওপর নির্ভর করতে হবে না বা কারও দান-খয়রাতের দিকে চেয়ে থাকতে হবে না। আত্ম-মর্যাদা নিয়ে সকলেই নিজের মতো বেঁচে থাকবে বা থাকতে পারবে।

যারা দান করে তাদেরকে আল্লাহ বহুগুণে বৃদ্ধি করে দেবেন। কিন্তু যে অবস্থাটির কথা বলতে চাচ্ছি সেটি হচ্ছে কোনদিন যদি দান গ্রহণ করার মতো লোক খুঁজে না পাওয়া যায় তেমন একটি কাল্পনিক অবস্থা। মানুষ তো তেমন সমাজেরই স্বপ্ন দেখে। আজ যারা অর্থ-সম্পদের মালিক হয়েছে জীবনের প্রথম দিকে তারা কিংবা তাদের পূর্ব-পুরুষেরাও তেমন স্বপ্ন দেখেছে।

যেদিন দান গ্রহণ করার মতো মানুষ পাওয়া যাবে না সেদিন দান থেকে পাওয়া সওয়াব মানুষ কিভাবে অর্জন করবে? তবে কি তখন কৃত্রিমভাবে বা

বলপূর্বক কিংবা ছলনা করে কিছু মানুষকে দরীদ্র বানিয়ে রাখা হবে এ বাণীকে কার্যকর করার জন্য?

অতএব কেবল সওয়াব অর্জনের অলিক চিন্তাই নয়, কাজ করতে হবে সৃষ্টির বৃহত্তর কল্যাণের কথা ভেবে। যেন মানুষের সমস্যার সমাধান হয়। সওয়াব নিয়ে ভাবতে হবে না। ভাল কাজের ফলাফলরূপে সেটি আপনাতেই অর্জন হয়ে যাবে আল্লাহর সৃষ্টির সূত্র অনুসারে। সে জ্ঞান ও বিশ্বাস রাখতে হবে। কেবল শাব্দিক অর্থে কোরআন বুঝলে হবে না। এর অন্তর্নিহিতে যেতে হবে। আল্লাহই ভাল-মন্দ সকল কাজের সূক্ষাতিসূক্ষ হিসেব রাখেন ও সংরক্ষণ করেন। অতএব সওয়াব নিয়ে না ভেবে কাজ করতে হবে সৎ নিয়তে। বিনিময় প্রাপ্তির প্রত্যাশা ছাড়া। তাই গীতায় বলা হয়েছে,

"তোমার সুনির্দিষ্ট দায়িত্ব পালন কর ভগবানের (আল্লাহর) তুষ্টির কথা বিবেচনা করে।" (গীতা ৩:৯)

কোরআন বলছে, "... তোমার কর্তব্য পালনে মনযোগী হও এবং ভাল কাজ কর। আবার বলি তোমার কর্তব্য পালনে মনযোগী হও ও বিশ্বাস স্থাপন কর। আরও একবার বলি: তোমার কর্তব্য পালনে মনযোগী হও এবং সঠিক কাজ কর। আল্লাহ সৎকর্মীদেরকে ভালবাসেন।" (কোরআন ৫:৯৩)

প্রকৃত কথা হচ্ছে জীবন ও জগতের মঙ্গলের চিন্তা থেকে সকল কাজ নিঃস্বার্থভাবে করতে হবে। আর নিঃস্বার্থতার প্রমাণস্বরূপ কাজ করতে হবে আল্লাহর কারণে, নিজের বাহবা প্রাপ্তির জন্য নয়।

'আল্লাহ যাকে ইচ্ছে বহুগুনে বৃদ্ধি করে দেন'। বস্তুত আল্লাহর সারাসরি কিছু করার প্রয়োজন হয় না। আবার চাইলে তিনি সারাসরিও করতে পারেন। তাঁর সৃষ্ট সূত্রই এমন যে 'এটি করলে ওটি হবে'। সব কার্যকারণের সূতোয় গাঁথা। আল্লাহ অটোমেশন প্রক্রিয়া ঠিক করে রেখেছেন।

উদাহরণস্বরূপ বলা যেতে পারে যে, সংকীর্ণ চিন্তা থেকে কেবল নিজের জন্য কিছু করা হলে মানুষ শত্রু হয়ে দাড়াবে। আবার মানব কল্যাণে তথা আল্লাহর চিন্তা থেকে কিছু করা হলে মানুষই সহযোগী হয়ে এগিয়ে আসবে। কেননা আল্লাহ মানুষকে কোন কাজটি সংকীর্ণতা থেকে এবং কোন কাজটি নিঃস্বার্থতা

বা উদারতা থেকে তথা আল্লাহর কারণে করা হচ্ছে সেটিও বোঝার জ্ঞান দিয়েছেন।

এগুলি সৃষ্ট বা প্রতিষ্ঠিত সূত্র। এগুলিই সত্য। তাই বলা হয় আল্লাহ সত্য ভিন্ন জগত সৃষ্টি করেননি। তিনি তাঁর সৃষ্টির অভ্যন্তরে এগুলি সহজাত ধর্ম বা সূত্ররূপে প্রতিষ্ঠিত করে রেখেছেন। ফলে তাঁকে সবসময় সব বিষয় সরাসরি দেখতে নাও হতে পারে। তিনি জানেন এটি হলে ওটি হবে এবং মানুষের নিজের পরিবেশ-পরিস্থিতিই কোন একটি বিষয়কে প্রতিহত করবে কিংবা ত্বরান্বিত করবে।

একই সূত্রে মানুষ যখন আল্লাহর নিয়তে তথা সমগ্র মানব জাহানের কল্যাণের নিমিত্তে কাজ করে তখন অনেক মানুষ সহযোগী হয়ে যায় বা এগিয়ে আসে। প্রতিটি মানুষ এক একটি ধানের শীষের মতো ফল দেয়। একের প্রচেষ্টা কোটিতে উপনীত হয়। এভাবেই আল্লাহর সূত্র কাজ করে। এভাবেই ভাল কাজের ফলাফল বহুগুণে বৃদ্ধি পেয়ে যায়। যার ফল সকল মানুষই পায়। গাছ রোপন করলে তার ফল সবাই পায়। কেবল ফল নয় অক্সিজেনও সবাই পায়। হিন্দু, মুসলিম, বৌদ্ধ, খ্রীষ্টান, ইহুদি পৃথকভাবে পায় না।

মহৎ প্রাণ মানুষদের জীবনও এক একটি উদাহরণ। তাদের এককভাবে শুরু করা একদিনের আন্তরীক একটি ক্ষুদ্র প্রচেষ্টা পরবর্তীতে কোথায় গিয়ে পৌঁছেছে! নবী-রাসূলগণ, বিজ্ঞানীগণ কিংবা সকল বিষয় বা পেশার পথিকৃতগণ তাদের কর্ম ও প্রচেষ্টা সমগ্র মানবজাহানকে উপকৃত করেছে। এভাবেই আল্লাহ ফলাফল বহুগুণে বৃদ্ধি করে দেন।

মানুষের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দানের টাকায় রাস্তা-ঘাট-ব্রিজ থেকে শুরু করে কত কত উন্নয়ন হচ্ছে! বহুগুণে সমৃদ্ধ হচ্ছে জগৎ। সকল মানুষই এসবের উপকার ভোগ করছে! কেবল কোন নির্দিষ্ট ধর্মের মানুষ এসবের উপকারভোগী নয়। এমনই আল্লাহর দিক-নির্দেশনা! আল্লাহর দিক-নির্দেশনাকে যথাযথভাবে বুঝতে হবে এবং সেভাবে প্রচারও করতে হবে। বর্তমান সময়ের আঙ্গিকে বিষয়গুলি নিয়ে ভাবতে হবে। জগত ছোট হয়ে আসছে। মানুষ মিলেমিশে একাকার হয়ে যাচ্ছে।

আল্লাহ কারও একার নয়। ভগবান বা ঈশ্বরও কারও একার নয়। গডও কারও একার নয়। আল্লাহ একাই সবার সৃষ্টিকর্তা, আল্লাহ একাই সবার লালন-পালনকর্তা।

আলোচ্য আয়াতে যে উদাহরণ দেয়া হয়েছে সেক্ষেত্রে পরিপূর্ণ ফলন পেতে হলে বীজ হতে হবে ভাল, কৃষককে কৃষির জ্ঞান রাখতে হবে এবং জমিও হতে হবে উৎকৃষ্ট। তেমনি আল্লাহর রাস্তায় ব্যায়ের অর্থ, যাকাত বা দান করে পরিপূর্ণ ফল পেতে হলে যেখান থেকে দান করতে হবে সে উপার্জন হতে হবে উত্তম, যিনি দান করবেন তাকেও বুঝতে হবে দান করার যথাযথ ক্ষেত্র, যাকে বা যে স্থানে দান করা হবে তাকেও তা যথাযথভাবে ব্যাবহার করতে জানতে হবে। তবেই সে দান থেকে পূর্ণ ফল পাওয়া যাবে। আর সবকিছু ঠিকমতো হলে এক থেকে যে সাত'শ গুণ বেশী ফলন পাওয়া যায় বা সম্ভব এটি তার একটি উদাহরণ মাত্র। এটি যেমন আল্লাহর অনুগ্রহ, তেমনি আল্লাহ চাইলে তাঁর অনুগ্রহ আরও অধিক করে দিতে পারেন। আল্লাহর ক্ষমতা সীমাহীন। যেমন গীতায় বলা হয়েছে,

"কোনরূপ প্রতিদানের প্রত্যাশা না করে কর্তব্য মনে করে যথাস্থানে, যথা সময়ে ও যথাযথ পাত্রে দান করাকে সাত্বিকী প্রকৃতির দান বলে। কিন্তু যে দান প্রতিদান বা ফল প্রাপ্তির উদ্দেশ্যে অন্তরে অনুতাপ বা আক্ষেপ নিয়ে করা হয় সেটি রাজসিক এবং অশ্রদ্ধা ও অবজ্ঞার সাথে অ-স্থানে, অসময়ে ও অপাত্রে করা দানকে তামসিক বলে।" (গীতা ১৭:২০-২২)

দান হতে হবে সাত্বিকী প্রকৃতির। আল্লাহর পথে ব্যায়ের হাজারও রাস্তা আছে। তবে ব্যাক্তিক পর্যায়ে ব্যায় করার ক্ষেত্রে পরিবারের সদস্য, আত্মীয়-স্বজন, অভাবগ্রস্ত, প্রতিবেশী ইত্যাদি নানান বিষয় ও দিক বিবেচনা করে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে ব্যায় করা উত্তম। গুরুত্ব ও প্রয়োজনের তীব্রতার দিকে লক্ষ্য রেখেও ব্যায় করা উচিত। কেবল নাম-যশের জন্য নয়।

এটি সত্য যে মানুষ সাধারণত কোন নৈতিক, মানবিক বা কোন মহৎ কাজে অর্থ ব্যায় করতে চায় না বা উৎসাহ পায় না, যদি না তাদের অর্থনৈতিক বিষয় সম্পর্কিত ধারণার ক্ষেত্রে কোন পরিবর্তন আনা সম্ভব হয়। এখানে বস্তুবাদীরা অর্থ-সম্পদ স্তুপীকৃত করে, আনন্দ-ফুর্তি করে জীবনকে

যথাসাধ্য উপভোগ করে, অতঃপর মৃত্যুবরণ করে। তারা সবকিছু লাভ-লোকসানের পাল্লায় পরিমাপ করে। ব্যাক্তিগত ও নগদ বা তাৎক্ষণিক লাভ ভিন্ন তারা কোন কাজে অর্থ ব্যায় করতে চায় না। তাদের কাছে এটা আশা করা যায় না যে তারা কোন মহৎ কাজে অর্থ ব্যায় করবে লাভ-লোকসানের হিসেব হিসেব ছাড়া। এমনকি যখন দেখা যায় যে তারা কোন মহৎ কাজে ব্যায় করছে তখনও তারা সেটি ব্যায় করে হিসেব-নিকেশ করে যে এ ব্যায় কতটুকু তার নিজেকে, নিজের গোষ্ঠী বা নিজের দেশকে লাভবান করবে। তারা বিশ্বের সকল মানুষের মঙ্গলের কথা ভাবে না। এমন মানুষেরা নিজের প্রাপ্তি বা লাভের জন্য অপরকে অনাহারে রেখে মেরে ফেলতেও দ্বিধাবোধ করে না। বাস্তবে এমন ঘটছে। এগুলি যথাযথ মানসিকতা নয়।

এমন মানসিকতা পরিবর্তনের জন্যই কোরআনের এমন দিক-নির্দেশনা। তাই আল্লাহর পথে ব্যায় করতে উৎসাহ দেয়া হয়েছে। যা সারা বিশ্বের মানুষকে বিবেচনা করে করা হয়ে থাকে। এ জন্য বড় দৃষ্টিভঙ্গী ও উদার মানসিকতা গড়ে তোলা প্রয়োজন। এর জন্য সামাজিক ব্যাবস্থায়েও পরিবর্তন আনা প্রয়োজন এবং সে লক্ষ্যে কাজ করা প্রয়োজন। যা ব্যাক্তিক লাভ বা বস্তুবাদী দৃষ্টিভঙ্গীকে মহৎ দৃষ্টিভঙ্গীতে পরিবর্তন করে দেবে। তেমন যথাযথ মানসিকতা গড়ে তোলার জন্যই এখানে ব্যায় সংক্রান্ত বিষয়ে দিক-নির্দেশনা দেয়া হয়েছে। কোরআনের দিক-নির্দেশনার বাস্তব ও ন্যায়সঙ্গত বিচার-বিশ্লেষনকে যথাযথভাবে উপলব্ধি করতে পারলে তা জগতের সকল মানুষকেই নিঃসন্দেহে অভিভূত করবে!

মানুষ কাজ করে পরে, আগে তার ভেতরে চিন্তার উন্মেষ ঘটতে হয়। একটি মহৎ চিন্তার সাথে একটি ভাল দর্শন কাজ করে। সঠিক দর্শনই মানুষকে সঠিক পথে চালনা করে। দর্শনই মূল। এক অন্ধকার সময়ে বা যুগে ইসলাম চিন্তার জগতকে আলোড়িত ও আলোকিত করতে একটি মহৎ দর্শন নিয়ে মানবজাতির সম্মুখে আবির্ভূত হয়েছে। এমন মহৎ আন্দোলন বা সংগ্রামের ব্যার্থতা মানবজাতিকে অন্ধকারে নিমজ্জিত করে দিতে পারে। অপরদিকে এর সফলতা অন্ধকার থেকে মানুষকে উদ্ধার করতে পারে।

একক প্রচেষ্টায় বড় কোন মহৎ কাজ করা সম্ভব হয়ে ওঠে না। সম্মিলিত প্রয়াস প্রয়োজন। প্রয়োজন অর্থের। তৎকালীন প্রেক্ষাপট বিবেচনায় বিশ্বাসীদেরকে

এ কাজে এগিয়ে আসতে নানাভাবে উৎসাহিত ও উদ্বুদ্ধ করা হয়েছে। বর্তমান প্রেক্ষাপটে সকল মানুষকেই এগিয়ে আসতে হবে আল্লাহর পথে তথা সমগ্র মানবতার কল্যাণার্থে ব্যায় করার জন্য।

কেউ যদি ভাল কাজ করে অর্থাৎ আল্লাহর রাস্তায় ব্যায় করে, তবে সে যেন বিশ্বাস রাখে যে বিনিময়ে আল্লাহ অধিক বৃদ্ধি করে দেন। তাই ধানের শীষের এ উদাহরণের মাধ্যমে আল্লাহর সক্ষমতার বাস্তব চিত্র তুলে ধরা হয়েছে। মানুষ সচক্ষে যখন আল্লাহর এমন অনুগ্রহের উদাহরণ দেখতে পায় যা দ্বারা শতকোটি মানুষকে তিনি আহার করাচ্ছেন, তখন সে ব্যায় করতে কার্পণ্য করে না। উৎসাহিত হয়। তার ভেতরে বিশ্বাস জন্মায়। তবে এ উৎসাহটি খুব সাধারণ মানুষদের জন্য প্রেরণাদায়ক হতে পারে।

যারা জ্ঞানত সমাজে ভাল ও প্রয়োজনীয় কাজের গুরুত্ব অনুধাবন করে তারা তাদের জ্ঞানের কারণেই ভাল পথে তথা আল্লাহর রাস্তায় স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে ব্যায় করে। এটিই ঈমানের জোর।

এমন মানুষদের আল্লাহ সরাসরি পুরস্কার নাও দিতে পারেন। তাদেরকে আল্লাহ কঠিন পরীক্ষায় ফেলতে পারেন। এভাবেই তিনি সন্দেহাতীতভাবে আসল-নকল চিনে নেন। বলা হচ্ছে,

“মানুষ কি মনে করে যে তারা একথা বলেই অব্যাহতি পেয়ে যাবে যে, আমরা বিশ্বাস করি এবং তাদেরকে পরীক্ষা করা হবে না? আমি তাদেরকেও পরীক্ষা করেছি যারা তাদের পূর্বে ছিল। এভাবেই আল্লাহ প্রকাশ করেন কে সত্যনিষ্ঠ এবং প্রকাশ করেন কে মিথ্যেরূপ ধারণকারী।” (আল-কোরআন ২৯:২-৩)

এদের জন্যও পুরস্কার আছে! সেটি পরিমাণে যেমন অধিক ও তেমনি অধিক আনন্দদায়ক। তবে সেটি পাওয়া সময় সাপেক্ষও হতে পারে। সেটি ইহকালে প্রাপ্ত নাও হতে পারে। পরকালে প্রাপ্ত হতে পারে। অতএব হতাশা নয়। আশাবাদী হতে হবে। উচ্চতর পর্যায়ের এমন ভাবনা ও ধৈর্য্যশক্তির জন্য অন্তরে সত্যিকার বিশ্বাসী হতে হবে।

আল্লাহর হিসেব বোঝা সহজ নয়। আল্লাহ যাকে ইচ্ছে বহুগুনে বৃদ্ধি করে দেন। মানুষকে কেবল স্বার্থচিন্তা পরিত্যাগ করে ভাল কাজ করে যেতে হবে।

এমনকি জগতের মানুষও কোন মানুষের করা ভাল কাজ প্রত্যক্ষ করে। তারাও তেমন সৎ কাজ ও প্রচেষ্টার যথাযথ মর্যাদা ও প্রতিদান দিয়ে থাকে। মানুষের মধ্য দিয়েই আল্লাহ তার কাজ সম্পন্ন করে নেন। এভাবেও আল্লাহ প্রতিদান দেন। আল্লাহতেই ভরসা রাখতে হবে।

আল্লাহর বিচার ব্যাবস্থা অতি সূক্ষ [আল্লাহর ইচ্ছে দ্রষ্টব্য ২.১৪২.৩]। এটি জাগতিক কাগুজে বিচার ব্যাবস্থার মতো নয়। তিনি মানুষের অন্তরের অবস্থা এমনকি নিয়ত সম্পর্কেও অবগত। তিনি সবকিছুকে বিবেচনায় নিয়ে সিদ্ধান্ত নেন। তাঁর কাজের অনেক কিছুই মানুষ জানতে বা বুঝতেও পারে না। বুঝতে পারে না বিধায় এভাবে বলা হয় যে, আল্লাহ যাকে ইচ্ছে বহুগুনে বৃদ্ধি করে দেন। বস্তুত আল্লাহ সবকিছুই তাঁর যথাযথ বিবেচনায় সত্যের আলোকে করেন।

▪ **২.২৬১.২** আল্লাহ সবকিছুকে পরিবেষ্টন করে রাখেন, সর্বজ্ঞ (Allah is All-Embracing, All-Knowing) : আল্লাহ সবকিছুকে পরিবেষ্টন করে রাখেন। যেমন গীতায় বলা হয়েছে,

"ভগবান! ... সকল কিছুকে পরিবেষ্টনকারী এবং সবকিছু তার মধ্যেই স্থিত।" (গীতা ৮:২২)

যিনি সবকিছুকে পরিবেষ্টন করে রাখেন তিনি পরিবেষ্টিত সকল বিষয় সম্পর্কে জ্ঞাত। তিনি সব জানেন। তাই সর্বজ্ঞ।

যে সময়ে এসব বাণী অবতীর্ণ হয়েছে সে সময়ে বিষয়গুলি বিশ্বাস করা মানুষের জন্য কঠিন ছিল। এত উচ্চ পর্যায়ের জ্ঞান সাধারণ মানুষের ছিল না। কোরআনে আল্লাহ বলেছেন,

"সৃষ্টিগতভাবে মানুষ ত্বরাপ্রবণ। আমি তোমাদেরকে আমার নিদর্শনাবলী প্রদর্শন করব, তবে আমাকে ত্বরা করতে বল না।" (আল-কোরআন ২১:৩৭)

বিজ্ঞানের কল্যাণে বর্তমান সময়ে মানুষের জন্য বিষয়গুলি উপলব্ধি করা অনেক সহজ হয়ে গেছে। আর তাই আল্লাহ বলেছেন যে মানুষকে তিনি তাঁর নিদর্শনাবলী প্রদর্শন করবেন। বর্তমান সময়ের মানুষ আল্লাহর নানাবিধ নিদর্শন দেখতে পাচ্ছে।

মানব দেহের ভেতরে যাদের বসবাস, যারা দেহের ভেতরেই খাদ্য গ্রহণ করে হৃষ্টপুষ্ট হচ্ছে তারা জানে না যে তাদের চাহিদা মানুষ তাৎক্ষণিক অবহিত। আল্লাহ সমগ্র মহাবিশ্বের সবকিছু তাৎক্ষণিক অবহিত।

আল্লাহ জানেন কেন, কাকে, কখন, কোথায় বৃদ্ধি করে দিতে হবে। বিশ্বাসী হয়ে মানুষকে কেবল ভাল কাজ করে যেতে হবে। আল্লাহ তাঁর বিবেচনায় যাকে ইচ্ছে বহুগুনে বৃদ্ধি করে দেন। আল্লাহর ওপর ভরসা রাখতে হবে।

মানুষকে দিয়ে ভাল কাজ করাবার জন্য এ বিশ্বাসটুকু স্থাপন করানও গুরুত্বপূর্ণ। তবে এটিও বুঝতে হবে যে আল্লাহ কিভাবে জানবেন সেটি একান্তই তাঁর বিষয়।

▪ **২.২৬২.১** যারা স্বীয় ধন সম্পদ আল্লাহর রাস্তায় ব্যায় করে, অতঃপর সে অনুগ্রহের কথা প্রকাশ করে না এবং কষ্টও দেয় না তাদেরই জন্য তাদের পালনকর্তার কাছে রয়েছে পুরস্কার : মানুষ স্মরণ রাখে। সে প্রাপ্ত অনুগ্রহের কথা স্মরণ রাখে। তবে প্রাপ্ত সে অনুগ্রহের কথা কৃতজ্ঞতার সাথে প্রকাশ করবে কি করবে না সেটি তার নিজের বিবেচনা। কেননা অনুগ্রহ দানের বিনিময়ে গ্রহীতার অন্তরে কষ্ট দেয়া, তাকে অবজ্ঞা করা, অপমান করা, লজ্জা দেয়া মানুষ সেগুলিও স্মরণ রাখে।

মানুষের যখন সুদিন যায় সে দাম্ভিক হয়ে যায়। আবার একই মানুষ যখন দুর্দিনে পতিত হয় সে তখন অনুভব করে যে সব আল্লাহর হাতে। তিনি আবার তাকে সব ফিরিয়ে দিতে পারেন। সে আশাবাদী হয়। কেউ কেউ আবার হতাশাগ্রস্তও হয়। আবার মানুষ এটিও স্মরণ করে যে দুর্দিনে কে তার সাথে কেমন আচরণ করেছে। সহযোগীতা করা সত্বেও যে খারাপ ব্যাবহার করে মানুষ সেটিকেও ভূলে যায় না।

এ বাণী যেমন ব্যাক্তিক পর্যায়ের জন্য প্রযোজ্য তেমনি সামষ্ঠিক পর্যায়ের জন্যও প্রযোজ্য। ব্যাক্তি যেমন ভূল আচরণের ফল পায় তেমনি সমষ্ঠিও পায়। যারা দান করার পরে দান গ্রহীতাকে কষ্ট দেয় তারা ভূল আচরণ করে। এটি না করা উত্তম। এখানে সে কথা স্মরণ করিয়ে দেয়া হয়েছে। এভাবে করা দান অর্থহীন হয়ে যায়। কেননা যে দান গ্রহণ করে সে বিপদগ্রস্ত বিধায় নিশ্চুপে দান গ্রহণ করে নেয় ঠিক, কিন্তু তার অন্তর সে মানুষকে বর্জন করে।

এমন দান দাতার জন্যও কোন ভাল ফল বয়ে আনে না। বিপদের দিনে তেমন দাতা এমনকি উক্ত দান গ্রহীতার সাহায্যও হয়তবা নাও পেতে পারে। কিংবা পেলেও একই আচরণ পেতে পারে। কেননা সে উপকারের চেয়ে কষ্টটাই অধিক স্মরণ রাখে।

মন্দ আচরণের সঙ্গে দম্ভ, ঔদ্ধ্যত্য ও অহংকারের সম্পর্ক আছে। অহংকার তারাই করে যারা আল্লাহর কারণে উদ্বুদ্ধ হয়ে কাজগুলি করে না। সেখানে নিয়তে সমস্যা থাকে।

আল্লাহ কখন কাকে কোন অবস্থায় রাখবেন কেউ জানে না। নাখোশ গ্রহীতা দাতার ভাল গুণটির চেয়ে মন্দ গুণটিই বেশী প্রচার করে। দুনিয়াতেই এই মন্দ প্রচারের মন্দ ফলাফল আছে। এ রকম দাতারা মূলত লোক দেখানর জন্য দান করে। তারা আল্লাহতে বিশ্বাস করে না। এ আচরণ তারও প্রমাণস্বরূপ হয়ে যায়। কেননা সে নিজেও বিশ্বাস করে না যে আল্লাহই তাকে পরীক্ষা করার জন্য অফুরন্ত দান করেছেন এবং তাতেই সে অপরকে দান করার সক্ষমতা অর্জন করেছে। সে ভাবে যে সে তার নিজ যোগ্যতায় এতসব অর্জন করেছে। তার যোগ্যতা অর্জনের প্রতিটি পর্যায়ে সে যে আল্লাহর আশীর্বাদপ্রাপ্ত এটি সে ভূলে যায়।

যারা তেমন ভূল আচরণ করে না সেটি যেমন দান গ্রহীতার প্রতি তার সহমর্মীতা ও আন্তরিকতার বহিঃপ্রকাশ ঘটায়, তেমনি এটি আল্লাহর প্রতি তার দৃঢ় বিশ্বাসেরও প্রমাণ বহন করে। তারা তাদের ভাল আচরণের পুরস্কার প্রাপ্ত হয় আল্লাহর প্রতিষ্ঠিত সূত্র বা নিয়ম অনুসারে। ভালদের সুনাম পার্থিব জীবনেও ছড়িয়ে পড়ে। পার্থিব জীবনেও ভাল আচরণের ভাল ফলাফল প্রতীক্ষা করে। কেবল সময়ের অপেক্ষা।

আল্লাহতে বিশ্বাসের কারণেই ভালদের এমন পুরস্কার। আল্লাহতে বিশ্বাস মানুষের ভাল গুণাগুণগুলিকে জাগিয়ে তোলার সহায়ক। আল্লাহ ভাল কাজের পুরস্কার প্রাপ্তি থেকে কাউকে বঞ্চিত করেন না (আল-কোরআন ১১:১১৫)। এটিও সূত্র। বিষয়টি যদিও যৌক্তিক ও সূত্রে আবদ্ধ তথাপি কোরআনে সেটি ঘোষনা করে আল্লাহ মানুষকে নিশ্চিত করেছেন। এ নিশ্চিতকরণ বিশ্বাসীদের বিশ্বাসের দৃঢ়তা ও আশাকে বেগবান করে। আল্লাহর ওপর ভরসা রেখে, তাঁকে হাজির জেনে নিভৃতে ভাল কাজ করাকেও এ বিশ্বাস উৎসাহিত করে। আল্লাহতে

বিশ্বাসী লোক দেখানর জন্য নয় কিংবা মানবীয় প্রশংসা প্রাপ্তির প্রত্যাশায়ও কাজ করে না।

যারা স্বীয় ধন সম্পদ আল্লাহর রাস্তায় ব্যায় করে, অতঃপর সে অনুগ্রহের কথা প্রকাশ করে না এবং মানুষ তথা দান গ্রহীতাকে কষ্টও দেয় না তাদেরই জন্য তাদের পালনকর্তার কাছে রয়েছে পুরস্কার- এ বার্তা দিয়ে মানুষকে বস্তুত দান গ্রহীতাদের প্রতি মন্দ আচরণ করা থেকে বিরত থাকতে বলা হয়েছে। অহংকার বা দম্ভ প্রকাশ করা থেকে বিরত থাকতে বলা হয়েছে। ভাল-মন্দ সব পরিস্থিতির পেছনে একজন আল্লাহ আছেন সেটি স্মরণ রাখতে উদ্বুদ্ধ করা হয়েছে।

▪ **২.২৬২.২** তাদের অন্তরে না কোন ভীতির সঞ্চার হবে, না তারা নিপতিত হবে কোনরূপ মনকষ্টে (There shall no fear come upon them, neither shall they grieve) : যে বা যারা ভাল কাজ করে তেমন বোধসম্পন্ন মানুষদের নিজেদের ভেতরেও একটি হিসেব কাজ করে। তারা সব সময় আল্লাহকে স্মরণ করে। কেননা তাদের আচরণ হয় বিনয়ী। তেমন মানুষ প্রতিটি কাজের সাথে আল্লাহর নির্দেশনাকে বিবেচনা করে। এটি কেবল আল্লাহতে ব্যাহ্যিক বিশ্বাসের কারণেই নয়, প্রত্যেক বোধ ও জ্ঞানসম্পন্ন মানুষের ভেতরে স্রষ্টাই সে মেশিন বসিয়ে দিয়েছেন যা দ্বারা সে তার নিজের কাজের একটি ভাল-মন্দ হিসেব নিজে করে নেয় বা নিতে পারে। কিন্তু সবাই সে মেশিনের যত্ন নেয় না বিধায় কারও ভেতরে হয়তবা সে যন্ত্রটি তেমনভাবে সচল নাও থাকতে পারে।

যারা বিষয়গুলি নিয়ে ভাবে তাদের নিজেদের ভেতরেও একটি হিসেব থাকে যে সে ভাল কাজ করছে নাকি মন্দ কাজ করছে? কোনটি অধিক করছে। তারা তাদের নিজেদের করা ভাল কাজগুলি বুঝতে পারে। ফলে তারা এতটুকু বোঝে যে, সে যখন মন্দ কাজ করেনি তখন কেন আল্লাহ তাকে শাস্তি দেবেন? কিংবা কেনইবা সে আল্লাহর ঘোষিত পুরস্কার প্রাপ্তি থেকে বঞ্চিত হবে?

তার হিসেব তাকে জানান দেয় যে সে মন্দ কাজ করেনি। ভাল কাজ করেছে। আল্লাহতে যে বিশ্বাস রাখে সে জানে যে আল্লাহ তার সকল কাজ

দেখছেন ও হিসেব রাখছেন। আল্লাহ তার ভাল কাজ সম্পর্কে অবহিত। ফলে মন্দ কাজের কারণে অন্তরে যে ভয় বা শংকা সৃষ্টি হয়, তার ভেতরে সেটি আসে না। তার ভেতরে ভীতি বা মনকষ্ট কাজ করে না। কেননা সে এটিও জানে এবং বিশ্বাস করে যে, আল্লাহ কখনও কারও প্রতি অন্যায় করেন না। তাদের অন্তর নিভৃতে আল্লাহতে দৃঢ় বিশ্বাসী। বিশ্বাসী বলেই তারা কর্মের হিসেব করে। তাদের অন্তর আল্লাহর বিচার ব্যাবস্থাকে স্বীকার করে।

আল্লাহ মানুষকে যা জানিয়েছেন সব সত্য। অর্থাৎ সবই সূত্রের খেলা। সূত্রের উপস্থিতির কারণেই কর্ম তার সূত্রানুসারে ফল প্রদান করে। কিন্তু সবাই সব সূত্র ঘাটতে যাবে না। কিছু মানুষকে কেবল বিশ্বাসই রাখতে হবে।

▪ **২.২৬৩.১** দান করে কষ্ট দেয়ার চেয়ে সদয় কথায় ক্ষমা চেয়ে নেয়া উত্তম (A kind word with forgiveness is better than almsgiving followed by injury) : পূর্বের আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছে যে যারা স্বীয় ধন-সম্পদ আল্লাহর রাস্তায় ব্যায় করে, অতঃপর সে অনুগ্রহের কথা প্রকাশ করে না এবং কষ্টও দেয় না তাদেরই জন্য তাদের পালনকর্তার কাছে রয়েছে পুরস্কার। দান করার পাশাপাশি যারা অহংকার প্রদর্শন করে তারা ভূল আচরণ করে। এক অর্থে সেটি বোকামিও।

বলা হচ্ছে, তেমন বোকামি না করা উত্তম। এ আয়াতে পরামর্শ দেয়া হচ্ছে যে, দান না করতে চাইলে অন্তত অপারগতা স্বীকার করে ক্ষমা চেয়ে নেয়া উত্তম। কিন্তু অহংকার প্রদর্শন, কোন রূঢ় বা কোনরকম মন্দ বা ঔদ্ধত্যপূর্ণ আচরণ করা উচিত নয়।

ক্ষমা চাওয়ার বিষয়টি বিনয়ের সাথে সম্পর্কিত। আল্লাহ মানুষের প্রতি মানুষকে আচরণে বিনম্র হতে শিক্ষা দিয়েছেন বা বলা যেতে পারে যে, দম্ভ ও ঔদ্ধ্যত্ত প্রদর্শন বা প্রকাশ না করতে শিক্ষা দিয়েছেন। আবার এটি আল্লাহকে অন্তরে সর্বদা স্মরণ রাখার সাথেও সম্পর্কিত বিষয়। আল্লাহকে স্মরণ রাখার সাথে বিষয়টি কিভাবে সম্পর্কিত? প্রথমত: আল্লাহর দিক-নির্দেশনার কারণে বিষয়টি যে মেনে চলে তাতে বোঝা যায় যে সে এ বিষয়ে সচেতন। সে আল্লাহর দিক-নির্দেশনাকে তথা আল্লাহকেই সর্বদা অন্তরে স্মরণ রাখে। দ্বিতীয়ত: আল্লাহর ওপর ভরসাকারী মাত্রই বিশ্বাস করে যে ভাল-মন্দ অবস্থা-অবস্থান

সবই আল্লাহর হাতে। আল্লাহ কখন কাকে কোন অবস্থায় রাখবেন কেউ জানে না। সকল মানুষেরই বিপদের দিনের জন্য প্রস্তুত থাকা উত্তম। সবই আল্লাহর পরীক্ষা। আজ যার দীর্ঘ দশা কাল তার ভাল হতে পারে। আবার উল্টোটিও হতে পারে। অতএব আল্লাহর ভাবনা তার ভেতরে সর্বদা বিদ্যমান। সে আল্লাহকে স্মরণকারী। আল্লাহকে স্মরণকারী বিবেচক মানুষই আচরণে নম্র ও বিনয়ী হয়ে থাকে।

দাতার কখনই এভাবে ভাবা উচিত নয় যে সে দান গ্রহীতার মহা উপকার করে ফেলেছে। সূত্রটি হচ্ছে যে, যে দান করে সে নিজের উপকারের জন্য করে। কিন্তু উপকার প্রাপ্তির সে প্রত্যাশাটি হবে আল্লাহর দিক থেকে। তাই আল্লাহতে বিশ্বাস প্রয়োজন। আল্লাহতে বিশ্বাস মানুষকে দিয়ে নিঃস্বার্থভাবে ভাল কাজ করায়। এটি একটি সূত্র মানুষের জন্য।

যদিও সত্য হচ্ছে যে নিঃস্বার্থভাবে মানুষকে ভাল কাজ করতে হয় বস্তুত জ্ঞানের কারণে। জ্ঞান জানে জাগতিক মঙ্গলের জন্য নিঃস্বার্থভাবেই ভাল কাজ করতে হয়। কিন্তু অধিকাংশ মানুষকে সূত্রে ফেলে দিয়ে ভাল কাজ করাতে হয়। তাই বিশ্বাসী জানে যে আল্লাহ সব দেখেন। সে পুরস্কার প্রাপ্তির জন্য ভাল কাজ করে।

বিশেষভাবে উল্লেখ্য যে, দান গ্রহীতারও উচিত নয় যে সে অকৃতজ্ঞ হবে। এ বিষয়টিও গুরুত্বপূর্ণ। তেমন ক্ষেত্রে মানুষ দান করতে আর উৎসাহিত হবে না। অকৃতজ্ঞ আচরণ দান গ্রহীতার দিক থেকে ভূল বা বোকামি আচরণ। অকৃতজ্ঞতার ফলাফল ভয়ংকর। এটি সব ভাল কাজ করাকে স্তব্ধ করে দিতে পারে। তথাপি এমন আচরণের ক্ষেত্রে দান গ্রহীতাকে ক্ষমা করে দিতে পারা উত্তম, যদিও কষ্টকর।

■ **২.২৬৩.২** আল্লাহ পরিপূর্ণ, প্রশান্তিময় (Allah is Absolute, Clement) : আল্লাহ সকল দিক থেকে পরিপূর্ণ [আল্লাহ দ্রষ্টব্য ২.২০.২]। মানুষের দান আল্লাহর প্রয়োজন নেই। কিন্তু মানুষের করা দান মানুষের নিজেদের মঙ্গলের জন্যই প্রয়োজন। এর বদৌলতে আল্লাহ তাকে পুরস্কৃত করেন। কারণ এ দানের বদৌলতে তার আরেক ভাই অর্থাৎ আল্লাহর দিক থেকে কোন না কোন

মানুষই উপকৃত হয়। অতএব যে দান করবে সে নিজের বা নিজেদের মঙ্গলের জন্য করবে।

আল্লাহ মানুষকে এমন দিক-নির্দেশনা প্রদান করেন যা মানুষের জন্য শান্তিদায়ক। আল্লাহ নিজেও প্রশান্তিময়। তিনি অশান্তিকে পছন্দ করেন না। যারা ভূল আচরণ করে তাদের কাজের পরিণাম তাদের নিজেদের জন্য এবং অপরের জন্য এমনকি সমাজের জন্য মন্দ পরিণাম বয়ে নিয়ে আসে। কিন্তু খুব সাধারণ মানুষ বিষয়গুলির সম্পর্কগুলি সহজে বুঝতে পারে না। কিন্তু আল্লাহ সব দেখেন। সময়টা মানুষের কাছে দীর্ঘ মনে হলেও আল্লাহর কাছে মূহুর্তেরও কম। তিনি পুরোটা দেখেন। কোন মানুষের একদিনের কোন ভূল আচরণের পরিণাম তার পরবর্তী মন্দ ঘটনাগুলিকে ত্বরান্বিত করেছে তিনি জানেন।

আল্লাহ মানুষকে তাই সঠিক দিক-নির্দেশনা দেন। যা প্রশান্তিদায়ক। যা সমাজে শান্তি বয়ে নিয়ে আসে। যারা স্বীয় ধন-সম্পদ আল্লাহর রাস্তায় ব্যায় করে, অতঃপর সে অনুগ্রহের কথা প্রকাশ করে না এবং মানুষকে কষ্টও দেয় না তাদেরই জন্য তাদের পালনকর্তার কাছে রয়েছে পুরস্কার। অতঃপর বলা হয়েছে, দান করে কষ্ট দেয়ার চেয়ে সদয় কথায় ক্ষমা চেয়ে নেয়া উত্তম। এগুলি সবই শান্তির সহায়ক বাণী। না অন্যের ভেতরে কষ্ট ও রাগের সৃষ্টি করে, না নিজের ভেতরে অহংকার ও ঔদ্ধত্যপূর্ণ আচরণ সৃষ্টির মাধ্যমে নিজের ক্ষতি করে। নির্দেশনাগুলি সবভাবে সকলের জন্যই প্রশান্তিদায়ক। আচরণগুলি মানুষের ধৈর্য্যের সাথেও সম্পর্কিত। কেননা ধৈর্য্যের অভাবেও মানুষ মন্দ আচরণ করে। আল্লাহ সহনশীল, ধৈর্য্যশীল। মানুষকে তা স্মরণ করিয়ে দেয়া হয়েছে যেন মানুষ ভাল গুণাবলী অর্জন করার চেষ্টা করে।

দাতার ভূল আচরণের রেষ গ্রহীতার ভেতরে ক্ষত সৃষ্টি করে থেকে যায়। সেগুলি সম্মিলিতভাবে একসময়ে বড় হয়ে সমাজে অশান্তির সৃষ্টি করে। বিষয়গুলি খুবই সূক্ষ্ম। কিন্তু মানুষের ভেতরে বড় প্রভাব রেখে যায়। তাই সব মানুষ বিষয়গুলি বুঝতে পারে না, কিংবা বুঝেও বলে না বা প্রকাশ করে না। কোরআন মানুষের সাথে মানুষের এমন আচরণ না করতে দিক-নির্দেশনা দিয়েছে।

আল্লাহ পরিপূর্ণ, প্রশান্তিময়, সহনশীল। যেখানে ঘাটতি সেখানেই আকাংখা। যেখানে আকাংখা সেখানেই অশান্তি। আল্লাহ সকল দিক থেকে নিখুঁতভাবে পরিপূর্ণ তাই প্রশান্তিময়, সহনশীল।

আল্লাহ নিজেই শান্তির ধারক। জগতে শান্তি বজায় রাখতে তাই তিনি দিক-নির্দেশনা প্রেরণ করেছেন। দিক-নির্দেশনার পথ ধরে চললে জগত শান্তিময় হবে। গভীর মনযোগ দিয়ে আল্লাহর নির্দেশনাগুলি বিশ্লেষণ করলে বোঝা যাবে যে, এখানে প্রতিটি নির্দেশনা এমনকি আচরণগত নির্দেশনাগুলিও এমনভাবে দেয়া হয়েছে যে এগুলি সকল মানুষকে প্রশান্তি দান করে। যেমন দানের ক্ষেত্রে দান গ্রহীতাকে প্রশান্তি দেয় তেমনি আবার দাতাকেও। তবে বিষয়গুলি মেনে চলার জন্য আল্লাহতে বিশ্বাস সকল ক্ষেত্রেই গুরুত্বপূর্ণ।

মানুষ আল্লাহর নির্দেশনা বহির্ভূত কাজ ও আচরণ করার মধ্য দিয়ে বস্তুত জগতকে অশান্ত করে তোলে। অতঃপর আবার তাঁরই দরবারে হাত তোলে শান্তির প্রত্যাশায়। অথচ আল্লাহর দিক-নির্দেশনার বাইরে কাজ করে নিজেরাই নিজেদের শান্তি নষ্ট করে। কেউ আবার কখনও অজ্ঞতার কারণে আল্লাহকেই নানাবিধ বিষয়ে দোষারোপ বা দায়ী করে বসে। সবই ভূল আচরণ এবং আল্লাহর নির্দেশকে সঠিক বিশ্লেষণে সঠিকভাবে বুঝতে না পারার ফল। গীতায় বলা হয়েছে,

"যেসব বিবেকহীন মানুষ শাস্ত্র বহির্ভূত ঘোর তপস্যার মাধ্যমে অন্তরস্থ আমাকেও ক্লিষ্ট করে তাদেরকে নিশ্চিতভাবে আসুরিক বলে জানবে।" (গীতা ১৭:৫)

আল্লাহ প্রশান্তিময়। এমনকি অতি ভক্তির নামে শাস্ত্র বহির্ভূত অতি তপস্যার মাধ্যমে তাঁকে ক্লিষ্ট করে সন্তুষ্ট করার প্রচেষ্টাকেও তিনি পছন্দ করেন না। সেসবও যন্ত্রনার কারণ। প্রশান্তির স্থান তাঁর পছন্দনীয়। কেবল তাঁর নির্দেশনার অনুসরণই প্রশান্তি ও পূর্ণতা দান করতে পারে।

▪ **২.২৬৪.১** হে বিশ্বাসীগন! তোমরা অনুগ্রহের কথা প্রকাশ করে এবং কষ্ট দিয়ে নিজেদের করা দানকে অর্থহীন করে দিও না, সে ব্যাক্তির মতো যে নিজের ধন-সম্পদ ব্যায় করে লোক দেখানোর উদ্দেশ্যে এবং আল্লাহ ও শেষ দিবসকে বিশ্বাস করে না : দানের বিষয়ে আচরণগত কিছু দিক ওপরেও

আলোচিত হয়েছে। কারও প্রতি করা অনুগ্রহের কথা প্রকাশ করা তাকে সমাজে ছোট করার অনুরূপ। পরোক্ষভাবে অপমান করা। উল্লেখিত আচরণ দাতার অর্জনকে দু'ভাবে নষ্ট করে। ইহকালে ও পরকালে।

মানুষ কে কখন কোন অবস্থায় থাকবে কেউ জানে না। বিপদের দিনে এমন ধরণের মানুষ মানুষের নিকট থেকে খুব একটা সহায়তা নাও পেতে পারে, কিংবা পেলেও তেমন আচরণ পেতে পারে যেমনটি একসময় সে নিজে করেছে। আবার তেমন আচরণ না পেলেও মানুষ তাকে কেবল করুণা করতে পারে। দান করার ফলে দান গ্রহীতার নিকট থেকে দাতা যে ভক্তি-ভালবাসা অর্জন করে, এমন আচরণের কারণে সে নিজেই সেটি নষ্ট করে দেয়। এগুলি মন্দ আচরণের ইহকালীন ফলাফল।

আবার ভাল কাজ করার মাধ্যমে দাতা আল্লাহর দিক থেকে ভাল যা কিছু অর্জন করে সে সেটিও নষ্ট করে দেয়। তার ভেতরের নিয়তটি আল্লাহ জানেন। সে নিজেকে জাহির করার ইচ্ছে থেকে দান করে। বস্তুত এ ধরণের মানুষ আল্লাহ ও শেষ দিবেস বিশ্বাস করে না। যারা আল্লাহ ও শেষ দিবসে বিশ্বাস করে তারা এমন আচরণ করে না। মানুষও তাদের আচরণের ধরণ থেকে বিষয়গুলি বুঝতে পারে।

এমন মানুষ এ জগতেই তাদের প্রাপ্য সন্মান ও পুরস্কারের প্রত্যাশি। আল্লাহ চাইলে তাদেরকে তাদের প্রত্যাশা অনুযায়ী ইহকালেই পুরস্কার দিতে পারেন। তবে সেটি পরবর্তী সময়ের জন্য ভাল হবে নাকি মন্দ হবে সেটি আল্লাহই ভাল জানেন। যদি কেউ সত্যিকার আল্লাহতে বিশ্বাসী হয় তবে সে এমন কাজ করা থেকে বিরত থাকবে। বস্তুত কাউকে অনুগ্রহ করলেও সে কথা প্রকাশ করে না করা উত্তম। আল্লাহ তেমন শিক্ষাই দিয়েছেন।

▪ **২.২৬৪.২** তার অবস্থা তেমন পাথরের মতো যার ওপর ধূলো জমেছিল, অতঃপর এক বৃষ্টি আঘাত করে তাকে মসৃন ও শূন্য করে দিল। তারা যা অর্জন করেছে তার ওপর তাদের কোন নিয়ন্ত্রন নেই : ভাল কাজ করে একজন ব্যাক্তি যা কিছু অর্জন করে একদিনের একটি ভূল কাজে তার সব অর্জন শেষ হয়ে যায়। অর্থাৎ ওপরে যে আচরণের কথা উল্লেখ করা হয়েছে তেমন আচরণ তার অর্জনের স্থায়িত্ব দিতে পারে না।

আজকে যে সৎ অন্তরে দান করে বা একটি ভাল কাজ করে সেটি তার অর্জন যা সঞ্চিত হয়ে আছে আল্লাহর কাছে। সঞ্চয় এ কারণে যে তার এমন ভাল আচরণের কারণে কোনদিন সে নিজেও বিপদগ্রস্ত হলে তারও তেমন সহযোগীতা প্রাপ্তির সম্ভাবনা সৃষ্টি হয়। কেননা মানুষ তাকে জানে। তার প্রতি সহানুভূতিশীল হয়। সর্বপরি আল্লাহ জানেন। তিনিই তার ভাল কাজের প্রকৃত প্রতিদানদাতা ও বিপদে রক্ষাকর্তা।

কিন্তু যারা ভাল কাজ বা দান করার পরেও মানুষকে তথা দান গ্রহীতাকে কষ্ট দেয় সমাজের মানুষ সেটিও জানতে পারে। আল্লাহও জানেন। ফলে তেমন ভূল আচরণের কারণে কৃত দান কোন ফল দেয়না। গ্রহীতা কষ্টটা অধিক মনে রাখে। অন্যদিকে সর্বসাধারণ খারাপ আচরণটি মনে রাখে। নিজেও কোনদিন বিপদগ্রস্ত হলে তেমন আচরণই পাওয়ার সম্ভাবনা বেশী। অতঃপর আল্লাহর সূক্ষ বিচার তো আছেই। ফলে এমন দাতার দান অপচয়ের মতো হয়ে যায়।

যারা এমন আচরণ করে তারা ভূল করে। এটি না করা উত্তম। যে দান গ্রহণ করে সে বিপদগ্রস্ত বিধায় নিশ্চুপে দানের অর্থ গ্রহণ করে নেয়, কিন্তু তার অন্তর দাতাকে বর্জন করে। বিপদে তেমন দাতা এমনকি গ্রহীতার নিকট থেকেও সাহায্য-সহানুভূতি নাও পেতে পারে।

আল্লাহ কখন কাকে কোন অবস্থায় রাখবেন কেউ জানে না। নাখোশ ব্যাক্তি তার ভালটির চেয়ে মন্দটিই বেশী প্রচার করে। দুনিয়াতেই সে মন্দ হিসেবে পরিচিতি পায়। কোনদিন বিপদে সে নিজেও তেমন আচরণই পেতে পারে। দুনিয়াতেই মন্দ কাজের মন্দ ফলাফল আছে। অতঃপর পরকাল তো আছেই। এরকম লোক মূলত লোক দেখানর জন্য দান করে। তারা আল্লাহ ও পরকালে বিশ্বাস করে না। এমন আচরণ সেটিরও প্রমাণ বহন করে।

যারা লোক দেখানর জন্য দান করে আল্লাহর দৃষ্টিতে সেটি গ্রহনীয় নয়। এর বড় প্রমাণ সমাজের মানুষ বা মানব অন্তরও তা গ্রহণ করে না। দান হতে হবে বিনিময় প্রত্যাশাবিহীন। এর অপর অর্থ হচ্ছে আল্লাহর কাছে সমর্পিত হয়ে বা আল্লাহর রাস্তায় অর্থাৎ মানবতার কল্যাণে দান করতে হবে। পৃথিবীতে মানুষ ব্যাতিত কিছুই নেই। থাকলেও তার মূল্য নেই। স্বয়ং আল্লাহ মানুষকে এখানে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। মানুষের কল্যাণে যে কোন প্রকার ব্যায় করাই আল্লাহর পথে ব্যায় করা। যারা তেমনভাবে কাজগুলি করবে না আয়াতে

উল্লেখিত উদাহরণে তাদের কর্মের ফলাফল বিষয়েই জানান হয়েছে। দান সম্পর্কে গীতায় এভাবে বলা হয়েছে,

"দান করা কর্তব্য মনে করে যথাসময়ে, যথাস্থানে, উপযুক্ত ব্যাক্তিকে কোনরুপ প্রতিদানের প্রত্যাশা না করে যে দান করা হয় (সেটিই উত্তম), সেটিকে সাত্বিকী বলা হয়।

কিন্তু যে দান কিছু প্রতিদানের আশায় বা কোন ফল বা স্বর্গাদি প্রাপ্তির আশায় কিংবা বিক্ষুব্ধ মনে বা অনিচ্ছা সত্বেও করা হয় (সেটি উত্তম নয়), এমন দানকে রাজসিক বলা হয়।

এবং যে দান অস্থানে, অসময়ে এবং অপাত্রে অবজ্ঞা ও অনাদরের সাথে করা হয় (সেটিও উত্তম নয়), সেটিকে তামসিক বলে।" (গীতা ১৭:২০-২২)

▪ **২.২৬৪.৩** আল্লাহ অবিশ্বাসী সম্প্রদায়কে পথ প্রদর্শন করেন না (Allah guideth not the disbelieving folk) : আল্লাহ সকলকে পথ প্রদর্শন করেন এবং করেছেন। তার প্রমাণ এই কোরআন। তিনি কোন নির্দিষ্ট গোষ্ঠীকে পথ প্রদর্শন করেন নাই। কোরআনের মাধ্যমে তিনি জগতের সকল মানুষকে পথ প্রদর্শন করেছেন। কিন্তু কোন পথ কে গ্রহণ করবে সেটি মানুষের নিজের সিদ্ধান্ত। সে ক্ষমতা আল্লাহ মানুষকে দিয়ে রেখেছেন। এটিই পরীক্ষা।

সিদ্ধান্ত নেবার পর কে মানুষকে চালনা করে? পথ ধরে চলার শক্তি আসে কোথা থেকে? শক্তির উৎস কি? গভীরভাবে ভাবলে মানুষ বুঝতে পারবে যে, সে শক্তিদাতাও তিনি। তিনিই চালনা করেন।

তিনিই যখন চালনা করেন তখন তিনি তো মানুষকে সঠিক পথে চালাবেন। এমনই তো হওয়ার কথা! কিন্তু না। তিনিই মানুষকে শক্তি দিয়ে চালিয়ে নিয়ে যাবেন সত্য। কিন্তু তিনি তাকে সে পথে নিয়ে যাবেন যে পথ সে নিজে গ্রহণ করে। তিনি তাকে সঠিক পথ দেখিয়ে দিয়েছেন। কোন পথে যেতে হবে বলেও দিয়েছেন। সিদ্ধান্ত মানুষের নিজের। এটিই পরীক্ষা।

"তাকে পথ চলার (ভিন্ন ভিন্ন) দুটি পথ প্রদর্শন করেছি (ভাল ও মন্দ)। কিন্তু সে চেষ্টা করেনি উন্নততর/উচ্চতর পর্যায়ে আরোহনের।" (আল-কোরআন ৯০:১০-১১)

এ কেমন পরীক্ষা? সত্যি বলতে এটি যেমন পরীক্ষা, তেমনি এটি একটি পথ প্রদর্শনও [দিক-নির্দেশনা দ্রষ্টব্য ২.২.২]। তবে একটু কঠিন। যে আল্লাহর পথ-নির্দেশনা মেনে চলবে না তাকে তো কঠিন অবস্থায় পরতেই হবে।

কিভাবে এটি মানুষের জন্য আল্লাহর পথ প্রদর্শন হতে পারে? কঠিন পথে মানুষ ঠেকে ঠেকে শিখবে। অতঃপর আল্লাহর প্রদর্শিত পথেই ফিরে আসবে বা আসতে বাধ্য হবে। কিন্তু যে তাতেও বুঝবে না অবশ্যই তার জন্য সংস্কার ও সংশোধনের ব্যাবস্থা আছে। সেটিই শাস্তি। শাস্তি কেবল শাস্তি নয়। শাস্তি দিয়ে আল্লাহর কি এসে যায় যদি মানুষ সঠিক পথে চলে [শাস্তি দ্রষ্টব্য ২.৩০]? বলা হচ্ছে,

"তোমাদের শাস্তি প্রদান করে আল্লাহর কি আসে যায়, যদি তোমরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর এবং বিশ্বাস স্থাপন কর?" (আল-কোরআন ৪:১৪৭)

শাস্তি কেবল শাস্তি নয়। শাস্তিকে মন্দ বা অমঙ্গল ভাবার কোন কারণ নেই। আল্লাহ প্রদত্ত 'শাস্তিও একটি রহমত'। তিনি অধিকতর বিপদ থেকে এর মাধ্যমে মানুষকে রক্ষা করেন। ভূল পথের পুনরাবৃত্তি থেকে ফিরিয়ে আনেন। কিন্তু বিষয়গুলিকে সবাই সেভাবে বুঝতে চেষ্টা করে না। 'শাস্তি' হচ্ছে মানুষকে সঠিক পথে ফিরিয়ে আনার সকল প্রচেষ্টাজনিত প্রক্রিয়ার অন্তর্ভূক্ত একটি পর্যায়।

আল্লাহর নিদর্শন রয়েছে এ জগতে। চাইলে মানুষ নিজেদেরকে দিয়েও বিষয়গুলি বুঝে নিতে পারে। উদাহরণ দেখতে পাবে নিজেদের ও পারিপার্শ্বিক জীবনেও। নিদর্শন রয়েছে জগতের পরতে পরতে। যে দেখার সে দেখতে পাবে। মাতা-পিতা যখন সন্তানকে শাস্তি দেয়, বস্তুত তারা তাকে শাস্তি দেয় না। ভূল পথ থেকে ফিরিয়ে আনে।

যে প্রদর্শিত পথ গ্রহণ করবে না তিনি তাকে বাধা দেবেন না, বরং সে যে পথে যেতে চায় সে পথে চলতেও সাহায্য করবেন। তাই বলা হয়েছে যে, যে তার কথা শুনে নাই তাকে তিনি পথ দেখিয়ে জোর করে নিয়ে যান না। কিন্তু এটিও বলা হয়েছে যে, যারা বিশ্বাস করে তাদেরকে তিনি আরও ভাল পথ প্রদর্শন করেন।

পথ-প্রদর্শনের অর্থ হচ্ছে যে, যে পথে মানুষকে চলতে বলা হয়েছে সে পথে চলার কারণে উপকৃত হওয়া। যারা দান করে অর্থাৎ প্রদর্শিত পথে চলে তারা তার সুফল প্রাপ্ত হয়। কিন্তু যারা প্রদর্শিত পথে চলে না, তারা উপকার লাভ তো করেই না বরং বিপদ বা ক্ষতির মুখেও পরে। অর্থাৎ আল্লাহ তাদের পথ দেখান না। বস্তুত তারা নিজেরাই পথকে গ্রহণ করে না। যারা তেমন করে তারা ভূল আচরণ করে। এটি না করা উত্তম।

আল্লাহ বিত্তবানকে যে অনুগ্রহ দান করেছেন অকৃতজ্ঞ সেখান থেকে অপরকে দিতে চায় না। অথচ তারা নিজেদের জন্য আল্লাহর নিকট থেকে অধিক প্রত্যাশা করে। অপরের প্রত্যাশা বা কষ্টগুলি অনুভব করে না। বস্তুত এগুলি পরীক্ষা।

আল্লাহ কিছু মানুষকে কেন অতিরিক্ত দান করেন? কেবলই কি স্ত্রী-সন্তানদের খাওয়াবার জন্য? বরং এটি তাঁর একটি সঠিক বাছাই। কারও মাধ্যমে তিনি জীবনের প্রয়োজনীয় উপকরণাদির যথাযথ প্রবাহ ঠিক রাখেন এবং কাউকে পরীক্ষায় ফেলেন। বস্তুত দান করার নির্দেশনাও একটি অর্পিত দায়িত্ব। যে দায়িত্ব পালন করবে সে অপরকে দেবে। অর্থ-সম্পদ প্রবাহের একটি মানচিত্র সৃষ্টি হবে। এভাবে প্রয়োজনীয় সকল কিছু সর্বত্র ন্যায়-সম্মতভাবে ছড়িয়ে যাবে। কিন্তু যে প্রবাহকে বাধাগ্রস্ত করবে বা আটকে রাখবে সে অন্যায়কারী। সে মানবের বৃহৎ কল্যাণ বোঝে না। এগুলি উদাসীনতা, অজ্ঞতা বা মূর্খতা। উদাসীনতা কিংবা মূর্খতা কল্যাণকে বাধাগ্রস্ত করে। মূর্খতার পরিণামও তাই ভয়াবহ। যা বড় আকারে আসে। যার ফলাফল প্রজন্মকেও ভোগ করতে হয়।

অস্থায়ী পৃথিবীতে নিজে কিছুদিন অতিরঞ্জিত ভাল থাকার কোন অর্থ নেই। যে সঠিকভাবে দায়িত্ব পালন না করে কেবল নিজে ভোগ করে সে অন্যায় ও অর্থহীন কাজ করে। যেমন বলা হয়েছে,

"... কেবল ইন্দ্রিয়াসক্ত পাপপূর্ণ জীবন বৃথাই জীবনধারণ।" (গীতা ৩:১৬)

এসব করে কোন লাভ বা উপকার নেই। পরীক্ষায় ফেলে আল্লাহ যথোপযুক্ত ও অনুপযুক্তকে এভাবে চিনে নেন। কাউকে পরিত্যাগ করতে হলেও তাকে

সুযোগ দিতে হয়। কেউ ক্ষমা প্রার্থনার সাথে সঠিক পথে ফিরে এলে আল্লাহ তাকে গ্রহণ করে নেন।

যে সুপথে চলার পথ বেছে নেয় না সে মন্দ পথে বা ভূল পথে গমন করে। এটি হয় আল্লাহর নির্দেশনাকে অনুসরণ না করার কারণে। বস্তুত এরা আল্লাহর প্রদর্শিত পথে বিশ্বাসী নয় অর্থাৎ অবিশ্বাসী। অবিশ্বাসীকে আল্লাহ তার পছন্দের পথে যেতে দেন। অর্থাৎ তারা নিজেরাই প্রদর্শিত সুপথে চলে না। ফলে সুপথে চলার শক্তি ও সহায়তা তারা আল্লাহর দিক থেকে বা ভেতর থেকে লাভ করে না। অনুপ্রাণীত হয় না। তাই বলা হয় যে, আল্লাহ অবিশ্বাসী সম্প্রদায়কে পথ প্রদর্শন করেন না [অবিশ্বাসী দ্রষ্টব্য ২.৩.১]।

▪ **২.২৬৫.১** যারা আল্লাহর রাস্তায় স্বীয় ধন-সম্পদ ব্যায় করে আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য এবং নিজের অন্তকরণকে শক্তিশালী করার জন্য, তাদের উদাহরণ যেন এক উচ্চ ভূমি যেখানে বৃষ্টি বর্ষিত হয় এবং তা দ্বিগুন ফসল দান করে। যদি এমন প্রবল বৃষ্টিপাত নাও হয় তবে হাল্কা বর্ষনই যথেষ্ট : এটি একটি উদাহরণ যেখানে দান করাকে উচ্চ ভূমিতে পতিত বর্ষনের সাথে তুলনা করা হয়েছে। যেখানে বৃষ্টি হলে প্রয়োজনীয় পরিমাণ পানির প্রাপ্তি ঘটে এবং ক্ষতিকর অতিরিক্ত পানি সরে যায়। আবার বর্ষন অল্প হলেও শস্য প্রয়োজনীয় পরিমান পানি পেয়ে থাকে। ফলন ভালই হয়। দ্বিগুণ উৎপাদনেরও সম্ভাবনা থাকে।

পর্যাপ্ত বৃষ্টি যেমন পতিত হয় আল্লাহ চাইলে কাউকে তেমনিভাবে দান করতে পারেন। অতিরিক্ত পানি ফসলের ক্ষতি করে। তেমনি অতিরিক্ত অর্থও ক্ষতির কারণ হয়। উচ্চ ভূমিতে অতিরিক্ত পানি জমতে পারে না, কিন্তু প্রয়োজনীয় পানিটুকু ঠিকই পেয়ে যায়। যা ফসলকে দ্বিগুণ করে তুলতে পারে। ঠিক তেমনি উচ্চমানের ও হৃদয়ের মানুষের ওপর আল্লাহর দান বর্ষিত হলে প্রয়োজনীয় অর্থ প্রাপ্তি তার ঠিকই হয়ে যায়। যা তার সম্পদকে দ্বিগুণও করে তুলতে পারে। বলা হচ্ছে, তেমন মানুষ অতিরিক্ত অর্থ দান করে নিজের ভূমিকে যেমন ক্ষতির হাত থেকে রক্ষা করে তেমনি আবার উর্বরও করে।

দানের ক্ষেত্রে আপাতদৃষ্টিতে বা তাৎক্ষণিকভাবে মনে হয় যেন সম্পদ কমে গেল। কিন্তু বলা হচ্ছে আসলে তা নয়। ক্ষতির কারণ অতিরঞ্জিত অর্থ সরে যায়। ক্ষতি না হওয়ার কারণে বহুগুণ বেশী প্রাপ্তি ঘটে।

উপরন্তু বিশ্বাসী যারা আল্লাহর দিক থেকে বিষয়টিকে বিবেচনা করে তারা আল্লাহর নির্দেশনা পালনের মাধ্যমে তাঁর সন্তুষ্টি অর্জন করে। এর ফলাফল অধিক ও ভাল কিছুর প্রাপ্তিকে নিশ্চিত করে। কেননা আল্লাহ নিজেই তার পুরস্কার প্রদান করেন।

আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের কাজ বিশ্বাসীর অন্তকরণকে পরিতৃপ্ত করে। পরিতৃপ্ত অন্তর দৃঢ় ও শক্তিশালী হয়। শক্তিশালী অন্তর কর্মের ভাল ফলাফল নিয়ে আসতে সক্ষম হয়।

ভাল কাজ যে কোন মানুষকে তৃপ্ত করে। দান করা ভাল কাজের অন্তর্ভূক্ত বিষয়। জাগতিক কল্যাণকল্পে আল্লাহ দান করাকে উৎসাহিত করেছেন। দান করার অভ্যাস মানুষের হৃদয়কে প্রসারিত করে। দুস্থ-দুঃখী মানুষের এতে উপকার হয়। এটি দাতা ও গ্রহীতা উভয়ের জন্য উপকারী। দাতার দিক থেকে অন্তকরণের প্রশান্তির জন্য এবং গ্রহীতার অভাব লাঘবের জন্য।

সামাজিক ও পরিবেশকে স্থিতিশীল রাখার ক্ষেত্রেও দানের বড় ভূমিকা আছে। অন্যথায় কিছু মানুষকে চুরি, ডাকাতি, রাহাজানি করে উপার্জন করতে হবে। সামাজিক শান্তি ও সম্প্রিতি রক্ষায় দানের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা আছে।

▪ **২.২৬৫.২** তোমরা যা কর আল্লাহ তা দেখেন (Allah is Seer of what ye do) : আল্লাহ সব দেখেন। মানুষ তার ভিত্তিকে মজবুত করছে নাকি দুর্বল করছে আল্লাহ তাও দেখেন। বিশ্বাসী বিশ্বাস করে স্বয়ং বিধাতা তাকে দেখছেন। তিনি তার প্রতি নজর রেখেছেন। এ বার্তা বিশ্বাসীকে ভাল কাজে উৎসাহিত করে। সে নিজেকে তার কাজে গুরুত্বপূর্ণ মনে করে। ভাল কাজের কারণে নিজেও নিজেকে সম্মানের চোখে দেখে [দ্রষ্টব্য ২.২৯.৪]।

এ বার্তা অবিশ্বাসীদের জন্য আবার এটি সতর্কবার্তাও বলা যেতে পারে। কেননা আল্লাহ তাদেরকেও দেখছেন। তারা ভাল কাজ করছে নাকি করছে না। ফলে এ ভয় তাদের সঠিক পথে ফিরিয়েও আনতে পারে। এর মাধ্যমে একটি সম্ভাবনার দ্বার উন্মুক্ত হয়। মানুষকে সুপথে ফিরিয়ে আনাই সকল দিক-

নির্দেশনার লক্ষ্য। কাউকে বিপদাপন্ন করা লক্ষ্য নয়। শাস্তি দেয়াও লক্ষ্য নয়। কাউকে দুরে সরিয়ে দেয়া দলীয় মনোভাবাপন্ন মানুষের কাজ হলেও আল্লাহর কাজ নয়। ভাল কাজ করলে আল্লাহ তা দেখেন এবং তিনি তার যথাযথ পুরস্কার দাতা।

এসব বার্তা যখন অবতীর্ণ হয়েছে তখন কেবল তা বিশ্বাসই করতে হয়েছে, যদিও বিশ্বাস করা কঠিন ছিল। কিন্তু বর্তমানে প্রযুক্তির কল্যাণে মানুষের পক্ষে বিষয়গুলি বোঝা সহজ হয়েছে। চাইলে মানুষও এখন মানুষের ওপর নজরদারী করতে পারে। আল্লাহ তো পারেনই। তাই বহু পূর্বেই আল্লাহ ঘোষনা করেছেন যে,

"আমি তাদেরকে আমার নিদর্শনাবলী প্রদর্শন করব, বিশ্বজগতে এবং তাদের নিজেদের মধ্যে, যতক্ষণ পর্যন্ত না এটি তাদের কাছে সুস্পষ্ট হয় যে, এটিই (কোরআন প্রদত্ত বার্তা) সত্য।" (আল-কোরআন ৪১:৫৩)

▪ **২.২৬৬** তোমাদের কেউ কি এমন পছন্দ কর যে, তার একটি খেজুর ও আঙ্গুরের বাগান হবে যার নিম্নদেশ দিয়ে নহর প্রবাহিত হবে এবং তাতে সর্বপ্রকার ফল-ফসল থাকবে এবং সে বার্ধক্যে পৌঁছাবে, তার দুর্বল সন্তান সন্ততিও থাকবে, এমতাবস্থায় বাগানে ঘূর্নিবায়ু আসবে যাতে রয়েছে অগ্নি এবং বাগানটি ভষ্মীভূত হয়ে যাবে? এমনিভাবে আল্লাহ তোমাদের জন্য নিদর্শনসমূহ বর্ণনা করেন যেন তোমরা চিন্তা-ভাবনা কর : এ আয়াতেও একটি উদাহরণ তুলে ধরা হয়েছে। যেখানে নিজের জীবনের ভিত্তিকে জীবনের প্রথম দিক থেকেই সুবিবেচনা প্রসূতভাবে মজবুত করার কথা বলা হয়েছে। যার ভাল ফল শেষ জীবনে মিলবে। অন্যথায় সামান্য বিপদ বা দুর্যোগে নিঃস্ব হয়ে যেতে হবে এবং সেটি জীবনের শেষ পর্যায়ে ঘটলে কষ্ট ও দুর্ভোগের শেষ নেই।

আজকের দিনের ভাল কর্মের ফল যেমন শেষ জীবনে মিলবে, তেমনি ইহকালের সকল কর্মের ফল পরকালেও মিলবে। বলা হচ্ছে, দান মানুষের ভিত্তিকে মজবুত করে। দান করা তেমনই ভাল কাজ যা আল্লাহর কাছে জমা হতে থাকবে। মানুষ পরবর্তীতে ফল লাভ করবে। ইহজগতেও এটি নিজের ভিত্তি বা অবস্থানকে মজবুত করে।

এমন বার্তার মাধ্যমে দান করতে মানুষকে উৎসাহিত করা হয়েছে। দানের অর্থে যেমন বিপদগ্রস্ত পাশের লোকটির উপকার করা হয়, দুঃস্থ মানবতার সেবা করা সম্ভব হয়, আবার দানের অর্থে বড় বড় মানব কল্যাণমুখী কাজ করাও সম্ভব হয়। যার ভাল ফলাফল এ প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে সকল মানুষই কোন না কোনভাবে লাভ করে। এগুলিকেও আল্লাহ প্রদত্ত পুরস্কারের অন্তর্ভূক্ত বিষয়রূপেই বিবেচনা করতে হবে। দান করতে তাই মানুষকে উৎসাহিত করা হয়েছে। বড় কল্যাণমুখী কাজে দানের অর্থ ব্যাবস্থাপনায় সুশাসন খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয়।

বাস্তব জীবনে যারা দান করে মানুষ তাদের কথা জানে ও স্মরণ করে। আল্লাহ কাকে কখন কোন অবস্থায় রাখেন বা রাখবেন কেউ জানে না। যারা দানের মতো ভাল কাজ করে বিপদের দিনে যেমনি আল্লাহ তাদের কথা স্মরণ করেন, তেমনি সমাজের মানুষও তাদের প্রতি সহানুভূতিশীল থাকে। ফলে দু'দিক থেকেই তাদের সহায়তা-সহানুভূতি প্রাপ্তির সম্ভাবনা থাকে।

এটিকে একটি সাধারণ উদাহরণ হিসেবে দেখাই উত্তম। এর অত্যাধিক চুলচেরা বিশ্লেষণের আদৌ কোন প্রয়োজন নেই। মানুষ যেন বিষয়সমুহ নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করে সেজন্য আল্লাহ তাঁর নিদর্শনসমুহ উদাহরণসহ এমনি করে বিস্তারিতভাবে তুলে ধরেন।

▪ **২.২৬৭.১** হে বিশ্বাসীগন! তোমরা স্বীয় উপার্জন থেকে ভাল বস্তুটি ব্যায় কর এবং যা আমি তোমাদের জন্য ভূমি থেকে উৎপন্ন করেছি তা থেকে উৎকৃষ্ট বস্তু ব্যায় কর এবং দান করার ক্ষেত্রে নিকৃষ্ট দ্রব্য ব্যায় করতে মনস্থ কর না যখন তোমরা নিজেরাও তা গ্রহণ করতে ইচ্ছুক নও, যদি না তোমরা চোখ বন্ধ করে সেটি নিয়ে নাও : বাস্তবে অধিকাংশ মানুষের মধ্যে দান করার ক্ষেত্রে তুলনামূলক মন্দ বস্তুটি বেছে নেয়ার মানসিকতা দেখা যায়। অথচ নিজে তেমন দ্রব্য গ্রহণ করতে দ্বিধাবোধ করে। এ মানসিকতা পরিহার করতে বলা হয়েছে। এটি মনের সংকীর্ণতার বহিঃপ্রকাশ। মনে সংকীর্ণতা আসে যখন সত্যিকারভাবে আল্লাহতে মানুষ বিশ্বাসী হয় না। তার নিঃশেষ হয়ে যাওয়ার ভয় আসে। কিংবা কৃপণতা বা লোভ কাজ করে। আচরণ হিসেবেও

এগুলি মন্দ। যা ভাল মানসিকতার পরিচয় বহন করে না। এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক-নির্দেশনা।

দান করার ক্ষেত্রে মানুষকে তার সাধ্যের মধ্যে উৎকৃষ্ট দ্রব্যটি দান করতে বলা হয়েছে। যার সামর্থ আছে দান করার ক্ষেত্রে সে উৎকৃষ্ট বস্তু ব্যায় করবে। কিন্তু যার ততটা সামর্থ নেই সে তার যা আছে সেখান থেকে নিজ প্রয়োজন মিটাবার পর যথাসাধ্য উৎকৃষ্ট বস্তুটি দান করবে।

একটা সময় ছিল যখন দাতা ও গ্রহীতা উভয়েই আজকের সময়ের বিবেচনায় অধিকতর অভাবগ্রস্ত ছিল। ফলে এ প্রবণতাটি বেশী ছিল। এখন অনেকের স্বচ্ছলতা এসেছে। এখনও কেউ তেমন মানসিকতা প্রদর্শন করলে সেটি অনেক বেশী মন্দ। তবে আজকাল অনেককে আল্লাহর এ নির্দেশ মেনে চলতে দেখা যায়। এসব বার্তা মানুষের মন-মানসিকতায় ধীরে ধীরে অনেক পরিবর্তন এনেছে।

উল্লেখ্য যে, কোরআনের সকল নির্দেশনা জগতে আল্লাহর মহাত্বকে তুলে ধরে। কোরআন মানুষকে যথাযথ আচরণসম্পন্ন মানুষ হতে শিক্ষা দেয়। ভাল গুণাগুণ অর্জনে উৎসাহ ও অনুপ্রেরণা হয়ে কাজ করে কোরআন।

কোরআনের নির্দেশনায় অন্যায্যতার স্থান নেই। ওপরের নির্দেশনাগুলি যথাযথভাবে বিচার-বিশ্লেষণ করলে বোঝা যায় যে, আল্লাহর সকল নির্দেশনাই মানুষকে দারুণভাবে ন্যায় ও সাম্যের বার্তা দেয়। অন্তরের সামান্যতম কলুষতাকেও দুরীভূত করতে প্রেরণা যোগায়।

এসব বার্তা থেকে মানুষ জেনেছে ও শিখেছে যে, নিজের জন্য যেটি পছন্দ অপর ভাই বা বোনের জন্যও তেমনভাবে ভাবতে হয়। পার্থক্য বা বৈষম্য করা উচিত নয়। আজ যার এমনি অবস্থা, ঠিক কিভাবে কে কখন কোন অবস্থায় পরে যাবে কেউ জানে না। আজকের অবস্থাপন্নও নিজের দুর্দিনে তারই করা আজকের মন্দ আচরণকে গ্রহণ করে নিতে পারবে না। তাই সকলকে সব অবস্থার জন্য যেমন প্রস্তুত থাকতে হয়, তেমনি সব অবস্থায়ই সকলকে সন্মানের চোখে দেখতে হয়। কোরআন প্রদত্ত এ সকল নৈতিক জ্ঞান তুলনাহীন! কেবল জ্ঞান নয়, কোরআন এক তুলনাহীন প্রেরণা যা মানুষকে সঠিক পথে চলতে সজীব করে তোলে। বলা হচ্ছে,

"কেউ জানে না আগামীকল্য সে কি উপার্জন করবে এবং কেউ জানে না কোন দেশে সে মৃত্যুবরণ করবে। আল্লাহ সর্বজ্ঞ, সর্ববিষয়ে সম্যক অবহিত।" (আল-কোরআন ৩১:৩৪)

▪ **২.২৬৭.২** জেনে রেখ, আল্লাহ পরিপূর্ণ, প্রশংসার্হ (Allah is Absolute, Owner of Praise) : আল্লাহ পরিপূর্ণ [আল্লাহ দ্রষ্টব্য ২.২০.২]। তাঁর কোন কিছুর অভাব বা ঘাটতি নেই। তাঁর কোন অবচিতি নেই। কিছু কাজ আছে যা আল্লাহর পরিপূর্ণতাকে সর্বত্র সুসামঞ্জস্যপূর্ণভাবে ধরে রাখে। তাই তাঁর নির্দেশনা মেনে চলতে হয়। যা পালন করলে সবকিছু ভারসাম্যপূর্ণ থাকে; স্থিতিশীল বা প্রশান্ত থাকে।

কিছু কিছু কারণে প্রকৃতি এমনকি সমাজও অশান্ত হয়। প্রাকৃতিক ও সামাজিক ভারসাম্য বিনষ্ট হয়। কিছু কাজ আছে যা পালন করলে ভারসাম্য প্রতিষ্ঠা পায়; সমাজ ও প্রকৃতি স্থিতিশীল বা শান্ত থাকে।

আল্লাহ তাঁর পথে ব্যায় করতে বলেছেন। সামাজিক স্থিতিশীলতা ও ভারসাম্য রক্ষার জন্য এগুলি প্রয়োজন। এসব কাজ মানুষের নিজেদের মঙ্গলের জন্যই করতে হয়। আবার মানুষকে পরীক্ষা করার জন্যও আল্লাহ তেমন নির্দেশনা দিয়ে থাকেন। এ সকল কাজের বা নির্দেশনার পরিপালনের সুফল মানুষই ভোগ করে। বস্তুত মানুষ তার নিজের বা নিজেদের কৃত ভাল-মন্দ আচরণের ফল নিজেরাই ভোগ করে। কিন্তু যে জগতকে আল্লাহ সত্যের ভিত্তির ওপর বা নানান সূত্রে প্রতিষ্ঠা করে রেখেছেন, সূত্রের বিচ্যুতির কারণে সে জগত ও মানবসমাজ ক্ষতিগ্রস্ত হয়। ক্ষতিগ্রস্ত হয় মানুষের নিজেদেরই করা ভুল কার্যকলাপের কারণে। তাই বলা হচ্ছে,

"মানুষের নিজ হাতে করা মন্দ কর্মের কারণে স্থলে ও জলে বিপর্যয় ছড়িয়ে পড়েছে। তারা যা করেছে, তার আংশিক ফল আল্লাহ তাদেরকে তাদের কর্মের শাস্তিস্বরূপ আস্বাদন করাতে চান, যেন তারা সঠিক পথে ফিরে আসে।" (আল-কোরআন ৩০:৪১)

নিজেদের মঙ্গলের জন্যই মানুষকে আল্লাহর নির্দেশ পালন করতে হয়। আল্লাহ তাঁর পথে মানুষকে ব্যায় করতে বলেছেন। এ সকল নির্দেশনার পরিপালন সামাজিক ও আর্থিক সূত্রের বিচ্যুতিগুলিকে ধীরে ধীরে সহনীয় মাত্রায়

সংশোধন করে। আল্লাহর বিশালত্বে কেউ তাঁর নির্দেশ পালন না করলে আল্লাহর কিছুই যায়-আসে না। আল্লাহ নিজেই পরিপূর্ণ। নিজেদের মঙ্গলের জন্যই মানুষকে আল্লাহর নির্দেশ পালন করতে বলা হয় নিজেদের পরিবেশে নিজেদের ভাল থাকার জন্য।

আল্লাহ কে বা কি কেউ জানে না। কেউ তাঁকে চেনে না। যিনি জগত সৃষ্টি করেছেন, যিনি মানুষ সৃষ্টি করেছেন, যিনি সকল সৃষ্টির স্রষ্টা, যিনি সব লালন-পালন করে চলেছেন, যিনি সকলের নিরাপত্তা বিধান করে চলেছেন, মহাবিশ্বের সবকিছু যার হাতে তাঁকেই আমরা আল্লাহ বলে জানি; তাঁকেই আমরা আল্লাহ নামে চিনি। যিনি স্রষ্টা, যিনি লালন-পালনকর্তা আবার একাধারে যিনি সংহারকর্তাও- যার হাতে সকল ক্ষমতা তিনিই তো প্রশংসার্হ হবেন। এটিই তো স্বাভাবিক নিয়ম বা সূত্র। এখানে বিষয়টি স্মরণ করিয়ে দেয়া হয়েছে।

অতএব আল্লাহই সে জন যিনি একমাত্র প্রশংসার্হ। কেননা আল্লাহকেই আমরা ওপরোক্ত সকল বিশেষণে বিশেষায়িত করে থাকি। অতএব তাঁর দিক-নির্দেশনাই পালনীয়। মানুষকে তাদের নিজেদের মঙ্গলের জন্যই আল্লাহর নির্দেশ পালন করতে হবে। আল্লাহর প্রয়োজনে নয়। আল্লাহ পরিপূর্ণ, স্বয়ংসম্পূর্ণ।

কোরআনের দর্শনে বিশ্বাসী এভাবেই আল্লাহকে জানতে শেখে এবং তাতেই বিশ্বাস রাখে। বস্তুত এসব বিষয়ে মানুষের নিশ্চিত কোন জ্ঞান নেই।

➢ (আয়াত ২৬৮) এ অংশে শয়তান (Devil) সম্পর্কে সতর্ক করা হয়েছে এবং আল্লাহর (Allah) অনুগ্রহের কথা বলা হয়েছে।

২৬৮	শয়তান তোমাদেরকে নিঃস্ব করে দিতে প্রতিশ্রুতি গ্রহণ করে এবং তোমাদের ওপর অশ্লীলতার নির্দেশনা দেয়। পক্ষান্তরে আল্লাহ তোমাদেরকে নিজের পক্ষ থেকে ক্ষমা ও অনুগ্রহের প্রতিশ্রুতি দেন। আল্লাহ সর্বত্র বিরাজমান, সবজান্তা। (The devil promiseth you destitution and enjoineth on you lewdness. But Allah promiseth you forgiveness from Himself with bounty. Allah is All-Embracing, All-knowing.)

▪ **২.২৬৮.১** শয়তান তোমাদেরকে নিঃস্ব করে দিতে প্রতিশ্রুতি গ্রহণ করে এবং তোমাদের ওপর অশ্লীলতার নির্দেশনা দেয়। পক্ষান্তরে আল্লাহ তোমাদেরকে নিজের পক্ষ থেকে ক্ষমা ও অনুগ্রহের প্রতিশ্রুতি দেন : শয়তান মানুষের মনে কু-মন্ত্রনা দেয়। সন্দেহ প্রবেশ করিয়ে দেয়। সে প্রতিটি ক্ষেত্রে মানুষকে ধ্বংস করে দিতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয় [শয়তান দ্রষ্টব্য ২.২৬৮.১]। এটি তার সেই প্রথম গৃহিত প্রতিশ্রুতিরই ফল যা কোরআনে এভাবে উদ্ধৃত হয়েছে,

"শয়তান বলল, হে আমার পালনকর্তা! আপনি যেমন আমাকে পথভ্রষ্ট করেছেন, আমিও তাদের (আদম সন্তানদের) সবাইকে পৃথিবীতে নানা সৌন্দর্য্যে আকৃষ্ট করব এবং তাদের সবাইকে পথভ্রষ্ট করে দেব।" (আল-কোরআন ১৫:৩৯)

শয়তানের শয়তানিতে কেউ নিমজ্জিত হলেও ক্ষমা প্রার্থনার সাথে ফিরে এলে আল্লাহ ক্ষমা করার প্রতিশ্রুতি দেন এবং তার প্রতি পুনরায় তাঁর অনুগ্রহ বর্ষন করেন [আল্লাহ ও ক্ষমা দ্রষ্টব্য ২.১৯৯]। তবে মনে রাখা প্রয়োজন যে, শয়তানের শয়তানি আল্লাহ সৃষ্ট। তিনি চাইলে সেটি সৃষ্টি নাও করতে পারতেন। মানুষের জন্য তার বৈশিষ্টের সৃষ্টি একটি পরীক্ষাস্বরূপ। বলা হচ্ছে,

"আমি .. যত রাসূল ও নবী প্রেরণ করেছি, তারা যখনই কিছু কল্পনা করেছে, তখনই শয়তান তাদের কল্পনায় কিছু মিশ্রণ করে দিয়েছে। ... (এটি) এ কারণে যে শয়তান যা মিশ্রণ করে, তিনি (আল্লাহ) তা পরীক্ষাস্বরূপ করে দেন তাদের জন্য যাদের অন্তরে রোগ আছে এবং যারা পাষানহৃদয়। ...।" (আল-কোরআন ২২:৫২-৫৩)

শয়তানের উপস্থিতি কেবল মন্দই না প্রয়োজনীও। অন্যথায় ভাল-মন্দ চেনা যেত না। ভাল-মন্দ পৃথক করা যেত না। উপযুক্তকে খুঁজে পাওয়া যেত না।

পথের কাঁটা হাত-পা কেটে ফেলে বিষয়টি মানুষ জানে। তাই চলার পথে সাবধানে চলতে হয়। তেমনি শয়তানের উপস্থিতি সত্বেও সাবধানে চলতে জানলে বিপদের আশংকা নেই। নিজের অসতর্কতা ও নির্বুদ্ধিতাই বিপদের কারণ। এ বিষয়ে আল্লাহ মানুষকে পথ-নির্দেশনা দিয়েই রেখেছেন। অতএব মানুষ আল্লাহর নির্দেশনা মেনে চললেই বিপদমুক্ত থাকতে পারবে। সুফল পাবে।

আমরা যখন শয়তানকে লক্ষ্য করে পাথর ছুড়ে মারি, বস্তুত তখন আমরা নিজের ভেতরের সেই শয়তানি ইচ্ছের প্রতি প্রতীকী পাথর ছুড়ে মারি। অথচ সবাই বিষয়টিকে সেভাবে বুঝতেও পারি না। শয়তানকে শয়তানীর জন্য দায়ী করলেও বস্তুত নিজেই দায়ী। নিজের অসতর্কতা দায়ী। নিজের নিয়ন্ত্রনহীনতা দায়ী। নিজের মন্দ ইচ্ছে দায়ী। নিজের ভেতরেই ভাল ও মন্দ একই সাথে বর্তমান। শয়তানের চরিত্রকে এভাবেও বর্ণনা করা হয়েছে,

"তারা (হঠকাররা) শয়তানের মতো, যে মানুষকে অবিশ্বাস করতে বলে। অতঃপর যখন সে অবিশ্বাসী হয়, তখন শয়তান বলে: নিশ্চয়ই! তোমার সঙ্গে আমার কোন সম্পর্ক নেই। আমি বিশ্ব পালনকর্তা আল্লাহকে ভয় করি।" (আল-কোরআন ৫৯:১৬)

আয়াতে যা বলা হয়েছে, তারই উদাহরণ হচ্ছে আদম-হাওয়ার সাথে করা তার হঠকারী আচরণ। যার ফলশ্রুতিতে আল্লাহর গৃহীত পদক্ষেপ ও উভয়ের অধঃপতন।

শয়তান বস্তুত নিজ অন্তরস্থ নেগেটিভ ফোর্সের একটি প্রতীকী নাম। সে সব মন্দ কাজের পেছনের কারণরূপে দায়ী। যা মূল চালিকা শক্তির বিপরীত দিকে ঠেলে।

আয়াতে অর্থ-সম্পদ ব্যায় করার বিষয়টিকে বিশেষভাবে গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। ভাল কাজে অর্থ-সম্পদ ব্যায় করার ক্ষেত্রে শয়তান মানুষের মনে নিঃশেষ হয়ে যাওয়ার আশংকা প্রবেশ করিয়ে দেয়। ভাল কাজে বাধা হয়ে দাঁড়ায়। মানুষই যদি শয়তান হয় তখন সে নানান যুক্তি উপস্থাপন করে। অথচ একই শয়তান আনন্দ-ফুর্তি বা অপ্রয়োজনীয় খাতে ব্যায় করতে উৎসাহ দেয়। প্ররোচিত করে। বস্তুত এসব করার মধ্য দিয়ে মানুষ দু'ভাবে নিঃশেষ হয়। প্রথমত: সে অপচয় করে, দ্বিতীয়ত: সে এমন কোন কাজ করছে না যার ফলে বিপদের দিনে উপকারভোগী মানুষ তার জন্য এগিয়ে আসবে।

ওপরে আনন্দ-ফুর্তি বা অপ্রয়োজনীয় খাতে ব্যায় করার বিষয় উল্লেখ করা হয়েছে। তবে সেখানেও কিছু বিবেচ্য বিষয় আছে। অর্থনীতির আধুনিক চিন্তাগুলিকেও বিবেচনায় অন্তর্ভূক্ত করতে হবে। যেমন নাচ-গান, খাওয়া-দাওয়া, ঘুরা-ফেরা, হাসি-তামাসা বা আনন্দ-ফুর্তির মাধ্যমেও কিন্তু অর্থের

একদিক থেকে অন্যদিকে একটি প্রবাহ সৃষ্টি হয়। অর্থশালী থেকে কম সামর্থবানদের দিকে বা বিত্তশালী থেকে বিত্তহীনদের দিকে অর্থ প্রবাহিত হয়। বস্তুত অর্থনীতিতে এটিও প্রয়োজন। অর্থাৎ বিত্তবানদের থেকে কম বিত্তবানদের দিকে অর্থ প্রবাহিত হওয়া। অর্থের এ সচলতা থাকতে হবে। যেহেতু বিত্তবানরা আনন্দ-ফুর্তিতে অংশ নিতে পছন্দ করে, তাই তাদের থেকে এভাবে অর্থকে প্রবাহিত করা সম্ভব হয়। এগুলি হচ্ছে আধুনিক চিন্তা, অংক ও বর্তমান বাস্তবতা। এসব ভাবনাকেও বিবেচনায় নিয়ে কাজ করতে হবে। একই সাথে আদর্শের বাণীও উচ্চারিত হতে হবে। কেননা সেটিও একটি চাপ যা ভাল পথে ধাবিত হওয়ার দিকে মানবসমাজকে বেগবান করে।

আনন্দ-ফুর্তির বিষয়গুলি একসময় দুর্নীতি সৃষ্টির আখড়ায় পরিণত হয়। এখানেই সমস্যা। এমনকি একসময় অনৈতিক কাজ পর্যন্ত চলে যায়। যা কেবল ব্যাক্তিকে নয় নিজের সন্তান-সন্তুতি থেকে অন্যের সন্তান সন্তুতি, অতঃপর সমাজ এমনকি বিশ্ব সমাজকেও কলুষিত করে। এমন পর্যায়ে চলে যায় যা দমানো কঠিন হয়ে যায়। এভাবে শয়তান জগতে অন্যায়-দুর্নীতি ও অশ্লিলতা সৃষ্টি করে এবং ধ্বংসের পথকে ত্বরান্বিত করে। মানুষকে নিঃস্ব করে দেয়। তবে এ পথের আকর্ষন আছে নিঃসন্দেহে। নিজেকে নিজের নিয়ন্ত্রন করা তাই 'জেহাদ' তুল্য।

অপরদিকে বলা হচ্ছে, আল্লাহ পথ দেখান পবিত্রতার দিকে। অর্থের প্রবাহ প্রয়োজন আছে। কিন্তু আল্লাহ অশ্লিলতাকে অনুৎসাহিত করেন। তিনি মানুষকে মানবতার দীক্ষায় দীক্ষিত হয়ে, মানব কল্যাণে উদ্বুদ্ধ হয়ে কাজ করাকে উৎসাহিত করেন এবং অশ্লিলতা পরিত্যাগ করে পবিত্র পথে তা প্রবাহ করতে দিক-নির্দেশনা দেন। দানের মাধ্যমে সে অর্থের প্রবাহকে তিনি চালু রাখার দিক-নির্দেশনা দেন এবং এর কোন সীমাবদ্ধতা নেই।

দান জগত সংসারে কলুষতামুক্ত অর্থ প্রবাহের একটি অন্যতম উপায় হতে পারে। তবে অবশ্যই সে অর্থ সৎ উপায়ে উপার্জন করতে হবে এবং সামষ্টিক বা সাংগঠনিকভাবে ব্যায় করার ক্ষেত্রে সুশাসন থাকতে হবে।

পূর্বের আয়াতসমুহে সেজন্যই এ বিষয়ে অনেক দিক-নির্দেশনা দেয়া হয়েছে। যেন দান করে কাউকে কষ্ট দেয়া না হয়। দান করার ক্ষেত্রে খারাপ দ্রব্য দেয়া না হয় ইত্যাদি। যিনি দান করবেন তিনি ঔদ্ধত্য বা অহংকার প্রকাশ

করবেন না এবং তিনি স্মরণ করবেন যে, নানান প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে মহান আল্লাহই তাকে আশীর্বাদপুষ্ট করেছেন। সামর্থবান করে গড়ে তুলেছেন। সেজন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করবেন এবং কৃতজ্ঞতার বহিঃপ্রকাশস্বরূপ আল্লাহর নির্দেশনা পালন করবেন। অর্থাৎ যথাসাধ্য দান করবেন।

যিনি দান গ্রহণ করবেন তাকে যদি কষ্ট দেয়া না হয় তবে সেও কৃতজ্ঞ চিত্ত হবে। এসব ভাল কাজ বাস্তবেও মানব জীবনের সঞ্চয়। বিপদের দিনে কাজে আসে। মানুষ এমন আচরণসম্পন্ন মানুষকে স্মরণ রাখে এবং বিপদের দিনে তেমন মানুষের সহায়তায় এগিয়ে আসে। তাদের গ্রহণ করা কোন ভাল উদ্যোগের প্রতিও স্বতঃস্ফূর্ততার সাথে এগিয়ে আসে। ভাল-মন্দ সকল আচরণই মানুষের মুখে মুখে ছড়িয়ে পরে। এটিও ইহজগতে প্রাপ্ত ভাল কাজের এক প্রকার পুরস্কার। অতঃপর পরকালের প্রতিশ্রুতি তো রয়েছে।

পরকালের বিষয়টি আবার অনেক বিষয়ের ওপর নির্ভর করে। যেমন বলা হয়েছে ভাল কাজ তথা দান করলে পরকালে পুরস্কৃত হবে, কিন্তু দেখা গেল এমন বড় কোন মন্দ কাজ করা হয়েছে যে উত্তম কর্মের সঞ্চিত সে উত্তম ফলাফলটি নষ্ট হয়ে গেছে। অতএব আল্লাহর দিক-নির্দেশনাকে ভূলভাবে বুঝলে কোন ফল পাওয়া যাবে না। সকলকে তাই সব বিষয়ে সচেতন ও সতর্ক হয়ে বুঝে-শুনে কাজ করতে হবে। ভূলভাবে ভাল কোনকিছু প্রত্যাশা করাও যথাযথ হবে না। নিম্নতম পর্যায়ে হলেও সবদিকেই ভাল পথে অবস্থান করতে হবে।

আল্লাহর কাছে রয়েছে মর্যাদার নানান স্তর (আল-কোরআন ৩:১৬৩)! তিনি কর্ম অনুযায়ী আনুপাতিক হারে পুরস্কৃত করবেন (আল-কোরআন ৭৮:২৬)। শয়তানের পথ পরিত্যাগ করে তাই ক্ষমা প্রার্থনার সাথে আল্লাহর পথে ফিরে আসা উত্তম। সঠিক পথ অবলম্বনকারীদের আল্লাহ তাঁর ক্ষমা ও অনুগ্রহের প্রতিশ্রুতি দেন।

▪ **২.২৬৮.২** আল্লাহ সর্বত্র বিরাজমান, সবজান্তা (Allah is All-Embracing, All-knowing) : আল্লাহ সর্বত্র বিরাজমান। অতএব কোন মানুষের নিরাশ হওয়ার কোন কারণ নেই। সে যদি কোন পর্বতের চূড়ায় বা গুহায় অবস্থান করে তথাপি আল্লাহ তার সম্পর্কে জানেন। আল্লাহর উপস্থিতি সর্বত্র। ফলে কে শয়তানের প্ররোচনায় প্ররোচিত হয়েছে তিনি তা জানেন। এটি সতর্কবার্তা।

আবার যে তার প্ররোচনা থেকে নিজেকে রক্ষা করে চলে তিনি সেটিও জানেন। বিশ্বাসীর জন্য এটি প্রেরণা। আশার সঞ্চারক [আল্লাহ দ্রষ্টব্য ২.২০.২]।

➢ (আয়াত ২৬৯) এ অংশে জ্ঞান ও প্রজ্ঞা (Wisdom) সম্পর্কে বলা হয়েছে যা কিনা আল্লাহর শ্রেষ্ঠতম আশীর্বাদসমুহের অন্যতম এবং তেমন আশীর্বাদ কে প্রাপ্ত হবে সেক্ষেত্রে আল্লাহর ইচ্ছেই (Will of Allah) মূখ্য বিবেচ্য বিষয়।

➢

২৬৯	তিনি যাকে ইচ্ছে তাকে বিশেষ জ্ঞান বা প্রজ্ঞা (হিকমত) দান করেন এবং যাকে বিশেষ জ্ঞান বা প্রজ্ঞা দান করা হয় সে প্রকৃত অর্থেই প্রভুত কল্যাণপ্রাপ্ত। তবে উপলব্ধিবোধ সম্পন্ন মানুষ ব্যাতিত কেউই তা স্মরণ বা শিক্ষা গ্রহণ করে না। (He giveth wisdom unto whom He will, and he unto whom wisdom is given, he truly hath received abundant good. But none remember except men of understanding.)

▪ **২.২৬৯.১** তিনি যাকে ইচ্ছে তাকে বিশেষ জ্ঞান বা প্রজ্ঞা দান করেন : এ আয়াতের দুটো দিক রয়েছে। একটি হচ্ছে পূর্বের আলোচনার ধারাবাহিকতার দিক। এছাড়াও এটি এমন একটি গুরুত্বপূর্ণ আয়াত যা জ্ঞানের গুরুত্বকে স্বতন্ত্রভাব তুলে ধরেছে।

ভাল-মন্দের পার্থক্য নির্ণয়ের জ্ঞানটাই প্রকৃত জ্ঞান। পূর্ববর্তী আয়াতের আলোচনার ধারাবাহিকতায় বলা যায় যে, যার সঠিক জ্ঞান আছে সে শয়তানের পথ বা ভূল পথ অবলম্বন করবে না। সে আল্লাহর পথ অবলম্বন করবে। আল্লাহর পথ অবলম্বন করার অর্থ হল ভাল পথে অর্থ-সম্পদ ব্যায় করা। এমন জ্ঞানসম্পন্ন মানুষ দান করার মাধ্যমে অর্থ-সম্পদ নিঃশেষ হয়ে যাওয়ার আশংকা করে না। তারা একটি নির্দিষ্ট মাত্রায় নিজেদের প্রয়োজন মিটিয়ে যথাযথভাবে ব্যায় করে যা কিনা মানব কল্যাণে অবদান রাখে।

অপরদিকে যারা শয়তানের প্ররোচনায় প্ররোচিত হয় তারা ভাল পথে ব্যায় করতেও ভয় পায়। অর্থ-সম্পদ নিঃশেষ হয়ে যাওয়ার আশংকা করে। উপরন্তু আরও অধিক পেতে চায়। এভাবে হয়তবা এমন মানুষ সংক্ষিপ্ত পার্থিব জীবনে

কিছুদিন ভাল থাকে। কিন্তু এটাই জীবনের শেষ নয়। সে বোধে আসতে পারাটিও জ্ঞানের সাথে সম্পর্কিত বিষয়।

বিষয়গুলি সাধারণভাবে অনেকেই জানে কিন্তু সেভাবে চলে না। এখানেই জানা ও জ্ঞানের পার্থক্য। জানা হচ্ছে একটি বিষয় সম্পর্কে সাধারণভাবে অবহিত হওয়া। সেক্ষেত্রে বিষয়ের প্রতি ততটা গুরুত্ব দেয়া হয় না বা এর গভীরে প্রবেশ করা হয় না। অর্থাৎ এর ভাল-মন্দ বা সুদুরপ্রসারি ফলাফল ইত্যাদি কোন কিছু নিয়েই ভাবনা-চিন্তা করা হয় না।

অন্যদিকে জ্ঞান হচ্ছে এমন যা কেবল বিষয় সম্পর্কে অবহিতই করে না, এর ভাল-মন্দ ও সুদুরপ্রসারী ফলাফল সম্পর্কেও একজনকে সচেতন করে তোলে। ভেতরে বিষয়ের ওপর চেতনার সৃষ্টি করে। সে পথ ধরে চলতে একটা প্রেরণাও সৃষ্টি করে। ফলে মানুষ জ্ঞানের পথ ধরে চলে বা বলা যায় জ্ঞান তাকে চলতে বাধ্য করে। বস্তুত জ্ঞানও চলতে বাধ্য করে না। জ্ঞানের কারণে যে বোধের সৃষ্টি হয় সে বোধ মানুষকে বেতর থেকে জ্ঞানের পথে চলতে বাধ্য করে। অর্থাৎ মানুষ নিজেই জ্ঞানের পথ ধরে চলতে বাধ্য হয় অনুধাবিত সত্যের জ্ঞানের কারণে।

সব মানুষই অনেক কিছু জানে। কিন্তু জ্ঞান সেই প্রাপ্ত হয় যাকে আল্লাহ দিতে ইচ্ছে করেন। এখানে সে কথা বলা হয়েছে। এর সাথে শরীর, মন, পরিবেশ, আগ্রহ এত জটিল সব বিষয় জড়িত যে আল্লাহর ইচ্ছে ভিন্ন সব বিষয়গুলি একই সাথে একজনের ভেতরে জেগে ওঠে না বা তাকে উদ্দীপ্ত করতে পারে না। আল্লাহ চাইলেই কেবল একজন সে আশীর্বাদ প্রাপ্ত হয় এবং তা অর্জন করতে পারে। তেমন মানুষই মনযোগী হয় ও অনুপ্রাণীত হয়ে ওঠে! বস্তুত আল্লাহ মানুষকে তার সমস্ত জীবনব্যাপি জানেন। মানুষ যেদিকে চলতে চায় আল্লাহ তাকে সে পথে নিয়ে যান বা যেতে সহায়তা করেন। মানুষ নিজ চেষ্টায় সব অর্জন করে। কিন্তু এটি বুঝতে হবে যে সে আল্লাহ থেকে বিচ্ছিন্ন কিছু নয়। আল্লাহ সাথেই বিরাজ করেন, আবার আল্লাহতেই জীবন সন্তরণরত। যেমন গীতায় বলা হয়েছে,

"এবং যখন তুমি .. সত্যকে জানবে- তুমি জানতে পারবে যে, সকল জীবসত্বা আমার অংশ এবং এইভাবে তারা আমার ভেতরে এবং তারা আমার।" (গীতা ৪:৩৫) [দ্রষ্টব্য ২১:১৯]

কোরআনে বলা হয়েছে, "নভোমণ্ডল ও ভূ-মণ্ডলে যারাই আছে তারা সবাই তাঁরই (আল্লাহরই) ...।" (আল-কোরআন ২১:১৯)

"তিন ব্যক্তির এমন কোন পরামর্শ হয় না যেখানে তিনি চতুর্থ না থাকেন, না পাঁচ জনে তিনি ষষ্ঠ নন কিংবা এর চেয়ে কম বা বেশী হোক এবং তারা যেখানেই থাকুক না কেন তিনি তাদের সঙ্গে আছেন;" (আল-কোরআন ৫৮:৭)

এ আয়াত যে সময়ে অবতীর্ণ হয়েছে সে সময়ে প্রাতিষ্ঠানিক লেখাপড়া আজকের মতো ছিল না। আবার যতটুকু ছিল সেটিও সকলে গ্রহণ করতে পারত না। অধিকাংশ মানুষ অভিজ্ঞতা, পর্যবেক্ষন, আলাপ-আলোচনা, নিজস্ব বিচার-বিশ্লেষণ ইত্যাদির মাধ্যমে কোন বিষয়ে জ্ঞান অর্জন করেছে। এর মধ্যেও যারা বিষয়ের গভীরে প্রবেশ করেছে তারা সে বিষয়ে নব নব চিন্তার উন্মেষ ঘটিয়েছে।

বিষয়ভিত্তিক জ্ঞানের বিষয়গুলি বর্তমানে অনেক অগ্রসর হয়েছে। পূর্বের তুলনায় অধিক মানুষ বর্তমানে উচ্চতর পর্যায়ে লেখা-পড়া করছে। আজকাল অনেকেই শিক্ষায় অংশগ্রহণ করছে বটে, তবে নতুন কোন ধারণার শুরুটা সাধারণত এক-দু'জন থেকে আসে। অর্থাৎ সকলেই নতুন কিছু সৃষ্টি করে না, কেউ কেউ করে। সৃষ্টি সম্পর্কিত জ্ঞান, বিধাতা সম্পর্কিত জ্ঞান, নব নব আবিষ্কারের জ্ঞান এমনকি জগতে বিষয়ভিত্তিক যত জ্ঞান আছে তার সবই এভাবে এগুচ্ছে। আচমকা কোন একটা জ্ঞানের দ্বার কারও মাস্তিষ্কে উন্মোচিত হয়ে যাচ্ছে! এরাই আশীর্বাদপ্রাপ্ত! এটাকেই আল্লাহর ইচ্ছে সম্পর্কিত বিষয় বলে অভিহিত করা হয়।

আচমকা কারও মস্তিষ্কে একটি নতুন চিন্তা বা ধারণার আগমন ঘটে যায়। যিনি ধারণার প্রথম ধারক তার কাছে তেমন বার্তার আগমনকে আল্লাহর আশীর্বাদ বলা যেতে পারে। ফলে বলা যেতেই পারে যে, 'আল্লাহ যাকে ইচ্ছে তাকে বিশেষ জ্ঞান বা প্রজ্ঞা দান করেন।' কেননা কেউই বুঝতে পারে না যে

কেন এক-দু'জন এভাবে প্রজ্জ্বলিত হয়ে ওঠে। যাদের কারণে সমগ্র জগত উপকৃত হয় তারা তো অবশ্যই আশীর্বাদ ও অনুগ্রহ প্রাপ্ত।

আল্লাহই জানেন কি প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে তিনি কাউকে অনুগ্রহ প্রদান করার জন্য বাছাই করে নেন। তবে অবশ্যই তিনি সেটি করেন একটি প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে। আমরা সব বুঝতে পারি না।

আল্লাহ কাকে তাঁর অনুগ্রহ দান করবেন, কেন দান করবেন, কি দান করবেন সেখানেও নিশ্চয়ই তাঁর বাছাই প্রক্রিয়া আছে। সাধারণভাবে এতটুকু বোঝা যায় যে, যে যে বিষয়ে অনুসন্ধানি বা আগ্রহী বিধাতা তাঁকে সে বিষয়ের জন্য বাছাই করে নেন। একই বিষয়ে অনেকে আগ্রহী হলে হয়ত তিনি একজনকে বেছে নেন। নিশ্চয়ই তিনি তাকে উপযুক্ত বিবেচনা করেন। মানুষও সেভাবেই একই কাজগুলি করে। তবে আগ্রহের পাশাপাশি গ্রহীতার আচরণও গুরুত্বপূর্ণ।

একজনের আচরণ ভাল কিন্তু তা সত্বেও বিধাতা একজন বদ রাগীকেও তাঁর অনুগ্রহ বা আশীর্বাদ দান করতে পারেন। কেননা সততা ও আন্তরীকতাও গুরুত্বপূর্ণ। আবার চাইলে তিনি কাউকে পরীক্ষায়ও ফেলতে পারেন। সে কারণেও একজনকে বাছাই করে নিতে পারেন যেটি মানব জ্ঞানে সাধারণভাবে বোঝা সম্ভব নয়। অর্থাৎ এসব বিষয়ে এত নির্ণায়ক হতে পারে যে মানুষ সব জানতে বা বুঝতেও পারবে না। ফলে বিষয়টি বিধাতার হাতেই থেকে যায়। অতএব বিষয়গুলি মানব জ্ঞানে আল্লাহর ইচ্ছের ওপর নির্ভর করে এভাবেই মানুষের বোঝার জন্য সুবিধাজনক হয়। তাছাড়া এ বিষয়ে সম্ভবত মানুষ আজও গবেষনা শুরু করেনি। কিংবা করলেও তার ফলাফল মানব সমাজে বহুল প্রচারিত নয়। তাই মানুষ জানে না।

সবচেয়ে বড় বিষয় হচ্ছে যে, সব নির্ণায়ক জানা সত্বেও এবং কোন মানুষকে সেভাবে প্রস্তুত বা গড়ে তোলার পরেও যদি আল্লাহ তাকে তাঁর অনুগ্রহ বর্ষন না করেন তবে? অতএব বুঝতে হবে যে, একচ্ছত্র ও সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী একমাত্র আল্লাহ নিজে। বিষয়গুলি একান্তই বিধাতা প্রদত্ত ও তাঁরই হাতে। এটি তাঁর ইচ্ছে। 'তিনি যাকে ইচ্ছে তাকে বিশেষ জ্ঞান বা প্রজ্ঞা দান করেন।' তবে তিনি দিন কিংবা না দিন মানুষকে যোগ্য হয়ে বা করে গড়ে ওঠার বা তোলার প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখতেই হবে।

■ **২.২৬৯.২** যাকে বিশেষ জ্ঞান বা প্রজ্ঞা দান করা হয় সে প্রকৃত অর্থেই প্রভুত কল্যাণপ্রাপ্ত। তবে উপলব্ধিবোধ সম্পন্ন মানুষ ব্যাতিত কেউই তা স্মরণ বা শিক্ষা গ্রহণ করে না : 'যাকে বিশেষ জ্ঞান বা প্রজ্ঞা দান করা হয়, সে .. প্রভুত কল্যাণপ্রাপ্ত।' বিষয়টিকে দু'ভাবে দেখা যেতে পারে বা আলোচনা করা যেতে পারে। একটি পূর্বের আয়াতসমুহের আলোচনার ধারাবাহিকতায়। অপরটি সাধারণ আলোচনারূপে।

যার সঠিক জ্ঞান আছে সে শয়তানের পথ বা ভূল পথ অবলম্বন করবে না। সে আল্লাহর পথ অবলম্বন করবে। আল্লাহর পথ অবলম্বন করার অর্থ হল ভাল পথে অর্থ-সম্পদ ব্যায় করা। এমন জ্ঞানসম্পন্ন মানুষ দান করে অর্থ-সম্পদ নিঃশেষ হয়ে যাওয়ার আশংকা করে না। তারা একটি নির্দিষ্ট মাত্রায় নিজেদের প্রয়োজন মিটিয়ে যথাযথভাবে ব্যায় করে।

অন্যদিকে যারা শয়তানের প্ররোচনায় প্ররোচিত হয় তারা ভাল পথে ব্যায় করতে ভয় পায়। অর্থ-সম্পদ নিঃশেষ হয়ে যাওয়ার আশংকা করে। উপরন্তু আরও অধিক পেতে চায়। এভাবে হয়তবা এমন মানুষ সংক্ষিপ্ত পার্থিব জীবনে কিছুদিন ভাল থাকে। কিন্তু এটাই জীবনের শেষ নয়। সে বোধে আসতে পারাটিও জ্ঞানের সাথে সম্পর্কিত।

বিষয়গুলি সাধারণভাবে অনেকেই জানে কিন্তু সেভাবে চলে না। পূর্বে উল্লেখ করেছি যে, জানা ও জ্ঞানের মধ্যে পার্থক্য আছে। জানলেও মানুষ ভাল পথে চলে না যদি না ভেতরে জ্ঞান প্রবেশ করে। তাই জ্ঞান একটি আশীর্বাদস্বরূপ। যা মানুষকে যথাযথ পথে চালনা করে ও তার সুফলকে চতুর্দিকে ছড়িয়ে দেয়।

জ্ঞান উপলব্ধিবোধের মাধ্যমে সম্মত করিয়ে ধীরে ধীরে মানুষকে অনুধাবিত সত্যের পথে নিয়ে যায়। মানুষ যখন সত্যটি জানতে বা উপলব্ধি করতে পারে, সত্যিকার অর্থে সে তখন বিপরীতে চলতে পারে না। কখনও বাধ্য হলেও যথাসময়ে যথাস্থানে ফিরে আসে।

জ্ঞান মানুষের অন্তরকে যৌক্তিকভাবে ভাল পথ অবলম্বনের প্রয়োজনীয়তাকে উপলব্ধি করিয়ে দিতে পারে। জ্ঞান মানুষকে এমন পর্যায়ে উন্নীত করে দিতে পারে যখন মানুষ নিজ থেকে ভাল হয়ে চলার প্রয়োজনীয়তাটি অন্তর দিয়ে

অনুধাবন করে। বিশ্বাসের প্রয়োজন হয় না। তবে জ্ঞানের কারণে বিশ্বাস সে সত্যে বা বলা যায় লব্ধ জ্ঞানে আপনা থেকে বাসা বেধে ফেলে।

জ্ঞান মানুষকে তার অনুধাবিত সত্যের সঙ্গে কঠিন বন্ধনে আবদ্ধ করে ফেলে। ফলে বিশ্বাস যেমন মানুষকে কোন ধারণায় বেধে ফেলে, জ্ঞানও তাই করে এবং সেটি করে বিশ্বাসকে মাধ্যম ধরে। কেননা সত্যের জ্ঞানটিই পরিশেষে বিশ্বাসে পরিণত হয়। জ্ঞান দ্বারা সৃষ্ট বিশ্বাস বিশ্বাসীকে নিজ জ্ঞানে অনুধাবিত সত্যের ওপর দৃঢ়ভাবে প্রতির্ষ্ঠিত রাখে।

'যাকে বিশেষ জ্ঞান বা প্রজ্ঞা দান করা হয়, সে .. প্রভুত কল্যাণপ্রাপ্ত।' জ্ঞানই মানুষকে সত্য ও সঠিক পথে প্রতির্ষ্ঠিত রাখে। ফলে সে মন্দ কাজ বর্জন করে, ভাল পথে চলে এবং বিপদ থেকেও মুক্ত থাকতে পারে। যার সুফল সে নিজে পায়, সমাজ পায় এমনিভাবে আরও বৃহৎ পরিসরও ভাল কাজের সুফল পায়। এভাবে আল্লাহর আশীর্বাদে কল্যাণ চতুর্দিকে ছড়িয়ে যায়।

বলেছি বিষয়টিকে দু'ভাবে দেখা যেতে পারে। একটি পূর্বের আয়াতসমুহের আলোচনার ধারাবাহিকতায় এবং অপরটি জ্ঞানের সাধারণ আলোচনারূপে। সাধারণ আলোচনায় বিষয়টিকে আরও সহজভাবে উপলব্ধি করা সম্ভব হবে।

আচমকাই কারও মস্তিষ্কে একটি নতুন চিন্তা বা ধারণার উন্মেষ ঘটে। পরবর্তীতে অনেকেই সেই জ্ঞান ধারণ করে কিংবা তাকে আরও শানিত বা দক্ষতার সাথে ব্যাবহার উপযোগী করে তোলে। যেমন বিমান যারা আবিস্কার করেছে তারা বর্তমান সময়ের বিমান চালাবার জ্ঞান রাখে না। কিন্তু যিনি সে চিন্তা বা ধারণার প্রথম ধারক হিসেবে অনুপ্রাণীত হয়েছেন তার কাছে তেমন বার্তা, জ্ঞান ও প্রেরণার আগমন আশীর্বাদস্বরূপ। এ আশির্বাদ কোথা থেকে এলো? এখানেই আল্লাহকে ধরে নেয়া হয়। কেননা এর উত্তর মানুষের জানা নেই। আচমকা সে জ্ঞান ও প্রেরণা আগমনের পূর্বেও তার ভেতরে হয়তবা সে জ্ঞান ও প্রেরণা ছিল না।

আশীর্বাদ প্রাপ্ত ব্যাক্তির জ্ঞান দ্বারা সে নিজে, তার সাথে সংশ্লিষ্ট ব্যাক্তিবর্গ, গোষ্ঠী এবং তার মাধ্যমে সমগ্র মানবসমাজ বা জগত কল্যাণপ্রাপ্ত, উপকৃত ও লাভবান হতে পারে। তবে আশীর্বাদপ্রাপ্তগণ সেভাবেই বাছাইকৃত যে তারা তাদের নিজেদের লাভের বিষয় নিয়ে মোটেও চিন্তিত না। আল্লাহ তাদেরকে সেভাবেই প্রশান্তি ও তৃপ্তিটুকু পর্যন্ত দান করেন। সেখানেও জ্ঞান কাজ করে।

কোন বস্তুগত বিষয় নয় জ্ঞানই মানুষকে সত্যিকার প্রশান্তি দিতে পারে। জ্ঞানই মানুষকে তৃপ্তিতে ভরে দিতে পারে। কেননা প্রশান্তি বস্তুতে থাকে না। প্রশান্তি লাভ হয় চিত্তে; নিজের ভেতরে। জ্ঞানই সেটিকে উপলব্ধি করিয়ে দেয়।

জ্ঞানপ্রাপ্ত ও উপলব্ধি বোধসম্পন্ন মানুষ ছাড়া বিষয়গুলির পেছনে যে একজনের তথা আল্লাহর উপস্থিতি আছে সাধারণ মানুষ সেটি ভাবতে পারে না কিংবা ভূলে যায়। তাই তারা আল্লাহকে স্মরণ করে না এবং শিক্ষাও গ্রহণ করে না। অনেকেই মনে করে যে সে নিজ যোগ্যতায় সব অর্জন করেছে। মানুষকে তাই স্মরণ করিয়ে দিয়ে বলা হচ্ছে,

"মানুষকে যখন দুঃখ-কষ্ট স্পর্শ করে সে তখন আমাকে ডাকতে শুরু করে, অতঃপর যখন আমি তাকে আমার পক্ষ থেকে অনুগ্রহ দান করি সে বলে, 'এটি তো আমি আমার নিজ জ্ঞানে অর্জন করেছি।' না এটি একটি পরীক্ষা। কিন্তু তাদের অধিকাংশই জানে না।" (আল-কোরআন ৩৯:৪৯)

আল্লাহ জানেন মানুষের অন্তর কি কথা বলে। তাই তিনি বিষয়টিকে এভাবে স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন।

মানুষের সকল প্রযুক্তিগত বৈজ্ঞানিক আবিস্কারের জ্ঞানও সূচনালগ্নে এমনিভাবে আচমকাই আবির্ভূত বা উন্মোচিত হয়েছে। একের জ্ঞান থেকে সমগ্র জগত বিকশিত ও উপকৃত হয়েছে। এখান থেকেও একের জ্ঞানে সমগ্র জগত যেভাবে কল্যাণপ্রাপ্ত হয়েছে সে বিষয়ে ধারণা লাভ করা যায়।

জ্ঞানপ্রাপ্ত ব্যাক্তি তাই সত্যিই আল্লাহর আশীর্বদপ্রাপ্ত, কল্যাণপ্রাপ্ত। প্রাপ্ত এ কল্যাণ যেমন তার নিজের জন্য, তেমনি সমগ্র মানবজাহান তথা বিশ্বজগতের জন্যও।

যাকে অনুগ্রহ করে আল্লাহ জ্ঞান দান করেন তারও উচিত কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা। এতটুকু বোধ থাকা উচিত। কিন্তু সকলেই সেভাবে উপলব্ধি করে না বা স্মরণও করে না। এটিও মানুষের সামগ্রীক জ্ঞানের অভাবের কারণে হয়ে থাকে।

আল্লাহর আশীর্বাদপ্রাপ্ত ব্যাক্তিদের কারণে সমাজের মানুষ যেভাবে উপকৃত হয়ে, তাদেরও এতটুকু বোধ থাকা উচিত যে তারাও তাকে যথাযথ সন্মান ও মর্যাদা দেবে। কেননা আল্লাহ নিজেই তেমন একজনকে তাঁর আশীর্বাদ প্রেরণের

মাধ্যমে মানবসমাজে সন্মানিত করেছেন। আবার তার কোন গুণের কারণে আল্লাহর আশীর্বাদ প্রাপ্তির মাধ্যমে অনেক মানুষ উপকৃত, সুবিধাপ্রাপ্ত বা কল্যাণ প্রাপ্ত হয়েছে। তাই তাকে তার প্রাপ্যটুকু দেয়া উপকারভোগীদের কর্তব্য।

উল্লেখ্য যে, সে কারণে কোন ব্যাক্তিকে পূঁজা করারও প্রয়োজন নেই। কেননা সব আসে আল্লাহর দিক থেকে। এ বোধটুকু সকলেরই থাকা প্রয়োজন এবং আল্লাহর প্রতিই প্রকৃতপক্ষে মানুষের কৃতজ্ঞ হওয়া অধিকতর সমীচীন।

আধ্যাত্ম জ্ঞানও এমনিভাবে বিশেষ জ্ঞানের অন্তর্ভূক্ত জ্ঞানসমুহের অন্যতম। আধ্যাত্ম জ্ঞানের মহাত্ব ও গুরুত্বকে গীতায় এভাবে তুলে ধরা হয়েছে,

“এমনকি যদি তুমি পাপিদের থেকেও অধিক পাপী হও, তথাপি এই দিব্য জ্ঞানের তরী দ্বারা পাপজনিত দুঃখের সাগর অতিক্রম করতে পারবে। প্রজ্বলিত অগ্নি যেমন কাষ্ঠসমুহকে ভস্মীভূত করে, জ্ঞানরূপ অগ্নি তেমনই সকল কর্মকে ভস্মীভূত করে। এ জগতে জ্ঞানের মতো পবিত্র তেমন আর কিছু নেই যা যোগসিদ্ধ মানুষ সময়ে নিজেই অন্তঃকরণে লাভ করে।” (গীতা ৪:৩৬-৩৮)

“জ্ঞানের দ্বারা আলোকিত হয়ে যখন কারও অজ্ঞতা বিনাশপ্রাপ্ত হয়, তখন তার জ্ঞান সবকিছু উন্মোচন করে দেয় ঠিক যেমন সূর্য্য দিবসে সব আলোকিত করে।” (গীতা ৫:১৬)

➢ (আয়াত ২৭০-২৭৪) এ অংশে আল্লাহর রাস্তায় ব্যায় বা দান করা (Alms) প্রসঙ্গে বলা হয়েছে।

২৭০	তোমরা যা দান কর কিংবা দান করার ইচ্ছে পোষন কর, নিশ্চয়ই! আল্লাহ তা জানেন। ভূলপথগামীদের কোন সাহায্যকারী নেই। (Whatever alms ye spend or vow ye vow, lo! Allah knoweth it. Wrong-doers have no helpers.)
২৭১	যদি তোমরা প্রকাশ্যে দান কর সেটি ভাল, তবে তোমরা যদি তা গোপনে কর এবং অভাবগ্রস্তদের দাও এটি হবে তোমাদের জন্য উত্তম এবং তোমাদের কিছু মন্দ কর্মফলকে তা দুরীভূত করবে। তোমরা যা কর সে বিষয়ে আল্লাহ অবহিত। (If ye publish your almsgiving, it is well, but if ye hide it and give it to the poor, it will

	be better for you, and will atone for some of your ill-deeds. Allah is Informed of what ye do.)
২৭২	তাদেরকে সঠিক পথ গ্রহণ করাবার দায়িত্ব তোমার নয় (হে মোহাম্মদ), বরং আল্লাহ যাকে ইচ্ছে তাকে সঠিক পথে পরিচালিত করেন। ভাল কাজে যা তোমরা ব্যায় করবে, তা তোমাদের নিজেদেরই উপাকারার্থে, যখন আল্লাহর সন্তুষ্টি ছাড়া অন্য কোন উদ্দেশ্যে ব্যায় করা হয় না। ভাল কাজে তোমরা যা ব্যায় করবে, তোমরা তার পূর্ণ প্রতিদান পাবে এবং তোমাদের প্রতি কোন অন্যায় করা হবে না। (The guiding of them is not thy duty (O Muhammad), but Allah guideth whom He will. And whatsoever good thing ye spend, it is for yourselves, when ye spend not save in search of Allah's Countenance; and whatsoever good thing ye spend, it will be repaid to you in full, and ye will not be wronged.)
২৭৩	(দান) অভাবগ্রস্তদের প্রাপ্য, যারা আল্লাহর পথে এমনভাবে ব্যাপৃত যে, জীবিকার সন্ধানে বের হতে পারছে না। বিষয়সমুহ নিয়ে যারা চিন্তা-ভাবনা করে না, তারা তাদেরকে অভাবমুক্ত মনে করে তাদের আত্ম-সংযমের কারণে। তোমরা তাদেরকে তাদের লক্ষণ দেখে চিনবে। তারা মানুষের কাছে অশোভনভাবে চায় না। তোমরা যে ভাল কাজেই অর্থ ব্যায় করবে আল্লাহ তা জানেন। ((Alms are) for the poor who are straitened for the cause of Allah, who cannot travel in the land (for trade). The unthinking man accounteth them wealthy because of their restraint. Thou shalt know them by their mark: They do not beg of men with importunity. And whatsoever good thing ye spend, lo! Allah knoweth it.)
২৭৪	যারা স্বীয় ধন-সম্পদ ব্যায় করে রাতে ও দিনে, গোপনে ও প্রকাশ্যে, তাদের জন্য পুরস্কার রয়েছে তাদের পালনকর্তার কাছে। তাদের অন্তরে

	না কোন ভীতির সঞ্চার হবে, না তারা নিপতিত হবে কোনরূপ মনকষ্টে। (Those who spend their wealth by night and day, by stealth and openly, verily their reward is with their Lord, and there shall no fear come upon them neither shall they grieve.)

▪ **২.২৭০.১** তোমরা যা দান কর কিংবা দান করার ইচ্ছে পোষন কর, নিশ্চয়ই! আল্লাহ তা জানেন : দুঃস্থ-অসহায়-দরীদ্রকে যা দান করা হয় আল্লাহ তা জানেন [আল্লাহ দ্রষ্টব্য ২.২০.২]। বস্তুত আল্লাহ সবজান্তা। তিনি সব জানেন। এমনকি কেউ যদি দান করার ইচ্ছে পোষন করে আল্লাহ সেটিও জানেন। আল্লাহ অন্তরের গোপন বিষয়ও জানেন। বিশ্বাসী সেটি বিশ্বাস করে। আল্লাহর এ অবগত হওয়ার বিষয়টি বিশ্বাসী এবং ভাল পথে যারা সংগোপনে কিংবা নিঃস্বার্থভাবে অর্থ ব্যায় করে তাদের কাছে অনেক মূল্য বহন করে।

সত্য অন্তর নিয়ে যারা কাজ করে তারা জগতের মানুষ দেখল কি দেখল না, জানল কি জানল না তা নিয়ে চিন্তিত নয়। তারা আল্লাহকে নিয়ে ভাবে। আল্লাহ সব জানেন এ চিন্তাই তাদেরকে ভাল কাজে উদ্বুদ্ধ করে। তারা জানে সকল ভাল কাজের প্রকৃত প্রতিদানদাতা আল্লাহ। বিশ্বাসীদেরকে এভাবে দান করতে উৎসাহীত করা হয়েছে। এ কারণেই জগতের সকল মানুষকে বিশ্বাস স্থাপনে আহবান করা হয়ে থাকে, যেন সকলেই আল্লাহর কারণে উদ্বুদ্ধ হয়ে ভাল কাজ করে।

বস্তুত এর মাধ্যমে অর্থের প্রবাহকে নিচের দিকে চলমান রাখাকে উৎসাহ ও দিক-নির্দেশনা দেয়া হয়েছে। সমাজ, জীবন ও জগতের মঙ্গল তথা ভারসাম্য রক্ষায় যা অপরিহার্য্য।

▪ **২.২৭০.২** ভূলপথগামীদের কোন সাহায্যকারী নেই (Wrong-doers have no helpers) : সামর্থ থাকা সত্বেও যারা দান করে না, বস্তুত তারা ভূল করে। আল্লাহ সকলের সকল কর্মকান্ড দেখেন। তিনি মানুষকে এভাবে পরীক্ষাও করেন। তিনি যথাযথ প্রতিদানদাতা। অপরের বিপদে যারা এগিয়ে আসে না তেমন মানুষ নিজের বিপদের দিনেও কোন সাহায্যকারী নাও পেতে পারে। এভাবেই আল্লাহর সূত্র কাজ করে।

কিছু মানুষ যাকাত কিংবা দান করতে অনিচ্ছা প্রকাশ করে। উপরন্তু সূদে অর্থ লগ্নি করে মানুষ থেকে অতিরিক্ত অর্থ আদায় করে। এরাও ভূল-পথগামী। এটি একটি সতর্কবাণী। এ বাণীর মাধ্যমে ভূল বা মন্দ কাজ করতে মানুষকে নিরুৎসাহিত করা হয়েছে। একইসাথে সঠিক পথে চলতে দিক-নির্দেশনা ও উৎসাহ দেওয়া হয়েছে।

■ **২.২৭১.১** যদি তোমরা প্রকাশ্যে দান কর সেটি ভাল, তবে তোমরা যদি তা গোপনে কর এবং অভাবগ্রস্তদের দাও এটি হবে তোমাদের জন্য উত্তম : প্রকাশ্যে দান করায় মন্দ কিছু নেই। সেখানেও একটি তৃপ্তি আছে। সমাজের মানুষ জানতে পারে। নিজের সন্মান বৃদ্ধি পায়। নিজেও ভাল কাজে উৎসাহিত হয়। দেখাদেখি অন্যরাও উৎসাহিত হয়। তবে অবশ্যই সেটি যেন অহমিকা প্রদর্শনের জন্য না হয়।

প্রকাশ্যে দান করায় কখনও নিজের ভেতরে অহমিকা এসে যেতে পারে। তাই গোপনে দান করা অধিক উত্তম। কেননা দান করতে হবে আল্লাহর কারণে অন্তর থেকে। এটি দাতার আন্তরিকতা ও সদিচ্ছারও একটি বহিঃপ্রকাশ। আল্লাহতে দৃঢ় বিশ্বাসেরও প্রকাশ। তেমন মানুষ প্রকৃতই আল্লাহর কারণে দান করে। নিজেকে জাহির করার জন্য নয়। কর্মের ধরণই মানুষের ভেতরের ইচ্ছে বা নিয়তকে প্রকাশ করে দেয়।

বাধ্যতামূলক প্রদেয় সাধারণত প্রকাশ্যে করা ভাল। যেমন যাকাত। এতে অন্যরাও উৎসাহিত হয়। তবে অপরাপর দান গোপনে করা ভাল। তাতে অহমিকা প্রদর্শিত হয় না। আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য করা হয়েছে বলে বিবেচিত হয়। অভাবগ্রস্তদের দান করা উত্তম। দান সম্পর্কে গীতায় এভাবে বলা হয়েছে,

“দান করা কর্তব্য মনে করে যথাসময়ে, যথাস্থানে, উপযুক্ত ব্যাক্তিকে কোনরূপ প্রতিদানের প্রত্যাশা না করে যে দান করা হয় (সেটি উত্তম), সেটিকে সাত্বিকী বলা হয়।

কিন্তু যে দান কিছু প্রতিদানের আশায় বা কোন ফল বা স্বর্গাদি প্রাপ্তির আশায় কিংবা অনিচ্ছা সত্বেও করা হয় (সেটি উত্তম নয়), সেটিকে রাজসিক বলে।

দান যা পরমেশ্বরে বিশ্বাস ও ভক্তি ছাড়া সম্পন্ন করা হয় তা ক্ষণস্থায়ী, তা সে যে প্রকারেই করা হোক না কেন। এগুলিকে অসৎ কর্ম বলা হয় এবং ইহকাল ও পরকাল কোন কালেই তা উপকারে আসে না।” (গীতা ১৭:২০-২১, ২৮)

▪ **২.২৭১.২** এবং তোমাদের কিছু মন্দ কর্মফলকে তা দুরীভূত করবে : প্রকাশ্যে দান করার ক্ষেত্রে সমাজের মানুষ প্রভাবক হয়ে কাজ করে। মানুষ যখন কারও করা দান সম্পর্কে জানে বা আলোচনা করে দাতা তাতে উৎসাহ পায়। আবার অন্যরাও ভাল কাজ তথা দান করতে আগ্রহী হয়। প্রকাশ্যে দান করা মন্দ কিছু নয়।

বলা হচ্ছে, যদি গোপনে দান করা হয় এবং সেটি অভাবগ্রস্তদের দেয়া হয় সেটি উত্তম। সেক্ষেত্রে বিশ্বাসীর জন্য সর্বোচ্চ প্রভাবক হচ্ছেন আল্লাহ! সমাজের বহু মানুষ না জানলেও আল্লাহ জানেন বিশ্বাসী তা বিশ্বাস করে এবং এমন ক্ষেত্রে বিশ্বাসী কেবল আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের নিয়তেই কাজটি করে। জগতের মানুষ দেখল কি দেখল না বা জানল কি জানল না তা নিয়ে ভাবে না। এখানে দাতার দানের বিষয়ে সৎ অন্তরের একটি বহিঃপ্রকাশ ঘটে। লোক দেখানর ইচ্ছেতে কাজটি করা হয়নি সেটি বোঝা যায়।

সত্য হচ্ছে গোপনে দান করলেও মানুষ সত্যটা জেনে যায়। কেননা গোপনে দান করলেও যাকে দেয়া হচ্ছে সে জানে। এমনিভাবে আল্লাহ সব জেনে যান। সমাজের মানুষও জেনে যায়। মানুষের ভাল কাজের কারণে তার কিছু মন্দ কাজের অপেক্ষারত মন্দ ফলাফল আল্লাহ দুর করে দেন। বস্তুত আল্লাহ কোরআনে যা বলেছেন তার সকল সূত্র তিনি জগতে পূর্ব থেকেই স্থাপন করে রেখেছেন। সব সূত্র অনুযায়ী চলে। তাই মানুষকে কোরআনের দিক-নির্দেশনা অনুযায়ী চলতে আহবান করা হয়। যেন মানুষ ভাল কিছু অর্জন করতে পারে।

এসব বার্তা মানুষকে সৎ অন্তর নিয়ে কোন কাজ করতে উৎসাহিত করে। ‘তোমাদের কিছু মন্দ কর্মফলকে তা দুরীভূত করবে’ আল্লাহর এ নিশ্চিত বার্তার কারণে মানুষ তথা বিশ্বাসী সে আশাতেও দান করতে উৎসাহিত হবে। মানুষকে ভাল কাজে উদ্বুদ্ধ হতে তাই বিশ্বাসী হওয়ার জন্য আহবান করা হয়।

বস্তুত বাস্তব জীবনেও আমরা দেখি যে কেউ যদি কোন খারাপ কাজ করে থাকে, অতঃপর যদি তার চেয়েও কোন ভাল কাজ করে তবে তার খারাপটা মানুষের কাছে ম্লান হয়ে যায়। এমনকি মানব হৃদয় তাকে তার ভাল কাজের জন্য পূর্বের মন্দ কাজটিকে মাফ করে দেয়। এগুলিই সূত্র। আল্লাহর বার্তার সত্যতার নিদর্শন এগুলি। সন্দেহপ্রবণদের বোঝার সুবিধার জন্য আবার এ উদাহরণগুলি প্রমাণও বটে!

▪ **২.২৭১.৩** তোমরা যা কর সে বিষয়ে আল্লাহ অবহিত (Allah is Informed of what ye do) : মানুষ যখন না দেখা আল্লাহকে বিশ্বাস করে এবং সে যখন জানে যে আল্লাহ তাকে দেখছেন তখন সে ভাল কাজ করে তৃপ্তি পায়। কেউ না দেখলেও সেটি সে বিবেচনায় নেয় না। এটি একটি দারুণ প্রভাবক হয়ে কাজ করে বিশ্বাসীর জন্য।

বস্তুত মানুষ নিজে যেটি জানে আল্লাহও সেটি জানেন [আল্লাহ দ্রষ্টব্য ২.২০.২]। এভাবেই আল্লাহ সব জানেন! তিনিই বিরাজ করেন ভেতরে।

বিশ্বাসীদের জন্য সর্বোচ্চ প্রভাবক হচ্ছেন আল্লাহ! এর ওপরে তাদের কাছে আর কোন প্রভাব সৃষ্টিকারী নেই। অবিশ্বাসীদেরও প্রভাবক আল্লাহ। নাস্তিকদেরও প্রভাবক আল্লাহ। কিন্তু কেউ বুঝতে ভূল করে। কেউ উপলব্ধিও করতে পারে না। আবার অনেকে অন্তরের গভীরে উপলব্ধি করেও কোন কারণে স্বীকার করে না। অন্তর তাদের বিদ্রোহী। আল্লাহতে অবিশ্বাসী ও নাস্তিক যখন জ্ঞানের কারণে কোন ভাল কাজ করে সে নিজে সেটি জানে। সে নিজে কে? যা সে নিজে জানে তাই আল্লাহ জানেন। আল্লাহর সংযোগবিহীন কোন কিছু বস্তুত প্রাণহীন। বিষয়গুলি নিয়ে ভাববার আছে। যেমন গীতায় বলা হয়েছে,

"এবং যখন তুমি .. সত্যকে জানবে- তুমি জানতে পারবে যে, সকল জীবসত্বা আমার অংশ এবং এইভাবে তারা আমার ভেতরে এবং তারা আমার।" (গীতা ৪:৩৫)

কোরআনে বলা হয়েছে, "নভোমণ্ডল ও ভূ-মণ্ডলে যারাই আছে তারা সবাই তাঁরই (আল্লাহরই) ...।" (আল-কোরআন ২১:১৯)

বলা হচ্ছে, "... তোমরা যা শোন ও দেখ প্রকৃতপক্ষে কে তা শোনে ও দেখে?" (আল-কোরআন ১০:৩১)

▪ **২.২৭২.১** তাদেরকে সঠিক পথ গ্রহণ করাবার দায়িত্ব তোমার নয় (হে মোহাম্মদ), বরং আল্লাহ যাকে ইচ্ছে তাকে সঠিক পথে পরিচালিত করেন : বার্তাবাহক কিংবা পথ প্রদর্শকগণের কাজ হচ্ছে আল্লাহর বাণী বা উপদেশ মানুষের কাছে পৌঁছে দেয়া। গ্রহণ করা বা না করা ব্যাক্তির নিজ বিবেচনা। মহানবী (সাঃ) নিজেও কাউকে পথ নির্দেশ করেননি। মানুষকে পথ প্রদর্শন করেছেন আল্লাহ। মহানবী আল্লাহর বার্তা মানবসমাজে পৌঁছে দিয়েছেন। তাই বলা হয়েছে,

“বল (হে মোহাম্মদ): আল্লাহর ইচ্ছে ব্যাতিত নিজের ভাল কিংবা মন্দ করা বিষয়েও আমার কোন ক্ষমতা নেই। ... আমি কেবলি একজন সাধারণ সতর্ককারী এবং সুসংবাদবাহক বিশ্বাসীদের জন্য।” (আল-কোরআন ৭:১৮৮)

সত্য হচ্ছে, কেউই কাউকে সঠিক পথে বা কোন পথে বা দিকেই চালাতে পারে না। প্রতিটি মানুষই তার নিজের বুঝে চলে ও চলতে চায়। এমনকি একটি শিশুও তার কাজে অপরের হস্তক্ষেপকে পছন্দ করে না। বাধা দিতে গেলে হাত দিয়ে সরিয়ে দেয়। চলার স্বাধীনতা চায়। তবে ভূল পথে চললে বিপদের সম্ভাবনাও আছে। সেজন্যই প্রয়োজন দিক-নির্দেশনা বা পথ প্রদর্শন। সমগ্র মানবজাতির জন্য আল্লাহ প্রদত্ত পথ-নির্দেশনা হচ্ছে আল-কোরআন। যেখানে আমরা ভাল-মন্দ পথ সম্পর্কে দিক-নির্দেশনা (Guidance) পাই। বলা হচ্ছে,

“আমি কি মানুষকে দু’টি চক্ষু দেইনি এবং জিহ্বা ও দু’টি ঠোট? তাকে পথ চলার ভিন্ন ভিন্ন দুটি পথ প্রদর্শন করেছি; ভাল ও মন্দ। কিন্তু সে চেষ্টা করেনি উন্নততর বা উচ্চতর পর্যায়ে আরোহনের,” (আল-কোরআন ৯০:৮-১১)

মানুষকে চক্ষু, কর্ণ নানা উপকরণ দেয়া হয়েছে জগতকে চিনে, জেনে ও বুঝে চলার জন্য। নিজ প্রচেষ্টার দ্বারাই নিজেকে বুঝে চলতে হবে। নিজেকে বিকশিত করতে হবে। নিজেকে নিজের নিয়ন্ত্রনও করতে জানতে হবে।

বস্তুত আল্লাহই মানুষকে পথ প্রদর্শন করেন। তিনি ভাল-মন্দ সম্পর্কিত জ্ঞান দিয়ে দিয়েছেন। কোরআনে ভাল-মন্দ চিহ্নিত করে দিয়েছেন। এ ছাড়াও প্রতিটি অন্তরে আছে দিক-নির্দেশনা। যা সৃষ্টিতেই অন্তর্গ্রথিত। বাইরে থেকে দেখা

যায় না। যা আছে লওহে-মাহফুজে (দ্রষ্টব্য ২.২৭)। তাই মানুষ যখন সিদ্ধান্ত নেয় ভেতর থেকে প্রতিনিয়ত ভাল-মন্দ বলে দেয়া হয়। পরামর্শ দেয়া হয়। তবে কেউ পরামর্শ গ্রহণ করে আবার কেউ করেনা। সিদ্ধান্ত নিজের। আল্লাহ কোন দিকে যেতে বাধা দেন না।

একইভাবে এটি কারই দায়িত্ব নয় যে সে অন্যকে সঠিক পথে চালনা করে নিয়ে যাবে। কিংবা জোর-জবরদস্তী করবে। প্রকৃতপক্ষে সেটি সম্ভবও নয় এবং করা উচিতও নয়।

নিজের সিদ্ধান্ত মানুষ শেষ মূহুর্তে নিজেই নেয়। তবে কেউ ভাল-মন্দ বিচারে সক্ষম হয়, সুপরামর্শ গ্রহণ করে, দিক-নির্দেশনা অনুসরণ করে এবং কেউ করে না।

যেহেতু সিদ্ধান্ত নিজের তাই ভাল-মন্দ কর্মের ফলাফল প্রাপ্তিও নিজের। এটিই পরীক্ষা। অতএব কাউকে সঠিক পথ গ্রহণ করাবার দায়িত্ব কারই নয় এবং সেটি করাও সম্ভব নয়।

প্রশ্ন হচ্ছে, মানুষ তো নিজেই সিদ্ধান্ত নেয় ও নিজেই চলে তাহলে আল্লাহ চালনা করেন বলা হচ্ছে কেন? যদি আল্লাহই মানুষকে চালনা করবেন তবে কর্মের কারণে মানুষের নিজেকে কেন ফল ভোগ করতে হবে? এ বিষয়টির মর্মার্থই কিছু মানুষ যথাযথভাবে বুঝতে ভূল করে।

চালক হচ্ছেন আল্লাহ। আল্লাহর সাহায্য ব্যাতিত মানুষের নিজের চলার এমনকি দৈহিক শক্তিটিও নেই। বিভিন্ন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে সে শক্তিটুকুও আল্লাহ প্রদত্ত। বিষয়গুলিকে খুব ক্ষুদ্র অর্থে বুঝলে হবে না। পেছনে বিশাল প্রক্রিয়া কাজ করে। যে প্রক্রিয়ার ফলে মানুষ অনুভব করে যে সে নিজে চলছে। বস্তুত চালনা করেন আল্লাহ।

এর সাথে মাটি, পানি, সূর্য্যের আলো, খাদ্য উৎপাদন, খাদ্য গ্রহণ থেকে শুরু করে দেহে শক্তি সঞ্চারণ পর্যন্ত সকল বিষয় সম্পর্কিত। কিছুই মানুষের নিজ নিয়ন্ত্রনে নয়। সবই আল্লাহর নিয়ন্ত্রনে। মানুষ যেমন সিদ্ধান্ত নেবে আল্লাহর সৃষ্ট দেহ মানুষকে সে পথেই নিয়ে যাবে। দেহ চলে আল্লাহ প্রদত্ত শক্তিতে। আল্লাহই চালক। একটি উদাহরণ দিয়ে বিষয়টি বোঝার চেষ্টা করি।

রথের চালক 'কৃষ্ণ'। 'অর্জুন' যেদিকে নিয়ে যেতে বলবে কৃষ্ণ রথকে সেদিকে নিয়ে যাবে। কিন্তু অর্জুন সিদ্ধান্ত নিলেও কৃষ্ণের সহায়তা ভিন্ন সে

নিজে রথ চালনা করতে পারবে না। আবার অর্জুনের সিদ্ধান্ত ছাড়া কৃষ্ণও রথ নিয়ে এগিয়ে যাবে না। কৃষ্ণ অর্জুনকে ভাল-মন্দ সব পরামর্শ ও উপদেশ দেবে। কিন্তু অর্জুন যেদিকে যেতে চাইবে সেদিকেই নিয়ে যাবে। বাধা দেবে না। বোঝার সুবিধার জন্য উদাহরণটি তুলে ধরা হল।

এমনিভাবে আল্লাহই মানুষকে চালনা করেন। সামনে এগিয়ে নিয়ে যান। কিন্তু সিদ্ধান্ত গ্রহীতা মানুষ নিজে। আল্লাহ মানুষকে সেদিকে চালনা করেন যেদিকে সে নিজে চলতে বা যেতে চায়।

এখানেই রয়েছে ভেতরের পরামর্শদাতা বা পথ-প্রদর্শক ও সিদ্ধান্ত গ্রহীতার মধ্যকার সূক্ষ্ম পার্থক্য। অর্থাৎ 'তিনি' ও 'আমি'র পার্থক্য। আমার ভেতরে 'আমি' আবার আমার ভেতরেই 'তিনি'। দু'য়ের পার্থক্য বোঝা কঠিন।

মানুষ যেদিকে যেতে চায় আল্লাহ সেদিকেই তার সক্ষমতা বৃদ্ধি করে দেন। মানুষ কেবল শারীরিক শক্তিতেই চলে না। মানসিক শক্তিও লাগে। তাই ইচ্ছে, উচ্ছ্বাস, উদ্দাম, গতি ভেতর থেকে তিনি সব উজ্জীবিত করে দেন। মানুষকে সর্বশক্তিতে জাগিয়ে তোলেন। অনুপ্রেরণা হয়ে কাজ করেন। যা মানুষ নিজের বলে অনুভব করে।

এভাবেও তিনি মানুষকে চালনা করেন। তবে তিনি ভূল পথে চালাবেন, নাকি সঠিক পথে নিয়ে যাবেন সেটি নির্ভর করে সিদ্ধান্ত গ্রহীতার ওপর। মানুষ যে পথে যেতে চাইবে সে পথেই তিনি তার শারীরিক-মানসিক সকল সক্ষমতা বৃদ্ধি করে দেবেন। তাঁর সার্বিক সহায়তা ভিন্ন মানুষের পক্ষে চলা সম্ভব নয়।

বস্তুত আল্লাহই মানুষকে চালনা করেন। সাধারণ চোখে পেছনের সূক্ষ্ম বিষয়গুলি মানুষের কাছে ধরা দেয় না। তাই মানুষ অনেক ক্ষেত্রেই যথাযথ কারণটি বা অংকটি বুঝে উঠতে পারে না।

কিছু মানুষকে আপাতদৃষ্টে সৌভাগ্যবান বলে মনে হয়। মনে হয় যেন আল্লাহ নিজেই তাদেরকে সঠিক পথে চালনা করছেন। আল্লাহ মানুষকে কেন ও কিভাবে চালনা করেন ওপরে কৃষ্ণ ও অর্জুনের উদাহরণ দিয়ে বিষয়টি তুলে ধরা হয়েছে। বলা হচ্ছে,

"নিশ্চয়ই! আমি মানুষ সৃষ্টি করেছি এবং আমি জানি তার মন নিভৃতে তাকে কি পরামর্শ দেয়। আমি তার গ্রীবাস্থিত ধমনী থেকেও অধিক নিকটবর্তী।" (আল-কোরআন ৫০:১৬)

"তোমার ওপরে তত্ত্বাবধায়ক নিযুক্ত রয়েছে, সদয়; যারা কর্ম বৃত্তান্ত লিখে চলেছে। তোমরা যা কর তারা তার সবই জানে।" (আল-কোরআন ৮২:১০-১২)

মানুষ সম্পর্কে আল্লাহ সব জানেন। একজন মানুষের সমগ্র জীবনকে আল্লাহ জানেন। তিনি জানেন কে কোন প্রকৃতির। তিনি জানেন কার কি নিয়ত। তিনি জানেন কে কেমন। তিনি জানেন কে কি চায়। তিনি জানেন কার কোন দিকে আগ্রহ। তিনি সব জানেন। কেননা তিনি প্রত্যেকের সাথে/ভেতরে আছেন। যেমন বলা হয়েছে,

"তুমি কি দেখনি, নভোমণ্ডল ও ভূ-মণ্ডলে যা কিছু আছে আল্লাহ তার সবই জানেন। তিন ব্যাক্তির এমন কোন পরামর্শ হয় না যেখানে তিনি চতুর্থ না থাকেন, না পাঁচ জনে তিনি ষষ্ঠ নন কিংবা এর চেয়ে কম বা বেশী হোক এবং তারা যেখানেই থাকুক না কেন তিনি তাদের সঙ্গে আছেন; পুনরুত্থান দিবসে তিনি তাদের অবহিত করবেন তারা যা করেছে। আল্লাহ সর্ব বিষয়ে জ্ঞাত।" (আল-কোরআন ৫৮:৭)

আল্লাহ পূর্ব থেকেই প্রতিটি মানুষ সম্পর্কে পরিপূর্ণভাবে অবগত। তাই যে যেমন প্রকৃতির বা যে ভেতরে যেমন ইচ্ছে পোষন করে তাকে তিনি সেদিকে চালনা করেন। মানুষ নিজে যখন ভেতরে নিজেকে ভাল পথে নিয়ে যেতে ইচ্ছুক হয় আল্লাহ তখন তাকে সে পথে নিয়ে যান। কিন্তু সাধারণ মানুষ জানে না যে কে কোন পথে যেতে ইচ্ছুক। তারা কারও ভেতরের খবর জানে না। অতীত জানে না। যথাযথ কারণ বা অংকটি মানুষ জানে না বা বুঝে উঠতে পারে না বলে মনে করে যে আল্লাহ নিজেই কাউকে সুপথে চালনা করছেন, কিন্তু কাউকে করছেন না। তাই 'আল্লাহ যাকে ইচ্ছে' কথাটি উচ্চারিত হয়।

বস্তুত আল্লাহ সকলকেই সুপথে নিয়ে যেতে ইচ্ছুক। কিন্তু আল্লাহর ইচ্ছেও সুবিবেচনা প্রসূত ইচ্ছে। যাকে দেখা যাচ্ছে আল্লাহ সুপথে চালাচ্ছেন না সে আসলে নিজেই সুপথে চলতে চাচ্ছে না। আল্লাহ তার ভেতরের সবকিছু পূর্ব

থেকেই জানেন। বস্তুত মানুষ নিজের সম্পর্কে নিজে যা জানে আল্লাহই তা জানেন। তিনি ভেতরে বিরাজ করেন। বলা হচ্ছে,

"... তোমরা যা শোন ও দেখ প্রকৃতপক্ষে কে তা শোনে ও দেখে?" (আল-কোরআন ১০:৩১)

আল্লাহ পূর্ব থেকেই মানুষ সম্পর্কে জানেন বিধায় যে সঠিক পথে চলার মানসিকতা সম্পন্ন তিনি তার ইচ্ছের সাথে আরও ইচ্ছে বর্ধিত করে দেন। তাই 'আল্লাহ যাকে ইচ্ছে তাকে সঠিক পথে পরিচালনা করেন' কথাটি সত্য প্রতিভাত হয়। বলা হচ্ছে,

"যারা নিয়ত ভক্ত এবং ভালবাসার সাথে আমার উপাসনা করে তাদেরকে আমি জ্ঞান-বুদ্ধি দান করি যার দ্বারা তারা আমাকে লাভ করে।" (গীতা ১০:১০)

মানুষকে আল্লাহ দিক-নির্দেশনা দিয়েছেন। ভাল-মন্দ বলে দিয়েছেন। যেমন ভাল পথে ব্যায় করতে উদ্বুদ্ধ করেছেন। কিন্তু কোন জোর-জবরদস্তী নেই। এটি মানুষের নিজেরই সিদ্ধান্ত যে সে কোন পথ বেছে নেবে।

তিনিই সকলকে পথ দেখান। চালনা করেন। সিদ্ধান্ত মানুষের নিজের যে সে কোন পথ বেছে নেবে। বস্তুত সত্য হচ্ছে যে, শেষ মুহূর্তে প্রতিটি মানুষ নিজেই নিজের সিদ্ধান্ত নেয়। সে ভাল পথ বেছে নিতে পারে, আবার মন্দ পথও বেছে নিতে পারে। তবে সুপথের পরামর্শ দিলেও জবরদস্তী কাম্য নয়। সেটি নকল করে পরীক্ষা পাশ করার মতো বিষয় হবে। কিংবা কেমিকেল দিয়ে ফল পাকাবার মতো বিষয় হবে। যে বিষয়ে নিশ্চয়ই আল্লাহ অবহিত থাকবেন।

উল্লেখ্য যে, কারও মন্দ পথ অবলম্বন যদি সামাজিক বিশৃংখলা সৃষ্টির কারণ হয়, তবে নিয়মানুযায়ী যথাযথ ব্যাবস্থা নেয়া যেতেই পারে। সেক্ষেত্রে যেন বিষয়গুলিকে 'আল্লাহর ইচ্ছে' বলে ভূলভাবে ব্যাখ্যা করা না হয় সেটিও বুঝতে হবে। আল্লাহ মানুষকে মন্দ পথ পরিহার করে চলার নির্দেশনা দিয়েছেন।

▪ **২.২৭২.২** ভাল কাজে যা তোমরা ব্যায় করবে, তা তোমাদের নিজেদেরই উপাকারার্থে, যখন আল্লাহর সন্তুষ্টি ছাড়া অন্য কোন উদ্দেশ্যে ব্যায় করা হয় না : মানুষকে ভাল পথে ব্যায় করতে বলা হয়েছে। এটি আল্লাহর দিক-

নির্দেশনা। বলা হচ্ছে, ভাল কাজে যা তোমরা ব্যায় করবে তা তোমাদের নিজেদেরই উপাকারার্থে। এর দুটি দিক আছে। একটি বাস্তব জীবনে এবং অপরটি পারলৌকিক।

আল্লাহ সূত্র ভিন্ন কিছু বলেন না। সূত্রই সত্য। এটি আল্লাহর একটি নিয়ম এবং মানব সমাজেও সে নিয়ম প্রতিষ্ঠিত বা আল্লাহই সে সূত্র প্রতিষ্ঠা করে দিয়েছেন। কেউ ভাল কাজ করলে বা ভাল পথে ব্যায় করলে তার ভাল ফলাফল মানবসমাজও তাকে দিয়ে থাকে। সমাজে তেমন মানুষের মর্যাদাও বৃদ্ধি পায়। মর্যাদা মানুষের জন্য নানাবিধ সুফলও বয়ে আনে। তবে এগুলি একান্তই ব্যাক্তিক দৃষ্টিকোন থেকে বলা হচ্ছে।

সমষ্ঠিগতভাবে মানুষ যখন বড় কোন ভাল কাজে ব্যায় করে বা দান করে, তখন সে কাজের ফল দ্বারা সমাজের মানুষের বৃহৎ কল্যাণ সাধন হয়। অর্থাৎ ভাল পথে ব্যায় করলে ব্যাক্তিক ও সামষ্ঠিক উভয় দিক থেকে তা মানুষের নিজেদেরই উপকার সাধন করে।

অতঃপর গুরুত্বপূর্ণ দিক-নির্দেশনাটি হচ্ছে যে, অবশ্যই সে ব্যায় হতে হবে আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য। এটিই মানুষের সত্যিকার আন্তরীকতার বহিঃপ্রকাশ। না সমাজের কোন মানুষের প্রশংসা প্রাপ্তির প্রত্যাশা থেকে ব্যায় করা, না কোন ফল লাভের আশায় ব্যায় করা, না দম্ভ প্রকাশের জন্য ব্যায় করা- কেবল আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য ব্যায় করতে হবে।

আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের নিয়ত ব্যাতিত যে কাজ করা হয় তাতে নিজের প্রচার-প্রচারণা ও নিজেকে প্রকাশের ইচ্ছে থাকে বেশী। যা সৎ, আন্তরীক ও উন্নত মানসিকতার পরিচায়ক নয়। তেমন হলে বাস্তব জীবনেই মানুষ সে দানকে মন থেকে গ্রহণ করে না। উপরন্তু বিদ্বেষ পোষন করে এবং মানুষ সেটিকে ছোট মানসিকতার পরিচয় বলে মনে করে। দানবীরের দানের অর্থ কিভাবে অর্জিত হয়েছে সেটি নিয়েও প্রশ্ন আসে। অর্থাৎ আল্লাহর সৃষ্ট সূত্রই মানুষকে দিয়ে দুই নিয়তে করা কাজের দুই রকমভাবে ভাল বা মন্দ ফলাফল বাস্তব জীবনেই দিয়ে দেয়। অতঃপর পরকাল তো আছেই।

অতএব যখন কেবল আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্যই ভাল কাজ করা হবে বা ভাল কাজে ব্যায় করা হবে, তখনই সেটি মানুষের জন্য সত্যিকার কল্যাণ বয়ে আনবে। তেমন ক্ষেত্রে মানুষ দাতাকে সন্মানের চোখে দেখে। মানুষ ভাল নিয়ত

বুঝতে পেরে সহায়তার হাত প্রসারিত করে দেয়। ভাল কাজে ব্যায় করলে পরকালেও তার ভাল ফলাফল প্রাপ্তি আছে। তাই বলা হয়েছে যে, "ভাল কাজে যা তোমরা ব্যায় করবে, তা তোমাদের নিজেদেরই উপাকারার্থে যখন আল্লাহর সন্তুষ্টি ছাড়া অন্য কোন উদ্দেশ্যে ব্যায় করা হয় না।"

গীতায় বলা হয়েছে, "(ভগবানের) প্রতি সমর্পন করে কাজ-দায়িত্ব পালন করা উচিৎ, অন্যথায় কাজ এই জড় দুনিয়ায় একজনকে আবদ্ধ করে ফেলে (অর্থাৎ ভেতরে ফল ভোগ করার ইচ্ছেকে জাগ্রত করে এ জগতেই মানুষকে বন্ধনে আবদ্ধ করে রাখে)। অতএব .. তোমার সুনির্দিষ্ট দায়িত্ব পালন কর ভগবানের তুষ্টির কথা বিবেচনা করে এবং এই প্রকারে তুমি সর্ব প্রকার আসক্তি ও বন্ধন থেকে মুক্ত থাকবে।" (গীতা ৩:৯)

▪ **২.২৭২.৩** ভাল কাজে তোমরা যা ব্যায় করবে, তোমরা তার পূর্ণ প্রতিদান পাবে এবং তোমাদের প্রতি কোন অন্যায় করা হবে না : ভাল কাজে মানুষ যা ব্যায় করবে মানুষ তার পূর্ণ প্রতিদান পাবে। আরও বলা হয়েছে যে, এক্ষেত্রে কোন অন্যায় করা হবে না। এগুলি আল্লাহর প্রতিশ্রুতি।

ভাল কাজের প্রতিদান না পাওয়া বা না দেয়াও যথাযথ বিবেচনাপ্রসূত কোন কাজ নয়। আবার যতটুকু প্রাপ্য তার চেয়ে কম দিয়েও আল্লাহ কখনই অন্যায্যতা করেন না।

যদিও আল্লাহর বিচার ব্যাবস্থায় কোন অন্যায় বা অন্যায্যতার স্থান নেই, তথাপি আশ্বাসের এ বাণী বিশ্বাসীকে আশাবাদী করে। বিশ্বাসীকে ভাল কাজে উদ্বুদ্ধ করে। বস্তুত মানুষকে এসব সত্য বা সূত্র স্মরণ করিয়ে দেয়া হয়েছে যেন মানুষ ভূলে না যায়। এ প্রতিদান আল্লাহর দিক থেকে ইহজগতে কিংবা পরজগতেও প্রাপ্ত হতে পারে।

বিশ্বাসী বিশ্বাস করে যে আল্লাহ সব জানেন, দেখেন। তিনিই প্রতিদান দাতা। এটি তার জন্য এক সন্তুষ্টি ও প্রশান্তির কারণ। না পেলেও কোন ক্ষতি নেই। ভাল কাজ নিজেদেরই উপাকারার্থে যখন সেটি আল্লাহর কারণে করা হয়। প্রতিদান না পেলে যে অসন্তুষ্ট হয় তার কর্ম নিঃস্বার্থ নয়। আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের নিয়ত ব্যাতিত যে কাজ করা হয় তাতে নিজের প্রচার ও

নিজেকে প্রকাশের ইচ্ছে বেশী থাকে। যা সৎ, আন্তরীক ও উন্নত মানসিকতার পরিচায়ক নয়।

এ জগত সূত্রের ওপর প্রতিষ্ঠিত। মানুষ সেসব সূত্র জানে। আল্লাহ স্মরণ করিয়ে দেন। মানুষ যখন ভাল কাজে ভাল নিয়তে নিঃস্বর্থভাবে ব্যায় করে তখন জগতের মানুষও সেটিকে ভালভাবে মূল্যায়ন করে এবং তেমন ভাল মানুষকে অন্তর থেকে গ্রহণ করে নেয়। সমাজে তার মর্যাদা বৃদ্ধি পায়। এগুলিও কি ভাল কাজের ইহজাগতিক যথাযথ প্রতিদান নয়?

ভাল কাজে ব্যায় করা হলে ব্যাক্তি, পরিবার, সমাজ সকলেই তার ভাল ফল ভোগ করে। অতঃপর পরকালে আল্লাহর প্রতিদানের প্রতিশ্রুতি তো আছেই। এসব বাণী বিশ্বাসীকে ভাল কাজে উদ্বুদ্ধ ও প্রাণবন্ত করে! আল্লাহ তাঁর বাণী দ্বারাই মানুষকে ভাল কাজে, সমাজের প্রয়োজনীয় কাজে উদ্বুদ্ধ করেন। যেমন বলা হয়েছে,

"... একটি ভাল বাণী হল একটি ভাল বৃক্ষের মতো। তার শিকড় মজবুত এবং শাখা প্রশাখা অতি উচ্চে পৌঁছে যায়। সে পালনকর্তার নির্দেশে প্রতি মৌসুমে ফল প্রদান করে। আল্লাহ মানুষের জন্য এমন দৃষ্টান্ত বর্ণনা করেন যেন মানুষ অনুসরণ করে। ... আল্লাহ বিশ্বাসীদেরকে দৃঢ় বাণী দ্বারা সুনিশ্চিত/সুদৃঢ়/সুপ্রতিষ্ঠিত করেন পার্থিব জীবনে এবং পরকালে।" (আল-কোরআন ১৪:২৪-২৭)

▪ **২.২৭৩.১** (দান) অভাবগ্রস্তদের প্রাপ্য, যারা আল্লাহর পথে এমনভাবে ব্যাপৃত যে, জীবিকার সন্ধানে বের হতে পারছে না। বিষয়সমূহ নিয়ে যারা চিন্তা-ভাবনা করে না, তারা তাদেরকে অভাবমুক্ত মনে করে তাদের আত্ম-সংযমের কারণে। তোমরা তাদেরকে তাদের লক্ষণ দেখে চিনবে। তারা মানুষের কাছে অশোভনভাবে চায় না : মানুষকে দান করতে উৎসাহ দেয়া হয়েছে। তবে স্মরণীয় যে দানের অর্থের যথার্থ প্রাপক অভাবগ্রস্তরা। বিশেষত যারা আল্লাহর পথে এমনভাবে ব্যাপৃত যার ফলে তারা নিজেরা নিজেদের জন্য জীবিকার সন্ধান করার খুব কমই সুযোগ পায়।

আল্লাহর পথ বলতে সকল ভাল, কল্যাণমূলক এবং আর্থ-সামাজিক-রাজনৈতিক তথা সমাজের ও মানব কল্যাণে দায়িত্ব ও কর্তব্য পালনমূলক

সকল কাজকেই বুঝতে হবে। সকল কাজই প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে আল্লাহরই কাজ।

যারা সমাজের ও মানব কল্যাণে দায়িত্ব ও কর্তব্য পালনমূলক কাজে নিয়োজিত থাকে এ ধরণের নিঃস্বার্থ কর্মঠ মানুষেরা সাধারণত আত্মসংযমী হয়। তারা অন্যের কাছে অশোভনভাবে কোন কিছু যাচ্ঞা করে না যখন তারা সত্য অন্তরে কাজগুলি করে। ফলে মানুষ তাদেরকে অভাবমুক্ত মনে করে।

বলা হচ্ছে, তাদের লক্ষণ দেখে তাদেরকে চিনে নিতে হবে এবং তাদের জন্য দানের অর্থ থেকে ব্যায় করতে হবে। এরা নিজেদের জন্য নয় মানবতার জন্য, মানব কল্যাণের জন্য কোন কিছু প্রত্যাশা না করে কাজ করে। এদের প্রেরণা আল্লাহ। এরা যে রং-ই ধারণ করুক না কেন প্রকৃতই বিশ্বাসী [বিশ্বাসী দ্রষ্টব্য ২.৫]।

ধর্ম বা দ্বীন হচ্ছে মানবজাতির চলার যথাযথ পথ। জীবন থেকে মানবজাতির চলার পথ বা ধর্ম পৃথক কিছু নয়। ধর্ম শব্দটি ব্যাবহার করার কারণে এ দিক-নির্দেশনা জীবনের অন্যত্র অচল এমন ভাববার কোন কারণ নেই। তবে এমন ভাববারও কারণ আছে যখন কেউ ধর্ম বা দিক-নির্দেশনাকে যথাযথ অর্থে বুঝতে ব্যার্থ হবে।

আল্লাহর এ পৃথিবীর মানবীয় ব্যাবস্থাপনা আল্লাহরই উদ্দেশ্যে একটি উচ্চ পর্যায়ের মহৎ কাজ। যা ধর্ম বা দ্বীন বা মানবীয় চলার পথ থেকে পৃথক কিছু নয়। এগুলিও আল্লাহর পথের কাজ।

যারা সৎভাবে জীবন-যাপন করে এবং মানবীয় ব্যাবস্থাপনা তথা এমনকি রাজনীতির সাথেও সম্পৃক্ত, দানের অর্থ থেকে তেমন মানুষদের জন্য ব্যায় করা যাবে। সাংগঠনিক কাজেও ব্যায় করা যাবে যদি সেই সংগঠনে সুশাসন থাকে। কেননা তারাও আল্লাহর পথে ব্যাপৃত এবং তাদের অনেকেই নিঃস্বার্থভাবে মানব কল্যাণে নিয়োজিত থাকার কারণে জীবিকার সন্ধানে বের হতে পারে না।

দানের অর্থ যেন অপাত্রে না যায় সে বিষয়টি লক্ষ্য রাখা বাঞ্ছনীয়। ভূলবশত বা না জানার কারণে অপাত্রে দানের অর্থ চলে গেলে সে ক্রটি হয়তবা দাতার নয়। তবে না জানার অভিনয় করা ক্রটি। আল্লাহ সব জানেন। এক্ষেত্রে যারা চালাকি বা ধূর্ততামির আশ্রয় নেবে তারা প্রকৃতপক্ষে

বিশ্বাসী নয়। সংগৃহীত দানের আর্থিক ব্যাবস্থাপনায় তেমন মানুষেরা থাকার অযোগ্য হিসেবে বিবেচিত হবে। আজকাল দানের অর্থ নিয়ে সমাজে নানান ধরনের প্রতারণা হয়ে থাকে কথাগুলি সে প্রেক্ষিতে বলা হয়েছে।

যারা প্রতারণা করে তাদের অন্তর রোগগ্রস্ত, অসৎ। এদের কর্মকান্ড সমাজে অসততার বিস্তার ঘটায়। 'আল্লাহ সব জানেন' তারা এ কথায় সত্যিকার অর্থে বিশ্বাসী নয়। তারা আল্লাহকে চায় না। তারা নিয়ম-নৈতিকতা বহির্ভূতভাবে হলেও যেনতেন প্রকারে জগতেই অধিক লাভবান হতে চায়।

উল্লেখ্য যে, দানকে একটি তাৎক্ষণিক ও সাময়িক ব্যাবস্থা হিসেবে দেখা উচিত। এটি বলা হচ্ছে ব্যাক্তিক পর্যায়ে ছোট-খাট বা ভিক্ষা পর্যায়ের দানকে বিবেচনা করে। অর্থাৎ এটি কোন চিরস্থায়ী ব্যাবস্থা হতে পারে না বা হওয়া উচিতও নয়। যাকাত, দান, কর্মের সংস্থান, ব্যবসা-বাণিজ্য, উন্নয়ন কর্মকান্ডের প্রসার নানান অর্থনৈতিক কর্মকান্ড সমাজ থেকে অভাব দুরীকরণের ব্যাবস্থাস্বরূপ। সমাজে একদিন অভাবগ্রস্ত মানুষ থাকবে না তেমন স্বপ্নই মানুষ দেখে। ইসলাম তেমন সমাজই বাস্তবে রূপদান করার পদক্ষেপ গ্রহণ করে।

দান করে পরকালে অধিক পুরস্কার লাভ হবে এটি মূল ধারণা নয়। তাহলে মানুষ কেবল সওয়াব অর্জনের জন্য বলপূর্বক কিছু মানুষকে দান করার জন্য অভাবগ্রস্ত বানিয়ে রাখবে। এটি দর্শন নয় বা হতে পারে না বা হওয়া উচিতও নয়।

পৃথিবীর তাবৎ মানুষকে অভাবমুক্ত করে নিয়ে আসার পূর্ব পর্যন্ত যারা সামর্থবান থাকবে এ ব্যাবস্থা ততদিন তাদের ওপর বলবৎ থাকতে পারে। বিষয়টিকে এভাবে দেখা যেতে পারে। কিন্তু মূল লক্ষ্য থাকবে পৃথিবী থেকে মানুষের অভাব এমনভাবে দুর করা যেন কাউকেই অন্যের দান গ্রহণ করতে না হয়, বৃহৎ ও সম্মিলিত কাজগুলি ব্যাতিত। তবে সেসবের জন্যও পৃথক প্রাতিষ্ঠানিক ব্যাবস্থা গড়ে তোলা সম্ভব হলে সেক্ষেত্রেও দানের দিকে চেয়ে থাকতে হবে না।

আল্লাহ সকলের জন্য বরাদ্দ রেখেছেন। আল্লাহ অফুরন্ত জীবনোপকরণ সরবরাহ করা সত্বেও মানবীয় অব্যাবস্থাপনার কারণে কিছু মানুষ তাদের প্রাপ্য থেকে বঞ্চিত হয়। এমন ব্যাবস্থা গড়ে তুলতে হবে যেন সকলেই তার ন্যূনতম চাহিদা পুরণ করতে পারে এবং কাউকেই অন্যের দান গ্রহণ করতে না হয়।

কোন একটি নতুন ধারণা প্রতিষ্ঠায় যেখানে বিরোধী পক্ষও থাকে সেখানে নব্য ধারণায় বিশ্বাসীদের তা প্রতিষ্ঠায় সম্মিলিত প্রচেষ্টার প্রয়োজন হয়। তেমন ক্ষেত্রে সামজের বৃহত্তর স্বার্থে সামর্থবানদেরকে দান করতেই হয়।

▪ **২.২৭৩.২** তোমরা যে ভাল কাজেই অর্থ ব্যায় করবে আল্লাহ তা জানেন (Whatsoever good thing ye spend, lo! Allah knoweth it) : মানুষ নিজে যা জানে আল্লাহ তার সবই জানেন [আল্লাহ দ্রষ্টব্য ২.২০.২]। বলা হচ্ছে, “তোমরা যা শোন ও দেখ প্রকৃতপক্ষে কে তা শোনে ও দেখে?” (আল কোরআন ১০:৩১)

এ বাণীর মাধ্যমে মানুষকে তথা বিশ্বাসীকে ভাল কাজে অর্থ ব্যায় বা দান করতে উৎসাহ দেয়া হয়েছে। দান করা একটি ভাল কাজ। বিশ্বাসীর কাছে ভাল কাজ সম্পর্কে আল্লাহর অবহিত থাকার বিষয়টি অনেক মূল্য বহন করে। বিশ্বাসী যখন জানে বা বিশ্বাস করে যে আল্লাহ তার সকল কাজ সম্পর্কে অবহিত সে তখন ভাল কাজ করতে উদ্বুদ্ধ হয়, উৎসাহ পায়। আল্লাহই বিশ্বাসীর ভাল কাজের সবচেয়ে বড় প্রেরণা।

▪ **২.২৭৪.১** যারা স্বীয় ধন-সম্পদ ব্যায় করে রাতে ও দিনে, গোপনে ও প্রকাশ্যে তাদের জন্য পুরস্কার রয়েছে তাদের পালনকর্তার কাছে : মানুষ যে ভাল কাজেই অর্থ ব্যায় করুক না কেন আল্লাহ তা জানেন। যারা ভাল কাজ করবে পরকালে তাদের জন্য পুরস্কার আছে। এ বাণীর মাধ্যমে ভাল কাজে তথা যথাসাধ্য অধিক পরিমাণে দান করতে মানুষকে বা সামর্থবানদেরকে উৎসাহিত করা হয়েছে।

এসব দিক-নির্দেশনা যখন দেয়া হয়েছে অর্থনীতি বা অর্থনৈতিক ভাবনা, রাজনীতি বা রাজনৈতিক ভাবনা সে সময়ে আজকের মতো ছিল না। রাষ্ট্রিয় ব্যাবস্থা ও কাঠামো এবং এ বিষয়ে ধ্যান-ধারণা আজকের মতো ছিল না এবং তা ব্যাপকভাবে প্রসার লাভ করে নাই। মানুষের অধিকার বিষয়ে মানুষ আজকের মতো সোচ্চার ছিল না। অধিকারের বিষয়ে সাংগঠনিক তৎপরতা বর্তমান সময়ের মতো জোরদার ছিল না। সমাজে ভারসাম্য আনয়ন ও বৈষম্য হ্রাসে দানকে একটি ব্যাবস্থা হিসেবে উৎসাহিত করা হয়েছে। তবে লক্ষ্য একটিই। সেটি হচ্ছে সমাজে ভারসাম্য প্রতিষ্ঠা ও বৈষম্য হ্রাস করা।

কোরআনের মূল দিক-নির্দেশনা সেটি। দান মূল নির্দেশনা নয়। তবে আধুনিক ব্যাবস্থা প্রতিষ্ঠা পায়নি বিধায় দানকে উৎসাহিত করা হয়েছে সময় উপযোগী ব্যাবস্থা হিসেবে। বিষয়গুলিকে যথাযথ জ্ঞানে এভাবে অনুধাবন করতে হবে।

আজও দান করার প্রয়োজন থাকলে দান করাকে উৎসাহিত করতে হবে। তবে এমন ব্যাবস্থা গড়ে তুলতে হবে যেন কাউকেই অন্যের দান গ্রহণ করতে না হয়। অন্তত ব্যাক্তিক পর্যায়ে। সেটিই স্বপ্ন। মানুষ তেমন স্বপ্নই দেখে এবং কোরআনও মানবজাতিকে তেমন স্বপ্নই দেখিয়েছে। আল্লাহ সকলের জন্যই ব্যাবস্থা রেখেছেন। মানুষের প্রাপ্য তার কাছে পৌঁছে দিতে হবে বা পৌঁছে যেতে হবে।

যতদিন তেমন ব্যাবস্থা মানুষ গড়ে তুলতে না পারছে ততদিন দান করাকে উৎসাহিত করতে হবে। এটি দুঃস্থদের তাৎক্ষণিক সমস্যার সমাধান করে, সমাজে মানবিকতা গড়ে তোলে, বৈষম্য হ্রাসে ধীরে হলেও কিছুটা অবদান রাখে, সমাজকে শান্ত রাখতে ভূমিকা রাখে, চুরি-ডাকাতি-রাহাজানি ইত্যাদির সম্ভাবনাকে কিছুটা হলেও অবদমিত রাখে। আর এসব ভাল কাজে যারাই এগিয়ে আসবে তারা আল্লাহর সুদৃষ্টিতে থাকবে। ইহজগতেও তারা মানুষের সুদৃষ্টিতে ও মর্যাদাবান থাকে। এক অর্থে ইহজগতেও তারা পুরস্কৃত হয় তাদের ভাল কাজে অংশগ্রহন ও অবদান রাখার জন্য। যা আল্লাহ প্রতিষ্ঠিত কার্যকারণ সূত্রের কারণে ঘটে।

মানুষকেই মানুষের পাশে দাড়াতে হবে। আর এভাবেই আল্লাহ তার জগতকে যথাযথভাবে পরিচালনা করেন। মানুষের জন্য এগুলি পরীক্ষা ও সুযোগ। যারা আল্লাহর কাজে এগিয়ে আসবে আল্লাহও তাদেরকে পুরস্কৃত করবেন। পরকালে তাদের জন্য আল্লাহর পুরস্কারের প্রতিশ্রুতি রয়েছে। এমনই আল্লাহর দিক-নির্দেশনা। আল্লাহর সকল নির্দেশনাই মানুষের জন্য প্রেরণাদায়ক, মানুষের নিজেদের মঙ্গলের জন্য এবং সৃষ্টিকে ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করার জন্য। কেননা মানুষের অবিবেচনাপ্রসূত কর্ম ও আচরণও সৃষ্টি ধ্বংসের একটি বড় কারণ হতে পারে।

■ **২.২৭৪.২** তাদের অন্তরে না কোন ভীতির সঞ্চার হবে, না তারা নিপতিত হবে কোনরূপ মনকষ্টে (There shall no fear come upon them neither shall they grieve) : (দ্রষ্টব্য ২.২৬২.২)।

➢ (আয়াত ২৭৫-২৮১) এ অংশে অর্থ ঋণ (Moneylending), সূদ (Usury or Interest) এবং ঋণগ্রস্থ ব্যাক্তি (Debtor) সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। এ ছাড়াও সূদের (Usury) বিষয়ে আলোচনা রয়েছে সূরা আল-ইমরান এর ১৩০-১৩২, সূরা নিসার ১৬১ এবং সূরা রোম এর ৩৯ নং আয়াতে।

২৭৫	যারা সুদ গ্রহণ করে (বিচার দিবসে) তারা এমনিভাবে দন্ডায়মান হবে যেন শয়তান তাদেরকে স্পর্শ দ্বারা মোহাবিষ্ট করে রেখেছে। এ অবস্থার কারণ এই যে, তারা বলে: ক্রয়-বিক্রয়ও তো সুদ নেয়ারই মতো; অথচ আল্লাহ ক্রয়-বিক্রয়কে বৈধ করেছেন এবং সুদকে নিষিদ্ধ করেছেন। অতঃপর যার কাছে তার পালনকর্তার পক্ষ থেকে এ সতর্কবার্তা পৌঁছেছে এবং বিরত হয়েছে, পূর্বে যা হয়ে গেছে তা তার নিজের, সে বিষয় আল্লাহর ওপর নির্ভরশীল; যারা পুনরায় সুদ নেয়ায় লিপ্ত হয় তারাই আগুনে পতিত হবার প্রকৃত অধিকারী। তারা সেখানে বসবাস করবে। (Those who swallow usury cannot rise up save as he ariseth whom the devil hath prostrated by (his) touch. That is because they say: Trade is just like usury; whereas Allah permitteth trading and forbiddeth usury. He unto whom an admonition from his Lord cometh, and (he) refraineth (in obedience thereto), he shall keep (the profits of) that which is past, and his affair (henceforth) is with Allah. As for him who returneth (to usury) - Such are rightful owners of the Fire. They will abide therein.)
২৭৬	আল্লাহ সুদকে নিশ্চিহ্ন করেছেন এবং দানকে ফলপ্রসূ করেছেন। আল্লাহ অসৎ ও দোষী ব্যাক্তিদের পছন্দ করেন না। (Allah hath blighted usury and made almsgiving fruitful. Allah loveth not the

	impious and guilty.)
২৭৭	যারা বিশ্বাস স্থাপন করে ও ভাল কাজ করে এবং উপাসনাকে প্রতিষ্ঠা করে ও দরীদ্রদেরকে তাদের প্রাপ্য অংশ (যাকাত) প্রদান করে তাদের পুরষ্কার রয়েছে তাদের পালনকর্তার কাছে। তাদের অন্তরে না কোন ভীতির সঞ্চার হবে, না তারা নিপতিত হবে কোনরূপ মনকষ্টে। (Lo! those who believe and do good works and establish worship and pay the poor-due, their reward is with their Lord and there shall no fear come upon them neither shall they grieve.)
২৭৮	হে বিশ্বাসীগন! তোমরা আল্লাহর প্রতি দায়িত্ব পালন কর এবং সূদের যে সমস্ত বকেয়া আছে তা পরিত্যাগ কর যদি তোমরা (সত্যিকার) বিশ্বাসী হও। (O ye who believe! Observe your duty to Allah, and give up what remaineth (due to you) from usury, if ye are (in truth) believers.)
২৭৯	যদি তোমরা তা পরিত্যাগ না কর, তবে আল্লাহ এবং তাঁর বার্তাবাহকের পক্ষ থেকে তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের জন্য সতর্ক করা হচ্ছে। কিন্তু যদি তোমরা ক্ষমা প্রার্থনা কর তবে তোমাদের মূলধন তোমাদেরই (সূদ ব্যাতিত)। অত্যাচার কর না, তাহলে অত্যাচারীতও হবে না। (And if ye do not, then be warned of war (against you) from Allah and His messenger. And if ye repent, then ye have your principal (without interest). Wrong not, and ye shall not be wronged.)
২৮০	ঋণগ্রস্থ ব্যাক্তি যদি অভাবগ্রস্থ হয় তবে তাকে সচ্ছলতা আসা পর্যন্ত সময় দেয়া উচিত। আর যদি তোমরা ঋণ ক্ষমা করে দাও দান হিসেবে তবে তা খুবই উত্তম যদি তোমরা উপলব্ধি কর। (And if the debtor is in straitened circumstances, then (let there be) postponement to (the time of) ease; and that ye remit the debt as almsgiving would be better for you if ye

	did not know.)
২৮১	এমন একদিনের বিপরীতে নিজেদেরকে রক্ষা কর যেদিন তোমরা আল্লাহর কাছে প্রত্যাবর্তিত হবে। অতঃপর প্রত্যেককেই পরিপূর্ণভাবে প্রদান করা হবে যা সে অর্জন করেছে এবং তাদের প্রতি কোনরূপ অবিচার করা হবে না। (And guard yourselves against a day in which ye will be brought back to Allah. Then every soul will be paid in full that which it hath earned, and they will not be wronged.)

- **সুদ বা রিবা (Usury, Interest)**

ওপরের আয়াতগুলি সূদ বা রিবা সম্পর্কিত। তাই এ বিষয়ে প্রথমেই একটু ধারণা নিয়ে নেয়া দরকার। উল্লেখ্য যে, সূদের নিষিদ্ধতা সম্পর্কিত আয়াত কোরআনের শেষ পর্যায়ে অবতীর্ণ হয়েছে।

'রিবা' শব্দের অর্থ হচ্ছে 'অতিরিক্ত'। যে ঋণে মেয়াদের হিসেবে অতিরিক্ত অর্থ আদায় করা হয় তাই হচ্ছে 'রিবা'। এর বিপরীতে কোন সম্পদ নেই কিন্তু সময় আছে।

জাহেলিয়াত যুগে আরব দেশে রিবার ব্যাপক প্রচলন ছিল। রিবা শব্দটি আরবী ভাষায় বহুল ব্যবহৃত একটি শব্দ। মূসা (আঃ) এর সময়েও এটি সুবিদিত ছিল এবং তাওরাতেও সূদ বা রিবাকে নিষিদ্ধ করা হযেছিল।

- **রিবার প্রকারভেদ**

জাহেলিয়াত যুগে বিভিন্ন প্রকারের রিবার প্রচলন ছিল। অর্থাৎ বিভিন্নভাবে সূদের অর্থ আদায় করা হত। যেমন,

- বাকিতে দ্রব্য ক্রয় করে নির্ধারিত সময়ে অর্থ ফেরত দিতে ব্যার্থ হলে সময় বৃদ্ধি করে দেয়া হত। তবে এর জন্য অতিরিক্ত মূল্য পরিশোধ করতে হত।

- কেউ অর্থ ধার নিলে একটা নির্দিষ্ট সময় পর অতিরিক্ত অর্থসহ তা ফেরত দিতে হত।

– অর্থ ঋণে একটা নির্দিষ্ট সময়ের জন্য একটা হার নির্ধারিত থাকত। সময়মতো ফেরত দিতে না পারলে অতিরিক্ত সময়ের জন্য অতিরিক্ত হারে সূদ অর্থাৎ চক্রবৃদ্ধিহারে সূদ ধার্য্য করা হত। অতিরিক্ত ধার্যকৃত এ অর্থই হচ্ছে ‘রিবা’।

রাসূলের বর্ণনা এবং হাদিস থেকে পরবর্তীতে রিবা সম্পর্কে আরও কিছু জানা যায়। কিন্তু এসব বিষয়ে বিস্তারিত বিবরণ না থাকায় শাস্ত্রবিদদের মধ্যে মতভেদ দেখা দেয়। যেমন কিছু বস্তু অদল-বদল করতে হলে নগদে ও বস্তুতেও সমান-সমান হতে হয়। যেমন সোনা-রূপা ইত্যাদি। ফলে এসব ক্ষেত্রেও কম-বেশী বা বাকী হলে সেটিও রিবার অন্তর্ভূক্ত বলে ধরা হত।

রিবার দুইটি ধরণ আছে। একটি হচ্ছে, নগদ ক্রয়-বিক্রয়ের ক্ষেত্রে অতিরিক্ত নেয়ার রিবা এবং অপরটি হচ্ছে, বাকী বিক্রয়ের ক্ষেত্রে রিবা। তবে কেউ কেউ করেন যে, কোরআনের ক্ষেত্রে রিবা হচ্ছে সেটি যা ঋণের ওপর নেয়া হয়। জাহেলিয়াত যুগে বস্তুত এটিকেই রিবা হিসেবে ধরা হত।

বকেয়া বা ঋণের লেনদেনের ক্ষেত্রে এই রিবাকেই আরবরা রিবা হিসেবে জানত এবং কোরআন সেটিকেই নিষিদ্ধ করেছিল। বিষয়টি সবার কাছে এতটাই স্পষ্ট ছিল যে এ বিষয়ে বিতর্কের কোন অবকাশ ছিল না। প্রচলিত এ রিবা সম্পর্কে কোন সন্দেহ বা মতভেদ ছিল না।

পরবর্তীতে রিবার নিষিদ্ধকরণের ক্ষেত্রে এমন কতগুলি বিষয়কেও রিবার অন্তর্ভূক্ত করে দেয়া হয়েছিল যে, যার কারণে কোনটি রিবার অন্তর্ভূক্ত এ বিষয়টি নিয়ে সংশয়ের সৃষ্টি হয়।

কারও মতে ঋণ থেকে যে সূদ আদায় করা হয় সেটিই প্রত্যক্ষ বা প্রকৃত বা সত্যিকার সূদ। ঋণের সূদটিই বর্তমানে বেশী প্রচলিত ও আলোচিত। এখানে সে সূদের আলোচনাই প্রাধান্য পাবে। তবে সূদ বা রিবা হিসেবে যেটিকে নিষিদ্ধ করা হয়েছে সেটি প্রকৃতপক্ষে অতি উচ্চ হারে বা চক্রবৃদ্ধিহারে আদায়কৃত সূদকেই বোঝায়। যে কোন বিবেচনায় সেটি সকলের কাছেই অনৈতিক হিসেবে গণ্য। পরবর্তীতে যা পরিস্কাভাবে কোরআনে উল্লেখ করে দেয়া হয়েছে। বলা হচ্ছে,

'হে বিশ্বাসীগণ! তোমরা সুদ নিও না দ্বিগুণ, চতুর্গুন ক্রমবর্ধমান হারে। ...।' (আল-কোরআন ৩:১৩০)

কেউ কেউ অবশ্য এ বক্তব্য মানতে নারাজ। তারা সূদ মাত্রই হারাম এভাবে বিবেচনা করে। এরা আসলে কোন বিষয়ের নিষিদ্ধতার অন্তর্নিহিত কারণ বুঝতে চায় না। শাব্দিক অর্থকে প্রাধান্য দিয়ে থাকে।

সূদ একটি পার্থিব বা জাগতিক কর্মকান্ডের অন্তর্ভূক্ত বিষয়। এর সাথে আল্লাহর সম্পর্ক কি? কেন আল্লাহ এটিকে নিষিদ্ধ করতে যাবেন? বিষয়টি ভালভাবে বুঝতে হবে।

বস্তুত সূদের সঙ্গে আল্লাহর কোন সম্পর্ক নেই। এটি আল্লাহকে লাভবানও করে না, এর দ্বারা আল্লাহর কোন ক্ষতিও সাধন হয় না। এটিকে আল্লাহ নিষেধ করেছেন মানবসমাজে এর ক্ষতিকারক দিকসমুহকে বিবেচনা করে। এটি নিষেধ করা হয়েছে মানুষেরই মঙ্গলের জন্য। আল্লাহর সৃষ্টিকে ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করার জন্য।

ভূমিকম্প, আগ্নেয়গীরির অগ্নুৎপাত, সূনামী, ঘূর্ণীবায়ু, জলোচ্ছাস, টর্ণেডো ইত্যাদি প্রাকৃতিক দুর্যোগই কেবল পৃথিবী ধ্বংসের কারণ নয়। মানুষের ভূল কর্মকান্ডও পৃথিবী ধ্বংসের কারণ হতে পারে। সূদ গ্রহণকারীদের কর্মকান্ডও জগত ধ্বংসের কারণ হতে পারে। সামগ্রীক আলোচনায় এ কথার মর্ম অর্থ উঠে আসবে।

কোরআন সূদ গ্রহণকে নিরুৎসাহিত করেছে। কেবল নিরুৎসাহিত নয়, পরবর্তী আয়াতসমুহ পাঠ করলে দেখা যায় সূদের কার্যকলাপকে ভীষনভাবে নিষিদ্ধ করেছে। পাশাপাশি এর পরিবর্তে দান, যাকাত প্রদান করা ইত্যাদি ভাল কাজ করতে উৎসাহ দেয়া হয়েছে। কিন্তু কেন? বিষয়গুলি আলোচনায় উঠে আসবে।

■ **২.২৭৫.১** যারা সুদ গ্রহণ করে তারা এমনিভাবে দন্ডায়মান হবে যেন শয়তান তাদেরকে স্পর্শ দ্বারা মোহাবিষ্ট করে রেখেছে : সুদ গ্রহণের সার্বিক পরিণতি হচ্ছে আর্থ-সামাজিক, মানসিক থেকে শুরু করে নৈতিক এমনকি আধ্যাত্মিক অবক্ষয়েরও কারণ। আপাতদৃষ্টিতে ভাল মনে হলেও প্রকৃত অর্থে সূদ ফলপ্রদ হয় না। এর এমন কিছু পার্শ্ব-প্রতিক্রিয়া আছে যা পরিশেষে নিজেদের

এবং সকলের ধ্বংস ডেকে আনে। অন্যায়ভাবে অর্জনের শেষ পরিণতি ভয়াবহ রকমের খারাপ। সূদ গ্রহণকে অন্যায় বলা হচ্ছে কেন? বিষয়গুলি আলোচনায় আসবে।

আপাত দৃষ্টিতে দেখা যায় কিছু মানুষ সূদের কারবার করে বেশ ভাল আছে। কিন্তু গোটা জগত সংসারের মানুষ সূদের কারণে নিষ্পেষিত হয়। আবার যারা ভাল থাকে বলে মনে হয় তারাও আর্থ-সামাজিক ও মানসিকভাবে খুব একটা ভাল থাকে না। কিন্তু তাদের চাকচিক্য মানুষকে ভুল বুঝতে সহায়তা করে এবং তারাও এর আশ্রয় নিয়ে নিজেদেরকে কৃত্রিমভাবে ভাল প্রকাশ করার চেষ্টা করে। তবে হ্যা, কিছুদিন তারা এবং তাদের পোষ্যরা বেশ ভাল থাকে। কিন্তু কেবল পরকাল নয় এ জগতেও তাদেরকে তাদের অপকর্মের কারণে কখনও বিপদের মুখোমুখী হতে হয়। অপকর্ম বলা হল এ কারণে যে, এ ব্যবসার কারণে সূদের কারবারীদেরকে নানামুখী মন্দ কাজে জড়িয়ে যেতে হয়।

সূদের কারবারীদের মন্দ কার্যকলাপের জন্য তাদেরকে নিরাপত্তা বলয়ের মধ্যে থাকতে হয়। তাদের শঙ্কাহীন মুক্ত জীবন নেই। সর্বদা দুঃচিন্তাগ্রস্ত থাকতে হয়। নানান রোগ-শোক দ্রুত চলে আসে দুঃশ্চিন্তা থেকে। সুদুরের লক্ষ্যবিহীন জীবন দর্শনে মন্দ কাজে আনন্দ করে কিছুদিন জীবন কেঁটে যায়।

যারা লোভী, স্বার্থপর, অত্যাচারী, অপরের সম্পদ অন্যায়ভাবে ভোগকারী বস্তুত তাদেরকে উদ্দেশ্য করে আয়াতের বাণী উদ্ধৃত হয়েছে। এখানে বিশিষভাবে সূদের কারবারীদের সম্পর্কে বলা হয়েছে। কেননা তারা এসব বিশেষনে বিশেষায়িত হবার যোগ্য। সূদের কারবার মানুষকে এ পথে যেতে বাধ্য করে। সে আলোচনা আসবে।

বলা হচ্ছে, এরা পার্থিব জীবনে যেমন সমাজের মানুষের ভালমন্দ দেখার সুযোগ পায়নি, অন্ধের মতো কেবল অর্থের পেছনে বা নিজেদের স্বার্থের পেছনে ছুটেছে, তেমনি পরকালে বা বিচার দিবসেও তারা উত্থিত হবে অন্ধ বা মাতালের মতো। কেননা বলা হয়ে থাকে যে, একজন ব্যাক্তি পরকালে পুনর্জীবিত হবে ঠিক সেই প্রকারে যে অবস্থায় সে এখানে মৃত্যুবরণ করে। যেমন গীতায় বলা হয়েছে-

"মৃত্যুকালে যে কেবলমাত্র আমাকে স্মরণ করার মাধ্যমে দেহত্যাগ করে, সে ততক্ষণাৎ আমার প্রকৃতি প্রাপ্ত হয়। এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই।

দেহত্যাগ কালে একজন যে ভাবনাটিকে বা অবস্থাটিকে স্মরণ করে, নিঃসন্দেহে সে সে অবস্থা বা ভাবিত তত্ত্বকে লাভ করবে।

অতএব, .. তুমি সর্বদা আমাকে স্মরণ কর .. এবং একই সাথে তোমার স্বভাববিহিত দায়িত্ব পালন কর ..। ... তোমার মন ও বুদ্ধিমত্তা আমাতে নিবদ্ধ করলে, নিঃসন্দেহে তুমি আমাকে লাভ করবে।

হে পার্থ! ... যার অন্তর সতত আমার ভাবনায় নিমগ্ন, সঠিক পথ থেকে বিচ্যূত নয় সে নিশ্চিতভাবে আমার কাছে পৌঁছাবে।" (গীতা ৮:৫-৮)

অতএব যে বা যারা অর্থ-সম্পদের চিন্তায় পাগল বা মাতাল তারা পরকালেও সেই মাতাল অবস্থায়ই পুনর্জীবিত হবে। হিতাহিত জ্ঞানশূন্য অবস্থায় উত্থিত হবে।

বস্তুত সূদের কারবারকে মন্দরূপে চিহ্নিত করা হয়েছে এবং এসব বক্তব্যের মধ্য দিয়ে মানুষকে এ ধরণের মন্দ কাজ থেকে বিরত থাকতে সতর্ক করা হয়েছে।

নিয়মের কঠোর প্রয়োগ ছাড়া কে নিয়ম পালন করবে? আবার কে সে জন যে কঠোর হস্তে নিয়মের বাস্তবায়ন করবে? কেন করবে? কিসের স্বার্থে করবে? আবার কোন উজ্জীবিত মানুষ যদি তেমন কোন পদক্ষেপ গ্রহণও করে, তবে তেমন উজ্জীবিত বোধসম্পন্ন কতজন মানুষ পাওয়া যাবে? কতদিনের জন্য তারা তেমনিভাবে উজ্জীবিত থাকবে? একদিন তারাও গড্ডালিকায় গা ভাসাতে পারে। আইন এবং আইনের কঠোর প্রয়োগ দিয়েও ভাল কোন কিছুকেও চিরদিনের জন্য বলবৎ রাখা যায় না।

এ কারণে বিশ্বাস খুব গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয়। বিশ্বাসের কারণে মানুষ আপনা থেকে নিয়ম-বিধি মেনে চলতে উদ্বুদ্ধ হয়। সূরা বাকারার শুরুতে বিশ্বাসীকে যেসব শর্তে বিশ্বাস করতে বলা হয়েছে সেসবে বিশ্বাস করা তাই অত্যান্ত গুরুত্বপূর্ণ। বিশ্বাসকে ভেতরে গাঁথতে হবে। অন্যথায় কেবল সূদের ক্ষেত্রেই নয় কোন নিয়মই ভালভাবে পরিপালিত হবে না। সব ভঙ্গুর হয়ে যাবে।

বিশ্বাস দু'ভাবে কাজ করে। আল্লাহর ভয়ে, অর্থাৎ শাস্তির ভয়ে এবং পুরস্কারের প্রত্যাশায় বা লোভে। পৃথিবীতেও আমরা নোবেল প্রাপ্তির জন্য ভাল কাজ করি। মানুষ সব সময়ের জন্য লোভী প্রাণী। তাকে দিয়ে তাই বুদ্ধিসম্মতভাবে কাজ আদায় করে নিতে হয়। কিন্তু জ্ঞানসম্পন্ন মানুষ জ্ঞানের কারণে ভাল-মন্দ পরিণতি বুঝে ভাল কাজ করে। উন্নত মানসিকতার কারণে করে। কিন্তু তেমন মানুষ সমাজে ক'জন? তাই বিশ্বাসও প্রয়োজন। যার সাথে পুরস্কারের প্রত্যাশা ও শাস্তির ভয় সম্পর্কিত।

উন্নত মানসিকতায় সকল মানুষকে নিয়ে আসার জন্য মহান আল্লাহ দিক-নির্দেশনা দিয়েছেন। নানান নির্দেশনা পরিপালনের মধ্য দিয়ে ভাল বিষয়গুলিকে অভ্যস্ততায় নিয়ে এসে পশ্চাৎপদ মানুষকে তিনি সঠিক পথে চলতে পথ দেখান। আদিম মানুষ থেকে শুরু করে বর্তমান সময়ের মানুষ পর্যন্ত সকল সমাজে তাই আল্লাহ সঠিক দিক-নির্দেশনা দিয়েছেন।

'বিচার দিবসে সূদখোরেরা এমনিভাবে আল্লাহর সামনে দন্ডায়মান হবে যেন শয়তান তাদেরকে স্পর্শ দ্বারা মোহাবিষ্ট করে রেখেছে'– মূলতঃ এ বাণীর মাধ্যমে মানুষকে সূদ থেকে উপার্জন করতে নিরুৎসাহিত করা হয়েছে। বিচার দিবসে যার বিশ্বাস আছে সে এ কাজ থেকে বিরত থাকবে। যার বিশ্বাস নেই তার ভেতরেও একটি ভাবনার সৃষ্টি করবে। বস্তুত সূদ গ্রহণ ও সূদের কারবারকে এসব বার্তার মাধ্যমে নিরুৎসাহিত করা হয়েছে। এসব বাণীর এটিই মূল বিষয়।

▪ **২.২৭৫.২** এ অবস্থার কারণ এই যে, তারা বলে: ক্রয়-বিক্রয়ও তো সুদ নেয়ারই মতো; অথচ আল্লাহ ক্রয়-বিক্রয়কে বৈধ করেছেন এবং সুদকে নিষিদ্ধ করেছেন : 'বিচার দিবসে সূদ-খোর এমনিভাবে আল্লাহর সামনে দন্ডায়মান হবে যেন শয়তান তাদেরকে স্পর্শ দ্বারা মোহাবিষ্ট করে রেখেছে'– বলা হচ্ছে তাদের এ পরিণতির কারণ এই যে, আল্লাহ সূদ নিষিদ্ধ করা সত্বেও তারা বলে সূদের মাধ্যমে যেমন অতিরিক্ত অর্থ আসে, ক্রয়-বিক্রয়ের মাধ্যমেও তো তেমনই অতিরিক্ত অর্থ আসে। দু'টো কাজেরই শেষ ফলাফল তো একই। দু'টোরই উদ্দেশ্য এক। দু'টো ক্রিয়ার মাধ্যমেই অতিরিক্ত অর্থ নিয়ে আসা হয়। পার্থক্য কেবল নামের কিংবা বায়ু নিঃসৃত শব্দের! ফলে একটি বৈধ হলে

অপরটিও বৈধ হতে হবে। কিংবা একটি অবৈধ হলে অপরটিও অবৈধ হওয়া উচিত। একটি বৈধ হলে অপরটি কেন অবৈধ হবে? যারা সূদের কারবার করে এমনই হল তাদের যুক্তি।

উল্লেখ্য যে, এ জগতে সবকিছুরই উপকারীতা ও অপকারীতা আছে। তবে কম আর বেশী। যার অপকারীতা তুলনামূলকভাবে বেশী সাধারনত সেগুলিই নিষিদ্ধ হওয়ার যোগ্য। সূদ বা রিবার ক্ষেত্রেও বিষয়টি সেরকম। অপকারীতা বেশী।

কিছু আছে যেগুলির মন্দ ফলাফল আপাত দৃষ্টিতে বা তাৎক্ষণিকভাবে বোঝা যায় না। উপরন্তু ভাল বোধ হয়। কিন্তু দীর্ঘমেয়াদে সেটির মন্দ ফলাফল বোঝা যায় বা পাওয়া যায়। যেমনটি মদ ও জুয়ার ক্ষেত্রে হয়। এসবের অর্থনৈতিক বা আরও কিছু লাভ বা ভাল লাগা আছে। তবে অর্থনৈতিক থেকে শুরু করে সামাজিক, নৈতিক এমনকি আত্মিক ক্ষতিও আছে। যা ব্যাক্তিক থেকে শুরু হয়ে পারিবারিক-সামাজিক গন্ডি পেরিয়ে বৈশ্বিক পর্যায়ে চলে যায়। অতঃপর প্রজন্মকে ধ্বংসের দিকে টেনে নিয়ে যায়।

বিষয়গুলির প্রতি মানুষকে অবশ্যই সচেতন হতে হবে। ব্যাক্তিগত লাভ-লোকসান থাকতেই পারে। কিন্তু এক্ষেত্রে বিবেচ্য হচ্ছে গোটা জগতের জন্য দীর্ঘমেয়াদে কোনটি লাভজনক বা উপকারী সে বিষয়টি। সূদ ক্ষতিকর। বিষয়গুলি আলোচনায় আসবে।

'আল্লাহ ক্রয়-বিক্রয়কে বৈধ করেছেন এবং সুদকে নিষিদ্ধ করেছেন।' ক্রয়-বিক্রয় থেকে মানুষ অতিরিক্ত অর্থ নিয়ে থাকে। এই অতিরিক্ত অর্থ হচ্ছে, 'মুনাফা'। মুনাফা বৈধ। একইভাবে ঋণ দিয়ে মানুষ অতিরিক্ত অর্থ নিয়ে থাকে। যার নাম 'সূদ'। সূদ নিষিদ্ধ। মুনাফা বৈধ, কিন্তু সূদ বৈধ নয় কেন? দুটির কাজ ও ফলাফল তো একই। অতিরিক্ত অর্থ আদায় করা। অতএব মুনাফা ও সূদ বিষয়ে কিছু আলোচনা তুলে ধরা বাঞ্ছনীয় বলে মনে করি। নিচে বিষয়গুলি তুলে ধরা হল।

- পণ্য উৎপাদনে উৎপাদন খরচ আছে, শ্রম ব্যায় আছে, মেধার একটি মূল্য আছে, ব্যবসায়ে ঝুঁকির বিবেচনা আছে। মুনাফার ক্ষেত্রে সাধারণত ওপরোক্ত সব বিষয়গুলিকে বিবেচনায় নিয়ে পণ্যের একটি মূল্য নির্ধারণ করা হয়। সে

মূল্য থেকে সব খরচ বহন করার পর মুনাফা আসে। উপরন্তু ব্যবসায়ে সুনির্দিষ্ট মুনাফা অর্জনের কোন নিশ্চয়তাও থাকে না।

অপরদিকে ঋণদাতা কোন প্রকার শ্রম দেয়া বা ঝুঁকি গ্রহণ ছাড়াই ঋণগ্রহীতার নিকট থেকে নিশ্চিন্ত মনে নির্ধারিত হারে সূদ আদায় করে নেয়। অথচ সব কিছুর মূল যে উদ্যোক্তা বা উৎপাদক তার লাভ-লোকসান, জীবন ও সম্পদের নিরাপত্তা ইত্যাদি বিষয়ে ঋণদাতার কোন প্রকার সাহায্য-সহযোগীতার মনোভাব বা চিন্তা-ভাবনা থাকে না। উপরন্তু সময়মতো ঋণ পরিশোধ করতে না পরলে চক্র বৃদ্ধিহারে সূদ আদায় করা হয়। এগুলি অনৈতিক ও অত্যাচারের পর্যায়ে পরে। এ ব্যাবসায় মানবিকতা নেই। উপরন্তু মানবিকতা ভূলুন্ঠিত হয়।

বিশ বছর কিংবা একশ বছরেও বৈশ্বিক বাণিজ্যিক অবস্থার কি পরিবর্তন কিংবা উত্থান-পতন ঘটবে কেউ জানে না। অথচ সূদের কারবারী উদ্যোক্তার সকল প্রকার বিপদ-আপদ ও দুর্যোগ সত্বেও নির্দিষ্ট হারে তার পাওনা সূদ আদায় করে নেয়। ক্ষতির কোন অংশ বহন করে না।

- একজন উদ্যোক্তা বা উৎপাদককে শুরুতেই সকল ব্যায় বহন করতে হয়। তাকে উৎপাদন করতে হয়, বাজারজাত করে মুনাফা করতে হয়, পরিশেষে ঋণদাতাকে সূদসহ অর্থ ফেরত দিতে হয়। ঋণগ্রহীতা বা উৎপাদককে আসল ও সূদ দু'টিই আয় করতে হয়। তার ঝুঁকিও বহুগুণ। অপরদিকে ঋণদাতা কোনরূপ ঝুঁকি গ্রহণ ও পরিশ্রম ছাড়াই তার অংশ নিয়ে নেয়।

- মুনাফার ক্ষেত্রে ক্রেতা-বিক্রেতার দর কষাকষির মধ্য দিয়ে পণ্যের একটি মূল্য নির্ধারণ হয়। এখানে ক্রেতা ও বিক্রেতা উভয়ের অবস্থা ও অবস্থান সমপর্যায়ের থাকে।

অপরদিকে সূদের ক্ষেত্রে আর্থিক সামর্থের দুর্বলতার কারণে ঋণগ্রহীতার অবস্থা দুর্বল থাকে। দর কষাকষি করা ঋণগ্রহীতার পক্ষে সম্ভব হয় না। ঋণদাতা তার ইচ্ছে মতো সূদ নির্ধারণ করে। এর সবকিছুই অনৈতিক এবং অত্যাচারের পর্যায়ে পরে।

- মুনাফার ক্ষেত্রে পণ্যের মূল্য একবারই নির্ধারণ করা হয়। কিন্তু সূদের ক্ষেত্রে সময়ের সাথে সাথে বারবার অতিরিক্ত সূদ ধার্য করা হয়।

- মুনাফার ক্ষেত্রে একটা সীমা নির্ধারিত থাকে। কিন্তু সূদের ক্ষেত্রে সেটি নেই।
- ক্রয়-বিক্রয়ের ক্ষেত্রে দ্রব্য ও অর্থের হাতবদল হলে ক্রিয়াটি সমাপ্ত হয়। কিন্তু সূদের ক্ষেত্রে ঋণদাতাদের অপকৌশলের কারণে তাদের ক্রিয়া কখনই সম্পন্ন হয় না। এমনভাবে সূদ ধার্য্য করা হয় যে গ্রহীতা ব্যবসায়ের উপার্জিত সব অর্থ সূদ হিসেবে ফেরত দেয়ার পরেও আসল বাকী থেকে যায়। ঋণদাতা নানান অপকৌশল অবলম্বন করে। ঋণগ্রহীতা একবার ঋণ গ্রহণ করলে চিরকাল ঋণের জালে আটকা পড়ে যায় এবং ঋণদাতা চিরকাল তাকে একইভাবে শোষন করে যেতে থাকে।

কখনও দেখা যায় যে, সূদ পরিশোধে বাধ্য করার জন্য ঘরের আসবাবপত্র পর্যন্ত ছিনিয়ে নেয়া হয়। নির্দয়-নিষ্ঠুর আচরণ করা হয়। সম্পর্ককে তুচ্ছ জ্ঞান করা হয়। সমাজে এসব অপকর্মই একসময় যথাযথ কর্মরূপে প্রতিষ্ঠা পায়। বাস্তবে এমন হয় এবং হচ্ছে। এগুলি অনাচার ও অনৈতিক কাজ। মানবিকতা, সম্পর্ক এ ধরণের ব্যবসার কারণে লোপ পেতে বসেছে। অর্থমূল্যেই সবকিছুকে পরিমাপ করা হচ্ছে।

সূদের কারবারের সাথে অত্যাচারের নানান কৌশল যুক্ত থাকে। আবার নানান অপকৌশলও অবলম্বন করা হয়। ঋণদাতা স্বার্থপরের মতো কেবল তার নিজের প্রাপ্তিটাই নিশ্চিত করে। অথচ ব্যাবসায়ে ঋণ গ্রহীতার লাভের কোন নিশ্চয়তাই নেই। ব্যবসায়ে লোকসানও হতে পারে। কিন্তু ঋণদাতা লোকসানের ভার বহন করে না। লোকসান সত্বেও গ্রহীতাকে সম্পূর্ণ ঋণ পরিশোধ করতে হয় সূদসহ।

এসব অনৈতিক ও অনাচারের কারণে সূদের কারবারকে নিষিদ্ধ করা হযেছে। মানুষের অর্থনৈতিক দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে এ ব্যাবসার মাধ্যমে তাদের ওপর একপ্রকার অত্যাচার করা হয়। ঋণ গ্রহীতার অবস্থা এবং সার্বিক পরিস্থিতি কোনকিছুকেই সেক্ষেত্রে বিবেচনা করা হয় না।

জগতসংসার দাড়িয়ে আছে সম্পর্কের ওপর [দ্রষ্টব্য ২.২৭]। কিন্তু সূদের কারবারের চরিত্র মানুষের সাথে মানুষের সম্পর্কগুলিকে ধ্বংস করে দেয়। সমাজ ব্যাবস্থায় বিশৃংখল অবস্থার সৃষ্টি হয়। কলুষতা প্রবেশ করে। স্বাভাবিক, সামাজিক এমনকি রক্তের সম্পর্ক পর্যন্ত ধ্বংস করে দিয়ে অর্থের বিবেচনায়

কর্তৃত্বের সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা করে। কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করতে গিয়ে কারবারিরা নিজেদের কিছু বাহিনীও গড়ে তোলে।

ওপরের আলোচনা থেকে সহজেই অনুমেয় যে সূদের ব্যাবসা সমাজের মানুষের পারস্পরিক সম্পর্কের মধ্যে স্বার্থপরতা, নির্দয়তা-নিষ্ঠুরতা, বিশৃংখলা ইত্যাদি অনুপ্রবেশে সহায়ক হয়ে কাজ করে। সমাজে ভাতৃত্ববোধ, সহযোগীতা, সহমর্মীতার মনোভাবকে ধ্বংস করে দেয়।

বৈশ্বিক পরিসর বিবেচনায় সূদের কারবার যুদ্ধের দামামা বাজিয়ে তুলতেও অনুঘটক হয়ে কাজ করে। যা ঘুরে-ফিরে আবার অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও অগ্রগতিকে নিজেই ধ্বংস করে। তারপর সেই ধ্বংস যজ্ঞের ওপর আবার নতুনভাবে উন্নয়নের খেলা খেলে। আবার ঋণ দান করে। সূদ আদায় করে। এভাবে ঋণের দুষ্টচক্র কাজ করে।

উদ্ধৃত সমস্ত মন্দ কাজগুলি ঘটে এ ব্যাবসার অন্তর্নিহিত চারিত্রিক বৈশিষ্টের কারণে। মানবিকতা ও সভ্যতা, সমাজ ও সংসারের বন্ধনকে এ কারবার ধ্বংস করে দেয়। কেবল একটি ক্ষুদ্র গোষ্ঠী এসব অনৈতিক কাজের মাধ্যমে লাভবান হয়। তারা রাজকীয় জীবন-যাপন করে।

এসবের সুদুরপ্রসারী ফলাফল ভয়াবহ। এ কারবারের এমন বৈশিষ্ট ও এর সুদুরপ্রসারী মন্দ ফলাফলসমুহকে বিবেচনা করেই একে নিষদ্ধ করা হয়েছে। এমনকি মুসা (আঃ) এর সময়েও এটিকে নিষিদ্ধ করা হয়েছিল। কিন্তু ইহুদিরা সে নির্দেশনা মতো চলেনি। বাস্তবে যারা এ ব্যাবসার অত্যাচারের প্রকৃত রুপটি দেখেনি তাদের পক্ষে বিষয়গুলি অনুধাবন করা কঠিন।

সূদের কারবারীরা মনে করে ক্রয়-বিক্রয়ও সুদ নেয়ারই মতো। অথচ দু'টি তুলনাযোগ্য নয়। হাতে টাকা থাকলে উৎপাদন বা সেবামুখী কোন ব্যবসা বা কাজ করে মুনাফা করতে হয়। কিন্তু হাতে টাকা থাকলে উৎপাদন বা সেবামুখী কোন শ্রম ব্যায় না করেও বসে বসে সূদ পাওয়া সম্ভব। ফলে মুনাফার সাথে সূদ তুলনাযোগ্য নয়।

ওপরে মুনাফা ও সূদের ভাল-মন্দ বিষয়গুলির তুলনামূলক একটি আলোচনা সংক্ষেপে তুলে ধরা হয়েছে। তবে সমাজ ও জগত-সংসারকে মন্দভাবে প্রভাবিত

করে সূদের তেমন আরও কিছু দিক তুলে ধরা বাঞ্ছনীয় বলে মনে করি। নিচে বিষয়গুলি আলোচনা করা হল।

- যারা ব্যবসায়ে সূদে অর্থ লগ্নি করে তারা সরাসরি কাজে জড়িত থাকে না। ফলে কর্মের ক্ষেত্রগুলিতে তারা অপাক্তেয় হয়ে যায় এবং তাদের নিজেদের ভেতরেও সে অনুভব আসে। কর্মক্ষেত্রে নির্দেশনা প্রদানে তাদের কোন অধিকার প্রতিষ্ঠা পায় না। কর্মীবাহিনীও কর্মে তাদের উপস্থিতি বুঝতে পারে না। ফলে কাজে প্রদত্ত অর্থের বিপরীতে তাদের কোন অধিকার বাস্তবে পরিলক্ষিত হয় না। তারা তাদের অর্থ ফেরত পাওয়ার বিষয়ে সর্বদাই শংকিত থাকে।

আশংকার কারণ থেকে তারা নোংরা কৌশলের পথ বেছে নেয় বা অবলম্বন করতে বাধ্য হয়। বাধ্য হয় কেননা এমন মানুষও সমাজে আছে যারা সুযোগ পেলে ঋণ ফেরত না দেয়ারও চেষ্টায় থাকে। সত্যি বলতে ঋণ গ্রহীতারাও যদি ফেরেশতার মতো হত তবে ঋণ দাতারাও হয়তবা ফেরেশতা হতে পারত। কিন্তু জগতের কোথাও তেমন বিশ্বাসের নিশ্চয়তা নেই। ফলে অর্থ লগ্নিকারীকেও তাদের লগ্নিকৃত অর্থ ফেরত পাওয়ার নিশ্চয়তা বিধানের জন্য নানান কৌশল অবলম্বন করতে হয়। যার ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ায় সমাজে নানান মন্দ কাজ ও তার শাখা-প্রশাখা ধীরে ধীরে জন্ম নিতে ও বিস্তার লাভ করতে থাকে।

লগ্নিকারী গোষ্ঠী সমাজে নানান শ্রেণী সৃষ্টি করে এবং একের সঙ্গে অপরের সম্পর্ক নষ্ট করে দেয়। এতে গোটা মানব সমাজে পারস্পরিক সম্পর্কের অবনতি ঘটে। তারা অর্থের মানদণ্ডে এসব সম্পর্ক নির্ধারণ করে। এর ভয়াবহ রূপ পিতা-মাতা-পুত্র-কন্যার সম্পর্ককেও বিনষ্ট করে দিতে পারে এবং বাস্তবে অনেক ক্ষেত্রে হচ্ছেও তাই। এরা পেশী শক্তিকে লালন-পালন করে।

তাদের দ্বারা সমাজে নোংরা কর্মকাণ্ডের সৃষ্টি হওয়ার সম্ভাবনার কারণে তাদেরকে অসৎ ও দোষী বলে সম্বোধন করা হয়েছে। কেননা সমাজে অনেক ধরণের অসৎ কর্মকাণ্ড উৎপত্তির মূল হয়ে দেখা দেয় এই সূদের কারবার।

- অর্থনৈতিক দিক থেকে দুই ধরণের ঋণ আছে। যেমন ব্যবসা-বাণিজ্যের জন্য প্রদত্ত হয় বৃহৎ ঋণ। অপরদিকে আছে ভোক্তা ঋণ। শেষোক্ত ঋণ মানুষের নিত্য প্রয়োজনীয় ঘরোয়া দ্রব্য-সামগ্রী ক্রয়ের সুবিধার্থে স্বল্প আয়ের মানুষের

প্রয়োজন হয়। কিন্তু এ ঋণের বিপরীতে কোন উৎপাদন বা আয়-উপার্জন নেই।

ভোক্তা ঋণ মানুষকে ধ্বংস করে দেয়। ঋণদাতা ও ব্যাংকগুলো স্বল্প আয়ের মানুষদের এ ঋণ প্রদানের মাধ্যমে বলা যায় সুকৌশলে এক প্রকার শোষন করে। স্বল্প আয়ের মানুষের যে আয় তা দিয়ে এ ঋণ পরিশোধ করা সম্ভব হয় না। ফলে একটি ঋণ পরিশোধ করতে গিয়ে তাদেরকে আরও ঋণের দ্বারস্থ হতে হয়। ঋণ গ্রহীতা এভাবে ঋণের জালে আটকা পড়ে যেতে থাকে। দেখা যায়, আসলের কয়েকগুণ সূদ দেয়ার পরেও আসল একই থেকে যায়। শোধ হয় না। আয়-উপার্জনের সিংহভাগ ঋণদাতা নিয়ে নেয়।

মনে করা হয় ঋণ পরিশোধের প্রয়োজনে কর্মী অধিক পরিশ্রম করতে বাধ্য হবে। কিন্তু এভাবে কর্মীর কর্মস্পৃহা দিনে দিনে কমে আসে। হতাশা নেমে আসে। জীবনে কোন উন্নতির মুখ দেখতে পায় না। দুঃশ্চিন্তা, অসুস্থ্যতা তাদেরকে আরও নিঃশেষ করে দেয়।

ঋণের জালে আটকে রেখে অধিকাংশ মানুষকে এভাবে শোষন করা হয়। প্রজন্মকে এ ব্যাবস্থা ধ্বংস করে দেয়। শ্রমিকের হতাশা ও দুর্দশা জাতীয় উৎপাদনকেও ক্ষতিগ্রস্ত ও নিম্নমানের করে দেয়। শোষকেরা মোটাতাজা হয়। শ্রেণী সংগ্রামের পথ উন্মুক্ত হয়। রক্তপাতের সৃষ্টি হয়। এটি এক সময় শোষককেও ধ্বংস করে দেয়। তাদের জান-মাল, প্রতিপত্তি-সন্মান সব অর্জন ধ্বংস হয়ে যায়। জাতি ধ্বংস হয়। কিন্তু স্বল্প মেয়াদে বিষয়গুলি অনেকে বুঝতে পারেনা। দীর্ঘমেয়াদেও কেবল তারাই বোঝে যারা বোধসম্পন্ন।

- সূদের ব্যবসার আরও সমস্যা এই যে, এভাবে উপার্জনের টাকা ভাল কাজে ব্যায় হয় না। কর্ম আদেশ পাওয়ার অপকৌশল হিসেবে মদ, জুয়া ও দেহ ব্যবসাকে ব্যাবহার করা হয় এবং এসব কাজকে চরম উৎকর্ষের জায়গায় নিয়ে যওয়া হয়। ক্ষমতাশালীদেরকে এর মাধ্যমে আকর্ষন করা হয়।

এভাবে সমাজের ওপর দিকে যা ঘটে তার আদলে নিচেও তেমন অবস্থার প্রসার ঘটে। সমাজে ব্যাধির মতো ছড়িয়ে পরে অনৈতিক কাজ।

- অধিক উপার্জনের লোভ বা নেশায় এটি অধিকতর লগ্নিতে উৎসাহিত করে। ফলে মন্দ কাজগুলি উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেতে থাকে এবং সমাজে এর মন্দ প্রভাব

মহামারির মতো সর্বত্র ছড়িয়ে যায়। একটা বুদ্ধিমান শ্রেণী অর্থলোভে জ্ঞানহারা মাতালের মতো আচরণ করে। সমাজের সাধারণ মানুষও এসব আচরণ অনুসরণ করে।

- এ ব্যবসা এমন মনোবৃত্তি সৃষ্টি করে যা দুঃস্থ গরীবদেরকে সহায়তা করতে উৎসাহিত করে না। তারা সামাজিক দায়িত্ব পালনে উদ্বুদ্ধ হতে পারে না। এ ব্যবসার চরিত্রের কারণে এমনটি হয়। তারা সব কিছুতে লাভ খোঁজে। যেখানে লাভ নেই সেখানে তারা নেই। মানবিকতা, বৃহৎ পরিসরে দুঃস্থদের জন্য দায়িত্ব পালন এসব তাদের মধ্যে সত্যিকার অর্থে নেই। যেটুকু আছে সেটি কেবল প্রদর্শনের জন্য, অর্থাৎ নিজেদেরকে বড় করে প্রকাশ করা এবং এই মহত্ব প্রদর্শন করেও ব্যবসাকে জমজমাট করা হয়।

- যারা সূদের ব্যবসা করে তারা মানবতার গন্ডিতে থাকতে পারে না। অংকের হিসেব বা স্বার্থটাই তাদের কাছে বড়। কখনও ব্যাক্তিক আবার কখনওবা গোষ্ঠীস্বার্থ। অর্থাৎ কেবল উপকারভোগীদের স্বার্থই তারা সংরক্ষণ করে। এ ব্যাবসার শিক্ষাটিই এমন। এ কাজের সাথে সংশ্লিষ্ট ব্যাক্তিরা ভীষনভাবে স্বার্থপর হয়ে যায়। তারা মানবতার গন্ডিতে থাকে না। তাদের আত্মিক ও নৈতিক পতন হয়।

- ব্যবসায়ের লাভ-ক্ষতিতে ঋণদাতার কোন অংশ থাকে না, ফলে ব্যবসার উন্নয়নেও তাদের কোন মাথাব্যাথা থাকে না। উপরন্তু ব্যবসায়ে ক্ষতির সম্ভাবনা দেখা দিলে লগ্নিকৃত টাকা যথাসময়ের পূর্বেই দ্রুত উঠিয়ে নেয়ার জন্য সবরকম ব্যাবস্থা গ্রহণ করা হয়। এতে দুঃসময়ে ঋণ গ্রহীতার সংকট ও আতংক আরও বৃদ্ধি পায়। এটি উদ্যেক্তা বা উৎপাদকের টিকে থাকার অবস্থাকে খারাপের দিকে নিয়ে যায়। সূদের ব্যবসায়ী কেবল নিজের স্বার্থটাই বোঝে। বৃহত্তর কল্যাণ ও অপরের সুবিধা-অসুবিধাকে বিবেচনা করে না।

- সূদের কারণে দরীদ্র আরও দরীদ্র হয়। দরীদ্রকে ঋণ দিয়ে কৌশলে তাদের থেকে সব ছিনিয়ে নেয়া হয়। গুটিকতক শোষকগোষ্ঠী বা পূঁজিপতি লাভবান হয়। মানবতা হয় ভূলুন্ঠিত। অর্থ-সম্পদ একদিকে জমা হতে থাকে। সমাজে অর্থনৈতিক ভারসাম্য বিনষ্ট হয়।

- যারা সূদের কারবারে অর্থ লগ্নি করে তারা অলসে পরিণত হয়। বিলাস বহুল জীবন যাপন করে যা সমাজের অন্যান্যদের মনে আক্রোশের সৃষ্টি করে। ভেতরে নিরব ক্ষোভ জমা হতে থাকে। যার ফলাফল এক সময় ভয়াবহরূপ ধারণ করতে পারে। তাই তারা অন্যদেরকে সর্বোচ্চ পর্যায়ে ব্যাতিব্যাস্ত রাখার কৌশল অবলম্বন করে। এমনকি অতি প্রয়োজনীয় নয় তেমন কাজেও।

সূদের নানামুখী মন্দ প্রভাবের কারণে আল্লাহ ক্রয়-বিক্রয়কে বৈধ বা হালাল করেছেন কিন্তু সুদকে নিষিদ্ধ বা হারাম করেছেন।

▪ **২.২৭৫.৩** অতঃপর যার কাছে তার পালনকর্তার পক্ষ থেকে এ সতর্কবার্তা পৌঁছেছে এবং বিরত হয়েছে, পূর্বে যা হয়ে গেছে তা তার নিজের, সে বিষয় আল্লাহর ওপর নির্ভরশীল : সূদকে সম্পূর্ণরূপে নিষিদ্ধ ঘোষনা করার পর বলা হচ্ছে যে, যে এ কাজ থেকে বিরত হয়েছে সে সঠিক পথে আছে। তবে পূর্বের বিষয় তার নিজের। অর্থাৎ এ বিষয়ে কোন ব্যাক্তি পূর্বে অর্থাৎ সূদ নিষিদ্ধ ঘোষিত হবার পূর্বে যে সূদের লেনদেন করেছে, চাইলে সে তার প্রাপ্য পরিত্যাগ করতে পারে যদি সম্ভব হয়, কিংবা যদি পরিত্যাগ না করে তবে সে বিষয়টি আল্লাহর বিবেচ্য বিষয়ের অধীন থাকবে। সেক্ষেত্রে আল্লাহ ক্ষমা করতেও পারেন আবার নাও করতে পারেন। এ বার্তার মধ্য দিয়ে তেমন ঝুঁকি না নেয়ার পরামর্শ দেয়া হয়েছে। অর্থাৎ সূদ পরিত্যাগ করাই ভাল। পরের আয়াতগুলিতেও সূদকে বর্জন করতেই উৎসাহিত করা হয়েছে।

▪ **২.২৭৫.৪** যারা পুনরায় সুদ নেয়ায় লিপ্ত হয় তারাই আগুনে পতিত হবার প্রকৃত অধিকারী। তারা সেখানে বসবাস করবে : নিষিদ্ধ ঘোষিত হওয়ার পরেও যারা সূদ গ্রহণ করবে তারা আল্লাহর শাস্তিতে পতিত হবে। পরকালে আগুনে অর্থাৎ নরকে নিক্ষিপ্ত হবে। এখানে আল্লাহর ভয় প্রদর্শন করা হয়েছে। যারা আল্লাহ ও পরকালকে মনে-প্রাণে বিশ্বাস করবে তারা এ সতর্কবার্তার কারণে সূদ গ্রহণ করা তথা যে কোন মন্দ কাজ করা থেকে বিরত থাকবে।

আল্লাহর ভয় কোন আদেশকে কার্যকরীকরণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। তবে এটি বিশ্বাসীর ওপর কাজ করে। তাই কোরআনে না দেখা বিষয়গুলিতে বিশ্বাস স্থাপন করতে মানুষকে আহবান করা হয়। যেন সকল মানুষ আল্লাহর আদেশ-

নিষেধ মেনে চলে। উল্লেখ্য যে, আল্লাহ কখনই মন্দ কাজের নির্দেশ দেন না। তিনি ন্যায়পরায়তার নির্দেশ দেন।

▪ **২.২৭৬.১** আল্লাহ সুদকে নিশ্চিহ্ন করেছেন এবং দানকে ফলপ্রসূ করেছেন (Allah hath blighted usury and made almsgiving fruitful) : আল্লাহ সুদকে নিশ্চিহ্ন করেছেন। এখানে ‘নিশ্চিহ্ন করেছেন’ বলতে বোঝান হচ্ছে যে, আল্লাহ সূদকে এমনভাবে নিষিদ্ধ করেছেন যে ওটা তার গ্রহণযোগ্যতা হারিয়েছে এবং হারিয়েও ফেলবে। ফলে নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে। এমনকি ওটার বরকতও নষ্ট হয়ে যাবে। ওখান থেকে যে আয় আসবে তা ফলপ্রসূ তো হবেই না, বরং ক্ষতির কারণ হয়ে দাড়াবে। বাস্তবে হচ্ছেও তাই।

সূদ ও দানের একটি তুলনা এখানে তুলে ধরা হয়েছে। এ দু’টি কাজে মানুষের দুটি ভিন্ন রকমের মানসিকতা কাজ করে বা প্রকাশ পায়, যা বিপরীতধর্মী। দান বা সদকা কোনরূপ বিনিময়ের প্রত্যাশা ছাড়া দেয়া হয়। তবে পরকালে এর ফলাফল পাওয়ার একটি প্রত্যাশা থাকে। আল্লাহ চাইলে পার্থিব জীবনেও মানুষকে এর উত্তম প্রতিদান দিতে পারেন। অন্যদিকে সূদের অর্থ বিনিময় ছাড়া দেয়া হয় না। দু’টির ক্ষেত্রে উদ্দেশ্য ও নিয়ত পরস্পর বিপরীতমুখী। সূদের কারবারের ফলাফল ধ্বংসস্বরূপ যা আলোচনা করা হয়েছে।

এ ছাড়াও সমাজে মানুষ মানসিকতার দিক থেকে এ দু’টিকে দু’ভাবে গ্রহণ করে। একটিকে অপছন্দের ছলে গ্রহণ করে, অপরটিকে গ্রহণ করে মন থেকে। মানুষের দ্বারা গ্রহণযোগ্যতাও কোন একটি কর্মকে ফলপ্রসূ করে এবং অপরটিকে ব্যার্থ করে দেয়।

সূদে অর্থ লগ্নির ক্ষেত্রে অতি প্রাপ্তি বা লোভের বাসনা আছে। দানে তা নেই। একটিতে সহমর্মীতা আছে অপরটিতে নেই। একটি সম্পর্কের উন্নয়ন করে অপরটি সম্পর্ক ধ্বংস করে।

সূদ তার চারিত্রিক বৈশিষ্টের কারণে সামাজিক, অর্থনৈতিক, নৈতিক ও আত্মিক উন্নয়নকেও ব্যাহত করে। ধীরে ধীরে এ ব্যাবস্থা সমাজ ও সম্পর্ককে ধ্বংসের দিকে নিয়ে যায়। অন্যদিকে দান সদয়তা, উদারতা, হৃদয়ের প্রসারতা এমনতর উচু গুণসম্পন্ন এবং লোভ ও স্বার্থপরতা, নিচু মানসিকতা, নির্দয়তাকে

বর্জন করে। সামর্থবানদেরকে আল্লাহ দান করতে উৎসাহিত করেছেন। দান করার ক্ষেত্রে যেসব বিষয় ও আচরণকে গুরুত্ব দিতে হবে বা নিয়ম মেনে চলতে হবে ইতিপূর্বে তাই সেসব বিষয় তুলে ধরা হয়েছে।

এটি সত্যি যে ঋণের প্রাপ্তির মাধ্যমেও মানুষ উপকৃত হয়। কেননা ঋণ মানুষের প্রয়োজন। কিন্তু ঋণের ক্ষেত্রে সূদের মন্দ দিকগুলি ওপরে তুলে ধরা হয়েছে। কিন্তু দানের ক্ষেত্রে সহমর্মীতা কাজ করে। কোন বিনিময় প্রত্যাশা করা হয় না। দানের অর্থেও ব্যাক্তিক থেকে বৃহৎ পরিসরেও মানব কল্যাণ সাধন হয়ে থাকে। দানের মাধ্যমেও মানুষ প্রয়োজনীয় অর্থ পেয়ে থাকে এবং উপকৃত হয়। সত্য হচ্ছে যে, যে কোন প্রকারেই হোক মানুষের অর্থ প্রয়োজন।

একটি উদাহরণ দিলে বিষয়টি সহজে বোঝা যাবে। যেমন মনে করি পরিবারে কারও অর্থের প্রয়োজন। পরিবারের কোন সদস্য তাকে অর্থ সহায়তা করল সূদ ব্যাতিরেকে। এতে সে উপকৃত হবে। পরিবারের অপর কোন সদস্য নিজ পায়ে দাড়াতে পারলে সেটি পরিবারেরই মঙ্গল। ঘনিষ্টজন একজন অপরজনকে এভাবে সহায়তা দিতে পারে। এভাবে গোটা পরিবারই উন্নতির মুখ দেখতে পারে। এভাবে সহায়তা করা সম্ভব হয় সম্পর্কের টানে। ঠিক তেমনিভাবে গোটা সমাজ বা বৃহৎ পরিসরে বিশ্ব সমাজও এভাবে একে অন্যকে সহায়তা করলে সকলেই উপকৃত হতে পারে। কিন্তু বাস্তবে সেটি সম্ভব হয় না। কেননা পরিবারের সদস্যের সাথে মানুষ যে সম্পর্কের টান অনুভব করে তেমনটি অন্য কোন মানুষের জন্য অনুভব করে না। এটি ক্ষুদ্র আঙ্গিকের উদাহরণ হলেও এমনিভাবে গোটা সমাজ তথা বিশ্ব সমাজকেও একটি পরিবার ধরে তেমনিভাবে কাজ করা যেতে পারে। তার জন্য আত্মিক সম্পর্ক দরকার। সূদের ব্যাবসা সে সম্পর্ককেই ধ্বংস করে দেয়। তারা কেবল নিজেরাই সকলের ওপর ছড়ি ঘোরাতে আনন্দ পায়।

কোরআন মানুষের সাথে মানুষের সম্পর্ককে সকল ক্ষেত্রে আপন করে গড়ে তোলার উপদেশ ও পরামর্শ দেয়। সূদবিহীন দানের অর্থে বিশ্বের সকল মানুষ উপকৃত হতে পারে। তবে বাস্তবতা হচ্ছে বিষয়গুলি তেমনভাবে গড়ে তোলা বা ওঠা আজও সম্ভব হয়নি। বরং সূদের ব্যবসার মাধ্যমে নিষ্পেশন চলে। কোরআন একটি আদর্শ সমাজ গড়ে তোলার পথ প্রদর্শন করে। তবে সেটি গড়ে তুলতে হলে মানুষের মনোবৃত্তিকে উন্নত, জ্ঞানসম্পন্ন ও সহমর্মীতাসম্পন্ন

হতে হবে। যা আজও হয়নি। তবে এটি লক্ষ্য হতে হবে। সে লক্ষ্যকে সামনে রেখে এগিয়ে যেতে হবে। পৃথিবী এক স্বর্গে পরিণত হবে।

বিনিময়হীন দান সকল মানুষকে সহায়তা দিয়ে সকলের উন্নতিকে ত্বরান্বিত করতে পারে। দানের অর্থ সকলকে এবং সবকিছুকে ফলপ্রসূ করে তুলতে পারে। অপরদিকে সূদের মাধ্যমে প্রদেয় অর্থের মন্দ দিকগুলি ওপরে তুলে ধরা হয়েছে। বোধসম্পন্ন মানুষ দু'টি বিষয়ের ভাল-মন্দ নিশ্চয়ই উপলব্ধি করতে পারবেন। সে কারণেই আল্লাহ সুদকে নিশ্চিহ্ন করেছেন এবং দানকে ফলপ্রসূ করেছেন।

▪ **২.২৭৬.২** আল্লাহ অসৎ ও দোষী ব্যাক্তিদের পছন্দ করেন না (Allah loveth not the impious and guilty) : সত্য হচ্ছে, আল্লাহ কখনই অসৎ ও দোষী ব্যাক্তিদের পছন্দ করেন না। কিন্তু এখানে বিশেষভাবে যারা সূদের ব্যবসার সাথে জড়িত তাদেরকে উদ্দেশ্য করে কথাটি বলা হয়েছে। কেননা এ ব্যবসার চরিত্রের কারণে সূদের কারবারীদেরকে যে পথ অবলম্বন করতে হয় সেটি ভাল পথ না। যারা এমন মন্দ পথ অবলম্বন করে আল্লাহ তাদেরকে অসৎ ও দোষী ব্যাক্তিদের পর্যায়ে গণ্য করেছেন। এর যথাযথ কারণ আছে। বিষয়গুলি ওপরে আলোচনা করা হয়েছে (দ্রষ্টব্য ২.২৭৫.২)।

যে মানবিক সম্পর্কের ওপর গোটা জগত সংসার দাড়িয়ে আছে তারা সেটিকে ধ্বংস করে দেয়। কেবলমাত্র অর্থের লেনদেনের ভিত্তিতে সম্পর্ক গড়ে তোলে। অপরকে শোষণ করার শিক্ষা দেয়। অর্থের পরিমাপের ভিত্তিতে বড়-ছোট বা সামাজিক মর্যাদা নির্ধারণ করে। এটিও এক ধরণের সামাজিক বিশৃংখলা সৃষ্টি করে। এদের দ্বারা সমাজে নানান অপকর্ম সৃষ্টি হওয়ার সম্ভাবনা তৈরী হয়। সমাজে অনেক ধরণের অসৎ কর্মকাণ্ড সৃষ্টির মূল হয়ে দেখা দেয় এই সূদের কারবার। তাই তাদেরকে অসৎ ও দোষী বলে সম্বোধন করা হয়েছে।

উল্লেখ্য যে, জগতে যে যা কিছু অর্জন করে চলেছে বস্তুত আল্লাহই তাকে তা দান করেছেন। আল্লাহ যাকে ঋণ দেয়ার সামর্থ দিয়েছেন বিনিময়ে সে আল্লাহকে কি দেয়?

বস্তুত আল্লাহকে মানুষের কিছুই দিতে হবে না। তার নির্দেশ পালন করে চলাই আল্লাহর সন্তুষ্টির কারণ। কিন্তু সূদের ভিত্তিতে ঋণের দাতা নিঃসন্দেহে একজন অকৃতজ্ঞ ব্যাক্তি। আল্লাহর নির্দেশটুকুও সে পালন করে না।

আল্লাহ যেমন তাকে অনুগ্রহ করেছেন, তেমনি আল্লাহর নির্দেশের কারণে তারও উচিৎ আল্লাহর সৃষ্টির জন্য তেমনিভাবে করা। বিনিময় প্রত্যাশা না করে মানুষের সহায়তায় এগিয়ে আসা। কিংবা কোন অনৈতিক ও অত্যাচারের পথ অবলম্বন না করা। সমাজের সার্বিক মঙ্গলের জন্যই এটি তার কর্তব্য। এটিই আল্লাহর জন্য করা। এটি একটি প্রক্রিয়া। আবার এটি আল্লাহর একটি পরীক্ষাও।

কিন্তু মানুষ যদি তা না করে উল্টো অন্যদের শোষন করতে থাকে তবে তো অবশ্যই সে অকৃতজ্ঞ। যে আল্লাহ তাকে দিয়েছেন এবং মানুষের প্রতি মানবিক ও সদয় আচরণ করতে বলেছেন, সে তা না করে নির্দয়-নিষ্ঠুর আচরণ করে চলেছে। অবশ্যই বিবেচনাহীন তেমন অকৃতজ্ঞ মানুষ অসৎ ও দুষ্ট প্রকৃতির।

এরা আল্লাহর বিষয়ে উদাসীন। তাই অকৃতজ্ঞ। আল্লাহই তাদেরকে সৃষ্টি করেছেন। চলার পথের দিক-নির্দেশনা দিয়েছেন। অথচ তাদের ভাবনা কেবল নিজেদের মধ্যেই কেন্দ্রীভূত। তারা নিজেদের জন্যই সম্পদ আহরণে মনযোগী। সমাজের অপরাপর মানুষদের কথা ভাববার সময়টুকুও তাদের নেই। তাদের মধ্যে মানবিকতা নেই। ক্ষণস্থায়ী ক'দিনের জীবনকেই তারা সব মনে করে। হেন কাজ নেই নিজেদের লাভের জন্য তারা করতে পারে না। তাই বলা হয়েছে এমন মানুষদের আল্লাহ পছন্দ করেন না।

আল্লাহ যাদেরকে অসৎ ও দোষী ব্যাক্তিদের পর্যায়ে গণ্য করেন অবশ্যই তাদের জন্য রয়েছে দুর্ভোগ। সেটি যেমন ইহকালে হতে পারে আবার হতে পারে পরকালে। এটি তাদের জন্য একটি সতর্কবার্তা যেন তারা মন্দ কাজ পরিত্যাগ করে। বস্তুত এসব বার্তার মাধ্যমে আল্লাহ সূদের কারবারকে নিরুৎসাহিত করছেন।

▪ **২.২৭৭.১** যারা বিশ্বাস স্থাপন করে ও ভাল কাজ করে এবং উপাসনাকে প্রতিষ্ঠা করে ও দরীদ্রদেরকে তাদের প্রাপ্য অংশ প্রদান করে তাদের পুরষ্কার

রয়েছে তাদের পালনকর্তার কাছে : যাদেরকে আল্লাহ অপছন্দ করেন তাদের বিষয়ে ইতিপূর্বে বলা হয়েছে। অতঃপর আল্লাহ বলছেন, যারা বিশ্বাস করে এবং ভাল কাজ করে, আল্লাহর উপাসনা করে, দরীদ্রদের প্রাপ্য অংশ যাকাত প্রদান করে তাদের পুরষ্কার রয়েছে তাদের পালনকর্তার কাছে। এটি মানুষের নিজেদেরই বিবেচনার বিষয় যে তারা কোন পথ অবলম্বন করবে। বিষয়টি যেমন বিশ্বাসের সাথে সম্পর্কিত তেমনি জ্ঞানের সাথেও সম্পর্কিত। যারা বিষয়ের ভাল-মন্দ বুঝবে নিঃসন্দেহে তারা সঠিক পথ গ্রহণ করবে।

বলা হচ্ছে, যে ভাল কাজ করবে সে আল্লাহর দিক থেকে পুরস্কৃত হবে। সূদ বর্জন, যাকাত প্রদান করা, দান করা সবই ভাল কাজের অন্তর্ভূক্ত। যাকাত অর্থনৈতিক সমস্যা সমাধানে ভূমিকা রাখে যা বাধ্যতামূলক। উপাসনা আল্লাহর নির্দেশনা পরিপালনে মানুষের ওপর প্রভাব রাখে। এ সবই বিশ্বাসের সাথে সম্পর্কিত বিষয়। বিশ্বাসই মানুষকে চালনা করে। পুরস্কারের ঘোষনার মধ্য দিয়ে মানুষকে ভাল কাজ করতে উৎসাহিত করা হয়েছে।

পুরস্কার প্রাপ্তির আশায় মানুষ ভাল কাজ করবে। তবে জ্ঞান ও বোধসম্পন্ন মানুষ যে কোন কাজের ভাল-মন্দ বিবেচনা করে ভাল কাজটিই করে এবং মন্দটা পরিহার করে। তার জন্য অবশ্য মানসিকতা উচ্চে উন্নীত হতে হবে। তবে যেভাবেই হোক না কেন মানুষকে সঠিক পথে চালনা করাই মূল লক্ষ্য। পুরস্কারের কথা বলে আল্লাহর নির্দেশ কার্যকর হওয়াকে বেগবান করা হয়েছে।

ভাল কাজের এ পুরস্কার মানুষ পরকালে প্রাপ্ত হতে পারে। চাইলে আল্লাহ ইহকালেও মানুষকে পুরস্কৃত করতে পারেন। এটি একান্তই আল্লাহর বিবেচনার বিষয়। তিনি যেমনটি ভাল মনে করেন তাই করবেন। এটিও বিশ্বাস রাখতে হবে যে ইহকালে তাঁর না দেওয়াও মঙ্গলজনক। এক অর্থে সেটিও পুরস্কার। কেননা কোন বিষয়ের ভাল-মন্দ তিনি সব জানেন যা মানুষ জানে না।

উল্লেখ্য যে, যাকাতকে বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। কিন্তু দান ব্যধ্যতামূলক নয়। যদিও দু'টোই ভাল কাজের অন্তর্ভূক্ত। দরীদ্রদের সহযোগীতা করার জন্য অবস্থাপন্নদেরকে দান করার বিষয়ে উৎসাহ দেয়া হয়েছে।

সূদ ও দানের ক্ষেত্রে মানুষের ভেতরের দু'টি চরিত্রের দু'রকম বৈশিষ্ট স্পষ্টভাবে ফুটে ওঠে। একজন ভীষনভাবে অর্থ-সম্পদের পূঁজারী এবং অপরজন আল্লাহর পূঁজারী! প্রথমজন অর্থ-সম্পদ স্তুপিকৃত ও জমাকরণের ধ্যনে দিনরাত

মগ্ন হয়ে থাকে। অপরজন হচ্ছেন সদয়। আল্লাহ ও তাঁর সৃষ্টির অধিকার ও দায়িত্ব ও কর্তব্য বিষয়ে সচেতন। সে সম্পদ অর্জন করে নিজের এবং অপরাপর সকলের হিত সাধনের জন্য।

আল্লাহ প্রথমোক্তদের কর্মকান্ডকে গ্রহণ করেন না। তারা একটি ভাল ও শক্তিশালী সমাজ গঠনে ভূমিকা রাখে না। বরং তারা নিজেদেরকে, প্রজন্মকে এমনকি অন্যান্যদেরকেও দুর্দশাগ্রস্ত করে তোলে। তাদের বিষয়ে বলা হয়েছে যে, পরকালেও তারা কঠিন অবস্থার মুখোমুখী হবে।

অপরদিকে দ্বিতীয় প্রকৃতির মানুষের কাজকে আল্লাহ গ্রহণ করেন। তারা একটি ভাল হৃদ্যতাপূর্ণ ও দৃঢ় ভিত্তির ওপর গড়ে ওঠা সমাজ কাঠামো গঠনে ভূমিকা রাখে। এটিকেই সত্যিকারের সফলতা বা অর্জন বলা যেতে পারে। তারা তাদের মানসিকতা, কর্ম ও হৃদ্যতাপূর্ণ পরিবেশ সৃষ্টির কারণে ইহকালেও শান্তির মুখ দেখে। অতঃপর পরকালের প্রতিশ্রুতি তো আছেই।

যারা আল্লাহর পথে খরচ করে তথা দান করে, হৃদয় যাদের সংকীর্ণতা থেকে মুক্ত ও প্রসারিত আল্লাহ তাদেরকে ভালবাসেন। পরকালেও তারা সুখী হবে। অপরদিকে বলা হচ্ছে, যারা সূদে অর্থ লগ্নি করে তারা অসৎ ও দোষী ব্যাক্তিদের পর্যায়ভূক্ত। আল্লাহ তেমন অসৎ ও দোষী ব্যাক্তিদের পছন্দ করেন না। বস্তুত এসব বার্তার মাধ্যমে আল্লাহ সূদ গ্রহণ করাকে নিরুৎসাহিত করছেন। পক্ষান্তরে উদ্বৃত্ত অর্থ দান করাকে উৎসাহিত করেছেন।

বিশ্বাসী অবশ্যই আল্লাহর নির্দেশনা পালন করবে। ভাল গুণাবলী অর্জন করবে, ভাল পথে উপার্জন করবে এবং ভাল কাজে ব্যায় করবে। সে কারণেই সকল মানুষকে কোরআনের দর্শনে বিশ্বাসী হতে আহবান করা হয়।

▪ **২.২৭৭.২** এবং তাদের অন্তরে না কোন ভীতির সঞ্চার হবে, না তারা নিপতিত হবে কোনরূপ মনকষ্টে (And there shall no fear come upon them neither shall they grieve) : (দ্রষ্টব্য ২৬২.২)।

▪ **২.২৭৮** হে বিশ্বাসীগন! তোমরা আল্লাহর প্রতি দায়িত্ব পালন কর এবং সূদের যে সমস্ত বকেয়া আছে তা পরিত্যাগ কর যদি তোমরা (সত্যিকার) বিশ্বাসী হও : সূদ বর্জনের নির্দেশনা জারির পর সূদের যে সমস্ত পূর্বের বকেয়া আছে সেসব পরিত্যাগ করতে বলা হয়েছে। সূদ বর্জনকে আল্লাহর প্রতি দায়িত্ব

ও কর্তব্য পালনের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে। বিষয়টি কতটা গুরুত্বের সাথে কোরআনে নেয়া হয়েছে উচ্চারিত বাণীর ধরণ থেকেই সেটি বোঝা যায়।

বিশ্বাসীদেরকে উদ্দেশ্য করে এ বাণী অবতীর্ণ হয়েছে। যদি তারা সত্যিকারের বিশ্বাসী হয় তবে অবশ্যই তারা সূদ পরিত্যাগ করবেই। এটি বিশ্বাসীদের জন্য একটি পরীক্ষাও।

তৎকালীন অবস্থার প্রেক্ষিতে সুনির্দিষ্টভাবে বিশ্বাসীদেরকে উদ্দেশ্য করে এ নির্দেশনা জারি করা হয়েছে। কেননা সেসময় বিশ্বাসীরাই সত্যিকার অর্থে আল্লাহর বাণীর ধারক, বাহক ও অনুসরণকারী ছিল। উপরন্ত তাদের দ্বারাই আল্লাহর বাণী সর্বপ্রথম কার্যকর হতে হবে। তবেই অপরাপরদের অনুসরণ করার জন্য বলা যেতে পারে।

সূদ সম্পর্কিত আল্লাহর এ বাণী সমগ্র মানব জাহানের উন্নতি ও কল্যান বিধানের জন্য প্রদত্ত হয়েছে। সমাজের ভালর জন্য ধীরে ধীরে সকলকেই তা পালন করতে হবে। আর সে কারণেই সকল মানুষকে বিশ্বাসী হতে আহবান করা হয়।

মোহাম্মদ (সাঃ) বিদায় হজ্বের ভাষনে অমুসলিমদের কাছে মুসলিমদের সূদের বকেয়া পাওনা মওকুফ করার ঘোষনা দেন এবং বিষয়টি নিয়ে অমুসলিমদেরও তেমনিভাবে বিবেচনা করা উচিত সেটি প্রত্যাশা করেন। অর্থাৎ সূদ ব্যাতিত কেবল মূলধন আদায় করা।

▪ **২.২৭৯.১** যদি তোমরা তা পরিত্যাগ না কর, তবে আল্লাহ এবং তাঁর বার্তাবাহকের পক্ষ থেকে তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের জন্য সতর্ক করা হচ্ছে : সূদ পরিত্যাগ করার বিষয়টিকে কতটা গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনা করা হয়েছে উচ্চারিত বাণীর ধরণ থেকে তা বোঝা যায়। যদি সূদের কারবার বন্ধ করা না হয় তবে সূদখোরদেরকে যুদ্ধের জন্য সতর্ক থাকতে বলা হয়েছে। এটি একটি মারাত্মক ঘোষনা। সূদের কারবার সে সময়ে কতটা খারাপ পর্যায়ে চলে গিয়েছিল যে যার জন্য এমন মারাত্মক ঘোষনা দিতে হয়েছে।

মানুষ সূদখোরদের দ্বারা অত্যাচারীত-নিষ্পেষিত হয়েছে। কিন্তু নিরীহ মানুষের এ নিয়মের বিপক্ষে করারও কিছু ছিল না। ইসলাম এমনিতর নানান প্রকারের আর্থ-সামাজিক-সাংস্কৃতিক অত্যাচারের হাত থেকে মানুষকে মুক্তি

দিতে এসেছে। এমন শক্ত ঘোষনার মাধ্যমে সূদের অনৈতিক ও অন্যায় কারবারকে বন্ধ করতে বলা হয়েছে। এ থেকে সকলকে বিরত থাকতে বলা হয়েছে; নয়ত যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হতে বলা হয়েছে। সূদের ব্যবসায়ের বিরূপ ফলাফলকে সমাজে কতটা ব্যাপক ও ক্ষতিকর হিসেবে ইসলামে চিহ্নিত করা হয়েছে সেটি এ ঘোষনা থেকে অনুধাবন করা যায়।

সূদের কারবার একটি স্বর্গীয় অর্থনৈতিক ব্যাবস্থা সৃষ্টির প্রধান অন্তরায়স্বরূপ, যা কিছু মানুষের অতিরঞ্জিত লোভী মানসিকতা থেকে সৃষ্টি হয়। নইলে এ জগতই হতে পারত স্বর্গ যেভাবে কোরআন পথ-নির্দেশ করেছে। যেখানে থাকবে মানুষের প্রতি মানুষের মমত্ব, সহমর্মীতা ও নিঃস্বার্থভাবে সহযোগীতা করার মনোভাব।

সত্যি বলতে বাস্তবে যারা সূদের কারবারের অত্যাচারের রূপটি দেখেনি বিষয়গুলি তাদের পক্ষে বোঝা কঠিন। আজও যেখানে এ ধরনের ব্যবসা চালু আছে ভূক্তভোগীমাত্রই জানে যে এর আষ্টে-পৃষ্ঠে কিভাবে তারা বাধা পরে যায় এবং আছে। এর সাথে একটি চক্র জড়িত থাকে যাদের ফাঁদ থেকে মানুষের মুক্তির কোন উপায় নেই। এমনকি তাদের ওপর শারীরিক, মানসিক ও সামাজিক নিষ্পেষনও চলে। সারা জীবন শ্রম ও সূদ দিয়েও এর জালে আটকে থাকা মানুষ সুখের নাগাল দেখতে পায় না। মাথা উঁচু করে দাড়াতে পারে না। সূদের কারবারিরা মানুষকে নিজের পায়ে দাড়াতে দিতে চায় না। তাদের ওপর চিরকাল নির্ভরশীল করে রাখতে চায়। এভাবে তারা তাদের উপার্জনের পথ সুগম করে। যাদের এ তিক্ত অভিজ্ঞতা নেই তারা এ বাণীর গুরুত্ব ও মর্ম অনুধাবন করতে ব্যার্থ হবে।

কেউ কেউ অবশ্য এমন মত পোষন করে যে, নিষিদ্ধ ঘোষিত এ অপরাধের কারণে শাস্তি হিসেবে সূদের কারবারের সাথে জড়িতদের যাবজ্জীবন বা মৃত্যুদন্ড হওয়া উচিত। তবে এটি যথাযথ বিবেচনা নয়। শক্তি প্রয়োগের যদি ক্ষমতাই থাকে তবে এমন অনৈতিক ব্যবসা বা কার্যকলাপ থেকে মানুষকে বল প্রয়োগে বিরত রাখা যেতে পারে। মৃত্যুদন্ডের প্রয়োজন কি?

বিষয়টি আল্লাহর বিচারের ওপর ছেড়ে দেয়া উত্তম। মৃত্যুদন্ডের মতো এতবড় নির্দেশনা যেখানে কোরআনেই স্পষ্টভাবে দেয়া হয়নি, সেখানে মানুষের

এমন নির্দেশনায় যাওয়ার প্রয়োজন কি? কারও জীবন নিয়ে লাভ কি? বরং ভাল কোনকিছুকে প্রতিষ্ঠা করার উপায় অন্বেষণ করতে হবে।

মস্তিষ্কে জ্ঞান পৌঁছাতে হবে। মানুষকে এ বিষয়ে যথাযথভাবে সচেতন করে তুলতে হবে। এর মন্দ দিকগুলি তুলে ধরতে হবে। বিকল্প উপায় বা পথ বের করতে হবে। উপরন্তু সূদের আলোচনা এখানেই শেষ নয়। আরও আলোচনা আছে।

▪ **২.২৭৯.২** কিন্তু যদি তোমরা ক্ষমা প্রার্থনা কর তবে তোমাদের মূলধন তোমাদেরই (সূদ ব্যাতিত) : সূদ নিষিদ্ধ হওয়ার পর কেউ যদি পূর্বেকৃত ভূলের জন্য আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করে এবং ভবিষ্যতে তেমন কাজ না করার প্রতিশ্রুতি গ্রহণ করে, তবে সে ক্ষমা পাবার যোগ্য। সেক্ষেত্রে সূদ ব্যাতিত কেবল মূলধন ফেরত পেতে বা দিতে পারে।

বাণীর ধরণ থেকে প্রতীয়মান হয় যে ক্ষমা না চাইলে শাস্তিস্বরূপ মূলধনও প্রাপ্য না। এ কথার অপর অর্থই হচ্ছে যুদ্ধ। কেননা সেক্ষেত্রে যুদ্ধ ব্যাতিত অর্থ আদায়ের আর কোন উপায় অবশিষ্ট থাকে না। বিষয়টি আপনা থেকেই যুদ্ধের দিকে গড়াবে। তাই পরিণতি বিবেচনা করেই পূর্বের আয়াতে যুদ্ধের ঘোষনার ইংগিত রয়েছে। অর্থাৎ তেমন ক্ষেত্রে মূলধনও ফেরত পাবে না বা দেয়া হবে না।

যদি শক্তি ও ক্ষমতা থাকে এবং যদি বিকল্প উপায় প্রতিষ্ঠা পায় বা করা সম্ভব হয়, তবে এ কাজ বন্ধে বাধ্য করার প্রতি ইংগিত রয়েছে এ বাণীতে।

▪ **২.২৭৯.৩** অত্যাচার কর না তাহলে অত্যাচারীতও হবে না (Wrong not, and ye shall not be wronged) : এটি একটি অত্যান্ত গুরুত্বপূর্ণ বাণী। সূদ নিষিদ্ধকরণ সম্পর্কিত সকল কারণের মূল নিহিত এখানে।

পূর্বেও উল্লেখ করেছি যে, সূদ একটি পার্থিব এবং অর্থনৈতিক কর্মকান্ডজনিত বিষয়। এর ভাল-মন্দ মানুষের তথা বিশেষত অর্থনীতিবিদদের বিবেচ্য বিষয়। সূদের সাথে আল্লাহর সম্পর্ক কি? এর সাথে কি আল্লাহর কোন লাভ বা ক্ষতির বিষয় জড়িত আছে? কেন তিনি সূদকে নিষিদ্ধ করতে যাবেন?

মানুষের নিকট থেকে আল্লাহর কোন কিছুই প্রাপ্তির প্রয়োজন নেই। মানুষেরই মঙ্গলের জন্য আল্লাহ এমন নির্দেশনা দিয়েছেন। তবে এর সাথে আল্লাহরও একটি সম্পর্ক আছে।

আল্লাহ সৃষ্টিকে যথাযথভাবে ধরে রাখেন। তিনি জগতে এমন পরিবেশ নিশ্চিত করেন যা সৃষ্টি ধ্বংসের কারণ হবে না। আল্লাহর সাথে বিষয়টির সম্পর্ক এখানে।

বিশ্বাসীদেরকে সূদ পরিহার করতে বলা হয়েছে এবং এটিকে মানুষের করণীয় হিসেবে একটি গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্বের অন্তর্ভূক্ত করা হয়েছে। বিষয়টিকে এত গুরুত্ব দেয়া হয়েছে যে, এ নির্দেশনা পালন করা না হলে অবিশ্বাসীদেরকে যুদ্ধের জন্যও সতর্ক করা হয়েছে।

সূদের মূল সমস্যাটি সূদে নয়। সূদের কারবারের মূল সমস্যাটি হচ্ছে এর সাথে অত্যাচার-নিপীড়নের একটি সম্পর্ক আছে এবং এর মাত্রা এত পরিমাণ বেশী যা ভূক্তভোগী ছাড়া কেউই কখনও উপলব্ধি করতে পারবে না। আবার সব সমস্যার একটি সমাধানের পথ আছে। কিন্তু এর সাথে এমনভাবে একটি শক্তিশালী দুষ্টচক্র জড়িত থাকে যে এর অত্যাচার-নিপীড়ন থেকে মানুষের মুক্তি প্রায় অসম্ভব।

একটি যুগান্তকারী ঘোষনার মধ্য দিয়ে সূদকে নিষিদ্ধ করা হয়েছে। বলা যায় একটি বিপ্লবী চেতনা নিয়ে কাজটি করা হয়েছে। এভাবে না হলে কখনই এমন কথা অর্থাৎ সূদকে নিষিদ্ধকরণের কথা উচ্চারণও করা সম্ভব হত না। কে শুনবে কার কথা? আল্লাহর নামে নির্দেশনা জারী করা হয়েছে বিধায় কাজটি করা সম্ভব হয়েছে। কোন মানুষের কথায় জগৎব্যাপি এমন কাজ করা কখনই সম্ভব ছিল না।

যার মাধ্যম হয়ে এ বাণী আগমন করেছে, তাঁর প্রতি বিশ্বাস ভালবাসা না থাকলে কোন মানুষের ওপর অবতীর্ণ আল্লাহর এমন বাণীকেও কেউ গ্রহণ করবে না। কেউই তার প্রতির্ষ্ঠিত স্বার্থকে জলাঞ্জলি দিতে চাইবে না। তাই সূরা বাকারার প্রথমে যে সকল শর্তে বিশ্বাস রাখতে বলা হয়েছে তা অতি গুরুত্বপূর্ণ। নির্দেশনা কার্যকরীকরণে বিশ্বাসজনিত বিষয়গুলি অপরিহার্য্য। এগুলির একটি একটির পরিপূরক। সব কার্যকারণের সূত্রে গাঁথা। একটিকে বাদ দিয়ে

অপরটি অর্জনযোগ্য হবে না। ফলস্বরূপ আল্লাহর নির্দেশনাও কার্যকরী করা সম্ভব হবে না।

উল্লেখ্য যে, প্রতিটি নির্দেশনার মধ্য দিয়ে আল্লাহ মহাবিশ্বে ন্যায় বা ন্যায্যতা প্রতিষ্ঠা করেন ও প্রতিষ্ঠিত রাখেন, যা ভারসাম্য সৃষ্টি করে; অন্যায়-অত্যাচার ও অশ্লিলতাকে তিনি দুরীভূত করেন। এ সবকিছুই জীবন ও জগত সংসারকে সঠিক পথে পরিচালনা করার জন্য করা হয়েছে। সৃষ্টিকে রক্ষা করার জন্য করা হয়েছে।

সূদের সাথে আল্লাহর লাভ-ক্ষতিজনিত কোন বিষয় নেই। এর সাথে সম্পর্ক মানুষের জীবন ও জীবিকার। এর সাথে সম্পর্ক অত্যাচারী ও অত্যাচারীতের। এ ব্যাবসার চরিত্র মানুষের সাথে মানুষের ভ্রাতৃত্ববোধ, সহযোগীতা ও সহমর্মীতার বোধকে ধ্বংস করে দেয়। ইসলাম মানুষকে সবরকম অত্যাচার-অনাচার, নিপীড়ন-নিষ্পেষন ও খারাপ অবস্থা থেকে মুক্তি দিতে এসেছে। সূদের কারবারীদের দুষ্টচক্র থেকে সাধারণ মানুষকে মুক্তি দিতে তাই একে নিষিদ্ধ করা হয়েছে। এর মূল লক্ষ্য সমাজ ও জীবন থেকে অন্যায়-অত্যাচারকে দুর করা, ন্যায়কে প্রতিষ্ঠা করা এবং সৃষ্টিকে ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করা।

বলা হচ্ছে, 'অত্যাচার কর না, তাহলে অত্যাচারীতও হবে না'। কিংবা "ভূল কর না, তাহলে তোমাদের প্রতিও ভূল করা হবে না।" সূত্রটি হচ্ছে, 'সকল নিষিদ্ধ কাজের ক্ষেত্রেই বদলাজনিত প্রতিকার বিধিসম্মত (দ্রষ্টব্য আল-কোরআন ২:১৯৪)।' আল্লাহর সৃষ্টির সূত্রে অত্যাচার করার বিধান নেই। যারা অত্যাচার করে তাহলে তারাও কখনও অত্যাচারীত হবে। তাই অত্যাচার করতে নিষেধ করা হয়েছে। তাহলে তারাও অত্যাচারীত হবে না। তাদের প্রতিও কোনরূপ ভূল আচরণ করা হবে না।

তবে এর চেয়েও বড় সূত্র হচ্ছে এই যে, আল্লাহ এ বিশ্বজগত সত্য দ্বারা সৃষ্টি করেছেন। জগতের সবকিছুই সূত্রের ওপর ভর করে চলে। মানুষের সৃষ্টিতেই আল্লাহ তার ভেতরে ন্যায় প্রবণতার একটি সূত্র অন্তর্গ্রথিত করে দিয়েছেন। আর তাই যে মানুষ অত্যাচার করে না তার প্রতিও অপর মানুষ অত্যাচার করে না এবং আল্লাহ তো নয়ই। এটিও সূত্র। এগুলি মানুষের ভেতরে সহজাতভাবে কাজ করে।

তবে কি কিছু মানুষ সূত্রের বাইরে কাজ করছে না? তারা কি নিরীহ মানুষকে অত্যাচার করছে না? তাহলে ওপরে যেভাবে বলা হল সেভাবে সূত্র কাজ করছে কোথায়? অল্পকিছু মানুষ সূত্রের বাইরে কাজ করছে। তাই তাদেরকে বিপথগামী, ভূল-পথগামী বা পথচ্যূত বলা হয়।

প্রশ্ন হচ্ছে, আল্লাহর সৃষ্ট সূত্রের বাইরে যাওয়া সম্ভব হচ্ছে কিভাবে? উত্তর হচ্ছে, আল্লাহই মানুষকে আবার সে সূত্রে সৃষ্টি করেছেন। তিনি মানুষকে কিছু কিছু ক্ষেত্রে তাঁর সূত্রের বাইরে গিয়ে কাজ করার সক্ষমতা দিয়েছেন। কিন্তু যেতে বারণ করেছেন। এটিই পরীক্ষা। পার্থিব জীবন তাই এক পরীক্ষা ক্ষেত্র। সে কারণেই বিচার দিবসের কথা বলা হয়েছে। অন্যথায় বিচার দিবসের প্রয়োজন হত না। দর্শনে সকল কিছু কার্যকারণের সূত্রে প্রতিষ্ঠিত।

কেউ যদি কাউকে অত্যাচার করে তবে সেও অত্যাচারিত হবে। সূদ নিষিদ্ধে তাই যুদ্ধের মতো মারাত্মক ঘোষনা এসেছে। অর্থাৎ এক সময়কার অত্যাচারী নিজেও অত্যচারিত হয়ে যাবার সম্ভাবনা আছে। তাই বলা হয়েছে, ‘অত্যাচার কর না, তাহলে অত্যাচারীতও হবে না’ এবং সেক্ষেত্রে অত্যাচারী যদি কখনও নিজেই অত্যাচারীত হয়ে যায় তবে বিষয়টিকে বড় দোষ হিসেবে দেখা নাও যেতে পারে। সেটি হবে তার কর্মের পরিণতি। এ বিষয়ে পূর্বেই সতর্ক করে দেয়া হয়েছে।

সূদের ব্যবসাকে অত্যাচার-উৎপীড়নের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে। বিষয়গুলি নিয়ে পূর্বে আলোচনা করা হয়েছে। বস্তুত এর মাধ্যমে অত্যাচারই করা হত এবং আজও তাই করা হয়। আজও অনেক স্থানে সেই প্রকারের অত্যাচার অব্যাহত আছে। কেন এটিকে অত্যাচারের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে?

যারা সূদের কারবার করে তারা লগ্নিকৃত টাকার বিনিময়ে লাভ নেয়। কোন পরিশ্রম করে না। অথচ ব্যবসায়ে লাভের কোন নিশ্চয়তা নেই। লোকসানও হতে পারে। কিন্তু লোকসান হলেও সূদাসল পরিশোধ করতে হয়।

সূদাসল সময়মতো পরিশোধ করতে না পারলে সূদের হার আরও চড়া হয়। চক্রবৃদ্ধিহারে সূদ আদায় করা হয়। মানুষ পরিশ্রম করেও লাভের মুখ দেখতে পারে না। বলা যায় এক প্রকার নিঃশেষ হয়ে যায়। কর্মস্পৃহা হারিয়ে ফেলে। পরিশ্রম করা সত্ত্বেও সংসারে কোনদিন স্বচ্ছলতা আসে না। কাজ করেও পরিশ্রমী মানুষ দাড়াতে পারে না। কৃষক-শ্রমিক সেটিও মেনে নেয়। কিন্তু

সময় মতো সূদ পরিশোধে অপারগতায় কোন সুরক্ষার ব্যাবস্থা বা কোন প্রকার সহায়তা-সহানুভূতিটুকুও দেখান হয় না। সূদের এ কারবার এক প্রকার অত্যাচারে পরিণত হয়। সবচেয়ে বড় অত্যাচার হচ্ছে অতিরিক্ত তথা দ্বিগুণ, ত্রিগুণ, চতুর্গুণ বা চক্রবৃদ্ধিহারে সূদ আদায় করা। কেবল বেশী নিয়েই অত্যাচার করা হয় তা নয়। কম দিয়ে বা কখনও প্রাপ্য না দিয়েও অত্যাচার করা হয়। অর্থ পরিশোধে ব্যার্থ হলে ঘরের আসবাবপত্র পর্যন্ত ছিনিয়ে নেয়া হয়। জমিজমা হাতিয়ে নেয়া হয়।

'অত্যাচার কর না, তাহলে অত্যাচারীতও হবে না'- এটি আল্লাহর দিক থেকে একটি গুরুতর সতর্কবাণী। যারা সূদ নেয়ার মাধ্যমে নিরীহ মানুষকে অত্যাচার করে আল্লাহও তাদেরকে একসময় তেমন পরিণতির দিকে ঠেলে দিতে পারেন। এটি সূদের কারবারীদের প্রতি সতর্ক বাণী। যেন তারা বিষয়টি বিবেচনা করে ও অত্যাচারের পথ পরিহার করে।

একই সাথে অত্যাচারীতদের জন্য এটি একটি আশা ও উদ্দীপনার বাণী। তারা বুঝতে পারে যে, যারা এমন কাজ করছে এটি একটি মন্দ কাজ। তাই আল্লাহ এটিকে অবৈধ ও অনৈতিক কাজ বলে স্বীকৃতি দিয়েছেন এবং নিষিদ্ধ করেছেন। এটি তাদের প্রতি করা অত্যাচারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করার ক্ষেত্রে নৈতিক শক্তি হয়ে কাজ করে।

'অত্যাচার কর না, তাহলে অত্যাচারীতও হবে না'- এ বাণী এ ব্যাবস্থা যখন অত্যাচারে পরিণত হয় তখন মানুষকে এর প্রতিকারে পদক্ষেপ নেয়ার অনুমোদন দেয়। অর্থাৎ যারা এর বিপক্ষে, তাদের যদি কখনও সে সক্ষমতা আসে তবে অত্যাচারীদের বিরুদ্ধে একইরূপ বা কঠিন ব্যাবস্থা নেয়ার একটি নৈতিক সমর্থন বা অনুমোদন দেয় এটি। যদিও ক্ষমার মহাত্ম আছে তবে উপযুক্ত শাস্তি প্রদানও কখনও কখনও সার্বিক মঙ্গলের জন্যই প্রয়োজনীয়। উল্লেখ্য যে, তেমন ক্ষেত্রে সার্বিক পরিবেশ-পরিস্থিতি গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করেই যথাযথ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা বাঞ্ছনীয়।

এটিও সত্য যে, ব্যবসা করার জন্য হাতে টাকা প্রয়োজন। সেজন্য ঋণ প্রয়োজন। যার নিকট থেকে ঋণ নেয়া হবে বিনিময়ে তাকে তো কিছু একটা দিতে হবে। সেটিই সূদ। এতে সমস্যা কোথায়?

সূদের সমস্যা বস্তুত সূদে নয়। এ ব্যবসার ধরণের কারণে এর সাথে যে অন্যায়-অত্যাচার করার একটি সম্পর্ক আছে সেটিই এর বড় সমস্যা। নৈতিক অবক্ষয়েরও একটি সম্পর্ক আছে। বিষয়গুলি আলোচনা করা হয়েছে।

ভূমি ব্যাবহারের কারণে ব্যবসা থেকে একটি প্রাপ্তি আছে। ভূমির ব্যাবহারকারীকে 'ভূমি'র বিপরীতে 'ভাড়া' দিতে হয়। এটি স্বীকৃত এবং এ বিষয়ে কোন দ্বিমত নেই। শ্রমিকের 'শ্রমে'র বিনিময়ে 'মজুরী' দিতে হয়। 'মূলধন' বিনিয়োগের কারণে প্রাপ্তি 'মুনাফা'। তাহলে ঋণের বিপরীতে সূদে আপত্তি বা সমস্যা কোথায়? ঋণদাতারও তো কিছু একটা পেতে হবে।

ভূমি, শ্রম, মূলধন ছাড়া যেমন ব্যবসা অচল, তেমনি ঋণ ছাড়াও তো ব্যবসা করা সম্ভব হয়ে ওঠে না বিশেষত বৃহৎ পরিসরে। ফলে জগতব্যাপি হাজার-হাজার, লক্ষ-কোটি মানুষের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করাও সম্ভব হয়ে উঠবে না। ঋণও হচ্ছে উৎপাদনের একটি গুরুত্বপূর্ণ হাতিয়ার। বৃহদাকারে কোন উদ্যেগ গ্রহণে ঋণ লাগবে আবার ক্ষুদ্র ঋণেরও প্রয়োজন আছে। অতএব 'ঋণে'র বিপরীতে প্রাপ্তি হিসেবে 'সূদ'ও থাকবে বা থাকতে হবে।

সূদের ক্ষেত্রে মূল সমস্যাটি কোথায় সেটি বুঝতে বা অনুধাবন করতে হবে। অতঃপর সে অনুযায়ী ব্যাবস্থা নিতে হবে। আবেগ দিয়ে নয়, এমনকি শাব্দিক অর্থ দিয়েও এসব জটিল বিষয় সাদামাটাভাবে বুঝলে হবে না। অন্তর্নিহিতের সমস্যা বুঝতে হবে।

বস্তুত ঋণ একটি অতি প্রয়োজনীয় বিষয়। বাস্তব জীবনে এর ভীষন চাহিদা আছে। ঋণে কোন সমস্যা নেই। অতএব ঋণের বিপরীতে প্রদেয় সূদেও কোন সমস্যা নেই বা থাকার কথা নয়। এর সাথে আল্লাহরও কোন সম্পর্ক নেই।

সূদের মূল সমস্যাটি হচ্ছে এর সাথে 'অন্যায় ও অত্যাচার' এর সংশ্লিষ্টতা এবং পার্শ্ব প্রতিক্রিয়াস্বরূপ নানান 'অনৈতিক কার্যকলাপ' সমাজে ছড়িয়ে পরার আশংকা। বিষয়গুলি ওপরে আলোচনা করা হয়েছে। মাত্রাতিরিক্ত হারে সূদ আদায় সবচেয়ে বড় অন্যায় এবং একই সঙ্গে অত্যাচারও।

সূদের ব্যবসার ধরণ ও প্রকৃতি অনুযায়ী 'অন্যায় ও অত্যাচার' বিষয়টি বলা যায় এর সাথে এক প্রকার অঙ্গাঅঙ্গিভাবে মিশে আছে। যাকে এ থেকে পৃথক করা সম্ভব হয়ে ওঠে না। কেননা ঋণদাতারও ঋণের অর্থ ফেরত পাওয়ার নিশ্চয়তা প্রয়োজন। তাদেরকেও নানান কৌশল অবলম্বন করতে হয়।

ঋণদাতা দুর্বল হলে ঋণের অর্থ ফেরত পাওয়ার নিশ্চয়তা থাকে না। ঋণের অর্থ ফেরত না দেয়ার মানসিকতাও অনেকের আছে।

অতএব সূদের ক্ষেত্রে এই জায়গাগুলিতে ন্যায্যতা বিধান ও সুশাসন প্রতিষ্ঠা করা বাঞ্ছনীয়। এখানে বিষয়ের সাথে সংশ্লিষ্ট মানুষদের তথা অর্থ ব্যবস্থা পরিচালনাকারী সংশ্লিষ্ট ব্যাক্তিবর্গ থেকে শুরু করে বিশেষায়িত ব্যাক্তিবর্গের অধিকতর কাজ করার সুযোগ আছে। সূদ নিষিদ্ধ বলতে বস্তুত মাত্রাতিরিক্ত ও ক্রমবর্ধমান হারে সূদ গ্রহণকেই নিষিদ্ধ করা হয়েছে (দ্রষ্টব্য আল-কোরআন ৩:১৩০)।

ওপরে আলোচিত সূদের নানাবিধ সমস্যার কারণে সূদকে নিষিদ্ধ করা হয়েছে। ভ্রাতৃত্ববোধ ও সহমর্মীতার চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে স্বর্গীয় এক অর্থনৈতিক ব্যাবস্থার ভিত্তি গড়ে তোলার জন্য দানকে তাই উৎসাহিত করা হয়েছে। যদিও জগতের সকল মানুষের মধ্যে তেমন মানসিকতা গড়ে তোলাও একটি কঠিন কাজ।

একটি দর্শন মানুষের চিন্তার জগতকে সমৃদ্ধ করে। নতুন পথ উন্মোচন করে দেয়। শুরুতে একটি চিন্তা বা ভাবনা থেকেই জগতের সুশৃংখল পরিচালনার কাজগুলি শুরু হয়। তাই একটি ভাল দর্শনের প্রচার-প্রচারণা করাও গুরুত্বপূর্ণ কাজ হিসেবে বিবেচিত হতে হবে।

দর্শনের প্রচার-প্রচারণার কাজেও অর্থের প্রয়োজন আছে। একটি ভাল দর্শন প্রতিষ্ঠা পেলে তার সুফল সকল মানুষই ভোগ করে। তাই একটি ভাল দর্শনের প্রচার-প্রচারণায় মানুষকে এগিয়ে আসতে হবে। এ পথে ব্যায়ও আল্লাহর পথে ব্যায়ের অন্তর্ভূক্ত বিষয়।

সূদের অর্থ নিয়ে এ ধরণের প্রচার-প্রচারণার কাজ করা যায় না বা করা সমীচীনও নয়। কেননা এমন ব্যায় করা হয় নিঃস্বার্থভাবে সকল মানুষের কল্যাণার্থে। মানুষের নিজেদেরকেই দর্শনের ভাল-মন্দ বুঝে স্বতঃস্ফুর্তভাবে এমন কাজে এগিয়ে আসতে হবে। এসব ক্ষেত্রে দানকেই উৎসাহিত করা হয়েছে। তাই এ লেখার প্রচার-প্রসারেও দানের অর্থকেই উৎসাহিত করা হচ্ছে।

▪ **২.২৮০.১** ঋণগ্রস্থ ব্যাক্তি যদি অভাবগ্রস্থ হয় তবে তাকে সচ্ছলতা আসা পর্যন্ত সময় দেয়া উচিত : বলা হচ্ছে যে, ঋণগ্রস্ত ব্যাক্তি অভাবগ্রস্ত হলে বা

ঋণ পরিশোধে অসমর্থ হলে তার ঋণ পরিশোধের সময় বৃদ্ধি করে দেয়া যেতে পারে। আয়াতের ভাষা থেকে বোঝা যায় যে এ বিষয়ে কোন বাধ্যবাধকতা আরোপ করা হয়নি। কেননা চুক্তি বা লেনদেনের শর্ত অনুযায়ী অর্থ যার প্রাপ্য তারও সেটি সময়মতো ফেরত পাওয়ার অধিকার আছে। সে সময়মতো তার প্রাপ্য চাইতেই পারে। নিয়মানুযায়ী ঋণদাতাকে ঋণগ্রহীতার সচ্ছলতা আসা পর্যন্ত সময় দিতে বাধ্য করা যায় না। তবে পরিস্থিতি বিবেচনায় মানবিক দৃষ্টিকোণ থেকে কাজটি করতে মানুষকে উদ্বুদ্ধ করা হয়েছে।

যিনি উদ্বুদ্ধ করেছেন এবং যারা তাঁকে ভালবাসে তারা নিজ উদ্যেগে তাঁর পছন্দনীয় কাজটি করবে। তাঁর প্রতি ভালবাসায় উদ্বুদ্ধ হয়ে করবে। তেমনটি আশা করা যায়। তবেই তো বিশ্বাসীর ঈমানী দৃঢ়তা প্রকাশ পাবে।

আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস ও ভালবাসা সৃষ্টি করা তাই দর্শনের নির্দেশাবলী প্রতিষ্ঠায় বড় ভূমিকা রাখে। অন্যথায় আইন দিয়েই সব কাজ সম্পন্ন করা যেত। কিন্তু আইন কি আজ পর্যন্ত আইন দিয়ে জগতের সকল আইনকে প্রতিষ্ঠার নিশ্চয়তা দিতে পেরেছে? তাই দর্শনের আদর্শকেও প্রতিষ্ঠার প্রয়োজনীয়তা আছে। আজও অধিকাংশ মানুষ সকল ক্ষেত্রেই ধর্মীয় দর্শন দ্বারা প্রভাবিত হয়ে ভাল কাজ করে। এখনও এটিরই প্রভাব বেশী। কিন্তু ধর্মীয় আদেশ-নিষেধকে পাশ কাটিয়ে ভূল পদক্ষেপ নেয়ার কারণে জগতে অনেক সমস্যার সৃষ্টি হচ্ছে।

কিছু মানুষ আল্লাহর নির্দেশনার ভূল ব্যাখ্যা, অপব্যাখ্যা দিয়ে অনৈতিক ও অন্যায় সুবিধা নিচ্ছে কিংবা অপকর্ম করছে সেটিও বর্তমানে একটি বড় সমস্যা হয়ে দাড়িয়েছে। অথচ তারা মনে করছে যে তারা ভাল কাজ করছে, সঠিক কাজ করছে। এসব কারণেও আজকাল অনেকে ধর্মের বিরুদ্ধাচারণ করে এবং একে পাশ কাটিয়ে যেতে চায়।

উল্লেখ্য যে, ঋণ পরিশোধে অসামর্থতার কারণে অভাবগ্রস্ত ঋণগ্রহীতার ঘরের আসবাব-পত্র ছিনিয়ে নেয়া অনৈতিক কাজ। বাস্তবে সূদের কারবারের এমনসব অনৈতিক ও অন্যায়-অত্যাচারের বৈশিষ্টের কারণেই সূদকে নিষিদ্ধ করা হয়েছে। এ ছাড়া সূদ নিষিদ্ধ হওয়ার অন্য কোন কারণ নেই। এগুলি পারস্পরিক সম্পর্ককেও নষ্ট করে। সমাজে এর মন্দ প্রভাব পড়ে। সবচেয়ে বড় অন্যায়-অত্যাচার হচ্ছে অতিরিক্ত হারে অর্থাৎ দ্বিগুণ, ত্রিগুণ, চতুর্গুণ বা চক্রবৃদ্ধিহারে

সূদ আদায় করা। সময় বৃদ্ধি করার সাথে দ্বিগুণ, ত্রিগুণ বা চক্রবৃদ্ধিহারে সূদ গ্রহণ করা বাঞ্ছনীয় নয়।

যারা ঋণের কারবার করে তারা অর্থ-সম্পদওয়ালা। তাদের সাথে সকল শক্তির জোগসাজশ থাকে। তারা অন্যায়-অত্যাচার করলেও বিচার পাওয়া যায় না। কিংবা বিচারের দুয়ার পর্যন্ত যাওয়ার সুযোগ ও সামর্থ অনেকের হয় না। অত্যাচারীতের পক্ষে দাড়াবার মতো কোন শক্তি বা উদ্যোগী মানুষ পাওয়া যায় না।

কোরআন অত্যাচারীতের পক্ষে নৈতিক শক্তি ও সমর্থন হয়ে কাজ করে। কোরআনের বাণী অত্যাচারীতের পক্ষে অত্যাচারীর বিরুদ্ধে একটি সতর্ক বার্তা। কেউ অত্যাচারী হয়ে উঠলে কোরআনের বাণী তাকে চাপের মুখে রাখে।

ঋণদাতাদেরকে অত্যাচারী না হয়ে মানবিক হওয়ার আহবান করা হয়েছে এ আয়াতে। ঋণগ্রস্ত ব্যাক্তি অভাবগ্রস্ত হলে বা ঋণ পরিশোধে অসমর্থ হলে তাকে ঋণ পরিশোধের সময় বৃদ্ধি করে দিতে বলা হয়েছে বা উৎসাহদান করা হয়েছে। সেক্ষেত্রে সূদ নেয়া নিষিদ্ধ। অতিরিক্ত সূদ নেয়ার তো প্রশ্নই আসে না। কোরআন তো সূদকেই নিষিদ্ধ করে দিয়েছে।

ঋণ পরিশোধের ক্ষেত্রে সময় বৃদ্ধি করে দেয়ার সুবিধা আছে যা উভয় পক্ষই পেতে পারে। এতে ঋণগ্রহীতা পুনরায় মেরুদন্ড সোজা করে দাড়াবার সুযোগ পায়। যথাযথভাবে ঋণ পরিশোধের সম্ভাবনা সৃষ্টি হয় বা অন্যভাবে বলা যায় যে, ঋণদাতার ঋণের অর্থ ফেরত পাওয়ার সম্ভাবনাও বৃদ্ধি পায়। উপরন্তু সদ্ভাব বজায় রেখে উভয় পক্ষের পারস্পরিক ব্যাবসায়িক সম্পর্ক দীর্ঘমেয়াদেও স্থায়িত্ব লাভ করে।

উল্লেখ্য যে, আজকাল অনেকে আল্লাহর এমন নির্দেশনার চাতুর্য্যপূর্ণ অপব্যাবহারও করছে। তাই বিষয়গুলি ভালভাবে যাচাই করারও প্রয়োজন আছে। সর্বক্ষেত্রেই সুশাসন প্রয়োজন এবং সুশাসনের প্রয়োজনে বহুমূখী ক্রসচেকিং এর ব্যাবস্থা থাকা বা উন্মুক্ত রাখা প্রয়োজন। অন্যথায় যাচাইকরণ কর্তৃপক্ষই দুর্নীতির আরেক নতুন ও শক্তিশালী আখড়ায় পরিণত হবে।

▪ **২.২৮০.২** আর যদি তোমরা ঋণ ক্ষমা করে দাও দান হিসেবে তবে তা খুবই উত্তম যদি তোমরা উপলব্ধি কর : যার সামর্থ আছে সে যদি প্রদত্ত

ঋণকে দান হিসেবে ক্ষমা করে দেয় তবে সেটি উত্তম। এ বিষয়ে সামর্থবানদেরকে এভাবে উদ্বুদ্ধ করা হয়েছে। যিনি বলেছেন এবং যারা তাঁকে ভালবাসে তারা তাঁর নির্দেশনার কারণে উদ্বুদ্ধ হয়ে তেমন কাজ করবে এমনটি আশা করা যায়। তবে বাধ্যবাধকতা আরোপ করা হয়নি। বিবেচনা করতে বলা হয়েছে। এতে পূণ্য আছে। যিনি করবেন তিনি সে বিশ্বাস থেকে করবেন। যিনি তা বিশ্বাস করে না সে তো বিশ্বাসীই নয়। সেক্ষেত্রে হয়তবা ঋণের অর্থ আদায়ে বিচার-সালিশে যেতে হতে পারে। নয়ত এ ব্যাবসার চারিত্রিক বৈশিষ্ট অনুযায়ী জোর-জবরদস্তী ও অত্যাচার করতে হতে পারে। যেসব কারণেই মূলত সূদকে নিষিদ্ধ করা হয়েছে। অতএব তা করা যাবে না।

ঋণগ্রস্থ ব্যাক্তি যদি অভাবগ্রস্থ হয় তবে তাকে সময় দিতে বলা হয়েছে। কিন্তু অভাবগ্রস্তের ঋণ যদি দান হিসেবে ক্ষমা করে দেয়া হয় সেটি আরও উত্তম। উত্তম কাজের প্রতিদানস্বরুপ পূণ্যের কথা বলা হয়। পূন্যের বা পুরস্কারের বার্তার মাধ্যমে সাধারণত কিছু কাজ করতে কিংবা কিছু কাজ না করতে উৎসাহ দেয়া হয়। পূণ্যের ফলাফল হচ্ছে অধিকতর প্রাপ্তি। স্বাচ্ছন্দময় প্রাপ্তি। সুখদায়ক অবস্থায় গমন। যা ভাল কাজের প্রতিদানস্বরুপ ইহকালেও মানুষ পেতে পারে কিংবা আল্লাহ পরকালেও পুরস্কৃত করতে পারেন।

সবাই পূন্যের পেছনে ছুটছে। পূন্যের কারণে আল্লাহ মানুষকে পুরস্কৃত করবেন। অথচ আল্লাহ বলা সত্বেও অধিকাংশ মানুষই নিজের অংশ ছাড়তে ইচ্ছুক হয় না।

যারা উপলব্ধিবোধ সম্পন্ন মানুষ তারা আল্লাহর উপদেশ শ্রবন করবে। তারা বিশ্বাস করে যে, আল্লাহর উপদেশ শ্রবন করার ফলাফলও উত্তম। আল্লাহও এমন মানুষদের প্রতি যথাসময়ে তেমনিভাবে ক্ষমাপ্রবন হবেন। ভেতরে সে আশাও জগরুক থাকে। সে আশায়েও অনেক তৃপ্তি থাকে। তৃপ্তি ও মানসিক শান্তি কেবলমাত্র অর্থ উপার্জনেই নয়। জীবনের আরও দিক আছে।

উল্লেখ্য যে, ঋণ পরিশোধের সময় বৃদ্ধি করা এবং ঋণকে দান হিসেবে মওকুফ করার বিষয়টি যাচাই-বাছাই সাপেক্ষে করতে হবে। এটি পরিস্থিতি বিবেচনা সাপেক্ষে করতে হবে। কেননা এ বাণীর সুবিধা নিতে অনেকে মিথ্যেভাবে তেমন দাবী করতে পারে। অতএব সেটি যাচাই করে দেখতে ও বুঝতে হবে। তবেই সেটি কার্যকর করা যেতে পারে।

আজকাল অনেকে এমন নির্দেশনার সুযোগ নিয়ে যোগসাজশেও অন্যায় কাজ করছে। বিশেষ করে সরকারী বা কোন প্রাতিষ্ঠানিক ঋণের তহবিলের ক্ষেত্রে এমনটি হতে দেখা যায়। আবার অনেককে অনেক অর্থ-বিত্তের মালিককরূপে দেখা যায়, কিন্তু সত্যিকার অর্থে তারা অনেক দায়-দেনার চাপের মধ্যে আছে বা থাকে। অথচ তারা অনেক ঐশ্বর্য্যশীল জীবন-যাপন করে। এগুলি অনৈতিক সুবিধা গ্রহণের পর্যায়ে পরে। সেক্ষেত্রে তারা এমন সুযোগ পেতে পারে না। কিন্তু বাস্তবে দেখা যাচ্ছে যে, অনেকেই তেমন সুযোগ পাচ্ছে বা নিচ্ছে, আবার কেউ তেমন সুযোগের ব্যাবস্থা করে দিচ্ছে। দুটোই অন্যায় কাজের মধ্যে পড়ে।

যদি ঋণ সংক্রান্ত কোন বিষয় আদালত পর্যন্ত গড়ায় বা আদালত যদি এমন কোন বিষয়ে হস্তক্ষেপ করে রায় প্রদান করে, তবে উভয়ের অবস্থা বিবেচনা করে যাচাই-বাছাই সাপেক্ষে সেটি করা বাঞ্ছনীয়। আদালত চাইলে এমন ক্ষেত্রে ঋণের আংশিক কিংবা পুরোটাই মওকুফ করে দিতে পারে। তবে ওপরে যে বিষয়গুলি তুলে ধরা হয়েছে বিশেষত যোগসাজশের বিষয় সেসবকেও বিবেচনায় নিতে হবে।

উল্লেখ্য যে, ইসলামী আদালত বলে পৃথক কোন আদালত থাকা উচিত নয়। সাধারণ ন্যায়-অন্যায় ও ইসলামী ন্যায়-অন্যায় পৃথক কোন বিষয় নয়। আল্লাহর বিবেচনায় অবশ্যই একটি চূড়ান্ত সত্য আছে। আদালত বিচার করবে সত্যের বা যথাযথতার দিক থেকে মানুষের ন্যায়-অন্যায় কাজের। ন্যায়-অন্যায় হিন্দু-মুসলিম, বৌদ্ধ-খ্রীষ্টানের জন্য পৃথক হতে পারে না। মানুষকে মানুষ হিসেবে দেখতে হবে। যদিও সামাজিক রীতি-নীতি, সংস্কৃতি ইত্যাদি বিষয়গুলিকে বিবেচনায় রাখতে হয়। তবে ধর্মীয় কোন আইনের ব্যাখ্যা যদি ন্যায় বা ন্যায্যতার পরিপন্থী হয় তবে সেটিও পরিত্যাজ্য।

আদালত ন্যায়-অন্যায়ের ভিত্তিতে মানুষের সমস্যার সমাধান করবে। অতএব কারও বা কোন গোষ্ঠীর জন্য আদালত পৃথক হওয়া বাঞ্ছনীয় নয়। আদালত একই আদালত এবং সেটি সকল মানুষের জন্যই হতে হবে। আদালতের কাজ সত্য ও ন্যায়কে সমুন্নত রাখা ও প্রতিষ্ঠা করা। আদালত ন্যায় প্রতিষ্ঠা করবে এটিই আল্লাহর দিক-নির্দেশনা এবং সকল আদালতকেই এ কাজটি যথাযথতা ও সততার সাথে করতে হবে। এটিই আল্লাহর আইনের বিচার। ন্যায় ভিন্ন আল্লাহর পৃথক কোন আইন নেই। ন্যায়ের প্রতিষ্ঠাই

আল্লাহর আইন। ন্যায় প্রতিষ্ঠায় স্থান-কাল-পাত্র অবশ্যই বিবেচ্য। আদালত সে বিষয়ে সুবিবেচনা করবে। নইলে আদালতকেও জবাবদিহি হতে হবে জনতার সম্মিলিত ইচ্ছের কাছে তথা আল্লাহর কাছে।

কেউ যদি নিজ বিশ্বাসের কারণে স্বেচ্ছায় কোন দর্শনের বিশ্বাসের মধ্যে থেকে বিচার প্রার্থী হতে চায়, তবে আদালতে তার জন্য বিশেষ ব্যাবস্থা রাখা যেতে পারে। কিন্তু দুই পক্ষের কোন এক পক্ষ যদি বিশেষ ব্যাবস্থায় বিচারে আপত্তি জানায়, কিংবা যদি দু'টি ভিন্ন ভিন্ন দর্শনের অনুসারীর মধ্যে বিচার কার্য পরিচালনা করতে হয়, সেক্ষেত্রে আদালত মানবীয় সাধারণ ন্যায়-অন্যায়ের নিয়মে বিচারকার্য পরিচালনা করবে।

উল্লেখ্য যে, কোরআনের অনেক বাণী সুনির্দিষ্ট পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে অবতীর্ণ হয়েছে। অতএব বাণীসমুহ ছিল তৎকালীন সময় ও পরিস্থিতির তাৎক্ষণিক ন্যায়সম্মত সমাধান। যা মানুষকে ন্যায়ের পথ প্রদর্শন করেছে বা বলা যায় পরিস্থিতি বিবেচনায় সর্বোচ্চ ন্যায়সম্মত সমাধান দিয়েছে। অতএব বুঝতে হবে যে, কোরআনের প্রকৃত দিক-নির্দেশনা হচ্ছে প্রতিটি ক্ষেত্রেই সম-সাময়িক পরিবেশ-পরিস্থিতিকে বিবেচনায় নিয়ে ন্যায়সম্মতভাবে সমস্যার সমাধান করা বা সমাধানের পথের সন্ধান করা। এটিই কোরআনের মূল দিক-নির্দেশনা। কেবল শাব্দিক, বাক্যিক কিংবা ব্যুৎপত্তিগত অর্থ দিয়ে কোরআনের বার্তাকে বুঝলে হবে না। এটি যেমন গ্রামার বা ব্যাকরণ বই নয়, তেমনি কোন বিজ্ঞান বইও নয়। এর অন্তর্নিহিত অর্থ বা মর্মার্থ বুঝতে হবে। বক্তব্যের নিয়তটিকে অনুধাবন করতে হবে।

ন্যায় প্রতিষ্ঠা পেলেই আল্লাহর নির্দেশনা কার্যকর হয় এবং সেটি হতে হবে স্থান-কাল ও পাত্রের বিবেচনায়। কোরআনে আল্লাহ নির্দিষ্ট পরিস্থিতিতে যে সমাধান প্রদান করেছেন তা করেছেন ন্যায়ের ওপর ভিত্তি করে। অতএব কোরআনের প্রকৃত নির্দেশনা হচ্ছে, 'ন্যায় প্রতিষ্ঠা করা'। হুবহু শাব্দিক অর্থ প্রতিষ্ঠা করা নয়।

ন্যায় কেবল আরব, গ্রীক কিংবা রোমান সমাজের নিয়ম দ্বারা চালিত নয়। সেটি চালিত হতে হবে মানুষের নিজ পরিবেশ, প্রকৃতি, অভ্যস্ততা, সংস্কৃতি, পরিস্থিতি ইত্যাদিকে বিবেচনায় নিয়ে। কোন রায় দ্বারা জনগণের সামষ্ঠিক অন্তর সত্যিকার অর্থে পরিতৃপ্ত হলে সেটিকে ন্যায়সম্মত বলা যেতে

পারে। অর্থাৎ জনগন কোন রায়কে ন্যায়সম্মত বলে মনে করে কিনা সে বিষয়টি গুরুত্বের সাথে বিবেচনায় নিতে হবে। যদিও এক্ষেত্রে কিছু ব্যাতিক্রমও থাকতে পারে সেটিও বিবেচ্য। তবে অবশ্যই কৃত্রিমভাবে সৃষ্টি করা কোন ন্যায়ের পক্ষকে বিবেচনা করে নয়। আর তাই এসব যাচাই-বাছাই করারও প্রক্রিয়াকে প্রতিষ্ঠা করতে হবে। অন্যথায় আদালতকেও তার রায়ের সপক্ষে যথাযথ যুক্তি বা প্রকৃত সত্য তুলে ধরতে হবে এবং জনসম্মুখে প্রকাশ করতে হবে। সর্বক্ষেত্রেই সুশাসন প্রয়োজন।

জগত চলমান। জগতের নিয়ম-রীতি, বিধি-বিধান পরিবর্তনশীল। সে কারণেই কোরআন মানুষের জন্য সার্বজনীন ও শাশ্বত দিক-নির্দেশনা। কোরআন মানুষকে শিক্ষা দিয়েছে যে পরিবেশ-পরিস্থিতি যেমনই হোক না কেন ন্যায়কে প্রতিষ্ঠা করতে হবে। ন্যায়কে সমুন্নত রাখতে হবে। ন্যায়কে ভূ-লুন্ঠিত করে গদবাধা কোন নিয়ম রক্ষা করার আদৌ কোন প্রয়োজন নেই। কোরআনের প্রতিটি বাণীর মর্মে মর্মে সে বার্তা রয়েছে। প্রসঙ্গক্রমে বিষয়গুলি আলোচনায় আসবে।

কোরআন সকল ক্ষেত্রে ন্যায়সম্মত সমাধানের কথা বলে। তৎকালে কোন একটি নির্দিষ্ট পরিস্থিতিতে কোরআন কি রায় দিয়েছে সেটি যেমন এক্ষেত্রে বিবেচ্য, তেমনি দিক-নির্দেশনারূপে অধিক বিবেচ্য হচ্ছে আক্ষরিক বাণী প্রতিষ্ঠা করা নয়, বরং ন্যায় প্রতিষ্ঠা করা। কোরআনের বাণীর শাশ্বততা ও সার্বজনীনতার ধারণার সাথে সম্পর্ক মূলত ন্যায্যতা প্রতিষ্ঠার। এটিই কোরআনের মূখ্য দিক-নির্দেশনা। কেবল শাব্দিক অর্থই নয়। ন্যায়টিই আসল বা মূল বিষয়। সেটিকেই প্রতিষ্ঠা করতে হবে স্থান-কাল ও পাত্রের বিবেচনায়।

এখানে সূদের প্রসঙ্গ আলোচিত হচ্ছে। ঋণগ্রস্ত ব্যাক্তি যদি যৌক্তিক কারণেও ঋণ পরিশোধে ব্যার্থ হয়, তথাপি দেখা যায় যে ঋণদাতা ঋণ গ্রহীতার ঘটি-বাটি, লোটা-কম্বল সব ছিনিয়ে নিয়ে তাদেরকে নিঃস্ব করে দেয়। নিঃস্বকে আরও নিঃস্ব করে দেয়। অভাবগ্রস্তকে আরও অভাবগ্রস্ত করে দেয়। মানবিক সম্পর্কের কোন মূল্য দেয় না। মূহুর্তেই চেহারা পাল্টে ফেলে। নতুনভাবে অধিকতর সামাজিক সমস্যার সৃষ্টি হয় এসব কারণে।

তাই ঋণ গ্রহীতার সত্যিকার অবস্থাকে বিবেচনায় নিয়ে তাকে আরও সময় দেয়া উচিত বলে বলা হয়েছে; যেন সে কর্ম ও শ্রম দিয়ে ঋণ পরিশোধ করতে

সমর্থ হয়। প্রয়োজনে আরও ঋণ দেয়া যেতে পারে। তবে অভাবগ্রস্থতার বিষয়টি সত্য কি-না সেটিও যাচাই করে দেখতে হবে। কেননা আজকাল অনেক বড় ঋণধারী বাস্তবে নিঃস্ব, কিন্তু ঋণের অর্থ দিয়ে আলীশান জীবন-যাপন করছে। তারা আল্লাহ প্রদত্ত একটি প্রয়োজনীয় সুযোগের চাতুর্যপূর্ণ ও অনৈতিক ব্যাবহার করে চলেছে এবং এটিকেও একটি নিয়মে পরিণত করেছে। হাজার-হাজার কিংবা লক্ষ-কোটি মানুষের সঞ্চয়ের টাকা নিজেরা লুটে-পুটে খাচ্ছে। অন্য কাউকে তা ব্যাবহার করার সুযোগও দিচ্ছে না। নানান নিয়ম, বিধি-বিধান ও নির্ণায়ক বা নির্ধারক নির্ধারণ করে পদে পদে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করা হচ্ছে। এগুলিও আর্থ-সামাজিক অন্যায় বা অত্যাচারের মধ্যে পরে। সর্বত্র সুশাসন প্রতিষ্ঠা করা তাই গুরুত্বের সাথে বিবেচ্য।

▪ **২.২৮১.১** এমন একদিনের বিপরীতে নিজেদেরকে রক্ষা কর যেদিন তোমরা আল্লাহর কাছে প্রত্যাবর্তিত হবে : আয়াতে এমন এক দিনের কথা বলা হয়েছে যেদিন মানুষ আল্লাহর কাছে প্রত্যাবর্তিত হবে। এটি সত্যি। এটি ঘটবেই। এ বার্তায় বিশ্বাস স্থাপন করার কথা বলা হয়েছে। এটি কোরআনের দর্শনের গুরুত্বপূর্ণ দিক।

এ বার্তার মাধ্যমে আল্লাহর কাছে জবাবদিহিতার বিষয়টি তুলে ধরা হয়েছে। একটি অবশ্যম্ভাবী বিচার দিবসের কথা বলা হয়েছে এবং সেই দিনের ভয়াবহতা থেকে নিজেদেরকে রক্ষা করার কথা ভাবতে বলা হয়েছে। অর্থাৎ প্রস্তুতি নিতে বলা হয়েছে যেন মানুষ সেই দিন আল্লাহর বিচারের হাত থেকে রক্ষা পেতে পারে। সে জন্য মানুষকে ভাল পথে চলতে বলা হয়েছে। আল্লাহ নির্দেশিত পথ মানুষকে সেদিনের বিপদ থেকে রক্ষা করতে পারে।

এমন সত্য পথ কেউ প্রদর্শন করেনি। আব্রাহামিক দর্শন ছাড়াও হিন্দু ধর্ম, বৌদ্ধ ধর্মেও কর্মফল সম্পর্কে বলা হয়েছে। কোরআন বলছে,

'... এমন কোন সম্প্রদায়/জাতি নেই যাদের মাঝে সতর্ককারী আসেনি (একই বার্তা নিয়ে)।' (আল-কোরআন ৩৫:২৪)

উপস্থাপনা যে যেভাবেই করুক না কেন মূল বক্তব্য একই। বোধসম্পন্ন ব্যাক্তিবর্গ বিষয়গুলিকে সেভাবেই দেখবেন। বিভিন্ন যুগ ও সময়ে অবতীর্ণ সব

বাণীর উপস্থাপন হুবহু একরকম হবে না বা হয় না। আমরা নিজেরাও একই কথা সবাই একইভাবে বলি না।

এ বার্তার মাধ্যমে মানুষকে সতর্ক করে দেয়া হয়েছে যে, তারা যেন পৃথিবীতে মন্দ কাজ না করে। আল্লাহ যা নিষেধ করেছেন তা না করে। আল্লাহ সূদকে নিষিদ্ধ করেছেন। অত্যাচার করতে নিষেধ করেছেন। অন্যায় কাজ করতে নিষেধ করেছেন। মানুষ যেন এসকল কাজ না করে তাই সতর্ক করা হয়েছে।

মানুষকে এ জন্যই আল্লাহতে ও সূরা বাকারার শুরুতে যেসব বিষয়ে বিশ্বাস রাখতে বলা হয়েছে তাতে বিশ্বাস স্থাপন করতে বলা হয়েছে। বিশ্বাস খুব গুরুত্বপূর্ণ। বিশ্বাসই আল্লাহর নির্দেশকে স্বতঃস্ফুর্ততার সাথে সমুন্নত রাখে। প্রতিটি বিশ্বাসী ব্যাক্তিই তার নিজেকে নিজে নিয়ন্ত্রন করে। বিচার দিবসে বিশ্বাস রাখা তাই অত্যান্ত গুরুত্বপূর্ণ। এখানে সে কথা স্মরণ করিয়ে দেয়া হয়েছে। অন্যায়-অত্যাচার করলে একদিন আল্লাহর কাছে জবাবদিহি হতে হবে। এসব বাণী মানুষকে মন্দ পথে চলতে সর্বপ্রথমেই মানসিকভাবে বাধা প্রদান করে এবং ভাল পথে চলতে উদ্বুদ্ধ করে।

■ **২.২৮১.২** অতঃপর প্রত্যেককেই পরিপূর্ণভাবে প্রদান করা হবে যা সে অর্জন করেছে এবং তাদের প্রতি কোনরুপ অবিচার করা হবে না : কোরআনে এমন বার্তা বহুবার উল্লেখ করা হয়েছে। মানুষের মনে একটি বিচার দিবসের সত্যতা বিষয়ে ভাবনার উদ্রেক করতে বারবার এ কথা স্মরণ করিয়ে দেয়া হয়েছে। এ বার্তায় বিশ্বাস করতে উদ্বুদ্ধ করা হয়েছে। মানুষকে তার মন্দ কর্মের পরিণাম ও তার ভয়াবহ পরিণতির বিষয়ে স্মরণ করিয়ে দেয়া হয়েছে। আবার আশ্বস্তও করা হয়েছে যে সেদিন কারও প্রতি কোনরকম অবিচার করা হবে না। বস্তুত আল্লাহ কখনই অবিচার করেন না। মন্দ বা নিষিদ্ধ কাজ না করলে কোন ভয় নেই।

বিচার দিবসে প্রত্যেকেই সে যা ভাল ও মন্দ কাজ করেছে তার অনুরুপ ফল পাবে। সেদিন কারও প্রতি অবিচার করা হবে না। এ বার্তা মন্দপথ অবলম্বনকারীদের জন্য যেমন সতর্কবার্তা, তেমনি সঠিক পথ অবলম্বনকারীদের মনে এটি আশার সঞ্চার করে।

এমন বার্তা ও আলোচনা জগতে থাকতেই হবে। অন্যথায় জীবন ও জগত ধীরে ধীরে মানুষের মন্দ মনোবৃত্তির পথে এগিয়ে যাবে যা গোটা জগতকে গ্রাস করবে। কোরআনের বার্তার আলোচনা ও এ বিষয়ক সকল ধরণের চর্চা তাই অব্যাহত থাকতে হবে। তবে ভূল, অপ্রয়োজনীয় ও অপব্যাখ্যাকে পরিহার করতে হবে। যারা তেমন করে তাদেরকে সচেতন করে গড়ে তুলতে হবে। অন্যথায় কঠোরভাবে দমন করতে হবে।

এটি এমন একটি আয়াত যা সার্বজনীন ও শাশ্বত। এ সতর্কবার্তা সকল বিষয়ের জন্যই প্রদত্ত। সকল কাজেই মানুষকে সতর্ক থাকতে হবে ও সঠিক পথে চলতে হবে। তবে এটিও প্রনিধানযোগ্য যে, এ আয়াতটি সূদের আয়াতের পরে উল্লেখ করা হয়েছে। বিশেষভাবে সূদের ক্ষেত্রে আল্লাহ যা বারণ করেছেন তা থেকে বিরত থাকতে এ আয়াতের মাধ্যমে সতর্কবার্তা দেয়া হয়েছে।

এটিও উল্লেখ্য যে, সূদ একটি পার্থিব কর্মকান্ডের অন্তর্ভূক্ত বিষয়। এর সাথে আল্লাহর কোন সম্পর্ক নেই। এর বৈধতা বা অবৈধতার সাথে আল্লাহর কোন লাভ বা ক্ষতি নেই। মানুষের ও জগতের মঙ্গলার্থে তিনি এ নির্দেশনা জারী করেছেন। কেননা এ ব্যবসার চারিত্রিক বৈশিষ্ট জীব ও জগতকে ধ্বংসের পথে নিয়ে যায় যা ওপরে আলোচনা করা হয়েছে।

ন্যায্যতা ভিন্ন ভারসাম্য রক্ষা হয় না। ভারসাম্যহীনতা পাহাড় পরিমাণ বৈষম্য সৃষ্টি করে যা জগত ধ্বংসের অন্যতম কারণ হয়ে উঠতে পারে। সূদের ব্যবসার মাধ্যমে সমাজে অন্যায় কার্যকলাপ প্রবেশ করে। বৈষম্য সৃষ্টি হয়। বস্তুত আল্লাহ সূদ নিষিদ্ধ করেননি। তিনি নিষিদ্ধ করেছেন অন্যায়কে যা যে কোন সময়ে ভয়ঙ্কর ও ভয়াবহ হয়ে ধ্বংসের কারণ হতে পারে।

যদি সূদের ব্যবসায়েও সুশাসন প্রতিষ্ঠিত থাকত তবে এটি নিষিদ্ধ হত না। আবার বৈধ নামে পরিচিত যে ‘ব্যবসা’- সেখানেও যখন অন্যায় প্রবেশ করে, সেটিও অবৈধ। অতএব সূদ কিংবা ব্যবসা এগুলি আদৌ কোন বিষয় নয়। বিষয় হচ্ছে ‘ন্যায়-অন্যায়’।

কেবল শাব্দিক অর্থ নয়। মর্মার্থ বুঝতে হবে এবং মর্মার্থের আলোকে আল্লাহ প্রদত্ত দিক-নির্দেশনাকে যুগোপযোগী করে প্রয়োগের ব্যাবস্থা নিতে হবে। আল্লাহ তাঁর ঐশী বাণীর মাধ্যমে আমাদেরকে মূলত ন্যায় পথে চলতে দিক-নির্দেশনা দিয়েছেন। অতএব কেবল শব্দের ওপর জোর দেয়ার সুযোগে সমাজে যেন

সুকৌশলে কোনপ্রকার অন্যায় প্রবেশ করতে না পারে সে বিষয়ে সতর্ক থাকতে হবে। কোন রকম চতুরতার আশ্রয় নেয়া যাবে না। যদি কেউ আল্লাহর বার্তাকে নিয়ে চাতুর্যপূর্ণ কোন কিছু করার চেষ্টা করে তবে বলা হচ্ছে যে, 'অতঃপর প্রত্যেককেই পরিপূর্ণভাবে প্রদান করা হবে যা সে অর্জন করেছে এবং তাদের প্রতি কোনরূপ অবিচার করা হবে না।'

সঠিক পথ অবলম্বনকারীদের প্রতি যেমন অবিচার করা হবে না, তেমনি পথচ্যুতদের বিচারও যথাযথভাবে হবে। সেখানেও অবিচার হবে না। যার যার কর্মের প্রাপ্য সে সে যথাযথভাবে পাবে। ভূল পথগামীদেরকে যদি তাদের প্রাপ্য শাস্তি না দেয়া হয়, তবে সেটিও হবে সঠিক পথ অবলম্বনকারীদের প্রতি অবিচার। তাদেরকে তাদের ত্রুটির চেয়ে অধিক শাস্তি দিলে সেটিও হবে অবিচার। কিন্তু কারও প্রতিই সেদিন কোন অবিচার করা হবে না। বিশ্বাসীকে আল্লাহর বিচার ব্যাবস্থায় নির্দ্বিধায় বিশ্বাস ও ভরসা রাখতেই হবে।

এতদ্বসত্বেও উল্লেখ্য ও মনে রাখা বাঞ্ছনীয় যে, আল্লাহ সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী। তিনি যে কাউকে ক্ষমা করতে পারেন। তাঁর ক্ষমার মধ্যেও সার্বিক বিষয়ের বিবেচনা অন্তর্ভূক্ত আছে যা কেবলমাত্র তিনিই জানেন। সেখানেও কোন অবিচার নেই।

জগতে যা কিছু ঘটে তা তার বিষয় ও উপাদানের নিয়ম অনুযায়ী ঘটে, যা ঘটে পরিবেশ ও পরিস্থিতির মিথস্ক্রিয়ার ফলে। সাধারণ মানুষ সাধারণ নিয়মগুলি জানে। তাই ব্যাতিক্রমগুলি বুঝতে পারে না বা বুঝতে চেষ্টা করে না। এতদ্বসত্বেও নিয়মে থেকেও যখন সাধারণ নিয়মের ব্যাতিক্রম তথা অনিয়ম ঘটে বা কোন ভূল হয়, সেটি তার ফল ভোগ করে জাগতিক সাধারণ নিয়মের বিবেচনায়। কিন্তু 'একজন' সব নিয়ম জানেন। তাই ক্ষমার বিষয়টি একচ্ছত্র 'তাঁর' বিবেচনার অধীন।

- **একটি উপসংহার (One conclution)**

একটু ভিন্নভাবে ভাবি। যদি সূদের নাম 'মুনাফা' এবং মুনাফার নাম 'সূদ' করে দেয়া হয়, তবে কি সূদের নিষিদ্ধতাজনিত যে সমস্যা তার সমাধান সম্ভব হবে? কথায় বলে,

- 'বৃক্ষ তোমার নাম কি'?

– 'ফলে পরিচয়'।

নামের পরিবর্তনে এ সমস্যার সমাধান হবে না। কেননা সমস্যাটি বস্তুত নামের মধ্যে নয়। সমস্যা এর কর্ম বা কর্মজাত ফলাফলে। তাই কোন বাণী বা বক্তব্যের মর্মার্থ বোঝা অতীব গুরুত্বপূর্ণ। কেন সূদ নিষিদ্ধ? কেন ব্যাবসা নিষিদ্ধ নয়? অন্তর্নিহিতে কি কারণ লুকিয়ে অছে?

কেবলমাত্র নামের কারণেই কোন কিছু নিষিদ্ধ হয় না বা হতে পারে না। মুনাফার নাম সূদ করে দিলে কি মুনাফা নিষিদ্ধ হয়ে যাবে? কিংবা সূদের নাম মুনাফা করে দিলে কি সূদের নিষিদ্ধতা উঠে যাবে?

সমস্যটি নামে নয়। অতএব সূদ নামটিও নিষিদ্ধ নয়। তাই সূদ নাম শুনলে আঁতকে ওঠারও কিছু নেই। বুঝতে হবে যে, প্রকৃতপক্ষে নিষিদ্ধ হচ্ছে সূদের কর্মজাত ফলাফল বা সূদজনিত কারণে সৃষ্ট আর্থ-সামাজিক সমস্যাগুলি। সমস্যাগুলি যেহেতু সূদ থেকে সৃষ্ট তাই সূদ নিষিদ্ধ হয়েছে। অতএব সূদ নিষিদ্ধতার কারণটিকে গভীরভাবে ও যথাযথতার সাথে এ বাণীর অন্তর্নিহিত অর্থ থেকে বুঝে নিতে হবে।

কোন কিছু নিষিদ্ধ হতে হলে সেটি হতে হবে তার কর্মজাত ফলাফলের দিককে বিবেচনায় নিয়ে। অর্থাৎ বিষয়টির ভাল-মন্দ ফলাফল বা তার প্রভাবকে বিবেচনায় নিয়ে এবং সেটি অবশ্যই হতে হবে কোন যৌক্তিক ভিত্তির ওপর ভর করে। অর্থাৎ সত্যের বা কোন অবধারিত সূত্রের ভিত্তির ওপর বিষয়টিকে প্রতিষ্ঠিত হতে হবে।

আল্লাহ জগত সৃষ্টি করেছেন সত্যকে ভিত্তি করে। তিনি মহা বিজ্ঞানময়। সব কিছুর পেছনে সত্য আছে। আছে সূত্র। সে সূত্রকে খুঁজে পেতে হবে। তবেই সত্যের নাগাল পাওয়া যাবে। সূদ নিষিদ্ধে আল্লাহর নির্দেশনায় কোন ত্রুটি নেই। কিন্তু মানুষের উপলব্ধিবোধ ও গৃহীত পদক্ষেপে ত্রুটি থাকতে পারে।

আল্লাহ মহাকাশ নিয়েও মানুষকে গবেষনা করতে উৎসাহিত করেছেন। গবেষনা ব্যাতিত কি সেক্ষেত্রে কোন কিছু অর্জন করা সম্ভব ছিল? সূদের ক্ষেত্রেও ঠিক তেমনিভাবে মূল সূত্রটি খুঁজে পাওয়ার চেষ্টা করতে হবে। অর্থাৎ সমস্যাটি কোথায় এবং এর সমাধানের সূত্রটি কি সেটি খুঁজে পেতে হবে? কেবল সূদ নামধারী কোন কিছুকে নিষিদ্ধ করলেই এ সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে না। কেননা শ্রমিকের যেমন শ্রমের বিপরীতে প্রাপ্য তার মজুরী, ঠিক

তেমনি ঋণদাতারও প্রদত্ত ঋণের বিপরীতে প্রাপ্য তার সূদ। অন্যথায় কেন একজন ঋণ দিতে যাবে? তার প্রাপ্তি কি?

সূদের নানাবিধ সমস্যার কারণে সূদকে নিষিদ্ধ করে ভ্রাতৃত্ববোধ ও সহমর্মীতার চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে স্বর্গীয় এক অর্থনৈতিক ব্যাবস্থা সৃষ্টির ভিত্তিস্বরূপ দানের কথা বলা হয়েছে। কিন্তু জগতের সকল মানুষের মধ্যে তেমন মানসিকতা ও চেতনা গড়ে তোলাও সহজসাধ্য নয়। যতদিন স্বর্গীয় ব্যাবস্থা গড়ে না উঠছে ততদিন বিকল্প থাকবেই। তবে লক্ষ্য সেটি থাকতে পারে।

সূদে টাকা লগ্নি করলে বাড়তি আয় আসে। ব্যবসায় দ্রব্য ক্রয়-বিক্রয় করলেও বাড়তি আয় হয়। উভয়টিতেই কোন না কোনভাবে ফলাফল এক। অর্থাৎ আয়-উপার্জন হয় বা হাতে বাড়তি টাকা আসে।

বলা হচ্ছে, 'আল্লাহ ক্রয়-বিক্রয়কে বৈধ করেছেন এবং সুদকে নিষিদ্ধ করেছেন'। তাহলে খাদ্য মজুদ করে ক্রয়-বিক্রয়ের মাধ্যমে অতিরিক্ত মুনাফা অর্জন করা কি এ কারণে নিয়মসিদ্ধ হবে যে এর নাম সূদ নয় ব্যবসা? কৃত্রিম সংকট সৃষ্টি করে দ্রব্যের মূল্য বৃদ্ধি করার মাধ্যমে অতিরিক্ত মুনাফা অর্জন করা কি শুধু এ কারণে নিয়মসিদ্ধ হবে যে এর নাম ব্যবসা? এগুলি তো ব্যবসা নামেই পরিচিত!

এ বিষয়ে সবাই একমত যে, এগুলি ব্যবসা নামে পরিচিত হলেও নিয়মসিদ্ধ নয়। এসব কাজও সূদের মতোই নিষিদ্ধ যদিও এগুলি ব্যবসা নামে পরিচিত।

অতএব কেবল ব্যবসা নাম হলেও তা হালাল হয়ে যায় না। নামের কারণে কোন কিছু হালাল বা হারম হয় না। নীতি-নৈতিকতাবোধ না থাকলে কোন কিছুই হালাল নয়। শুধু সূদ নয় তেমন ক্ষেত্রে ব্যবসাও হারাম।

কি ব্যবসা, কি মুনাফা, কি ঋণ, কি সূদ সবই হারাম যদি সুশাসন না থাকে। অতএব সর্বত্র সুশাসন থাকতে হবে বা প্রতিষ্ঠা করতে হবে। জীবন ও জগতের মঙ্গলের চিন্তা থাকতে হবে। ক্ষতিকারক দিক আছে কিনা সেসব ভাবতে হবে। উপকারীতা আছে কিনা ভাবতে হবে। অপকারীতা আছে কিনা তাও ভাবতে হবে।

নাম ব্যবসা হলেই যেমন কোনকিছু হালাল হয়ে যায় না, তেমনি নাম সূদ হলেই সেটি হারাম হয়ে যাবে না। কর্মজাত ফলাফল যাচাই করে দেখতে হবে। দেখতে হবে উপকারীতা-অপকারীতা কি আছে। ন্যায়-অন্যায় কি আছে।

সূদের মন্দ দিক আছে। ওপরে আলোচনা করা হয়েছে। ভাল দিকও আছে। আলোচনায় আসবে। আবার যে কারণে সূদ হারাম হয়েছে সে একই কারণে ব্যবসাও হারাম হতে পারে, যদি ব্যবসার মধ্য দিয়ে অতি বুদ্ধিমানেরা সূদের মতোই কিংবা তার চেয়েও অধিক অর্থ উপার্জন করে। অর্থাৎ একই কাজ করে।

অতি মুনাফা করাও নিষিদ্ধ। মুনাফার ক্ষেত্রেও ন্যায্যতা থাকতে হবে। অথচ মুনাফার নামেও বর্তমানে সুকৌশলে অন্যায়-অত্যাচার করা হচ্ছে। কোথাও কেউ নেই যে এসব নিয়ে কথা বলবে। যাদেরকে কথা বলতে দেয়া হয়েছে তারাও সুবিধার ভাগীদার। তারা কেবল নিজেদের অংশ নিশ্চিত করছে। কিছু লোক তাই সূদের কর্মজাত ফলাফলই ভোগ করছে মুনাফার নামে।

সূদের নামে প্রকাশ্যে যা করা হয়, চতুর লোকেরা গোপনে-নিভৃতে, অগোচরে-অলক্ষে ব্যবসা নাম দিয়েও তাই করে। অতি ভদ্রবেশী বিশ্বাসী তাতেই সন্তুষ্ট। কেননা এখন আর কেউ সূদ খাচ্ছে না। সবাই এখন পবিত্র ব্যবসা করছে। বিশ্বাসীরা বিজয় অর্জন করেছে!!

ওপরে সূদ নামে যেসব মন্দ দিক তুলে ধরা হয়েছে নিঃসন্দেহে তা সমাজের জন্য খারাপ। বৃহৎ পরিসরে বিশ্ব সমাজ ব্যাবস্থার জন্যও খারাপ। যা কিনা পার্থিব জীবনকে এক স্বর্গীয় জীবন ব্যাবস্থায় পরিগনিত করার ক্ষেত্রে প্রধান অন্তরায়। তাই সূদকে হারাম গণ্য করা হয়েছে এবং সেসব বন্ধ হতেই হবে।

ওপরে মজুত নামে অতিরিক্ত মুনাফা আদায়ের লক্ষ্যে যে ব্যবসার কথা বলা হয়েছে সেটিও খারাপ। কিংবা আবহাওয়ার ভাল-মন্দের ওপর নির্ভর করে দ্রব্যের চড়া মূল্য আদায় করা সেটিও সঠিক কাজ নয় বরং খারাপ। খাদ্যশস্য অতিরিক্ত লাভের আশায় মজুত করে রাখাও নিষিদ্ধ। এগুলি সবই ব্যবসায়ের সুশাসনের অভাবজনিত কারণ থেকে সৃষ্ট।

ব্যবসায়ে সুশাসনের অভাবজনিত কারণে কিছু ব্যবসা যেমন নিষিদ্ধ হতে পারে তেমনি সূদের ক্ষেত্রেও হতে পারে। সূদ বা রিবার সমস্যাও সুশাসনজনিত। কিন্তু সমাজে কোন কিছু বা কোন কথা একবার চালু হয়ে

গেলে বা প্রচলন হয়ে গেলে সে ভূল ধারণা থেকে মানুষকে মুক্ত করে আনা খুব সহজ কাজ নয়। সূদের ক্ষেত্রেও এখন তাই হচ্ছে।

যারা বুদ্ধিমান বা অন্যকথায় ধূর্ত তারা চিরকালই সবদিক থেকে লাভবান। তারা তাদের দ্রব্যের বিক্রয় বৃদ্ধি করার জন্য মুসলিম ক্রেতা সংগ্রহ করে। সূদের বিপক্ষে কথা বলে। কিন্তু মুনাফা করে তিনগুণ, চারগুণ থেকেও অনেক অনেক বেশী। যে হার সুনির্দিষ্টভাবে সূদের ক্ষেত্রে পবিত্র কোরআনে নিষিদ্ধ করে দেয়া হয়েছে।

বস্তুত ভেতরে অংক আছে। হিসাববিদেরা সব জানে। আগে যেমন পুরোহিতেরা রাজার কার্যকলাপের বৈধতা দিত, কর্পোরেট জগতে এখন সে কাজ করে হিসাববিদেরা। তারাও লাভবান। অধিক বেতন পায়। ঐ বেতনের যৌক্তিকতাও তারা নির্ধারণ করে। এসবের মূল রহস্য বের করে আনা সহজ কাজ নয়।

অতিরিক্ত সূদ আদায় যেমন হারাম, অতিরিক্ত মুনাফা করাও হারাম। কোরআনে মুনাফার ক্ষেত্রে অতিরিক্ত শব্দটি ব্যাবহার করা হয়নি বলে এটি বৈধ নয়। এভাবে সুযোগ নেয়া যাবে না। কোরআন হচ্ছে দিক-নির্দেশনা। দিক-নির্দেশনাকে হুবহু শাব্দিক অর্থে বা ব্যাকরণগত বা ব্যুৎপত্তিগত অর্থের দিক থেকে বুঝলে চলবে না। কোরআনের দিক-নির্দেশনা যে অকল্যাণের কারণে সূদকে নিষিদ্ধ করেছে, সে একই অকল্যাণ যদি চতুরতার আশ্রয় নিয়ে হালাল কাজের মধ্য দিয়ে করা হয় তবে সেটিও হারাম।

উল্লেখ্য যে, এক সময় ইহুদিদের জন্য চর্বি হারাম করা হয়েছিল (আল-কোরআন ৬:১৪৬)। তাদের মধ্যে কিছু বুদ্ধিমান লোক চর্বি গলিয়ে ব্যবসা করত। কেননা গলিত চর্বি তো নিষিদ্ধ করা হয়নি। তবে কি এটি চতুরতা নয়? এটা কি আরোপিত নিয়ম অনুযায়ী বৈধ?

সাব্বাথ দিবসে ইহুদিদের জন্য নদী থেকে মাছ আহরণ করা নিষিদ্ধ ছিল। তাদের মধ্যে কিছু চতুর লোক নদীর সঙ্গে খালের চিকন সংযোগ তৈরী করে শিকারের জন্য বৈধ দিবসে মাছকে পুকুরে নিয়ে আসত। অতঃপর সাব্বাথ দিবসেও সেখান থেকে শিকার করত। যুক্তি হচ্ছে, সাব্বাথ দিবসে তো তারা নদী থেকে মাছ শিকার করছে না। এটি কি আরোপিত নিয়ম অনুযায়ী বৈধ

নাকি চতুরতা? চতুরতা করে হারামকে হালাল এবং হালালকে হারাম করাও হারাম। বলা হচ্ছে,

‘হে বিশ্বাসীগণ! তোমরা সুদ নিও না দ্বিগুণ, চতুর্গুন ক্রমবর্ধমান হারে। ...।’ (আল-কোরআন ৩:১৩০)

সূদ দিয়ে যা করার কারণে সূদ হারাম হয়েছে কিছু বুদ্ধিমান মানুষ এখন সে একই অর্থ মানুষের নিকট থেকে হালাল ব্যবসা বা মুনাফার নামে আদায় করে নিচ্ছে। এ ব্যবসা কি বৈধ? এটা কি চতুরতা নয়?

সমস্যাটি নামে নয়; যে কোনভাবে এর সুশাসনে। ইসলাম প্রকৃত অর্থে মানব কল্যাণের চিন্তা থেকে এ দুষ্ট কাজগুলি নিষিদ্ধ করেছে। অতএব মর্মার্থ ভালভাবে বুঝতে হবে। নয়ত সূদ হারাম বলে যারা এ বিষয়ে শাব্দিক অর্থে অনড়তা প্রদর্শন করবে, তারা মূলত তাদের অনড়তা দিয়ে দুষ্টদেরকেই প্রকারান্তরে সহায়তা করবে। নয়ত এদের ভেতরেও অতি মুনাফাখোরদের সহায়তাকারী আছে বা সুবিধাভোগী আছে বলে ভাবা যেতে পারে।

বিষয়টিকে দলের মধ্যে ‘কাউয়া’ প্রবেশ করেছে এভাবেও বলা যেতে পারে। এরা যে কোনভাবে যে কোন উপায়ে ছলচাতুরী করে নিজেরাই লাভবান হতে চায়। তা সে সূদের নামেই হোক আর ব্যবসার নামেই হোক।

বর্তমান সময়টা তো দুষ্টুমির চরম পর্যায়ে উপনীত হয়েছে। অর্থের প্রবাহ ব্যবসায়ের দিকে হলে চতুর লোকেরা ব্যবসা করে। অর্থের প্রবাহ সংস্কৃতির দিকে হলে এরা সংস্কৃতির চর্চা করে। তাই এখন যারা নিয়ম, বিধি-বিধান বিষয়ে কথা বলে তারাও বিত্তশালী কিনা কিংবা তাদের পৃষ্ঠপোষকগণ বিত্তশালী কিনা সেগুলিও যাচাই করে দেখা দরকার।

কোরআনে সূদের নিষিদ্ধতা বিষয়ে বিবিধ আলোচনায় যেসব যুক্তি উত্থাপন করে কথা বলা হয়, তার অধিকাংশই ক্ষুদ্র আঙ্গিক বিবেচনা করে বলা হয়। যেমন ব্যাক্তি পর্যায়ের ঋণদাতা নিয়ে কথা বলা হয়। সূদ বা রিবা যখন নিষিদ্ধ করা হয়েছে তখন ব্যাক্তিক পর্যায়ের ঋণদাতাদের বিষয় ভাবনায় রেখেই তা করা হয়েছে। তখনও মানুষ বৃহৎ পরিসরে জগতব্যাপী ভাবনা ভাবতে অভ্যস্ত হয়ে ওঠেনি।

বর্তমান সময়ের এই এক গ্রাম পৃথিবীর যুগে সেভাবে ভাববার এখন আর অবকাশ নেই। বৃহৎ আঙ্গিকে ব্যাংকিং ব্যাবস্থা, বীমা, পুঁজিবাজার নিঃসন্দেহে প্রয়োজনীয় ও অপরিহার্য। এগুলির সাথে ইসলামের বিধি-নিষেধের কোন সংঘর্ষ নেই। কিন্তু ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ বা বোঝার ক্ষেত্রে ভূল আছে। এগুলি অর্থনীতির সাথে সম্পর্কিত বিষয়। অর্থনীতিও এক বিজ্ঞান। কোরআন সত্যের পথের ধারক। এ জগত সত্যের ভিত্তির ওপর সৃষ্ট ও প্রতির্ষ্ঠিত। সবখানে আছে সূত্র। বৈজ্ঞানিক সন্ধান ব্যাতিত সত্যকে খুঁজে পাওয়া যাবে না। কোরআন সত্যের সন্ধানকে নিষেধ করেনি, বরং উৎসাহিত করেছে। কোরআন কি নিষেধ করেছে, কেন নিষেধ করেছে সেসবকেও যথাযথভাবে বুঝতে হবে।

যে আমলে কোরআন অবতীর্ণ হয়েছে সে সময়ে অর্থনীতির এতসব ব্যাবস্থা বিদ্যমান থাকলে এতদিনে সমস্যার সমাধান হয়ে যেত। কোন ভূল ব্যাখ্যা বা প্রথা একবার প্রচলিত হয়ে গেলে বা অন্যকথায় মস্তিষ্কে ঢুকে গেলে ঐ প্রজন্ম নিঃশেষ না হওয়া পর্যন্ত চলতেই থাকে। আর তাতে না হলেও পরিবর্তনের সূচনা হতে কমপক্ষে চল্লিশ বছর সময় লেগে যায়। অপেক্ষার বিকল্প নেই, সুশিক্ষারও বিকল্প নেই।

ব্যাংক, বীমা, পুঁজিবাজার এসব ব্যাবস্থা তৎকালীন সময়ে বিদ্যমান থাকলে অনেক সাহাবারাও এসবের পক্ষে কথা বলত। সে যুগে এসব ব্যাবস্থা না থাকার কারণে তুলনামূলকভাবে ভাল ও ন্যায়সম্মত সমাধান যুগের উপযোগী করে কোরআনে তুলে ধরা হয়েছে।

উদাহরণস্বরূপ বলা যেতে পারে যে, মুখ গহব্বর দুর্গন্ধমুক্ত ও পরিস্কার রাখার জন্য সে সময়ের সর্বশ্রেষ্ট পদ্ধতি হিসেবে মেসওয়াক ব্যাবহার করতে বলা হয়েছে। আবেগপ্রবন গোষ্ঠী আধুনিক যুগেও এখন সেটিই অনুসরণ করে চলেছে সওয়াব অর্জনের জন্য। অথচ সে সময়ে ক্লোজআপ থাকলে সাহাবারা হয়তবা সেটিই ব্যাবহার করতেন।

বস্তুত মেসওয়াক করা সুন্নত নয়। সুন্নত হচ্ছে মুখগহ্বরকে যথাযথভাবে পরিস্কার ও দুর্গন্ধমুক্ত রাখা। শাব্দিক অর্থই সব নয়। চোখের দেখাই সব নয়। মর্মার্থ অনুধাবন করতে হবে।

ব্যবসা হচ্ছে উৎপাদিত পণ্যের ক্রয়-বিক্রয়। কোন দ্রব্য উৎপাদন করতে হলে একজন উদ্যেক্তা লাগে। একজন ভাল উদ্যোক্তা অত্যান্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়।

উদ্যোক্তা ভিন্ন কোন কাজ শুরুই করা সম্ভব হয় না। উদ্যোক্তাই সমস্ত কার্যকলাপকে রেলের ইঞ্জিনের মতো টেনে নিয়ে যায়। তার ভেতরে থাকে জ্ঞান, প্রাণের উচ্ছাস, উদ্যাম, স্বতঃস্ফুর্ততা, পরিকল্পনা, লক্ষ্য এবং সর্বপরি সমাজ ও মানুষের হিত সাধনের চিন্তা।

উদ্যোক্তা একা সব কাজ করতে পারে না। তার সহায়ক বাহিনী লাগে। লাগে কর্মী বাহিনী বা শ্রমিক। উৎপাদনে যেতে হলে প্রয়োজনীয় স্থাপনা স্থাপনের জন্য প্রয়োজন একখন্ড ভূমি বা জমি। সব থাকা সত্বেও কাজ করা সম্ভব হয় না যদি না থাকে মূলধন। কিন্তু বৃহৎ কাজে মূলধন কোথা থেকে আসবে? একক ব্যাক্তির পক্ষে কি বৃহৎ কাজে একা মূলধন সরবরাহ করা সম্ভব? অতএব প্রয়োজন ঋণ।

ব্যবসা থেকে একজন উদ্যোক্তার প্রাপ্য 'মুনাফা'। শ্রমিকের প্রাপ্য 'মজুরী'। ভূমির মালিক পায় 'ভাড়া'। যিনি ব্যবসায়ের অত্যান্ত গুরুত্বপূর্ণ উপাদান মূলধন যোগান দেবেন তিনি কি কিছুই পাবেন না? সেটিও কি ন্যায়সম্মত?

ঋণের সূদের কারবারের পেছনে অনেক অন্যায় ও অপকর্ম আছে ওপরে আলোচনা করা হয়েছে। কিন্তু যে মূলধন ছাড়া ব্যবসাই শুরু করা সম্ভব হয় না সে মূলধনের যোগানদাতা কিছুই পাবে না সেটিও তো ন্যায়সম্মত হতে পারে না।

উদ্যোক্তাকে যিনি মূলধন সরবরাহ করেন সেটি তিনি করেন ঋণ আকারে। আর ঋণের বিপরীতে তার প্রাপ্য হচ্ছে 'সূদ'। এটি তার অংশ। এর যৌক্তিক ভিত্তি আছে। বিজ্ঞানসম্মত। সূত্রের ওপর প্রতিষ্ঠিত। ফলে সূদ নামক নামটি কি করে নিষিদ্ধ হতে পারে?

নিষিদ্ধ হচ্ছে সূদের কারণে সৃষ্ট অন্যায় ও অনৈতিক কাজসমূহ, যার প্রভাব বা ফলাফল আর্থ-সামাজিক এমনকি নৈতিক দিক থেকেও মন্দ। আর সে কারণে সূদকে নিষিদ্ধ করা হয়েছে। অর্থাৎ যখন কোনকিছু নীতি বিবর্জিতভাবে কাজ করে, অতিরিক্ত অর্থ আদায় করে, অর্থ আদায়ে মানবতা ভূ-লুন্ঠিত হতে দেয় তখন সেটি নিষিদ্ধ। কিন্তু সেটি সূদ নয়, বরং সূদের ব্যাবস্থাপনার সুশাসনের সাথে সম্পর্কিত বিষয়। সুশাসনের অভাবজনিত কারণে ব্যবসাও কোন কোন ক্ষেত্রে নিষিদ্ধ। অতএব শুধু সূদই হারাম না। নীতি-নৈতিকতা বিবর্জিত সব কাজই হারাম। এমনকি ব্যবসাও।

কোরআনের বক্তব্যের অন্তর্নিহিত অর্থ বুঝে সেভাবে কাজ করতে হবে। ‘ইন্নামাল আমালু বিন নিয়ত’। নিয়তের ওপরই সবকিছু নির্ভর করে।

- **করণীয় কি (What to do)?**

সূদকে নিষিদ্ধ করে পরবর্তী করণীয় বিষয়ে বিভিন্ন আলোচনা ও ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণে সাধারণত যেসব পরামর্শ দেয়া হয় সেগুলি এ আলোচনায় তুলে ধরা প্রয়োজন বলে মনে করি। কেননা কোন বিকল্প ব্যাবস্থা না করে বিদ্যমান কোন ব্যাবস্থাকে বন্ধ করে দেয়া যায় না। তাতে ভাল-মন্দ পরের কথা চলমান জীবন ব্যাবস্থাই রুদ্ধ হয়ে যাবে।

এ বিষয়ে আলোচনার প্রথমেই বুঝতে হবে যে ঋণ কিভাবে দেয়া সম্ভব হয়? ঋণ দিতে হলে অবশ্যই কোন না কোনভাবে অর্থ একটি জায়গায় সঞ্চিত, জমাকৃত বা স্তুপিকৃত হতে হবে। জমাকৃত অর্থ হতে হবে উদ্বৃত্ত বা অলস, যে অর্থ দৈনন্দিন ব্যাবহারের কাজে অর্থের মালিকের প্রয়োজন হচ্ছে না। তবেই সে জমাকৃত অর্থ থেকে অন্যকে ঋণ বরাদ্দ দেয়া সম্ভব হতে পারে।

ব্যাক্তি ঋণদাতা তার ব্যাক্তিগত সঞ্চিত বা উদ্বৃত্ত অর্থ দিয়ে ঋণের কারবার করে। কিন্তু এটি খুবই ক্ষুদ্র আঙ্গিকে হয়ে থাকে। বর্তমান বৈশ্বিক অর্থনৈতিক ভাবনার দিক থেকে বা বৃহৎ অর্থ বা মূলধন সরবরাহের বিবেচনার দিক থেকে যা ধর্তব্যের মধ্যে পরে না। কোরআনে যে সময়ে সূদকে নিষিদ্ধ করা হয়েছে সে সময়ে ব্যাক্তিক বা অত্যান্ত ক্ষুদ্র পর্যায়ের কারবারকে বিবেচনা করে তা করা হয়েছে। কিন্তু বৈশ্বিক অর্থনৈতিক ভাবনার বিষয়টি ভিন্ন ও বৃহত্তর।

সূদকে নিষিদ্ধ করে পরবর্তী করণীয় বিষয়ে বিভিন্ন ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণে সাধারণত যেসব পরামর্শ দেয়া হয় নিচে সংক্ষেপে সেসব বিষয়ে ধারণা তুলে ধরা হল।

- যাকাতের সার্বজনীন প্রচলনকে একটি বিকল্প ব্যাবস্থা বলা হচ্ছে। প্রত্যেককে যাকাত দিতে হবে বাধ্যতামূলকভাবে। এটি কর আরোপের মতো। মুনাফা থেকে যাকাত আদায় করা হবে। আবার স্থাবর সম্পদ থাকলেও যাকাত দিতে হবে।

বাধ্যতামূলকভাবে যাকাত আরোপ করা হলে সম্পদশালী স্থাবর সম্পদ অলস ফেলে রাখতে পারবে না। কেননা সম্পদ যথাযথভাবে ব্যাবহার না করে অলস ফেলে রাখলেও যাকাত দিতে হবে এবং যাকাত দিতে দিতে একপর্যায়ে সম্পদ

নিঃশেষের পর্যায়ে চলে যাবে। এ ব্যাবস্থা সম্পদকে অলস ফেলে না রেখে কাজে খাটাতে উৎসাহিত করাবে।

অন্যদিকে সঞ্চিত নগদ অর্থ বা পূঁজিকে ব্যবসায় নিয়েজিত না করে জমা করে রাখলে তা উপকারে আসবে না। অর্থের মালিক নিজেও উপকৃত হতে পারবে না এবং উদ্বৃত্ত অর্থ অপরকেও উপকৃত করবে না।

যাকাত ব্যাবস্থাকে তাই একটি প্রতিষ্ঠানিক ব্যাবস্থায় পরিণত করা যেতে পারে। ব্যাক্তিক পর্যায়ে বিচ্ছিন্নভাবে বর্তমানে যে যাকাত আদায় করা হয় এভাবে যাকাতের অর্থ দিয়ে বড় কোন কাজ করা সম্ভব হয় না। বৃহৎ আঙ্গিকে অর্থের সে ব্যাবহার কোন উপকারে আসে না। যাকাত ব্যাবস্থাকে তাই প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দিতে হবে।

যাকাতের সকল অর্থ কেন্দ্রিয়ভাবে এক স্থানে সংগৃহীত হতে হবে। যাকাত হবে পূঁজি বা তহবিল সংগ্রহের উত্তম একটি মাধ্যম। দরীদ্রদের সহযোগীতার গুরুত্বপূর্ণ হাতিয়ার হবে যাকাত। যাকাতের অর্থ থেকে সূদবিহীন ঋণ দেয়া যেতে পারে এবং ঋণ দেয়ার ক্ষেত্রে প্রকৃত হকদারদের কাছে সে অর্থ পৌঁছাতে হবে। এ ব্যাবস্থার মাধ্যমে সম্পদের ব্যাবহার তথা ব্যবসায় নিয়োজিতকরণকে উৎসাহ দেয়া হবে।

জাতির সম্পদ ও পূঁজি কয়েকজন পুঁজিপতির হাতে যাওয়া বন্ধ হতে হবে। তাই যাকাতের অর্থের ব্যাবহারে সুশাসন আনতে হবে। নয়ত এক্ষেত্রেও সূদের মতো অবস্থা হবে। সুশাসন সর্বত্রই গুরুত্বপূর্ণ।

বৃহৎ পুঁজিপতিরা হিসেব কষে ঠিকমতো যাকাত আদায় করে না। যাকাত আদায় ও ব্যাবহারের আওতা বৃদ্ধি করতে হবে। কোরআন একটি দিক-নির্দেশনা দিয়েছে মাত্র। যুগের সাথে এর উন্নয়নের কাজ করা মানুষের কর্তব্য।

যাকাতের বর্তমান হার নিয়েও গবেষনা করতে হবে। কোরআন আমাদেরকে পথ দেখিয়ে দিয়েছে বা দিক-নির্দেশনা দিয়েছে, কিন্তু তার উন্নয়ন ও তাকে যুগোপযোগী করা মানুষের কাজ। কোরআনের দিক-নির্দেশনা অবশ্যই সঠিক। সূদ হারাম করে যাকাতের প্রাতিষ্ঠানিক প্রবর্তন একটি বিকল্প ব্যাবস্থা হতে পারে।

- সূদের ভিত্তিতে নয়, ঋণ দেয়া যেতে পারে লাভ-ক্ষতি দু'টোরই অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে। এটি আরেকটি বিকল্প ব্যাবস্থা হতে পারে। এটি করা না হলে ব্যবসায়ের উন্নতিতে ঋণদাতার কোন প্রচেষ্টা বা আন্তরীকতা থাকে না। ফলে ব্যবসায়ের লাভ-ক্ষতি যাই হোক না কেন ঋণদাতা যে কোন উপায়ে কেবল সূদ আদায় করতেই সচেষ্ট থাকে। ব্যবসায়ের যত শ্রম ও দুঃশ্চিন্তা কেবলমাত্র ঋণ গ্রহীতাকে এককভাবে বহন করতে হয়। ঋণদাতা পূঁজি খাটিয়ে আয়েসে বসে বসে তার প্রাপ্য বুঝে নেয়। এটি এক প্রকার অত্যাচার।

এক্ষেত্রে অবশ্য এটিও গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনার দাবী রাখে যে, অনেকে সূদ দিতে ইচ্ছুক তবুও অংশীদারীত্বের নামে তার ব্যবসায়ে বা কাজে অপরের অযাচিত হস্তক্ষেপ কামনা করে না। তাই এ ব্যাবস্থাটি উভয়ের সম্মতির ভিত্তিতে হতে হবে। চাপিয়ে দেয়া উচিত হবে না। তাতে উদ্যোক্তার সম্মতি না থাকলে তার কর্মস্পৃহা হ্রাস পাবে।

ব্যাক্তিক পর্যায়ে ঋণদাতাগণ অভাবগ্রস্ত কিছু মানুষকে সূদবিহীন ঋণ দিতে পারে। আবার যদি একটি কেন্দ্রীয় তহবিল থেকে সূদবিহীন ঋণ দিয়ে মানুষকে কাজের সুযোগ করে দেয়া হয়, তবে তা অনেক মানুষের উন্নয়নের সহায়ক হতে পারে। এক্ষেত্রে ব্যবসায়ের লাভ-লোকসানের অংশীদারীত্বের ভিত্তিতে বিনিয়োগ করা যেতে পারে। এমনকি সরকারকেও সূদ-মুক্ত ঋণ দেয়া যেতে পারে। এসব ব্যাবস্থা অবশ্যই উন্নয়নকে ত্বারন্বিত করবে।

- অনেকে দানকে একটি বিকল্প পন্থা বলার চেষ্টা করেছেন। সম্ভব হলে বড় বড় অর্থ ও সম্পদের দানকে প্রাতিষ্ঠানিক ব্যাবস্থার আওতায় নিয়ে আসা যেতে পারে। ছোট ছোট বা ক্ষুদ্র প্রকৃতির দান ব্যাক্তিক পর্যায়ে করা যেতে পারে। এভাবে দানের অর্থও পূঁজি সংগ্রহের একটি মাধ্যম হতে পারে। যেখান থেকে ঋণ সরবরাহ করা যেতে পারে।

যারা দানকে একটি বিকল্প ব্যাবস্থারূপে বিবেচনা করতে চায় তাদের যুক্তি হচ্ছে, যদি সমাজের স্বচ্ছল ব্যাক্তিরা অভাবীদের মাঝে নিজেদের সম্পদের কিছু অংশ বন্টন করে দেয় সেটিও একটি ব্যাবস্থা হতে পারে। কিন্তু এটি ঐচ্ছিক ব্যাবস্থা। একে বাধ্যতামূলক করা যায় না। এটি একটি নিজস্ব বদান্যতামূলক ব্যাবস্থা। রাষ্ট্রিয় বা বৃহদাকারের সমস্যা সমাধানে এটিকে কোন ব্যাবস্থা হিসেবে

ধরা যায় না, যদিও দারীদ্র দূরীকরণে এ ব্যাবস্থা অনেকটাই সহযোগীতা করে। তবে এটি ঋণের বিকল্প নয়। এটি ব্যাক্তিক পর্যায়ের বিষয়। দানকেও যদি প্রাতিষ্ঠানিক পর্যায়ে নিয়ে আসা যায় তখন এটি একটি বিকল্প হতে পারে। অর্থাৎ দানের টাকা এক স্থানে সংগৃহীত হয়ে জমা হবে। অতঃপর এর যথাযথ ব্যাবহার হবে। তবে সুশাসন না থাকলে সূদের মতোই অবস্থা হবে। সূদের সমস্যা সুশাসনের সমস্যা। যদিও এর চরিত্রের সাথে অত্যাচারের বৈশিষ্ট ঢুকে গেছে। তাই বর্জনীয়। অন্য কোন বড় কারণ নেই।

উল্লেখ্য যে, সূদের কারবারের সাথে দান তুলনাযোগ্য নয়। যাকাতের সাথেও নয়। দান এদের বিকল্প নয়। এটি একটি স্বতন্ত্র ব্যাবস্থা যা ঐচ্ছিক। দান সব ব্যাবস্থার মধ্যে অব্যাহত থাকতে পারে।

ওপরের আলোচনায় বিবিধ ব্যাবস্থার সুবিধা-অসুবিধা ও ভাল-মন্দ তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়েছে। তবে সত্যিকারভাবে কি করা যেতে পারে সেটি এ বিষয়ে বিশেষায়িত ব্যাক্তিবর্গের বিশেষত হিসাব বিজ্ঞানীদের চিন্তা-ভাবনার বিষয় বলে মনে করি। এ ছাড়াও যেসব প্রতিষ্ঠান অর্থনৈতিক কাজের সাথে সম্পৃক্ত সেসব প্রতিষ্ঠানের পরিচালনাকারীদের সিদ্ধান্ত গ্রহণজনিত বিষয় বলেও মনে করি। তবে স্বতঃস্ফুর্ততার সাথে যে কেউ আগ্রহী হয়ে এ বিষয়ে নিজস্ব চিন্তা-ভাবনা তুলে ধরতে পারেন।

বিশেষভাবে উল্লেখ্য যে, দু'চার-দশজনের সূদ বর্জন অর্থনৈতিক ব্যাবস্থা পরিবর্তনে খুব বেশী কাজ করবে না। কোরআনের দিক-নির্দেশনা জগতের সকল মানুষের জন্য। অতএব এসব ব্যাবস্থাকে কার্যকরী করতে হলে আল্লাহর সৃষ্ট সব মানুষকেই এর অন্তর্ভূক্ত হতে হবে বা করতে হবে। কেবল গোষ্ঠীগত চিন্তা করে এ ব্যাবস্থার সার্বিক সুফল পাওয়া যাবে না। বিশেষত বর্তমান সময়ে তো নয়ই। ইসলাম হচ্ছে আল্লাহতে সমর্পন, যা প্রকৃতি ও পরিবেশের স্বাভাবিক গতিময়তাকে অনুসরণ করে চলে [সমর্পন দ্রষ্টব্য ১.৫]। বাধা-ধরা কতগুলি নিয়মই ইসলাম নয়। তাই সময়ের সাথে সকল ক্ষেত্রেই প্রয়োজনীয় সংস্কার করা যেতে পারে।

জগতের অধিকাংশ মানুষই কর্মফলে বিশ্বাস করে। অর্থাৎ একটি বিচার ব্যাবস্থাকে স্বীকার করে। যে নামেই ডাকুক না কেন তারা আল্লাহতেও বিশ্বাসী।

অতএব জগতের সকল মানুষই বিশ্বাসী বিষয়টিকে সেভাবে ভাবতে বা বুঝতে হবে [বিশ্বাসী দ্রষ্টব্য ২.৫]।

ধর্মীয় ছোট ছোট পার্থক্যগুলি জ্ঞানের পার্থক্য ছাড়াও অভ্যস্ততা-অনভ্যস্ততা এবং ধারণার উত্তরাধিকারের পার্থক্যের মতো বিষয় হয়ে গেছে। এছাড়াও পৃথক সংস্কৃতির সাথেও জড়িয়ে আছে। সংস্কৃতির প্রভাব গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। সেটিকে বিবেচনায় রাখতে হবে। ফলে তাৎক্ষণিকভাবে সবাই একইরকমের বিশ্বাসী হয়ে যেতে পারবে না এবং বর্তমান বিশ্বে তার খুব প্রয়োজনও নেই।

যেটি বেশী প্রয়োজন সেটি হচ্ছে মানুষকে সকল নিয়ম ও বিধি-বিধানের পেছনের কারণকে বুঝতে শেখা। সত্য ও সঠিক কাজটি বুঝতে শেখা। অতএব 'বায়তুল মাল' থেকে এক আল্লাহর সৃষ্ট সকল মানুষের জন্যই ব্যায় করতে হবে।

একজন ঋণদাতা আল্লাহর দেয়া জীবন, আল্লাহর দেয়া আলো-বাতাস, মাটি-পানি এমনকি আল্লাহর সার্বিক অনুগ্রহ লাভ করে ঋণদাতায় পরিণত হয়। আল্লাহকে সে এর বিনিময়ে কি দেয়?

বাহ্! এ কেমন প্রশ্ন? আল্লাহ কে, কি, কোথায় মানুষ কি এসবের কিছু জানে? আল্লাহকে কি মানুষের পক্ষে কোন কিছু দেয়া সম্ভব?

হ্যা সম্ভব। আল্লাহকে কেউ চেনে না, জানে না। আল্লাহকে পাওয়া যাবে তাঁর সৃষ্টির মধ্যে। প্রকৃতি ও জীবনের মাঝে। আল্লাহর সৃষ্ট সৃষ্টির জন্য করাই আল্লাহর জন্য করা। এটাই আল্লাহর পথে ব্যায়।

দলীয়, গোষ্ঠীগত, জাতিগত তথা সংকীর্ণ চিন্তা পরিহার করে বিষয়গুলিকে বর্তমান সময়ে এভাবে বুঝতে হবে। সকল মানুষের জন্য কাজ করতে হবে। 'বায়তুল মাল' থেকে ব্যায় করতে হবে সকলের জন্য। তাই পূর্বেই বলে নেয়া হয়েছে যে, সকল মানুষই কোন না কোনভাবে আল্লাহতে বিশ্বাসী। কিছু মানুষের কারণে বিশ্বাসী শব্দটির ওপর এখানে জোর দিতে হয়েছে। তবে জ্ঞান বলে যে জগতের সকল মানুষের জন্যই ব্যায় করতে হবে।

বুঝতে হবে যে, সূদ বিষয়ে বস্তুত আল্লাহর কোন সমস্যা নেই। আল্লাহর কোন লাভ-ক্ষতি নেই। এক্ষেত্রে মূল সমস্যাটি হচ্ছে, সূদের কারবারের প্রক্রিয়াগত কারণে সমাজে 'অন্যায়-অত্যাচার' প্রবেশ, মানুষের পারস্পরিক

সম্পর্কের বিনষ্টিকরণ এবং সে কারণে আল্লাহর সৃষ্টির ক্ষতি ও ধ্বংস হওয়ার সম্ভাবনার সৃষ্টি হওয়া।

অতএব আল্লাহর দিক-নির্দেশনাটি হচ্ছে, যে কোন নাম বা ফর্মেই হোক না কেন 'অন্যায়-অত্যাচার' করা যাবে না। এটিই এক্ষেত্রে 'সার্বজনীন' ও 'শাশ্বত' বক্তব্য। মূল নির্দেশনা এটি। সমস্যা সমাধানে সর্বত্র 'সুশাসন' প্রয়োজন। সূদের সমস্যা সূদের নয়, সুশাসনের সমস্যা। সুশাসন প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব হলে মূলধনের বিপরীতে ঋণদাতার প্রাপ্য সূদ বহাল থাকতেই পারে। উল্লেখ্য যে, সুশাসনের মধ্যে সূদের হার একটি অত্যান্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়।

- **বর্তমান বিশ্ব ব্যাবস্থা ও করণীয় (Present world order and to do)**

যে সময়ে ঋণ কিংবা সূদের বিষয়ে কোরআনের বাণীসমুহ অবতীর্ণ হয়েছে সে সময়ে আধুনিক ব্যাংকিং ব্যাবস্থা ছিল না। বীমা প্রতিষ্ঠান ছিল না। পূঁজি সংগ্রহের জন্য পূঁজিবাজার ছিল না। অর্থ তখন এর মালিকানাকে যথাযথভাবে বজায় রেখে বৈশ্বিক পরিসরে সর্বত্র প্রবহমান রাখা সম্ভব ছিল না।

বর্তমান সময়ে ব্যাংকিং ব্যাবস্থার কারণে অর্থ অলস বসে থাকে না। ব্যাংক, বীমা, পূঁজিবাজার সকলেই উদ্বৃত্ত ও সঞ্চিত অর্থকে এক জায়গায় নিয়ে আসছে। সরকার এসব অর্থ কাজে লাগাতে পারছে। মূলত অর্থের প্রবাহ বন্ধ হওয়া বা থেমে যাওয়া কিংবা প্রক্রিয়ার ত্রুটিগত কারণে একদিকে চলে যাওয়া অর্থাৎ একদিকে জমা বা স্তুপিকৃত হওয়াটিই সমস্যা। দেহে যেমন সর্বত্র রক্তের প্রবাহ দরকার, সমাজে তেমনি অর্থের প্রবাহের সুসামঞ্জস্যতা থাকা দরকার। এটিই গুরুত্বপূর্ণ। যা এখন সম্ভব। তবে সুশাসন খুবই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়।

বর্তমান ব্যাবস্থা ও করণীয় বিষয়ে নিচে একটি সাধারণ ধারণা বা আলোচনা তুলে ধরা হল। যেখানে ভাল-মন্দ দিক, সুবিধা-অসুবিধা সবই তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়েছে। তবে করণীয় নির্ধারণ করার বিষয়টি বিশেষায়িত বা সংশ্লিষ্ট ব্যাক্তিবর্গের বিষয় বলে মনে করি। বর্তমানে উন্নত জ্ঞান-গবেষনা এবং সত্য বা সূত্রের আলোকে শ্রেষ্ঠতম উপায়ে সর্বক্ষেত্রেই সবকিছু নির্ধারণ করতে হবে। এ ধারণার সাথে কোরআন বা ইসলামের কোনই সংঘর্ষ নেই। ধর্ম এবং ইসলামকেও তাই যথাযথ জ্ঞানে জানতে ও বুঝতে হবে। নিচে আলোচনা তুলে ধরা হল।

– **ব্যাংক ব্যাবস্থা (Banking System) :** সূদের কারবারের বিকল্প হিসেবে কেউ কেউ ব্যাক্তিগত বা নিজস্ব পূঁজি দিয়ে ব্যবসা করার পরামর্শ দিয়ে থাকেন। এটি কোন যথাযথ সমাধান নয়। এভাবে বড় কাজ হয় না বা করাও সম্ভব নয়। বড় বড় কাজ সম্পাদন হচ্ছে বিধায় আজকাল দরীদ্রও রাজার হালে জীবনযাপন করতে পারছে যা একসময় ভাবাই যেত না।

বড় কাজের জন্য বড় পূঁজি প্রয়োজন। পূঁজি সংগ্রহের পেছনে ব্যাংক, বীমা, পূঁজিবাজার অবশ্যই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। ব্যাংক, বীমা, ষ্টক এক্সচেঞ্জ না থাকলে টাকা মাটির নিচে চলে যেত। তাতে সে অর্থ দিয়ে কারই কোন উপকার হত না। বড় কোন কাজ বা প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা সম্ভব হত না। এইসকল প্রতিষ্ঠান সমস্ত পূঁজিকে এক জায়গায় করছে। বৃহদাকার ঋণ প্রদান করছে। বৈশ্বিক পরিসরে বড় বড় কাজ করা সম্ভব হচ্ছে। কর্মের সংস্থান হচ্ছে। বিশ্ব ব্যাবস্থায় পরিবর্তন এসেছে!

যে প্রতিষ্ঠান থেকে বহু সংখ্যক মানুষ উপকৃত হচ্ছে সে প্রতিষ্ঠানকেও তো বাঁচিয়ে রাখতে হবে। প্রতিষ্ঠান বাঁচবে কিভাবে? তাকেও তো লাভ করতে হবে। ঋণের বিপরীতে সূদ হচ্ছে তার আয়। আয় ছাড়া প্রতিষ্ঠান বাঁচবে কি করে? অতএব সূদ অপরিহার্য্য। তবে ব্যাংক ব্যাবস্থা নিয়েও বর্তমানে অনেক অভিযোগ আছে। কেবল লক্ষ্য রাখতে হবে যেন অন্যায়-অত্যাচার না হয়। সর্বত্রই সুশাসন দরকার। সূদের প্রধান সমস্যা সূদে নয়, সুশাসনের সমস্যা। ওপরে বারবার তাই এ বিষয়টিই তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়েছে।

ব্যাংকগুলি অতি উষ্চহারে সূদ ধার্য্য করে। ব্যাংক থেকে ঋণ নিয়ে ব্যবসা করে লাভ করা সম্ভব হয় না। বাজারে বিদ্যমান হারে যে সূদ দিতে পারবে না সে ঋণ পাবে না। সূদের হারও দাতারাই নির্ধারণ করে। এখানে দরকষাকষির সুযোগ নেই। এমনকি জাতীয় বা মানবজাতির উপকারার্থে করা কাজের ক্ষেত্রেও কোন ছাড় নেই। এতে জাতি এমনকি বৈশ্বিক দিক বিবেচনায় মানবজাতিও ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

অন্যদিকে পূঁজি সংগ্রহ করতে গিয়ে ব্যাংক, পোষ্ট-অফিস বা সঞ্চয় হিসেব থেকে সূদের যে অর্থ বা লাভ দেয়া হয় বলে বলা হয়, তা দিয়ে মানুষের জীবন চলে না। অতি নগন্য।

সূদের ব্যবসা করে ব্যাংক, আর্থিক প্রতিষ্ঠান বা পূঁজিপতি নিজে লাভের অংশ নিয়ে নেয়। সেখানে যথাযথ বিবেচনা সাপেক্ষে কারও কোন ভাগ নেই। অথচ আর্থিক প্রতিষ্ঠান দেউলিয়া হলে সে দায় সবার কাঁধে পরে। এগুলি সবই অবিচার বা সুশাসনের অভাবের মধ্যে পড়ে।

বিত্তশালী, ক্ষমতাশালী ও ব্যাবস্থাপনার সাথে সংশ্লিষ্ট ব্যাক্তিবর্গ আর্থিক প্রতিষ্ঠান থেকে নিয়ম বহির্ভূতভাবে বা অতি সহজে ঋণ নিয়ে নিচ্ছে, কিন্তু সাধারণ মানুষ অতি নিয়মের মুখোমুখী ও হয়রানির স্বীকার হচ্ছে।

কম সামর্থবানেরা ব্যাংক থেকে প্রয়োজনীয় ঋণ সহায়তা পায় না। কিংবা যা পায় তা ধর্তব্যে নয়। ঋণ নিয়ন্ত্রনের মাধ্যমে দাতারা ঋণ গ্রহীতাদেরকেও নিয়ন্ত্রন করে। বলা যায় গ্রহীতাদেরকে এক প্রকারে নিয়ন্ত্রন করা হয়।

ঋণ প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানগুলি নিজেরা সব নিয়ন্ত্রন করার চেষ্টা করে। এর থেকে খুনোখুনি, দেহ ব্যবসা নানান অপকর্মের সৃষ্টি হয়। আবার এসবের পৃষ্ঠপোষকতারও প্রয়োজন হয়।

একজন সৎ বা ভাল উদ্যেক্তার ব্যাবসায়ের লাভের টাকা সূদ আকারে নিয়ে নেয়া হয়। দিতে অপারগ হলে সাধারণ মানুষের সঞ্চিত টাকা ব্যাবহার করে নিজেরা অথবা নিজেদের পছন্দের লোক দ্বারা প্রকৃত উদ্যেক্তাকে পাশ কাটিয়ে সে কাজটি নিজেরা বৃহৎ আকারে শুরু করে দেয়া হয়। প্রকৃত উদ্যেক্তাকে বাজার থেকে হটিয়ে দেয়া হয়। কখনও নিজেদের ক্ষতি স্বীকার করে হলেও প্রতিযোগীকে হটিয়ে দেয়া হয় এবং বাজার নিয়ন্ত্রন করা হয়। এ সবই অন্যায়-অত্যাচার ও সুশাসনের অভাবের মধ্যে পড়ে।

সামাজিক বা বৃহৎ উপকারের দিক বিবেচনা করে ক্ষুদ্র স্বার্থপরতা ত্যাগ করে সত্যিকারের উদ্যোক্তাকে যদি সহযোগীতা করা না হয়, তবে মানবসমাজ শক্ত ভিত্তির ওপর দাড়াতে পারে না। সম্পদের কর্তৃত্ব যাদের হাতে তাদের উচিত যথাযথ উদ্যোক্তাকে সহযোগীতা করা; বিরূপ আচরণ না করা এবং অন্যায়ভাবে বাজার থেকে হটিয়ে না দেয়া।

ধনীরা যদি দরীদ্রদের শোষনের হাতিয়ার মনে করে তবে সংঘাত অনিবার্য। দীর্ঘমেয়াদে যা সকল উন্নয়কে ব্যাহত করতে বাধ্য। সেক্ষেত্রে উন্নয়ন ধরে রাখাও সম্ভব হয় না। কেবল সাময়িক লাভবান হওয়া যায়। সমাজের সদ্যস্যদের মধ্যে সংহতি ক্ষুন্ন করে এমন কর্মকান্ডের প্রকৃতপক্ষে কোন স্থায়ীত্ব

নেই। তাই স্বার্থপরতা পরিত্যাগ করে একে অন্যের সহযোগীতায় ন্যায় ও সাম্যের ভিত্তিতে এগিয়ে এলে সমাজে সংহতি বৃদ্ধি পবে। একে অন্যের প্রতি সহমর্মীতা নিয়ে এগিয়ে এলে উন্নয়ন বা অগ্রগতি লাভ করা সম্ভব। সেক্ষেত্রে ন্যায্যতা প্রতিষ্ঠা করার বিকল্প নেই।

উল্লেখ্য যে, ঋণ গ্রহীতার দীর্ঘমেয়াদি সম্ভাব্য আচরণও একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। ঋণ গ্রহীতা অর্থ ঋণ নিয়ে বড় হবে, বড় হয়ে ঋণদাতার সাথেও একসময় খারাপ ব্যাবহার করতে পারে। এটিও সামাজিক একটি সমস্যার কারণ অর্থাৎ অকৃতজ্ঞতা। অকৃতজ্ঞকে ক্ষমা না চাওয়া পর্যন্ত আল্লাহও গ্রহণ করেন না। এ বিষয়টিও ভাবতে হবে। এ আশংকার কারণেও ঋণ দাতারা অনেক সময় ঋণ গ্রহীতার মঙ্গল প্রত্যাশা করে না কিংবা তাদেরকে নিয়ন্ত্রনের মধ্যে রাখতে চায়। ক্ষতি করে হলেও দাবিয়ে রাখে। অর্থাৎ সকল দিকেই সকলের যুক্তি আছে। এতদ্বসত্বেও অতি অত্যাচার-অবিচার ও অন্যায্য আচরণ কাম্য নয়। দরিদ্র-নিরীহদের ওপর নিপীড়ন-নির্যাতন কাম্য নয়। বস্তুত সে কারণেই সূদকে নিষিদ্ধ করা হয়েছে। সূদের ক্ষেত্রে সবচেয়ে বড় অত্যাচার-অবিচার হচ্ছে অতিরিক্ত হারে সূদ ধার্য্য ও আদায় করা। তাই বলা হয়েছে,

‘হে বিশ্বাসীগণ! তোমরা সুদ নিও না দ্বিগুণ, চতুর্গুন ক্রমবর্ধমান হারে। ...।’ (আল-কোরআন ৩:১৩০)

অতএব আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমুহের ওপরে সুশাসনের অভাবজনিত যেসব ত্রুটি বিচ্যুতি উল্লেখ করা হয়েছে সেসব ত্রুটি দুর করার পদক্ষেপ নিতে হবে। তবে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে ‘সূদের হার’। এটিকে অত্যচারের পর্যায়ে নিয়ে যাওয়া যাবে না। আবার সূদ আদায়ে অনৈতিক ও অযৌক্তিকভাবে নিষ্ঠুর হওয়া যাবে না। তাহলে সূদ নামটির আর কোন ত্রুটি থাকবে না এবং কর্মজাত ফলাফল ভাল হলে কেবল নামের কারণে হারামও হবে না। ঋণের মেয়াদ বৃদ্ধি পেলে সময়ের হিসেবে সূদ বেশী আসতে পারে, তবে সেটি ক্রমবর্ধমান না হয়ে ক্রমহ্রাসমান হারেও হতে পারে।

সরকার ব্যাবস্থা সাধারণত বৃহৎ ব্যাবসায়ী বা পুঁজিপতিদের থেকে আয়করের মাধ্যমে টাকা তুলে নিয়ে সমন্বয়ের চেষ্টা করে, যেন টাকা পূঁজিপতিদের নিকট থেকে আবার জাতীয় তহবিলে সরকারের কাছে পৌঁছে

যায়। ভাল উদ্যোগ। তবে সেখানেও ফাঁকিবাজি আছে। সে অর্থের প্রকৃত সুবিধাভোগী কারা সে প্রশ্নও আছে। হিসেবে গড়মিল করেও পূঁজি স্থানান্তর করা হচ্ছে। সর্বত্রই মূল সমস্যা হচ্ছে নীতি-নৈতিকতার বিবর্জন ও সুশাসনের অভাব। অন্য কিছুই নয়।

বৈশ্বিক পরিসরে বর্তমানে যেসব ঋণদানকারী প্রতিষ্ঠান আছে যেমন বিশ্ব ব্যাংক, আইএমএফ তাদের সূদের হার অনেক কম। তবে যেহেতু তারা বৃহৎ আকারের ঋণদানকারী প্রতিষ্ঠান তাই বিষয়টি গবেষনা করে দেখা প্রয়োজন এবং যদি সূদের সে হার অধিক হয়ে থাকে তবে সেটিও নামিয়ে আনা যেতে পারে।

স্থানীয় পর্যায়ের ব্যাংকসমুহ অধিক হারে সূদ আদায় করে। যথাযথভাবে সূদের হার নির্ধারণ করা হলে সূদে কোন সমস্যা নেই। সূদের সাথে অন্যান্য যেসব অত্যাচার ও নিয়ন্ত্রনজনিত সমস্যা আছে তেমন সমস্যা সর্বক্ষেত্রে আছে। অংশীদারের ভিত্তিতে ব্যাবসা করলেও এসব সমস্যা এড়ানো যায় না। বিভিন্ন প্রকৃতির মানুষ আছে। সবাই আদর্শ মানব নয়। ফলে দানবীয় কিছু বিষয় সর্বত্র থাকে এবং থাকবেও। ব্যাবস্থাগুলোতে তাই যথাযথ সুশাসন প্রতিষ্ঠা করার কৌশল নিয়ে ভাবতে হবে।

সূদের যথাযথ বা ন্যায়সম্মত হার নির্ধারণে কেবল বিশেষজ্ঞগণ নয়, এর সাথে সংশ্লিষ্ট সকল পক্ষের মতামত নিয়ে তা নির্ধারণ করা বাঞ্ছনীয়। সময় সময় ফলো-আপ করা প্রয়োজন। বলা হচ্ছে,

“ধনৈশ্বর্য্য যেন কেবল তোমাদের বিত্তশালীদের মধ্যেই পূঁঞ্জীভূত না হয়।” (আল-কোরআন ৫৯:৭)

বিষয়টি সাধারণভাবে সকলেই অনুধাবন করে। ধন-সম্পদ কেবলমাত্র গুটি কয়েক মানুষের হাতে সঞ্চিত হওয়া খারাপ। কিন্তু বর্তমানে এসব প্রাতিষ্ঠানিক ব্যাবস্থার মাধ্যমে তাই করা হচ্ছে। নেতৃস্থানীয়রাই সর্বক্ষেত্রে সকল কিছুর হর্তাকর্তা হয়ে বসে আছে। সকল ক্ষেত্রেই সুশাসন প্রতিষ্ঠা করতে হবে কোরআন নির্দেশিত লক্ষ্যকে অর্জন করতে হলে।

- **বীমা ব্যাবস্থা (Insurance) :** বীমার মাধ্যমে ব্যবসার ক্ষতি বা দুর্ঘটনায় সাহায্যের নামে পূঁজি সংগ্রহ করা হয়। বীমা প্রতিষ্ঠানও মূলধনী তহবিল গঠনে

গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। বৃহৎ ব্যবসায়িরা উপকৃত হয়। তাদের মাধ্যমে জাতি তথা মানবসমাজও উপকৃত হয়। তবে সুশাসনের অভাব সর্বত্র।

অনেক সময় অর্থ আত্মসাৎ করার জন্য নিজেরাই দুর্ঘটনার নামে নাটক সাঁজিয়ে বা গুদামে অগ্নিসংযোগ করে বীমা থেকে টাকা উত্তোলন করে নেয়া হয়। অপরদিকে মাঝে মাঝে দু'একজন দরীদ্রকে পত্রিকার পাতায় অর্থ পরিশোধের ছবি দেখিয়ে বিজ্ঞাপন দেয়া হয়। এভাবে পূঁজি সংগ্রহ করা হয়। সব পূঁজি কেবল পূঁজিপতিরাই কাজে লাগাতে পারে। সবাই সুযোগ পায় না বা সবাইকে ন্যায্যতার ভিত্তিতে সে সুযোগ দেয়াও হয় না। এগুলি সুশাসনজনিত সমস্যা। বিশ্ব বর্তমানে জ্ঞান-বিজ্ঞানে অনেক অগ্রসর হয়েছে; এখন গুরুত্ব দিতে হবে সর্বক্ষেত্রে সুশাসন প্রতিষ্ঠায়।

- **পূঁজি বাজার (Capital Market) :** পূঁজি বাজার বা ষ্টক এক্সচেঞ্জকে জুয়ার কারখানা বলা হয়। এটা তারা বলে অর্থনীতির বিষয়গুলিকে যারা ভালভাবে বোঝে না। আবার আরও একদল বলে যারা ব্যাবসাটা বোঝে কিন্তু এগুলো বলে অবুঝদের অর্থ হাতিয়ে নেয়। অতএব যে যে কাজ করবে তার নিজেকেই সে কাজটি ভালভাবে জেনে-বুঝে করতে হবে। নয়ত না করা ভাল। আগুন উপকারী কিন্তু বোঝে না বলে শিশু তাতে হাত দিয়ে হাত পুড়িয়ে ফেলে। তাই বলা হয়েছে,

"যে বিষয়ে তোমার কোন জ্ঞান নেই তা অনুসরণ কর না।" (আল-কোরআন ১৭:৩৬)

পূঁজি বাজার জুয়া খেলার স্থান নয়। পূঁজি উত্তলনের একটি অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম এটি। তবে যারা জুয়া খেলার মনোবৃত্তি বা খেলার স্থান মনে করে খেলতে আসে, তারা সর্বস্ব হারিয়ে এসব কথা বলে। সর্বত্র অংক আছে; আছে সূত্র ও সত্য। সূত্রটা জেনে কাজ করতে হবে।

বড় মূলধন সংগ্রহ, বড় বড় কাজের জন্য পূঁজি সংগ্রহে পূঁজি বাজারের ধারণার চেয়ে উত্তম ধারণা আর কিছুই হতে পারে না। তবে ঐ একই কথা। সর্বত্র সুশাসন প্রয়োজন।

যারা সূদের কারবারে টাকা লগ্নি করে বা বড় অংকের মূলধন সরবরাহ করে, তারা অর্থ-সম্পদের মালিক হয়েছে বলে ধরে নেয়া যায়। তারা এত

অর্থ-সম্পদের মালিক হতে পারার কথা নয় যদি না অনৈতিক ও অনিয়ম করে থাকে। সঠিক নিয়মের মধ্যে থেকে অর্থ-সম্পদের পাহাড় গড়ে তোলা সম্ভব হয় না। যদি তেমনটি সম্ভব হয় তবে বুঝতে হবে যে নিয়মটিই সঠিক নয়।

ওপরে যত আলোচনা করা হয়েছে তাতে সর্বক্ষেত্রে প্রধান বা মূল সমস্যা একটিই বড়ভাবে প্রতীয়মান হয়। সেটি হচ্ছে সর্বত্র 'সুশাসনের অভাবজনিত সমস্যা'। অতএব এ দিকটায় নজর দিতে হবে। সূদ বর্জন করে নয়। সূদ একটি অপরিহার্য্য বিষয়। অন্যথায় পৃথিবীকে স্বর্গ হতে হবে। পৃথিবী যখন স্বর্গে পরিণত হবে তখন অপ্রয়োজনীয় অনেক কিছুরই আর করার প্রয়োজন হবে না। অর্থও হয়তবা অপ্রয়োজনীয় হয়ে যাবে। হাত বাড়ালেই সব পাওয়া যাবে।

- **সূদ গ্রহণের শাস্তি** (Punishment)

কোন কোন ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণকারীদের মতে সূদ গ্রহণের শাস্তিস্বরূপ হত্যা করার নির্দেশনা জারী করা উচিত। সত্যি বলতে সূদ গ্রহণের শাস্তিস্বরূপ হত্যা করার নির্দেশনা জারী করা সঠিক কাজ নয়। উপরন্ত বর্তমান সময়ে তো নয়ই।

যুদ্ধকালীন, সংগ্রাম চলাকালীন কিংবা একটি আদর্শের প্রতিষ্ঠাকালীন সময় এবং স্বাভাবিক বা স্থিতিশীল সময় বা অবস্থাকে একভাবে দেখা উচিত নয়। কোন আদর্শ প্রতিষ্ঠাকালীন সময়ে কিছু বিষয়ে কখনও কখনও কঠোর অবস্থান গ্রহণ করতে হয়। কঠোর হতে হয় বিষয়টিকে সুপ্রতিষ্ঠিত করার জন্য। সর্বসাধারণকে জানাবার জন্য বা উদাহরণ সৃষ্টি করার জন্য। কিন্তু সেটি সব সময়ের জন্য নয় বা হতে পারে না বা হওয়া উচিতও নয়।

ভালভাবে বিচার-বিশ্লেষণ না করে এমন বক্তব্য প্রদান অনুসারীদেরকে ভূল পথে চালিত করতে পারে। এমনকি কোন কোন অবিবেচক পরিচালনাকারীদেরকেও। তাই এমন বক্তব্য না দেয়া বা তা থেকে বিরত থাকা বা এসবের প্রচার-প্রচারণা হতে না দেয়া উত্তম।

➢ (আয়াত ২৮২-২৮৩) এ অংশে চুক্তি (Contract), সাক্ষী (Witness) ও সাক্ষ্য (Testimony) প্রসঙ্গে বলা হয়েছে।

২৮২	হে বিশ্বাসীগন! যখন তোমরা কোন নির্দিষ্ট সময়ের জন্য ঋণের

আদান-প্রদান কর তখন তা লিপিবদ্ধ কর। তোমাদের মধ্যে কোন লেখক ন্যায়সঙ্গতভাবে তা লিখে দেবে। কোন লেখক লিখতে অস্বীকার করবে না, যেমনটি আল্লাহ তাকে শিক্ষা দিয়েছেন; তার উচিত তা লিখে দেয়া। ঋণ গ্রহীতা যেন লেখার বিষয়বস্তু বলে দেয় এবং সে (লেখক) যেন স্বীয় পালনকর্তা আল্লাহকে ভয় করে এবং লেখার মধ্যে বিন্দুমাত্র কম-বেশী না করে। অতঃপর ঋণ গ্রহীতা যদি কম বুঝে তেমন প্রকৃতির হয়, কিংবা দূর্বল অথবা নিজে লেখার বিষয়বস্তু বলে দিতে অক্ষম হয়, তবে তার অভিভাবক ন্যায়সঙ্গতভাবে লিখিয়ে নেবে। সাক্ষী রেখ; তোমাদের মধ্য থেকে দু'জন পুরুষ লোককে। যদি দু'জন পুরুষ না হয়, তবে একজন পুরুষ ও দুজন মহিলা, যাদেরকে তোমরা সাক্ষীরূপে অনুমোদন কর, যেন একজন যদি ভুলে যায় তবে অন্যজন তা স্মরণ করিয়ে দিতে পারে। যখন সাক্ষীদের ডাকা হবে তখন অবশ্যই তারা যেন অস্বীকার না করে। তোমরা মেয়াদ উল্লেখপূর্বক এটি লিখতে অলসতা কর না সেটি ছোট হোক কিংবা বড় হোক। আল্লাহর দৃষ্টিতে এটি অধিক ন্যায়সঙ্গত, সাক্ষ্য হিসেবে অধিক নিশ্চিত এবং তোমাদের মধ্যে সন্দেহ দুরীকরণে সর্বোত্তম পন্থা। তবে সেটি ব্যাতিত যদি কারবার নগদ হয়, পরস্পর হাতে হাতে আদান-প্রদান কর। এক্ষেত্রে তোমরা সেটি না লিখে রাখলেও কোন অন্যায় হবে না। তোমরা ক্রয়-বিক্রয়ের সময় সাক্ষী রেখ এবং লেখক ও সাক্ষীকে ক্ষতিগ্রস্ত কর না। যদি তোমরা তা কর তবে সেটি হবে পাপ। আল্লাহর প্রতি দায়িত্ব পালন কর। আল্লাহ তোমাদেরকে শিক্ষা দেন। আল্লাহ সবকিছু জানেন। (O ye who believe! When ye contract a debt for a fixed term, record it in writing. Let a scribe record it in writing between you in (terms of) equity. No scribe should refuse to write as Allah hath taught him, so let him write, and let him who incurreth the debt dictate, and let him observe his duty to Allah his Lord, and diminish naught thereof. But if he who oweth the debt is of

	low understanding, or weak, or unable himself to dictate, then let the guardian of his interests dictate in (terms of) equity. And call to witness, from among your men, two witnesses. And if two men be not (at hand) then a man and two women, of such as ye approve as witnesses, so that if one of the two erreth (through forgetfulness) the one of them will remind. And the witnesses must not refuse when they are summoned. Be not averse (reluctant) to writing down (the contract) whether it be small or great, with (record of) the term thereof. That is more equitable in the sight of Allah and more sure for testimony, and the best way of avoiding doubt between you; save only in the case when it is actual merchandise which ye transfer among yourselves from hand to hand. In that case it is no sin for you if ye write it not. And have witnesses when ye sell one to another, and let no harm be done to scribe or witness. If ye do (harm to them) lo! it is a sin in you. Observe your duty to Allah. Allah is teaching you. And Allah is knower of all things.)
২৮৩	তোমরা যদি ভ্রমনে থাক এবং কোন লেখক না পাও তবে বন্ধকী বস্তু হস্তগত রাখা উচিত। যদি একে অন্যকে বিশ্বাস কর, তবে যাকে বিশ্বাস করা হয় তার উচিত অন্যের প্রাপ্য পরিশোধ করা এবং স্বীয় পালনকর্তা আল্লাহকে ভয় করা। সাক্ষ্য গোপন কর না। যে তা গোপন করে অবশ্যই তার অন্তর পাপপূর্ণ। তোমরা যা কর আল্লাহ তা অবহিত। (If ye be on a journey and cannot find a scribe, then a pledge in hand (shall suffice). And if one of you entrusteth to another let him who is trusted deliver up that which is entrusted to him (according to the pact between

	them) and let him observe his duty to Allah his Lord. Hide not testimony. He who hideth it, verily his heart is sinful. Allah is Aware of what ye do.)

▪ **২.২৮২.১** হে বিশ্বাসীগন! যখন তোমরা কোন নির্দিষ্ট সময়ের জন্য ঋণের আদান-প্রদান কর তখন তা লিপিবদ্ধ কর : ঋণের আদান-প্রদানের ক্ষেত্রে চুক্তি লিখিত করতে বলা হয়েছে। প্রমাণ হিসেবে এটি একটি শক্তিশালী মাধ্যম। কখনও কোন ভূল বুঝাবুঝি হলে চুক্তি লিখিত হলে সমস্যা সমাধান সহজ হয়। অযথাই ভূল বোঝাবুঝির কারণে সম্পর্কগুলি নষ্ট হওয়ার সম্ভাবনা হ্রাস পায়। বর্তমান সময়ে যদিও চুক্তি সেভাবেই করা হয়, কিন্তু যে সময়ে ও সমাজে এ বার্তা অবতীর্ণ হয়েছে, বিষয়গুলি তখন তেমনিভাবে প্রতিষ্ঠা পায়নি। তাই আল্লাহ মানুষকে যথাযথ সময়ে যথাস্থানে এ বিষয়ে যথাযথ দিক-নির্দেশনা দিয়েছেন।

উল্লেখিত দিক-নির্দেশনাগুলি খুবই প্রাথমিককালীন সময়ের, কিন্তু খুবই গুরুত্বপূর্ণ ও মৌলিক দিক-নির্দেশনা। বর্তমানে এসব বিষয়ে উচ্চতর লেখা পড়ার সুযোগ রয়েছে। বর্তমানে সেসবই অনুসরণীয়। বলা যায় যা প্রাথমিককালীন এসব মৌলিক দিক-নির্দেশনাসমুহের হাত ধরেই বর্তমান পর্যায়ে উপনীত হয়েছে।

বিশেষভাবে উল্লেখ্য যে, লেখাপড়া যত উচ্চতরই হোক না কেন কিংবা জ্ঞান যত অগ্রসরই হোক না কেন- কিছু মানুষ এর মাঝেও নিয়ম-বিধানকে পাশ কাঁটিয়ে বা আড়ালে রেখে বা ফাঁকি দিয়ে কাজ করতে চায়। এসব ক্ষেত্রে কোরআনের নির্দেশনা কেবল যা করতে হবে তার দিক-নির্দেশনাই নয়, কোরআন ন্যায়ের পথ অবলম্বন করে কাজ করার জন্য এক তুলনাহীন প্রেরণা হয়েও কাজ করে! তবে এটি কাজ করে বিশ্বাসীর ওপর। তাই বিশ্বাসের শর্তগুলিতে বিশ্বাস স্থাপন সকল মানুষের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ। অপরদিকে সমাজে ন্যায়সম্মতভাবে কাজ করার জন্য এটি একটি অতুলনীয় চাপও যা সকল মানুষের ওপর কাজ করে।

কোরআনের দিক-নির্দেশনা বস্তুত সকল মানুষের জন্য; জাগতিক শৃংখলা বজায় রাখার জন্য তথা সৃষ্টিকে ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করার জন্য।

আল্লাহর বিধানের বা ন্যায়সম্মত দিক-নির্দেশনার বিচ্যুত আচরণ সমাজ, সংসার তথা বিশ্ব ব্যাবস্থাকে হুমকির মুখে ফেলে দিয়ে সৃষ্টি ধ্বংসের কারণ হয়ে দাড়াতে পারে।

▪ **২.২৮২.২** তোমাদের মধ্যে কোন লেখক ন্যায়সঙ্গতভাবে তা লিখে দেবে। কোন লেখক লিখতে অস্বীকার করবে না, যেমনটি আল্লাহ তাকে শিক্ষা দিয়েছেন; তার উচিত তা লিখে দেয়া : তৎকালীন সময়ে লেখাপড়া জানা লোক খুব বেশী ছিল না। কিন্তু যারা লেখাপড়া জেনেছে বা শিখেছে সেটিও আল্লাহর আশীর্বাদ যে তারা সে জ্ঞান লাভ করতে পেরেছে। আল্লাহর আশীর্বাদে তারা যে জ্ঞান অর্জন করেছে সে আল্লাহই তাদের ওপর সামাজিক দায়িত্ব বর্তে দিয়েছেন যে, ঋণের চুক্তিপত্র করার ক্ষেত্রে ঋণ গ্রহীতা যদি অক্ষর জ্ঞানসম্পন্ন না হয়, তবে তেমন ক্ষেত্রে লেখাপড়া জানা লোক ন্যায়সম্মতভাবে চুক্তিপত্র লিখে দেবে এবং সেটি করতে তারা অস্বীকার করবে না। অর্থাৎ তাদের ওপর এটি আল্লাহ প্রদত্ত একটি সামাজিক দায়িত্ব। আল্লাহ প্রদত্ত দায়িত্ব বিধায় বিশ্বাসীর পক্ষে সেটি এড়িয়ে যাওয়া সম্ভব নয়। সবাই যেন সামাজিক দায়িত্ব পালন করে সে কারণে সকলকে বিশ্বাসী হতে উদ্বুদ্ধ করা হয়।

▪ **২.২৮২.৩** ঋণ গ্রহীতা যেন লেখার বিষয়বস্তু বলে দেয় এবং সে (লেখক) যেন স্বীয় পালনকর্তা আল্লাহকে ভয় করে এবং লেখার মধ্যে বিন্দুমাত্র কম-বেশী না করে : ঋণ গ্রহীতাকে সে সুযোগ দেয়া হয়েছে যে, সে লেখককে শর্তাবলী বলে দেবে এবং লেখক হুবহু তাই লিখে দেবে। লেখার মধ্যে সে কোনরূপ বেশ-কম করবে না। তাই আল্লাহকে ভয় করার কথা স্মরণ করিয়ে দেয়া হয়েছে। অর্থাৎ সে ইচ্ছেকৃত কোন ভূল করলে গ্রহীতা বুঝতে না পারলেও আল্লাহ সব দেখেন সে কথা স্মরণ করিয়ে দেয়া হয়েছে। একদিন তিনি সকল প্রকার অন্যায় ও ছল-চাতুরির যথাযথ বিচার করবেন। এটি সতর্কবার্তা যেন মানুষ মন্দ কাজ না করে। কিন্তু এটি কাজ করবে আল্লাহতে বিশ্বাসীর ওপর। সকলেই যেন সততার সাথে কাজ করে তাই মানুষকে বিশ্বাসী হতে আহবান করা হয়।

▪ **২.২৮২.৪** অতঃপর ঋণ গ্রহীতা যদি কম বুঝে তেমন প্রকৃতির হয়, কিংবা দূর্বল অথবা নিজে লেখার বিষয়বস্তু বলে দিতে অক্ষম হয়, তবে তার

অভিভাবক ন্যায়সঙ্গতভাবে লিখিয়ে নেবে : ঋণ গ্রহীতা যদি কম বুঝে তেমন প্রকৃতির হয়, কিংবা দূর্বল অথবা নিজে লেখার বিষয়বস্তু বলে দিতে অক্ষম হয়, তবে তার কোন অভিবাবক তার পক্ষ হয়ে বিষয়গুলি যথাযথভাবে লিখিয়ে নেবে।

▪ **২.২৮২.৫** সাক্ষী রেখ; তোমাদের মধ্য থেকে দু'জন পুরুষ লোককে। যদি দু'জন পুরুষ না হয়, তবে একজন পুরুষ ও দুজন মহিলা, যাদেরকে তোমরা সাক্ষীরূপে অনুমোদন কর, যেন একজন যদি ভুলে যায় তবে অন্যজন তা স্মরণ করিয়ে দিতে পারে : চুক্তি লিখিত করার পরেও দু'জনকে সাক্ষী রাখার কথা বলা হয়েছে। মানুষের মধ্য থেকে যে কেউ সাক্ষী হতে পারে, তবে যারা বিষয়টির সাথে সম্পৃক্ত বা বিষয় সম্পর্কে অবহিত তাদের মধ্য থেকে সাক্ষী রাখা উত্তম। আবার উভয় পক্ষ যাদেরকে সাক্ষী হিসেবে অনুমোদন দেয় অর্থাৎ মেনে নেয় তেমন ব্যাক্তিগণই সাক্ষী হবে।

সাক্ষী এমন হবে যার বা যাদের বিষয়ে সমাজে কোন প্রকার নেতিবাচক ধারণা নেই। বিষয়টি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। কেননা সাক্ষীদের সাক্ষ্যের ওপর বিচারের রায় নির্ভর করে। অতএব বিচার সঠিক হবে কি হবে না সেটি সাক্ষীদের দেয়া সত্য বা মিথ্যে বা অযথাযথ সাক্ষ্য দেয়ার ওপর ভীষনভাবে নির্ভর করে। সাক্ষীদের তাই উচ্চমানের চারিত্রিক গুণসম্পন্ন হতে হবে যারা সত্য ভিন্ন মিথ্যে বা কোন প্রকারের অন্যায় কাজকে প্রশ্রয় দেয় না এবং সমাজে এ বিষয়ে তাদের সুনাম ও গ্রহণযোগ্যতা আছে তেমন প্রকৃতির।

ন্যায় সাক্ষ্যদানে যথেষ্ট সাহসী ভূমিকাও রাখতে হয়। আর এটি তাদের পক্ষেই করা সম্ভব যারা সব কিছুকে তুচ্ছ জ্ঞান করে আল্লাহতে বিশ্বাসী। সত্য ও ন্যায়ের পথে থাকাই আল্লাহর পথে থাকা। তারাই আল্লাহতে প্রকৃত বিশ্বাসী। সুনির্দিষ্টভাবে সাক্ষীদের তথা সকল বিশ্বাসীদেরকে উদ্দেশ্য করে তাই বলা হয়েছে,

"হে বিশ্বাসীগণ! তোমরা আল্লাহর উদ্দেশ্যে ন্যায় সাক্ষ্যদানে অবিচল থাক ... আল্লাহর প্রতি তোমার কর্তব্য পালন কর। নিশ্চয়ই! তোমরা যা কর সে বিষয়ে আল্লাহ জ্ঞাত।" (আল-কোরআন ৫:৮)

"(হে সাক্ষীগণ) তোমরা আল্লাহর উদ্দেশ্যে সমুন্নত হয়ে ন্যায়সম্মত সাক্ষ্য দেবে। যে ব্যাক্তি আল্লাহ ও পরকালে বিশ্বাস করে তাকে উপদেশ দেয়া হচ্ছে এভাবে কাজ করার জন্য। ...," (আল-কোরআন ৬৫:২)

বলা হচ্ছে সাক্ষী হবে দু'জন পুরুষ লোক। যেন চুক্তির বিষয় একজন ভূলে গেলেও অপরজন তা স্মরণ করিয়ে দিতে পারে। যদি দু'জন পুরুষ লোক না হয়, সেক্ষেত্রে একজন পুরুষের বিপরীতে দু'জন স্ত্রীলোক সাক্ষী হতে পারবে। অর্থাৎ একজন পুরুষ ও দু'জন স্ত্রীলোক। তবে একজন পুরুষ লোক সাক্ষী থাকা বাধ্যতামূলক কিনা সেটি কোরআনে স্পষ্ট করা হয়নি। অর্থাৎ কোন পুরুষ লোক সাক্ষী না থাকলে কেবলমাত্র চারজন স্ত্রীলোক সাক্ষী হতে পারবে কিনা সেটি স্পষ্ট নয়। তবে সাক্ষীজনিত নারী-পুরুষের এ দ্বিধাদ্বন্দ্বের বিষয়টির স্পষ্টিকরণ খুব বেশী গুরুত্বপূর্ণ নয়। অন্তত এ গ্রন্থের বিশ্লেষণের প্রেক্ষিতে।

বস্তুত সকল মানুষই সমান ও সমগুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু জীবন দর্শন ও বাস্তব অবস্থা সমাজে মানুষের ওপর প্রভাব রাখে। মানুষ সম্পর্কে মানুষের দৃষ্টিভঙ্গী গড়ে তোলে। তাতেই সমাজে কারও মূল্য, মর্যাদা ও গুরুত্ব বৃদ্ধি পায় আবার কারও মর্যাদা ক্ষুন্ন হয়। কেউ ছোট এবং কেউ বড় হয়ে যায়।

কোরআন যে সময়ে যেখানে অবতীর্ণ হয়েছে তখনকার সমাজে নারীর মর্যাদার বিষয়টি আজকের মতো ছিল না। আবার তেমন বিস্তৃত আকারে স্বীকৃতও ছিল না। হঠাৎ করে একদিনে সে অবস্থার পরিবর্তন করে দেয়াও সম্ভব না। নারীর মর্যাদা বৃদ্ধির সাথে আয়-উপার্জনক্ষম হওয়ার একটি সম্পর্ক আছে। সেটি রাতারাতি হয়ে যাওয়াও সম্ভব না। বিষয়টি সময় সাপেক্ষ। আবার সমাজে প্রচলিত ধারণার পরিবর্তনও একটি সময় সাপেক্ষ বিষয়। যা জীবন দর্শনের সাথে সম্পর্কিত বিষয়। যে সচেতনতা সৃষ্টিও একটি সময়সাপেক্ষ বিষয়।

তৎকালীন সমাজে একজন পুরুষকে যতটা গুরুত্বপূর্ণ ও মর্যাদাসম্পন্ন মনে করা হত নারীকে সেভাবে দেখা হত না। নারীর প্রতি এমন দৃষ্টিভঙ্গীর কারণে তৎকালীন আর্থ-সামাজিক অবস্থা বিবেচনায় একজন পুরুষের স্থলে দু'জন নারীর কথা বলা হয়েছে। তথাপি কোরআন তেমন সামাজিক অবস্থার প্রেক্ষাপটেও সাক্ষীর মতো একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে নারীদেরকে সম্পৃক্ত করার

বিধান রাখার মাধ্যমে সামাজিক তথা সকল কর্মক্ষেত্রে তাদের মর্যাদাকে উচ্চে উন্নীত করেছে। একই সাথে নারীদেরকে গুরুত্বপূর্ণ কোন কাজের যোগ্যরূপে জগতব্যাপী স্বীকৃতিও দিয়েছে। কিন্তু একদিনেই সব অর্জন করা সম্ভব নয়। আবার মুখে কিংবা কিতাবে বলে দিলেই সব অর্জন হয়ে যায় না। তেমন যোগ্যতা সম্পন্ন হয়ে গড়ে ওঠারও একটি বিষয় আছে। যেটি সময়সাপেক্ষ।

অপরদিকে কোন নির্দেশনাও দিতে হয় স্থান-কাল-পাত্র ও তার বাস্তবায়নের সম্ভাব্যতার বিষয়সমূহকে বিবেচনায় নিয়ে। যেন সমাজেও সেটি গ্রহণযোগ্য হয়। কঠোর পুরুষ শাসিত তৎকালীন সময়ে এমন নির্দেশনাকে যুগান্তকারী বিবেচনা করতে হবে। যা নারীদেরকে আজকের পর্যায়ে এনে দিতে জগতব্যাপি ভূমিকা রেখেছে। এমনই কোরআনের দিক-নির্দেশনা।

বর্তমান সময়ে নারীদের অবস্থার অনেক পরিবর্তন ঘটেছে। তারা এখন আয়-উপার্জন করে, সংসার চালায়, আলোচনায় অংশ নেয়, কথা বলে, মতামত দেয় এবং সকল কাজে অংশগ্রহন করে। উপরন্তু জনমত গড়ে তোলার ক্ষেত্রেও তারা এমনকি সাংগঠনিকভাবেও সর্বক্ষেত্রে বলিষ্ট ভূমিকা পালন করে চলেছে সফলতার সাথে। বস্তুত তৎকালীন সমাজে নারীদের এমন জোরালো ভূমিকা না থাকার কারণেই নারীরা পশ্চাদপদ ছিল। আবার তাদেরকে সম্মিলিতভাবেও কোনঠাসা করে রাখা হয়েছিল। কোরআনের বিভিন্ন আয়াত ভালভাবে পর্যালোচনা করলে ওপরের বক্তব্যসমূহের যথার্থতা বোঝা যাবে। যেমন কোরআনে বলা হয়েছে,

“পুরুষেরা নারীদের ওপর দায়িত্বশীল এজন্য যে, ... পুরুষেরা অর্থ-সম্পদ ব্যায় করে।” (আল-কোরআন ৪:৩৪)

অতএব সমাজ সংসারে কে দায়িত্বশীল হবে এটি কেবল নারী কিংবা পুরুষ হওয়ার দ্বারা নির্ধারিত হয় না। এটি নির্ভর করে অর্থ-সম্পদের ওপর কর্তৃত্ব কার বা সে সম্পদ ব্যায় করার অধিকার কার ওপর সেসবকে বিবেচনায় রেখে। বর্তমান সময়ে নারীরাও উপার্জন করে এবং সংসারের প্রয়োজনে অর্থ-সম্পদ ব্যায় করে। বলা হচ্ছে,

"তারা কি আল্লাহর জন্য এমন কাউকে (কন্যা সন্তান বা নারীদেরকে) নির্ধারণ করে, যে অলংকারে মন্ডিত হয়ে লালিত-পালিত হয় এবং বিতর্কে কথা বলতে অক্ষম? (আল-কোরআন ৪৩:১৮)

বস্তুত এসব আয়াতের বিদ্যমান ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণে ত্রুটি আছে। সে কারণেই কোরআনের এই যথাযথ বিশ্লেষণ তুলে ধরার প্রয়াস হাতে নেয়া হয়েছে।

ওপরোক্ত আয়াতের অর্থ এই নয় যে কোরআন এটি স্বীকৃতি দিচ্ছে যে, নারীরা অলংকারে মন্ডিত হয়ে লালিত-পালিত হয় বা হবে বা হতে হবে এবং তারা বিতর্কে কথা বলতে সৃষ্টিগতভাবে অক্ষম। বিষয়গুলি তেমন নয়।

এটি তখনকার সমাজে নারীদের অবস্থার একটি চিত্রকে তুলে ধরেছে। পুরুষ শাসিত সমাজ যেভাবে তাদেরকে চাপের মুখে রেখেছিল, যার কারণে তারা মুখ ফুটে ন্যায্য কথাটিও বলতে পারত না সে বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ করেছে এ আয়াত এবং এ অবস্থার সমালোচনা করে এর উত্তরণের প্রতি প্রচ্ছন্নে ইংগিত প্রদান করেছে। বিষয়গুলিকে যথাযথ জ্ঞানে উপলব্ধি করতে হবে।

উল্লেখ্য যে, নারীরা অলংকারে মন্ডিত হলেও দোষের কিছু নেই; যার জন্য যেটি প্রযোজ্য। অলংকারে মন্ডিত হয়েও ন্যায্য ও সত্য কথা বলা সম্ভব।

সাক্ষীর বিষয়ে আলোচনা হচ্ছে। পূর্বেও বহুবার উল্লেখ করেছি যে, কেবল শাব্দিক অর্থই কোরআনের যথার্থ দিক-নির্দেশনা নয়। যথাযথতার সাথে এর বিশ্লেষণ গুরুত্বপূর্ণ। কোরআনের দিক-নির্দেশনা হচ্ছে স্থান-কাল ও পাত্রের বিবেচনায় সত্য ও ন্যায়কে প্রতিষ্ঠা করা। বর্তমান সময়ের বিবেচনায় একজন পুরুষের স্থলে একজন নারীও সাক্ষী হতে পারবে।

■ **২.২৮২.৬** যখন সাক্ষীদের ডাকা হবে তখন অবশ্যই তারা যেন অস্বীকার না করে : বলা হচ্ছে, 'আল্লাহর প্রতি দায়িত্ব পালন কর।' প্রয়োজন বিবেচনায় আল্লাহর প্রতি বিভিন্নভাবে দায়িত্ব পালন করা সম্ভব। বলা হচ্ছে, 'যখন সাক্ষীদের ডাকা হবে, তখন অবশ্যই তারা যেন অস্বীকার না করে।' অর্থাৎ সাক্ষ্য দিতে অস্বীকার বা গড়িমসি না করতে নির্দেশনা দেয়া হয়েছে এবং যথাযথ সাক্ষ্য দিতে বলা হয়েছে। এটি মানুষের দায়িত্বের অর্ন্তভূক্ত একটি বিষয় এবং বিষয়টি গুরুত্বপূর্ণ। কেননা এর ওপর বিচারের রায়, রায়ের যথাযথতা বা সত্যতা এবং সামাজিক ন্যায্যতা প্রতিষ্ঠার বিষয়গুলি জড়িত।

সাক্ষীদের সাক্ষ্য দিতে অস্বীকৃতি, মিথ্যে বা ভূল সাক্ষ্য দেয়ার কারণে বিচারের ভূল রায় সমাজ জীবনকে কলুষিত ও অশান্তিপূর্ণ করে তুলতে পারে। সমাজে অন্যায়ের প্রবেশ ঘটাতে পারে। সমাজে ন্যায্যতা প্রতিষ্ঠা এবং শান্তি-শৃংখলা রক্ষায় যথাযথ সাক্ষ্যদান তাই সকলের দায়িত্ব ও কর্তব্যের মধ্যে পরে। আর বৃহৎ অর্থে বিষয়টি আল্লাহর প্রতি দায়িত্ব পালন এ কারণে যে, সমাজে সত্য ও ন্যায় ভূ-লুন্ঠিত হলে সেটি সৃষ্টি ধ্বংসের কারণ হতে পারে। সৃষ্টি কেবল ভূ-কম্পন বা সুনামিতেই ধ্বংস হয় না। অন্যায়-অন্যায্যতাও মানব হৃদয় থেকে শুরু করে সমগ্র সৃষ্টির ভীত কাঁপিয়ে দিতে পারে।

সৃষ্টিকে রক্ষা করা আল্লাহর প্রতি দায়িত্ব পালন করা। এটিই মানব জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ দায়িত্ব ও কর্তব্য পালনরূপে বিবেচ্য।

▪ **২.২৮২.৭** তোমরা মেয়াদ উল্লেখপূর্বক এটি লিখতে অলসতা কর না সেটি ছোট হোক কিংবা বড় হোক। আল্লাহর দৃষ্টিতে এটি অধিক ন্যায়সঙ্গত, সাক্ষ্য হিসেবে অধিক নিশ্চিত এবং তোমাদের মধ্যে সন্দেহ দূরীকরণে সর্বোত্তম পন্থা : ছোট বিষয় হোক কিংবা বড় বিষয় হোক চুক্তি লিখিত করতে বলা হয়েছে। এ বিষয়ে একেবারেই ঔদাসিন্য প্রদর্শন করতে বারণ করা হয়েছে। কেননা চুক্তি লিখিত না হলে সেটি অনেক বড় সমস্যার সৃষ্টি করতে পারে। এমনকি পারস্পরিক সম্পর্ক ধ্বংস করে দিতে পারে। বিষয়টি কম গুরুত্বপূর্ণ নয়। সম্পর্কের ওপরই এ জগত সংসার টিকে আছে (অঙ্গীকার ও সম্পর্ক দ্রষ্টব্য ২.২৭)।

চুক্তির লিখিতকরণ অধিক ন্যায়সঙ্গত হিসেবে বিবেচিত। প্রয়োজনের সময় সাক্ষ্য হিসেবে লিখিত চুক্তি অধিক নিশ্চিত এবং সন্দেহ দূরীকরণে সর্বোত্তম পন্থা হিসেবেও বিবেচিত। অতএব ভবিষ্যতে সম্ভাব্য যে কোন প্রকার বিবাদ এড়াতে লিখিত চুক্তি করার পরামর্শ দেয়া হয়েছে এবং তাতে সুনির্দিষ্টভাবে মেয়াদ উল্লেখ করতে বলা হয়েছে। এমনই কোরআনের দিক-নির্দেশনা।

▪ **২.২৮২.৮** তবে সেটি ব্যাতিত যদি কারবার নগদ হয়, পরস্পর হাতে হাতে আদান-প্রদান কর। এক্ষেত্রে তোমরা সেটি না লিখে রাখলেও কোন অন্যায় হবে না : কারবার নগদ হলে বা সাথে সাথে আদান-প্রদান হয়ে গেলে সেক্ষেত্রে লিখিত চুক্তি না করায় কোন অন্যায় নেই।

▪ **২.২৮২.৯** তোমরা ক্রয়-বিক্রয়ের সময় সাক্ষী রেখ এবং লেখক ও সাক্ষীকে ক্ষতিগ্রস্ত কর না। যদি তোমরা তা কর তবে সেটি হবে পাপ : সাক্ষী সংক্রান্ত কিছু দিক নির্দেশনা দেয়া হয়েছে এখানে। ক্রয়-বিক্রয়ের চুক্তি করার সময় সাক্ষী রাখতে বলা হয়েছে এবং লেখক ও সাক্ষীদের কোন প্রকার ক্ষতি করতে নিষেধ করা হয়েছে। যদি তেমন করা হয় তবে সেটি হবে শাস্তিযোগ্য অপরাধ। অর্থাৎ সেটি গুরুতর পাপ বা অন্যায় কাজ হিসেবে গণ্য হবে।

পূর্বেও উল্লেখ করেছি যে, সাক্ষীদের ন্যায়সম্মত সাক্ষ্যদানের ওপরে বিচারের রায়ের যথাযথতা নির্ভর করে। বিচারের যথাযথতার ওপর সমাজের শান্তি-শৃংখলা নির্ভর করে। সাক্ষীকে যে ক্ষতিগ্রস্ত করে প্রথমত তার সে কর্মই জানান দেয় যে সে অন্যায়কারী। অর্থাৎ সে সাক্ষ্যের ন্যায় সাক্ষ্যদানকে ভয় করে, যা তার অন্যায় কাজের সত্যতাকে প্রমাণ করে দিতে পারে; কিংবা সে মিথ্যে সাক্ষীর আশ্রয় নিতে চায় যা তার অন্যায় কর্মকে সত্যরূপে প্রতিষ্ঠিত করবে। এ মনোবৃত্তিটিই একটি অন্যায় মনোবৃত্তি। যার মনোবৃত্তি এমন সে অপরাধী প্রকৃতির।

অন্যায় মনোবৃত্তির কারণে বা সত্য সাক্ষ্যের ভয়ে যে সরাসরি সাক্ষীকে ক্ষতিগ্রস্ত করতে দ্বিধা করে না, সে বাস্তবেই আরও বড় একটি অন্যায় কাজ করে ফেলে। বলা হচ্ছে এমন কাজ পাপ। পাপ কাজের যেমন পরকালীন শাস্তি আছে যা আল্লাহর প্রতিশ্রুতি; তেমনি এটি ইহজগতের পরিচালনাকরীদের জন্যও একটি দিক-নির্দেশনা যে তেমন মানুষদের এ জগতেও শাস্তি প্রাপ্য।

▪ **২.২৮২.১০** আল্লাহর প্রতি দায়িত্ব পালন কর। আল্লাহ তোমাদেরকে শিক্ষা দেন। আল্লাহ সবকিছু জানেন : ক্রয়-বিক্রয় ও ঋণের চুক্তি করার দিক-নির্দেশনা প্রদানের মধ্য দিয়ে আল্লাহ মানুষকে ন্যায় ও বাস্তবসম্মত বিষয় শিক্ষা দিয়েছেন। সমাজে শান্তি-শৃংখলা রক্ষায় এ কাজগুলি করা একান্ত অপরিহার্য। আল্লাহ সকল বিষয়ের ভাল-মন্দ ও তার নির্দেশনার বিচ্যুতির পরবর্তী পরিণাম সম্পর্কে জানেন। তাই সকল বিষয়েই তিনি মানুষকে এভাবে সঠিক শিক্ষা বা দিক-নির্দেশনা দিয়েছেন।

বলা হচ্ছে যে, আল্লাহ যেভাবে শিক্ষা দিয়েছেন মানুষ যেন সে কাজগুলি যথাযথভাবে পালন করে। সঠিকতার সাথে সঠিক কাজ করাও আল্লাহর প্রতি

কর্তব্য পালন। কেননা তিনি শান্তি ও শৃংখলা রক্ষার্থে এসব জ্ঞান দান করেছেন। যারা তা পালন করে ও পালন করতে সকলকে উদ্বুদ্ধ করে তারাও আল্লাহর নির্দেশিত পথে জাগতিক শান্তি রক্ষার্থেই কর্তব্য পালন করে। যেসব বিষয় পালন করতে বলা হয়েছে এবং যেসব কাজ করতে নিষেধ করা হয়েছে, যথাযথভাবে তার পরিপালন করা আল্লাহর প্রতিই কর্তব্য পালন করা হিসেবে বিবেচিত হয়। বিষয়টি সকলকে স্মরণ করিয়ে দেয়া হয়েছে। যেন মানুষ কোন প্রকার ছল-চাতুরীর আশ্রয় না নেয় এবং মানুষ যেন স্মরণ করে যে আল্লাহর প্রতি দায়িত্ব পালনে অবহেলার জন্য মানুষকে একদিন জবাবদিহি করতে হবে। আল্লাহ সব জানেন। এটি একটি সতর্কবার্তা অন্যায় মনোবৃত্তিসম্পন্ন মানুষদের জন্য।

▪ **২.২৮৩.১** তোমরা যদি ভ্রমনে থাক এবং কোন লেখক না পাও তবে বন্ধকী বস্তু হস্তগত রাখা উচিত : বিদেশে বা সফররত অবস্থায় যদি ক্রয়-বিক্রয় ও ঋণের আদান-প্রদান হয় এবং লেখক পাওয়া না যায় তবে কোন কিছু বন্ধক রাখা যেতে পারে এবং বন্ধকরূপে যা রাখা হবে ঋণ দাতার অধিকারে সেটি দিয়ে দিতে হবে।

এভাবেই আল্লাহ যুগোপযোগী যথাযথ দিক নির্দেশনা দিয়েছেন। বর্তমানেও এসব ক্ষেত্রে যুগোপযোগী পদক্ষেপ অনুসরণীয়। এমনই কোরআনের শাশ্বত ও সার্বজনীন দিক-নির্দেশনা।

▪ **২.২৮৩.২** যদি একে অন্যকে বিশ্বাস কর, তবে যাকে বিশ্বাস করা হয় তার উচিত অন্যের প্রাপ্য পরিশোধ করা : বলা হচ্ছে, এক্ষেত্রে যদি একে অন্যকে বিশ্বাস করে তবে উভয়ের উচিত একে অন্যের প্রাপ্য পরিশোধ করা। যদি কোন কিছু বন্ধক রাখা হয় তবে যে শর্তে বন্ধক রাখা হয়েছে গ্রহীতার উচিত শর্ত পুরণ করা এবং শর্ত পুরণ হলে বন্ধকী বস্তু যথাযথভাবে ফেরত দিয়ে দেওয়াও ঋণ দাতার কর্তব্য।

এভাবেই আল্লাহ মানবজাতির জন্য প্রতিটি ক্ষেত্রে ন্যায়সম্মত দিক-নির্দেশনা দিয়েছেন। যে দিক-নির্দেশনার যথাযথ পরিপালন সমাজ ও জগত সংসারকে শান্তিপূর্ণ রাখতে ভূমিকা রাখে। মানুষকে আল্লাহর দিক-নির্দেশনার ওপর আস্থা ও বিশ্বাস রেখে নির্দেশনা পলন করতে বলা হয়েছে।

আল্লাহর নির্দেশনা পালন করলেই মানুষ জানতে, বুঝতে এমনকি প্রমাণ পাবে যে এ পথই যথাযথ ও শান্তির এবং সবচাইতে জটিলতামুক্ত সরল পথ। জগতের সকল মানুষকে তাই আল্লাহতে বিশ্বাসী হয়ে আল্লাহর দিক-নির্দেশনায় সমর্পন করতে আহবান করা হয় শান্তি প্রতিষ্ঠা ও রক্ষার স্বার্থে।

■ **২.২৮৩.৩** এবং স্বীয় পালনকর্তা আল্লাহকে ভয় করা (Let him observe his duty to Allah his Lord) : একদিন আল্লাহর বিচারের দিন আসবে, সেদিন অন্যায়কারীর জন্য দিনটি সুখকর হবে না। যে আল্লাহকে বিশ্বাস করবে এবং বিচার দিবসে আল্লাহর বিচারের ভয় করবে সে নিজে কোন মন্দ পথ অবলম্বন করা থেকে এ কারণে বিরত থাকবে।

মানুষ যেন একে অন্যের সাথে ছলচাতুরি না করে তাই এটি এখানে স্মরণ করিয়ে দেয়া হয়েছে। সে কারণেই আল্লাহতে বিশ্বাস গুরুত্বপূর্ণ। সকল মানুষকে তাই বিশ্বাসী হতে আহবান করা হয়। বিশ্বাসী হয়ে যেন সকলেই নিজ থেকে আল্লাহর নির্দেশনা মেনে চলে। সরল পথে চলে।

■ **২.২৮৩.৪** সাক্ষ্য গোপন কর না। যে তা গোপন করে অবশ্যই তার অন্তর পাপপূর্ণ : খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি দিক-নির্দেশনা। সাক্ষ্য গোপন করতে নিষেধ করা হয়েছে। এটি অত্যান্ত অন্যায় একটি কাজ। সত্য সাক্ষ্যের ওপরই বিচারের ন্যায্যতা নির্ভর করে। বিচারের ন্যায্যতার ওপর সামাজিক শান্তি-শৃংখলা নির্ভর করে। যে সাক্ষ্য গোপন করে বলা যায় যে, যথাযথ বিচার ব্যাবস্থাকে সে ভূলুন্ঠিত করে দেয় বা করার চেষ্টা করে। যা সমাজে ন্যায় প্রতিষ্ঠার প্রতিবন্ধকস্বরূপ এবং সমাজে অন্যায় প্রবেশের পথকেও প্রশস্ত করে দেয়।

যদি কেউ সাক্ষ্য গোপন করে তবে এর অপর অর্থ হচ্ছে এই যে, সে সত্যটি জানে এবং জানে বিধায় সে তা কোন কারণে গোপন করতে চায়। এটি এক অর্থে অন্যায়কারীকে সমর্থন করা এবং নিজেকেও অন্যায়ে জড়িয়ে ফেলা। এমন মানুষ ন্যায়বিচার প্রত্যাশী না। তাই বলা হয়েছে যে, যে তেমন কাজ করে অন্তর তার পাপপূর্ণ। আল্লাহর বিচারের দিবসেও এরা দোষী সাব্যস্ত হবে এবং ইহজগতেও তেমন মানুষের জন্য বিচারের ব্যাবস্থা থাকতে হবে এবং সাক্ষী হিসেবে তাদেরকে অযোগ্য ঘোষনা করতে হবে, যদি না ক্ষমার শর্ত পুরণ করে ক্ষমা প্রার্থনা করে।

উল্লেখ্য যে, সাক্ষ্য দু'ভাবেই গোপন করা যায়। সাক্ষ্যের উপাদান বা বস্তু গোপন করে। আবার ঘটনার সত্যতা অস্বীকার করে বা মিথ্যে বলে অর্থাৎ যে কোনভাবে সত্য গোপন করে।

▪ **২.২৮৩.৫** তোমরা যা কর আল্লাহ তা অবহিত (Allah is Aware of what ye do) : বিষয়টি স্মরণ করিয়ে দেয়া হয়েছে। কেউ গোপনে কিংবা ছল-চাতুরীর আশ্রয় নিয়েও যদি অন্যায় কাজ করে যেমন সাক্ষ্য গোপন করা, সাক্ষীর ক্ষতিসাধন করা ইত্যাদি, তবে সে যেন জানে যে আল্লাহ সব কিছুই জানেন [দ্রষ্টব্য ২.২৯.৪]। বস্তুত মানুষ নিজে যা জানে আল্লাহই তা জানেন। শেষ বিচার দিবসে হলেও তাকে পরিণতি ভোগ করতে হবে। অন্যায়কারী কখনও কোনদিনই পার পাবে না।

এটি অন্যায়কারীকে অন্যায়করণ থেকে বিরত রাখতে কৌশল হিসেবেও কাজ করে। অন্যদিকে ন্যায় প্রত্যাশী ও বিশ্বাসীকে আশাপ্রদ করে। আল্লাহতে এবং বিশ্বাসের অপরাপর শর্তসমূহে বিশ্বাস রাখা তাই অত্যান্ত গুরুত্বপূর্ণ। এ বিশ্বাস বিধি-বিধানসমূহের সাথে এমনভাবে সম্পর্কিত যে তা জাগতিক শান্তি ও শৃংখলা রক্ষায় সহায়ক হয়ে কাজ করে। সকল মানুষকে সে কারণেই বিশ্বাসী হতে আহবান করা হয়। জগতের কল্যাণার্থে।

▪ **চুক্তি** (Contract) (অয়াত নং ২.২৮২-২.২৮৩)

চুক্তি সম্পর্কে উদ্ধৃত আয়াতসমূহে যা বলা হয়েছে তা এত স্বচ্ছ ও পরিস্কারভাবে বলা হয়েছে যে, এর বাড়তি ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের প্রয়োজন হয় না। বলা যায় যে আয়াত দু'টি স্ব-বিশ্লেষিত আয়াত। উপরন্তু বিভিন্ন গ্রন্থে এসব আয়াতের অনেক ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করাও হয়েছে। এখানে আরও বিশ্লেষণ করতে গেলে একই বক্তব্যের পুনরাবৃত্তি হয়ে যাবে। গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে এটি উপলব্ধি করা যে, এ দিক-নির্দেশনা কেন? এখানে সে বিষয়ে কিছু আলোচনা করতে চাই।

চুক্তিতে যারা আবদ্ধ হবে, নিশ্চয়ই তারা কিছু একটা করার জন্য সম্মত হয়েই তা করবে এবং সেটির যথাযথ পরিপালনই সকল পক্ষের নিকট থেকে প্রত্যাশিত। সেটিই ন্যায়সম্মত আচরণ। মানুষকে ন্যায় আচরণটিই করতে হবে।

এটিই সরল পথ। মানুষ সত্য ও ন্যায় পথে চললে এত নিয়ম কানুনের প্রয়োজন হয় না। কিন্তু অনেকেই সহজ নিয়মটিকে সহজভাবে বোঝে না বা গ্রহণ করে না। আবার সব মানুষ ন্যায় পথে চলেও না। তাই এত দিক-নির্দেশনা।

চুক্তি সম্পর্কিত এ আয়াতে গুরুত্ব পেয়েছে মূলত বিশ্বাস ভঙ্গের বিষয়টি। কেননা চুক্তির সাথে অলিখিতভাবে বিশ্বাসের একটি সম্পর্ক আছে। লিখিত চুক্তির বিষয়টি উদ্ধৃত হয়েছে মূলত বিশ্বাস ভঙ্গের সম্ভাব্য আশংকা থেকে। যা শেষ পর্যন্ত আইন-কানুন, বিচার-সালিশ, মামল-মোকদ্দমা পর্যন্ত যেতে পারে। অতএব আয়াতের দিক-নির্দেশনাটি এ জন্য যে, যদি কোন পক্ষ দ্বারা চুক্তির শর্তসমুহে যথাযথভাবে বিশ্বাস রক্ষিত না হয়, তবে সেক্ষেত্রে যা করণীয় এটি তার পূর্ব প্রস্তুতি। অর্থাৎ পরবর্তীতে প্রয়োজনীয় বিচার-সালিশের জন্য প্রমাণ পত্র ও সত্য সাক্ষী প্রস্তুত করে রাখা।

এ থেকে এটিও বোঝা যায় যে, তৎকালীন সামাজ ব্যাবস্থায় চুক্তির ক্ষেত্রে এমন বিচ্যুতির ঘটনা অহরহই ঘটত এবং এর বিহিত করার মতো তেমন ভাল কোন উপায় বা পথ ছিল না। তাই এখানে একটি যথাযথ পথ-নির্দেশনা দেয়া হয়েছে। সর্বপরি আল্লাহতে বিশ্বাস রেখে কাজগুলি যথাযথভাবে করতে বলা হয়েছে। আল্লাহতে বিশ্বাস তাই অত্যান্ত গুরুত্বপূর্ণ। এখানে আল্লাহতে বিশ্বাস এর অপর অর্থই হল শেষ বিচার দিবসে বিশ্বাস রাখা!

চুক্তির বিষয়ে এ বার্তা তখনকার প্রেক্ষাপটে একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক-নির্দেশনা হিসেবে প্রয়োজনীয় ছিল। এমনকি আলোচ্য বিষয়ে এখানে যে মৌলিক দিক-নির্দেশনা দেয়া হয়েছে তা আজও সমভাবে প্রযোজ্য। এর অন্তর্নিহিত মূল বক্তব্য দিক-নির্দেশনারূপে সার্বজনীন ও শাশ্বত।

কেবল চুক্তি নয়, সকল বিষয়েই লেখাপড়া বর্তমানে অনেক উন্নত হয়েছে। জ্ঞান সমৃদ্ধ হয়েছে। প্রাথমিক সময়ের এ সকল মৌলিক দিক-নির্দেশনাসমূহকে ধারণ করেই অগ্রগতি সাধিত হয়েছে। বর্তমান প্রেক্ষাপট পূর্বের তুলনায় ভিন্ন ও জটিলতর হয়েছে। দুষ্টরা এখন ছল-চাতুরীর নতুন নতুন কলা-কৌশলের আশ্রয় নিয়ে বিশ্বাস ভঙ্গ করে থাকে। আধুনিক ব্যাবস্থাপনায়েও সকল দিক বিবেচনায় রেখে যথাসাধ্য ত্রুটিহীনভাবে পেশাদার লোকদের দিয়ে এসব চুক্তি করানর

ব্যাবস্থা গ্রহণ করা হয়। তারপরেও সমস্যা থাকে এবং হয়। তারপরেও শক্তি ও ক্ষমতাও প্রদর্শিত হয়। অতএব বুঝতে হবে যে, সমস্যাটি কেবল এখানেই নয়।

সমস্যা হচ্ছে বিশ্বাসে বা বিশ্বাস ভঙ্গে; কথা দিয়ে কথা না রাখায়। সত্যিকারের অপারগতার কারণে বিশ্বাস ভঙ্গ হলে বিষয়টি ভিন্ন। আবার অপারগতার অভিনয়ের বিষয়টিও ভিন্ন। বিশ্বাস ভঙ্গের বা কথা দিয়ে কথা না রাখার সমস্যাটি তৎকালীন সময়েও ছিল। ছিল বলেই এমন দিক নির্দেশনার প্রয়োজন হয়েছে। আজও আছে।

এখানে যা বলা হয়েছে এবং আধুনিক কালের লেখা-পড়ায়ও যা বলা হয়, তার মূল বিষয়টি হচ্ছে সাক্ষ্য-প্রমাণ রাখা। সেটি লিখিত রাখার ক্ষেত্রে এবং সাক্ষী রাখার ক্ষেত্রেও। অতঃপর সমস্যা সৃষ্টি হলে বিচার-সালিশে যাওয়া।

বিচার ব্যাবস্থায় গিয়ে সমস্যা সমাধানের চেষ্টা করা আদৌ সুখকর নয়। এতে সময়ক্ষেপন হয় এবং অনেক ক্ষেত্রে কাগজ-পত্র মিথ্যেকে সত্য প্রমাণ করে দেয়। আছে অর্থ ও ক্ষমতার দাপট। বিচারপতিদেরও অসহায়ত্ব আছে। বিচারকগণও স্বাধীনভাবে রায় দিতে পারে না অনেক ক্ষেত্রে। তারাও চাপের মুখে থাকে। যাকে ‘বিব্রত’ শব্দ দিয়ে বোঝান হয়। অনেকে পূর্ব থেকেই কোন দিকে ঝুঁকে থাকে। অতঃপর অসহায় সেই অসহায়। সমস্যা সেই সমস্যাই থেকে যায়। উপরন্তু প্রতি পদক্ষেপে বা কাজে বিচার-সালিশের মুখোমুখী হতে হলে কাজ করাও সম্ভব নয়। বর্তমান সময়ে অনেক বুদ্ধিমান ইচ্ছেকৃতভাবে বিষয়গুলিকে আদালত পর্যন্ত নিয়ে যায়। আদালত মানেই কালক্ষেপন। ভূক্তভোগী আজীবন ভূক্তভোগীই থেকে যায়।

আদালতের দেয়া শাস্তিকেও মানুষ আজকাল ভয় করে না। সেখান থেকে বেরিয়ে আসার পথও জানে। বিকল্প পথেরও উদ্ভব হয়েছে আজকাল।

সাক্ষী প্রমাণ রাখা না রাখা আজকাল এক অর্থে এক হয়ে গেছে। বিচারালয়ে গিয়ে বরং অত্যাচারী-অন্যায়কারীদের সুবিধা হয়। কেননা তারা এর আশ্রয়ে সমস্যাকে জিইয়ে রেখে দীর্ঘায়িত করে। অন্যদিকে জীবন পরিপূর্ণ বিলাসীতায় অতিবাহিত করে দিতে পারে। আধুনিক বিচার ব্যাবস্থার আশ্রয় নিয়েও বঞ্চিত অনেক ক্ষেত্রে বঞ্চিতই থেকে যায়।

মূল সমস্যা হচ্ছে বিশ্বাস ভঙ্গে। মানুষ মানুষের সঙ্গে বিশ্বাস ভঙ্গ করে। কথা দিয়ে কথা রাখে না। আর এটি সহজেই ঘটে যখন আল্লাহ ও পরকালে

নিজ থেকে আন্তরীক ও সত্যিকারের বিশ্বাস রাখে না বা সমাজ তা রাখতে সহায়কের ভূমিকা পালন করে না। সত্যি বলতে আল্লাহ ও পরকালে বিশ্বাসের কোন বিকল্প উপায় নেই। কোরআন তাই মানব জীবনের জন্য এক সঠিক ও যথাযথ দিক-নির্দেশনা।

সত্যি বলতে সমাজের সুবিধাভোগীরাই কোরআনের বাণী সমুন্নতকরণে সত্যিকারের বড় বাধা বা বিরোধীতাকারী। অথচ তারাই এর পৃষ্ঠপোষক সাঁজে! তারা সব উপায় অবলম্বন করে নিজেরা ভাল থাকতে জানে। পোষ্যরা নিজেদের স্বার্থ ক্ষুন্ন হলেও না বুঝেই এসব রূঢ় সত্য কথার বিরোধীতা করে।

আল্লাহ ও পরকালে বিশ্বাস মানুষের নিজেকেই নিজের ভাল পথে চালিত করতে পারে। বর্তমান সময়ে এর প্রয়োজনীয়তা বেশী গুরুত্বপূর্ণ হয়ে দেখা দিয়েছে। পৃথিবীর ইতিহাসে শক্তির দাপটে অন্যায় আচরণ করে চিরকালই কিছু মানুষ ভোগ-বিলাসী জীবন-যাপন করেছে। কিন্তু তা টিকে থাকেনি। পৃথিবীতে এ ক'দিনের ভাল থাকা, বেশী পাওয়া, বেশী খাওয়া, অধিক মর্যাদার মূল্যই বা কি আছে মৃত্যুর পরে? এগুলি রিপু থেকে সৃষ্ট মানসিক সমস্যা। এগুলিকে দমন করতে শিখতে হবে। আত্ম-নিয়ন্ত্রিত হতে হবে। তেমন শিক্ষার মাধ্যমে মানুষকে গড়ে তুলতে হবে। প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ্য যে, সমগ্র গীতায় বস্তুত সে পথই প্রদর্শিত হয়েছে।

প্রয়োজন হচ্ছে ন্যায়-সম্মত সমাজ গঠন যা দীর্ঘমেয়াদে শান্তিপূর্ণভাবে টিকিয়ে রাখা সম্ভব হবে। কারও অতি মর্যাদার প্রয়োজন নেই। সকলেই সাধারণ জীবন-যাপন করবে ন্যায্যতার ভিত্তিতে। কিন্তু প্রতিটি মানুষের ভেতরে বাসা বেধে থাকা দুষ্ট চরিত্রগুলি তা হতে দেয় না। যে অর্থ মামলা মোকদ্দমায় খরচ করা হয়, তা আল্লাহ ও পরকালের বিচারের ধারণা প্রচার-প্রসার ও সে দর্শনকে বাস্তবসম্মত উপায়ে কঠিনভাবে ধরে রাখার ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হলে হয়তবা উপকার বেশী পাওয়া যেত। বিচারকদের এ বিষয়ে কাজ করা উচিত।

কোরআনে উল্লেখিত ওপরের দিক-নির্দেশনাসমুহ অবশ্য পালনীয়। তবে সেটি তাৎক্ষণিক ব্যাবস্থা হিসেবে। অর্থাৎ ধারণায় এমন পরিস্থিতির অবসান বা উচ্ছেদকে ধারণ করতে হবে। বিশ্বাসের মর্যাদাকে সমুন্নত করা ও একে প্রতিষ্ঠা করার বিষয়টিতে অধিক গুরুত্ব দিতে হবে। আলোচনায় এটি বেশী বেশী

আসতে হবে। এ বিষয়ে অবজ্ঞা প্রদর্শন করার প্রবণতার অবসান ঘটাতে হবে। সমাজে বিশ্বাসের মর্যাদাকে সমুন্নত করতে হবে। বিশ্বাসের যথাযথ মূল্য দিতে হবে। গুরুত্ব সহকারে সমাজে এর প্রচার-প্রসারে কাজ করতে হবে।

আয়াতে সাক্ষীর কথা বলা হয়েছে। সাক্ষী মিথ্যে সাক্ষী দিলে বা দিতে বাধ্য হলে নিরোধের উপায় কি? সাক্ষী গোপন না করতে বলা হয়েছে। কিন্তু গোপন করলে উপায় কি? লিখিত চুক্তি করার কথা বলা হয়েছে, তথাপি ভঙ্গ করলে করার কি? আধুনিক আইনেও এগুলি করতে বলা হয়নি। সেখানেও শাস্তির ভয় দেখান হয়েছে। তবুও ঘটে।

বাস্তব জীবনে আল্লাহর ভয় নয় আইনের ভয় দেখান হয় বা আইনকে ভয় করতে বলা হয়। মানুষ আইনকে কেন ভয় করবে? আইনকে ভয় করবে আইনের কঠোর বাস্তবায়নকারীর জন্য। কিন্তু আইনের বাস্তবায়নকারী কোন রাজা, বাদশাহ বা কোন সরকারকে ভয় করার কথা বললে আইনের সে বাস্তবায়নকারীকে কঠোর হতে হয়। কঠোর হতে গিয়ে একসময় নিজেও সীমা অতিক্রম করে। নিজেকে সীমার মধ্যে ধরে রাখতে পারে না। অতঃপর অত্যাচারী হয়ে ওঠে। কিংবা রাজনীতির খেলায় তার ধ্বস নামাবার জন্য তারই অধীনস্তরা সে না চাইলেও অতিরঞ্জিত কাজ করে ধ্বস নামায়। কোন ব্যবস্থাই এসব সমস্যার চিরস্থায়ী কোন সমাধান করতে পারবে না। সত্যি বলতে মানুষের নিজেকেই ভাল হতে হবে। কিন্তু কোন রাজা, বাদশাহ বা সরকার প্রতিটি 'ব্যাক্তি মানুষ'কে ভাল করতে পারবে না। একটু গভীরভাবে চিন্তা-ভাবনা করলে মানুষ নিজেই এসব কথার যথার্থতা বুঝতে পারবে।

সমস্যা সমাধানে তাই একমাত্র আল্লাহ ছাড়া কোন গত্যান্তর নেই। আল্লাহ ও পরকালীন বিচার ব্যাবস্থায় বিশ্বাস করা তাই অতি অতি গুরুত্বপূর্ণ। সমাজের সকল মানুষের ভেতরে এ ধারণা বা দর্শনকে সমুন্নত করতে হবে। যে শিক্ষার শুরু হতে হবে শৈশব থেকে এবং হতে হবে বাধ্যতামূলক। তবে এক্ষেত্রেও যেন অতি কল্প-কাহিনী দিয়ে বস্তুনিষ্ঠতাকে বিনষ্ট করা না হয় সে বিষয়ে সচেতন থাকতে হবে। সমাজের প্রতিটি মানুষই নিজ থেকে অন্যায় কাজের বিপক্ষে প্রকাশ্যে অবস্থান নেবে। শিক্ষাটি এমনই হতে হবে। কোরআনের দিক-নির্দেশনা হবে মানুষের জন্য অনন্য এক প্রেরণা! সব বিষয় আদালত পর্যন্ত নিয়ে যেতে হবে না।

বলা হচ্ছে, '(লেখক) যেন স্বীয় পালনকর্তা আল্লাহকে ভয় করে এবং লেখার মধ্যে বিন্দুমাত্রও বেশ কম না করে।' 'লেখক ও সাক্ষীকে ক্ষতিগ্রস্ত কর না। যদি তোমরা তা কর তবে সেটি হবে পাপ।' এ কাজগুলিকে এখানে সরাসরি পাপ বা অন্যায় বলা হয়েছে। সাধারণ জ্ঞানও এগুলিকে অন্যায় বলে। আল্লাহর প্রতি কর্তব্য পালন করতে বলা হয়েছে। এক্ষেত্রে এ কর্তব্য পালনকে এভাবেই বুঝে নিতে হবে যে, এমন অন্যায় ঘটে থাকলে সমাজ তাকে প্রতিহত করার ব্যাবস্থা নেবে। সে ব্যাবস্থা নেয়ার ক্ষেত্রে আয়াতে উল্লেখিত পদক্ষেপসমূহ সহায়ক এবং করণীয়।

প্রশ্ন হচ্ছে কে পালন করবে সে দায়িত্ব? দুষ্টরা হেন কাজ নেই যা করতে পারে না। তাদেরকে সবাই ভয় করে। এসব কাজ করার অনেক বাহিনী সরকারেরও থাকে। কিন্তু তাদেরও সবাই আল্লাহতে সত্যিকারের না বিশ্বাসী, না ভীত! যখন সমাজের রন্ধ্রে রন্ধ্রে অন্যায় প্রবেশ করবে, তখন তারাও তাদের চাকরির শর্ত ভঙ্গ করে অন্যায় কাজ করবে এটিই স্বাভাবিক। তারা তো সমাজের বাইরের কিছু নয়। তাই সমাজে আল্লাহ ও পরকালে বিশ্বাসী তথা কোরআনের সঠিক ব্যাখ্যা সম্বলিত ধারণায় বিশ্বাসীদের একটি বাহিনী থাকা বাঞ্ছনীয়, যারা 'জাগতিক প্রাপ্তি বা লোভকে বর্জন' করে এ কাজগুলিকে সমুন্নত রাখবে।

'যাকে বিশ্বাস করা হয় তার উচিত অন্যের প্রাপ্য পরিশোধ করা' এটি উচিত। কিন্তু উচিত কাজ না করলে? তাই সকল কথার নির্যাসরূপে শেষের কথাটুকু বলা হয়েছে, 'স্বীয় পালনকর্তা আল্লাহকে ভয় করা'। যা ছাড়া চুক্তির শর্তসমূহ বাস্তবায়ন করার ক্ষেত্রে আর কোন গত্যান্তর নেই।

একইভাবে বলা হয়েছে, 'সাক্ষ্য গোপন কর না। যে তা গোপন করে অবশ্যই তার অন্তর পাপপূর্ণ।' সকল মন্দ কাজই না করতে বলা হযেছে এবং মানুষ সম্পর্কে একটি ধারণা দেয়া হয়েছে। কিন্তু মূল বক্তব্য রয়েছে শেষে, অর্থাৎ 'তোমরা যা কর আল্লাহ তা অবহিত।' আল্লাহ সব জানেন। শেষ বিচারের দিনে ধরা হবে।

এ বাণী ভুক্তভোগীর ভেতরে আশার সঞ্চার করে, প্রাণের সঞ্চার করে। অত্যাচারীকে ভীত করে। কিন্তু বিশ্বাসহীনকে ভীত করবে না। তাই বিশ্বাস স্থাপন জরুরী। যে শিক্ষা শৈশব থেকেই সকলকে দেয়া প্রয়োজন। কোরআনে

উল্লেখিত বিশ্বাসের বার্তার প্রচার-প্রসার তাই অত্যান্ত গুরুত্বপূর্ণ। সমাজে শান্তি-শৃংখলা রক্ষা করা ও ন্যায় প্রতিষ্ঠার স্বার্থে সকল বোধসম্পন্ন মানুষের এ কাজে অংশগ্রহণ করা প্রয়োজন। এটি একটি দর্শন যা জীবন ও জগতের কল্যাণার্থে দিক-নির্দেশনারূপে অবতীর্ণ হয়েছে।

আল্লাহ ও পরকালে বিশ্বাস রেখে 'প্রতিটি ব্যাক্তি' নিজ থেকে ভাল হয়ে না চললে সমস্যার প্রকৃত অর্থে দীর্ঘস্থায়ী কোন সমাধান নেই। লক্ষ লক্ষ ঝুলন্ত মামলার মধ্যে হাজারে দু-একটি ভাল ও সঠিক রায় এবং তার পেছনে ব্যায়িত অর্থ, শ্রম ও সময়ের অপচয় বিবেচনায় নিলে এগুলি কোন ফলদায়ক কিছু নয়। অর্থাৎ এসব ক্ষেত্রেও সুশাসন ও সঠিক ব্যাবস্থাপনা দরকার। যারা নিয়ম সংরক্ষণ করবে তাদের সততা, যোগ্যতা, দক্ষতা, সামর্থ অনেক কিছুর প্রয়োজন আছে। যোগ্যতা, দক্ষতা, সামর্থ হয়তবা শিক্ষা-প্রশিক্ষন-বাজেট বরাদ্দ দিয়ে হবে, কিন্তু সততা?

আল্লাহ ছাড়া গতি নেই। কেননা সর্বত্রই এককে দিয়ে অপরকে চোখে চোখে রাখার ক্ষেত্রেও অসততা ঘটতে পারে। পরিশেষে আল্লাহতে বিশ্বাস এবং তাঁকে ও পরকালে তাঁর বিচারের ভয়কে লাগবেই।

'আল্লাহর প্রতি কর্তব্য পালন কর। তোমাদের মধ্যে সন্দেহ দুরীকরণে সর্বোত্তম পন্থা।' সমস্যার সৃষ্টি হওয়ার সম্ভাবনাকে হ্রাস করাও আল্লাহর প্রতি কর্তব্য পালন করা। অন্যথায় সমাজে বড় সমস্যার সৃষ্টি হতে পারে। ছোট ছোট অন্যায় বড় অন্যায়ের সৃষ্টি করে। একটি দুটি অন্যায় থেকে বৃহত্তর পরিসরে বড় আকারে অন্যায়ের সৃষ্টি হয়। সমস্যার সৃষ্টি হওয়ার সম্ভাবনাকে অঙ্কুরেই হ্রাস করার প্রচেষ্টা গ্রহণ করা তাই আল্লাহর প্রতি এক গুরুত্বপূর্ণ কর্তব্য পালন করারূপে বিবেচিত। সন্দেহ দুরীকরণে তাই পূর্ব থেকেই উত্তম পন্থা গ্রহণ করার জন্য বলা হয়েছে।

এটিও অত্যান্ত গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্বের মধ্যে পরে যে, 'তোমরা মেয়াদ উল্লেখপূর্বক এটি লিখতে অলসতা কর না, সেটি ছোট হোক কিংবা বড় হোক। আল্লাহর দৃষ্টিতে এটি অধিক ন্যায়সঙ্গত, সাক্ষ্য হিসেবে অধিক নিশ্চিত এবং তোমাদের মধ্যে সন্দেহ দুরীকরণে সর্বোত্তম পন্থা।'

এমনকি ঘনিষ্টজনদের সম্পর্কও এই অবহেলা করার কারণে বিনষ্ট হতে পারে। পৃথিবীকে ধরে রাখে মূলত সম্পর্ক [অঙ্গীকার দ্রষ্টব্য ২.২৭]। সে

সম্পর্কের গভীরতা অধিক থাকে কাছের মানুষদের বা আত্মীয়দের মাঝে। সেটি ছুটে গেলে জগত অচল হয়ে যায়। কেউ কাউকে বিশ্বাস করতে পারে না। এক সমস্যা আরেক সমস্যার উৎপত্তি করে। বিশ্বাস দিয়েই পৃথিবী চলে। বিশ্বাসহীনতা সমাজে ছড়িয়ে পড়লে সমাজ নষ্ট হয়ে যায়। বিশ্বাস ভেঙ্গে গেলে অরাজকতা ভিন্ন আর কিছুই থাকেনা। তাই বিশ্বাস নষ্ট না হয় তেমন পদক্ষেপ পূর্ব থেকে নেয়া প্রতিটি মানুষের দায়িত্ব ও কর্তব্যের মধ্যে পরে।

আয়াতে লেন-দেন বা ক্রয়-বিক্রয় বা ঋণ গ্রহণের ক্ষেত্রে চুক্তি সম্পর্কিত বিষয় আলোচিত হয়েছে। উল্লেখ্য যে, কোরআন যে যুগে অবতীর্ণ হয়েছে তার চৌদ্দ'শ বছর পরের ঘটনার ক্ষেত্রেও কোরআন থেকে দিক-নির্দেশনা পাওয়া যায়। কেননা কোরআন থেকে একটি বিষয়ের ওপর প্রাপ্ত দিক-নির্দেশনা থেকে একই প্রকৃতির অপরাপর বিষয়েও দিক-নির্দেশনা পাওয়া যায়। তাই কোরআন সকল বিষয়ের ক্ষেত্রেই দিক-নির্দেশনা হয়ে কাজ করে। কিন্তু এটিও স্মরণযোগ্য যে এটি বিষয়ভিত্তিক কোন গ্রন্থ নয়। কোন একটি সুনির্দিষ্ট বিষয়ের আদ্যোপান্ত এখানে আলোচনা করা হয়নি।

কোরআন মহাকাশ সংক্রান্ত বিষয়ের কোন পুস্তক নয়; নয় পদার্থ, রসায়ন বা সামাজিক ও অর্থনীতি বিষয়ক বিশেষায়িত কোন গ্রন্থ। অথচ এটি এমন এক গ্রন্থ যেখানে সকল বিষয়ের জন্যই দিক-নির্দেশনা আছে। কেন এবং কিভাবে এটি সম্ভব হয়েছে? কারণ কোরআন সকল ক্ষেত্রেই মূল সূত্রটি ধরিয়ে দিয়েছে বা মূল দিক-নির্দেশনাটি দিয়ে দিয়েছে। কিন্তু সমসাময়িক সময়ের প্রতিটি কাজের বা সমস্যার সমাধান করা বা সমাধান খুঁজে বের করা মানুষের নিজেদের কাজ ও দায়িত্বের অন্তর্ভূক্ত বিষয়। সে কাজ করতে গিয়ে কোরআনের দিক নির্দেশনাকে বিবেচনায় নিলে মানুষ সুফল পাবে বা বলা যেতে পারে যে, সমস্যা সমাধানের সহজ পথ ন্যায্যতার ভিত্তিতে উন্মোচিত হবে।

কোরআনে সকল বিষয় ও কর্মের ক্ষেত্রেই নৈতিক, আচরণিক ও মানসিক বিষয়গুলি প্রাধান্য পেয়েছে। যা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। যা প্রতিটি কাজ ও বিষয়ের সাথে বা অন্তরালে কঠিনভাবে সম্পৃক্ত থাকে। এমনকি একটু ভেবে দেখলেই বোঝা যাবে যে, যে চুক্তি বিষয়ে এত কথা এত দিক-নির্দেশনা আলোচিত হচ্ছে তার পেছনের মূল কারণটিও হচ্ছে 'নৈতিকতার স্খলনজনিত'। কোরআনের

বাণী তাই সার্বজনীন ও শাশ্বত। কেননা এটি এমন বিষয় নিয়ে কথা বলে যা সকল যুগে, সকল অবস্থানে ও সকল বিষয়ের সাথে যুক্ত থাকে। যার অবনতি ঘটলে সমাজ ও পরিবেশ বিশৃংখল হয়ে যায়। কোরআনের দিক-নির্দেশনাকে সমুন্নত রাখা তাই সমাজ ও পরিবেশের স্বার্থে সমাজের মানুষেরই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব। হিন্দু-মুসলিম-বৌদ্ধ-খ্রীষ্টান এভাবে পৃথকীকরণ করে ভাববার প্রয়োজন নেই। মানুষের পৃথিবীকে, মানুষের নিজেদের স্বার্থে মানুষকেই সুন্দর করে গড়ে তুলতে হবে।

কোরআন সমাজ-পরিবেশ ও সকল মানুষের বিকাশের জন্য এক অতুলনীয় অনুপ্রেরণা হয়ে কাজ করে!! কোরআন এসেছে জগতের সকল মানুষের জন্য। এটি কেবলমাত্র মুসলিমদের জন্য প্রদত্ত দিক-নির্দেশনামূলক গ্রন্থ নয়। যারা এর বাণী সমুহের যথার্থতাকে উপলব্ধি করে এবং নিজেদের জীবনে সেটি অনুসরণ করে চলে তারাই এ বার্তার প্রেরণকারীর প্রতি সমর্পিত। তারাই মুসলিম। বিষয়গুলিকে সেভাবে বুঝতে হবে। গ্রামার অনুসরণ না করেও মানুষ কথা বলতে পারে। কাজ করতে পারে। এগুলিই বাস্তব ও সত্য! সত্যকে বুঝতে ও উপলব্ধি করতে হবে; স্বীকার করতে হবে; সকলের প্রতি সহনশীল ও সহমর্মী হয়ে মানবজীবন পরিচালনা করতে হবে।

কোন ঋণ বা দ্রব্যের লেন-দেন বা ক্রয়-বিক্রয়ের ক্ষেত্রে যেমন চুক্তি হয়ে থাকে তেমনি বিবাহও একটি চুক্তি; আরও আছে যেমন সামাজিক চুক্তি। সংবিধানও এক প্রকার চুক্তি। ব্যাংক থেকে নেয়া ঋণও চুক্তির মধ্যমে নিতে হয়। চুক্তির ক্ষেত্রে চুক্তি ভঙ্গের মনোবৃত্তি সকল ক্ষেত্রেই মন্দ। যাদের অন্তরে তেমন মানসিকতা আছে তারা ক্ষুদ্র থেকে বৃহৎ চুক্তিও ভঙ্গ করে। মূলত চুক্তি ভঙ্গ নয়, বিশ্বাস ভঙ্গ।

গ্রন্থে অঙ্গীকারের বিষয় নিয়েও আলোচনা করা হয়েছে [অঙ্গীকার দ্রষ্টব্য ২.২৭]। মানবজাতিও কিছু বিষয়ে আল্লাহর সঙ্গে অঙ্গীকারাবদ্ধ বলে বলা হয়েছে। মানুষকে বিষয়গুলি জানতে হবে এবং তা পরিপালন করতে হবে। অন্যথায় সেখানেও বিশ্বাস ভঙ্গ হবে। বিশ্বাসই সবকিছুকে নিয়মের মধ্যে ধরে রাখে। বিশ্বাস ভঙ্গ বিষয়টি যেমন পার্থিব বিবেচনায় তেমনি পরকালীন বিবেচনায়েও শাস্তিযোগ্য অপরাধ। আল্লাহ সব বিষয় মানুষকে বিস্তারিতভাবে জানিয়ে দিয়েছেন। তাই বলা হয়েছে,

“বার্তাবাহকগণ সু-সংবাদদাতা এবং সতর্ককারী। বার্তাবাহকগণকে এ জন্যই প্রেরণ করা হয়েছে, যেন তাদেরকে প্রেরণের পর আল্লাহর প্রতি মানুষের আর কোন যুক্তি বা অভিযোগ না থাকে।” (আল-কোরআন ৪:১৬৫)

উদ্ধৃতিতে উল্লেখিত ‘যুক্তি বা অভিযোগ না থাকে’ কথাটির অর্থ হল মানুষকে বিশ্বাস ভঙ্গের কারণে শাস্তি ভোগ করতে হবে। যে মানুষ আল্লাহর সঙ্গে কৃত বিশ্বাস ভঙ্গ করতে পারে যেটি মানব চিন্তার চৌহদ্দির মধ্যে সর্বোচ্চ পর্যায়ের অন্যায় বা পাপ, সে যে কোন বিশ্বাস অনায়াসে ভঙ্গ করতে পারে। সেখান থেকেই বিশ্বাস ভঙ্গের অভ্যাসের শুরু। যদি বিষয়টি কেবল ধারণাও হয়, তবে যে সে ধারণাকে ছিন্ন করে যেতে পারে সে নীতি-নৈতিকতার সব ছিন্ন করতে পারে। তাই সন্তানদেরকে ধারণায় আল্লাহর প্রতি দৃঢ় বিশ্বাস স্থাপনে ও তাতে অবিচলভাবে প্রতিষ্ঠিত থাকার শিক্ষায় গড়ে তোলার যাবতীয় ব্যাবস্থা গ্রহণ করা সকল পিতা-মাতা-শিক্ষক বা সমাজের মুরুব্বীদের নৈতিক দায়িত্ব ও কর্তব্য। সমাজ, পরিবেশ তথা সৃষ্টির স্বার্থেই সেটি প্রয়োজনীয়।

কেবল আবৃতি নয়, কোরআনের মর্মার্থ বুঝতে হবে যথাযথ ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণের সাথে। সে কারণেই এ গ্রন্থ রচনার উদ্যোগ। নয়ত বাজারে বিশেষায়িত ব্যাক্তিদের অনেক রচনা আছে।

চুক্তির বিষয়ে বর্তমানে কমার্শিয়াল ও ইন্ড্রাসট্রিয়াল বা ব্যাবসায় ও শিল্প-বাণিজ্য বিষয়ক আইন, বিজনেজ আইন ইত্যাদি বহুবিধ গবেষনা ও অভিজ্ঞতালব্ধ পাঠ্য বইসমুহে অনেক বেশী বিশ্লেষিত দিক-নির্দেশনা আছে। যা প্রাথমিক কালের ধর্মীয় দিক-নির্দেশনাসমুহের হাত ধরেই আজ এ পর্যায়ে এসেছে। অতএব ধর্মীয় দিক-নির্দেশনাকে আজকের আধুনিক অগ্রগতির ভিত্তি বলা চলে। কিন্তু পুস্তকে যত ভাল ভাল জ্ঞানই থাকুক না কেন পরিপালন করা সম্ভব না হলে তার কোন মূল্য নেই। তাই আল্লাহ ও পরকালে বিশ্বাস গুরুত্বপূর্ণ যা স্বয়ংক্রীয়ভাবে মানুষকে দিয়ে সব পালন করায়।

কোরআনের দিক-নির্দেশনা মানবজাতির জন্য এক তুলনাহীন প্রেরণা! যে কারণে বিশ্বাসী আপনা থেকে সততা বজায় রেখে বিধি-বিধান মেনে চলতে শেখে। কিন্তু বোধসম্পন্ন কিছু ভাল মানুষ ব্যাতিত কেউ নিয়ম মেনে, সততা বজায় রেখে চলবে না। মানুষকে সে বোধে আসতে হলেও তাই জাগতিক সকল

আইন-কানুন, বিধি-বিধানের পরেও আল্লাহ ও শেষ বিচার দিবসের জ্ঞানে জ্ঞানান্বিত করা একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়।

অতি বিশেষণে জর্জরিত এবং শব্দের বুৎপত্তিগত অর্থের মাধ্যমে কোরআনের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করার মনোবৃত্তির চেয়ে এ আলোচনা বা বিশ্লেষণ অধিক বাস্তবসম্মত, কার্যকরী এবং পরবর্তী প্রজন্মের জন্য প্রয়োজনীয়, উপকারী ও বোধদায়ক হবে।

➢ (আয়াত ২৮৪) এ অংশে আল্লাহর কাছে জবাবদিহিতার (Accountability) প্রসঙ্গটি উদ্ধৃত হয়েছে। অর্থাৎ শেষ বিচার দিবসের কথাটি স্মরণ করিয়ে দেয়া হয়েছে। জগতের সকল বিধি-বিধানের সত্যিকারের পরিপালন এ বিচার দিবসে বিশ্বাস রাখার ওপরই নির্ভর করে।

২৮৪	নভোমন্ডল ও ভূমন্ডলে যা কিছু আছে সবই আল্লাহর; তোমরা মনের কথা প্রকাশ কর কিংবা গোপন কর, আল্লাহ এর জন্য তোমাদের হিসেবের মুখোমুখী করবেন। তিনি যাকে ইচ্ছে ক্ষমা করবেন এবং যাকে ইচ্ছে তিনি শাস্তি দেবেন। আল্লাহ সবকিছু করতে সক্ষম। (Unto Allah (belongeth) whatsoever is in the heavens and whatsoever is in the earth; and whether ye make known what is in your minds or hide it, Allah will bring you to account for it. He will forgive whom He will and He will punish whom He will. Allah is Able to do all things.)

▪ **২.২৮৪.১** নভোমন্ডল ও ভূমন্ডলে যা কিছু আছে সবই আল্লাহর : নভোমন্ডল ও ভূমন্ডলে যা কিছু আছে সবই আল্লাহর [আল্লাহ দ্রষ্টব্য ২.২০.২]। সবকিছু তাঁর আওতাভূক্ত ও তাঁর নিয়ন্ত্রনাধীন। তিনি এর প্রতিটি বিষয় বা বস্তু সম্পর্কে পরিপূর্ণ ওয়াকিবহাল। যেমন গীতায় বলা হয়েছে,

"আমার অপ্রকাশিত রূপে আমার দ্বারা সমগ্র বিশ্ব পরিবেষ্টিত। ... সর্বত্র বিচরণশীল বায়ু যেমন আকাশে স্থিত, তেমনই এই জগত তথা সমস্ত জীব ও জড় আমাতে স্থিত বলে জানবে।" (গীতা ৯:৪-৬)

মানুষ যেমন দেহের কোটি কোটি কোষ ও জটিল ব্যবস্থাপনা সত্বেও তার নিজের সম্পর্কে মূহুর্তেই পরিপূর্ণ ওয়াকিবহাল বা জেনে নিতে সক্ষম, তেমনি নভোমন্ডল ও ভূমন্ডলে যা কিছু আছে সবই আল্লাহর। তিনি সব জানেন।

▪ **২.২৮৪.২** তোমরা মনের কথা প্রকাশ কর কিংবা গোপন কর, আল্লাহ এর জন্য তোমাদের হিসেবের মুখোমুখী করবেন : পবিত্র কোরআনের সর্বপ্রথম সূরা সূরা-ফাতেহাতে আল্লাহ মানবজাতিকে একটি বিচার দিবস সম্পর্কে ধারণা দিয়েছেন। যে দিবসে বিচারক থাকবেন স্বয়ং আল্লাহ নিজে। কোরআনে বিচার দিবস সম্পর্কে আরও বলা হয়েছে,

"সেদিন প্রত্যেকেই নিজেকে মুখোমুখী পাবে যা কিছু সে ভাল কাজ করেছে এবং যা কিছু মন্দ করেছে; তখন প্রত্যেকেই কামনা করবে তার এবং তার কৃত মন্দ কর্মের ব্যবধানটি যদি অনেক দূরের হত! আল্লাহ তাঁর নিজের সম্পর্কে তোমাদেরকে সতর্ক করছেন।" (আল-কোরআন ৩:৩০)

"সেদিন কর্ম বৃত্তান্তের নথি উপস্থাপন করা হবে এবং তুমি দেখবে তাতে যা আছে সে কারণে অপরাধীরা সন্ত্রস্ত। তারা বলবে, 'এটি কেমন ধরণের নথি যা ছোট বড় কোন কিছুকেই হিসেবের আওতার বাইরে রাখেনি, সবকিছুকেই বিবেচনায় নিয়েছে!' তারা যা করেছে তার সবকিছুকেই তারা তাদের মুখোমুখী পাবে। তোমার পালনকর্তা কারও প্রতি অন্যায় করেন না।" (আল-কোরআন ১৮:৪৯)

"সেই চিরঞ্জীব চিরস্থায়ীর (আল্লাহর) সামনে সব মুখমণ্ডল অবনমিত হবে এবং যে ভূল কর্মের বোঝা বহন করবে, সেদিন সে অবশ্যই ব্যর্থ হবে। যে কিছু ভাল কাজ করবে একজন বিশ্বাসী হয়ে, সে না তার প্রতি কোনরূপ অন্যায়ের আশংকা করবে, না কোনরূপ ক্ষতির।" (আল-কোরআন ২০:১১১-১১২)

আয়াতে বলা হয়েছে যে, মানুষ মনের কথা প্রকাশ করুক কিংবা গোপন করুক আল্লাহ তাও জানেন। সবকিছু যার, যিনি সব কিছুর স্রষ্টা তিনি কি তা জানবেন না? তাঁর জানাটাই তো স্বাভাবিক। মানুষ কথা বললে যেমন তা সংরক্ষিত হয়ে থাকে, তেমনি চিন্তা করলেও তা সংরক্ষন করার ব্যাবস্থা আছে। আল্লাহ বলেন,

"আমার কাছে রক্ষিত গ্রন্থ তোমাদের সম্পর্কে সত্য বিবৃত করবে। নিশ্চয়ই! আমি প্রতিটি বিষয়কে এমনিভাবে (সৃষ্টি) করেছি যে, তোমরা যা কর তা লিপিবদ্ধ-সংরক্ষিত হয়ে যায়।" (আল-কোরআন ৪৫:২৯)

"নভোমণ্ডল ও ভূ-মণ্ডলে অণু পরিমাণ ওজনের কিংবা তার চেয়ে ছোট বা তার চেয়ে বড় একটি কণাও নেই, যা তোমার পালনকর্তা থেকে লুক্কায়িত থাকতে পারে। এ সবই নির্দিষ্ট গ্রন্থে সুনির্দিষ্টভাবে লিপিবদ্ধ আছে।" (আল-কোরআন ১০:৬১)

মানুষ তার ভেতরে কোন গোপন মন্দ ধারণা থেকে কোন কাজ করলে তিনি সেটিকেও বিচারের জন্য বিবেচনায় নিতে পারেন, বিষয়টি একান্তই আল্লাহর ইচ্ছে বা বিবেচনার অধীন।

এটি মানুষের জন্য এক ভয়াবহ সতর্ক বার্তা। তবে এর দ্বারা যেমন আল্লাহর সক্ষমতা সম্পর্কে মানুষকে কিছুটা ধারণা দেয়া হয়েছে, একই সাথে মানুষকে এ বার্তার মাধমে সতর্কও করা হয়েছে।

নিঃসন্দেহে আল্লাহ অন্যায় ও অযৌক্তিক কোন কাজ করেন না। মানুষ আল্লাহর সূক্ষ্ম বিবেচনাকে বুঝতে না পারার কারণে হয়তবা কখনও ভূল বুঝতে পারে। কিন্তু তাঁর কাছে প্রতিটি বিষয়ের হিসেব সংরক্ষিত।

'মনের কথা প্রকাশ কর কিংবা গোপন কর' এর মাধ্যমে মানুষকে তার কর্মের পাশাপাশি চিন্তায়ও সৎ হতে উদ্বুদ্ধ করা হয়েছে। নিঃসন্দেহে যে মন্দ কাজের পরিকল্পনা করে তার জানা উচিত যে আল্লাহ তাও জানেন।

যদি কেউ মন্দ কাজ করে তবে তা শাস্তিযোগ্য। কিন্তু যদি মন্দ কাজ নাও করে তবুও আল্লাহ তার মনোবৃত্তি সম্পর্কে পরিপূর্ণ ওয়াকিবহাল। নিশ্চয়ই তেমন একজনের প্রতি আল্লাহর দৃষ্টি ও একজন সৎ মানুষের প্রতি দৃষ্টি এক হবে না। আল্লাহর মন্দ দৃষ্টি বা মন্দ বিবেচনায় থাকাও একটি ভয়াবহ বিষয়। যে কোন সময় বিপদের সম্ভাবনা।

আল্লাহ অন্যায় বিচার করেন না। মন্দ চিন্তা করলেই মানুষ শাস্তি পেয়ে যাবে বিষয়টি তেমন নয়। শাস্তি পেতে পারে তখন যখন মন্দ চিন্তাটিকে বাস্তবায়ন করা হয়। কিন্তু কোন বাধা বা অসুবিধার কারণে কেউ যদি ইচ্ছে থাকা সত্ত্বেও মন্দ কাজ করতে না পারে, অথচ মন্দ কাজটি করার তার পূর্ণ

নিয়ত ছিল, তবে আল্লাহ তার মনোবৃত্তি সম্পর্কে ওয়াকিবহাল। তিনি শাস্তি দেবেন কি দেবেন না এটি একান্তই তাঁর বিবেচনা।

আল্লাহ তাঁর ইচ্ছেতে কাউকে বিপদ থেকে উদ্ধার করতে পারেন, মন্দকে শাস্তি দিতে পারেন আবার ক্ষমাও করতে পারেন। তবে মানুষকে এসব বুঝে সতর্ক হয়ে চলতে হবে। এ বার্তা থেকেই মানুষের বুঝে নিতে হবে যে, আল্লাহ মন্দ কাজ পছন্দ করেন না।

সবচেয়ে বড় বিষয় হচ্ছে যে, মানুষের মানসিকতা ও চিন্তাকে নিজ থেকে উন্নত পর্যায়ে নিয়ে যেতে হবে। বিকশিত করতে হবে।

কিছু মন্দ চিন্তা আছে যা মানুষের নিজের নিয়ন্ত্রনে নয়। আপনা থেকে চলে আসে। এসবের জন্য যতক্ষণ মানুষ মন্দ কাজটি না করছে ততক্ষণ শাস্তি প্রাপ্তির সম্ভাবনা নেই। বিবেচনা পরিপূর্ণভাবে আল্লাহর হাতে। তবে তেমন ক্ষেত্রে বারবার আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করা শ্রেয়।

এ আয়াতটি অত্যান্ত গুরুত্বপূর্ণ ও তাৎপর্য্যপূর্ণ একটি আয়াত। যে সময়ে এ আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে সে সময়ে মানুষের আজকের দিনের আধুনিক প্রযুক্তিগত জ্ঞান ছিল না। মানুষ কল্পনাও করতে পারেনি যে কি করে মনের গোপন চিন্তাটিও জেনে নেয়া সম্ভব? বিশ্বাস করা ছাড়া কোন গত্যান্তর ছিল না। কিন্তু আজকের দিনের মানুষ যৌক্তিক ও সহজতরভাবেই বিষয়গুলি বিশ্বাস করতে পারে। কেননা আল্লাহ তাঁর অনেক নিদর্শন মানুষকে দেখিয়ে যাচ্ছেন। আল্লাহ বলেন,

"সৃষ্টিগতভাবে মানুষ ত্বরাপ্রবণ। আমি তোমাদেরকে আমার নিদর্শনাবলী প্রদর্শন করব তবে আমাকে ত্বরা করতে বল না।" (আল-কোরআন ২১:৩৭)

"আমি মানুষকে আমার নিদর্শনাবলী প্রদর্শন করব বিশ্বজগতে এবং তাদের নিজেদের মধ্যে যতক্ষণ পর্যন্ত না এটি তাদের কাছে সুস্পষ্ট হয় যে, এটিই (কোরআন প্রদত্ত বার্তা) সত্য।" (আল-কোরআন ৪১:৫৩)

সর্বপরি এ আয়াত যখন মানুষকে জানান দেয় যে আল্লাহ সব জানেন, তিনি প্রকাশিত ও অপ্রকাশিত সব জানেন এমনকি মনের গোপন ভাবনা বা চিন্তাটিও জানেন এবং এর জন্য মানুষকে একদিন অর্থাৎ শেষ বিচার দিবসে আল্লাহর কাছে জবাবদিহি করতে হবে এর অর্থ এই যে মানুষকে তার কথা,

কাজ ও চিন্তায় আল্লাহ সৎ হতে অনুপ্রাণীত করেছেন এবং একই সাথে কোন প্রকার মন্দ চিন্তা বা পরিকল্পনা বা কোন প্রকার ষড়যন্ত্র করা থেকেও বিরত থাকতে বলছেন। যেমন আল্লাহ বলেন,

"যারা অন্যায় কাজের চক্রান্ত করে তাদের জন্য রয়েছে কঠোর শাস্তি এবং তেমন চক্রান্তকারীদের চক্রান্ত কোন কাজেই আসবে না।" (আল-কোরআন ৩৫:১০)

"পৃথিবীতে ঔদ্ধত্য প্রদর্শন ও মন্দ চক্রান্ত এবং মন্দ চক্রান্ত তাকেই ঘিরে ধরে যে তা তৈরী করে। ...। " (আল-কোরআন ৩৫:৪৩)

"যদি আল্লাহ মানুষকে তাদের কৃতকর্মের কারণে তেমন কাজে নিয়োজিত করতেন যা তাদের প্রাপ্য, তবে ভূ-পৃষ্ঠের একটি জীবন্ত প্রাণীকেও তিনি ছেড়ে দিতেন না; কিন্তু তিনি একটি নির্দিষ্ট সময়ের জন্য (বিচার দিবস পর্যন্ত) তাদেরকে অবকাশ দিয়েছেন এবং যখন তাদের সে নির্দিষ্ট সময় উপস্থিত হবে- তখন অবশ্যই জেনে রেখ, আল্লাহ তাঁর বন্দাদের প্রতি সদা সর্বদাই দৃষ্টি রাখেন।" (আল-কোরআন ৩৫:৪৫)

মানুষের জ্ঞান যতই বৃদ্ধি পাবে মানুষ ততই আল্লাহতে তথা কোরআন প্রদত্ত বার্তায় বিশ্বাসী হবে। মন্দ কাজ করা থেকে বিরত থাকতে ও ভাল কাজ করতে উদ্বুদ্ধ হবে। কেননা মানুষ জ্ঞানতই জানবে যে আল্লাহ সব জানেন এবং এর জন্য কখনও জবাবদিহি করতে হবে।

▪ **২.২৮৪.৩** তিনি যাকে ইচ্ছে ক্ষমা করবেন এবং যাকে ইচ্ছে তিনি শাস্তি দেবেন (He will forgive whom He will and He will punish whom He will) : শাস্তি ও ক্ষমার বিষয়টি একান্তই আল্লাহর একচ্ছত্র ক্ষমতা ও ইচ্ছের (Will of Allah) আওতাধীন বিষয় [আল্লাহর ইচ্ছে দ্রষ্টব্য ২.১৪২.৩]। তিনি ইচ্ছে করলে কাউকে ক্ষমা করবেন, ইচ্ছে করলে শাস্তি দেবেন। তবে এখানে ভূল বোঝার কোন অবকাশ নেই। তিনি এটিও তার নিয়ম বা সূত্র অনুসারে করেন। কেননা আল্লাহ অন্যায় বিচার করেন না। সত্য ভিন্ন কোন কিছু করেন না। তাঁর ইচ্ছে সত্যের পথ ধরে চলে যার সব মানুষ বুঝতে পারে না।

আল্লাহ হচ্ছেন ন্যায় বা ন্যায্যতার সর্বোচ্চ প্রতীক। এর উর্ধ্বে ন্যায্যতার আর কিছু নেই। শাস্তিযোগ্য অপরাধ তিনি ক্ষমা করেন না। আবার প্রাপ্তব্য পুরস্কারও তিনি রদ করেন না। অপরাধ ক্ষমা প্রাপ্তির যোগ্য হলেই কেবল ক্ষমা পেতে পারে। কিন্তু কোনটি ক্ষমা প্রাপ্তির যোগ্য এবং কোনটি ক্ষমা প্রাপ্তির যোগ্য নয় সেটি জানেন আল্লাহ নিজে। তার অতি অতি সূক্ষ্ম বিবেচনা মানুষের পক্ষে জানা বা বোঝা সম্ভব নয়।

আল্লাহ যখন বিচার করেন তখন একজনের সমস্ত জীবনের সকল কর্মকান্ডকে বিবেচনায় নেন। কিন্তু মানুষ কারও জীবনের পরিপূর্ণ হিসেব জানে না। পরিপূর্ণ জ্ঞান না থাকার কারণে ভাল-মন্দের যথাযথ গুরুত্বও নির্ধারণ করতে পারে না। এর সাথে জাগতিক অনেক বিষয় জড়িত থাকে। বিষয়গুলি সূক্ষ্ম ও জটিল। আল্লাহ মানুষের সমস্ত জীবনের ভাল-মন্দের হিসেব বিবেচনা করে বিচার করবেন। সেক্ষেত্রে ভাল-মন্দের গুরুত্বও বিবেচিত হবে। তাই এভাবেই বিশ্বাস রাখতে হয় যে, ‘তিনি যাকে ইচ্ছে ক্ষমা করবেন এবং যাকে ইচ্ছে তিনি শাস্তি দেবেন।’

জীবনের হিসেব শেষে একজনের একটি গুরুত্বপূর্ণ মন্দ কিংবা ভাল কর্ম শাস্তি প্রাপ্তি কিংবা ক্ষমা বা পুরস্কার প্রাপ্তির জন্য যথেষ্ট বিবেচিত হতে পারে। পরিপূর্ণ বিবেচনা একমাত্র আল্লাহর হাতে।

উল্লেখ্য যে, মানবীয় ভাবনায় সকল হিসেব-নিকেশ শেষেও কারও প্রতি আল্লাহ প্রদত্ত শাস্তি পরিপূর্ণ হতে পারে, সাময়িক হতে পারে, লঘু শাস্তির প্রকৃতিতে হতে পারে কিংবা সেটি পুরোপুরি রহিতও হতে পারে। বিবেচনা একান্তই আল্লাহর। তিনি সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী। অতএব তিনি যাকে ইচ্ছে ক্ষমা করবেন এবং যাকে ইচ্ছে তিনি শাস্তি দেবেন। বিশ্বাস রাখাই মানুষের জন্য সর্বোত্তম।

বিশেষভাবে উল্লেখ্য যে, জগতে যা কিছু ঘটে তা তার বিষয় ও উপাদানের নিয়ম অনুযায়ী ঘটে যা ঘটে পরিবেশ ও পরিস্থিতির মিথস্ক্রিয়ার ফলে। সাধারণ মানুষ সাধারণ নিয়মগুলি জানে। তাই ব্যাতিক্রমগুলি বুঝতে পারে না বা বুঝতে চেষ্টা করে না। এতদ্বসত্বেও নিয়মে থেকেও যখন সাধারণ নিয়মের ব্যাতিক্রম তথা অনিয়ম ঘটে বা কোন ভূল হয়, সেটি তার ফল ভোগ করে

জাগতিক সাধারণ নিয়মের বিবেচনায়। কিন্তু 'একজন' সব নিয়ম জানেন। ক্ষমার বিষয়টি তাই একচ্ছত্র 'তাঁর' বিবেচনার অধীন।

▪ **২.২৮৪.৪** আল্লাহ সবকিছু করতে সক্ষম (Allah is Able to do all things) : শাস্তি ও ক্ষমার ক্ষেত্রে আল্লাহ যেমন সব নিজের ইচ্ছে বা বিবেচনাতে করেন, তেমনি সৃষ্টির ক্ষেত্রেও তিনি যা খুশি তাই সৃষ্টি করেন। তিনি যেভাবে খুশি সেভাবে সব পরিচালনা করেন। অর্থাৎ তিনি সবকিছু করতে সক্ষম [আল্লাহ দ্রষ্টব্য ২.২০.২]। কোন কিছুই তাঁর সক্ষমতার বাইরে নয়। তিনি সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী। তাঁকে কারও কাছে জাবাবদিহি হতে হয় না। যেমন বলা হচ্ছে,

"(আল্লাহ) যা করেন তৎসম্পর্কে তিনি জিজ্ঞাসিত হবেন না, কিন্তু তারা (মানুষ/অন্যায়কারীরা/অবিশ্বাসীরা) জিজ্ঞাসিত হবে।" (আল-কোরআন ২১:২৩)

আল্লাহ সবকিছু করতে সক্ষম। আল্লাহর সক্ষমতা ও সার্বভৌম ক্ষমতা এবং একান্তই তাঁর বিবেচনা বা ইচ্ছে (Will of Allah) সম্পর্কে ধারণা দিতে গিয়ে পবিত্র কোরআনে আরও বলা হয়েছে,

"(লক্ষ্যার্জনে) জ্ঞান প্রাপ্তিতে তিনি তাঁর বার্তাবাহকরূপে যাকে ইচ্ছে বাছাই করেন। ...।" (আল-কোরআন ৩:১৭৯)

"আল্লাহ যদি ইচ্ছে করেন, তবে তোমাদের অপসারণ করতে পারেন এবং তোমাদের স্থলে অন্যদের প্রতিষ্ঠা করতে পারেন? আল্লাহ তা করতে সক্ষম।" (আল-কোরআন ৪:১৩৩)

"আমি যাকে ইচ্ছে তাকে জ্ঞানের মর্যাদাপূর্ণ স্তরে উন্নীত করি। নিশ্চয়ই! তোমার পালনকর্তা প্রজ্ঞাময়, সচেতন।" (আল-কোরআন ৬:৮৩)

"আল্লাহ যা ইচ্ছে করেন, তাই করেন।" (আল-কোরআন ২২:১৪)

"আল্লাহ যা ইচ্ছে করেন তাই সৃষ্টি করেন। নিশ্চয়ই! আল্লাহ সবকিছু করতে সক্ষম।" (আল-কোরআন ২৪:৪৫)

"তোমার পালনকর্তা যা ইচ্ছে সৃষ্টি করেন এবং যাকে ইচ্ছে মনোনীত করেন। তাদের কোন পছন্দ নেই।" (আল-কোরআন ২৮:৬৮)

"সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর, নভোমণ্ডল ও ভূ-মণ্ডলের স্রষ্টা, ... তিনি সৃষ্টিকে বিকশিত করেন যেমনিভাবে তিনি চান তেমনিভাবে। নিশ্চয়ই! আল্লাহ সবকিছু করতে সক্ষম।" (আল-কোরআন ৩৫:১)

"নভোমণ্ডল ও ভূ-মণ্ডলে সার্বভৌমত্ব আল্লাহরই। তিনি যা ইচ্ছে সৃষ্টি করেন। তিনি যাকে ইচ্ছে কন্যা-সন্তান দান করেন এবং যাকে ইচ্ছে পুত্র সন্তান দেন। অথবা তিনি তাদেরকে দান করেন পুত্র ও কন্যা উভয়ই এবং যাকে ইচ্ছে বন্ধ্যা করে দেন। নিশ্চয়ই! তিনি সর্বজ্ঞ, ক্ষমতাশীল।" (আল-কোরআন ৪২:৪৯-৫০)

আল্লাহতে যে বিশ্বাস করবে, কোরআনের দর্শনে যে বিশ্বাস করবে তাকে এ কথাটিও চোখ বুঁজে বিশ্বাস করে নিতে হবে। বিশ্বাসের ক্ষেত্রে এটিও একটি শর্ত। আল্লাহ যা ইচ্ছে করতে পারেন।

বস্তুত আল্লাহকে কেউ চেনে না, জানেনা। তাঁর সম্পর্কিত ধারণাই তাঁর পরিচয়। কোরআন মানবজাতির সম্মুখে আল্লাহ সম্পর্কে একটি ধারণা উপস্থাপন করেছে মাত্র। তাঁর সক্ষমতাকে সীমাহীনরূপে চিহ্নিত করা হয়েছে। এটি প্রমাণ করার প্রয়োজন নেই। এভাবেই তাঁকে বুঝতে হবে। মানুষকে সেভাবেই উদ্বুদ্ধ করা হয়েছে।

জগতে কত কত সৃষ্টি আছে! কত কত ঘটনা আছে! সবই আল্লাহর করা। কত বিচিত্র কিছু তিনি সৃষ্টি করেছেন! শুধু তাঁর সৃষ্টিসমুহকে পর্যবেক্ষন করলেও তার সক্ষমতার সীমাহীনতা সম্পর্কে বুঝতে পারা যায়।

অতীতে যা ছিল তার সবই তিনি করেছেন। অতীতে যা কিছু এ জগতে ছিল না বর্তমানে তা আছে। তাও তিনি করেছেন। বর্তমানে যা নেই ভবিষ্যতে মানুষের কল্পনার অতীত সেসবও তাঁর পক্ষে করা সম্ভব এভাবে ধরে নেয়া যায় অতীতের অভিজ্ঞতায়। অর্থাৎ তিনি কি না করতে পারেন! তিনি সব করতে পারেন। কোরআন আল্লাহর সক্ষমতা সম্পর্কে মানুষের সম্মুখে স্বচ্ছ ধারণা উপস্থাপন করেছে। সঠিকভাবে এসবের অর্থ অনুধাবন করা মানুষের নিজেদের কাজ।

মানুষও যা ইচ্ছে করেছে তাই করেছে। পাখির মতো আকাশে উড়তে চেয়েছে- উড়েছে। হাতের নাগালে পাঠ্যবই চেয়েছে- পেয়েছে। মানুষ যা ইচ্ছে

করেছে তাই করেছে বা পেয়েছে! এখান থেকেও বুঝে নেয়া সম্ভব যে আল্লাহ যা ইচ্ছে তাই করতে পারেন। মানুষ যা করেছে আল্লাহই তা মানুষের জন্য সম্ভব করে দিয়েছেন। আল্লাহ সব পারেন। বিষয়টি বুঝতে ও বিশ্বাসের মধ্যে আনতে মানুষকেও জ্ঞানের সে পর্যায়ে উন্নীত হতে হবে।

ইচ্ছে (Will) একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। এটিকে সেভাবেই বুঝতে হবে। ইচ্ছের সাথে জ্ঞানের সম্পর্ক আছে। নতুন জ্ঞানের কারণে নতুন ইচ্ছের সৃষ্টি হয়। অর্থাৎ জ্ঞানের একটি পর্যায়ে এলে জ্ঞানের কারণে আবার নতুন একটি ইচ্ছের সৃষ্টি হয়। ইচ্ছের মাধ্যমে ধাপে ধাপে আল্লাহ মানুষকে অগ্রসরমান করেন। মানব অভিজ্ঞতায় যখন একটি নতুন ইচ্ছের সৃষ্টি হয়, তখন সে ইচ্ছে আবার নতুন জ্ঞানের সৃষ্টি করে। এভাবে ইচ্ছে আর জ্ঞানের চাকা মানুষকে সামনে অগ্রসর করে। বলা হচ্ছে,

“নিশ্চয়ই! তোমরা অগ্রসরমান হবে/পরিভ্রমণ/আরোহন করবে ধাপে ধাপে।” (আল-কোরআন ৮৪:১৯)

ওপরে মানুষের ইচ্ছের উদাহরণটি তুলে ধরা হল এজন্য যেন মানুষ বুঝতে পারে যে তার স্রষ্টা সব পারে। আল্লাহর অনুমোদন ও সহায়তা ভিন্ন মানুষের পক্ষে কিছুই করা সম্ভব ছিল না।

কোরআনের দর্শনের পূর্ণ বাস্তবায়ন নির্ভর করে এর পরস্পর সম্পর্কযুক্ত সূত্রের ওপর। একটি সূত্রে কেউ বিশ্বাস না রাখলে দর্শনের অনুসরণে পূর্ণ ফল পাওয়া যাবে না। ফলে কোরআনের দর্শন থেকে ফল লাভ করতে হলে, আল্লাহ সবকিছু করতে সক্ষম সেটিতেও তর্কাতিতভাবে বিশ্বাস রাখতে হবে। তবে যৌক্তিকভাবে কেউ বিষয়গুলি বুঝতে চাইলে সে পথও খোলা আছে। যে বিষয়ে ওপরে কিছুটা ধারণা দেয়া হয়েছে।

বস্তুত আল্লাহকে কেউ চেনে না, জানে না। জাগতিক নানান অভিজ্ঞতা ও নানাবিধ জ্ঞান এক পর্যায়ে মানুষকে এ উপলব্ধিবোধে নিয়ে আসে যে, সব কিছুর পেছনে ‘একজন’ আছেন। বিভিন্ন জন এ ‘একজনা’কেই বিভিন্ন নামে ও সঙ্গায় চেনে-জানে এবং জানে যে তিনি সবকিছু করতে সক্ষম।

অভিজ্ঞতা ও বিশ্লেষিত জ্ঞানের চূড়ান্ত পর্যায়ে আল্লাহ সম্পর্কে মানুষ এমন বিশ্বাসে বিশ্বাসী হতে বাধ্য হয়। তবে অধিকাংশ মানুষের জন্য অতি বিশ্লেষণে না গিয়ে কেবল বিশ্বাসী হয়ে চলাই উত্তম ও প্রশান্তির কারণ হতে পারে।

উল্লেখ্য যে, সত্যিকার বিশ্বাসের বিষয়টি এমন যে এটি কারও দাবী করার বিষয় নয়। জ্ঞান বিকাশের সাথে সাথে মানুষ যখন উপলব্ধি করতে পারে যে জগতে 'তিনি' ভিন্ন পেছনে আর কেউ নেই, নেই কোন সহায়তাকারী; অন্তর যখন সবকিছুতে সেই 'একজনা'কেই দেখতে পায়, অন্তর যখন নিজ জ্ঞানের কারণে কেবলমাত্র তাঁর মুখাপেক্ষী হয়ে যায়, সে তখন তাঁর ওপর ভরসাকারী হয়ে যায় এবং তাতেই নিজেকে পরিপূর্ণরূপে সমর্পন (Surrender) করে দেয়- তখনই সে সত্যিকার অর্থে বিশ্বাসী। কিন্তু এ পর্যায়ে আসতে সময় লাগে। বিশ্বাসেরও বিভিন্ন পর্যায় ও মাত্রা আছে [বিশ্বাস দ্রষ্টব্য ২.৫]। বিশ্বাসী জ্ঞানতই বিশ্বাস করে যে, 'আল্লাহ সবকিছু করতে সক্ষম।'

➢ (আয়াত ২৮৫) সূরার শুরতে বিশ্বাসীদেরকে যেসব বিষয়ে বিশ্বাস রাখতে হবে সেসব বিষয় তুলে ধরা হয়েছে। সূরার এ পর্যায়ে বা শেষে এসে বিশ্বাসের শর্তগুলি (Belief) পুনরায় স্মরণ করিয়ে দেয়া হয়েছে।

২৮৫	আল্লাহর বার্তাবাহক বিশ্বাস করে যা তাঁর পালনকর্তার পক্ষ থেকে তার ওপর অবতীর্ণ হয়েছে এবং বিশ্বাসীরাও তাই বিশ্বাস করে। তাদের প্রত্যেকেই বিশ্বাস করে আল্লাহতে, তাঁর ফেরেশতাগনে, তাঁর অবতীর্ণ গ্রন্থসমুহে এবং তাঁর বার্তাবাহকগনের প্রতি- আমরা আল্লাহর বার্তাবাহকদের কারও প্রতি কোনরূপ পার্থক্য করি না এবং বিশ্বাসীরা বলে: আমরা শুনেছি এবং আমরা সেটি মেনে চলি। হে আমাদের পালনকর্তা! আমাদের প্রতি তোমার ক্ষমা মঞ্জুর কর। তোমারই দিকে প্রত্যাবর্তন। (The messenger believeth in that which hath been revealed unto him from his Lord and (so do) believers. Each one believeth in Allah and His angels and His scriptures and His messengers - We make no distinction between any of His messengers - and they say:

	We hear, and we obey. (Grant us) Thy forgiveness, our Lord. Unto Thee is the journeying.)

▪ **২.২৮৫.১** আল্লাহর বার্তাবাহক বিশ্বাস করে যা তাঁর পালনকর্তার পক্ষ থেকে তার ওপর অবতীর্ণ হয়েছে : আল্লাহর বার্তাবাহক তাই বিশ্বাস করেন যা তার পালনকর্তার পক্ষ থেকে অবতীর্ণ হয়েছে। আল্লাহর বার্তাবাহক যা বিশ্বাস করেন তা তার পালনকর্তার পক্ষ থেকে আগত এর মাধ্যমে কোরআন সকলের অবগতির জন্য এ বিষয়টিকেও নিশ্চিত করেছে।

অতএব বিশ্বাসের বিষয় বা শর্তগুলি বার্তাবাহকের নিজস্ব কোন বিষয় বা বক্তব্যও নয়। এ বার্তা জগতসমুহের যিনি সৃষ্টি ও লালন-পালনকর্তা তিনিই বার্তাবাহকের কাছে প্রেরণ করেছেন। এ বার্তার মাধ্যমে সকল কিছুর কৃতিত্ব স্বয়ং আল্লাহর প্রতি সমর্পন করা হয়েছে। এ বিষয়ে আর কারও কোন দাবী করার অবকাশ নেই। কেউ যেন কখনও এসব বিষয় নিয়ে বিতর্কের অবকাশ সৃষ্টি করতে না পারে।

▪ **২.২৮৫.২** বিশ্বাসীরাও তাই বিশ্বাস করে : আল্লাহর বার্তাবাহক কি বিশ্বাস করে এটি অত্যান্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয়। কেননা আল্লাহর বার্তাবাহক যা বিশ্বাস করে সেটি তার অনুসারীদের জন্যও প্রযোজ্য।

আল্লাহর বার্তাবাহক বিশ্বাস করে যা তাঁর পালনকর্তার পক্ষ থেকে তার ওপর অবতীর্ণ হয়েছে। এর মাধ্যমে প্রচ্ছন্নে বিশ্বাসীদেরকেও তাই বিশ্বাস করতে উদ্বুদ্ধ করা হয়েছে।

যারা সত্যিকার বিশ্বাসী তারাও তাই বিশ্বাস করবে যা আল্লাহর বার্তাবাহক বিশ্বাস করে। এটিই স্বাভাবিক। কেননা বিশ্বাসীরা রাসূলকে ভালবাসে, বিশ্বাস করে। তারা তারই অনুসারী। তাই তারা তাই বিশ্বাস করে যা আল্লাহর বার্তাবাহক বিশ্বাস করে এবং তারা এটিও বিশ্বাস করে যে এ সকল বার্তাই আল্লাহ প্রদত্ত।

অতঃপর রাসূল কি বিশ্বাস করে এবং বিশ্বাসীদেরকেও তার অনুসারী হয়ে কি বিশ্বাস করতে হবে তা পরবর্তীতে উদ্ধৃত হয়েছে।

▪ **২.২৮৫.৩** তাদের প্রত্যেকেই বিশ্বাস করে আল্লাহতে, তাঁর ফেরেশতাগনে, তাঁর অবতীর্ণ গ্রন্থসমুহে এবং তাঁর বার্তাবাহকগনের প্রতি- আমরা আল্লাহর

বার্তাবাহকদের কারও প্রতি কোনরূপ পার্থক্য করি না : আল্লাহর বার্তাবাহক যেভাবে বিশ্বাস করে সেভাবে বিশ্বাসীরাও বিশ্বাস করে আল্লাহতে, তাঁর ফেরেশতাগনে, তাঁর অবতীর্ণ গ্রন্থসমুহে এবং তাঁর বার্তাবাহকগনের প্রতি।

কোরআনের দর্শন যেসব বিষয়ে বিশ্বাস স্থাপনের কথা বলে সূরার প্রথমেই তা তুলে ধরা হয়েছে। এ বিষয়ে সূরার আয়াত নং ২ থেকে ৫ পর্যন্ত বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা হয়েছে। গুরুত্ব বিবেচনায় সূরার শেষ পর্যায়ে এসে তা পুনরুল্লেখ করে বিষয়গুলি স্মরণ করিয়ে দেয়া হয়েছে।

▪ **২.২৮৫.৪** এবং বিশ্বাসীরা বলে: আমরা শুনেছি এবং আমরা সেটি মেনে চলি : এখানে সত্যিকার বিশ্বাসীদের গুণ তুলে ধরা হয়েছে। বলা হচ্ছে, বিশ্বাসীরা এসব বিষয় নিয়ে তর্কে বা যুক্তিতে অবতীর্ণ হয় না। এর সত্যাসত্য অনুসন্ধান করতে যায় না। তারা আল্লাহতে বিশ্বাস করে। আল্লাহর রাসূলে বিশ্বাস করে। রাসূল যা বলেছেন তারা তা কেবল বিশ্বাসই করে তাই নয়, তারা তা মেনেও চলে। এমনই হতে হবে বিশ্বাসীর আচরণ।

বিশ্বাসীদের গুণাগুণ ও আচরনের এটি একটি অত্যান্ত গুরুত্বপূর্ণ দিক। এমন না হলে কোন দর্শনের অনুসারীই তার দর্শনকে প্রতিষ্ঠা করতে পারবে না। তাই আদর্শকে প্রতিষ্ঠা করতে হলে আদর্শে বিশ্বাসীকে আদর্শ সম্পর্কে জেনে তার প্রয়োজনীয়তা জ্ঞানত উপলব্ধি করতে হবে এবং সে বোধ থেকে মেনেও চলতে হবে। তবেই সে আদর্শ প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব।

উল্লেখ্য যে, এ ইতিবাচক এ বার্তার মাধ্যমে বিশ্বাসীদেরকে রাসূলের বিশ্বাসে তথা বিশ্বাসের শর্তসমুহ মেনে চলতে উদ্বুদ্ধ ও অনুপ্রাণীতও করা হয়েছে। দর্শনের প্রতিষ্ঠা শর্তগুলিতে দৃঢ় বিশ্বাসের ওপরই নির্ভর করে।

দর্শনের শর্তগুলি হচ্ছে এক একটি স্তম্ভ। যার ওপর দাড়িয়ে আছে দর্শনের সফলতা। কিন্তু মানুষকে একতাবদ্ধ করে রাখারও একটি দায়িত্ব আছে। একই কেন্দ্রবিন্দুকে আবর্তন করে মানুষকে একতাবদ্ধ রাখতে হবে। তাই একই ধারণাতে সকলকে বিশ্বাসী হতে হবে।

কোরআন একটি দর্শন নিয়ে আগমন করেছে। যে দর্শন সত্য ও ন্যায়ের কথা বলে, অন্যায়কে প্রতিরোধ ও প্রতিহত করার কথা বলে, ন্যায়কে প্রতিষ্ঠা

করার কথা বলে, কুসংস্কার, অশিক্ষা-কুশিক্ষা ও অজ্ঞতাকে দুরীভূত করার কথা বলে।

সত্য ও ন্যায়কে প্রতিষ্ঠা করতে হলে এ দর্শনে বিশ্বাসীদেরকে তথা সত্য ও ন্যায়ের পক্ষের মানুষদেরকে একতাবদ্ধ থাকতে হবে। বিপরীত বা বিরোধী শক্তি তথা মিথ্যের পক্ষ শক্তির বিপক্ষে শক্ত অবস্থানে থাকতে হবে। কাজটি সহজ নয়। বলা হচ্ছে, বিশ্বাসীরা তাদের নবী বা নেতার বিশ্বাসেই বিশ্বাসী ও একতাবদ্ধ। তারা এ বিষয়ে দ্বিমত করে না। তারা মিথ্যের বিপক্ষে দৃঢ় অবস্থানে স্থিত।

বিশ্বাসের মূল লক্ষ্য সত্য ও ন্যায়কে প্রতিষ্ঠা করা ও সমুন্নত রাখা। সৃষ্টিকে মিথ্যে তথা সমুহ ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করা। জগতে শান্তি প্রতিষ্ঠা করা। সে লক্ষ্যকে সামনে রেখেই বিশ্বাসীরা রাসূলের বিশ্বাসে বিশ্বাসী।

▪ **২.২৮৫.৫** হে আমাদের পালনকর্তা! আমাদের প্রতি তোমার ক্ষমা মঞ্জুর কর (Grant us Thy forgiveness, our Lord) : মানুষ তার কর্মে ভূল-ভ্রান্তি করে। অজান্তেও ভূল করে। কিন্তু আল্লাহ এমন এক দয়াবান যার কাছে প্রতিনিয়ত আশা নিয়ে ক্ষমা প্রার্থনা করা যায়। তিনি ক্ষমা করতে পারেন [আল্লাহ ও ক্ষমা দ্রষ্টব্য ২.১৯৯]।

এটি একটি বিনয়ী আচরণের লক্ষণ ও প্রকাশ। যে আচরণ একজনকে সর্বক্ষণ আল্লাহর মহাত্বকে মনে করিয়ে দেয় এবং জ্ঞানত কোন প্রকার ভূল না করতে মানুষকে সতর্ক ও সচেতন করে। ক্ষমা প্রার্থনায় কোন ত্রুটি নেই। কিন্তু অনেক মানসিক প্রশান্তি আছে। ক্ষমা প্রার্থনা মনের শক্তি ও সংকল্পকে বেগবান করে। ভবিষ্যতে ত্রুটিমুক্ত থেকে কাজ করতে অনুপ্রেরণা যোগায়।

বিশ্বাসী বা দৈবী গুণসম্পন্ন মানুষ মাত্রই জানে ও বিশ্বাস করে যে একদিন তাকে আল্লাহ তা'য়ালার কাছেই প্রত্যাবর্তন করতে হবে। তাকে তার কর্মের জন্য জবাবদিহি করতে হবে। তাই সে জানা ও অজানা সম্ভাব্য সকল ভূলের জন্য প্রতিনিয়ত ক্ষমা প্রার্থনা করে। এখানেও সূরার শেষ পর্যায়ে আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করা হয়েছে। মানুষকে এমনিভাবে সকল কাজে বিনয়ী হতে শিক্ষা দেয়া হয়েছে এবং আল্লাহর ক্ষমা প্রাপ্তির সম্ভাবনার দুয়ারকে খোলা রাখতে

শিক্ষা দেয়া হয়েছে, যা 'কোন একদিন' মহাবিপদ থেকে মানুষকে রক্ষা করতে পারে।

■ **২.২৮৫.৬** তোমারই দিকে প্রত্যাবর্তন (Unto Thee is the journeying) : 'আমাদের প্রতি তোমার ক্ষমা মঞ্জুর কর' মানুষকে সম্ভাব্য ভূল-ক্রটির জন্য আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করতে শিক্ষা দেয়া হয়েছে। যা 'কোন একদিন' মহাবিপদ থেকে মানুষকে রক্ষা করতে পারে। এখানে সেই 'কোন একদিন' এ বিশ্বাসের কথাই ব্যাক্ত করা হয়েছে।

বিশ্বাসী মাত্রই জানে ও বিশ্বাস করে যে, তাকে একদিন আল্লাহ তা'য়ালার কাছে প্রত্যাবর্তন করতে হবে [দ্রষ্টব্য ২.২৮.৪]। এ বিষয়ে বিতর্কের কোন অবকাশ নেই। কোরআনের দর্শনে এটি একটি অপরিহার্য্য শর্ত। তবে এ প্রত্যাবর্তন শুধুই প্রত্যাবর্তন নয়। এ প্রত্যাবর্তনের সাথে অনেক বড় বিষয় জড়িয়ে আছে।

পার্থিব জীবনে মানুষ যেসব ভাল-মন্দ কাজ করেছে, তাকে তার কর্মের জন্য মহান আল্লাহর কাছে জবাবদিহি করতে হবে। সে জন্য এ প্রত্যাবর্তন। আল্লাহর বার্তাবাহকের সঙ্গে বিশ্বাসীরা এ বিষয়টিও বিশ্বাস করে। বলা হচ্ছে,

"হে মানুষ, নিশ্চয়ই! তুমি তোমার কর্মসহ তোমার প্রতিপালকের নিকট ফিরে চলেছ। এ প্রত্যাবর্তন সুনিশ্চিত। অতঃপর তোমার প্রতিপালকের সাক্ষাৎ লাভ করবে (কৃতকর্ম সহ)।" (আল-কোরআন ৮৪:৬)

সূরা বাকারার শুরু থেকে এ পর্যন্ত মানুষের জন্য আল্লাহর দিক থেকে অনেক দিক-নির্দেশনা দেয়া হয়েছে। এ বিশ্বাস সে দিক-নির্দেশনা মেনে চলার সহায়ক শক্তি হয়ে কাজ করে। এটি আল্লাহর নির্দেশনার প্রয়োগকে নিশ্চিতকরণেও ভূমিকা রাখে। তাই কার্যকারণ সম্পর্কে সম্পর্কিত সকল ধারণায় বিশ্বাস রাখা অতি গুরুত্বপূর্ণ।

পরকাল বা বিচার দিবসে বিশ্বাস নিজ থেকে আল্লাহর নির্দেশনা পালন করে চলতে মানুষকে উদ্বুদ্ধ করে। সত্যিকার বোধসম্পন্ন মানুষদের আচরণ প্রত্যক্ষ করেও এর কার্যকারীতা বিষয়ে ধারণা লাভ করা সম্ভব। যে যে ধর্মেই থাকুক না কেন অনেকেই এ ধারণায় বিশ্বাসী। আর এ ধারণার পেছনেই আল্লাহ, ভগবান, ঈশ্বর, গড এর ধারণা বিদ্যমান।

➢ (আয়াত ২৮৬) সূরার শেষ পর্যায়ে এসে মহান আল্লাহর কাছে অন্তরের অন্তস্থল থেকে মূল্যবান প্রার্থনা (Prayer) করা হয়েছে।

২৮৬	আল্লাহ কাউকেই তার সাধ্যাতীত কোন কাজের ভার দেন না। তার জন্য ততটুকু, যতটুকু সে নিজে অর্জন করেছে এবং তার বিপক্ষেও ততটুকুই বর্তায় যতটুকু সে পাবার যোগ্য। হে আমাদের পালনকর্তা! আমাদের দোষী সাব্যস্ত কর না যদি আমরা ভুলে যাই, কিংবা কোন নিদর্শনকে ভুল করে উপেক্ষা করি। হে আমাদের পালনকর্তা! আমাদের ওপর এমন বোঝা অর্পন কর না যেমন আমাদের পূর্ববর্তীদের ওপর করেছ। হে আমাদের প্রভূ! আমাদের ওপর এমন বোঝা অর্পন কর না যা বহন করার শক্তি আমাদের নেই। আমাদের ক্ষমা কর, পাপ মোচন কর এবং আমাদের প্রতি দয়া কর। তুমিই আমাদের রক্ষাকর্তা। আমাদেরকে বিজয় দাও অবিশ্বাসী সম্প্রদায়ের ওপর। (Allah tasketh not a soul beyond its scope. For it (is only) that which it hath earned, and against it (only) that which it hath deserved. Our Lord! Condemn us not if we forget, or miss the mark! Our Lord! Lay not on us such a burden as thou didst lay on those before us! Our Lord! Impose not on us that which we have not the strength to bear! Pardon us, absolve us and have mercy on us, Thou, our Protector, and give us victory over the disbelieving folk.)

- **২.২৮৬.১** আল্লাহ কাউকেই তার সাধ্যাতীত কোন কাজের ভার দেন না (Allah tasketh not a soul beyond its scope) : সম্পূর্ণ আয়াতটি একটি প্রার্থনা। প্রার্থনার প্রাক্কালে এখানে প্রাসঙ্গিক কিছু বিষয় স্মরণ করে নেয়া হয়েছে। আল্লাহর বিচার ব্যবস্থা তথা আল্লাহর কাছে জবাবদিহিতার ভয়, আল্লাহর দেয়া শাস্তির ভয় কিংবা আল্লাহ প্রদত্ত পুরস্কারের প্রত্যাশা যদি অন্তরে না থাকে, তবে কোন সূত্র বা নিয়মই মানুষের ওপর কাজ করবে না এবং মানুষকে মন্দ কর্ম থেকে বিরত রাখা বা সুপথে চালনা করা সম্ভব হবে না। অথচ সকল দিক-নির্দেশনার এটিই মূল লক্ষ্য।

বিশ্বাসী বিচার দিবসে বিশ্বাস করে। অন্তরে তার আল্লাহর শাস্তির প্রতি ভয় আছে। ভাল কাজের জন্য পুরস্কার প্রাপ্তির প্রত্যাশাও আছে। আল্লাহর দিক-নির্দেশনায় বিশ্বাসী তাই কর্ম-চঞ্চল হয়ে ওঠে!

বিশ্বাসীদের ওপর আল্লাহ গুরু দায়িত্ব অর্পন করেছেন। দায়িত্ব অর্পন করেছেন সত্য ও ন্যায়কে প্রতিষ্ঠা করা এবং অন্যায় ও অসত্যকে প্রতিহত করার। কিন্তু মানুষের সক্ষমতার সীমাবদ্ধতা আছে। দায়িত্ব ও কর্তব্য যথাসাধ্য পালন করা সত্বেও কর্মে ভূল-ক্রটি হতে পারে। সম্ভাব্য অনিচ্ছাকৃত ক্রটির জন্য সম্পূর্ণ এ আয়াতে আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করা হয়েছে এবং প্রকারান্তরে সফলতার সাথে লক্ষ্যে পৌঁছানর জন্য সহায়তা চাওয়া হয়েছে।

আল্লাহর কাছে প্রার্থনা শুরু করার প্রাক্কালে 'আল্লাহ কাউকেই তার সাধ্যাতীত কোন কাজের ভার দেন না' বিষয়টি স্মরণ করে নেয়া হয়েছে। এটি আল্লাহর একটি নিয়ম বা সূত্র (Allah's Law)। ফলে মানুষের যা করার সক্ষমতা নেই, নিশ্চয়ই আল্লাহ তেমন কাজের ভার মানুষের ওপর বা বিশেষভাবে এক্ষেত্রে বিশ্বাসীদের ওপর অর্পন করবেন না প্রার্থনাকারীর অন্তরে এটি একটি প্রত্যাশা।

বিশ্বাসী আল্লাহর শাস্তিকে ভয় করে। প্রার্থনার প্রাক্কালে বিষয়টি স্মরণ করে নেয়ার অর্থ হচ্ছে, সাধ্যের অতীত কোন কাজের জন্য আল্লাহ যেন তাঁর বান্দাদেরকে কঠিন জবাবদিহিতার মুখোমুখী না করেন। শাস্তিতে নিপতিত না করেন। প্রার্থনার পূর্বে প্রার্থনাকারীর মনের সে ইচ্ছেকে এখানে প্রকাশ করে নেয়া হয়েছে। আল্লাহ যেন মানুষের প্রতি তথা বিশ্বাসীদের প্রতি ক্ষমাপ্রবণ হন সে প্রত্যাশা করা হয়েছে। বস্তুত এখানে আল্লাহর ভীতি থেকে রক্ষা পাওয়ার বাসনা প্রকাশ পেয়েছে। তাঁর দয়া প্রার্থনা করা হয়েছে। আবার প্রচ্ছন্নে কর্মে সফলকাম হতে আল্লাহর সাহায্যও কামনা করা হয়েছে।

প্রার্থনার মাধ্যমে আল্লাহর কাছে করা এ আবেদন বিশ্বাসীর অন্তরে অনিচ্ছাকৃত ক্রটির কারণে ক্ষমা ও সাহায্য প্রাপ্তির সম্ভাবনাকে জাগিয়ে তোলে। মানুষকে আশান্বিত করে। আশাই মানুষকে চলতে সহায়তা করে। মানুষ সচল থাকলে তার কর্ম অবশ্যই উপকারী কিছু একটা ফল বয়ে নিয়ে আসে।

কোরআন মানবজাতির পথ চলার দিক-নির্দেশনা। কোরআনে আল্লাহ মানুষের জানার সুবিধার্থে নিজের নিয়ম বা সূত্র তুলে ধরেছেন। এসব দিক-

নির্দেশনা বা সূত্র মানুষের নিজেদের পরিচালনার ক্ষেত্রেও অনুসরণীয় ও প্রযোজ্য। যার পক্ষে যা করা সম্ভব নয়, তাকে সে কাজ দেয়া যায় না এবং তার জন্য তাকে দোষীও সাব্যস্ত করা যায় না। জগত পরিচালনায় মানুষকেও আল্লাহর এসব দিক-নির্দেশনাকে অনুসরণ করে চলতে হয়।

মানুষের মধ্যে যদি কেউ তার অধীনস্তকে তার সাধ্যাতীত কাজ দেয়, তবে সেক্ষেত্রে সে কাজে ব্যার্থতার দায় তার ওপর বর্তায় না এবং তেমন ক্ষেত্রে তার কর্মে সহায়তার হাতও প্রসারিত করে দিতে হয়।

পিপড়ে তার দেহের ওজনের চেয়ে বিশ গুণ অধিক বোঝা বহন করতে পারে। শুনে মনে হয় যেন অনেক বেশী বা সাধ্যের অতীত কাজ করছে। কিন্তু এটা তার সাধ্যের অতীত নয়। তাকে সেভাবেই সৃষ্টি করা হয়েছে। কেবল আধিক্যই সাধ্যের অতীত নয়। যার পক্ষে যা করা সম্ভব নয় বস্তুত সেটিই সাধ্যের অতীত।

সাধ্যের অতীত কাজ করা কোন সৃষ্টির পক্ষেই সম্ভব না। এটাই সত্যি। যা সত্যি আল্লাহর সূত্র সে পথেই সবকিছুকে চালনা করেন। আল্লাহই 'সত্য'। সত্যই সূত্র। সৃষ্টির সবকিছুই আল্লাহর সৃষ্টির সূত্র মেনে চলে।

এ প্রার্থনা যে পরিস্থিতিকালে শিক্ষা দেয়া হয়েছে বিশ্বাসীদের জন্য সে সময়টি ছিল চরম দুঃসময়ের। আর্থ-সামাজিক-মানসিক সবদিক থেকে তারা ছিল বিপর্যস্ত। অন্তরসমূহ ছিল অধৈর্য্যপ্রায়। বিপদের মহাসমুদ্রে পতিত হয়ে কোথাও কোন সহায়তা কিংবা আশার সম্ভাবনার ক্ষীণ আলোটুকু দেখা যাচ্ছে না। এমতাবস্থায় কেবল আল্লাহর সহায়তাই ভরসা। প্রার্থনার প্রাক্কালে তাই এ বাণীর স্মরণ বিশ্বাসীদের অন্তরে প্রশান্তি এনে দেয়। তাদেরকে অধিকতর পরীক্ষা বা কষ্টে নিপতিত হওয়ার ভয় থেকে মানসিকভাবে পরিত্রান দেয়। আল্লাহর ক্ষমা ও সহায়তা প্রাপ্তির আশায় আশান্বিত করে।

▪ **২.২৮৬.২** তার জন্য ততটুকু, যতটুকু সে নিজে অর্জন করেছে এবং তার বিপক্ষেও ততটুকুই বর্তায় যতটুকু সে পাবার যোগ্য (For it that which it hath earned, and against it that which it hath deserved) : এটিও আল্লাহর একটি সূত্র (Allah's Law)। সূত্রই সত্য। সবকিছু সৃষ্টির সূত্রের পথে তথা সত্যের পথে চালিত হয় এবং হবে। তাই বলা হয়েছে যে, এ বিশ্বজগত

সত্যের ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত (আল-কোরআন ১৬:৩)। সূত্রের ব্যাতিক্রম হবে না। কোরআনের মাধ্যমে মহান কারিগর মানুষের কাছে তাঁর সৃষ্টির সূত্রগুলি তুলে ধরেছেন। মানুষকে বুঝতে সহায়তা করেছেন যেন মানুষ সূত্রগুলির বিষয়ে জানতে পারে ও মেনে চলে এবং বিপদমুক্ত থাকতে পারে। একইসাথে লক্ষ্য অর্জনে সফলকাম হতে পারে। পার্থিব জীবনে মানুষের জন্যও এ সকল সূত্র দিক-নির্দেশনা হয়ে কাজ করে।

পার্থিব জীবনের ভাল-মন্দ কৃতকর্মের জন্য মানুষকে একদিন আল্লাহর কাছে জবাবদিহি হতে হবে। ভাল করলে ভাল ফল পাবে, মন্দ করলে মন্দ ফল পাবে। যে যেমন কর্ম করবে তেমন ফল পাবে। কৃতকর্মের দায়-দায়িত্ব মানুষের নিজের। এটি সূত্র ও সত্য। এর ব্যাত্যয় হবে না। আল্লাহ মানুষকে তাঁর নিয়ম সম্পর্কে অবহিত করছেন মানুষেরই হিতার্থে।

আল্লাহর বিচার ব্যবস্থা ভীষনভাবে ন্যায্যতার ওপর প্রতিষ্ঠিত। সর্বত্র আল্লাহর সূত্রে বিচারের ন্যায়পরায়নতার বিষয়টি ফুটে ওঠে। আল্লাহর বিচারে মানুষের অন্তরের গোপন ইচ্ছেকেও বিবেচনায় নেয়া হবে। সেক্ষেত্রে নিয়ত প্রাধান্য পাবে। সূক্ষাতিসূক্ষ ন্যায়ের ওপর প্রতিষ্ঠিত আল্লাহর সকল সূত্র।

বিচারের ন্যায়পরায়নতা ভিন্ন ভালদের ভাল থাকার বিষয়টি অর্থহীন হয়ে যাবে। অপরদিকে মন্দরা মন্দ কাজে উৎসাহিত হবে। তাতে ন্যায় প্রতিষ্ঠা পাবে না। অতএব আল্লাহর ন্যায্যতার সূত্র কাজ করবেই।

এতদ্বসত্বেও স্মরণে রাখতে হবে যে, পরিপূর্ণ বিবেচনা একান্তই আল্লাহর। তিনি সূক্ষ্ণ বিচারক। মানবের পূর্ণাঙ্গ জীবনে সকলের সকল বিষয় তিনি অবহিত। তিনি যাকে ইচ্ছে ক্ষমা করবেন, যাকে ইচ্ছে শাস্তি দেবেন। তাঁর ইচ্ছেও সুবিবেচনাপ্রসূত বিষয় যা মানুষের বোধগম্যতার উর্ধ্বে [আল্লাহর ইচ্ছে দ্রষ্টব্য ২.১৪২.৩]।

আল্লাহ কাউকেই তার সাধ্যাতীত কাজের ভার দেন না। যার পক্ষে যতটুকু করা সম্ভব আল্লাহ তাকে ততটুকু কাজ বা দায়িত্ব অর্পন করেন। অতএব মানুষের উচিত যথাযথভাবে দায়িত্ব ও কর্তব্য পালন করা। সাধ্যাতীত কাজ না দেয়া সত্বেও মানুষ তার দায়িত্ব পালনে ব্যার্থ হলে যেমন কর্ম করবে তেমন ফল পাবে। এখানে সে বিষয়টিও গুরুত্ব পেয়েছে। প্রার্থনার প্রাক্কালে বিষয়টির

স্মরণ মানুষকে তার কথায়-কর্মে ও চিন্তায় অযৌক্তিক ত্রুটি করা থেকে বিরত থাকতে উপদেশ দিচ্ছে।

প্রার্থনার প্রাক্কালে আল্লাহ প্রতিষ্ঠিত এ সূত্র স্মরণ করে নেয়া হচ্ছে বা স্মরণ করিয়ে দেয়া হচ্ছে। অর্থাৎ প্রার্থনাকারী এ সত্য জেনে-বুঝে নিজের কর্মের ভাল-মন্দ দায়ভার নিজের ওপর নিয়ে এ প্রার্থনা করছে। প্রার্থনার এ ধরণ প্রার্থনাকারীর আত্মবিশ্বাস বৃদ্ধিতেও সহায়ক হয়ে কাজ করে।

প্রার্থনার এ ধরণ মানুষকে তার কাজ ও দায়িত্বের যথাযথ পরিপালনের বিষয়ে সর্বোচ্চ সতর্ক ও সচেতন থাকতে অনুপ্রাণীত করে। দায়িত্ব ও কর্তব্য পালনের বিষয়ে উদাসীনতা দুর করার সহায়ক হয়ে কাজ করে এ প্রার্থনা। আল্লাহ সেভাবেই বিষয়গুলি শিক্ষা দিয়েছেন। অর্থাৎ সত্যকে জেনে-বুঝে ও স্বীকার করে নিয়ে যৌক্তিকভাবে কোন কিছু যাঞ্চা বা উত্থাপন করা, অতঃপর অপারগতায় আল্লাহর কাছে ক্ষমা ও সাহায্য প্রার্থনা করা।

সত্যকে অস্বীকার করে বা পাশ কাটিয়ে আজগুবি বা কল্পনাপ্রসূত কোন প্রার্থনা করার শিক্ষা দেয়া হয়নি এখানে। সত্যের ওপর ভিত্তি করে ভীষন নিয়মমাফিকভাবে বিশ্বাসীদেরকে আল্লাহর কাছে যাঞ্চা করার শিক্ষা দেয়া হয়েছে।

- **২.২৮৬.৩** হে আমাদের পালনকর্তা! আমাদের দোষী সাব্যস্ত কর না যদি আমরা ভুলে যাই, কিংবা কোন নিদর্শনকে ভূল করে উপেক্ষা করি (Our Lord! Condemn us not if we forget, or miss the mark) : মূল প্রার্থনায় যাওয়ার পূর্বে আল্লাহর দু'টি সূত্রকে প্রথমে স্মরণ করে নেয়া হয়েছে। অর্থাৎ প্রার্থনাকারী আল্লাহর ওপরোক্ত নিয়মের বিষয়ে সচেতন। অতঃপর সব জেনে-বুঝেই সাধ্যমত নিজ দায়িত্ব পালন করত আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করা হয়েছে।

উল্লেখ্য যে, আল্লাহ তাঁর প্রেরীত বার্তার মাধ্যমে সৃষ্টি জগত ও বাস্তব জীবনের নানানসব ঘটনা তুলে ধরে মানুষকে শিক্ষা দেন। সঠিক পথের দিক-নির্দেশনা দেন। এমনই আল্লাহর শিক্ষাদান প্রক্রিয়া। এসবই হচ্ছে তাঁর 'নিদর্শন'।

এটি মানুষের নিজেদেরই কাজ যে তারা আল্লাহর সৃষ্টিকে পর্যবেক্ষন করবে, নিদর্শনসমূহকে খুঁজে নেবে, সেসব নিয়ে আলোচনা-পর্যালোচনা ও গবেষনা করবে; ঘটনাসমুহ থেকে শিক্ষা গ্রহণ করবে এবং সেগুলি থেকে প্রাপ্ত শিক্ষাকে জীবন ও জগত পরিচালনায় কাজে লাগাবে।

কোন নিদর্শন খুঁজে পেতে ও তার থেকে সঠিক শিক্ষা বা জ্ঞানটি বুঝে নিতে ব্যার্থ হলে সেটি মানবীয় ত্রুটি। আবার প্রাপ্ত জ্ঞানকে কাজে না লাগিয়ে উপেক্ষা করা হলে সেটিও মানবীয় ত্রুটি। ভূল হলে ভূলের মাশুল গুণতে হয় এটিও একটি সূত্র।

একটু অন্যভাবে ভাবি। এ জগত সংসারে মানুষ কত বড় বড় কাজ ও দায়িত্ব পালন করে চলেছে! এখানে কেউ বিজ্ঞানী, কেউ কবি, কেউ লেখক, সমাজবিদ, ধর্মগুরু, কেউ বড় কোন কর্মকর্তা। প্রত্যেকে নানান কাজে ব্যাস্ত। বস্তুত আজ আমরা নিজেদেরকে অপ্রয়োজনীয় কাজে ব্যাপৃত রেখেছি। তা না হলে গ্রহ থেকে গ্রহান্তরে পূর্বাবস্থায় তথা পূর্বের সেই সুখী অবস্থায় ফিরে যাওয়ার উপায় সন্ধান করতাম না। আদম-হাওয়া তো স্বর্গীয় উদ্যানে সুখী অবস্থাতেই ছিল!

ছোট্ট একটি ভূল। শয়তানের প্ররোচনা নামে পরিচিত। তাতেই আল্লাহর আদেশ অমান্যের ঘটনা। পরিণতিস্বরূপ আজকের এই কর্মব্যাস্ত মানবজীবন। কথাগুলি বিশেষভাবে ঐশী গ্রন্থসমুহে বিশ্বাসীদেরকে উদ্দেশ্য করে বলা হচ্ছে। কেননা বাইবেল-কোরআনে বিষয়গুলি উদ্ধৃত হয়েছে। কেউ বিশ্বাস করুক কিংবা না করুক উপমা হিসেবে গ্রহণ করে নিয়েও এসব থেকে শিক্ষা গ্রহণ করার আছে। ছোট্ট একটি ভূল কিন্তু পরিণতি কত বিশাল ও জটিল! ছোট আসলেই ছোট না। ছোটকেও অবহেলা করতে নেই। প্রার্থনায় সে কথাই বলা হয়েছে, "হে আমাদের পালনকর্তা! আমাদের দোষী সাব্যস্ত কর না যদি আমরা ভুলে যাই, কিংবা কোন নিদর্শনকে ভূল করে উপেক্ষা করি।"

জগত সংসারেও লালন-পালনকারীর সাথে করা অকৃতজ্ঞ আচরণের পরিণাম হয় এমনই ভয়ংকর! মানুষকে আল্লাহর সকল নিদর্শন থেকে শিক্ষা নিয়ে সঠিক পথে চলতে অনুপ্রাণীত করা হচ্ছে।

রামায়ন-মহাভারত এসব গ্রন্থেও ব্যাক্তিক কিংবা পারিবারিক ছোট্ট ঘটনাসমুহ থেকে কত বড় সর্বনাশ হতে পারে মানুষকে সেসব বিষয়ে ধারণা

দেয়া হয়েছে। কারও প্রতি করা কারও অন্যায়, বিদ্বেষমূলক ও হিংসাত্মক আচরণ কিংবা নিজেকে নিয়ন্ত্রন করতে না পারার পরিণামই তুলে ধরা হয়েছে এসব গ্রন্থে। ছোট্ট বিষয়টি একসময় আর ছোট্ট থাকে না। অনেক মানুষ, সমাজ, গোত্র, জাতি জড়িয়ে যায়। জগত সংসারে এসবের পরিণাম ধ্বংস ডেকে আনে। মানুষকে এসব ঘটনাবলী বা নিদর্শন থেকে শিক্ষা নিয়ে ভূল না করতে অনুপ্রাণীত করা হয়েছে। তাই এসব গ্রন্থকে দিক-নির্দেশনামূলক বা পথ-প্রদর্শনকারী গ্রন্থ বলা হয়।

ইসরাইলের সন্তানদের এক ভাইয়ের প্রতি অপর ভাইদের করা হিংসাত্মক ও অন্যায় আচরণ নিজেদের মধ্যকার ছোট্ট একটি পারিবারিক ঘটনা বলেই বিবেচিত হওয়ার ছিল, যা বাইবেল ও কোরআন উভয় গ্রন্থেই গুরুত্বের সাথে উদ্ধৃত হয়েছে [লেখকের 'বাইবেল কোরআন ও ইসরাইল' বই দ্রষ্টব্য]। কিন্তু নিজেদের মধ্যকার একদিনের সেই ক্ষুদ্র অন্যায় বা ভূল কাজ জগতে কত ব্যাপক প্রভাব বিস্তার করেছে মানুষকে সেসব থেকে শিক্ষা নিতে উদ্বুদ্ধ করা হয়েছে। মানুষকে এমন ভূলের পুনরাবৃত্তি না করতে বলা হচ্ছে।

ক্ষুদ্র কিন্তু প্রকৃতই ক্ষুদ্র নয়। যেমন পরমাণুর ভেতর প্রচন্ড শক্তি লুকিয়ে থাকে!! যত ক্ষুদ্রই হোক মানুষকে অন্যায় কাজ করতে বারণ করা হচ্ছে। মানুষকে স্মরণ করিয়ে দিয়ে আল্লাহ বলছেন,

"নভোমণ্ডল ও ভূ-মণ্ডলে রয়েছে কত নিদর্শন (শিক্ষনীয় ঘটনা), যা তারা (মানুষ) পাশ কেটে চলে যায়, ফিরেও তাকায় না!" (আল-কোরআন ১২:১০৫)

এ বাণীর মাধ্যমে মানুষকে নানাবিধ ঘটনা ও তার পরিণতিজনিত নিদর্শন থেকে শিক্ষা নিতে বলা হয়েছে। সঠিক পথটি বেছে নিতে অনুপ্রাণীত করা হয়েছে। তাই তো কোরআন মানব জাতির জন্য এক যথাযথ দিক-নির্দেশনামূলক গ্রন্থ (Guidance) যা সূরার শুরুতেই উদ্ধৃত হয়েছে। মানুষের পথ-প্রদর্শনমূলক এমনি বহু নিদর্শন আল্লাহর সৃষ্টিতেও ছড়িয়ে রাখা আছে। আল্লাহ বলেন,

"নিশ্চয়ই! নভোমণ্ডল ও ভূ-মণ্ডলে বিশ্বাসীদের জন্য রয়েছে নিদর্শনসমুহ। এবং তোমাদের সৃষ্টিতে ও পৃথিবীতে ছড়িয়ে রাখা জীব জন্তুর মাঝেও রয়েছে

নিদর্শনাবলী, তাদের জন্য যাদের নিশ্চিত বিশ্বাস আছে। দিবারাত্রির পরিবর্তনে, আসমান থেকে আল্লাহ জীবনোপকরণ সরবরাহ করে ধরিত্রীকে তার মৃত্যুর পর পুনরুজ্জীবিত করেন তাতে এবং বায়ুমণ্ডলের পরিবর্তনে রয়েছে নিদর্শনাবলী তাদের জন্য যারা বোধসম্পন্ন।" (আল-কোরআন ৪৫:৩-৫)

"নভোমণ্ডল ও ভূ-মণ্ডলের সৃষ্টিতে এবং রাত ও দিনের পরিবর্তনে এবং মানুষের কল্যাণে নদীতে জলযান সমূহের চলাচলে, আকাশ থেকে বর্ষণকৃত পানি যা দ্বারা মৃত জমিনকে সজীব করে তুলেন তাতে এবং তার মাঝে ছড়িয়ে দেয়া সকল প্রকার জীবে, বাতাস প্রবাহের গতি-প্রকৃতিতে এবং আসমান ও জমিনের মাঝে বিচরণকৃত মেঘমালা- এ সবই বোধসম্পন্ন মানুষের জন্য আল্লাহর ইংগিতপূর্ণ নিদর্শন।" (আল-কোরআন ২:১৬৪)

আল্লাহর সৃষ্টির সকল নিদর্শনই জীবন-জগত তথা সৃষ্টির সুরক্ষার জন্যই প্রয়োজনীয়। যা খুঁজে পেতে মানুষকেই কাজ করতে হয় এবং হবে। উদাসীনতার কারণে কোন নিদর্শনকে ভূল করে উপেক্ষা করা হলে কিংবা খুঁজে পেতে ব্যার্থ হলে বা সেখান থেকে যথাযথ শিক্ষা ও জ্ঞানটি নিতে ব্যার্থ হলে সেটি মানবীয় ত্রুটি হিসেবে বিবেচিত হবে। এমন ত্রুটির কারণে সৃষ্টিজগত সমুহ বিপদের মুখোমুখী হতে পারে। এমনকি হতে পারে সৃষ্টি ধ্বংসের কারণ। এর দায় মানুষের ওপরও বর্তায়। কেননা আল্লাহ তাঁর নিদর্শন প্রদর্শন করেছেন। পরবর্তী কাজ মানুষের। সে কারণেই মানবজাতির সৃষ্টি! নয়ত এ জগতে মানুষের আর গুরুত্বপূর্ণ কি কাজ আছে?

আল্লাহ তাঁর প্রেরীত বার্তা ও নিদর্শনসমুহ থেকে যথাযথ জ্ঞান ও শিক্ষা নিয়ে মানুষকে পথ চলতে দিক-নির্দেশনা দিয়েছেন। এ কাজগুলিই মানুষের যথাযথ দায়িত্ব ও কর্তব্য পালনের অন্তর্ভূক্ত বিষয়।

জগতের অধিকাংশ মানুষ দৈনন্দিন যে কাজগুলির সাথে ভীষনভাবে জড়িয়ে আছে বা থাকে বা যেসবকে সর্বাধিক প্রাধান্য দেয় যেমন- অন্য, বস্ত্র, বাসস্থান .. বিনোদন ইত্যাদি বস্তুত এগুলি মূল কাজ নয়। এগুলি মূল কাজের সহায়ক কাজ। মানুষকে কেবল সহায়ক কাজগুলি করার জন্যই পৃথিবীতে প্রেরণ করা হয়নি বা সৃষ্টি করা হয়নি বা হতে পারে না। 'বোধসম্পন্ন' মানুষ মাত্রই সেটি জানে ও বোঝে [দ্রষ্টব্য ২.২৯.২, ২.২৯.৩]।

প্রসঙ্গক্রমে কিছু কথা বলে রাখি। ওপরের উদ্ধৃতি সমুহের প্রতিটির শেষের দিকে লক্ষ্য করলে দেখা যাবে যে, আল্লাহর নিদর্শন সম্পর্কে বলতে গিয়ে সবক্ষেত্রেই এভাবে বলা হয়েছে যে, '... রয়েছে নিদর্শনাবলী, তাদের জন্য যাদের নিশ্চিত বিশ্বাস আছে।' '... রয়েছে নিদর্শনাবলী তাদের জন্য যারা বোধসম্পন্ন।' 'এ সবই বোধসম্পন্ন মানুষের জন্য আল্লাহর ইংগিতপূর্ণ নিদর্শন।'

যারা আল্লাহর সৃষ্টির সন্ধান-অনুসন্ধান করে, সেখান থেকে শিক্ষা লাভ করে, শিক্ষাকে কাজে লাগায় এবং জগত পরিচালনায় সহায়তা করে তারাই প্রকৃত অর্থে 'বোধসম্পন্ন' মানুষ। বর্তমান সময়ে প্রতিটি বিষয়ের বিশেষজ্ঞ ব্যাক্তিবর্গ বা বিজ্ঞানী ও সমাজ বিজ্ঞানীরা সংশ্লিষ্ট বিষয়ের কাজগুলি করে থাকেন। এসব বিষয় ও কাজ এখন আধুনিক বিষয়ভিত্তিক শিক্ষা কার্যক্রমসমুহের অন্তর্ভূভূক্ত বিষয়।

আল্লাহর সৃষ্টির সন্ধান-অনুসন্ধান হচ্ছে নিজেকে ও আল্লাহকে জানারই নামান্তর। তাঁকে জানতে ও বুঝতে পারার মধ্য দিয়েই সত্যিকারভাবে তাঁর মহাত্ম প্রকাশ পায়। এভাবে মানবসমাজ তাঁর মহাত্ম জানতে ও বুঝতে পারে। মানুষ নতুন জ্ঞানে তাঁর মহাত্ম বর্ণনা করে। মুখে মুখে তাঁর গুণগানের যথার্থ প্রচার ও প্রসার ঘটে। যারা কাজগুলি করে তারাই যথার্থ অর্থে 'বোধসম্পন্ন' মানুষ।

'বোধসম্পন্ন' মানুষদের কর্মের মাধ্যমেই সত্যিকারভাবে আল্লাহর মহাত্ম প্রকাশিত হয় ও ফুটে ওঠে। আল্লাহর মহাত্ম বর্ণনা, তাঁর গুণগান করা, তাঁকে জানা ও বোঝা এ সবই এবাদতের পর্যায় বা অন্তর্ভূক্ত বিষয়। বস্তুত কল্যাণমূলক সকল কাজই আল্লাহর উপাসনা বা এবাদত। তাই বলা হয়েছে,

"নিজ নিজ স্বভাবজাত কর্ম বা স্বকর্ম (বিশেষায়িত কর্ম) অনুসরণ করে সকল মানুষ উৎকর্ষ সাধন করতে পারে। ... মানুষ তার নিজ দায়িত্ব পালন করার মাধ্যমে ভগবানের অর্চনা করে সিদ্ধি, উৎকর্ষতা বা পরিপূর্ণতা লাভ করতে পারে।" (গীতা ১৮:৪৫-৪৬)

আল্লাহর 'নিদর্শন' তাঁর মহাত্মকে প্রকাশ করে। তাঁকে জানতে ও বুঝতে সহায়তা করে। যথাযথ জ্ঞানে তাঁকে জানা ও বোঝা মানুষের দায়িত্ব ও কর্তব্যের মধ্যে পরে। তাঁকে জানা ও বোঝাই হচ্ছে তাঁর মহাত্মকে উপলব্ধি

করা। এ উপলব্ধিবোধই মানুষকে তাঁর গুণগান করতে অনুপ্রাণীত করে। এটিই এবাদত বা উপাসনা!

কোরআনে উপাসনাকে প্রাতিষ্ঠানিক ভিত্তির ওপর দাঁড় করাতে দিক-নির্দেশনা দিয়েছে। মানুষের জন্য সর্বক্ষেত্রেই এ নির্দেশনা একটি যথাযথ দিক-নির্দেশনা হয়ে কাজ করে। অর্থাৎ সকল কাজকেই এমনিভাবে প্রাতিষ্ঠানিক ভিত্তির ওপর দাঁড় করাবার নির্দেশনা রয়েছে এতে। সকল কল্যাণমূলক কাজই এবাদত।

বিজ্ঞানীরা প্রতিটি বিষয়ে বৈজ্ঞানিক গবেষনা করে চলেছেন। বিজ্ঞানীরা আল্লাহর নিদর্শনসমূহকে সত্যিকার অর্থে সন্ধান-অনুসন্ধান ও বিচার-বিশ্লেষণ করে মানবজাতির সামনে যথাযথভাবে তুলে ধরছেন। প্রতিটি বিষয়ই বর্তমান সময়ে প্রাতিষ্ঠানিক ভিত্তির ওপর দাড়াতে পেরেছে। যা এক সময়ে সেভাবে প্রতিষ্ঠা পায়নি। প্রাতিষ্ঠানিক ভিত্তির ওপর কোন কিছুকে দাড় করান সম্ভব হলে সেটি দৃঢ় ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠা পায়। সেখান থেকে মানবসমাজ সর্বোচ্চ পর্যায়ে উপকৃত হয়। তাই বর্তমানে গুরুত্বপূর্ণ কাজ হচ্ছে জগতের সকল মানুষকে উচ্চ শিক্ষার আওতার মধ্যে নিয়ে আসা এবং ভূল পথ পরিত্যাগ করা।

জলে, স্থলে ও অন্তরীক্ষে আছে আল্লাহর নানান নিদর্শন। আল্লাহর নিদর্শন খুঁজে পাওয়া ও তাকে কাজে লাগান সৃষ্টির সুরক্ষার জন্য প্রয়োজন। ঔদাসীন্য বা মানবীয় কোন ক্রটির কারণে আল্লাহর কোন নিদর্শনকে উপেক্ষা করা হলে কিংবা সেখান থেকে শিক্ষা নিয়ে কাজে লাগাতে ব্যার্থ হলে সেটি সৃষ্টি ধ্বংসের কারণ হতে পারে। তাই এ বিষয়ে সজাগ ও সচেতন থাকা মানবজাতির অন্যতম গুরু দায়িত্ব।

সচেতন থাকা সত্বেও আল্লাহর প্রকান্ড কর্মকান্ডের সবকিছু মানুষের চোখে ধরা নাও দিতে পারে। ভূল হতেই পারে। যে কোন প্রকার ক্রটির কারণে মানুষকে আল্লাহরই স্মরণাপন্ন হতে হয়।

প্রার্থনায় মানুষের অসহায়ত্ব ও সম্ভাব্য মানবীয় ক্রটি স্বীকার করে আল্লাহকে স্মরণ করা হয়েছে। মানুষকে অতীত, বর্তমান, ভবিষ্যত সকল প্রকার বিপদ থেকে কেবল আল্লাহই রক্ষা করতে পারেন।

মানুষ হিসেবে যে দায়িত্ব মানুষের ওপর বর্তেছে, নিজেদের ত্রুটির কারণে মানুষকে না আবার আল্লাহর দৃষ্টিতে দোষী সাব্যস্ত হতে হয় এবং পরিণতি ভোগ করতে হয়, তাই অজান্তেও কোন ত্রুটি হয়ে থাকলে আল্লাহর কাছে এভাবে ক্ষমা প্রার্থনা করা হয়েছে। অনিচ্ছাকৃত ভূল থেকেও কিভাবে রক্ষা পেতে হয় এখানে সে শিক্ষা দেয়া হয়েছে।

বিশ্বাসীর মনে আল্লাহর ভীতি আছে। এ ভীতির অনেক বড় উপকারীতা আছে। এ প্রার্থনা আল্লাহর মহাত্বকে স্মরণ করিয়ে দেয়; মানুষকে আশাবাদী ও কর্মে উৎসাহিত করে; জ্ঞানত কোন প্রকার ভূল না করতে মানুষকে সদা-সর্বদা সচেতন থাকতে সতর্ক করে।

আল্লাহর কাছে মার্জনা চাওয়ায় কোন ত্রুটি নেই। কিন্তু অনেক মানসিক প্রশান্তি আছে। ভূল-ত্রুটি সত্বেও পুনরায় শুদ্ধ হয়ে চলার আশাকে জাগ্রত করে এ প্রার্থনা। নতুন উদ্যমে পথ চলতে সহায়তা করে। আল্লাহর কাছে চাওয়া সব সময়ের জন্যই মঙ্গলকর। জানা-অজানা সম্ভাব্য সকল ভূলের জন্য প্রতিনিয়ত আল্লাহর আনুকূল্য প্রার্থনা করা উচিত [আল্লাহ ও ক্ষমা দ্রষ্টব্য ২.১৯৯]।

এ প্রার্থনা যেমন আল্লাহর আনুকূল্য প্রাপ্তির আশাকে জাগরিত করে, তেমনি নিজের মনেও প্রশান্তি এনে দেয়। নতুন উদ্যেমে কাজ শুরু করার শক্তি ও সাহসের সঞ্চার করে। ভবিষ্যতের জন্য আশার আলো দেখায়।

কোন নিদর্শনকে ভূল করে উপেক্ষা করা হলে এবং মানুষের অযাচিত তেমন কোন ভূলের কারণে জীবন ও জগতে সম্ভাব্য কোন বিপদ নেমে এলে, যে কর্তব্য মানুষের পক্ষে যথাযথভাবে পালন করা সম্ভব হয়নি তার জন্য আল্লাহ যেন মানুষকে দোষী সাব্যস্ত না করেন এবং সমুহ বিপদ থেকেও মানুষকে রক্ষা করেন সে জন্য এ প্রার্থনা কার হয়েছে।

আল্লাহ বার্তা প্রেরণ করেন, নিদর্শন প্রদর্শন করেন এবং সর্বপরি ভেতরে 'প্রেরণা'র সৃষ্টি করেন। প্রেরণায় উজ্জীবিত হয়ে মানুষ কাজ করে। নিজ বা নিজেদের জ্ঞানকে কাজে লাগিয়ে বিচার-বিবেচনা ও বিশ্লেষন করেই মানুষ একটি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। যে সিদ্ধান্ত সফলতা বা বিফলতার পেছনে কাজ করে।

যে 'প্রেরণা' বিশ্বাসীদেরকে রাসূলের নেতৃত্বে সত্য ও ন্যায় প্রতিষ্ঠার মতো গুরু দায়িত্বে নিয়োজিত করেছে, মানবীয় সীমাবদ্ধতার মধ্যে সিদ্ধান্ত গ্রহনে

সেখানে যদি অজান্তেও কোন ভূল-ভ্রান্তি হয়ে থাকে যা লক্ষ্য অর্জনে সফলতা বা বিফলতার পেছনে কাজ করে, তবে আল্লাহর কাছে সে ত্রুটির জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করা হয়েছে। আল্লাহর ত্রুটিহীন বিবেচনায় বিশ্বাসীদেরকে তথা বোধসম্পন্ন মানুষদেরকে সে কারণে যেন দোষী সাব্যস্ত না করে মার্জনা করা হয় সেজন্য এ প্রার্থনা করা হয়েছে। প্রচ্ছন্নে এর মাধ্যমে মানুষের সীমাবদ্ধতাকে স্বীকার করে আল্লাহর সাহায্য ও সহযোগীতাও যাঞ্চা করা হয়েছে।

- **২.২৮৬.৪** হে আমাদের পালনকর্তা! আমাদের ওপর এমন বোঝা অর্পন কর না যেমন আমাদের পূর্ববর্তীদের ওপর করেছ। হে আমাদের প্রভূ! আমাদের ওপর এমন বোঝা অর্পন কর না যা বহন করার শক্তি আমাদের নেই (Our Lord! Lay not on us such a burden as thou didst lay on those before us! Our Lord! Impose not on us that which we have not the strength to bear) : এমন এক সময়ে প্রার্থনার এ বাণী অবতীর্ণ হয়েছে বা শিক্ষা দেয়া হয়েছে, বিশ্বাসীরা যখন ছিল চরমভাবে নির্যাতিত। কষ্টের পর কষ্ট। যেন সহ্য ক্ষমতার বাইরে। অধৈর্য্য প্রায়। আর্থ-সামাজিক, মানসিক সবদিক থেকে তারা কোণঠাসা ও ধৈর্য্যচ্যুত ছিল প্রায়।

প্রার্থনার এ ধরণ দুঃসময়ে বিশ্বাসীদের অন্তরে প্রশান্তি এনে দেয়। অধিকতর পরীক্ষায় নিপতিত হওয়ার আশংকা থেকে নিস্তার লাভ করার একটি আশার সঞ্চার করে। যেন আল্লাহর কাছে আবেদন করে রাখা হয়েছে। আল্লাহ সেটি মঞ্জুর করতে যাচ্ছেন। কষ্টে জর্জরিত মানুষ হতাশার মাঝেও আশার আলো দেখতে পাচ্ছে। আল্লাহ তাদের পাশে সহায় হয়ে আছেন। তাঁর একটুখানি সুদৃষ্টি মূহুর্তে সব কষ্ট দুর করে দিতে পারেন। তারা স্বস্তির জন্য অপেক্ষমান। সামনে আশার আলো।

এ প্রার্থনা বিশ্বাসীদের ধৈর্য্য ধারণের সক্ষমতাকে বৃদ্ধি করে দেয়। ধৈর্য্যই অসম শক্তির পরিচায়ক। বিপদের মূহুর্তে বিশ্বাসীদের উগ্র বা ভূল আচরণ পরিত্যাগ করে বিনয়ী হতেও অনুপ্রাণীত করে এ প্রার্থনা। বিনীত অন্তরে এমন বিনয়ী প্রার্থনা বিপদেও বিশ্বাসীর আচরণকে সঠিক পথে চলতে সহায়ক হয়ে কাজ করে। অন্তরকে সাহসী ও শক্তিশালী করতে ভূমিকা রাখে। বিনয় সফলতার মূলমন্ত্র!

এ প্রার্থনা কোন উদাসীন নয় বরং একজন সচেতন মানুষের প্রার্থনা। যে তার নিজের দুর্বলতা বা কোন অপারগতা বিষয়ে ওয়াকিবহাল। সেই ত্রুটিজনিত কর্মফল থেকে মুক্ত হওয়ার মানসে মার্জনা চাওয়া হয়েছে। উচ্চ মানসিকতার প্রকাশ রয়েছে এ প্রার্থনার মাঝে। এ প্রার্থনার মনস্তাত্বিক গুরুত্ব অপরিসীম।

খুবই গুরত্বপূর্ণ এ প্রার্থনা। জগতের সকল নির্যাতিত বা ভীষনভাবে কষ্টে বা চাপের মুখে পতিত মানুষের জন্য এটি একটি আদর্শ প্রার্থনা। বিপদাপন্ন অন্তরে এমন প্রার্থনা প্রশান্তি এনে দেয়। আল্লাহ পাশে আছেন তাই বুকে সাহসের সঞ্চার করে; মনে আশার সঞ্চার করে।

উল্লেখ্য যে, প্রার্থনা থেকে উপকার পেতে হলে যার কাছে যাঞ্চা করা হচ্ছে তাঁকে বিশ্বাস করতে হবে। যার যার বিশ্বাস মতে আল্লাহতে বিশ্বাসী ও ভরসাকারী হতে হবে।

সকল যুগেই দেখা যায় যে পূর্বতনেরা অধিক পরিশ্রম করে ও অধিক ঝুঁকিরও মুখোমুখী হয়ে থাকে। পরবর্তীদের জন্য যা বহন করার সামর্থ নানান কারণে কমে আসে। যেমন শারীরিক দিক থেকে, তেমনি মানসিক দিক থেকে এবং আধুনিকায়নের কারণেও।

ইসরাইলের সন্তানেরা মুসা (আঃ) এর নেতৃত্বে আল্লাহর বাণীকে সমুন্নত করতে ও ধরে রাখতে প্রাণান্তকর পরিশ্রম ও কষ্ট সহ্য করেছে। তারা মরুর বুকে চল্লিশ বছর দিশেহারা হয়ে ঘুরে বেরিয়েছে। আল্লাহর কারণে যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়েছে। সে কষ্ট সহ্য করার ক্ষমতা পরবর্তী প্রজন্মের হয়তবা না থাকার কথা। ঈসা (আঃ) ক্রুশবিদ্ধ হয়েছেন। নবী ইয়াহহিয়াহকে হত্যা করা হয়েছে। পূর্বতনদের ইতিহাসে এমন অনেক ঘটনা রয়েছে যা ভাবলেও গা শিউরে ওঠে।

ধর্মীয় বিষয় আলোচনা হচ্ছে বিধায় কেবল নবী-রাসূলদের ক্ষেত্রেই এমনটি ঘটেছে তা নয়। ইতিহাস পর্যালোচনায় দেখা যাবে এমনি অসংখ্য ঘটনা যুগে যুগে দেশে দেশে সংঘটিত হয়েছে। বিজ্ঞানী, দার্শনিক থেকে শুরু করে সমাজ সংস্কারক পর্যন্ত যারাই জীবন ও জগতকে বিকশিত করতে অবদান রেখে গেছে তাদের অনেককেই নির্যাতনের শিকার হতে হয়েছে। নিরীহ মানুষও দুষ্ট চক্র ও সামাজিক ভ্রান্ত নিয়মের কারণে নির্মমভাবে নির্যাতিত হয়েছে।

মানুষের যা বহন করার শক্তি নেই আল্লাহ মানুষকে তেমন বোঝা চাপিয়ে দেন না। আল্লাহর সূত্রই তেমন। প্রার্থনার প্রাক্কালে আল্লাহর সে সূত্রটিকে তাই প্রথমেই স্মরণ করে নেয়া হয়েছে। অতঃপর আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করা হচ্ছে যেন আল্লাহ তেমন কোন বোঝা বিশ্বাসীদের ওপর চাপিয়ে না দেন যা বহন করার শক্তি প্রজন্মের নেই। এর অপর অর্থ হচ্ছে, বিশ্বাসী সম্প্রদায়ের ওপর যে গুরু দায়িত্ব অর্পন করা হয়েছে তা অর্জন যেন তিনি সহজসাধ্য করে দেন [প্রার্থনা দ্রষ্টব্য ২.১২৭]। বলা হচ্ছে,

"তিনিই হাসান, তিনিই কাঁদান এবং তিনিই মৃত্যু ও জীবন দান করেন।" (আল-কোরআন ৫৩:৪৩-৪৪)

আল্লাহই মানুষকে কষ্টে নিপতিত করেন, আবার আল্লাহই মানুষকে পরিত্রাণ দান করেন। আল্লাহ একাই মানুষের ভাল-মন্দের নিয়ন্ত্রক। বিশ্বাসী তাই বিশ্বাস করে। বিশ্বাসী একমাত্র আল্লাহকেই সাহায্যকারী হিসেবে জানে। অতএব সত্যিকার বিশ্বাসীর প্রার্থনা কেবলমাত্র আল্লাহরই কাছে। যেমনটি সূরা ফাতেহায় বলা হয়েছে, 'আমরা (কেবলমাত্র) তোমারই সাহায্য কামনা করি'।

■ **২.২৮৬.৫** আমাদের ক্ষমা কর, পাপ মোচন কর এবং আমাদের প্রতি দয়া কর (Pardon us, absolve us and have mercy on us) : কোন নিদর্শনকে উপেক্ষা করা বা কোন নিদর্শনকে বুঝতে না পারা কিংবা কোন নিদর্শনকে খুঁজে না পাওয়া, সক্ষমতার বাইরে কোন দায়িত্ব গ্রহণে অপারগতা বা নির্দেশনা পালনে ব্যার্থতা, সিদ্ধান্ত গ্রহণে কোন প্রকার ভূল-ভ্রান্তি, কোন পাপকাজ যা জানা নেই অজান্তেও যদি তেমন কোন ভূল হয়ে থাকে তবে তার জন্য মহান আল্লাহর দরবারে ক্ষমা প্রার্থনা করা হয়েছে।

আল্লাহ অতি সূক্ষ্ম দ্রষ্টা। তিনি মানুষের ইচ্ছেকৃত, অনিচ্ছাকৃত ও অজান্তের ভূলগুলিও জানেন। তাঁর কাছে সর্বক্ষণ ক্ষমা চাওয়ায় কোন ত্রুটি নেই [আল্লাহ ও ক্ষমা দ্রষ্টব্য ২.১৯৯]। কিন্তু তাতে ক্ষমা পাবার সম্ভাবনা সৃষ্টি হয়। সম্ভাবনার প্রত্যাশায় এ প্রার্থনা মনকেও শান্তনা ও প্রশান্তি দেয়। আশার সঞ্চার করে। যা পরবর্তী কাজকে সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হতে সহায়তা করে।

ক্ষমা প্রার্থনা মানসিক যন্ত্রনা থেকে বাস্তবিকই মুক্তি দিতে পারে। তবে বিশ্বাসী ভিন্ন এর মর্ম কেউই যথাযথভাবে বুঝতে পারবে না। সকলকে তাই

বিশ্বাসী হতে আহবান করা হয়। কেননা আল্লাহতে বিশ্বাসী আপাতদৃষ্টে শূন্য হাতেও অনেক উপকার পেয়ে থাকে। যদিও এর মধ্যেও সত্য আছে, আছে বিজ্ঞান কিন্তু সবাই সেসব বুঝতে যাবে না আবার অনেকে বুঝবেও না।

বিনয়ী অন্তর ভিন্ন কেউ ক্ষমা প্রার্থনা করে না। ক্ষমা প্রার্থনা করার অপর অর্থ তাই অন্তরের বিনয়ী ও নমনীয় মনোভাবের সৃষ্টি ও প্রকাশ। তেমন মানুষ নিজেকে বা নিজের কাজের ভাল-মন্দ নিজেই মূল্যায়ন করে। নিজেকে শোধরাণোর চেষ্টা করে এবং আল্লাহর নির্দেশনাকে অনুসরণ করে। আল্লাহও তেমন উন্নত আচরণের মানুষদের জন্যই ক্ষমা মঞ্জুর করেন।

মহান আল্লাহ ক্ষমা করলেই কেবল মানুষ ক্ষমা পেতে পারে। মানুষের পাপ মোচন হতে পারে। তিনি ভূলকে শুদ্ধে পরিণত করে দিতে পারেন। তিনি পাপকে পূণ্যে পরিণত করে দিতে পারেন। তিনি সমগ্র পরিস্থিতি, সমগ্র জ্ঞানকে নানাভাবে পাল্টে দিতে পারেন! তাঁর হাতে সকল ক্ষমতা! তাঁর হাতে চাবি। বিশ্বাসী তাই প্রতিনিয়ত আল্লাহর কাছে এক বুক আশা নিয়ে ক্ষমা প্রার্থনা করে যায়। তিনি দয়া করলেই কেবল মানুষ তাঁর রুদ্ররোষ থেকে রক্ষা পেতে পারে। তাই এ প্রার্থনা।

উল্লেখ্য যে, ক্ষমা চাইতে হবে আন্তরীক হয়ে। নিজেকে বা নিজেদেরকে অমনোযোগী বা উদাসীন রেখে কেবল মুখস্ত দোয়া পড়লে সেটি ফলদায়ক হবে না। সচেতন হয়ে ক্ষমা চাইতে হবে। মানবীয় সক্ষমতার সর্বোচ্চ পর্যায়ে সতর্ক ও সচেতন থাকতে হবে সঠিক কাজ করার জন্য। অনিচ্ছাকৃত ভূল ক্ষমা প্রাপ্তির যোগ্য।

উল্লেখ্য যে, আল্লাহর কাছেও সকলে ক্ষমা চাইতে পারে না। সে সৌভাগ্য সকলের হয় না। তার জন্য আল্লাহকে বুঝতে হবে। আল্লাহতে বিশ্বাসী হতে হবে। এমন দৈবী সম্পদপূর্ণ গুণসমুহ অর্জন করতে হবে যা অন্তরকে বিনয়ী করে তুলবে। বিনয়ী মানুষই সত্যিকার অর্থে মন থেকে ক্ষমা প্রার্থনা করতে পারে। সকলে করতে পারে না। অনেকের ক্ষেত্রেই দম্ভ ও অহমিকা বাধা হয়ে দাড়ায়। অহমিকা ও দম্ভ নিয়ে ক্ষমা প্রার্থনা করা যায় না। চতুরতার আশ্রয় নিয়ে ক্ষমা প্রার্থনা করাও হবে অর্থহীন। তেমন ক্ষমা প্রার্থনা কাজেও আসবে না। আল্লাহ অন্তর্যামী। তিনি অন্তরের ভাবনাটিকেও জানেন। মানুষকে

সত্যিকারভাবে অন্তরে নম্র, সভ্য ও সমর্পিত হয়ে আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করতে হবে।

ক্ষমা পেতে হলে অবশ্যই ক্ষমার শর্ত পূরণ হতে হবে। ভূলের পুনরাবৃত্তি করা যাবে না। এতদ্বসত্বেও আল্লাহ যাকে ইচ্ছে ক্ষমা করবেন, যাকে ইচ্ছে শাস্তি দেবেন। আল্লাহর সূক্ষ্ম বিচার ব্যাবস্থা মানুষের বোধগম্যতার উর্দ্ধে। অন্তহীন আশা ও ভরসার স্থানের নাম 'আল্লাহ'।

কষ্ট ও দুর্দশায় জর্জরিত জীবনে আল্লাহর নৈকট্য অনুভবে তাঁর কাছে করা ক্ষমা প্রার্থনা অন্তরকে সত্যি সত্যিই প্রশান্ত করে। ভেতরে কাজ করার শক্তি সঞ্চার করে। আচরণকে সঠিক পথে চালনা করে। ভূল-ত্রুটি থেকে দুরে থাকতে বা রাখতে নিজেদেরকে সতর্ক ও সচেতন করে এবং সক্ষম করে তোলে। ধৈর্য্যধারণের ক্ষমতা বৃদ্ধি করে। এ প্রার্থনা বিনয়ী হয়েও কর্মে সফল হতে সহায়ক হয়ে কাজ করে। প্রাণে আশা ও গতির সঞ্চার করে।

কষ্টে নিপতিত জগতের সকল মানুষের জন্য এটি একটি আদর্শ প্রার্থনা। তবে তার জন্য নিঃসন্দেহে আল্লাহতে বিশ্বাসী ও ভরসাকারী হতে হবে।

▪ **২.২৮৬.৬** তুমিই আমাদের রক্ষাকর্তা। আমাদেরকে বিজয় দাও অবিশ্বাসী সম্প্রদায়ের ওপর (Thou, our Protector, and give us victory over the disbelieving folk) : বিশ্বাসী ও অবিশ্বাসী বিষয়টি এ গ্রন্থে যেভাবে উপস্থাপন করা হয়েছে অর্থাৎ ভাল-মন্দ, সত্য-মিথ্যা বা ন্যায়-অন্যায়ের পার্থক্যের ভিত্তিতে, আয়াতের এ অংশের বিশ্লেষণও সে আলোকেই তুলে ধরা হবে [বিশ্বাসী-অবিশ্বাসী দ্রষ্টব্য ২.৬]।

বস্তুত ভাল-মন্দ, সত্য-মিথ্যা, ন্যায়-অন্যায়ের ভিত্তিমূল ব্যাতিত বিশ্বাসী-অবিশ্বাসী কথাগুলি কার্যত কোন মূল্যই বহন করে না। সেক্ষেত্রে সেটি নোংরা ও নীচুমানের দলীয়, গোত্রীয় কিংবা জাতীয়তাবাদী মনোভাবের পরিচয় বহন করবে। সমগ্র মানবজাতি ও বিশ্ব-মানবতাকে স্পর্শ করতে পারবে না। অথচ বলা হয় ইসলাম এসেছে সকল মানুষের জন্য।

জগতজুড়ে একটা দ্বন্দ্ব চলমান আছে আবহমান কাল থেকে। দ্বন্দ্ব বা যুদ্ধটা আসলে সত্য-মিথ্যার। একদল সত্যের পক্ষে। যখন অপরদল মিথ্যে বা ভূলকে

ধারণ করে আছে বলে বলা হয়। একটা ধারণা মানুষকে সত্যের পথে চালনা করে এবং একটা ধারণা মিথ্যে বা ভূলের দিকে। তাই বলা হয়েছে,

"একদলকে আল্লাহ সঠিক পথে পরিচালিত করছেন যখন অপরদল ভ্রান্ত পথ ধারণ করে আছে। তারা আল্লাহকে তথা সত্য ও ন্যায়ের পথ ছেড়ে শয়তানদেরকে তাদের বন্ধুরূপে গ্রহণ করেছে এবং ধারণা করছে যে তারা সঠিক পথেই পরিচালিত।" (আল-কোরআন ৭:৩০)

দ্বন্দ্বটা আবার জ্ঞান ও নির্জ্ঞানেরও। সঠিক জ্ঞান সত্যের পথে চালনা করে এবং ভূল জ্ঞান ভূল পথে। বিশ্বাসী বিশ্বাস করে সে সত্যের জ্ঞানের ওপর প্রতিষ্ঠিত। অবিশ্বাসীর জ্ঞানও মনে করে সে সঠিক পথে আছে। আবার কখনও সে জানেই না যে সে ভূল পথে আছে। অতএব লড়াই চলছে জ্ঞান-নির্জ্ঞানের।

অবিশ্বাসী কখনও ভূল পথে আছে জেনেও কিছু যুক্তির অবতারণা করে টিকে থাকার জন্য। নিজের অবস্থানে সে অনড় থাকে। অনড় থাকে মূলত স্বার্থের কারণে। দ্বন্দ্বটা আসলে স্বার্থের কারণেও।

একদল জ্ঞানের কারণে সত্য ও সঠিক ধারণায় বিশ্বাসী। অপরদলও কোন যুক্তি ও জ্ঞানের কারণে কোরআনের দর্শনে অবিশ্বাসী। 'কোরআনের দর্শনে অবিশ্বাসী' এভাবে বলা হচ্ছে, কেননা সাধারণভাবে বিশ্বাসী-অবিশ্বাসী কথাটি কোরআনের ধারণায় বিশ্বাস-অবিশ্বাসের ওপর ভিত্তি করে ধরে নেয়া হয়। অথচ কোরআনের ধারণায় বিশ্বাসী নয় জগতে তেমন বিশ্বাসীও আছে। তারাও একজন সৃষ্টিকর্তায় বিশ্বাস করে, ভাল-মন্দ কর্মফলে বিশ্বাস করে, স্বর্গ-নরকে বিশ্বাস করে। বিশ্বাসের কারণে তারাও সঠিক পথে তথা জ্ঞানের পথে, ন্যায়ের পথে ও সত্যের পথে চলে। এমন বিশ্লেষন চরম সত্যের ধারণার ওপর ভিত্তি করে করা হচ্ছে। অর্থাৎ কোন প্রকারের দলীয় ধারণার উর্ধ্বে থেকে।

বিশেষভাবে উল্লেখ্য যে, কোরআনের দর্শনে কোন প্রকার অলীক, কল্পনাপ্রসূত বা কোন অযৌক্তিক ধারণা লালন করার অবকাশ নেই। কোরআন যে দর্শন তুলে ধরেছে তা কুসংস্কারমুক্ত, যৌক্তিক, বাস্তব ও বিজ্ঞানসম্মত এবং সময়পোযোগী। এর প্রতিটি বিষয় ও সূত্র কার্যকারণ সম্পর্কে সম্পর্কিত। কোরআনের বাণীসমুহ বাস্তব জীবনের সর্বক্ষেত্রে ন্যায় প্রতিষ্ঠা করতে ও তাকে সমুন্নত রাখতে বলে। সকল ক্ষেত্রে একটি ভারসাম্য রক্ষা করার শিক্ষা দেয়।

যথাযথভাবে কোরআনের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ সাপেক্ষে মর্মকথা বুঝতে পারার বিষয়টি জ্ঞানের সাথে সম্পর্কিত বিষয়। কোরআনে এমন কোন বার্তা নেই যা মিথ্যে, অন্যায়, অশ্লীল, অযৌক্তিক কিংবা কল্পনাপ্রসূতভাবে বিধৃত হয়েছে। কোরআন বিজ্ঞান তথা সত্য ও যৌক্তিকতাকেই প্রধান্য দেয়। যেমন বলা হয়েছে,

"তারা তোমার কাছে (অর্থাৎ রাসূলের কাছে) এমন কোন দৃষ্টান্ত বা সমস্যা উত্থাপন করে না বা নিয়ে আসে না (যার প্রেক্ষিতে) আমি (আল্লাহ) তোমাকে সত্য বা সঠিক সমাধান ও সুন্দর ব্যাখ্যা বা যুক্তি প্রদান না করি (কোরআনের মাধ্যমে)।" (আল-কোরআন ২৫:৩৩)

আল্লাহই সত্য। কোরআন সত্যকে প্রকাশ করে। বিজ্ঞান ও যৌক্তিকতা সত্যকেই সন্ধান করে। কোরআন সত্যের আলোকে সমস্যার সমাধানের কথা বলে।

এ প্রেক্ষিতে অবশ্য এটিও স্মরণযোগ্য যে, সর্বকালেই জ্ঞানের বার্তা তার যুগের সাথে তাল রেখে চলেছে। একসময়ে গল্পের মতো করে অনেক বিষয় আলোচিত হয়েছে। সেভাবেও মানুষকে ঘটনা বিশ্লেষন করতে শিক্ষা দেয়া হয়েছে। সত্য ও সঠিক বা ন্যায়-অন্যায় বিষয়ে ভাবতে উদ্বুদ্ধ করা হয়েছে। অতঃপর কোনটি গ্রহনীয় এবং কোনটি গ্রহনীয় নয় সেটি বুঝতে সহায়তা করা হয়েছে। সকল ধর্মই চিরকাল ভূল ও সঠিকটি ভেবে-চিন্তে সিদ্ধান্ত নিতে মানুষকে উৎসাহ দিয়ে এসেছে। মানুষের চিন্তার জগতকে আলোড়িত করেছে। জ্ঞান প্রবেশ করিয়ে দিয়েছে মস্তিস্কে। কিন্তু ধর্ম যখন সম্মিলিত মানবের হৃদয় নিঃসৃত সত্যকে প্রত্যাখ্যান করে একটি 'গ্রামার' বা 'ব্যাকরণে' রুপান্তরীত হয়েছে তখন তা ব্যাবসায় পরিণত হয়েছে। যার মধ্যে সেই ধর্মীয় মনোভাব, চেতনা ও উচ্ছাস নেই। তবে এটিও একেবারেই অপ্রয়োজনীয় তা বলা যাবে না। কেননা জগতে সকল মানুষই সমপর্যায়ের নয়। এখানে বিভিন্নজনের হৃদয় ও মস্তিষ্ক যেমন বিভিন্নভাবে আলোড়িত করতে হয়, তেমনি প্রশান্তও করতে হয়। সত্য হচ্ছে, বাস্তবে যা ঘটে তাই সত্য এবং সেটি সম্ভব হয় বলেই ঘটে। প্রয়োজন ফুরিয়ে গেলে আবার নিঃশেষও হয়ে যায়। বস্তুত নিঃশেষ হয়ে যায় না। জ্ঞানটা থেকে যায়। কেউ কেউ ধারণ করে রাখে। সেটিও প্রয়োজনীয়।

একই সমস্যায় পুনর্বার পতিত হলে তারাই তখন হাল ধরে, ঠিক 'টিকা' যেভাবে মানব দেহে কাজ করে বিষয়টি তেমন। এ জগতে কোন কিছুই ফেলে দেবার নয়।

প্রসঙ্গে ফিরে আসি। যুদ্ধটা আবার ন্যায়-অন্যায়েরও। বস্তুত যুদ্ধটা দু'পক্ষের স্বার্থের। দুটি পক্ষের স্বার্থের সাথেই রয়েছে ন্যায়-অন্যায়ের সংশ্লিষ্টতা। সেখানে ন্যায্যতা বা ভারসাম্য প্রতিষ্ঠিত হওয়া প্রয়োজন। আছে অর্থ-সম্পদের বন্টনে ন্যায়-অন্যায়, আছে ক্ষমতার ব্যাবহারে ন্যায়-অন্যায়, আছে সামাজিক আচার-আচরণে ন্যায়-অন্যায়, আছে বিচার-সালিশে ন্যায়-অন্যায় ইত্যাদি।

ন্যায়ের পথই হচ্ছে সত্যের পথ। সঠিক বা যথাযথ জ্ঞানের পথ। অন্যায়ের পথ হচ্ছে মিথ্যে, ভূল বা ক্ষণিকের মোহ দ্বারা চালিত নির্জ্ঞানের পথ। মানুষের মধ্যে একদল বিষয় ও সময়ের প্রেক্ষিতে ন্যায়ের পক্ষে অবস্থান করে। অপরদল অন্যায়ের পক্ষে। বলা হচ্ছে, 'অবিশ্বাসীরাই অন্যায়কারী' (আল-কোরআন ২:২৫৪)। অর্থাৎ যারা অন্যায়কারী তারাই সত্যে অবিশ্বাসী। তারাই মিথ্যে বা ভূলের পক্ষে। অসত্যের পথে। তাই বলা হয়েছে,

"যারা অবিশ্বাস করে তারা বস্তুত মিথ্যের অনুসরণ করে এবং যারা বিশ্বাসী তারা তাদের পালনকর্তার নিকট থেকে আগত সত্যের অনুসরণ করে।" (আল-কোরআন ৪৭:৩)

অতএব 'মিথ্যের অনুসরণকারীরাই অবিশ্বাসী' এবং 'সত্য পথের অনুসারীরা বিশ্বাসী'। এটিই বিশ্বাসী-অবিশ্বাসীর সবচাইতে যথাযথ সঙ্গা। কতগুলি আচার-অনুষ্ঠান, রীতি-নীতির পরিপালনই কেবল মানুষের মতো সৃষ্টির একটি সেরা জীবের বিশ্বাসী কিংবা অবিশ্বাসী হওয়ার বিষয়টিকে নির্ধারণ করতে পারে না। সেজন্যই ওপরে ধর্মের ক্ষেত্রে 'গ্রামার' বা 'ব্যাকরণ' শব্দটি ব্যাবহার করা হয়েছে। একইসাথে অবশ্য এটিও উল্লেখ করা হয়েছে যে বাস্তবতার প্রয়োজনে এগুলিরও প্রয়োজন আছে। কিন্তু সর্বোচ্চ প্রাধান্য দিতে হবে সত্য-মিথ্যা, ন্যায়-অন্যায়কে। এর ভিত্তিতেই বিশ্বাসী-অবিশ্বাসী নির্ধারিত হতে হবে। তাই বলা হয়ে থাকে,

"সত্য ব্যতিত কেবল ধর্মের প্রতিই তোমরা অধিক গুরুত্ব দিও না।" (আল-কোরআন ৫:৭৭)

সাধারণভাবে ধর্ম বলতে মানুষ ধর্মীয় বিধি-বিধান, আচার-অনুষ্ঠান এসবের পালনকেই ধর্ম পালন বলে মনে করে। ওপরের বাণীতে ধর্মের ক্ষেত্রে এসবের ওপর অধিক গুরুত্ব না দিয়ে সত্যের ওপর গুরুত্ব দিতে বলা হয়েছে। সত্যকে সমুন্নত রাখাই ধর্মের মূল কাজ এবং সে কারণেই বিধি-বিধান পালন করতে হয় যেন মানুষ সত্য বিচ্যুত হয়ে না যায়। অতএব সত্যই মূল।

ইসলাম ন্যায়ের বার্তা নিয়ে আগমন করেছে। সকল মানুষের জন্য এসেছে। কোন সুনির্দিষ্ট দলের স্বার্থ সংরক্ষণ করতে ইসলামের আবির্ভাব ঘটেনি। 'জগতের সকল মানুষই কোরআনে প্রদর্শিত পথ-নির্দেশনার ন্যায্যতার প্রসঙ্গ উত্থাপন করে নিজের বা নিজেদের অধিকার দাবী করতে পারে।' অত্যান্ত গুরুত্বপূর্ণ বক্তব্য এটি। তার জন্য ন্যায়ের ভিত্তিতে কোরআনের সত্য ও সঠিক ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ প্রণয়ন করতে হবে। প্রচলিত ধারণায় পরিবর্তন আনতে হবে।

লড়াই চলছে ভাল-মন্দ, সত্য-মিথ্যা, ন্যায়-অন্যায়, জ্ঞান-নির্জ্ঞান হয়ে বিশ্বাস-অবিশ্বাসের তথা বিশ্বাসী ও অবিশ্বাসীর মধ্যে। 'আমাদেরকে বিজয় দাও অবিশ্বাসী সম্প্রদায়ের ওপর'। দীর্ঘ সূরার শেষ পর্যায়ে এসে গুরুত্বপূর্ণ এ প্রার্থনা উপস্থাপিত হয়েছে।

প্রার্থনার মধ্য দিয়ে এখানে জেহাদ, যুদ্ধ বা সংগ্রামের মূল লক্ষ্যকে বিশ্বাসীদের সামনে উপস্থাপন করা হয়েছে। বিশ্বাসীর অন্তরে লক্ষ্য অর্জনের আন্তরীক ইচ্ছে প্রবেশ করিয়ে দেয়া হয়েছে।

এ প্রার্থনা আল্লাহর সহায়তা প্রাপ্তির প্রত্যাশাকে জাগ্রত করে। ভেতরকে উজ্জীবিত করে। অন্তকরণকে দৃঢ় ও শক্তিশালী করে। বিশ্বাসীদের ওপর এর মনস্তাত্তিক প্রভাব অপরিসীম। মনস্তত্ত্বও এক অত্যান্ত গুরুত্বপূর্ণ বিজ্ঞান!!

অসত্যের ওপর বিজয় অর্জন করাই বিশ্বাসীর লক্ষ্য। এটিকেই অবিশ্বাসী সম্প্রদায়ের ওপর বিজয় অর্জন করা বলে বলা হয়েছে। অর্থাৎ অন্যায় ও ভূলের বিপক্ষে সত্য ও ন্যায়কে প্রতিষ্ঠা করা। বস্তুত এ লক্ষ্যেই আল্লাহ মানুষ সৃষ্টি করেছেন। এটিই জগতকে সর্বনাশের তথা ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করতে পারে। বিষয়টিকে তাই সৃষ্টির আপাত লক্ষ্য মনে করা যেতে পারে।

দ্বন্দ্বের মাধ্যমে একে অন্যকে তাড়া করে ফেরা বা একে অন্যের পেছনে এভাবে ছুটে বেড়ানর অপর নামই হচ্ছে সংগ্রাম বা জেহাদ। এর মাঝেই আছে

জীবনের সচলতা বা গতিময়তা যা প্রতিনিয়ত পরিবর্তনকে সম্ভব করে তোলে। সৃষ্টিকে বিকশিত করে।

জগতের সর্বত্রই বিপরীতমুখী শক্তিসমুহের লড়াই চলছে। সে লড়াইয়ে 'সত্য' অসত্যের ওপর বিজয় প্রত্যাশী। বলা হচ্ছে,

"আমি সত্যকে মিথ্যের বিপক্ষে নিক্ষেপ করি, অতঃপর সত্য মিথ্যের মস্তক চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দেয় এবং নিশ্চয়ই! মিথ্যে নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়।" (আল-কোরআন ২১:১৮)

আল্লাহ বিরাজ করেন সত্য ও ন্যায়ের সাথে। বিশ্বাসীরা জানে তারা সত্যের পথে পরিচালিত। আল্লাহ আছেন তাদেরই সাথে। তিনিই তাদের রক্ষাকর্তা।

যে সময়ে এ বাণী অবতীর্ণ হয়েছে তৎকালীন প্রেক্ষাপট বিবেচনায় বিশ্বাসীরা যে শারীরিক, মানসিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক চাপের মুখে ছিল এ প্রার্থনা আল্লাহতে বিশ্বাসীর অন্তরে প্রশান্তির ছাঁয়া নিয়ে এসেছে। আশার আলো জাগ্রত করেছে। তারা আল্লাহর নৈকট্য অনুভব করেছে। সত্যি বলতে আল্লাহর নৈকট্য অনুভবের মধ্যেই বিশ্বাসীর সকল শক্তি ও শান্তি লুক্কায়িত থাকে। এ প্রার্থনা তাদের ভেতরে সাহসের সঞ্চার করেছে। তাদের ধৈর্য্য ধারণের সক্ষমতাকে বৃদ্ধি করে দিয়েছে। ধৈর্য্য লক্ষ্যে অবিচল থাকতে সহায়তা করে। লক্ষ্যে সফল হতে প্রার্থনা এভাবেই মানুষকে সহায়তা দিয়ে যায় [প্রার্থনা দ্রষ্টব্য ২.১২৭]। বলা হচ্ছে,

"বিজয় আসে আল্লাহর সাহায্যে। তিনি যাকে ইচ্ছে বিজয়ে সাহায্য করেন। তিনি পরাক্রমশালী, দয়ালু।" (আল-কোরআন ৩০:৫)

বিশ্বাসী বিশ্বাস করে জয়-পরাজয় আল্লাহর হাতে। বিশ্বাস-অবিশ্বাসের দ্বন্দ্বে বিশ্বাসী আল্লাহর পক্ষ শক্তি হয়ে অবিশ্বাসীদের বিপক্ষে এক কঠিন সংগ্রামের মুখোমুখী দাড়িয়ে। সে যুদ্ধে জয় পেতে বিশ্বাসী বিজয় প্রত্যাশায় আল্লাহর কাছে প্রার্থনায় রত। নিজ প্রচেষ্টা সত্বেও এ প্রার্থনা বিশ্বাসীর বিনয়ী আচরণের প্রকাশ। ন্যায়ের পক্ষাবলম্বনের সাথে বিনয়ী আচরণই হচ্ছে শক্তির উৎস। এ দু'য়ের মাঝে একটি লুক্কায়িত সম্পর্ক আছে।

আল্লাহর কাছে নিজের প্রার্থিত বিষয়ে প্রার্থনা বিশ্বাসীকে তার প্রত্যাশা পুরণের বিষয়ে আশাবাদী করে তোলে। আশা তাকে এগিয়ে নিয়ে যায়।

আল্লাহর কাছে প্রার্থিত বিষয় তার লক্ষ্য। আর প্রার্থনা সে লক্ষ্যে অবিচল থাকার ইচ্ছে বা নিয়তের বহিঃপ্রকাশ। ইচ্ছে তাকে বুদ্ধি-জ্ঞান, শক্তি-সাহস সব সরবরাহ করে, আত্মপ্রত্যয়ী করে তোলে, মনবলকে উচ্চে উন্নীত করে। সামষ্ঠিক প্রার্থনা নিজেদের সংহতিকে বৃদ্ধি করে। লক্ষ্য বা বিজয় অর্জনের সংগ্রামে মনবলই বিজয়কে সম্ভব করে তোলে। এ সবকিছু ঘটে আল্লাহকে মাধ্যম ধরে যা নিজের ইচ্ছে এবং সকল শারীরিক ও মনাসিক শক্তিকে একত্রিত করে নিজেকে পরিপূর্ণরূপে জাগ্রত হতে সহায়তা করে! মানুষ জেগে উঠলে অসম্ভবকে সম্ভব করতে পারে কিংবা সে পথে জীবনও বিসর্জন দিয়ে দিতে পারে, যা ইহজাগতিক কোন কাজে তার প্রচেষ্টার সর্বোচ্চ পর্যায়কে প্রকাশ করে।

'তুমিই আমাদের রক্ষাকর্তা'। নানাবিধ বিপদ-আপদ থেকে মানুষ নিজেই নিজেকে রক্ষা করে। আবার কখনও একজন মানুষও অপর একজন মানুষকে বিপদ থেকে উদ্ধার করে। জীব-জন্তু, পশু-পাখি এমনকি গাছপালাও মানুষকে অনেক বিপদ-আপদ থেকে রক্ষা করে; অর্থাৎ সার্বিক পরিবেশ মানুষকে রক্ষা করে। এমন অনেক উদাহরণ হতে পারে।

রক্ষাকর্তারূপে যখন আল্লাহকে স্মরণ করা হয় তখন সেটি সর্বশেষ পর্যায়কে বিবেচনা করে করা হয়। শেষ পর্যায়ে যখন আর কেউ থাকে না তখন থাকে একা 'নিজ'। তখনই মানুষ আল্লাহকে অনুভব করে সবচাইতে যথাযথভাবে। যখন সব সম্পর্ক, আশা-ভরসা ছুটে যায় তখন মানুষ একমাত্র নিজের ওপর ভরসা করে। তখন নিজেই নিজের রক্ষাকর্তা। কিন্তু এই নিজে কে মানুষ সেটা জানে না। এই নিজের সাথেই আল্লাহর সবচাইতে ঘনিষ্ট সম্পর্ক। যখন কেউ থাকে না তখন থাকেন আল্লাহ। মানুষ প্রচন্ডভাবে একা হয়ে গেলেই আল্লাহকে সবচাইতে ভালভাবে অর্থাৎ হৃদয়ের সকল অনুভূতি দিয়ে অনুভব করে। তখন বুঝতে শেখে যে আল্লাহই একমাত্র রক্ষাকর্তা।

আল্লাহকে দেখা যায় না, ধরা যায় না, ছোঁয়া যায় না। দেখা যায় কেবল নিজেকে। আল্লাহর ওপর ভরসা মানে নিজের ওপর নিজের ভরসা। এখানেই আত্মবিশ্বাসের সৃষ্টি। এখানেই মানুষ প্রথম আত্মকে উপলব্ধি করে। এমন পরিস্থিতির মুখোমুখী হওয়া ভিন্ন সত্যিকার আত্মবিশ্বাস সৃষ্টি হয় না। জ্ঞান অর্জন করে বিষয়গুলি কেবল জানা যায় কিন্তু অন্তকরণের উপলব্ধিতে আনা

কঠিন। আল্লাহর অনুভব মানুষকে আত্মবিশ্বাসী হয়ে উঠতে সহায়তা করে। আত্মবিশ্বাস যেমন বিজয় ছিনিয়ে আনে আবার এই আত্মবিশ্বাসই নিজেকে রক্ষা করে সকল বিপদ থেকে। এভাবেই আল্লাহ মানুষের রক্ষাকর্তা হয়ে দাড়ান।

ওপরে মানুষ থেকে শুরু করে জীব-জন্তু, পশু-পাখি, গাছ-পালা যাদেরকে রক্ষার সহায়ক বলে উল্লেখ করা হয়েছে, বস্তুত তাদের পেছনে তথা সমগ্র পরিবেশের পেছনেও সেই একই আল্লাহর হাত রয়েছে। সবদিক বিবেচনায় আল্লাহই সকলের একমাত্র রক্ষাকর্তা।

বিশ্বাসীগণ যখন বিপদের মুখোমুখী হয় তারা আল্লাহকেই স্মরণ করে, আল্লাহতেই ভরসা করে। অন্য কোথাও নয়। আল্লাহর ভাবনাই তাদেরকে উজ্জীবিত করে। ভেতরে প্রাণের সঞ্চার করে। মনবল বৃদ্ধি করে। আল্লাহই বিশ্বাসীদের তথা বোধসম্পন্ন ও ন্যায়ের পক্ষ্যের সকল মানুষের জন্য এভাবে সহায়তা দিয়ে একমাত্র রক্ষাকর্তা হয়ে মূর্তমান থাকেন।

যারা সত্য ও ন্যায়ের পথ অবলম্বনকারী তাদের সকলের জন্য এটি একটি শাশ্বত ও সার্বজনীন প্রার্থনা। তবে এ বাণীর আরও কিছু তাৎপর্য আছে।

যে সময়ে এ বাণী অবতীর্ণ হয়েছিল সেটি ছিল মুসলমানদের জন্য একটি কঠিন পরীক্ষার সময়। তারা আর্থ-সামাজিক সবদিক থেকে ভীষনভাবে কষ্টে নিপতিত হয়েছিল। অবিশ্বাসী-অন্যায়কারীদের দ্বারা নির্যাতিত হয়েছিল। এ অবস্থায় আল্লাহ বিশ্বাসীদেরকে এ প্রার্থনা শিক্ষা দান করেন। যা তাদেরকে তাদের আদর্শের পথে ধৈর্য্যের সাথে লেগে থাকতে সহায়তা করেছে, ধৈর্য্যের সাথে বিপদ মোকাবেলা করতে শিক্ষা দিয়েছে, মনবলকে উজ্জীবিত করেছে ও রেখেছে এবং প্রাণান্তকর কষ্ট সত্বেও উচ্চ মানের নৈতিক মূল্যবোধকে ধারণ করার শক্তি দান করেছে; বিনয়ী হতে শিক্ষা দিয়েছে, লক্ষ্যের পানে ধৈর্য্যের সাথে অবিচল থাকতে শক্তি জুগিয়েছে।

আল্লাহর কাছে প্রার্থনা বা তাঁর স্মরণ বিশ্বাসীকে তথা বোধসম্পন্ন সকল মানুষকেই আশাবাদী হতে সহায়তা করে। সে আশায় বুক বেধেই আল্লাহর দরবারে এমন প্রার্থনা করা হয়েছে, “আমাদেরকে বিজয় দাও অবিশ্বাসী সম্প্রদায়ের ওপর।” আশাই মানুষকে তার অবিরাম কর্ম প্রচেষ্টার মাধ্যমে সফলতার দ্বারপ্রান্তে পৌঁছে দেয়।